সচিত্র মাসিকপত্র

মালঞ্চ

৭ম বর্ষ প্রথম খণ্ড

(১৩২৭ বৈশাখ হইতে আশ্বিন ১৩২৭)

সম্পাদক

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত এম, এ

প্রকাশক

সাহিত্যপ্রচার স

২৪নং ষ্ট্রাণ্ডরোড

মালঞ্চ

সপ্তম বর্ষ

প্রথম ষাণ্মাসিক বিষয়-সূচী

বৈশাখ হইতে আশ্বিন

১৩২৭

প্রবন্ধাদি

গল্প-উপন্যাস

কবিতা

চিত্র (রঙ্গিন)

ভক্তিমতী

পল এণ্ড কোং লিঃ
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা
"পোষাক"
সকল রকম
তৈয়ারী ও
অর্ডারী
পোষাক
ও
থান
"কাপড়"
বেনারসী, পাশী
ও সকল রকম
ধুতী
ও
শাড়ী
মফঃস্বলের
জন্য বিশেষ
বন্দোবস্ত
আছে

মালঞ্চ

৭ম বর্ষ } বৈশাখ—১৩২৭। { ১ম সংখ্যা

চুক্তির দাবী

"বলিস্ কি রমু! এতগুলো টাকা খরচ ক'রে বিলেত পাঠালি, মস্ত একটা নামকরা মানুষ হ'য়ে নাকি ফিরে এল, এখন বলে বিয়ে ক'রবো না?"

"তাই ত খুড়ীমা, কি করি এখন বলত? অবাক ক'রেছে একেবারে। আজকালকার শিক্ষিত ছেলে—বিলেত থেকে এসেছে—নামকাম খুব হ'য়েছে—এরাও এত বড় পেজোমোটা ক'রবে—"

"বলে কি? কেন বিয়ে ক'ত্তে চায় না? এতগুলো টাকা--"

রমাকান্ত উত্তর করিলেন, "টাকার জন্য ত ভাব্‌ছি না খুড়ীমা।--ছ সাত হাজার টাকা গেছে, তা আমাদের কারবার না জুয়োখেলা—অমন পঁচিশ ত্রিশ হাজারও কত যায়, আবার হ'লত লাখ-দুলাখও এল। টাকার জন্য ত ভাব্‌ছি না। তবে এমন নামকরা ছেলে—ওর হাতে মেয়ে দেব মনে ক'ল্লেও বুকটা দশহাত উঁচু হ'য়ে ওঠে। না খুড়ী মা, এ ছেলে আমি ছাড়তে পারিনে। আর মানুষ ক'রে এনেছি আমি নিজে, এখন ছাড়্‌তে পারি?"

"ছাড়্‌বি না, কি ক'র্‌বি? বিয়ে যে ক'ত্তে চায় না?"

"যত টাকা লাগে দেব। ওকে জামাই আমার ক'ত্তেই হবে।"

"তা কি বলেছে কিছু? টাকা কি চায়?"

"না, তা চায় নি কিছু। বরং লিখেছে, বছর দুহাজার ক'রে আমাকে দেবে,--পাঁচ বছরে সুদে আসলে আমার টাকা উঠে আস্‌বে, চুক্তি থেকে আমি এখন মুক্তি দিই এই তার ইচ্ছে।"

"হুঁ—"

"তা আমি ত আর সুদ খাব ব'লে টাকা লাগাইনি তার কাছে। এখন ছাড়ব কেন?"

"ছাড়্‌বি না, ক'র্‌বি কি? ধ'রে বেঁধে কি ব্যাটা-ছেলের বিয়ে হয়?"

"ধ'রে বেঁধে হয় না,—টাকায় হয়। পঞ্চাশ হাজার, ষাট হাজার—চায় এক লাখ টাকা আমি দেব।"

"তাতে কি আর মেয়ের সুখ হবে কিছু?"

"কেন হবে না? বিয়ে ক'রে কি আর ভদ্রলোক কেউ স্ত্রীকে অযত্ন ক'রে? আরও বিলেত থেকে এসেছে—বড় একটা পদমর্য্যাদা হ'য়েছে—"

"তা হ'ক্ বাছা। ও ছেলে আসলে লোক ভাল নয়, ধর্ম্মজ্ঞান একটুও নেই—

রমাকান্ত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন,—কহিলেন, "খুড়ীমা, ও সব ধর্ম্মজ্ঞান ট্যান—সেকেলে কথা এখন রেখে দেও। ধর্ম্মজ্ঞান! ধর্ম্মজ্ঞান আবার কোথায় এখন কার আছে? এই যত বড় বড় লোক বল, রাজা জমিদার, উকিল কৌন্সিলি, ডাক্তার কবিরাজ, ব্যবসায়ী মহাজন, ধর্ম্মজ্ঞানে কোন্ কাজটা কে ক'রে থাকে? কেবল পয়সা। পয়সা কিসে আস্‌বে, এই যা এক হিসেব আজ কাল্‌কার সব লোকে করে। তবে আইন বাঁচিয়ে চ'লতে হয়, এই যা কথা। নইলে ধর্ম্মজ্ঞান আবার কোথায় কার আছে? কারবারে যে এত টাকার খেলা খেলছি, এই যে হাজারে হাজারে টাকা আস্‌ছে—ধর্ম্মজ্ঞানের ভূত ঘাড়ে চাপলে কবে ফতুর হয়ে পাড়াগাঁয়ের সেই কুঁড়ে ঘরে গে আধপেটা ভাতের জন্যে মাথার ঘাম পায় ফেল্‌তে হ'ত।"

খুড়ীমা একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া উত্তর করিলেন, "তা বাপু, তোরা যা খুসী ক'রগে, আমাদের কাছে আর ওসব বড়াই করিস নি। কাণে শুনতেও ভয় করে।"

"তা ত করে, কত সুখে এখন আছ দেখ দেখি। আর তোমার ধর্ম্মজ্ঞান নিয়েত সেই কুঁড়ে ঘরে থাকতে, ক্ষুদ কুড়ো খেতে।"

"তা বাবা যাই বলিস্, এর চাইতে সেই কুঁড়ে ঘরে ক্ষুদ কুড়োও যে ভাল ছিল। বিদুরের কুঁড়ে ঘরে এক মুঠো ক্ষুদের ভিক্ষেও ভগবান্ যে সোণার মুঠোর চেয়েও আদর ক'রে হাতে নিয়েছিলেন।"

"যত সব বাজে কথা! ওসব দিন আর এখন নেই খুড়ীমা, জানলে? কলি বল, তাই সই। তা কলিতে কলির জীব হ'য়েই চলতে হবে। কলিতে কলির ধর্ম্মই মানতে হবে।"

খুড়ীমা কহিলেন, "কলির আবার ধর্ম্ম! এক পো নাকি ছিল, তাও দেখছি গেছে। তা বাপু, যা খুসী বাইরে তোরা গিয়ে কর।—আমাদের আর ওসব কথা শুনোস্ নি। তোর ঐশ্বর্য্যের ভোগ চাই নি,—বিনোর একটা গতি হ'ক, তারপর আমায় কাশী পাঠিয়ে দে,— বাব বিশ্বনাথের পায়ে গিয়ে পড়ে থাকব।"

রমাকান্ত হাসিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, সে তখন বোঝা যাবে।—বিনোর এই গতিটা আগে হ'ক।"

খুড়ীমা আবার একটু ভাবিয়া কহিলেন, "তা ও ছেলে বলে কি?—বিয়ে কত্তে চায় না কেন?"

"কেন, সে ত স্পষ্ট কিছু বলে না। যত বাজে ছুতো করে! লিখেছে, তখন না বুঝে একটা চুক্তি ক'রে ফেলেছিল—

"চুক্তি! ওমা সে কি!"

"চুক্তি বই কি?—আমি তাকে বিলেতে ডাক্তারী পড়ার যত খরচ পত্তর দেব, ফিরে এলে এখানে ব'সতে যা খরচ লাগে যোগাব, আর সে আমায় মেয়ে বিয়ে করবে। এই ত হ'য়েছিল চুক্তি আমার সঙ্গে তার।"

"ও কপাল! কি যে বলে! বিয়ের সম্বন্ধ—দেনা পাওনার কথা কত হয়ে থাকে; তাকে কি চুক্তি বলে? সে হ'ল—"

"ঐ আসলে গিয়ে হল চুক্তিই। সোজা সত্যি কথাটা ব'লতে হ'লে তাই বলতে হয়।"

"তা দিন কাল যা প'ড়েছে, ব'ল্লেও এমন দোষ কিছু হয় না। আগে ছিল কোন ঘরে কার কি দেনা পাওনা, সব নিয়ম বাঁধা। সম্বন্ধ যদি পছন্দ হ'ল, আর কথাটি নেই, ঘটকরা আর মাতব্বর সামাজিকরা দেনা পাওনার মীমাংসা করে দিত, কথাটি কেউ ব'লত না। উঁচু ঘরের মেয়ে আনলেও পণ ভালমানষী সব যেমন নিয়ম ছিল, দিতে হত।"

"তাই বল্লুম না খুড়ীমা, সেই সত্যিযুগ আর তোমাদের এখন নেই। ঘোর কলিই এসে প'ড়েছে, যতই তোমরা মাথায় হাত দেও, আর হা হুতোশ কর।"

"তা ত দেখতেই পাচ্ছি। নইলে এই ত ভদ্দর লোকের ছেলে—লেখা পড়া শিখেছে—বড় ভাই আছে,— কোথায় সে রইল, নিজে ক'ল্লে বিয়ের চুক্তি! এক রাশি টাকা খরচ ক'রে এল, এখন ব'লে বিয়ে ক'রব না। তা বলে কি? ভুল বুঝে ত চুক্তি করেছিল। তা কচি খোকাটি ত আর ছিল না। কেন এ ভুল বুঝল? না, তখন বুঝি বিলেত যাবার বাই মাথায় চড়েছিল,—খরচাব টাকা নিজের নেই, কেউ আর দেবেও না—"

"কথা আসলে তাই। এখন ব'লছে, বিয়ে—জীবনের মত একটা সম্বন্ধ মেয়ের সঙ্গে জানা শুনা নেই—"

"অবাক ক'ল্লে কেন তখন ত দেখেই পছন্দ ক'রে গেল—"

"পছন্দ কি আর ঠিক মেয়েকে ক'রেছিল? ক'রেছিল বিলেত যাবার টাকা। তা সত্যি বলতে কি খুড়ীমা, বিনো ত দেখতে এমন সুন্দর মেয়ে নয়—তবে নেহাত যে একটা যাচ্ছেতার মত—তাও কিছু বলা যায় না।"

খুড়ীমা একটু মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "হুঁ—তা আমি বলি কি রমু, এ সম্বন্ধ ছেড়ে দিগে। টাকা যা গেছে— তা গেছে, কতই ত যায়। মেয়েটাকে একেবারে জলে ফেলে দিস্‌নে।"

"জলে ফেলে দেব! বল কি খুড়ীমা? কি ছেলে! খাসা পাশ করে বেরোল—কত বড় বড় সাহেবের ছেলে-গুলোকেও কত নীচে ফেলে প্রথম হ'ল। অমনি যুদ্ধের ডাক্তার হ'য়ে গেল, কত নাম সেখানে হ'ল। কি সব মান পেলে—রাজা নিজে পর্য্যন্ত তারিফ ক'রে

তাকে চিঠি দিয়েছেন। এই ছেলের হাতে মেয়ে দেব—লাগ্‌বে না হয় আর লাখ টাকা! একেও ব'লছ মেয়ে জলে দেওয়া?"

"সুখ হবে না, রমু, বিনোর সুখ হবে না। আমি ব'লে রাখলুম, শেষে পস্তাবি। হ'ক্‌না বড়লোক, ছেলে মানুষ নয়। মেয়ের যদি সুখ চাস্‌, মানুষের হাতে দে।"

"পাগল হ'য়েছ খুড়ীমা! মানুষ আবার কাকে বলে? আর এই এক কথায় আমি সম্বন্ধটা ছেড়ে দিতে পারি? যা ব'লছে ও সব বিলেতফেরতা ছেলেদের খেয়াল। বিয়ে যদি এখন না হয়, আমার মান থাক্‌বে না, মেয়েব নামে একটা বদনাম্‌ হবে। আর ধর না, বাগ্‌দান হ'য়ে গেছে—সেটা ত তোমরা মান? আর এও ঠিক জেনো—এখন যাই ওজর আপত্তি করুক, বিয়ে হ'লে সব মিটে যাবে। ওকে মাথায় ক'রে শেষে রাখবে। সাহেবদের দেশে থেকে, তাদের সঙ্গে মিলে মিশে সাহেবী খেয়াল কিছু হ'য়েছে,—তা সেটা একরকম ভালই হ'য়েছে। মেমসাহেবরা সাহেবদের কাছে কত আদর পায় জান? বিয়েটা হ'ক্‌, বিনো দেখো তেমনি আদর ওব কাছে পাবে।"

খুড়ীমা আর কিছু বলিলেন না। উত্তরে কেবল অতি গভীর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

(২)

"রমাকান্ত বাবু তা'হলে এই চুক্তির দাবীটা ছেড়ে দিতে প্রস্তুত নন?"

এটর্ণি বিনোদকৃষ্ণ বাবু এক গাল মিষ্টহাসি ছড়াইয়া মধুর মোলায়েম স্বরে উত্তর করিলেন, "চুক্তির কথাটা আর কেন তুলছেন ডক্টর রায়। আপনার কাছে কি চুক্তির দাবী নিয়ে কোনও কথা তাঁর চল্‌তে পাবে? জামাই ব'লে আপনাকে তিনি আশীর্ব্বাদ ক'রেছেন—"

"All bosh! ওসব রেখে দিন। চুক্তিই একটা তাঁর সঙ্গে আমার হ'য়েছিল। আমার পণ আমি রাখ্‌তে পাচ্ছি না, সুদে আসলে ক্ষতিপূরণ তাঁকে আমি দিতে চাচ্ছি। এর বেশী আর আমি এখন কি ক'ত্তে পারি?"

"দেখুন, ক্ষতিপূরণের কথা ব'লেছেন, ৬।৭ হাজার টাকা আপনার জন্যে তিনি খরচ করেছেন; লাখ টাকার উপর মাসে যার আয়—"

"লাখ টাকার উপরে মাসে আয়! বলেন কি মিষ্টার বোস্‌?"

"হাঁ, তাইত বল্‌ছি। কেন আপনি কি জানেন না?—আজ কাল যে ক'লকেতার একজন premier merchant তিনি। তিন চারটে কয়লারখনি, ৫।৬টা চাবাগান, মস্ত order supply agency—branch তার নানান সহরে কাজ ক'চ্চে। তারপর—share merketএ, lands speculation এ যাতে হাত দিচ্চেন, একেবারে সোণা ফ'লছে! লাখ টাকার ত কথাই নাই, ক লাখ মাসে আসে, কে জানে?—ঐ এক মেয়ে, এই ক'হাজার, মোটে আপনার জন্যে খরচ ক'রেছেন—সেটা ত তিনি হিসেবেই ধরেন না। আমাকে ত বল্‌ছিলেন, লাখ টাকা পর্য্যন্ত আপনাকেই যৌতুক দেবেন—এছাড়া মেয়েকে যা দেবেন—"

ডক্টর রায় উত্তর করিলেন, "হুঁ, লম্বা ঘুষ দিতে চাচ্ছেন দেখছি। তবে মিছে চেষ্টা জান্‌বেন মিষ্টার বোস্‌। এটা যা তা একটা কেনাবেচার কাজ নয়। জীবনটা টাকায় বিকিয়ে দেবে, সে ছেলে নবেন রায় নয়!"

বিনোদবাবু একটু অপ্রতিভ হইয়া সামলাইয়া কহিলেন "ঘুষ! বলেন কি ডক্টর রায়? শ্বশুর জামাতাকে যৌতুক দেবে, একে কি ঘুষ বলে?"

"প্রথম সেই চুক্তির সময় এ যৌতুকের কথা কিছুই ছিল না। এখন একথা তুলেছেন, একে ঘুষ ছাড়া কি ব'লব? তা জান্‌বেন, ঘুষ নিয়ে কোনও ভদ্রলোক বিয়ে করে না। টাকার লোভে জীবনটা বিকিয়ে দেব, সে আমাকে দিয়ে হবে না।"

বিনোদবাবুর মুখে কটু একটা উত্তর আসিতেছিল,—ঠোঁটে কামড় দিয়া কিছুকাল চুপ করিয়া রহিলেন। শেষে কহিলেন, "তা নিজে ইচ্ছে ক'রেই ত বিবাহের সম্বন্ধে সম্মতি দিয়েছিলেন। এখন আপত্তির কারণটা কি হল, বুঝ্‌তে পাল্লে—"

ডাক্তার রায় উত্তর করিলেন, "সে কারণ আমি কাউকে ব'ল্‌তে বাধ্য নই। চুক্তি একটা যে ভাবেই হ'ক্‌, হয়েছিল। এখন দেখ্‌তে পাচ্ছি, চুক্তির সর্ত্ত আমি রাখ্‌তে পাচ্ছি না। বেশ, তাঁর সে টাকা আমি ফিরিয়ে দিতে চাচ্ছি। বস্‌, আর কেন?"

"এটা কি একটা সাধারণ চুক্তি ব'লে মনে করেন? আপনি ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে—"

"তাঁকে চ'ক্ষে একবার দেখেছিলাম বটে, আলাপ পরিচয় কিছু হয়নি, প্রেমের খেলাও কিছু করিনি? Engagement হ'য়েছিল তাঁর পিতার সঙ্গে, তাঁর সঙ্গে নয়। তবু যদি বলেন্ তাঁর হৃদয় ভঙ্গের কারণ কিছু ঘটতে পারে, বেশ, ক্ষতিপূরণ নালিশ তিনি ক'ত্তে পারেন—"

বিনোদবাবুর মুখ খানি লাল হইয়া উঠিল,—উত্তর করিলেন, "হিন্দু ভদ্রঘরের মেয়ের সম্বন্ধে হিন্দু সন্তানের মুখে একথা শোভা পায়না ডক্টর রায়।'

"আপনি আমাকে অপমান ক'চ্ছেন মিষ্টার বোস্?"

"মাপ ক'র্‌বেন ডক্টর রায়, তার চেয়ে বেশী অপমান আপনি আমার মক্কেলকে আর তাঁর কন্যাকে ক'রেছেন।"

"যেচে তাঁরা অপমান নিচ্ছেন,—আমার দোষ কিছুই নাই। তাহ'লে, এখন বিদায় মিষ্টার বোস্, কিছু ব'ল্‌বার যদি আপনাদের থাকে, বেশ, formal চিঠি দেবেন। আর উত্তরও আমার এটর্ণির কাছ থেকে পাবেন। Good bye। বেয়ারা!"

রায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বিনোদবাবুও অবশ্য উঠিলেন, উঠিয়া কহিলেন, "বেশ তাই হবে। তবে সেটা আপনার পক্ষে বড় সুবিধে হবে না ডক্টর রায়। আমি জানি, কেন আপনি রমাকান্ত বাবুর মেয়েকে এখন বিয়ে কত্তে চান না!"

"জানেন? কি জানেন আপনি?"

"সার ডি আর ঘোষের বাড়ীতে খুব যাওয়া আসা ক'রে থাকেন?"

ডাক্তার রায়ের মুখ একটু যেন শুকাইয়া আসিল। তবু যথেষ্ট দৃপ্তভাবেই উত্তর করিলেন।

"থাকি। তিনি বন্ধু, তাঁর বাড়ীতে যাওয়া আসা করি, সে কথা ব'ল্‌বার আপনি কে?"

"তাঁর খুব সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা একটি মেয়ে আছেন।"

"সাবধান মিষ্টার বোস্। ভদ্রমহিলার নাম অমন অবজ্ঞায় মুখে আন্‌বেন না।"

"ভদ্রমহিলার অবজ্ঞা হিন্দুসন্তান আমরা ক'ত্তে পারি না। যাহ'ক, সেই মিস্ ঘোষকে ত আপনি বিবাহ ক'ত্তে চান?"

"যদি চাই-ই এমন, কি দোষ তাতে হ'য়েছে? আমি এখনও অবিবাহিত, bigamyর নালিশ চল্‌বে না।"

"তা চলবে না।—তবে এই সব কথা সার ডি আর ঘোষ জানতে পারে—"

ডাক্তার রায়ের বিশুষ্ক বিবর্ণ মুখখানি নত হইয়া পড়িল, কিন্তু তখনই আবার মুখ তুলিয়া কহিলেন "বেশ ইচ্ছা হয়, তাঁকে সব জানান। আর তিনি যে জানেন না, তাই বা কি ক'রে জান্‌লেন?"

"জান্‌লে -আপনার সঙ্গে কন্যার বিবাহ তিনি দিতে পারেন না।"

"তার চেয়েও বড় অনেকে দিতে প্রস্তুত। আমি পছন্দ ক'রে নিলে যে কেউ আমার হাতে মেয়ে দিয়ে কৃতার্থ হবে।"

"হ'তে পারে। তবে মিস্ ঘোষ নিজেও কি কৃতার্থ হবেন?"

রায় ভ্রূকুটি করিলেন। বিনোদবাবু কহিলেন, "দেখুন, আপনি যে ব্যবহার ক'চ্ছেন, বাধ্য হ'য়ে আমাদের আদালতে যেতে হবে। -কিছুই তাহ'লে গোপন থাক্‌বে না। যে সুনাম আপনি অর্জ্জন ক'রেছেন, যে পদমর্য্যাদার অধিকারী হ'য়েছেন, তা আপনি রাখ্‌তে পারবেন কিনা আর সম্ভ্রান্ত ঘরের কোন শিক্ষিতা কন্যা বিবাহ করার সম্ভাবনা আপনার থাক্‌বে কিনা, সেটা ভেবে দেখ্‌তে পারেন। আচ্ছা, তবে এখন আসি।"

বিনোদবাবু দরজা পর্য্যন্ত আসিলেন।

"মিষ্টার বোস্।"

"বলুন।"

"বসুন একটু।"

বিনোদ বাবু ধীরে ধীরে আসিয়া আবার বসিলেন।

রায় কহিলেন, "কেউ আর এখানে নেই, মন খুলেই কথা ব'লতে পারি। এতে আপনাদের কি লাভ হবে?"

"লাভ বিশেষ কিছু না হ'ক, আপনার দুর্ব্ব্যবহারের প্রতিশোধ একটা নেওয়া হবে। সেটাও কম কথা নয়। আশাভঙ্গ, অপমান—এর প্রতিশোধ সবাই নিতে চায়।"

"অনিচ্ছায় বাধ্য ক'রে যদি রমাকান্ত বাবু আমার সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দেন,—মেয়ে কি তাতে সুখী হবে মনে করেন?"

"আমি কি মনে করি, তা নিয়ে কোনও কথা হচ্ছে না। রমাকান্ত বাবু চান, তাঁর মেয়েকে আপনি বিবাহ করেন। মেয়ে তিনি জলে ফেলে দেন কি আগুনে ফেলে দেন, সেটা আমার দেখবার কথা নয়। তাঁর এটর্ণী

আমি, তাঁর কথাই আমি আপনাকে জানাচ্ছি তাঁর মেয়ে যদি কথা মত আপনি বিবাহ করেন, এক লাখ টাকা অতিরিক্ত যৌতুক আপনাকে দেবেন। আর যদি বিবাহ না করেন, চুক্তি ভাঙ্গেন,—এর প্রতিশোধ তিনি নেবেন"

"প্রতিশোধ! —হুঁ আচ্ছা—" রায়ের মুখখানি আঁধার ও ভ্রূকুটিকুটিল হইয়া উঠিল।

"এখনই কোনও জবাব আমি চাইনে, আপনি একটু ভেবে দেখ্‌তে পারেন। কাল বরং আপনার শেষ কথা আমাকে জানাবেন।"

"আচ্ছা, তাই হবে। কাল আমার শেষ উত্তর পাবেন।"

"ওসব রেখে দেও বিনোদ। আসলে কি বুঝ্‌লে? রাজি হবে কি?"

"হতে পারে—হলে হবে লোভে আর ভয়ে—"

"তা হ'ক। হ'লেই হ'ল, তা হ'লে হবে বল।"

"খুব সম্ভব! তবে বন্ধুভাবে তোমাকে বল্‌ছি রমু, মেয়ের ভাল যদি চাও, ওকে ছেড়ে দেও। ৭।৮ হাজার টাকা খরচ হ'য়েছে, তা চোবে জোচ্চোরেও অমন ঢের ঠকিয়ে নেয়। এর উপর আবার এক লাখ টাকা জলে ফেলো না।—তা তোমার আছে, ফেল্‌তে পার, সেটা এমন বেশী কিছু নয়।—কিন্তু মেয়েটা—"

"কিছুনা—কিছুনা! ওসব কিছু ভেবো না বিনোদ। ছেলেমানুষ—এখন দুষ্টুমী একটু যাই করুক—"

"সোজা ছেলেমানুষী দুষ্টুমী নয় রমু। এ একেবারে হৃদয়হীন পশু!"

"পাগল! পাগল! তাও কি হয় কখনও? অমন খাসা চেহারা—"

"শয়তানও চেহারায় শুনেছি সুপুরুষ—"

"আরে না না! কি বলে! শয়তান? শয়তান কেন হবে?—খাসা ছেলে! মেসে গিয়ে যখন দেখ্‌লাম,—আহা! যেন ঘর উজ্জ্বল ক'রে ব'সে আছে। চেয়ে চোক আর ফেরাতে পারিনে। শুনলাম লেখাপড়ায় অমন ছুটি ছেলে আর হয় না। তখনই পণ করেছিলাম, যা টাকা লাগে, বিনোকে ওর হাতেই দেব। এখন কি ছাড়্‌তে পারি? আরও এখন বিলেত থেকে এসেছে—একেবারে মণিকাঞ্চন যোগ হ'য়েছে।"

বিনোদবাবু উত্তর করিলেন, "রমু, ব্যবসা কর আর যতই টাকা কর, মানবচরিত্রের অভিজ্ঞতা তোমার বড় কম। সেটা এই কল্‌কাতার এটর্ণি আমরা অনেক বেশী বুঝি। মিষ্টি চেহারায় কত যে অতি জঘন্য পশুত্ব ঢাকা আছে জান কিছু? আর অনেকেরই, সেটা বড় পাতলা আবরণ, কেবল একটু রঙ দেওয়া মাত্র, একটা আঁচড় দিলেই অতি কাল কুৎসিৎ ভিতরটা বেরিয়ে পড়ে। আর প্রতিভার কথা বল্‌ছ? হায়! প্রতিভাবান যদি পাষণ্ড হয়, সে যে কতবড় পাষণ্ড হ'তে পারে সে আর তোমাকে কি বল্‌ব? বাস্তব শয়তান যদি এ পৃথিবীতে থাকে, সে এই রকম সব প্রতিভাবান্ পাষণ্ডেরই মূর্ত্তি ধরে আছে।"

"না না বিনোদ, দোহাই তোমার! মনটা আমার ভেঙ্গে দিও না। কোনও মতে যদি রাজি হয়, বিয়ে আমি না দিয়ে পারব না। সুখ দুঃখ—ওসব মেয়ের কপাল।"

"তা যদি বল, তবে নাচার!—তাহলে হাত পা গুটিয়ে চুপ করেই বসে থাক্‌তে হয়। কিছুর জন্যেই কিছু করাটা একেবারে বাজে খাটুনী।"

"আর কি জান বিনোদ, যেমনই হ'ক, বিলেত-ফেরতা ছেলে—সম্ভ্রান্ত সমাজে ওর একটা বড় স্থান এখন হ'য়েছে। বিবাহিত স্ত্রীকে ওরা আদর যত্ন না করেই পারে না।"

"ভিতরের কথা ওদের কিছুই জান না তুমি। বাইরে একটা ঠাট বজায় রেখে চলে—এই পর্য্যন্ত। খারাপ যারা, ঘরে যে তারা কত খারাপ, সাধারণ হিন্দুপরিবারের কেউ তা কল্পনাও ক'র্ত্তে পারে না।"

"আচ্ছা, কাল ত জবাব একটা দেবে ব'লেছে। দেখাই যাক্‌না কি জবাব দেয়। যদি না বলে, বেশ, আর কোনই চেষ্টা তবে ক'র্‌ব না।"

"আর হাঁ যদি বলে?" "তখন তখন—আচ্ছা—দেখাই যাক্ কি বলে—"

বিনোদবাবু কহিলেন, "শোন রমু, যদি না বলে, বুঝব কিছু মনুষ্যত্ব এখনও ওর মধ্যে আছে,—অন্ততঃ ভয়ে দমেনা, লোভেও ভোলে না।—আর হাঁ যদি বলে—"

"তবে ?"

"সেই হাঁ'তে যদি তুমি ভোল, মেয়ের কপালে তোমার বিস্তর দুঃখ আছে।"

"তুমিও বড় বাড়াবাড়ির দিকে যাচ্ছ বিনোদ। দোষগুণ সবারই আছে। আসলে হ'য়েছে কি জান? ওই তোমাদের আর ডি ঘোষের মেয়েটা দেখ্‌তে ভাল, ধাড়ী হ'য়েছে,ইংরেজি টিংরিজি প'ড়েছে, বিবিয়ানা ঢং জানে--খাসা মাছটা ওকে দেখে ফাঁক বুঝে টোপ ফেলেছিল। ও গিলেছে—গলায় গেছে এখন বড়সী বিঁধে—

"সার আর ডি ঘোষের পরিবারকে বেশ জানি, এই রকম টোপ ফেলে মাছ ধরবার লোক তাঁরা নন,—"

"কেন তারাও ত বিলেতফেরত। ওদের নাকি ঘরে ঘরে সবারই গলদ -"

"এমন কথা আমি বলিনি রম্। ঢের মহাপ্রাণ সাধু লোকও তাঁ'দের মধ্যে আছেন।"

"তবে যত অসাধু হ'ল ওই বেচারী নবেন ?"

বিনোদবাবু ভ্রূকুটি করিলেন।—কহিলেন, "তোমার সঙ্গে যুক্তি তর্ক কিছু নিয়ে করা মিথ্যে।—তা বেশ, তোমার পাঁটা তুমি ল্যাজে কাট্‌বে, আমার কি? বন্ধু বলে মনে করি, আমার যা বলা উচিত ব'ল্‌লাম। এখন কি ক'র্‌বে না ক'রবে—সেটা তুমি গে দেখ।"

এই বলিয়া বিনোদবাবু উঠিলেন 'এই দেখ। আরে, ব'স, ব'স। একেবারে রেগেই গেলে যে। আচ্ছা দেখ না, কাল কি জবাব দেয়, - তারপর যা হয় বুঝে শুনে একটা করা যাবে। কি বল ?"

"বেশ, তাই ক'রো।—তবে আমার যা ব'লবার তা বলেছি। এখন বোঝা শোনা তোমার।—আমায় যা ব'ল্‌বে—তাই ক'র্‌ব। আসি তবে ভাই,—অনেক রাত হ'য়ে গেল।"

"আচ্ছা, এস তবে। হাঁ, চিঠিটা এলেই আমাকে খবর দিও। মনটা –কিজান—"

"আচ্ছা, এলেই চিঠি তোমার আফিসে পাঠিয়ে দেব"

পরদিন ডাক্তার রায়ের পত্র আসিল,—চুক্তিমত তিনি রমাকান্তবাবুর কন্যাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত। জোর করিয়া আর কোনও দাবী তিনি কিছুই করিতে চান না,—তবে ভরসা করেন রমাকান্ত বাবুও তাঁহার শেষের সব প্রতিশ্রুতিও পালন করিবেন। বিবাহ যত শীঘ্র সম্ভব হইয়া গেলেই তিনি সুখী হইবেন।

বিনোদবাবু এই পত্র পাঠাইয়া দিলেন। রমাকান্তবাবুও আর কোনও দ্বিধা বা বিনোদবাবুর পরামর্শের অপেক্ষাও কিছু করিলেন না। সপ্তাহ পরে একটি বৈবাহিক যোগ ছিল, দিন স্থির করিয়া মহাসমারোহে বিবাহের আয়োজন আরম্ভ করিলেন।

(৪)

পত্র পুষ্প পতাকায় শোভিত প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা-সম্মুখস্থ বৃহৎ প্রাঙ্গনে সুসজ্জিত অভ্যর্থনামণ্ডপ, বিচিত্র তাড়িতালোকসজ্জায় মায়াপুরীর ন্যায় ঝলমল করিতেছে। স্থানে স্থানে সুসজ্জিত মঞ্চের উপরে বিচিত্র সঙ্গীত থাকিয়া থাকিয়া চারিদিক তার মধুর গম্ভীর সুর-ঝঙ্কারে পরিপূর্ণ করিয়া শ্রোতৃবর্গের দেহে দেহে মোহন নৃত্যের হিল্লোল তুলিয়া বাজিয়া উঠিতেছে। মধ্যে মধ্যে অন্তঃপুরিকাগণের শঙ্খ ও হুলুধ্বনিতে প্রাণানন্দকর মঙ্গলঘোষ আকাশ ভরিয়া উঠিতেছে। নিমন্ত্রিত সহস্রাধিক লোকের সমাগমে, কলরবে, ভোজ-সমারোহে, আলোকোদ্ভাসিত বৃহৎ বিবাহগৃহ, অভ্যর্থনামণ্ডপ, সম্মুখস্থ রাজপথ সব যেন জমজম গমগম করিতেছে। ৯টায় বিবাহের লগ্ন, দুই মিনিট পূর্ব্বে একখানি মোটরে চড়িয়া সাধারণ ভদ্রলোকের বেশে একা বর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে বরকর্ত্তা নাই, বরযাত্রী নাই, পুরোহিত নাই, নাপিত নাই, কেহই নাই। রমাকান্ত বাবু যারপর নাই অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। আত্মীয় কুটুম্ব সকলে বিস্ময়ে অবাক্!

একটু পরেই থতমত খাইয়া রমাকান্ত বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার—আর লোকজন—"

রায় উত্তর করিলেন "লোকজন আমার আর কেউ নেই।"

"দেশে থেকে—"

"কে আসবে? এক দাদা, তিনি আসেন নি। কেন, তাতে কি আট্‌কাবে কিছু?—"

একটি ভদ্রলোক—রমাকান্ত বাবুর আত্মীয় - উত্তর করিলেন, "পিতা নাই, আপনি নিজেই কর্ত্তা, আটকাবে না কিছু, তবে—"

'তবে আর কি ? সময় বোধ হয় হ'য়েছে। বিয়ে হ'ক্।"

"পুরোহিত—নাপিত—"

"সে সব আমি কোথায় এখানে পাব ? আপনারা যা দরকার ব্যবস্থা ক'রে নেবেন।"

আর বাদানুবাদ নিষ্প্রয়োজন। রমাকান্ত বাবু ভাঙ্গা মনে নিঃশব্দে বরকে বিবাহ মণ্ডপে লইয়া আসিলেন!—যথারীতি না হউক, যথাসম্ভব অনুষ্ঠানে কন্যা সম্প্রদান হইয়া গেল।

পরদিন বরকন্যা বিদায় হইবার কথা। কিন্তু কোথায় তারা বিদায় হইবে? আহারাদির পর বর কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যা হইয়া গেল,—এখনও ফেরে না।—দুশ্চিন্তায় রমাকান্তবাবু ছটফট করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই পিয়নবহিতে নাম সহি করাইয়া এক পিয়ন একখানা চিঠি রমাকান্ত বাবুকে দিয়া গেল। রমাকান্তবাবু তাড়াতাড়ি চিঠি খুলিয়া ফেলিলেন,—চিঠি খানি তাঁহার নব জামাতার। এইরূপ লেখা ছিল,—

"মহাশয়,

চুক্তি হইতে আমি মুক্তি চাহিয়াছিলাম,—ক্ষতিপূরণ দিতেও প্রস্তুত ছিলাম।—কিন্তু আপনার এটর্ণি কাছে জানিলাম, চুক্তির সর্ত্তে আমাকে বাধ্যই রাখিতে চান। তাহা পালন না করিলে শুনিলাম, আপনি আদালতের সাহায্য গ্রহণ করিবেন এবং লোকসমাজে আমাকে অপদস্থ করিবেন। ভাল, আপনার ইচ্ছা মত সে সর্ত্ত আমি পালন করিয়াছি, যথারীতি আপনার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছি। বিবাহ করিব এই মাত্র চুক্তি ছিল, পত্নীরূপে আপনার কন্যাকে ভালবাসিব, এবং ভাল বাসিয়া তাঁহার সঙ্গে একত্রে বাস করিব, এরূপ কোনও চুক্তি বোধ-হয় আমার সঙ্গে আপনার হয় নাই। বস্তুতঃ ইহা চুক্তির বিষয়ও হইতে পারে না ? যাহা হউক, বিবাহিত পত্নীকে প্রতিপালনের দায়িত্ব আমি অস্বীকার করিতেছি না। তাঁহার ভরণপোষণের জন্য জীবৎকাল মাসিক পঞ্চাশ টাকা করিয়া আমি দিব। শুনিয়াছি ইহাতেই বাঙ্গালী ভদ্রমহিলার সচ্ছন্দে চলিতে পারে। আর যদি ইহা আপনারা কম মনে করেন, আদালতে তাঁহাকে আবেদন করিতে বলিবেন! আদালত যাহা আমার দেয় বলিয়া রায় দেন,—তাহাই আমি দিতে বাধ্য থাকিব।

নিঃ

শ্রীনরেন্দ্র কুমার রায়।"

[ক্রমশঃ]

শিশু

[১]

কোথা হ'তে এলে শিশু এমন সুন্দর,
পীযুষপূরিত দেহ অতি মনোহর,
মুখের অমিয় হাসি, (যেন) ঊষার সৌন্দর্য্য রাশি,
চোকের চাহনিটুকু মনোমুগ্ধকর,
কোথা হ'তে এলে শিশু এমন সুন্দর।

[২]

কোথা ছিলে ? যেথানেতে দেবতার বাস !
যেথানে নন্দনে ফোটে পারিজাত রাশ।
যেথানেতে শুধু সুখ, সকলেরি হাসি মুখ,
যাহারা জানেনি কভু দুখের আভাস,
কোথা ছিলে ? যেথানেতে দেবতার বাস ?

[৩]

তাই বুঝি শিশু তুমি সুন্দর এমন,
চাঁদের জোছনা মত উজল বরণ,
মন্দাকিনী কুলুতান, বুঝি ও কণ্ঠের গান,
সদা হাসিমাখা মুখ দেবতা মতন,
তাই বুঝি শিশু তুমি সুন্দর এমন।

[৪]

জিজ্ঞাসি তোমারে ওগো ! ত্রিদিবের ফুল,
এলে যে ধরায় তুমি ! করো নিতে ভুল !
কঠিন ধরণী হেরে চলিয়া যাবে না ফিরে
দুঃখেতে মায়ের বুক করিয়া আকুল,
জিজ্ঞাসি তোমারে ওগো ! ত্রিদিবের ফুল।

[৫]

তুমি শিশু মা'র অতি সোহাগের ধন,
মাতার সর্ব্বস্ব তুমি হৃদয় রতন।
তোমারি সুখের তরে, জননী ভাবিয়া মরে,
তোমার বিপদ হ'লে সজল নয়ন,
তুমি শিশু মার অতি সোহাগের ধন।

[৬]

আসিয়াছ ধরাধামে, করি আশীর্ব্বাদ,
থাকিও মায়ের বুকে, পুরাইও সাধ,
কুটিলতা কঠোরতা সংসারের আবিলতা
স্পর্শেনা তোমাকে যেন কোন অপবাদ,
আসিয়াছ ধরাধামে করি আশীর্ব্বাদ।

শ্রীসুবর্ণলতা দাশ গুপ্তা

সংগ্রহ বৈচিত্র

ষোলবছরে কোটিপতি

মিঃ লিওনার্ড জে মার্টিন বালক-বয়সে বিদ্যালয় ছাড়িয়া পয়সা রোজগারে মন দেন। কেরাণীগিরি হইতে সুরু করিয়া নানান কাজে তিনি ঢুকেন। কিন্তু কোন টাতেই তাঁহার মন টিকে নাই। শেষটা ইঞ্জিনিয়ারি কাজ তাঁহার পছন্দ হইল। এই কাজে থাকিতে থাকিতে, উনিশ বৎসর বয়সের সময়েই তিনি তিন হাজার টাকা জমাইয়া ফেলেন। সেই টাকা মূলধন করিয়া, লণ্ডন সহরে আসিয়া তিনি একটি খুব ছোট কারখানা স্থাপন করেন। এই কারখানায় নানারকম ছোটখাট কল-কব্জা তৈরি করা হইত। এখানে তিনি প্রাণপণ পরিশ্রমে কারখানার সব-রকম কাজই নিজের হাতে করিতেন। সাত আট বৎসর হাড়ভাঙা খাটুনির পর, ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মূলধনের ত্রিশশত টাকা ত্রিশ হাজারে গিয়া দাঁড়াইল। ঠিক সেই সময়ে বিলাতে "মোটরবাস" নামক গাড়ী চলিবার ধূম পড়িয়া যায়। তীক্ষ্ণবুদ্ধি মার্টিন, বন্ধুদের নিষেধ না মানিয়া, আপনার সঞ্চিত মূলধনে চল্লিশটি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সমস্ত গাড়ীই কিনিয়া লইলেন। তার ফলে তিনি আশ্চর্য্যরূপে লাভবান হইলেন। এই কাজে সফল হইয়া তিনি Associated Manufacturer's company নামে এক নূতন ব্যবসায়ের পত্তন করিলেন। গত যুদ্ধের সময়ে তিনি কৃষি-সংক্রান্ত যন্ত্রাদি বিক্রয়েও প্রবৃত্ত হইয়া প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করেন। এম্‌নি নানান কাজে হাত দিয়া আজ তিনি এতদূর ধনবান হইয়া উঠিয়াছেন যে, সম্প্রতি তিনি বিলাতের রাজসরকার হইতে ছয় কোটি টাকা দাম দিয়া চার কোটি ত্রিশ লক্ষ গজ পট্টবস্ত্র কিনিয়া লইয়াছেন। এই কাপড় বেচিয়াও তাঁহার বড় কম লাভ হইবে না। মিঃ লিওনার্ড মার্টিনের বয়স এখন সাঁইত্রিশ বৎসর মাত্র। এই সামান্য বয়সেই, ঠিক ষোল বৎসরের মধ্যেই, তিনি স্বোপার্জ্জিত তিন হাজার টাকাকে আজ কোটী কোটী টাকায় পরিণত করিয়া পৃথিবী-বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছেন।

টোট্‌কা

একটিমাত্র লেবু হইতে প্রায় দুটি লেবুর রস চান? নিংড়াইবার আগে লেবুটিকে যদি সামান্য তপ্ত করিয়া লন, তবে রসের মাত্রা বিলক্ষণ বাড়িয়া যাইবে।

নরওয়ে ও সিংহলদ্বীপে "বির্কন" নামে যে জিনিষটি পাওয়া যায়, তাহাকে হীরার বদলে ব্যবহার করার প্রস্তাব হইয়াছে।

গত শরৎকালে বন্ধ হইবার আগে পার্লামেন্টের যে উশবেশন হইয়াছিল, তাহাতে মিঃ বোনার-ল'কে সর্ব্বশুদ্ধ এক হাজার একশো একান্নটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হইয়াছিল।

সমুদ্রগামী জহাজ তটপ্রদেশ হইতে ত্রিশ মাইলের বেশী দূরে গেলে, তাহার উপরে আর শিশির পড়েনা।

৫২১ খৃষ্টাব্দে বিলাতে সর্ব্বপ্রথম বড়দিনের উৎসব হয়। তাহার আগে বড়দিনের দিনটি সয়তানের নামে উৎসর্গ করা ছিল।

ফ্রান্সে একটি চলিত কু-সংস্কার আছে যে, বড়দিনের দিন অবগাহন স্নান করিলে, পরের বৎসরে আর জ্বর ও দাঁতের গোড়ায় ব্যথা হইবে না।

মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে জিহ্বার অনুভূতি সব-চেয়ে বেশী তীক্ষ্ণ।

ঘরকন্নার কথা

১। কালির দোয়াতের ভিতর একটা পুরাতন নিব ফেলিয়া রাখিলে তাহা কালির অ্যাসিড শুষিয়া লইবে এবং নিত্য-ব্যবহার্য্য নূতন নিবগুলি বেশী ট্যাকসই হইবে।

২। হাঁটাহাঁটিতে সকালের চেয়ে দুপুরে অল্প একটু পায়ের আকার বাড়িয়া যায়; এজন্য সকাল বেলায় নূতন জুতা কেনা উচিত নয়।

৩। একটি সুতায় টার্পিন তেল মাখাইয়া সেটি কোন ভাঙ্গা বোতল বা গেলাসের যে জায়গায় কাটা দরকার সেই জায়গায় চারিপাশে বাঁধিয়া দিয়া বোতল বা গেলাসটীর ভিতরে সুতার রেখা পর্য্যন্ত জল পূর্ণ করিয়া তারপর সূতার অগ্নিসংযোগ করিলে জিনিষটা সোজাভাবে কাটিয়া যাইবে। (হিন্দুস্থান)।

হিন্দুর সমাজশরীর।

(Hindu Society as a Social Organism.)

(২)

ব্যষ্টি ও সমষ্টি মানব—ব্যষ্টি মানবের স্বাধীনতা।

ব্যষ্টি মানবের স্বাধীনতার বা Individual libertyর ব্যাপ্তি জীবনের কোন ক্ষেত্রে কতদূর পর্য্যন্ত হওয়া ন্যায় সঙ্গত, অথবা কোন ক্ষেত্রে কতদূর পর্য্যন্ত এই স্বাধীনতায় কোনও বাধা ব্যষ্টির অধিকারে অন্যায় বা অসঙ্গত বাধা হয় না, গত সপ্তাহের অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধের শেষ ভাগে এই কথাটির উল্লেখ করিয়াছিলাম।

ব্যষ্টির স্বাধীনতার বাধা যাহা কিছু আসিতে পারে, আসিবে অবশ্য সমষ্টির দিক হইতে, উদ্দেশ্য সমষ্টির মঙ্গল।

এখন এই সমষ্টি বলিতে কি বুঝিব? কোনও দেশেই মানব পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একা একা যার যেমন খুসী থাকে না, মিলিয়া মিশিয়া একদল বা সমাজ হইয়া বাস করে। সন্ন্যাসী যে সংসার ও জন-সমাজ ছাড়িয়া বিজনে গিয়া তপস্যা করেন, তাও দশজন সন্ন্যাসী যদি একই বিজনে তপস্যা করিতে যান, তাঁহাদেরও সেখানে একটা দল হইয়া উঠে। দলের কতকগুলি নিয়মও তাঁহারা বাঁধিয়া নেন,—পরস্পরের সম্বন্ধে সকলে সেই নিয়ম মানিয়া চলেন। যিনি তাহা মানিতে ইচ্ছা করেন না, তিনি সেই স্থান ত্যাগ করিয়া আরও দূর, বিজনতর অঞ্চলে চলিয়া যান। কারণ দশজনের সঙ্গে মিলিয়া থাকিতে হইলে, এ সব নিয়ম না মানিয়া কেহ পারে না। সন্ন্যাসীরাই যখন দল বাঁধেন, সংসারী মানবের ত কথাই নাই। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক তারা এক দেশে এক অঞ্চলে বাস করে। সাংসারিক বহু রকম সম্বন্ধ পরস্পরের সঙ্গে আসিয়া পড়ে, পরস্পরের সহায়তা বহু কর্ম্মে সকলে গ্রহণ করে, এমন কতকগুলি সমান স্বার্থ সকলের আসিয়া জোটে, যাহা কাহারও নহিলে চলে না, অথচ একা কেহই করিতে পারে না, সকলে মিলিয়া করিতে হয়। সকলের ছেলেপিলেরা লেখা-পড়া শিখিবে, সকলে মিলিয়া পাঠশালা করিতে হয়। সকলেই পথে চলিবে, ঘাটে জল খাইবে, পথ ঘাট সকলে মিলিয়া করিয়া নেওয়া দরকার। কেহ কাহাকেও পীড়ন না করে, অবিরত কলহে ও মারামারি কাটাকাটিতে কাজ-কর্ম্মের ব্যাঘাত না হয়, শত্রুপক্ষ কেহ আসিয়া সব লুঠিয়া পাঠিয়া না নিয়া যায়, তাই দণ্ডনীতির ব্যবস্থাও তাহাদের করিতে হয়। এই সব ব্যবস্থা করিয়া বহু লোক যে একত্র হইয়া এক দেশে সুখে সচ্ছন্দে থাকে, তাহাই হইল মানবের সমষ্টি। এখন সমষ্টির ধরণটা বা মূল প্রকৃতি কি?

এই যে বহু মানবের এক দেশে একটা দল, ইহা প্রত্যেক ব্যক্তিমানবের সুবিধার জন্য একটা কৃত্রিম সংহতি বা artificial association মাত্র, না প্রত্যেক সমষ্টিরই ব্যষ্টি হইতে বিশিষ্ট একটা স্বাভাবিক অস্তিত্ব আছে, যাহা শরীরী জীবের ধর্ম্মের অধীন, অর্থাৎ এই সমষ্টি বা সমাজও একটা Organism কি না।

সমষ্টি বা সমাজ যদি Organism হয়, তবে তার জীবনের একটা বিশিষ্ট ধর্ম্মও আছে, এবং ব্যষ্টির জীবনের ধর্ম্ম অপেক্ষা তাহা গরীয়ান্। ব্যষ্টি এক, সমাজ এই এক এক বহু ব্যষ্টিকে লইয়া। ব্যষ্টি এই আসে এই যায়, সমাজে তার জীবনের লীলা অল্পেই শেষ হয়। কিন্তু সমাজ কেবল বর্ত্তমান ব্যষ্টিসমূহ লইয়া নয়, সুদূর অতীত হইতে পুরুষ পরম্পরায় বহু ব্যষ্টির জীবন ব্যাপিয়া তার জীবন চলিয়াছে,—ভবিষ্যতে বহু পুরুষ-পরম্পরার জীবন ব্যাপিয়াও চলিবে। সুতরাং ব্যষ্টির ধর্ম্মকে সমষ্টির বা সমাজের ধর্ম্ম মানিয়া চলিতে হইবে। অথচ ব্যষ্টি তার নিজের বিশিষ্টতাও একেবারে হারাইয়া সমষ্টির ধর্ম্মের এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রে মাত্র পরিণত হইতেও পারে না।

বেঞ্জামিন কীড তাঁহার Social Evolution গ্রন্থে এই কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"Oth:r things being equal, the m:st vigarous Social Systems are those in which

are combined the most effective subordination individual to the interests of the Social Organism with the highest development of his own personality."

অর্থাৎ—'অন্যান্য অবস্থা যেখানে সমান আছে,সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী সমাজ তাহাই যেখানে Social Organism বা সমাজ শরীরের স্বার্থ বা মঙ্গলের অধীন হইয়া ব্যষ্টিমানবের স্বার্থ বা মঙ্গল সাধনার চেষ্টা চলিতেছে, অথচ তার ব্যক্তিত্বের মহিমার বিকাশও যতদূর হইতে পারে, তার অবসরও আছে।'

আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যাহারা সমাজতত্ত্বের আলোচনা করিতেছেন, অর্থাৎ সমাজ সম্বন্ধে স্বাভাবিক অভিব্যক্তি বা evolution বাদের অনুবর্ত্তক যাঁহারা, বেঞ্জামিন কীড তাঁহাদেরই অন্যতম। ইঁহারা সমাজকে organism বা শরীরী জীবের ধর্ম্ম বিশিষ্ট বলিয়া মানেন।

উদ্ধৃত মন্তব্যে বেঞ্জামিন কীড যে কঠিন সমস্যার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তার সমাধান কি, কিসে এই দুই দিক বজায় থাকিতে পারে, পাশ্চাত্য সমাজে তার লক্ষণ কি দেখা যাইতেছে, ইত্যাদি সম্বন্ধে এই মতবাদী পণ্ডিতগণ অনেক কথাই বলিতেছেন। আজ এই প্রবন্ধে সে আলোচনার মধ্যে যাইব না। তবে আর একটি কথা এইখানে বলিয়া রাখিতে পারি এই যে, হিন্দুর সমাজধর্ম্মে এই সমস্যার সমাধান কিছু পাওয়া যায় কি না তাহা আমাদের বড় একটি অনুসন্ধান ও আলোচনার বিষয়, আর তুলনা করিয়াও আমাদের দেখিতে হইবে, হিন্দুর সমাজধর্ম্ম আর পাশ্চাত্য সমাজধর্ম্ম এই সমস্যার সমাধানে কোনটা কতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছে।

সমষ্টি বা সমাজ কোনও organism নয়, ব্যষ্টিমানবের সুবিধার জন্য তাহাদের একটা artificial association বা কৃত্রিম সংহতি মাত্র, এই মত যাহারা পোষণ করেন, ব্যষ্টির অধিকার সম্বন্ধে তাঁহারা কি বলেন, ঠিক সেই নীতি অনুসারে চলিলে, তাহার ফল অধিকাংশ ব্যষ্টিমানবের পক্ষে গিয়া কি দাঁড়ায় এবং এই কৃত্রিম-সংহতির কর্ম্মশক্তির অবস্থাই বা কিরূপ হয়, আজ এই প্রবন্ধে তার সম্বন্ধে যথাসাধ্য আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব। তবে অদ্যকার পাঠ্য অংশে তাহার শেষ হইবে না। এই মতের নীতি অনুসারে ব্যষ্টি মানবের কথাই বড় কথা, তার স্বাধীনতার ও অধিকার ভোগের দাবীর উপরে আর কোনও দাবী হইতে পারে না। সমষ্টির সংহতি মাত্র এই উদ্দেশ্যে যে, এক ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতার ভোগ, অপরের সমান স্বাধীনতার ভোগে বাধা উপস্থিত না করে, আর সকলের সমান স্বার্থ যে সব ব্যাপারে, তাহা সকলের সমান বা যার যার যথাসাধ্য চেষ্টায় রক্ষিত হইতে পারে। সুতরাং এই ধর্ম্ম সাধারণতঃ Individualism নামে পরিচিত, বাঙ্গলায় আমরা ইহাকে 'নিরপেক্ষ ব্যষ্টিপ্রাধান্য বা 'ব্যষ্টিস্বাতন্ত্র্য' নামে অভিহিত করিতে পারি। কারণ, ঠিক এই মত এ দেশে দেখা দেয় নাই, ইহার কোনও বিশেষ নামও এ দেশে নাই।

একবার মনে হইয়াছিল, এ সম্বন্ধে আদবে কিছু আলোচনারই আবশ্যকতা আছে কি না। কিন্তু বোধ হয় আছে।

ইয়োরোপে শতাব্দীর অধিককাল এই মত এমনই প্রাধান্য করিয়াছে যে, সমাজ একটা Organism, Organism রূপে তার একটা বিশিষ্ট ধর্ম্মও আছে, সেই ধর্ম্মের প্রকৃতি কি, লক্ষ্য কি, এই সব কথার অধুনা বহু প্রচার সত্ত্বেও এই Individualistic মতের প্রভাব ইয়োরোপীয় জীবনে এখনও বেশ দেখা যাইতেছে। Social Organism বা সমাজশরীরের ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাঁহারা এত সূক্ষ্ম আলোচনা করিতেছেন, তাঁহারাও যে সকলে একেবারে ইহার প্রভাব এড়াইতে পারিয়াছেন, তাও মনে হয় না। কেন, বা কিসে, যথাসময়ে যথাপ্রসঙ্গে তাহা বলিব। তারপর আমাদের দেশেও ইহার প্রভাব যথেষ্ট আসিয়া পড়িয়াছে। এই মত এ দেশে যাঁহারা প্রচার করিতেছেন, তাঁহারা আবার আধুনিক বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ কি বলিতেছেন, তার আলোচনাও বড় করেন না। Individualistic নীতির আদর্শই তাঁহাদের চিত্ত একেবারে মগ্ন করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই মোহবশতঃ সমাজের সকল নীতির-বন্ধন হইতে ব্যষ্টিমানবের সম্পূর্ণ মুক্তিই ইঁহারা কামনা করেন,—বলেন, তাহাতেই ভারতসন্তানের কল্যাণ হইবে। কারণ শাস্ত্র বা Scripture দ্বারা শাসিত যে ধর্ম্ম,

faith বা বিশ্বাস মাত্র যাহার আশ্রয়—free reason বা নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধি নয়, সেইরূপ ধর্ম্মমূলক নীতির বন্ধন হইতে মুক্তিতেই নাকি মানবের শ্রেষ্ঠ কল্যাণ সাধিত হইবে।

তাই এই মত এবং তার প্রতিষ্ঠা হইলে সাধারণ ব্যষ্টিমানবের জীবনের পরিণাম কি হইতে পারে, তাহাও আলোচনা করিয়া দেখাটা একেবারে নিরর্থক বলিতে পারি না।

এই মতের বড় একজন পাণ্ডা জর্ম্মাণ সুধী ব্যারণ উইল্‌হেল্ম ভন হামবোল্ড্ বলেন—

........"The end of man, or that which is prescribed by the eternal or immutable dictates of reason, and not suggested by vague and transient desires, is the highest and most harmonious development of his powers to a complete and consistent whole." that, therefore, the object "towards which every human being must ceaselessly direct his efforts, and on which especially those who design to influence their fellowmen must ever keep their eyes, is the individuality of power and development;" that for this there are two requisites, "freedom, and variety of situations;" and that from the union of these arise "individual vigour and manifold diversity," which combine themselves in "originality."

অর্থাৎ—"মানব জীবনের লক্ষ্য তার সমস্ত শক্তির উচ্চতম এবং যথাসম্ভব পরস্পর-সমঞ্জস বিকাশ, যাহাতে সব সমান ভাবে মিলিয়া একটা সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে। সাময়িক ও অস্পষ্ট বাসনার প্রেরণা ইহা নহে, Reason বা বিবেক-বুদ্ধির নিত্য ও ধ্রুববাণী। সুতরাং ব্যক্তিত্বের শক্তির ক্রম-পরিণতি কিসে হইতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই প্রত্যেক মানবের—বিশেষ ভাবে যাঁহারা অন্যান্য মানবের জীবন বিশেষ কোনও দিকে পরিচালনা করিতে চান, তাঁহাদের সকল কর্ম্মচেষ্টা প্রয়োগ করিতে হইবে। আর ইহার জন্য দুইটি বস্তুর প্রয়োজন স্বাধীনতা ও অবস্থার বৈচিত্র। নানারকম অবস্থার মধ্যে প্রত্যেকে যদি নিজের স্বাধীন বুদ্ধি অনুসারে চলিতে পারে, তবেই ব্যক্তিত্বের প্রকৃত শক্তি ও তার বৈচিত্র বিকাশ পাইবে। এবং তাহা হইতেই originality বা মৌলিকতা অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিতে যে কিরূপ ও কতখানি স্বকীয় শক্তি আছে, তাহা প্রকাশ পাইবে।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, মানব কি কেবল তবে আপনার উপরেই নির্ভর করিবে, পুরুষপরম্পরার সঞ্চিত জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানের দৃষ্টিতে যে সব নীতি অনুসৃত হইয়া আসিতেছে, তার দিকে একেবারেই চাহিবে না, তার অনুসরণ করিয়া একেবারেই চলিবে না?

জন ষ্টুয়ার্ট মিল্ ইহার উত্তরে বলেন,—

"On the otherhand, it would be absurd to pretend that People ought to live as if nothing whatever had been known in the world before they came into it; as if experience had as yet done nothing towards showing that one mode of existence, or of conduct, is preferable to another. Nobody denies that people should be so taught and trained in youth as to know and benefit by the ascertained results of human experience. But it is the privilege and proper condition of a human being, arrived at the maturity of his faculties, to use and interpret experience in his own way. It is for him to find out what part of recorded experience is properly applicable to his own circumstances and character."

অর্থাৎ—"কোনও একরূপ নীতি, অন্যরূপ নীতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিনা অতীতের জ্ঞান যে এ সম্বন্ধে কিছুই একটা পথ নির্দ্দেশ করে নাই, একথা বলা ঠিক নয়। প্রথম জীবনে প্রত্যেক লোককে শিখাইতে হইবে, মানবের অতীত জ্ঞান কোন্ বিষয়ে কি বুঝিয়াছে এবং জীবনের কোন সম্বন্ধে কোন নীতি অনুসারে চলিলে ভাল হয় তাহা নির্দ্দেশ

করিয়াছে। কিন্তু মানব তাহার শক্তিসমূহের পরিণতি লাভ করিলে, পুরুষপরম্পরাগত অতীতের জ্ঞানও সেই জ্ঞাননির্দ্দিষ্ট নীতি সমূহ নিজের নিরপেক্ষ বুদ্ধিতে বিচার করিয়া দেখিবে এবং নিজের জীবনের বিশেষ অবস্থায়, তার বিশেষ বিশেষ গুণ রুচি ও শক্তির পক্ষে যার যতটুকু গ্রহণ করা সে ভাল মনে করে তাই করিবে।"

কেন? জন ষ্টুয়ার্ট মিলের যুক্তি এ সম্বন্ধে এই,—

"The traditions and customs of other people are, to a certain extent, evidence of what their experience has taught them; presumptive evidence, and as such, have a claim to his deference: but, in the first place, their experience may be too narrow; or they may not have interpreted it rightly. Secondly, their interpretation of experience may be correct, but unsuitable to him. Customs are made for customary circumstances and customary characters; and his circumstances or his character may be uncustomary. Thirdly, though the customs be both good as customs, and suitable to him, yet to conform to custom, merely as custom, does not educate or develop in him any of the qualities which are the distinctive endowment of a human being. The human faculties of perception, judgment, discriminative feeling, mental activity and even moral preference, are exercised only in making a choice. He who does anything because it is the custom makes no choice. He gains no practice either in discerning or in desiring what is best for him."

অর্থাৎ—"পুরুষপরম্পরাগত যে সব মত ও রীতিনীতি সমস্ত লোকে অনুবর্ত্তন করিয়াছে, কতক পরিমাণে তাহাদেরই অভিজ্ঞতায় ভাল বুঝিয়াছে বলিয়াই করিয়াছে। সেগুলি বর্ত্তমানে যে কোনও ব্যক্তির পক্ষে শ্রদ্ধার পরীক্ষা করিয়া দেখিবার বস্তু সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাও হইতে পারে, যে সব অতি সঙ্কীর্ণ এবং তাহারা হয়ত তার তাৎপর্য্য ভুলও বুঝিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, তারা ভুল না বুঝিতেও পারে, কিন্তু তা হয়ত তাদের পক্ষে উপযোগী ছিল, বর্ত্তমান কোনও ব্যক্তির পক্ষে উপযোগী নয়। তৃতীয়তঃ সেগুলি ভাল এবং তার পক্ষে উপযোগীও হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া কেবল পুরুষ পরাম্পরাগত ও প্রচলিত রীতি বলিয়াই তাহা যদি লোকে মানিয়া নেয় এবং তদনুসারে চলে, তবে মানবোচিত যে সব গুণ ও শক্তির, যে বুদ্ধির অধিকারী হইয়া সে জন্মিয়াছে, তার যথোচিত বিকাশ হয় না। প্রত্যেক নীতি নিজের বুদ্ধিতে বিচার করিয়া বাছিয়া নিবে, এই অধিকার থাকিলেই তবে মানবের ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব বিকাশ হইতে পারে। প্রচলিত রীতি নীতি বলিয়াই তাহার অনুবর্ত্তন যে করে, সে বুঝিয়া বিচার করিয়া কিছুই নেয় না, এই শক্তির অনুশীলনও তাহা কিছুই হয় না।"

ব্যষ্টিমানবকে নিরপেক্ষভাবে প্রধান বলিয়া ধরিয়া নিলে, তার অধিকারের ও উন্নতির সম্ভাবনার কথা যতদূর খোলসা করিয়া বলা যাইতে পারে, তাহা উদ্ধৃত কয়েকটি উক্তিতেই বেশ বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আর কোনও প্রামাণিক বচন উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন।

কোনও সমষ্টি বা সমাজকে ইহারা **Organism** ভাবে দেখেন নাই, তাহার একটা বিশিষ্ট জীবন, সেই জীবনের একটা বিশিষ্ট ধর্ম্ম থাকিতে পারে, এ কথাও ইহারা ভাবেন নাই। তবে সমষ্টির একটা অস্তিত্ব ইহারা স্বীকার করেন, এবং পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাহা ইহাদের মতে আপনাদের সুবিধার জন্য একদেশবাসী বহুব্যক্তির একটা কৃত্রিম সংহতি বা **artificial a·sociation** মাত্র। প্রত্যেক ব্যষ্টির বহুস্বার্থ এই সংহতি হেতু রক্ষিত হইতেছে, সকলের সমান কতকগুলি মঙ্গলও এই সংহতির বলে সাধিত হইয়া থাকে। আবার একের স্বার্থসাধন চেষ্টা অন্যের স্বার্থসাধনচেষ্টায় যে সব অন্যায় বাধা উপস্থিত হয়, তাহারও নিবারণ ও প্রতিকার সংহতির বলেই হইতে পারে। সুতরাং এই সংহতির অস্তিত্ব এবং এই সব উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী শক্তি যাহাতে তাহার বজায় থাকে, তাহা নিতান্ত আবশ্যক। তাই প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনতা

এজন্য কিছু খর্ব্ব করিয়া রাখিতে হইবে। এইখানে ব্যক্তিতে সংহতিতে সংঘর্ষ একটা বাধিতে পারে, সুতরাং উভয় পক্ষেরই কর্তৃত্বের একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা থাকা আবশ্যক। সে সীমা কি হইবে? মিল বলেন,—

"To individuality should belong the part of life in which it is chiefly the individual that is interested; to Society the part which chiefly interests Society."

অর্থাৎ—"ব্যষ্টির স্বার্থ যেখানে প্রধান সেখানে ব্যষ্টিরই অধিকার প্রধান থাকিবে। আর যেখানে সমাজের স্বার্থ প্রধান সেখানে সমাজের অধিকার প্রধান থাকিবে।"

কথাটা শুনিতে বেশ ভাল এবং অতি যুক্তিযুক্ত বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু জীবনের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ব্যষ্টির স্বার্থই প্রধান, যাহার উপরে সমষ্টির কোনও অধিকার থাকিবে না, ইহা নির্দ্দেশ করাটা এমন সহজ নয়। পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা উল্লেখ করিয়াছি, প্রত্যেক ব্যক্তির civic এবং political duties & responsibilities বলিতে যাহা বুঝায় তাহাই মাত্র ইহাদের মতে সমষ্টির বা সমাজের ক্ষেত্র এবং তাই মাত্র সমাজের কর্তৃত্বাধীনে থাকিবে,—আর তার ethical duties যাহা তাহাতে ব্যষ্টির স্বার্থই প্রধান তাহা ব্যষ্টির ক্ষেত্র, সে সব বিষয়ে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার স্বাধীন বিচারবুদ্ধিতে চলিবে,—তার নিজের স্বার্থ, প্রবৃত্তি, বুদ্ধির হিসাবে যাহা ভাল মনে করে, তাহাই করিবে,—তার উপরে সমাজের কোনও কর্তৃত্ব চলিবে না।

কিন্তু সমষ্টির বা সমাজের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা যাহা, তাহাতেও ব্যষ্টিমানবের ethical আদর্শ ও কর্ত্তব্যের উপরে সেই সমাজের মঙ্গলামঙ্গল কিছু নির্ভর করে কি না একথা তাঁহারা তেমন করিয়া ভাবেন নাই। একেবারে যে করে না, অবশ্য ইঁহারা বলেন না। তবে তাঁহাদের কথা এই যে, এই সব ব্যাপারে সমাজের কর্তৃত্বে ব্যষ্টির অনিষ্ট অনেক বেশী হইবে। বিশেষতঃ ব্যষ্টির স্বাধীনতা-রূপ যে সনাতন অধিকার, তার উপরে সমাজের পক্ষ হইতে অন্যায় বাধা আসিয়া পড়িবে, ব্যষ্টির ব্যক্তিত্বের মহিমাকে খর্ব্ব করিবে। ব্যষ্টি মানব এ সব বিষয়ে অসঙ্গত আচরণ কিছু করিলে ক্ষতি যাহা হইবে তাহা নিজের, সমাজের অসুবিধা যেটুকু হইবে তাহা সামান্য, সমাজ তাহা সহিয়া নিতে পারে। কিন্তু সমাজের হাতে ইহার কর্ত্তৃত্ব থাকিলে ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে যে ক্ষতি হইবে, তাহা অনেক বড়।

মিল তাই বলেন,—

"But with regard to the merely contingent or as it may be called, constructive injury which a person causes to society, by conduct which neither violates any specific duty to the public nor occasions perceptible hurt to any assignable individual except himself, the inconvenience is one which society can afford to bear, for the sake of the greater good of human freedom."

ব্যষ্টি মানবের অধিকারের কথা আপাততঃ এই পর্য্যন্তই থাক্। এখন, ব্যষ্টিপ্রধান সমষ্টির যে সংহতিশক্তিটুকু ইহারা মানেন, সেই শক্তির কর্তৃত্ব কিভাবে কি যন্ত্রের সাহায্যে পরিচালিত হইবে? ইহার উত্তর হইতেছে, Democracy বা গণতন্ত্র।—ফরাসী বিপ্লবের প্রারম্ভে ফরাসীদেশে যে বাণী উঠিয়াছিল—Vox populi Vox Dei অর্থাৎ জন সাধারণের বাণীই ভগবদ্বাণী, ইহাতেই Democracyর মূলনীতির সত্য নিহিত রহিয়াছে।

সম্প্রতি এলাহাবাদ হইতে Democrat নামে একখানি পত্রিকা বাহির হইয়াছে। সেই পত্রিকার মুখবন্ধে Democratএর লক্ষ্য সম্বন্ধে এই কথাগুলি ঘোষিত হইয়াছে।

"We shall try to be true to our name we stand for democratic ideal in every walk and relation of life This ideal recognises no privilage arising from physical accidents as they are called either of birth or sex or economic or political accidents of wealth or rank. It demands that all human beings shall be given exactly the same social opportunities for the higher possible realisation of their inherent humanity and no man or woman shall be restrained in the freest exercise and enjoyment of their powers both

of mind and body as long as they do not, in pursuit of their own freedom, infringe the equal freedom of others to freely pursue their own personal or social ends. Democratic ideal demands in common concerns of social or political life, collective ideals wishes and interests of all shall prevail over individual ideas and wishes and particularistic or sectional interests, and voice of all shall direct the common business of State or Church."

Democrat এই মুখবন্ধে যে কথা বলিতেছেন, Democracy সম্বন্ধে তার অপেক্ষা বেশী কোনও কথা আর বলিবার নাই। আধুনিক পাশ্চাত্য সুধীবর্গ Democracyর দাবী যতদূর করেন, এ দাবী তাহাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। তাঁহারা ধর্ম্মনীতির অর্থাৎ Church ও Ethicsএর ক্ষেত্রে সংহতির কোনও দাবী করেন না, ব্যষ্টি মানবকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাখিতে চান। কিন্তু আমাদের এই democrat সে ক্ষেত্রেও democratic সংহতি শক্তির শাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে চান। তবে, একটু সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনে হইবে, কেবল রাষ্ট্র বা civic & political ক্ষেত্রে নয়, বৃত্তি ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে, ধর্ম্মনীতির ক্ষেত্রে, সর্ব্বত্রই মানবে মানবে সম্বন্ধ বড় ঘনিষ্ঠ, সর্ব্বত্রই সংহতির একটা আবশ্যক আছে। সংহতিশক্তি ন্যায়তঃ ও স্বভাবতঃ যদি democraticই হয়, তবে democracyর প্রভুত্ব সকল ক্ষেত্রে সকল সম্বন্ধেই মানিতে হইবে। যাহা হউক, democratএর এই উক্তি সম্বন্ধে বিশেষভাবে একটি কথা বলিবার আছে। সাধারণভাবে এই কথার আলোচনা এইরূপ অন্যান্য যে সব কথার উল্লেখ করিয়াছি তার সঙ্গেই হইবে। কিন্তু বিশেষ যে কথাটি বলিবার আছে, তাহা এই খানেই বিশেষভাবে বলিলে ভাল হয়।

কথাটা হইতেছে এই উক্তির বিশেষ প্রেরণা যাহা তার সম্বন্ধে। ভারতবাসী ইংরেজের রাষ্ট্রশাসনের অধীন। ইংরেজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত থাকিয়া ভারতের রাষ্ট্রশাসন যাহাতে ভারতবাসীর স্বায়ত্ত হয়, তার জন্য একটা আন্দোলন চলিতেছে। এবং তার পক্ষে যত রকম যুক্তি থাকিতে পারে, সবই দেশহিতৈষণার প্রেরণায় প্রবুদ্ধ জননায়কগণ অবলম্বন করিতেছেন। তবে একটি কথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না। তাহা এই যে, ইংরেজ জাতিরূপ বিশেষ এক মানবসমষ্টি ভারতীয় মানবসমষ্টিকে শাসন করিতেছেন। স্বায়ত্ত শাসনের দাবী এখানে ন্যায়তঃ আসিবে ভারতীয় জনসমষ্টির পক্ষ হইতে, ইংরেজ জনসমষ্টির নিকটে। তার বিচার হইবে, ইংরেজ জনসমষ্টির ভারতীয় জনসমষ্টিকে এরূপ শাসন করিবার ন্যায়তঃ কোনও অধিকার আছে কি না, তাহা লইয়া। কিন্তু ভারতীয় জনসমষ্টির আভ্যন্তরিক শাসন কিরূপ প্রকৃতির হইবে, সমাজ কি আকার ধারণ করিলে ভাল হয়, ধর্ম্মপদ্ধতিই বা কি ভারতবাসীর উপযোগী, এ সব একেবারে স্বতন্ত্র কথা। ইংরেজের সঙ্গে আমাদের রাষ্ট্রীয় শাসনের অধিকার লইয়া যে বোঝাপড়া হইতেছে, তার মধ্যে এ সব কথা আসিতে পারে না। এই ঘোষণা হইতে যাহা বুঝা যায়, তাহাতে মনে হয়, ইহার লক্ষ্য ভারতীয় সমাজ ও ধর্ম্মকে একেবারে ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়া। তাই যদি Democratএর উদ্দেশ্য হয়, তবে সে আলাদা কথা। তার আলোচনা প্রসঙ্গ ক্রমে যথা সময়ে হইবে। কিন্তু ভারতের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় অবস্থার উন্নতি সাধন যদি Democratএর অভিপ্রায় হয়, তবে তার মধ্যে ঠিক এই কথা আসিতে পারে না। এক একবার মনে হয়, Democrat যদি এই কথাটা ভাবিয়া দেখিতেন, তবে বুঝি এই ঘোষণা তাঁহার মুখে বাহির হইত না।

Individualism এক সঙ্গে Democracyর একটা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধই রহিয়াছে। আর দুই এরই মূল উৎস বা প্রধান আশ্রয় হইতেছে, মানুষের নিরপেক্ষ বিবেক বুদ্ধি বা Reason—কারণ, ইহার উপরে আর যাহা কিছু থাকিতে পারে, মানুষ তাহা বিশ্বাসে মাত্র মানিয়া নিতে পারে, বিচারের যুক্তিতে ঠিক বুঝিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। তাই এই সব মতের ভিত্তি স্বরূপ Rationalism কথাটাও ব্যবহৃত হয়।

এখন Individualism, Democracy এবং Rationalism, এই সব দিক হইতে মানবের অধিকার সম্বন্ধে যে সব কথা বলা হয়, তাহা কতদূর সত্য এবং ব্যষ্টিহিসাবেই বা মানবের মঙ্গল তাহাতে কতদূর সাধিত হইতে পারে বা এ পর্য্যন্ত হইয়াছে, তাহা আমাদের

আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে তার আগে ইয়োরোপে এই মতের উদ্ভব ও প্রচার কিরূপে, কেন হইল, তার একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করিয়া নিলে, বোধ হয় সুবিধা হইতে পারে।

প্রাচীন গ্রীক ও রোমক সভ্যতার প্রভাব বহু পরিমাণে বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় সভ্যতার উপরে আসিয়া পড়িলেও বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় জাতিসমূহের এবং তাহাদের সভ্যতার প্রারম্ভ খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে ধরা যাইতে পারে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে পশ্চিমে রোমসাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়, নবম শতাব্দীপর্য্যন্ত বড় একটা বিপ্লবের অবস্থা চলে, অনেক ভাঙ্গা গড়ার পর দশম শতাব্দী হইতে নূতন এক ধারায় ইয়োরোপীয় নূতন জাতিসমূহের জীবন যাত্রার সূচনা স্পষ্ট হইয়া উঠে। বিভিন্ন রাজ্যে এবং রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধে বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইলেও রুস ও পোল ব্যতীত সমস্ত ইয়োরোপীয় জাতিসমূহ এক ধর্ম্মশাসনের অধীনে, এক খৃষ্টীয় সমাজভুক্ত তখন হইয়াছিল। এই ধর্ম্ম শাসনের যন্ত্র ছিল রোমক চার্চ্চ বা ধর্ম্মমহামণ্ডল, খোদযন্ত্রী রোমের পোপ আর তাঁহার সহযোগী ছিলেন সকল দেশের প্রধান যাজকবৃন্দ। অত্যাশ্চর্য্য শক্তিশালী এক ধর্ম্মশাসন-পদ্ধতি রোমক চার্চ্চ ইয়োরোপীয় সমাজে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। দশম শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্য্যন্ত অজেয় অপ্রতিহত শক্তিতে এই চার্চ্চ বা ধর্ম্মমহামণ্ডল ইয়োরোপীয় খৃষ্টানসমাজের উপরে প্রভুত্ব করিত। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে প্রবল এক বিদ্রোহ ইহার বিরুদ্ধে দেখা দেয়, এবং খৃষ্টানসমাজের আধাআধি লোক রোমক চার্চ্চের প্রভুত্ব অস্বীকার করিয়া পৃথক পৃথক চার্চ্চ বা ধর্ম্ম-শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত করে। ইহারা সাধারণতঃ Protestant প্রটেষ্টাণ্ট নামে পরিচিত হয়। রোমক চার্চ্চের অধীন যাহারা তাহাঁদের নাম ছিল রোমান্ ক্যাথলিক বা কেবলই ক্যাথলিক। 'ক্যাথলিক' কথাটার অর্থ হইতেছে, বিশ্বজনীন বা সার্ব্বজনীন। রোমক চার্চ্চ দাবী করিতেন, সমগ্র খৃষ্টান্‌সমাজের উপরে এই চার্চ্চের শাসনপ্রভুত্ব ভগবদ্‌বিহিত বস্তু। রোমান্ ও খৃষ্টান প্রায় এক অর্থেই তখন ব্যবহৃত হইত। যে রোমান্ সেই খৃষ্টান, যে খৃষ্টান সেই রোমান্। রোমক সাম্রাজ্য-শক্তি যেমন সমগ্র খৃষ্টান সমাজের রাষ্ট্রীয় প্রভু, রোমক চার্চ্চও তেমনই সমগ্র খৃষ্টানসমাজের ধর্ম্ম প্রভু। সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন, যেমন ভগবৎপ্রতিনিধি-স্বরূপ রোমীয় সম্রাট, তেমনই ধর্ম্মশাসন যন্ত্ররূপ চার্চ্চের অধিপতি ছিলেন, ভগবৎপ্রতিনিধি-স্বরূপ রোমের পোপ। প্রাচীন রোম সাম্রাজ্য লুপ্ত হইলেও, নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে মহাবীর সার্লেম্যানকে রোমের পোপ রোমীয় সম্রাট রূপে অভিষেক করেন। সার্লেম্যানের সাম্রাজ্যও তখন ছিল সমগ্র মধ্য ইয়োরোপ ব্যাপিয়া। এই সাম্রাজ্যের নাম হইল, Holy Roman Empire। এবং যে ভাবে যে অবস্থাতেই হউক, Holy Roman Empire নামে একটা সাম্রাজ্য-রূপ বস্তু বা তার ঠাট, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ কাল পর্য্যন্ত ইয়োরোপে বর্ত্তমান ছিল। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে যেমন প্রত্যেক খৃষ্টানকে রাষ্ট্রশাসনে ভগবৎপ্রতিনিধি এই সাম্রাজ্যের অধিপতির শাসন মানিতে হইবে, ধর্ম্মনীতি-সম্বন্ধীয় ব্যাপারেও তেমনই প্রত্যেক খৃষ্টানকে ধর্ম্মশাসনে ভগবৎপ্রতিনিধি পোপকে মানিতে হইবে, ইহাই ছিল তখন-কার রাষ্ট্রবিধানেরও ধর্ম্মবিধানের মূল নীতি।

কিন্তু সেই যুগে ইয়োরোপীয় খৃষ্টানবর্গের স্বভাবচরিত্র ও বুদ্ধির অবস্থা যেরূপ ছিল, তাহাতে তাহাদের উপরে এইরূপ ধর্ম্মনীতির শাসন যেরূপ চলিতে পারে, রাষ্ট্রনীতির শাসন সেরূপ চলিতে পারে না। কোন দেশেরই রাজা বা অভিজাত ভূস্বামী সম্প্রদায় এই তথাকথিত এই Holy Roman Empireএর সম্রাট্‌কে একেবারেই মানিতেন না। কিন্তু কোনও দেশেরই রাজা কি প্রজা কেহই রোমক চার্চ্চের অধিপতি পোপের ধর্ম্মশাসনকে অবহেলা করিয়াও চলিতে পারেন নাই।

এই শাসনের ধরণটা ছিল, একেবারেই despotic। পোপ ভগবানের প্রতিনিধি, সুতরাং পোপের বাণী ভগবদ্‌-বাণীরই ন্যায় অলঙ্ঘ্য। পোপ যাহা বলিবেন, যখন যে বিধান করিবেন, বিনাবিচারে অবনত মস্তকে সকলকে তাহা শিরোধার্য্য করিয়া নিতে হইবে। ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে যে সব doctrine বা মত চার্চ্চ সত্য বলিয়া প্রবর্ত্তন করেন, তার বিরুদ্ধে কোনও কথা বলাই মহাপাপ, কঠোর দণ্ডের যোগ্য। ধর্ম্ম সাধনার যে অনুষ্ঠান পদ্ধতি রোমক চার্চ্চ প্রতিষ্ঠা করেন, সকলকে বিনা ওজরে সেই সব অনুষ্ঠানই পালিতে হইবে। অন্যথা যে করিবে-সেও কঠোর দণ্ডার্হ হইবে। সে

দণ্ড আবার যেমন তেমন নয়, অপরাধীর জীবন্ত অনলে দাহন! মানবের বুদ্ধির উপরে, বিচারের উপরে, বিবেকের উপরে, ধর্ম্মসাধনার অধিকারের উপরে, এত বড় despotic আধিপত্য কোনও ধর্ম্মশাস্ত্র আর কোথাও করিয়াছে, বলিয়া জানি না। যে সব বিশ্বাস ও সেরূপ অনুষ্ঠান পদ্ধতি রোমক চার্চ্চ প্রবর্ত্তন করেন এবং যে সব বিধির উপরে আপনার প্রভুত্বের দাবী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, বাইবেলে যিশুখৃষ্টের এবং তাঁহার শিষ্যবর্গের কোনও উপদেশের দ্বারাই তাহার সমর্থন করা যায় না। তাই চার্চ্চের সঙ্গে যাঁহাদের সকল স্বার্থ সংসৃষ্ট, সেই সব যাজক ব্যতীত অন্য খৃষ্টানের পক্ষে বাইবেল পড়াও নিষিদ্ধ হইয়াছিল। যুক্তি ছিল এই যে তাহারা বাইবেলের সত্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবে না। বাইবেল পড়া এবং কোনও দেশের ভাষায় লাটিন বাইবেল তরজমা করিয়া প্রচার করাও দণ্ডনীয় পাপ বলিয়া বিহিত হইল। বাইবেল পড়িলে খৃষ্টানেরও জীবন্ত অনলে দাহন শাস্তি হইত! তবু, হয়ত লোকে এই কঠোর শাসন সহিতে পারিত, যদি এই শাসনের কর্ত্তারা সত্যই দেবতার মত পুরুষ হইতেন। কিন্তু দেবত্বের সঙ্গে এইরূপ অন্যায় শাসনের কোনও সম্বন্ধ থাকে না। রোমকচার্চ্চের যাজকবৃন্দের মধ্যে দেবত্বের কোনও লক্ষণ তখন দেখা যাইত না। পোপ ইটালীর মধ্যভাগে ক্ষুদ্র একটি রাজ্যেরও অধিপতি ছিলেন। সকল দেশ হইতেই প্রচুর প্রণামী বা ধর্ম্মকরও তাঁহারা পাইতেন। রাজার হালে তাহারা থাকিতেন, রাজার মতই ভোগবিলাসে দিন যাপন করিতেন।—তাঁহার সহযোগী প্রধান যাজকবৃন্দও প্রত্যেক দেশে বড় এক এক জন ভূস্বামীর মত ছিলেন,—সাধারণ ভূস্বামীদের মতই জীবনযাপন করিতেন। মানবজীবনে যত রকম দুর্নীতি হইতে পারে, সবই ইহাদের মধ্যে দেখা যাইত। বিবাহ করা ইহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল; বিলাসে তাহাতে অতিশয় ব্যভিচারও তাঁহাদের মধ্যে দেখা দেয়। অতিরিক্ত ভোগবিলাসের জন্য অর্থের প্রয়োজনও বড় হইত। সকল দেশের প্রজাদের নিকট হইতেই নানা কৌশলে অর্থশোষনের চেষ্টা তাঁহারা করিতেন। রাষ্ট্রশাসনেও আপনাদের প্রভুত্ব বড় বেশী পরিচালনা করিতে চাহিতেন। খৃষ্টানমণ্ডলীর প্রকৃত আধ্যাত্মিক ও ধর্ম্মনৈতিক মঙ্গল অপেক্ষা আপনাদের সম্পদ সুখ ও ক্ষমতার দিকেই রোমীয় চার্চ্চের যাজকমণ্ডলীর লক্ষ্য বেশী হইয়া উঠিয়াছিল।

রোমক চার্চ্চের নিন্দাই কতকগুলা করিলাম।—তবে ইহাও বলিতে হইবে, বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় সভ্যতার উন্নতির প্রথম বিকাশ রোমকচার্চ্চের সহায়তায় হইয়াছে। খৃষ্টধর্ম্মের বিশেষ একটা রূপ বা পদ্ধতি ইয়োরোপীয় সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল রোমকচার্চ্চ। ইয়োরোপীয় জাতি সমূহের মধ্যে যে একই প্রকৃতির সভ্যতা বিকাশ হইয়াছে, তার কৃতিত্বও প্রধানতঃ রোমকচার্চ্চের। এই বিশেষ প্রকৃতি ধরিয়া যে ইয়োরোপীয় জাতি সমূহের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে, তার প্রধান কারণও এই যে, ইহার উন্মেষের যুগে, এই প্রকৃতি ধরিয়া উঠিবার যুগে, রোমকচার্চ্চ ইয়োরোপীয় জাতিসমূহকে একই ধর্ম্ম-শাসনের অধীনে একই সমাজভুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল। ইয়োরোপে তখনকার জ্ঞানবিদ্যার অনুশীলন, অর্থাৎ Culture যাহা কিছু তাহাও এই রোমক চার্চ্চের নেতৃত্বাধীনেই ছিল। যে দেশে যাহা কিছু উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছে, সকলেই যে সমানভাবে সহজে তার ফলভোগী হইয়াছে, তাও সকলে এই রোমক চার্চ্চের শাসনাধীনে ছিল বলিয়া হইতে পারিয়াছে। এককথায়, একটা organism রূপে ইয়োরোপীয় সমাজ যে ধর্ম্মে আশ্রিত ছিল, সেই ধর্ম্মের রূপ ছিল রোমক চার্চ্চ। ইয়োরোপীয় সভ্যতার ঋণ রোমক চার্চ্চের কাছে বড় কম নয়।

কিন্তু রোমক চার্চ্চ এত বড় ট্রাষ্টের বা দায়িত্বের কর্ত্তব্য ঠিক ভাবে পালন করিতে পারে নাই। সমাজকে organism বলিয়া ধরিলেও ব্যষ্টির অধিকারও তার মধ্যে বড় কম নয়। ব্যষ্টির সেই অধিকারকে রোমক চার্চ্চ একেবারেই অস্বীকার করিয়াছিল। ব্যষ্টির ব্যক্তিত্বের মহিমা বিকাশের সকল পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল। রোমক চার্চ্চের শাসনপদ্ধতি একেবারে রোমক সাম্রাজ্যের শাসন-পদ্ধতির অনুকরণে গঠিত হইয়াছিল।

সমগ্র প্রজামণ্ডলীর উপরে শাসনপদ্ধতির কেন্দ্রশক্তির একাধিপত্য বা despo tic authorityই ছিল রোমক সাম্রাজ্যের মূলনীতি। ধর্ম্মশাসনপদ্ধতিতেও কেন্দ্রীয় শক্তির প্রতিভূ পোপের এই despotism বা একাধিপত্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

চার্চ্চের এই শক্তির প্রতিষ্ঠা যে সব পোপরা করেন, তাঁহাদের যে আধ্যাত্মিক প্রেরণা ছিল, চরিত্র বল ছিল, তাহা যখন শুষ্ক হইয়া গেল, ক্ষীণ হইয়া পড়িল, একমাত্র

পার্থিব ক্ষমতার অধিকার, পার্থিব ভোগবিলাস এবং সেই ভোগবিলাসের উপযোগী অর্থ আহরণই হইল রোমকচার্চ্চের প্রধান লক্ষ্য। কোনও সমাজের ধর্ম্মনীতির নেতৃত্ব দীর্ঘকাল যাঁহারা পরিচালনা করিতে চান, পার্থিব সম্বন্ধে অসাধারণ ত্যাগী তাঁহাদের হওয়া আবশ্যক। এই ত্যাগের সংস্কার ভারতীয় ব্রাহ্মণের ন্যায় বংশানুক্রমে রোমক যাজকবর্গের ছিল না, এই ত্যাগের উপযোগী শিক্ষা ও সাধনার ব্যবস্থাও একরূপ কিছু ছিল না। এরূপ অবস্থায় এত দূর ক্ষমতা শিষ্যবর্গের কেবল অর্থের উপরে নয়, বুদ্ধির উপরেও অধিকদিন চলিতে পারে না। এই সময় প্রাচীন রোমের ও গ্রীসের বিদ্যার আলোচনায় ইয়োরোপীয় চিন্তার স্রোত অন্ধবিশ্বাসের পথ ছাড়িয়া যুক্তির ও নিরপেক্ষ বিচার বুদ্ধির পথে চলিতে আরম্ভ করিল। রোমক চার্চ্চের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তখন অবশ্যম্ভাবী; সেই বিদ্রোহ ঘটিল। প্রত্যেক দেশেরই বহু খৃষ্টান রোমীয় চার্চ্চের-শাসনাধীনতা ত্যাগ করিল। এই বিদ্রোহ দমনের জন্য রোমক চার্চ্চও তাহার কঠোর দণ্ডবিধান অস্বাভাবিক একরূপ দানবীয় কঠোর মাত্রায় নিয়া তুলিল। চার্চ্চের বিরুদ্ধে লোকের বিরাগ আরও বাড়িল,—বিদ্রোহীর দল আরও পুষ্ট হইল।

এই বিদ্রোহ, যাহা ইয়োরোপীয় ইতিহাসে Reformation নামে পরিচিত, তাহা মাত্র রোমক চার্চ্চের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, খৃষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে নয়। বিদ্রোহী প্রটেষ্টাণ্টগণ বলিলেন, খৃষ্টীয় ধর্ম্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মনীতির ব্যাখ্যা রোমক চার্চ্চ যাহা করিতেছেন, তাহা সত্য ব্যাখ্যা নহে। প্রত্যেক দেশের ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তাহার নূতন ব্যাখা করিয়া নূতন নূতন ধর্ম্মপদ্ধতি দেশে প্রবর্ত্তিত করিলেন। আর সেই সব ধর্ম্মপদ্ধতি হইল, প্রত্যেক দেশের রাষ্ট্র শাসনের অধীন!

রোমক চার্চ্চের শাস্ত্র বিধি আদিম খৃষ্টীয় সমাজের নায়ক প্রাচীন Fathers বা Saints গণের নামের দোহাই দিয়া চলিত। লোকে ইঁহাদের ঋষির ন্যায় মানিত। কিন্তু নূতন এই সব Reformed বা Protestant চার্চ্চের শাস্ত্রবিধি প্রণয়ন করিলেন, তখনকার পণ্ডিতগণ। পণ্ডিত যত বড়ই হউন, ঋষির মর্য্যাদা ইঁহাদিগকে কেহ দিত না। লুথার, ক্যালভিন, জুইঙ্গলি প্রভৃতি যে সব নায়ক বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের প্রটেষ্টাণ্ট চার্চ্চ প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তাঁহাদিগকে লোকে বড় মনে করিলেও, এত বড় মনে করিত না যে, তাঁহাদের নির্দ্দেশ শাস্ত্রনির্দ্দেশের মত গ্রহণ করিবে। কাজেই আরও কত জনে নূতন নূতন ব্যাখ্যা দিয়া খৃষ্ট ধর্ম্মের কত নূতন নূতন পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিতে প্রয়াসী হইলেন। লুথার, ক্যালভিন্ যদি ধর্ম্মপদ্ধতির সংস্কার করিতে পারেন, তাঁহারাই বা পারিবেন না কেন? ধুয়া উঠিল, খৃষ্টধর্ম্মের তত্ত্ব কি, স্বাধীন বিচারবুদ্ধির দ্বারা তাহা বুঝিয়া নিয়া তদনুসারে চলিবার অধিকার প্রত্যেক খৃষ্টানের আছে। প্রটেষ্টাণ্ট চার্চ্চের একটা একত্বের বল আর রহিল না। বহু পদ্ধতি, বহু সম্প্রদায় হইল। কতকগুলি হইল ষ্টেট চার্চ্চ, আর কতকগুলি হইল স্বতন্ত্র বা independent চার্চ্চ। ষ্টেট্ চার্চ্চ গুলি রাষ্ট্রশক্তির বলে সকল প্রজাকেই তার পদ্ধতি অনুসারে চলিতে বাধ্য করিবার বহু চেষ্টা করিয়াছিল,—রোমক চার্চ্চের অনুকরণে বহুবিধ কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থাও করিয়াছিল। কিন্তু Independent church সমূহও অসাধারণ ধীরতায় সকল দণ্ড সহ্য করিয়া আপনাদের অস্তিত্ব রক্ষা করিবার প্রয়াস সর্ব্বত্র পাইয়াছে। ক্রমে ষ্টেট্ চার্চ্চ গুলি এই Independent church গুলির অস্তিত্ব ও অধিকার স্বীকার করিতে বাধ্য হয়।

বহু চার্চ্চের উদ্ভবে ধর্ম্মনীতির একটা সংহতিশক্তি রহিল না,—ধর্ম্মনীতির বন্ধনেও একটা শিথিলতা আসিয়া পড়িল। প্রাধান্য অবশ্য সর্ব্বত্রই থাকিল, ষ্টেট্ চার্চ্চ গুলির। কিন্তু সেই ষ্টেট্ চার্চ্চ গুলির প্রতিষ্ঠায় আবার ধর্ম্মশাসন রাষ্ট্রশাসনের অধীন হইয়া পড়িল। ক্রমে ইয়োরোপের সব ষ্টেট্ বা রাষ্ট্র শক্তি যখন democratic বা গণতান্ত্রিক আকার ধারণ করিল, state church গুলিও সেই democracyর অধীন হইয়া পড়িল। ধর্ম্মনীতি জনসমাজকে শাসন না করিয়া, জনসমাজের শাসনাধীন হইল। Independent চার্চ্চ গুলি ত প্রথম হইতেই democratic রীতি ধরিয়াছিল। যে শাসন করিবে, সেই যদি শাসিতের অধীন হইয়া পড়ে, তবে তাহার যে দশা হয়, ইয়োরোপে প্রটেষ্টাণ্ট চার্চ্চরূপ ধর্ম্মপদ্ধতিগুলির অবস্থা তাই হইল। ইহা জনসমাজকে ধর্ম্মনীতির পথে স্থিত রাখিবার পক্ষে অনুকূল অবস্থা কি না, তাহা ভাবিবার কথা বটে।

Reformation বা রোমক চার্চের বিরুদ্ধে প্রটেষ্টাণ্ট বিদ্রোহ ইয়োরোপীয় Individualism এর সূত্রপাৎ করে, তবে একটা সীমা অতিক্রম করিয়া যায় না। খৃষ্টধর্ম্মকে ইহা মানিয়া চলিয়াছে,—দাবী তার এই মাত্র ছিল যে খৃষ্টধর্ম্মের তত্ত্ব কি তাহা বুঝিয়া তদনুসারে চলিবার একটা নিরপেক্ষ অধিকার সকলেরই আছে। কিন্তু Individualism বস্তুটা এমনই যে একবার মুক্ত হইয়া ছুটিবার পথ পাইলে, কোনও সীমার মধ্যে সে বড় থাকে না। দুর্ব্বার প্রবল গতিতে সকল বন্ধন ছাড়াইয়া, সকল সীমা লঙ্ঘন করিয়া যাইতে চায়। চার্চের শক্তিও এতদূর শিথিল ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, এই পথে সে আর কোনও বাধা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না।

ক্রমেই তার বল বৃদ্ধি পাইতেছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীতে, এমন কতকগুলি অবস্থা আসিয়া পড়িল, যাহার প্রভাবে যে বন্ধনটুকু সে মানিত,যে সীমা সে একেবারে লঙ্ঘন করিতে চায় নাই, সে বন্ধনও ছিন্ন করিয়া সেই সীমাও লঙ্ঘন করিয়া, নূতন এক লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইল। এই লক্ষ্য মুক্ত নিরপেক্ষ Rationalism, আর তাই ধরিয়া জীবনের সকল ক্ষেত্রে Individualism মহিমার প্রতিষ্ঠা,—সমষ্টির সঙ্গে সকল সম্বন্ধে democracyর প্রবর্ত্তন! ইহাও আরও বড় একটি বিদ্রোহের ফল। এই বিদ্রোহ বিখ্যাত ফরাসী বিপ্লব। ফরাসী দেশে তখন বড় একটা সামাজিক বৈষম্য দেখা দিয়াছিল, বড় কঠোর পীড়ন দরিদ্র জনসাধারণকে তাহা করিত। একথা পূর্ব্ব প্রবন্ধেও কিছু উল্লেখ করিয়াছি। সমাজে যে বৈষম্য স্বাভাবিক, তাহা লোকে বুঝিতে পারে, কোনও শ্রেণীর লোককেও অন্যায় পীড়ন তাহা করে না,—বৈষম্যের মধ্যেও লোকে সন্তুষ্ট থাকে, যাহা সে পাইবার যোগ্য তাহাও পায়। তারপর যারা উপরে আছে, উপরের বড় দায়িত্ব তারা বহন করিতেছে, তাহাদের এই দায়িত্ব বহনে নিম্নতর শ্রেণীর লোকেরা যে কতখানি উপকৃত হইতেছে, কতটা নিরুদ্বেগ হইয়া যার যার জীবনের বৃত্তি অনুসরণ করিয়া শান্তিতে আছে, ইহাও অনুভব করিবার সুযোগ যথেষ্ট পায়। ইহার উপর উচ্চতর সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের ব্যবহারে যদি স্নেহ ও সমবেদনা, তাহাদের সুখ স্বচ্ছন্দতার প্রতি সদয় দৃষ্টি তারা দেখিতে পায়, বহু কর্ম্মে, পরস্পরের সঙ্গে বহু সম্বন্ধে যদি তার পরিচয় পায়, তবে তাহাদের বিরুদ্ধে একটা অসন্তোষের উত্তেজনাও নিম্নতর শ্রেণী সমূহের মধ্যে হয় না। কিন্তু ফরাসী সমাজে নিম্নতর জনসাধারণের মধ্যে এরূপ কিছু বুঝিবার কি ভাবিবার অবসর একেবারেই ছিল না,—অস্বাভাবিক একটা পীড়নই কেবল তাহারা অনুভব করিত। সমাজে ও রাষ্ট্রে যেমন প্রত্যেকেরই সুখ সুবিধা অনেক আছে, তেমন দায়িত্বও অনেক আছে, সুখ সুবিধাগুলি রক্ষার জন্য ত্যাগ অনেক করিতে হয়, ক্লেশও অনেক পাইতে হয়। কিন্তু ফরাসী রাষ্ট্রের ও সমাজের অবস্থা তখন এমনই হইয়াছিল যে, এই সব দায়িত্বের, ত্যাগের ও ক্লেশের ভাগটা একেবারেই গিয়া পড়িয়াছিল, দরিদ্র জনসাধারণের উপরে, আর সুখ-সুবিধাগুলি ভোগ করিতেন সবই উচ্চতর অভিজাত সম্প্রদায় আর উচ্চতর যাজকবর্গ। কেবল তাই নয়, দরিদ্র জনসাধারণকে নানা রকম পীড়ন করিবারও ক্ষমতা এবং অধিকার তাঁহাদের হাতে ছিল। কোনও নীতি, কোনও যুক্তি দ্বারা এই বৈষম্যকে, বৈষম্যের এই পীড়নকে সমর্থন করা যাইত না। বেশী হউক, অল্প হউক, বুদ্ধি ও বিচারশক্তি মানবমাত্রেরই আছে। সকলেই ভাবিত, কেন আমরা এত দুঃখ সহিতেছি? কিন্তু ভাবিয়া কোনও কূল পাইত না। জীবনের এমন একটি দিক ছিল না, যে দিকে দরিদ্র একটু শান্তির ও আশার আলোক পাইতে পারে। ইহকালের দুঃখও লোকে বরদাস্ত করিতে পারে—পরকালের কথা ভাবিয়া, পার্থিব দুঃখের ভার বহিতে পারে—আধ্যাত্মিক শান্তির আশ্রয়ে। কিন্তু তৎকালীন ধর্ম্মপদ্ধতিও এরূপ কোনও আশার বা শান্তির পথ লোককে দেখাইতে পারে নাই। ক্যাথলিক চার্চের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রটেষ্টাণ্ট চার্চ্চ সমূহের মধ্যে ক্যালভিন-প্রতিষ্ঠিত চার্চের প্রাধান্যই বেশী ছিল,—এই ক্যালভিনিক চার্চ্চ এবং আরও অনেক Independent church জীবনের সকল কর্ম্মে,সকল আনন্দে ইহকালে কেবল পাপ,আর পরকালে তার জন্য অনন্ত শাস্তির বিভীষিকাই দেখাইতেন। তা ছাড়া, যার যার চার্চের অধীনে লোককে বলে বাধ্য করিয়া রাখিবার প্রয়াস তখনও চলিতেছিল। এ অবস্থায় সমগ্র সমাজবিধান ও ধর্ম্মবিধানের বিরুদ্ধেই অতি ভীষণ একটা অসন্তোষের, উত্তেজনার সৃষ্টিই পীড়িত মানবের চিত্তে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু অজ্ঞ জনসাধারণের দুঃখ এবং দুঃখপ্রসূত অসন্তোষ সহজে কোনও

একটা নির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়া প্রতিকারের উদ্দেশ্যে ছুটিতে পারে না। তাহাদের বুদ্ধিকে এইদিকে পরিচলিত করিবার জন্য এমন নেতার আবশ্যক যাঁহারা ইহার তত্ত্ব ও নিদান আলোচনা করিয়া জনসাধারণের অস্পষ্ট বুদ্ধি ও লক্ষ্যহীন উত্তেজনাকে একটা আশার দিকে, নির্দ্দিষ্ট একটা পথে, নির্দ্দিষ্ট একটা লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করিবেন। রুশো ভল্টেয়ার প্রভৃতি এইরূপ অনেক নেতারও আবির্ভাব এই সময়ে হয়। প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত সকল রাষ্ট্রবিধান, সমাজবিধান ও ধর্ম্মবিধানের বিরুদ্ধে ইঁহারা মানবের সাম্য ও স্বাধীনতার বাদ প্রচার করিতে লাগিলেন। অতিতৃষ্ণার্ত্ত যেমন আগ্রহে শীতল জল পান করে, সে জলে কোনও কঠিন রোগের বীজাণু আছে কিনা, ভাবে না,—তেমনই আগ্রহে জনসাধারণ ইঁহাদের প্রচারিত নীতি গ্রহণ করিতে লাগিল, তার মধ্যে অসত্যের অমঙ্গল কিছু আছে কিনা, থাকিতে পারে কি না, তাহাও ভাবিবার একটু অবসর কাহারও হইল না।

দেশের আর্থিক অবস্থায় বড় একটা সঙ্কট এই সময়ে দেখা দেয়, – ভীষণ দুর্ভিক্ষের পীড়নেও দরিদ্র একেবারে উন্মত্তবৎ হইয়া উঠে। অনুকূল আরও এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটিল, যাহাতে ফরাসী জনসাধারণ রাজা ও উচ্চতর সম্প্রদায় সমূহের বিরুদ্ধে একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল, – প্রাচীন রাষ্ট্রবিধান, সমাজবিধান, ধর্ম্মবিধান – সব একেবারে চূর্ণ করিয়া ফেলিল।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছিলাম, বৈষম্য ও অন্যায় শাসন যখন সীমা ছাড়াইয়া যায়, সাম্যের বিদ্রোহ তাব বিরুদ্ধে তেমনই প্রবলভাবে উত্থিত হয়, ইহাও সকল সীমা ছাড়াইয়া যায়।

ফরাসী বিপ্লবের যুগে যেমন সাম্যের তেমনই স্বাধীনতার দাবী সকল সীমা ছাড়াইয়া অতি উৎকট অস্বাভাবিক ভাবে প্রকাশ পায়। প্রাচীনের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ একেবারে ছিন্ন করিয়া নূতন পূর্ণ সাম্য ও স্বাধীনতার নীতি ধরিয়া মানবসমাজকে একেবারে নূতন ধাঁচে নূতন করিয়া গড়িয়া নিবারও প্রয়াস একটা হয়।

এক দেশের অধিবাসী মানবসমূহের মধ্যে একটা সংহতিও আবশ্যক এবং সংহতিকে প্রত্যেক মানবের পূর্ণ স্বাধীনতার উপরে হস্তক্ষেপও কিছু করিতে হয়। কিন্তু ইহাও যে অন্যায়। অন্যায় হইলেও করিতেই হইবে, নহিলে সংহতি থাকে না, ব্যষ্টি হিসাবে সকল মানবের স্বার্থও রক্ষিত হয় না। ইহার একটা কৈফিয়ৎ চাই। এই কৈফিয়ৎ হইল, রুশোর Social contract theory বা সামাজিক চুক্তি-বাদ। এই বাদের কথা এই যে, সকল মানব প্রথমে মিলিয়া পরস্পরের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় একটা contract বা চুক্তিতে একটা সমাজ বাঁধিয়া গিয়াছে, সেই চুক্তিতে সমাজশক্তির বা গবর্ণমেণ্টের হাতে কতকগুলি বিশেষ অধিকার তারা দিয়াছে, যাহার বলে এই সমাজশক্তি বা গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক ব্যক্তিকে শাসন করিতে পারে,—আর পারে মাত্র ততটুকু, যতটুকু অধিকার একটু স্বেচ্ছাকৃত চুক্তিতে তার হাতে দেওয়া হইয়াছে।

এই সামাজিক চুক্তির বাদটা এতই অস্বাভাবিক এবং পদে পদে এতই logical fallacy বা যুক্তির ভুল ইহাতে আসিয়া পড়ে যে, পরবর্ত্তী সমাজতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ইহা একেবারেই অশ্রদ্ধেয় ও অগ্রাহ্য বলিয়া ত্যাগ করিয়াছেন। সে সব আলোচনার মধ্যে আমাদেরও যাইবার কোনও আবশ্যক নাই।

কিন্তু যে Rationalistic, Individualistic এবং Democratic নীতির আবির্ভাব ফরাসী বিপ্লবের যুগে হয় তাহা রহিয়া গেল, এবং যে আকার তাহা পরে ধারণ করে, তাহা উল্লেখমাত্র প্রবন্ধের প্রথমে করিয়াছি, আলোচনা হয় নাই।

ক্রমে ইহার আলোচনা করিব।

(ক্রমশঃ)

মুসলমান সমাজের প্রতি

(নিখিল ভারত মোসলেম লিগ কর্ত্তৃক গোবধ প্রথা রহিত বা ত্রাণ করিবার প্রস্তাব গ্রহণে)

(১)

অত বড় কথা ওমুখেই সাজে, তোমরা যে মহাপ্রাণ
নবাবের জাতি আজিকে করিলে নবাবের মত দান।
জগৎ বিজয়ী হে আলমগীর,
দিলে বুক-জোরা নব জায়গীর
আজিকে প্রণয়ে জিনিয়া লইলে বিপুল হিন্দুস্থান।

(২)

তোমরা উদার, বিরাট মহৎ, তোমরা দানী ও ত্যাগী,
আমরা ছিলাম দুয়ারে দাঁড়ায়ে এত দিন যার লাগি।
আজিকে হাসিয়া দিলে করে তুলি,
ভরে দিলে চির ভিক্ষার ঝুলি,
জুড়ে দিলে এই নিখিল ভারত ভাঙ্গা চোড়া খান খান্।

(৩)

বনিয়াদী রাজা এতদিন পর পুরাইলে হায় সাধ
বুকের পাঞ্জা বসাইয়া দিলে এত বড় তায় দাদ্
ওগো দানবীর ওগো মসলিম
লও বারবার শত তসলিম্
গোলাপের সাজি হইয়া উঠিল রাঙা খর্পরখান।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

বুকের বোঝা

(১)

লোকে বলে আমি কেমন যেন হইয়া যাইতেছি,—বোধ হয় আমার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। আমারও এক এক সময় সন্দেহ হয়, সত্যই হয়ত আমার মাথা খারাপ হইয়াছে। আশ্চর্য্য কি? দিবারাত্র যে রাবণের চিতা বুকে করিয়া বেড়াইতেছি, তাহাতে একেবারে পাগল যে হইয়া যাই নাই, ইহাই আশ্চর্য্য মনে হয়। কি ভীষণ সে চিতানল! যদি উহা একেবারে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিত তবে একমুহূর্ত্তেই আমার সমস্ত যন্ত্রণার বিরাম হইত। কিন্তু এ আগুন ত সে আগুন নয়। তুষানলের মত ধিকি ধিকি করিয়া এই যে চিতা ধীরে অতি ধীরে আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল দগ্ধ করিতেছে, কতদিনে উহার এ ক্ষয়কার্য্য শেষ হইবে তাহা কে জানে? যতদিন না হয় ততদিন আমাকে এ অসহ্য জ্বালার যন্ত্রণায় ছটফট করিয়া বেড়াইতে হইবে।

লোকে কিন্তু তাহা বুঝে না; আমিও কাহাকেও বুঝাইবার চেষ্টা করি না। আমি জানি, চেষ্টা করিলেও কাহাকেও আমি আমার প্রকৃত বেদনার তিলাংশও বুঝাইতে পারিব না। তবে এক এক সময় মনে হয়, কাহারও নিকট প্রাণের কথা বলিতে পারিলে হয়ত আমার এ জ্বালার কিছু লাঘব হইত। কিন্তু কাহার নিকট বলিব? যাহাকেই বলিতে যাইব, সেই সহানুভূতির পরিবর্ত্তে ঘৃণার তীব্র কশাঘাতে আমার ক্ষতবিক্ষত হৃদয় আরও ক্ষতবিক্ষত করিবে। তাই কাহারও নিকট প্রাণের জ্বালা জানাইতে পারি না; অথচ কোনরূপে উহার একটু বাহির করিয়া দিতে না পারিলেও আমার চলিতেছে না। পুঞ্জীভূত বেদনার রুদ্ধ আবেগে আমার বুক ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। তাই আজ কাগজ কলমের সাহায্যেই আমার এ বোঝা কিছু হাল্কা করিবার চেষ্টা করিব। যদি কখনও বাতাসে উড়িয়া এই কাগজ খানা কাহারও হাতে পড়ে, তবে তাঁহার কাছে আমার মাত্র এই ভিক্ষা, তিনি যেন উহা পাগলের প্রলাপ বলিয়াই মনে করেন!

দামোদরের প্রবল বন্যায় যখন সমস্ত বর্দ্ধমান জেলা ভাসিয়া যাইতেছিল, তখন একদিন রামকৃষ্ণ সেবা সমিতির পক্ষ হইতে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া পাশেই এক বাসায় উপস্থিত হইলাম। বাহিরের ঘরে যাইতেই চাকর আমার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। আমি একজন বাবুকে ডাকিয়া দিতে বলিতে সে জানাইল, সেখানে কোন বাবু থাকেন

মা ; শুধু "মাইজী" আর তাঁহার মেয়ে, একজন ঝি ও একজন চাকর লইয়া সেখানে আছেন। আমি তখন চাকরের হাত দিয়া আমার ভিক্ষার খাতা খানা ও সেইসঙ্গে সমিতির পক্ষ হইতে প্রচারিত এক আবেদন পত্র মাইজীর নিকট পাঠাইয়া দিলাম। সে কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে জানাইল, তাহার"মাইজী"আমাকে ভিতরে যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। আমি অপরিচিত যুবক, আমাকে একজন ভদ্ররমণী বাসার ভিতর যাইবার জন্য অনুরোধ করিবেন কেন ? আমাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া চাকর আপনা হইতেই জানাইল, দরকার হইলে "মাইজী" এরকম মধ্যে মধ্যে অপরিচিতের সঙ্গে দেখা করেন। তবে যদি আমার কোন আপত্তি থাকে, তিনি নিজেই বাহিরের ঘরে আসিয়া আমার সহিত দেখা করিবেন।

ইহার পর আমি আর আপত্তি করিতে পারিলাম না। সঙ্কুচিত পদে চাকরের সহিত বাসার ভিতর প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, নিতান্ত একটি সাধারণ ঘরের মধ্যে, মেঝের উপর মাদুর পাতিয়া দুইটি রমণী বসিয়া আছেন। একজন যৌবন শেষে প্রৌঢ়ত্বের সীমায় আসিয়া দাড়াইয়াছেন, আর একজন বাল্যছাড়িয়া সুবেমাত্র যৌবনের পথে পা দিয়াছে। সম্মুখের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কাপড়ের টুকরা ও এককোণে একটি সেলাইর কল দেখিয়া আমি বুঝিলাম, ইহাঁরা দুইজন এতক্ষণ সেলাই করিতেছিলেন, আমার আগমন সংবাদেই আপাততঃ কাজ বন্ধ আছে। আমি ঢুকিতেই বয়োজ্যেষ্ঠা উঠিয়া আমার অভ্যর্থনা করিয়া এক খানা চেয়ার দেখাইয়া বলিলেন, "আমার অপরাধ মাপ করবেন। আপনাদের সমিতির এই আবেদন পত্র খানি পড়ে আমার তৃপ্তি হয় নাই। সমস্ত সংবাদ আপনার মুখে শুনবার জন্যই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি। এতবড় একটি ব্যাপারে শুধু একখানি ছাপান কাগজ থেকে সমস্ত কথা জানা যায় না"।

রমণীর কথা কহিবার সহজ, নিঃসঙ্কোচ ভাব দেখিয়া আমি আরও বিস্মিত হইলাম। একজন অপরিচিত, বয়স্ক পুরুষের সম্মুখে একজন ভদ্রঘরের হিন্দুরমণীকে এভাবে কথা বলিতে আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। অথচ রমণীকে ভদ্ররমণী ছাড়া আর কিছু বলিয়াও মনে হইল না। তাঁহার মধ্যে যে ধীরতা, যে একটি মৃদুতা দেখিলাম, তাহা ভদ্ররমণী ছাড়া অন্যে কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না।

একটা কিছু উত্তর দেওয়া উচিত। তাই কোনমতে সঙ্কোচ চাপিয়া রাখিয়া তাঁহাকে জানাইলাম, আমাদের কার্য্যে তিনি যে এতটা আগ্রহ দেখাইতেছেন ইহা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা। আর কি বলিয়াছিলাম তাহা ভাল মনে নাই। তবে এটুকু বেশ মনে আছে, বন্যাপীড়িত হতভাগ্যদের দুর্দ্দশার কথা আমি এমন আগ্রহে, এমন জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছিলাম যে, রমণী স্থির, নিশ্চল দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন।

আমার কথা শেষ হইলে রমণী আঁচল দিয়া চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, "আপনার কথা শুনে আমার মনে যে কি হচ্ছে তা বলতে পারি না। সার্থক আপনারা জন্মগ্রহণ করেছিলেন যে, পরের জন্য আপনারা এভাবে নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন দিয়ে কষ্ট ও অসুবিধা বরণ করে নিয়েছেন। আমি স্ত্রীলোক, আমার ক্ষমতা বড়ই অল্প। তবু আমি আপনাদের সমিতির পক্ষ হয়ে সামান্য মাত্র কাজ করতে পারলেও নিজকে অত্যন্ত ভাগ্যবতী মনে করব। আমি আপনাকে এক হাজার টাকা দেব স্বীকার করছি। এর বেশী দিতে পারলাম না বলে আমার নিজেরই যে কত কষ্ট হচ্ছে তা আমিই জানি।"

বিস্ময়ে, আনন্দে আমি নির্ব্বাক হইয়া রমণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তিনি আমার ভাব দেখিয়া কি মনে করিলেন জানি না, তবে বোধ হইল, যেন আমার বিস্ময়-মুগ্ধ, প্রশংসোজ্জ্বল দৃষ্টির সম্মুখে তিনি কিছু সঙ্কুচিত ও লজ্জিত হইয়া মুখ নীচু করিলেন। আমার তখন জ্ঞান হইল। আত্ম-সম্বরণ করিয়া বলিলাম, "আপনাকে যে কি বলে ধন্যবাদ দিব, জানি না। আপনার মত নারী যদি সংসারে বেশী থাক্‌তেন—"

বাধা দিয়া আর্ত্তকণ্ঠে রমণী বলিয়া উঠিলেন, "না, না, আপনি কি বলতে যাচ্ছেন তা আপনি জানেন না। না জেনে সংসারের উপর এতবড় একটা অন্যায় করবেন না, ধর্ম্ম তা সইবে না।"

দেখিলাম এক গভীর আঘাতে তাঁহার সেই করুণাস্নিগ্ধ মুখখানি সহসা একেবারে পাংশুবর্ণ হইয়া গিয়াছে, আর তাঁহার ক্ষীণ দেহখানি কি এক অজ্ঞাত উত্তেজনায় থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। আমার কথায় যে আঘাত কোন্ খানে তাহা বুঝিতে না পারিয়া আমি লজ্জায়, বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া রহিলাম।

কিছুক্ষণ পরে রমণী আপনা হইতেই আত্মসম্বরণ করিয়া নিজের এই আকস্মিক উত্তেজনা প্রকাশে যেন নিজেই কিছু লজ্জিত হইয়া ঈষৎ সঙ্কুচিত কণ্ঠে কহিলেন, "আপনি আমার কথায় কিছু মনে করবেন না। এক এক সময় আমার এ রকম হয়। কারণ আপনাকে জানাতে পারছি না। যা'ক্, আজ আর আপনাকে বেশী দেরী করাব না। পরশু এই সময় আসবেন. আমি টাকা যোগাড় করে রাখব।"

(২)

নির্দ্দিষ্ট দিনে উপস্থিত হইলে রমণী আমার হাতে এক হাজার টাকার কয়েক খানি নোট দিয়া বলিলেন, "যদি আপনি কিছু মনে না করেন তবে আপনাকে একটি কথা বলতে চাই।"

আমি বলিলাম, "যা বলবার তা আপনি অনায়াসে বলতে পারেন।"

রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের সমিতিতে বোধ হয় জামাকাপড়ের অনেক দরকার হয়?"

আমি উত্তর করিলাম, "তা হয় বই কি? সমিতির আশ্রয়ে ত আর দরিদ্রের সংখ্যা কম নাই।"

রমণী কহিলেন, "তবে আপনাকে একটা অনুরোধ করছি।—আশা করি, সে অনুরোধটা রাখবেন। আমি গরীব, টাকা দিয়ে সর্ব্বদা আপনাদের এই সেবা কার্য্যে সাহায্য করবার ক্ষমতা আমার নাই। তবে পরিশ্রম দ্বারা সে অভাব যথাসাধ্য পূরণ করবার চেষ্টা করব। কিরণ সেলাইর কাজ খুব ভাল জানে। আপনি যদি তা'র সহায় হ'ন, তবে সে পুণ্য করবার এই একটি মহৎ উপায় অবলম্বন করতে পারে।"

রমণীর উপর ভক্তি ও শ্রদ্ধা আমার আরও বৃদ্ধি পাইল। উল্লসিতকণ্ঠে বলিলাম, "সে ত, আমার পক্ষে অত্যন্ত আনন্দের কথা।"

কিরণ তখন মাতার আদেশে তাহার সেলাইর বাক্স নিয়া আসিল। দেখিলাম, বালিকা হইলেও শিল্পবিদ্যায় কিরণ অনেক দরজীকেও হারাইতে পারে। পেনি, ফ্রক হইতে আরম্ভ করিয়া কাঁথা, সুজনি, কোট, জ্যাকেট ইত্যাদি নানারকম জিনিষে তাহার সে বাক্সটি একেবারে পরিপূর্ণ। রমণী এক একটি করিয়া আমাকে তাঁহার কন্যার শিল্প-কার্য্যের নমুনা দেখাইতে লাগিলেন। আমিও হর্ষোৎফুল্ল নয়নে সেগুলি দেখিয়া অকপট প্রশংসা করিতে লাগিলাম। সব দেখা শেষ হইয়া গেলে যখন আমি প্রশংসমান দৃষ্টিতে কিরণের দিকে চাহিলাম তখন মুহূর্ত্তমধ্যে আমার সমস্ত উল্লাস, সমস্ত আনন্দ যেন মন্ত্রবলে কোথায় উড়িয়া গেল। পূর্ব্বে যখন আমি আসিয়াছিলাম তখন সঙ্কোচে কিরণের মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিতে পারি নাই। আজও এতক্ষণ সেদিকে বড় লক্ষ্য করি নাই। কিন্তু এখন তাহার মুখের দিকে চাহিতেই আমি বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া গেলাম। কি যে দেখিলাম তাহা আমি বলিতে পারিব না।—কথায় বা ভাষায় তাহা বুঝাইবার শক্তিও বোধ হয় কাহারও নাই। তবে এইটুকু মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমার মনে হইল, বিষাদ যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া আমার চক্ষুর সম্মুখে বসিয়া আছে। বোধ হয়, আমার প্রশংসায় ক্ষণিকের জন্য তাহার মুখে সসঙ্কোচ প্রীতির একটা কোমল দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সুন্দর মুখে, বিষাদের সে অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের উপর প্রশংসা-শ্রবণ-সঙ্কুচিতার এক কোমল স্নিগ্ধতা যে কি রকম দেখাইতেছিল তাহা আমি বুঝাইতে পারিব না। আমি স্তম্ভিত, মুগ্ধের মত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

সহসা রমণীর কণ্ঠস্বরে আমার চমক ভাঙ্গিল। নিজের এই আত্মবিস্মৃতিতে লজ্জায় আমার আকর্ণ কপোল দুটি লাল হইয়া উঠিল। চোখ তুলিয়া আর কাহারও মুখের দিকে তাকাইয়া কথা বলিতে পারিলাম না। তাড়াতাড়ি কোন রকমে তাঁহাদের সামান্য মাত্র কাজ করিতে পারিলেও যে নিজকে অত্যন্ত সুখী মনে করিব এ কথা জানাইয়া আমি বাহির হইয়া পড়িলাম।

কিন্তু বাসায় আসিয়াও আমার মনের মধ্যে কেবলই সেই করুণ, বিষণ্ণ মুখখানি ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। এত অল্প বয়সে, যৌবনের প্রারম্ভে বালিকার এ কি ভাব! উল্লাসে, আবেগে রমণী যখন দীপ্তিময়ী হইয়া উঠে, কল্পনা রাজ্যের মোহময় স্বপ্ন আসিয়া যখন এক অপূর্ব্ব উন্মাদনায় মানুষকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলে, শীতান্তে বসন্তাগমের মত নবজাগরণের সাড়া পাইয়া মানুষের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি যখন সজাগ হইয়া উঠে, আপনার নবলব্ধ পূর্ণতার খরবেগ সহ্য

করিতে না পারিয়া মানুষ যখন সারা বিশ্বকে সে পূর্ণতার ভাগ দিবার জন্ত অস্থির হইয়া উঠে—সে বয়সে, জীবনের সেই আবেগমদিরাময়, প্রীতিপ্রেমোদ্ভাসিত সন্ধিক্ষণে তাহার একি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! প্রাণের মধ্যে তাহার এমন কি তীব্র-জ্বালা যে, সে উত্তাপে এ অসময়েই এ স্ফুটনোন্মুখ কুসুমটি শুকাইয়া ম্লান হইয়া উঠিয়াছে। গভীর সহানুভূতিতে আমার হৃদয়টি পূর্ণ হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে ইঁহাদের জীবনের এই গুপ্তবেদনার ইতিহাস যেমন করিয়াই হউক জানিবার জন্ত একটি প্রবল আগ্রহ আমার মনের মধ্যে একটি নূতন উত্তেজনার সৃষ্টি করিল।

(৩)

সমিতির কাজ উপলক্ষ করিয়া এই দুইটি রমণীর সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা বেশ জমিয়া উঠিল। ক্রমে আমার লজ্জা, সঙ্কোচ দূর হইয়া তাঁহাদের সহিত ব্যবহারে একটি সহজ আনন্দভাব ফুটিয়া উঠিল। তাঁহারাও আমাকে পাইয়া যে বড়ই সুখী হইলেন তাহা তাঁহাদের প্রত্যেকটি কার্য্যে টের পাইতাম। কিন্তু এই নৈকট্যের মধ্যেও কেমন একটি দূরত্বের ভাব আমার প্রাণের মধ্যে গভীর বেদনা দিতে লাগিল। আমার মনে হইত, অনুভবনীয় অথচ অপ্রকাশ্য কি যেন একটি দুর্ভেদ্যপ্রাচীরের মত আমোদের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। আমি বুঝিতে পারিতাম, এত আত্মীয়তার মধ্যেও কি যেন একটি সঙ্কোচ, একটি আশঙ্কাজনিত দ্বিধায় তাঁহারা আমার সহিত ঠিক মন খুলিয়া মিশিতে পারিতেছেন না। আরও দেখিলাম, এই দুইটি রমণীর হৃদয়ে যে গভীর বেদনার আভাস পাইয়া এক সময় আমি চমকিয়া উঠিয়া-ছিলাম সে বেদনা সামান্ত নহে। সে বেদনার তীব্র জ্বালা তাঁহাদের উভয়েরই অন্তরস্থ সমস্ত রসটুকু নিঃশেষে শুষ্ক করিয়া শুধু দুইটি প্রাণহীন দেহ রাখিয়া গিয়াছে। কাহারও হাস্তে মাদকতা নাই, কার্য্যে উৎসাহ নাই, কথায় আবেগ নাই,—যেন এক একটি যন্ত্রচালিত পুতুল মাত্র,—গতি আছে, প্রাণ নাই,—স্পন্দন আছে—আবেগ নাই,—ধ্বনি আছে—ঝঙ্কার নাই।

কি যে এই গভীর বেদনা তাহা বুঝিতে না পারিয়া একটি নিষ্ফল উত্তেজনায় আমি অস্থির হইয়া উঠিলাম। কত রকমে এই প্রহেলিকা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিলাম, পারিলাম না। একদিন থাকিতে না পারিয়া কিরণের মাকে এ সম্বন্ধে স্পষ্ট একটি প্রশ্ন করিয়া বসিলাম। কোন উত্তর পাইলাম না। কিন্তু আমার প্রশ্নে তাঁহার মুখখানা মুহূর্ত্তের মধ্যে যে রকম বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল তাহা মনে করিয়া ভবিষ্যতে আর কখনও তাঁহাকে এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করি-বার সাহস হয় নাই। অথচ এ নিগূঢ় প্রহেলিকার মর্ম্মভেদ না করিলেও আমার শান্তি নাই। আমি বুঝিয়াছিলাম, ভাল হউক, মন্দ হউক, এই দুইটি নারীর সহিত আমি এমন বন্ধনে জড়িত হইয়া পড়িয়াছি, যাহা ছিঁড়িবার আর আমার ক্ষমতা নাই। আমি আমার অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। পূর্ণযৌবনের প্রথম ভালবাসার উন্মত্ত আবেগে তখন আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছিল। আমি কিরণকে ভালবাসিয়াছিলাম। সে কি ভালবাসা!—বুঝি কেউ কাহাকেও এত ভালবাসে নাই। এক অদৃশ্য যাদুকরের মোহময় স্বর্ণদণ্ডস্পর্শে আমার এতদিনকার সুষুপ্তপ্রাণ তখন নবজাগরণের মধুরতায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল; বিশ্বসংসার তখন এক নূতন, পুলকোজ্জ্বল মূর্ত্তিতে আমার মুগ্ধদৃষ্টির সম্মুখে দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছিল। নিভৃতচিন্তায়, অলীককল্পনায়, আকাশকুসুম রচনায় তখন আমি এক অপূর্ব্ব পুলকের আস্বাদ অনুভব করিতেছিলাম। সবই তখন আমাকে এক সম্পূর্ণ নূতন, স্বপ্নময়, মধুময় স্বর্গরাজ্যে লইয়া যাইতেছিল। কেবল এই এক কাল মেঘ আসিয়া মধ্যে মধ্যে আমার দৃষ্টিপথে অন্ধকার যবনিকার সৃষ্টি করিতেছিল। কিন্তু মেঘ যতই ঘনীভূত হইতেছিল, আমার মনোবেগ ততই যেন উদ্দাম হইয়া তাহা ছিন্ন ভিন্ন করিবার জন্য প্রমত্ত হইয়া উঠিতেছিল।

অবশেষে একদিন রাত্রে কিরণদের চাকর আসিয়া সংবাদ দিল, কিরণের মার কলেরা হইয়াছে—আমি একবার যাইতে পারিলে ভাল হয়। গিয়া দেখিলাম, রোগিনীর প্রায় আসন্নকাল উপস্থিত। কিরণের কাছে শুনিলাম, সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার দাস্ত ও বমি আরম্ভ হয়। সে ডাক্তার ডাকাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তিনি দেন নাই।

আমাকে দেখিয়াই তিনি ইঙ্গিতে আমাকে তাঁহার মাথার কাছে বসিতে বলিলেন। আমি চাকরের দ্বারা পার্শ্ববর্ত্তী একজন বড় ডাক্তারের নিকট একখানা চিঠি পাঠাইয়া দিয়া তাঁহার শিয়রে যাইয়া বসিলাম। সেই মৃত্যু-ছায়াব্যাপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিলাম, চিকিৎসায় তাঁহার

বিশেষ কিছু করিতে পারিবে না। আমার চক্ষু জল আসিল। দেখিলাম, ক্ষণিকের জন্য তাঁহার যন্ত্রণাক্লিষ্ট, বিবর্ণ মুখখানি মৃদু হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে তিনি বলিলেন, "ছি! আপনি কাঁদছেন কেন? আমার এ মরণ দুঃখের নয়,—এ আমার যন্ত্রণার শেষ হল। যে আগুন এতদিন আমার বুকে জ্বলছিল আজ তাহার নিবৃত্তি হবে। তবে আমার এই অভাগীন কিরণের জন্যই যা আশঙ্কা, তা'কে আপনার আশ্রয়ে রেখে গেলাম। আমার হাতবাক্সে একখানা কাগজে আপনি একদিন যা জানতে চেয়েছিলেন তা' পাবেন। সেটা আগে জেনে কিরণের সম্বন্ধে যা ব্যবস্থা করবার করবেন। তবে আমার শেষ প্রার্থনা সে যেন ভেসে না যায়।"

আমি বলিলাম, "সে জন্য আপনি চিন্তা করবেন না। আমি বেঁচে থাকতে কিরণের কোন কষ্ট হ'বে না।"

আমার এই আশ্বাসে মৃত্যুর অসীম যন্ত্রণার মধ্যেও শান্তির একটি স্নিগ্ধ আভায় তাঁহার সমস্ত মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

যথাসময়ে ডাক্তার আসিলেন, কিন্তু কিছু করিতে পারিলেন না। উষার প্রথম কনকরেখাসম্পাতের সঙ্গে সঙ্গে তিনি শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

(৪)

মায়ের মৃত্যুর পর হইতে কিরণ যেন কেমন এক রকম হইয়া যাইতে লাগিল। কথা সে কোনদিনই বেশী বলিত না, স্ফূর্ত্তিও তাহার বেশী দেখি নাই। কিন্তু তবু যে ক্ষীণ সজীবতাটুকু ছিল, এখন সেটুকুও যেন কোথায় চলিয়া গেল। সর্ব্বদাই প্রায় দেখিতাম, সে শূন্যদৃষ্টিতে, নীরবে বসিয়া কি ভাবিতেছে। ভাবনার যে তাহার যথেষ্ট কারণ আছে তাহা বুঝিতাম। সংসারে তাহার একমাত্র সম্বল যে মা ছিলেন তিনিও চলিয়া গিয়াছেন। আত্মীয় বলিতে, আপনার বলিতে তাহার আর কেহই নাই। যৌবনপ্রবেশের পথে, ভালবাসার অদম্য পিপাসায়, ভালবাসিবার এবং ভালবাসা পাইবার আকুল আকাঙ্ক্ষায়, মানুষ যখন অস্থির হইয়া উঠে, আপনার বলিয়া একজনকে জড়াইয়া ধরিবার জন্য মানুষ তাহার প্রসারিত বাহু লইয়া সারা জগৎময় ছুটিয়া বেড়ায়; সেই সময়—আত্মীয় বন্ধুশূন্যতার জ্বালা যে কত তীব্র তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেহ অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু আমার আশঙ্কা হইত, যদি তাহার এই নির্ব্বাক্, জমাটবাঁধা শোকভার তাহাকে বেশী দিন বহন করিতে হয়, তবে হয়ত সে পাগল হইয়া যাইতে পারে। তাই একদিন যখন সে এইরূপ নীরবে বসিয়া ভাবিতেছিল, তখন আমি তাহার কাছে বসিয়া, ধীরে ধীরে তাহার একখানি হাত নিজের দুহাতের মধ্যে নিয়া বলিলাম, "তুমি সর্ব্বদা এমন করে থাক কেন, কিরণ? শেষে পাগল হয়ে যা'বে নাকি?"

কিরণ তাহার সকরুণ চক্ষু দুটি আমার মুখের উপর রাখিয়া উত্তর করিল, "অত ভাগ্য কি আমার হ'বে? আমি –"

সহসা আমার মুখ দিয়া বাহির হইল, "তোমার মুখে এ সব কথা শুনলে আমার যে বড় কষ্ট হয় কিরণ।"

ক্ষণিকের জন্য তাহার মুখের উপর কি যেন একটি কিসের মৃদু আলোক খেলিয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই স্বাভাবিক বিষাদপূর্ণ কণ্ঠে সে উত্তর করিল, "তা জানি—কিন্তু তবু ত আমার অবস্থা আমি ভুলতে পারি না। সংসারে আমার এখন যে কোনই আশ্রয় রইল না।"

উদ্গতপ্রায় প্রাণের উচ্ছ্বাস বহু কষ্টে চাপিয়া রাখিয়া আমি কহিলাম, "কেন, আমি ত আছি। তোমার মা আমার উপরই তোমার ভার দিয়ে গিয়েছেন। তুমি আমার কাছেই থাকবে।"

উদ্বেগকণ্ঠে কিরণ বলিয়া উঠিল, "কিন্তু আপনি কি বলছেন তা আপনি জানেন না।"

এবারও বহু কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া আমি কহিলাম, "কি বলছি তা আমি বেশ জানি। তুমি কি আমাকে এতই হীন মনে কর যে, তোমার মায়ের মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে দাঁড়িয়ে আমি যে ভার গ্রহণ করেছিলাম, এখন তাহা টেনে ফেলে দেব? তবে তুমি যদি আমাকে অনাবশ্যক মনে কর, বুঝব সেটি আমারই দুর্ভাগ্য।"

এত চেষ্টায়ও কণ্ঠস্বর ঠিক রাখিতে পারিলাম না। শেষ কথাটি বলিবার সময় রুদ্ধ আবেগে গলা কাঁপিয়া উঠিল। আমি কিরণের হাত ধরিয়াছিলাম, স্পষ্ট অনুভব করিলাম, সেও স্থির নাই; একটি প্রবল মানসিক উত্তেজনায় তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিতেছে। সে তাড়াতাড়ি আমার হাত ছাড়াইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "কিন্তু আপনি ত

এখনও ম'ার সেই কাগজখানা পড়েন নাই। আগে সেটি পড়ুন—তারপর যা বল্‌বার হয় বলবেন।"

তাহার এই আকস্মিক উত্তেজনা ও কম্পিত কণ্ঠস্বরে, আশায় ও আনন্দে আমার বুক নাচিয়া উঠিল। বুঝিলাম, আমার ভালবাসা ব্যর্থ হয় নাই। আমি আর স্রোতের বেগ রোধ করিতে পারিলাম না। চেষ্টাও করিলাম না। বলিলাম, "সেই কাগজে যাহাই লেখা থা'ক্ না কেন, জেনো তোমাকে ছাড়া আমার গতি নাই।"

আর্ত্তকণ্ঠে "হা ভগবান্" বলিয়াই কিরণ কাঁপিতে কাঁপিতে বিছানার উপর মাথা গুঁজিয়া বসিয়া পড়িল। একটি গুরু আশঙ্কায় আমি আবার অস্থির হইয়া উঠিলাম। ব্যাকুলভাবে তাহার একখানি হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমায় মাপ কর কিরণ। যদি তোমার মনে কোন কষ্ট দিয়ে থাকি, তবে আমার মনের দিকে চেয়ে আমাকে ক্ষমা করো। এতদিন চেপে ছিলাম, আজ হঠাৎ বের হ'য়ে পড়্‌ল। কিন্তু জেনো, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজই আমি করব না।"

মাথা না তুলিয়াই কিরণ উত্তর করিল, "আপনি আমার মনের কথা ঠিক বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না, বুঝাবার ক্ষমতাও আমার নাই; কিন্তু আর কোন কথা বল্‌বার আগে আপনি সেই কাগজখানা পড়ুন। এই চাবি নিন্—বাক্সের মধ্যে উপরেই পাবেন। আগে সেটি পড়ুন;—তারপর—তারপর সব বিবেচনা ক'রে যা কর্‌বার হয় কর্‌বেন। কিন্তু আপনার কাছে আমার একমাত্র প্রার্থনা, নিতান্ত নির্দ্দয় হবেন না, অন্ততঃ আপনার অনুকম্পাটুকু থেকেও বঞ্চিত করবেন না।"

একটি অনিশ্চিত আশঙ্কায় আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি বাক্স খুলিয়া কাগজখানা বাহির করিলাম। সামান্য কয়েকটি মাত্র লাইন। কিন্তু এই সামান্য কয়েকটি লাইনই আমার চিরজীবনের শান্তিনাশের পক্ষে যথেষ্ট। লেখা ছিল, "গণিকার ঘরে জন্মিলেও এক করুণাময় দেবতা আমাকে নরকের পঙ্কিল আবর্ত্ত থেকে টেনে তুলেছিলেন। কিরণ আমার তাঁরই পবিত্র, অপাপবিদ্ধ, স্মৃতিচিহ্ন। কোথায়ও কি সে আশ্রয় পাবে না?"

সহসা বিরাট ভূমিকম্পে সমস্ত পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল। আমি মাতালের মত টলিতে টলিতে বিছানার উপর মাথা ধরিয়া বসিয়া পড়িলাম।

তারপর কিছুক্ষণের কথা আমার মনে নাই। যখন বুঝিবার ক্ষমতা ফিরিয়া আসিল তখন দেখিলাম, আমি শুইয়া আছি, আর কিরণ উদ্বেগব্যাকুল নয়নে আমার শিয়রে বসিয়া মাথায় জল ও বাতাস দিতেছে।

আমার জ্ঞান ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া সে আস্তে আস্তে বিছানা হইতে নামিয়া দাঁড়াইল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া "আমায় ভাব্‌তে দেও" বলিয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে বাসায় চলিয়া আসিলাম।

(৫)

সমস্তদিন যে কি ভাবে কাটিল তাহা এক অন্তর্য্যামীই জানেন। যে সুন্দর, সুরভি কুসুমকোরকটি এতদিন ধরিয়া এত যত্নে পূর্ণ যৌবনের সমস্ত আবেগ দিয়া অভিনন্দিত করিয়া আসিতেছিলাম, আজ তাহা কোন্ নির্ম্মম হস্তের কঠোরস্পর্শে এভাবে দলিত, নিষ্পেষিত হইয়া গেল! উচ্ছ্বল আবেগের সুখকল্পনায়, এতদিন ধরিয়া শূন্যে যে অপূর্ব্ব নন্দনকানন রচনা করিয়া আসিতেছিলাম, আজ তাহা কোন্ প্রলয়-ঝঞ্ঝাবাতে এভাবে অকালে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল! আমার আশামুগ্ধ, তৃষিত দৃষ্টির যে ছায়াশীতল, নির্ঝরস্নিগ্ধ স্বর্গরাজ্য ভাসিয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহা শ্রান্ত, তৃষ্ণার্ত্ত মরুযাত্রীর চক্ষুর সম্মুখ হইতে মরীচিকার মত কোন্ শূন্যে মিলাইয়া গেল!

কিন্তু পরদিন নিদ্রাভঙ্গে দেখিলাম, আমার পূর্ব্বদিনকার বুকের বোঝা অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। কে যেন আসিয়া আমার কাণে কাণে আশার বাণী শুনাইতে লাগিল। আমার মনে হইল, আমি এত হতাশ হইতেছি কেন? সবই ত ঠিক সেই আছে। আমি কেন তবে বৃথা এ দুশ্চিন্তায় জ্বলিয়া মরিতেছি! পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত নাই! পতিতা কি চিরকালই পতিতা? আমি ত তাঁহাকে দেখিয়াছি, এবং দেখিয়াছি বলিয়াই তিনি যে কখনও সজ্ঞানে কোন পাপ করিতে পারেন তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না। তবে জন্মগত সংস্কারান্ধতার সময় তিনি যাহাই করিয়া থাকুন, জীবনব্যাপী তীব্র আত্মগ্লানি ও কঠোর ব্রহ্মচর্য্যেও কি তাঁহার ক্ষালন হয় নাই?

আর কিরণ! সে ত সম্পূর্ণ অপাপবিদ্ধ, পবিত্র অনাঘ্রাতকুসুমের মত নির্ম্মল, জন্মগত পাপ যদি বিধাতার চক্ষে প্রকৃতই পাপ বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে সে পাপ ত

তাহার এই জীবনব্যাপী লজ্জা ও ঘৃণার দ্বারাই শুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। যদি তাহা নাও হইয়া থাকে, তবু আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। কত কষ্ট, কত মর্ম্মপীড়ার মধ্য দিয়া যে পবিত্রতা সে লাভ করিয়াছে, সমাজের অত্যাচারে, মানুষের নির্ম্মলতায় সে পবিত্রতা কি সে হারাইয়া ফেলিবে? আত্মীয়বন্ধুহীনা, যৌবনোন্মুখী এই কিশোরীকে যদি হিংস্রপশুস্বভাব মনুষ্যসমাজের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া যায় তবে কি সে তাহার এই বহু কষ্টলব্ধ পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারিবে? যদি না পারে তবে সে জন্য দায়ী কে হইবে? সকল বিচারকের উপর যিনি বিচারক, তাঁহার কাছে সে জন্য কে জবাবদিহি করিবে? সে নিজে—না সংসার—না আমি?

না, আমি কিরণকে পরিত্যাগ করিব না। সমাজ যদি এজন্য আমাকে পরিত্যাগ করে, সংসার যদি এজন্য অঙ্গুলি নির্দ্দেশে জগতের কাছে আমাকে কলঙ্কিত বলিয়া প্রচার করে, তবু আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। মানুষের নিন্দা বিদ্রূপের ভয়ে আমি পরকালে ভগবানের কাছে অপরাধী হইতে পারিব না,—ইহকালেও দুইটি জীবন এ ভাবে ব্যর্থ হইতে দিব না।

কিরণকে সে কথা জানাইতেই সে কিছুক্ষণ স্তব্ধের মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আমি বুঝিলাম, তাহার প্রাণের মধ্যে কি একটা প্রবল ঝড় বহিতেছে; কিন্তু সে ঝড় আনন্দের কি দ্বিধার তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমি বলিতে লাগিলাম, "শুধু তোমার মা'র মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে দাঁড়িয়ে কথা দিয়েছি বলেই যে আমার এই সঙ্কল্প তা মনে ক'রো না। আমার নিজের জন্যই আমি তোমাকে ছাড়তে পারি না।"

সহসা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া কিরণ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কথা আমি ভাল বুঝতে পার্‌ছি না।"

আমি তাহার আতঙ্কের কারণ বুঝিলাম। বুঝিয়া আনন্দে ও তাহার প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মন পূর্ণ হইয়া উঠিল। আমি উত্তর করিলাম "আমি তোমাকে বিয়ে করব।"

কাঁপিতে কাঁপিতে কিরণ আমার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "না না, তা' হ'তে পারে না।"

মুহূর্ত্তের জন্য সন্দেহের ঘনছায়া আমার মনের সমস্ত উল্লাস অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তবে কি আমি এতদিন একটি ভুলধারণা লইয়া এ শূন্যোদ্যান রচনা করিয়া আসিয়াছি? উদ্বেগাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন হ'তে পারে না কিরণ? তবে কি বুঝ্‌ব তুমি আমাকে চাও না?"

কিরণ তাহার সজল চক্ষু দুটি আমার মুখের উপর রাখিয়া কাতরকণ্ঠে উত্তর করিল, "আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনি ছাড়া আমার আর এ সংসারে কেউ নাই। সেই আপনিই যদি আমাকে ভুল বুঝেন তবে আমার যে আর গতি নাই।"

আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার কথার অর্থ আমি বুঝি না। তুমি কেন আমার হ'তে পারবে না?"

কিরণ উত্তর করিল, "আমার জন্য আপনাকে আমি লোকের কাছে কলঙ্কের ভাগী হ'তে দেব না।"

আমার বুক হইতে সন্দেহের কালোমেঘ অপসারিত হইয়া সেখানে আনন্দের উজ্জ্বলজ্যোতি প্রকাশিত হইল, আমি উত্তর করিলাম, "অসার কলঙ্কের জন্য আমি তোমাকে পরিত্যাগ করব, তুমি কি আমায় এতই অপদার্থ মনে কর?"

কিরণ কহিল, "কিন্তু আপনি সব দিক ভেবে দেখ্‌ছেন না। আমাকে গ্রহণ করলে আপনি সমাজে একঘরে হয়ে থাকবেন। আপনার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সব আপনাকে দেখলে ঘৃণার সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে। সে আঘাত আপনি সহ্য করতে পারবেন কি?"

আমি বলিলাম, "অনায়াসে পারব সমাজ যদি বিনাদোষে আমাকে পরিত্যাগ করে তবে আমার তা'তে কোনই হাত নাই। আত্মীয়স্বজনের মধ্যে আমার এক ছোট বোন—তারও বিয়ে হয়েছে। কাজেই সমাজকে ভয় করে চলবার আমার কোনই দরকার নাই। আর বন্ধু-বিচ্ছেদ? তুমিই আমার সে অভাব পূর্ণ করবে। মিথ্যা আশঙ্কায় তুমি আজীবন ক্লেশ বরণ করে নিও না, আর আমারও জীবন মরুভূমি করে দিও না।"

সহসা তাহার কোমল হস্তদ্বয়ে আমার পাদুখানি জড়াইয়া ধরিয়া আর্ত্তকণ্ঠে কিরণ বলিয়া উঠিল, "আমাকে ক্ষমা করুন। আমি রমণী, স্বভাবতঃই দুর্ব্বল। প্রলোভন

দেখিয়ে আমাকে আমার কর্ত্তব্যপথ থেকে বিচ্যুত করবেন না। আমি চিরদুঃখিনী—দুঃখ যত বড়ই হোক্, আমি সহ্য করতে পারব। কিন্তু আমাকে গ্রহণ করলে যে কলঙ্কের বোঝা আপনার মাথায় চাপবে, তা' আপনি সহ্য করতে পারবেন না। পারলেও, আমারই জন্য আপনার সে কষ্ট জেনে দিবারাত্র আমি অনুতাপের আগুনে জ্বলে পুড়ে মরব। সে জ্বালার তুলনায় বর্ত্তমানের জ্বালা অনেক ভাল। আমাকে দয়া করে ভালবেসেছেন—এর বেশী সুখ আমি চাই না। এ পোড়া অদৃষ্টে এর বেশী সুখ সহ্যও হ'বে না। আমার জীবন সার্থক হয়েছে, সে সার্থকতার পূর্ণানন্দ থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না।"

সংসার-স্নেহবঞ্চিতা, জন্মদুঃখিনী, কুসুমকোমলা বালিকার এ কি মহান্ আত্মত্যাগ! বুভুক্ষু হৃদয়ের পূর্ণক্ষুধা লইয়া মুখের সম্মুখ হইতে স্বর্গের অমৃতভাণ্ড এ ভাবে ফিরাইয়া দিতে পারে—এ বালিকা কে? কুসুমপেলব বালিকাদেহে বজ্র হইতেও কঠোর, নিয়তি হইতেও নির্ম্মম হৃদয় লইয়া—এ বালিকা কে?

কিন্তু কিরণের কথায় যতই মুগ্ধ হইতেছিলাম, ততই তাহাকে পাইবার জন্য একটু আকুল পিপাসা আমাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল। ধীরে ধীরে তাহাকে তুলিয়া, তাহার কোমল হাত দুখানি আপনার কম্পিত হস্তমধ্যে আবদ্ধ করিয়া কহিলাম, "কিন্তু তোমাকে না পেলে আমার দশা কি হবে তা ও কি ভেবে দেখেছ কিরণ?"

অপেক্ষাকৃত শান্ত কণ্ঠে কিরণ উত্তর করিল, "আপনি বিয়ে করুন। নূতন স্নেহের বন্ধনে আপনার মন কিছু দিনের মধ্যেই আবার ঠিক হ'য়ে আসবে।"

অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে আমি উত্তর করিলাম, "বেশ, আমি না হয় তাই করলাম। কিন্তু তোমার দশা কি হ'বে?"

মুহূর্ত্তের জন্য যেন কিরণের সমস্ত দেহ কাঁপিয়া উঠিল, কণ্ঠস্বর রোধ হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মসম্বরণ করিয়া উত্তর করিল, "মা আমাকে আপনার আশ্রয়ে রেখে গিয়েছেন,—আপনার আশ্রয় ছাড়া আমার গতি নাই। আপনার সংসারে দাসীর প্রয়োজন হ'বে,—আমাকে দাসীরূপে নিতে আপনার কি আপনার স্ত্রীর বোধ হয় আপত্তি হ'বে না।"

মনে হইল কে যেন আমার বুকে বিষাক্ত শেলাঘাত করিল। আকুলকণ্ঠে বলিলাম, "না না এ নিষ্ঠুর আদেশ তুমি করো না। তোমাকেই আমি চাই।"

কিরণ কি বলিতে যাইতেছিল, আত্মসম্বরণ করিয়া গম্ভীরভাবে কি চিন্তা করিয়া, সংযতকণ্ঠে উত্তর করিল, "কিন্তু একটি বিষয় আপনি ভেবে দেখছেন কি? যে কলঙ্কের ছাপ কপালে নিয়ে আমার এই শাস্তি, আমাকে বিয়ে করে আপনার সন্তানের কপালেও কি সেই ছাপ দিয়ে তার সমস্ত জীবন অভিশপ্ত করে দিবেন?"

এ কি কথা? এই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত অতর্কিত আঘাতে আমার সমস্ত বাক্‌শক্তি লোপ পাইয়া গেল। অদৃষ্টের একি কঠোর পরিহাস! নিয়তির এ কি নির্ম্মম বিধান! মুহূর্ত্তের জন্যও এতদিন এ কথা আমার মনে হয় নাই। যে কষ্ট, যে অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য আজ আমি সংসারকে তুচ্ছ করিতে যাইতেছি, সেই কষ্ট ও বেদনার ভার আমি কোন্ হিসাবে আমারই ভবিষ্যৎ সন্তানের মাথায় চাপাইয়া দিব? সে যদি সংসারকে তুচ্ছ করিতে না পারিয়া, তাহার সমস্ত লজ্জা ও লাঞ্ছনার জন্য আমাকেই দায়ী করে, তাহার লাঞ্ছিত হৃদয়ের তীব্র আক্রোশে সে যদি আমাকেই তাহার প্রধান শত্রু বলিয়া মনে করে, তবে কে তাহাকে দোষ দিবে? কে তখন তাহার সে দগ্ধপ্রাণে মুহূর্ত্তের জন্যও শান্তির স্নিগ্ধপ্রলেপ আনিয়া দিবে? হায়! এ যে বড় কঠোর, বড় তিক্ত, ধ্রুব, সত্য।

তবে আর কেন? এক শুভ্রশারদ জ্যোৎস্নায় প্রকৃতির মুখে যে স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য দেখিয়া পাগলের মত ছুটিয়া চলিয়াছিলাম, ঘোর অমানিশা আসিয়া সে সৌন্দর্য্য ঢাকিয়া ফেলুক;—উচ্ছল আবেগের মোহমাদকতায় যে আকাশ-কুসুম আমার মুগ্ধচক্ষুর সম্মুখে বাসনার স্ফুলিঙ্গের মত ফুটিয়া উঠিয়াছিল, প্রলয়ের ঝড় আসিয়া তাহা উড়াইয়া নিক;—নবপ্রণয়ের সুখস্বপ্নঘোরে ভাবীজীবনের যে স্বর্গরাজ্য সৃষ্টি করিয়া আসিতেছিলাম, একটি বিরাট ভূমিকম্পে তাহা ভূমিসাৎ হইয়া যা'ক্;—যে যাদু-করের যাদুদণ্ডস্পর্শে সংসারের এই শোকদুঃখান্ধকার, কণ্টকাবৃত, কুটিলপথও আমার নিকট সুখশান্তিপূর্ণ হিমকরোজ্জল, কুসুমস্নিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, বিধাতার কঠোর অভিশাপ আসিয়া তাহার সমস্ত মোহজাল ছিন্ন করিয়া দিক্!

আমি কাতরকণ্ঠে কহিলাম, "তবে তাই হোক্ কিরণ! ইহকালে তোমাকে পাব না, পরকালের অপেক্ষায়ই বুক বেঁধে থাক্‌ব। সংসারের অবিচার, অত্যাচার সেখানে আমাদিগকে স্পর্শ করতে পারবে না। লোকনিন্দা, ভবিষ্যৎ চিন্তা সেখানে আমাদের অনন্তমিলনের পথে বাধা দিবে না। কিন্তু তুমি আমাকে বিয়ে করতে বলো না। যে মানস-প্রতিমার পুজায় আমার সমস্ত প্রাণ আনন্দমুখরিত হ'য়ে উঠেছে, আজ তা'কে বিসর্জ্জন দিয়ে সেখানে অন্য প্রতিমার ঘট স্থাপন করতে আদেশ করো না। যে সুরভি-কুসুমের মধুর গন্ধে আমার সমস্ত জীবন কেবল ঘ্রাণময় হয়ে উঠেছে, আজ তাহা নিজহস্তে নিষ্পেষিত করে নূতন সুবাসের মোহে ছুটে বেড়াতে বলো না।"

অশ্রুবিগলিতকণ্ঠে কিরণ উত্তর করিল, "তবে তাই হোক্; যেখানে হোক্, আপনার আশ্রয়ে একটু স্থান দিবেন। নিজের জন্য আমার কোনই দুঃখ নাই। বিধাতার দেওয়া কলঙ্কের ছাপ যে এতদিন নীরবে বহন করে এসেছি, মানুষের দেওয়া কলঙ্ক তার আর কি করবে? কিন্তু আপনাকেও যে আমার জন্য কলঙ্কের পসরা মাথায় করে নিতে হ'বে, সমাজের কলুষিত রসনা যে আপনার নামেও চতুর্দ্দিকে কলঙ্ক ঘোষণা করে বেড়াবে, সে দুঃখ রাখবার আমার স্থান নাই। তবু ইহকালের যাই হ'ক পরকালের আশায় এ জ্বালাও আমি নীরবে সহ্য করব। যে কলঙ্করেখা আমাদের দু'জনের মধ্যে বিরাট অভিশাপেরমত এসে দাঁড়িয়েছে, দেখি জীবন- ব্যাপী প্রায়শ্চিত্তেও তাহা মুছে যায় কিনা।"

তারপর—তারপর সুদীর্ঘ ছয়টি বৎসর ধরিয়া সংসারের শত চিন্তা, শত ব্যাকুলতার মধ্যে আমি এই ফুটনোন্মুখী কিশোরীতে নারীত্বের যে পূর্ণবিকাশ দেখিতে পাইয়াছিলাম তাহা সম্পূর্ণই অপূর্ব্ব। দগ্ধহৃদয়ের অসহ্য জ্বালায় অস্থির হইয়া যখনই ছটফট করিয়াছি তখনই তাহার শান্তিহস্তের স্নিগ্ধপরশে আমার সে জ্বালার নিবৃত্তি হইয়াছে। জগদ্‌যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইয়া যখনই আমি হতাশপ্রাণে পরাভব স্বীকার করিতে উদ্যত হইয়াছি, তখনই তাহার প্রেমপূর্ণ আশ্বাস-বাণী আমার প্রাণে নূতন উৎসাহের সৃষ্টি করিয়াছে,— সংসারের অত্যাচারে, অবিচারে ক্রোধান্ধ হইয়া যখনই আমি সমাজকে প্রতিশোধ দিবার জন্য ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছি, তখনই মূর্ত্তিমতী ক্ষমারূপে সে আমার সম্মুখে আসিয়া আমার সমস্ত উত্তেজনা শান্ত করিয়া দিয়াছে। সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে ধ্রুবতারার মত সে সর্ব্বদা আমাকে এই ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ অন্ধকার পথে পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছে।

তারপর একদিন সহসা এই স্বর্গের ফুল মর্ত্ত্যের কলুষিত বায়ুস্পর্শে মলিন হইয়া ঝরিয়া পড়িল। জগতের আলো আমার চোখে নিভিয়া গেল। খরমধ্যাহ্নে রাহু আসিয়া আমার জীবনাকাশ অন্ধকার করিয়া দিল। সে অন্ধকার ভেদ করিয়া কবে আবার তাহার স্নিগ্ধজ্যোতি ফুটিয়া উঠিবে? ইহজীবনের সমস্ত সাধ মিটিয়াছে, পরজীবনের আশায় বুক বাঁধিয়া বসিয়া আছি। সে আশা কবে মিটিবে?

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দে সরকার।

শাসন-সংস্কার-আইন

ভারতের শাসন-প্রণালী-সংস্কার-বিষয়ক আইন গত ১৯১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে বিলাতের মহাসভায় পাশ হইয়াছে। গত ১৯১৫ সনে ভারত-শাসন-সংস্কার-বিষয়ক একটি আইন পাশ হয়। এই আইন পাশ হইবার সময়ে ভারতবর্ষের শাসন-সংক্রান্ত বিষয় ১৭৭০ সন হইতে ১৯১২ সন অবধি বিভিন্ন সময়ের ৪৭টি আইনের মধ্যে সন্নিবেশিত ছিল। ১৯১৫ সনের আইনে এই ৪৭টি আইনের বিক্ষিপ্ত বিষয়গুলি শৃঙ্খলার সহিত সন্নিবেশিত করা হয় এবং পূর্ব্ব প্রচলিত ৪৭টি আইন এক প্রকার রদ করা হয়। অতঃপর ১৯১৬ সনে পুনরায় ভারত-শাসন-সংস্কার-বিষয়ক একটি আইন পাশ হয়, উহা দ্বারা ১৯১৫ সনের আইনের কতক কতক অংশ পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন করা হয় মাত্র। বর্ত্তমান ১৯১৯ সনের আইনে শাসন-প্রণালী-সংক্রান্ত অনেক নূতন ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং তদনুযায়ী ১৯১৫ ও ১৯১৬ সনের আইন দুইটির অনেক অংশ পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের শাসন-প্রণালীসংক্রান্ত বিষয়

১৯১৫-১৯১৬-ও ১৯১৯ সনের তিনটি আইনে সন্নিবেশিত আছে।

যাঁহারা ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ, অথচ আইনের ভাষার সহিত সুপরিচিত নহেন, তাঁহাদিগের পক্ষেও এই তিনখানি আইন একযোগে মিলাইয়া মর্ম্মোদ্ধার করা কঠিন। আর ইংরেজী অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে এই আইনের মর্ম্ম অবগত হওয়া বর্ত্তমানে এক প্রকার অসম্ভব; কারণ বাঙ্গালায় এ পর্য্যন্ত এ সকল আইনের কোনও প্রকার অনুবাদ দেখিতে পাই নাই। এদিকে শাসন-সংস্কারের নূতন ব্যবস্থা সত্বরই দেশে প্রচলিত হইবে। আগামী কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ মাসে নূতন ব্যবস্থাপক সভাসমূহের নির্ব্বাচনকার্য্য শেষ হইবার কথা। এক বাঙ্গালা প্রদেশে প্রায় ১৫ লক্ষ ব্যক্তি এই প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনকার্য্যে ভোট দেওয়ার অধিকার পাইবেন।

অতএব এ সময়ে দেশের শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই যদি নূতন আইনের মর্ম্ম অবগত হইয়া নিরক্ষর ভোটারদিগকে এ বিষয় বুঝাইয়া দিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলেই ভোটদাতাগণ সকলে কতক পরিমাণে নিজ নিজ দায়িত্ব বুঝিয়া নির্ব্বাচন কার্য্যে যোগদান করিতে পারিবেন।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে, যাহাতে ইংরেজী অনভিজ্ঞ পাঠকগণ সহজে বুঝিতে পারেন এইরূপ সরল ভাষায় শাসনসংস্কার আইনের স্থূল মর্ম্ম আলোচনা করা হইল।

নূতন আইন।

নূতন আইনে সাধারণ নীতির আকারে মূল বিষয় গুলি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং ঐ সকল নীতি অনুযায়ী শাসন-যন্ত্রের বিশিষ্ট পরিবর্ত্তন কি হইবে তাহা পরে সময়ে সময়ে বিশেষ বিধি প্রণয়ন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই বিশেষ বিধি সকল প্রথমতঃ ভারত-সরকার নির্দ্দেশ করিবেন, তারপর উহা বিলাতে ভারত-সচিব কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে পরিগৃহীত হইবে। এই প্রকারে প্রণীত বিধি সকল বিলাতের মহাসভায় দপ্তরে পাঠান হইবে এবং কোনও সভা ইচ্ছা করিলে এক মাসের মধ্যে ঐ সকল বিধি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া যে কোনও মন্তব্য পাশ করিতে পারিবেন এবং তদনুযায়ী উহা পরিবর্ত্তিত হইবে। বিধিপ্রণয়নসম্বন্ধে বর্ত্তমান আইনের সাধারণ ব্যবস্থা এইরূপ।

বিশেষ বিধি।

নূতন আইনে রাজকার্য্যের বিষয় সমূহ কেন্দ্রীয় বিষয় বা ভারত-সরকারের অনুষ্ঠেয় বিষয় এবং প্রাদেশিক বিষয় বা প্রাদেশিক সরকারের অনুষ্ঠেয় বিষয়, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু কোন্ বিশিষ্ট বিষয় কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত তাহা নির্দ্দিষ্ট হইবে, পরে বিশেষ বিধি দ্বারা।

প্রাদেশিক বিষয় সকল আবার সংরক্ষিত ও সমর্পিত—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। সংরক্ষিত বিষয় সকল প্রায় পূর্ব্ববৎ প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তা ও তাঁহার কাউন্সেলের সভ্যগণের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে। আর সমর্পিত বিষয় সকল নূতন আইন অনুযায়ী নির্ব্বাচিত মন্ত্রিগণের সাহায্যে অনুষ্ঠিত হইবে। এ সম্বন্ধেও কোন্ বিশিষ্ট বিষয় কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত তাহা বিশেষ বিধি দ্বারা পরে নির্দ্দিষ্ট হইবার ব্যবস্থা।

প্রাদেশিক বিষয়ের মধ্যে সংরক্ষিত বিষয়সম্বন্ধে ভারত-সরকারের প্রভুত্ব পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ থাকিবে। তবে সমর্পিত বিষয় সম্বন্ধে ভারত-সরকার পূর্ব্ববৎ কর্ত্তৃত্ব পরিচালনা করিবেন না, কিন্তু কিরূপ ভাবে এই কর্ত্তৃত্ব পরিচালনা করিবেন তাহা বিশেষ বিধিদ্বারা পরে নির্দ্দিষ্ট হইবে।

প্রাদেশিক বিষয় সম্বন্ধে প্রয়োজন অনুসারে প্রাদেশিক সরকারকে টাকা কর্জ্জ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু কিরূপ অবস্থায় ও কি সর্ত্তে এইরূপ কর্জ্জ করিতে পারিবেন তাহা পরে বিশেষ বিধি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইবে।

অতএব দেখা যাইতেছে, নূতন শাসন প্রণালী কার্য্যতঃ কিরূপ আকার ধারণ করিবে এবং তাহা কি পরিমাণে ভারতবাসিগণের রাজনৈতিক অধিকার প্রসারিত করিবে এ সকলই বিশেষরূপে বিশেষ বিধি প্রণয়নের উপর নির্ভর করিতেছে।

বিধিপ্রণয়নদ্বারা কোনও গুরুতর বিষয়ের আইনের বিশিষ্ট আকার নির্দ্দেশ ও সাময়িক পরিবর্ত্তন করিবার ব্যবস্থা নানা কারণে বিশেষ আপত্তিজনক। মূল আইন পাশ করিবার ক্ষমতা বিলাতের মহাসভার। কোনও আইন পাশ করিবার সময় তাহা বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া মহাসভাকর্ত্তৃক পাশ হয়। একবার এইরূপে কোনও আইন পাশ হইলে তাহা পরিবর্ত্তন করাও বেশ সুকঠিন। কিন্তু বিশেষ বিধি নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতা ভারত-সরকারের

উপর ন্যস্ত, বিলাতের ভারত-সচিব অনুমোদন করিলেই এক প্রকার এই বিশেষ বিধি সকল চূড়ান্ত আকার ধারণ করিবে। অতএব মহাসভার আইন অপেক্ষা এইরূপ বিধি সকল অনায়াসে এবং সহজেই পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে। এই সকল বিধি নির্দ্দেশসম্বন্ধে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাকে কোনও অধিকার দেওয়া হয় নাই। তাহা না করিয়া শাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিবর্গের হস্তে ব্যবস্থা প্রণয়নের এরূপ গুরুতর ক্ষমতা অর্পণ করা বিশেষ প্রকারে নীতিবিরুদ্ধ হইয়াছে।

প্রাদেশিক সরকার।

কোন দেশের রাজকার্য্যসমূহ প্রধানতঃ শাসন বিভাগ, ব্যবস্থা বিভাগ, বিচার বিভাগ এই তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।

প্রাদেশিক শাসন বিভাগ :—এই বিভাগের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তা থাকিবেন একজন গভর্ণর। সংরক্ষিত বিষয়সংক্রান্ত শাসনকার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য একটি কাউন্সিল বা অমাত্যসভা থাকিবে। সমর্পিত বিষয়-সংক্রান্ত শাসন কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য কয়েক জন মন্ত্রী নিযুক্ত হইবেন।

সম্রাট বিশেষ নিয়োগপত্র দ্বারা প্রাদেশিক অমাত্যসভার অমাত্যদিকে নিযুক্ত করিবেন; কাজেই ইঁহাদিগকে কার্য্য হইতে অপসরণ করিতে হইলেও সম্রাটের বিশিষ্ট আদেশ প্রয়োজন। প্রাদেশিক গভর্ণর নিজ ইচ্ছানুযায়ী মন্ত্রিগণকে নিযুক্ত বা বরখাস্ত করিতে পারিবেন। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচিত সভ্যদিগের মধ্য হইতে এইরূপ মন্ত্রী নির্ব্বাচন করিতে হইবে; অন্যথায় নির্ব্বাচিত ব্যক্তি ছয় মাসের মধ্যে যদি ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচিত সভ্য হইতে না পারেন, তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইবে।

সংরক্ষিত বিষয়সংক্রান্ত শাসনকার্য্য অমাত্যসভার বৈঠকে মীমাংসিত হইবে। এই সভার অধিকাংশ সভ্যের মতানুযায়ী চলিতে গভর্ণর সাধারণতঃ বাধ্য থাকিবেন। তবে কোনও বিষয়ে, দেশের শান্তি ও কল্যাণের জন্য প্রয়োজন বোধ করিলে, গভর্ণর অমাত্যসভার অধিকাংশ সভ্যের মতের বিরুদ্ধে নিজ দায়িত্বে নিজ মতানুযায়ী কার্য্য করিতে পারেন।

সমর্পিত বিষয়সংক্রান্ত শাসনকার্য্যসম্বন্ধে গভর্ণর মন্ত্রিগণের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিবেন। কোনও বিষয়ে এই পরামর্শ সঙ্গত মনে না করিলে গভর্ণর ইচ্ছানুযায়ী ব্যবস্থা করিতে পারেন।

উল্লিখিত বিধান কয়েকটি আলোচনা করিলেই অমাত্য ও মন্ত্রিগণের নিয়োগ ও ক্ষমতা সম্বন্ধে যে বিশেষ পার্থক্য করা হইয়াছে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

ব্যবস্থাপক সভা :—

(ক) গঠন প্রণালী :—গভর্ণরশাসিত প্রত্যেক প্রদেশে একটি ব্যবস্থাপক সভা থাকিবে। ইহাতে তিন শ্রেণীর সভ্য থাকিবেন (১) অমাত্য সভার সভ্যগণ (২) গভর্ণরের মনোনীত সভ্যগণ ও (৩) ভোটদ্বারা নির্ব্বাচিত সভ্যগণ। প্রত্যেক প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নূতন আইনের ১ম তপসীল নির্দ্দিষ্ট সভ্যসংখ্যা থাকিবে; তদনুযায়ী বঙ্গদেশের প্রাদেশিক সভার সভ্যসংখ্যা ১২৫ জন। প্রত্যেক সভায় শতকরা বিশজনের অধিক সরকারী কর্ম্মচারী থাকিতে পারিবে না এবং শতকরা অন্ততঃ ৭০ জন ভোট দ্বারা নির্ব্বাচিত সভ্য থাকিবে। ভোট দেওয়ার অধিকার, সভ্য নির্ব্বাচন করিবার প্রণালী প্রভৃতি বিষয় বিশেষ-বিধি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইবে।

ব্যবস্থাপক সভা প্রত্যেকবার গঠিত হইয়া তিন বৎসর পর্য্যন্ত চলিবে। গভর্ণর ইচ্ছা করিলে উহার পূর্ব্বেই সভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবেন, অথবা উহার মেয়াদ এক বৎসর পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দিতে পারিবেন। সভা ভাঙ্গার তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে গভর্ণর সভা পুনর্গঠন করিবার ব্যবস্থা করিবেন; অর্থাৎ উক্ত ছয় মাসের মধ্যে নির্ব্বাচন প্রভৃতি কার্য্য শেষ করিয়া সভার নূতন বৈঠকের আয়োজন করিবেন। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপকসভায় একজন সভাপতি নিযুক্ত হইবেন। (এ যাবৎ গভর্ণর স্বয়ং সভাপতি থাকিতেন, কিন্তু নূতন আইনে তাহা হইবে না।) প্রথম চারি বৎসর গভর্ণর এই সভাপতি নিযুক্ত করিবেন, পরে সভার নির্ব্বাচিত ব্যক্তি এই পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। নির্ব্বাচিত ব্যক্তি গভর্ণরের অনুমোদিত হওয়া চাই।

(খ) ব্যবস্থাপ্রণয়নসংক্রান্ত অধিকার :—প্রদেশের শান্তি ও সুশাসনের উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপকসভা এই আইনের বিধান অনুসারে সর্ব্ববিধ আইন প্রণয়ন করিতে পারিবেন। যে সকল আইন ভারত-সরকার কর্ত্তৃক প্রণীত

হইয়াছে বা হইবে, তাহা নিজ প্রদেশের জন্ত নিজ প্রকার বিধান অনুযায়ী পরিবর্ত্তন বা রদ করিতে পারিবেন। নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে গভর্ণর জেনারেল মহোদয়ের অনুমতি না লইয়া প্রাদেশিক সভা কোনও আইন প্রণয়ন বা তৎসম্বন্ধীয় আলোচনা করিতে পারিবেন না :—

(১) বিশেষ বিধি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট প্রাদেশিক সরকারের এলাকা বহির্ভূত—কোনও প্রকার রাজকর স্থাপন।

(২) যদ্দ্বারা ভারতের সরকারী ঋণ, অথবা ভারত-সরকার কর্ত্তৃক স্থাপিত বাণিজ্যশুল্ক কিম্বা অপর কোনও রাজকর—কোনও প্রকারে নষ্ট হইতে পারে এরূপ কোনও ব্যবস্থা।

(৩) সৈন্ত বিভাগের বিধি ব্যবস্থা ব্যয় প্রভৃতি।

(৪) ভিন্ন দেশীয় রাজন্ত বা রাজসরকারের সহিত ভারত সরকারের সম্বন্ধ।

(৫) ভারতের রাজকার্য্য সমূহের মধ্যে কেন্দ্রীয় বিষয় বা ভারত-সরকারের অনুষ্ঠেয় বিষয় বলিয়া যে সকল কার্য্য বিশেষ বিধি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইবে।

(৬) যে সকল প্রাদেশিক বিষয়ে ভারতীয় ব্যবস্থাপক-সভা কর্ত্তৃক ব্যবস্থা প্রণীত হইবে বলিয়া বিশেষ বিধি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইবে।

(৭) কোনও আইন দ্বারা ভারতসরকারের উপর ন্যস্ত কোন ক্ষমতা সম্বন্ধে।

(৮) যে সকল বর্ত্তমান আইন প্রাদেশিক সভা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন না এইরূপ নির্দ্দিষ্ট করা হইবে।

(৯) ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক যে সকল আইনে এরূপ নির্দ্দেশ থাকিবে যে, প্রাদেশিক সভা পূর্ব্বে অনুমতি না লইয়া তাহা সম্পূর্ণ বা কোনও অংশে পরিবর্ত্তন বা রদ করিতে পারিবেন না তদ্বিপরীত কোনও ব্যবস্থা।

(১০) প্রাদেশিক সভা বিলাতের মহাসভায় প্রণীত কোনও আইনের বিরুদ্ধ কোনও ব্যবস্থা করিতে পারিবেন না।

(আ) কোনও আইনের প্রস্তাব প্রাদেশিক সভায় উপস্থিত করিবার অনুমতি চাহিবার সময় অথবা উপস্থিত করিবার পর যদি গভর্ণর বিবেচনা করেন যে, প্রস্তাবিত আইন বা তাহার কোনও অংশ দ্বারা কোনও প্রদেশের শান্তিতে কোনও ব্যাঘাত হইতে পারে, তাহা হইলে গভর্ণর তন্মর্ম্মে নির্ণয়পত্র প্রচার করিয়া প্রাদেশিক সভায় উক্ত আপত্তিজনক আইন বা তাহার অংশের প্রস্তাব আলোচনা প্রভৃতি রহিত করিতে পারিবেন।

(ই) প্রাদেশিক সভায় কোনও আইনের প্রস্তাব পরিগৃহীত হইলে গভর্ণর ঐ সম্বন্ধে (১) তাঁহার সম্মতি আছে কিম্বা নাই জানাইতে পারেন, অথবা (২) ঐ প্রস্তাব সম্পূর্ণ পুনর্ব্বিবেচনা করার জন্ত, কি কি বিষয়ে পরিবর্ত্তন করা সঙ্গত এ সম্বন্ধে নিজ মতামত সহ সভায় ফেরত পাঠাইতে পারেন; অথবা (৩) বিশেষ বিধিদ্বারা নির্দ্দিষ্ট বিষয়সংক্রান্ত আইনের প্রস্তাব গভর্ণর জেনারেলের মতামতের জন্ত প্রেরণ করিতে পারেন। এ বিষয়ে ছয় মাসের মধ্যে গভর্ণর জেনারেলের সম্মতি বিজ্ঞাপিত বা অন্য কোনও ব্যবস্থা না হইলে প্রস্তাব রহিত বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঈ) উপরোক্তভাবে কোনও আইনের প্রস্তাব প্রাদেশিক সভায় পরিগৃহীত হওয়ার পর গভর্ণরের সম্মতি না পাইলে রহিত বলিয়া গণ্য হইবে। তাঁহার সম্মতি পাইলে তৎপর গভর্ণর জেনারেলের সম্মতি পাওয়া আবশ্যক। গভর্ণর জেনারেলের সম্মতি পাইলে তবেই উক্ত প্রস্তাব আইনরূপে পরিগণিত ও বলবৎ হইবে। তদনন্তর সম্রাট ইচ্ছা করিলে উক্ত আইন রদ করিতে পারিবেন। সম্রাটের উক্ত অভিপ্রায় প্রাদেশিক সরকার অবগত হইয়া সাধারণের গোচর করিবেন। উক্ত প্রকার গোচর করিবার তারিখ হইতে উক্ত আইন রদ বলিয়া গণ্য হইবে।

(উ) সংরক্ষিত বিষয়সংক্রান্ত কোনও আইনের প্রস্তাব উপস্থিত করিবার অনুমতি যদি প্রাদেশিক সভা না দেন, অথবা ঐ সম্বন্ধীয় কোনও আইন গভর্ণরের অভিপ্রেত আকারে সভা পাশ না করেন, তাহা হইলে গভর্ণর আবশ্যক বোধ করিলে উক্ত আইন তাঁহার শাসনসংক্রান্ত দায়িত্ব পরিচালনা করিবার জন্ত প্রয়োজন, এই মর্ম্মে নির্ণয়পত্র প্রচার করিয়া পাশ করিতে পারিবেন।

এই প্রকারে প্রণীত আইন গভর্ণর জেনারেলের নিকট প্রেরিত হইবে, তিনি উহা সম্রাটের আদেশের জন্ত পাঠাইবেন এবং সম্রাটের সম্মতি বিজ্ঞাপিত হইলে উহা বলবৎ হইবে। তবে যদি গভর্ণর জেনারেল মনে করেন যে, বিশেষ গুরুতর কারণে বিলম্ব করা সঙ্গত হইবে না, তাহা হইলে সম্রাটের সম্মতির প্রতীক্ষা না করিয়াও তিনি এইরূপ আইন মঞ্জুর

করিতে পারিবেন ও তদনন্তর উহা বলবৎ হইবে। পরে সম্রাট ইচ্ছা করিলে উক্ত আইন রহিত হইবে। সম্রাটের সম্মতির জন্য এইরূপ কোনও আইন পেশ করিবার অন্ততঃ আশী দিন পূর্ব্বে প্রস্তাবিত আইন বিলাতের মহাসভার দপ্তরে উপস্থিত করিতে হইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মজুমদার।

"অশ্রুময়"

অশ্রুময় রায় বিকালের আফিস্ ট্রেণে বাড়ী ফিরিতেছিল। প্রায় তিনমাসের উপর সে কলিকাতায় চাকরীর চেষ্টায় আসিয়াছে। ক্রমাগত নানা আফিসে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যখন সে একেবারেই হতাশ হইয়া পড়িতেছিল, ঠিক্ তখনই হঠাৎ একদিন, দেবতার নিকট প্রার্থিত বরলাভের মতই, একটা সওদাগরী আফিসে চল্লিশ টাকা বেতনের কেরাণীগিরিতে বহাল হইল।

বাড়ীতে জননী ও একমাত্র ভগিনী ছিলেন। সুতরাং এই আনন্দসংবাদ তাঁহাদিগকে প্রদান করিবার জন্য তাহার প্রাণ স্বতঃই চঞ্চল হইবার কথা। পত্র লিখিলেও চলিত, কিন্তু কাছে যাইয়া জননীর আশীর্ব্বাদ লাভের লোভটুকু সে ছাড়িতে পারিল না। আর ভগিনী কল্যাণীর স্নেহাভিনন্দন সে কল্পনাবলেই অনুভব করিয়া পুলকিত হইয়া উঠিতেছিল।

বিপুলবেগে ট্রেণ ছুটিয়া চলিয়াছে; তবু অশ্রুময় অস্থির হইয়া উঠিতেছিল;—কখন সে বাড়ী পৌছিয়া কল্যাণীকে ডাকিবে, কখন জননীকে প্রণাম করিবে! ট্রেণের গতি যদি তাহার হৃদয়ের গতির অনুযায়ী হইত, তাহা হইলে সে বোধ হয় এতটা অস্থিরতা অনুভব করিত না!

তাহার তরুণ মুখকান্তি উৎসাহে, আনন্দে দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। বার বার সে জানালার ফাঁক দিয়া বাহিরের দিকে চাহিতেছিল। সান্ধ্য সূর্য্যের কোমল রক্তিমাভা তাহার মুখের উপর পড়িয়া, মুখখানিকে এক অনির্ব্বচনীয় গরিমায় উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল।

কৈশোর তখনও এই সুন্দর মুখখানির অধিকারীকে একেবারে ত্যাগ করিয়া যায় নাই;—তাহার চঞ্চলতার মধ্যে, তাহার চোখের কৌতুহলদীপ্তির মধ্যে কৈশোর তাহার রেশটুকু রাখিয়া গিয়াছে! তখনও যৌবন তাহার শরীরে নিজের সমস্তটুকু প্রভাব প্রকাশ করে নাই; কিন্তু যেটুকু করিয়াছে, তাহাতেই তাহার প্রত্যেক ভঙ্গিটিকে শোভন ও সংযত করিয়া তুলিয়াছে!

অশ্রুময়ের ঠিক্ পাশেই একটি যুবক উপবিষ্ট ছিল; সে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত অশ্রুময়ের চঞ্চলতা লক্ষ্য করিতেছিল। এইবার অশ্রুর অরুণরাগদীপ্ত সুন্দর মুখখানির দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"নাম?"

"অশ্রুময় রায়"—বিস্মিত দৃষ্টি প্রশ্নকর্ত্তার মুখের উপর মুহূর্ত্তের জন্য তুলিয়া ধরিয়া উত্তর দিয়া ব্যস্ত অশ্রু আবার বাহিরের দিকে চাহিল।

মুখ ফিরাইতেই যুবক মৃদু হাসিয়া কহিল, "এত ব্যস্ত যখন, তখন ঠিক্ সেই যায়গাটিতেই যাচ্ছেন, যেখানে সবি মধুর হয়ে ওঠে এবং"—

"ওর মাঝে আর 'এবং' কিছু নেই; সহজ কথায় বলতে গেলে, বাড়ী যাচ্ছি, এবং সে স্থানটা বোধ হয় কারু কাছেই কম মধুর নয়,"—বলিয়া অশ্রুময় হাসিয়া উঠিল।

তাহার সরল হাসিটুকু দেখিয়া যুবক মুগ্ধ হইল।

পথ চলিবার সময় দু'কথাতেই আত্মীয়তা সংস্থাপিত হয়। যুবক যাহার সরল হাসি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল, তাহার সহিত পরিচয়টি নিবিড় করিয়া তুলিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"বাড়ী আপনার কে কে আছেন?"

"যাকে দিয়ে শ্বশুর বাড়ী হয়, তিনি তো অন্ততঃ নেই"—ঠোট খানি দাঁতে একটু চাপিয়া, একটু হাসিয়া অশ্রুময় উত্তর দিল।

"ওঃ! তবে তো ভারি ভুল হয়ে গেছে আমার!" অশ্রুময়ের শান্ত দুই চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে কোমল স্বরে কহিল, "বাড়ী মা আর বোনটি আছেন।"

পরমুহূর্ত্তেই একটু হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "আমার একটা কথা মনে হচ্ছে,"—

"কি বলুন তো"—

"আপনি কেবলি ব্যক্তি বিশেষের খোঁজ নিচ্ছেন,—আপনার অদৃষ্টাকাশে—তিনি বুঝি নতুন দেখা দিয়েছেন"—যুবক অশ্রুময়কে কথা শেষ করিতে না দিয়াই হাসিয়া কহিল, "ঠিক হ্যালির ধূমকেতুর মত"—

অশ্রুময় একবার এদিকে ওদিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "না, ধ্রুব তারার মত!"—

উভয়েই খানিকটা হাসিয়া লইল। তখন ট্রেণ-খানি একটা বিকট দৈত্যের মতই তীব্র চীৎকার করিয়া ছুটিতেছিল। অশ্রুময় একবার জানালা দিয়া মুখ বাহির করিল। ক্রমে গতি মন্দ হইয়া আসিতেছিল; গাড়ীখানি তখন একটা ছোট পাকা বাড়ী দক্ষিণে রাখিয়া ছুটিতেছিল। সম্মুখেই একটা ছোট পুকুর; সেই পুকুরের পাশে পাশে ফুলের গাছ; একটু দূরে দূরে আম কাঁঠালের গাছ। আরও দূরে পল্লীর শ্যামল বনপ্রান্ত দেখা যাইতেছিল। সেই বনপ্রান্তের কাছে তখনও সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আইসে নাই। কিন্তু বৃক্ষশীর্ষের কাছটি দিয়া একটা সুস্পষ্ট ধূমরেখা স্থির হইয়া রহিয়াছে এবং আসন্ন সন্ধ্যার সূচনা করিতেছে!

ঘাট্‌লার সিঁড়ির উপরকার টবগুলিতে ছোট ছোট ফুল-গাছ আলো করিয়া বিচিত্র ফুল ফুটিয়াছে।

একটি পরিপুষ্ট দেহ শিশুকে বুকের সঙ্গে জড়াইয়া ধরিয়া একটী পনের ষোল বছরের মেয়ে ঘাট্‌লার উপর হইতে গাড়ী দেখিতেছিল। কোলের শিশুটী ফুল ছিঁড়িবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিতেছিল। ট্রেণের শব্দে সে তাহার বড় বড় চোখ দুইটা তুলিয়া গাড়ীর দিকে চাহিল, পর মুহূর্ত্তেই মেয়েটার বুকের কাছে মুখ লুকাইল।

অশ্রুময়ের চঞ্চল দৃষ্টি মেয়েটীর মুখের উপর স্থাপিত হইল। শৈবালজড়িত প্রফুল্ল পঙ্কজের মতই তাহার চূর্ণ কুন্তলাবৃত মুখখানি সান্ধ্যসূর্য্যের কোমল আলোকপাতে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল।

মেয়েটী দেখিল, ট্রেণ হইতে কে তাহার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে। সে চক্ষু ফিরাইয়া লইল, এবং কোলের ছেলেটার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে ঘাট্‌লার অন্য দিকে চলিয়া গেল।

কিন্তু যে অমন উন্মুখ দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল, তাহার অত্যন্ত শান্ত দৃষ্টিটুকুর মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল, যাহা কখন অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়া তাহার মুখখানাকে আর একবার গতিশীল গাড়ীটার দিকে ফিরাইয়া দিল।

তখন ট্রেন দূরে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তবু সেই মুখখানা দেখা যাইতেছিল।

বিস্মিত পুলকে অশ্রুময়ের সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিতেছিল, সে জানালার ফাঁক দিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া যতক্ষণ দেখা গেল, সেই ঘাট্‌লার দিকে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু গাড়ীর গতিটা যে হঠাৎ এতই দ্রুত হইয়া উঠিতে পারে তাহা তাহার কোনও কালেই ধারণা ছিল না।

কল্পনারাজ্য হইতে বাস্তবের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে মানুষের যেমন মোটেই সময়ের দরকার হয় না, তেমনি এই অত্যন্ত দ্রুতগামী গাড়ীটারও এক সময়ে থামিয়া যাইতে এতটুকুও সময় লাগিল না।

অশ্রুময় গাড়ীর মধ্যে মুখ আনিতেই দেখিল, তাহার পাশের ভদ্রলোকটি ব্যাগ হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কিন্তু ঠিক্ কখন যে তাঁহার মুখের উপর দিয়া একটা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন আসিয়া গিয়াছে, অশ্রুময় সে খবরটি না জানিলেও সে এটুকু অনুভব করিল, যে, হঠাৎ একটা তীব্র আঘাত পাইলেই মানুষের মুখ অমন করিয়া কালিমালিপ্ত হইয়া যাইতে পারে! কিন্তু সে আঘাতটা যে কি তাহা জানিয়া লইবার অবসরও যেমন তখন ছিল না, তেমনি অধিকারও তো তাহার ছিল না।

অশ্রুময় ম্লান মুখে কহিল, "অসুখ বোধ করচেন কি? আপনার মুখ যে একেবারে কেমন হয়ে গেছে!"—

"না, কই অসুখ তো কিছু করেনি।"—বলিয়াই যুবক একটু ব্যস্ততার সহিত গাড়ীর দুয়ার খুলিয়া ফেলিল এবং আর একবার অশ্রুময়ের মুখের দিকে তাহার ম্লান দৃষ্টি তুলিয়া ধরিয়া কহিল, "তবে আসা যাক্! এইটেই যখন আপনার বাড়ী যাওয়ার পথ, তখন মাঝে মাঝে দেখা হতেও পারে!"

একটি ক্ষুদ্র নমস্কারের প্রত্যর্পণে দুই পাণি যুক্ত করিয়া স্তম্ভিত অশ্রুময় প্রতিনমস্কার করিল। একটু হাসিয়া যুবক প্ল্যাটফরমের উপর নামিয়া পড়িতে গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

যতক্ষণ দেখা গেল, অশ্রুময় সেই অপরিচিত যুবকের দিকে চাহিয়া রহিল। দুদণ্ডের পরিচয়ে এই যুবক তাহার হৃদয়ে একটা আন্দোলন তুলিয়া দিয়া গিয়াছিল।

বাহিরে, দূর চক্রবাল-রেখার কাছটিতে সূর্য্য ডুবিতেছিল। মেঘের শীর্ষে শীর্ষে অপূর্ব্ব রঙ্গের খেলা চলিয়াছে। অশ্রুময় জানালার কাঠের উপর বুক রাখিয়া সেই রঙ্গিন্ পশ্চিম আকাশের দিকেই চাহিয়া রহিল।

কোথায় সেই কল্পনালোকের মোহিনী তুলিকাটি, যাহার কোমল স্পর্শে, বাহিরের আকাশ ও তাহার অন্তরাকাশ এমন করিয়া একই পুলক ছন্দে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে!

[২]

অশ্রুময় বাড়ী আসিয়া যখন মাকে প্রণাম করিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে!

ছেলেব মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে মানদা সুন্দরী কহিলেন, "ওরে কল্যাণি! এদিকে আয়, তোর দাদা এসেচে!"

কল্যাণী পাকঘরের দিক্ হইতে ছুটিয়া আসিল, অশ্রুময়কে প্রণাম করিয়া কহিল, "তুমি কিন্তু বেশ্ লোক দাদা, কাল তোমার চিঠি আসেনি, আজ সকালেও এলনা, মা তো ভেবেই অস্থির!—বিদেশে যারা থাকে, তারা যদি নিয়মমত চিঠি না লেখে, তা'তে বাড়ীর লোক যে কতখানি ব্যস্ত হয় তা' তোমরা কিচ্ছুটি বোঝ না, দাদা!"

অশ্রুময় কহিল, "তা' তুই তো আর ব্যস্ত হস্‌নি"—

মানদাসুন্দরী একটু হাসিয়া কহিলেন, ওমা, ব্যস্ত আবার হয়নি! হর্‌করা আস্‌তে এতটুকু দেরী হলেই ও ঘর আর পথ কর্‌তে থাকে! এ পাগ্‌লীর জন্য কি স্বস্তি পাবার যো'টি আছে! বাছা যখন ছেলের মা হবেন; তখন যে কি কর্‌বেন তা' আমি ভেবেই পাইনে!"—

কল্যাণী তাহার ক্ষুদ্র রক্তাধর একটু প্রসারিত করিয়া দিয়া একটু মৃদু হাসিল; তার পরমুহূর্ত্তেই ধীরে ধীরে কহিল, "বুঝ্‌লে ত দাদা মার কথা! ছেলের চিঠি না পেয়ে মা কতখানি অস্থির হয়ে ওঠেন!"—

মানদাসুন্দরী একটু হাসিয়া কহিলেন, "ক্ষমা বুঝি তুই কাউকেই করিস্‌নে কল্যাণি! তোর্ সঙ্গে পেরে ওঠাই দায়!"—

"বাঃ দোষ হ'ল বুঝি আমার! নিজের কথারই ধরা পড়ে গেলে, তা' আমি আর কি করি বল? দাদার চিঠি আস্‌তে একটু দেরী হলেই যে, মা, তোমার ইষ্টদেবতার নাম কর্‌তেও ভুল হয়ে যায়, সে খবরটি এখন কে দেয়, বল! আচ্ছা দাদা, তুমিই না হয় বিচার কর"—

"ওরে, তুই এখন থাম্! আর এত বক্‌তেও বাপু তুই পারিস্! তোর দাদার হাত মুখ ধোবার জল দিয়েচিস্?"—

"সে আমি কোন্ সন্ধ্যেবেলা ঠিক্ করে রেখে দিয়েচি!"

—তা' তুই কি করে ঠিক্ কর্‌লি, কল্যাণি! আমি তো লিখিনি যে, আজ আস্‌ব।"—

মানদাসুন্দরী হাসিয়া উঠিলেন, কহিলেন,—"এইবার মা লক্ষ্মী আমার ধরা পড়ে গেছেন! ওরে, ও যে রোজ সন্ধ্যেবেলাই অম্‌নি করে গাড়ু গামছা খড়ম গুছিয়ে রাখে, বলে, 'কি জানি কখন দাদা আস্‌বে।—সব সাজানো গুছানো না পেলে মনে কর্‌বে এরা কেউ'—হঠাৎ কল্যাণীর মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই মানদাসুন্দরী থামিয়া গেলেন, তার পর একটু হাসিয়া কহিলেন, "না তুমি তো বাপু কাউকেই ক্ষমা কর না, এখন বাছা, অমন করে নিষেধ কর্‌লে চল্‌বে কেন? আমি আজ অশ্রুকে সব কথা বলে দেবই, এতে যা' থাকে আমার অদৃষ্টে"—

কল্যাণী অত্যন্ত নিরুপায় হইয়া পড়িল। তার পর হঠাৎ রাগিয়া উঠিয়া কহিল, "কেমন মা গো তুমি, দাদা হাতমুখ ধোয়নি, খায়নি, ওকে একটু সুস্থ হতে দাও, তার পর যত পার নালিশ ক'র! কল্যাণী ত আর পালিয়ে যাচ্ছে না," বলিয়াই সে অশ্রুময়ের হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল "দাদা, তুমিও যেমন, মার কথা শোন! তুমি চল, হাত মুখ ধোবে!"—

জননী হাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁহার দুই চক্ষুর পাতাই যে জলে ভিজিয়া উঠিল, তাহা আর কাহারও চোখে না পড়িলেও, কল্যাণীর দৃষ্টি এড়াইল না।

সে মার কাছে সরিয়া আসিয়া কহিল, "তোমার তো আহ্নিক করা হয়ে গেছে মা! আচ্ছা তুমি কাপড়টা বদলে নিয়ে আমাদের ভাত দাও না!" তার পর একটু গলা খাটো করিয়া কহিল, "আমি দাদার সঙ্গেই খেতে বসি না কেন!"

বারান্দায় অশ্রুময় হাতমুখ ধুইতেছিল, কল্যাণী যত মৃদুস্বরেই বলুক্ না কেন, কথাটা তাহার কাণে গেল, সে

ডাকিয়া কহিল, "সেই বেশ হ'বে মা! মেসে ঠাকুরের হাতের রান্না খেয়ে খেয়ে তো অরুচি ধরে গেছে, আজ তোমার হাতে খেয়ে বেঁচে যাব। কল্যাণীকে কিন্তু বলে দাও, মা, ওযে সমস্ত মাছগুলি আমার ভাতের মাঝে লুকিয়ে রাখবে, আর নিজে কিচ্ছুটিই খাবে না, তা' কিন্তু চল্‌বে না মা!"

কল্যাণী রাগিয়া গেল, কহিল, "তা' অত কথার তো কোনো দরকার নেই মা! এর যা' ঠিক ব্যবস্থা হ'তে পারে তাই আমি করে দিচ্ছি! আমরা কেউই খাবারটা ছোঁব না। তুমিই দু'জনকে খাইয়ে দাও! মা আর কিছু আমাকে কম করে দিয়ে তোমাকে বেশী করে দেবে না, দাদা!"

মানদাসুন্দরী দুই হাতে কল্যাণীর মাথাটা বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া কহিলেন, "ওরে ক্ষেপি, তোর মাই কি ঠিক্ নিক্তির ওজনে ভাগ করে দিতে পারবে? তোর মুখে খাবার তুলে দিতে গেলেই যে তুই নানা রকমের বাহানা তুলিস্! তুই খেতে পারিস্‌নে, তোর গা' কেমন করে, তোর এসব গুলি আমি কেমন করে ঠেকাব বল?"—

—"শোন মার সৃষ্টিছাড়া কথা! খাবার জিনিষটা মুখে তুলে দিতে গেলে কেউ নাকি আবার অম্‌নি করে! ও তোমার অশ্রু বিদেশ থেকে এসেচে তাকে বেশী করে দেবার একটা ফন্দি আগে থাকৃতে বের করে কল্যাণীর মুখ বন্ধ কর্‌তে চাচ্ছ! আমি কি আর ওসব বুঝিনে!'

কিন্তু খাওয়ার সময় একটু কিছু বেশী মুখে দিতে গেলেই কল্যাণী রাগিয়া অনর্থ বাধাইতে লাগিল। "সত্যিই কি আমি রাক্ষুসী, যে অমন করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমার মুখের মধ্যে পুরে দিতে চাচ্ছ!"—কল্যাণীর কথা শুনিয়া অশ্রুময় কহিল, "তোর সঙ্গে পারাই তো কঠিন রে! তুই কিছু খাবিনে, আরও বকাবকি করে অনর্থ বাধাবি!"

আহারান্তে অশ্রুময় ও কল্যাণী মাতার দুই পাশে শুইয়া পড়িল। কত সুখ ও দুঃখের কাহিনীর আলোচনার মধ্যে তাহাদের ভাবী সাংসারিক বন্দোবস্তের পরামর্শ হইয়া গেল।

অন্যান্য কথার মধ্যে স্থির হইল, অশ্রুময় প্রত্যহই বাড়ী হইতে কলিকাতা যাইয়া আফিস্ করিবে!—

তখন কল্যাণী কহিল, "মা, এইবার কিন্তু দাদার বিয়ে দিতে হবে!"

অশ্রুময় অত্যন্ত মৃদুস্বরে কহিল, "আর ?

—"এঁ হে!"—দুষ্ট কল্যাণীর মুখ এবার বন্ধ হইয়া আসিবার উপক্রম হইল! তখন জননী ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, "তা' দু'জনেরই বিয়ে হবে।"

"কিন্তু আগে অশ্রুর!"—

"কল্যাণী মুখ ফুলিয়ে থাক্‌বে না ত?"—অশ্রুময় কথাটা বলিয়াই টিপিটিপি হাসিতেছিল।

"ই—রে! দাদাটার মোটেই লজ্জা নেই!"—

মানদাসুন্দরী হাসিয়া উঠিলেন। সে বড় তৃপ্তির হাসি! অশ্রুময় বহুদিন পরে মায়ের মুখে প্রসন্ন হাসি দেখিয়া তৃপ্ত হইল।

কল্যাণী মার বুকের কাছে মুখ লুকাইয়া রহিল। মানদাসুন্দরী তাহার সংসর্পিত চুলের রাশির মধ্যে ধীরে ধীরে অঙ্গুলী সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

তখন সমস্ত পল্লীটা নিবিড় সুপ্তিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। কচিৎ দুই একটা কুক্কুর ডাকিয়া উঠিয়া পরক্ষণেই নীরব হইয়া যাইতেছিল। দুই একটা পেচকের কর্কশ ধ্বনি মধ্যে মধ্যে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল! বাহিরে গাছের পাতায় পাতায় শিশির টপ্‌টপ্ করিয়া পড়িতেছিল। পল্লীর অখণ্ড শান্তির ও নীরবতার মধ্যে সে শব্দটুকুও অশ্রুময়ের কাণে আসিতেছিল!

কল্যাণী হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "বুঝলে দাদা! মা তোমার চেয়ে আমাকেই বেশী ভাল বাসেন।"

পরম গম্ভীরভাবে অশ্রুময় কহিল, "না, লক্ষীটি, এমন একটা কথা বিনা প্রমাণে বিশ্বাস তো করা যায়ই না, তা' ছাড়া"—

"প্রমাণ যথেষ্ট আছে—একেবারে অকাট্য! এই দেখ, মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন!"—কল্যাণীর কথা শুনিয়া জননী মৃদু হাসিয়া কহিলেন,—"পাগ্‌লী আর কি, আমি ভাব্‌লাম ও না জানি কিই বল্‌বে!"—

অশ্রুময় কহিল, "বুঝ্‌লি তো কল্যাণি! ওটা প্রমাণ বলে গ্রাহ্যই হতে পারে না।"—

কল্যাণী নিতান্তই নিরুপায় হইয়া পড়িয়া জননীর— কাণের কাছে মুখ নিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল—

"মা! তুমি বল না কল্যাণীকে বেশী ভালবাসি;—আমি কাল ভোরে তোমাকে এক সাজি ফুল তুলে দেব!"—

"অশ্রু! বোঝ, কল্যাণী কিন্তু আমাকে এক সাজি ফুল তুলে দিতে চাচ্ছে!"—

"কোন্ ঘুষ্‌খোরের মেয়ে বাপু তুমি, আমি তো ঘুষ্ দিতে পারব না!"—

কল্যাণী উচ্চ রোলে হাসিয়া উঠিল,

"ভারি জব্দ, তবে আমারই জিৎ, কেমন তো মা?"

মানদাসুন্দরী কল্যাণীকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার নির্ম্মল ললাটে ওষ্ঠস্পর্শ করিলেন, কহিলেন, "দূর ক্ষেপি!"

কল্যাণীর অন্তরমধ্যে একটা তৃপ্তি ও আনন্দের প্রবাহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। সে মার বুকের কাছে মুখ লুকাইয়া চুপ করিয়া রহিল।

একটু পরেই গুরুনিশ্বাসপতনশব্দ শুনিয়া অশ্রুময় বুঝিল, মা ও কল্যাণী নিদ্রাগত।

তখন অশ্রুময়ের মানস চক্ষের সম্মুখে একখানি তরুণী মূর্ত্তি ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল।

কক্ষের সেই নিবিড় অন্ধকার যবনিকা ভেদ করিয়া, কোন্ সুদূর কল্পনালোক হইতে সেই লীলাতরঙ্গায়িত মূর্ত্তিখানি বুঝি বড় সন্তর্পণে, বড় সঙ্কোচে নামিয়া আসিতেছিল!

এমুখ, এমূর্ত্তি যেন অশ্রুময়ের চিরপরিচিত! জন্মে জন্মে যেন এমনি করিয়া কতবার এই তরুণী তাহার কাছটিতে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে!

আজিকার দিন পর্য্যন্ত সে যে বাড়িয়া উঠিয়াছে, সে যেন ইহাকেই পাইয়া সম্পূর্ণ হইবার জন্য,—সার্থক হইবার জন্য!

অমাবস্যার কোন্ নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে শশাঙ্ক লুকাইয়া ছিল, আজ তাহার যৌবনের প্রতিপদের দিনে মুহূর্ত্তের জন্য সে আসিয়া দেখা দিয়া গেল।

তাহারই হৃদয়াকাশে পূর্ণায়িত হইবার জন্যই কি প্রতিপদ-শশাঙ্কের এই ক্ষণিক অভিযান!

(ক্রমশঃ)

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।

"চল্‌তি পথে"

The war of Ideas.

গত ডিসেম্বর মাসের **Nineteenth Century and after** পত্রিকায় **W. Morris Colles** এবং **A. D. Mc Laren, "The war of Ideas,"** নামক একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে, মহাসমর শেষ হইয়াছে বটে; কিন্তু আরও একটা বিপুলতর সংঘর্ষ শীঘ্রই বিশ্বের ভাবরাজ্যে উপস্থিত হইয়া দারুণ একটা বিপ্লব সৃষ্টি করিবে।

বিভিন্ন জাতীয় আদর্শের ভিতর, চিরকালই একটা অনৈক্য বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়। তাঁহারা বলিতে চাহেন যে, গত যুদ্ধটা এই রকম চিরন্তন বিরোধেরই একটা অভিব্যক্তি। "বর্ম্মে বর্ম্মে কোলাকুলি" মানব-মনের রেষারিষির ভাবটাই পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে। —জার্ম্মাণি শতাব্দীব্যাপী সামরিক নির্ব্বাচনের (military selection) ফলে যে সমরপটুতা লাভ করিয়াছিল, তাহা তাহার জাতীয় আদর্শকে সফলতার পথে লইয়া যাইতে পারে নাই সত্য, কিন্তু সে এই প্রেরণাটাকে নূতন ক্ষেত্রে পরিচালিত করিয়া বিশ্বকে প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে পুনরায় আহ্বান করিবে। জার্ম্মাণ জাতি জীবনসংগ্রামে পিছাইয়া পড়িতে রাজি নয়—প্রত্যেকের মত সেও বাঁচিয়া থাকিতে চায়!

বিশ্বে সমরক্ষেত্র ছাড়া আরও অনেক রঙ্গভূমি আছে। যে সকল মহাজাতি বিশ্বে এক একটা উদ্দেশ্য লইয়া আসিয়াছে, তাহাদের ভাবরাজ্য এখন হইতেই যে একটা বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছে তাহা একটু তলাইয়া দেখিলেই সহজে বোঝা যায়। যদি জার্ম্মাণি কেবল ভাবুক ও কবির জন্মস্থান হইত, যদি ইংরেজ কেবল দোকানদারের জাত ছাড়া আর কিছুই না হইত, ফরাসীরা যদি কেবল 'চার্ব্বাক'-কেই গুরু স্বীকার করিয়া লইত, রুষ যদি ভবিষ্যতের একটা উজ্জ্বল ছবি চোখের সামনে না দেখিত, তাহা হইলে আজ পৃথিবীতে যুদ্ধ হইত কিনা সন্দেহ। যদি অন্যদেশের আর্থিক

ও রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের একটা হিসাব নিকাশ না লওয়া হয়, তাহা হইলে আজ এই গণতন্ত্রপ্রতিষ্ঠার যুগে, জার্ম্মাণির একচ্ছত্রসাম্রাজ্যবিস্তারের বাসনা যুগধর্ম্মকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া, কেন প্রায় সফল হইয়া উঠিতেছিল, তাহার উত্তর দেওয়া কঠিন হইবে।

নবীন জার্ম্মাণির বাণিজ্যবিস্তার পৃথিবীর বুকে একটা অশান্তি জাগাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবে যে, যুদ্ধটা ক্রমতাবলম্বী গ্রেট ব্রিটেন ও জার্ম্মাণির শক্তিপরীক্ষা মাত্র। পরস্পরের আর্থিক ও রাজনৈতিক উন্নতি; শিক্ষার এক একটা বিশিষ্ট ধারা (type) গড়িয়া তুলিয়াছিল, এবং কোন ধারা'টি জয়লাভ করে, তাহাই এই যুদ্ধের প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয় ছিল।

জার্ম্মাণির জাতীয় শক্তি সব চেয়ে বেশী পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহার সংগঠনক্ষমতা এবং দক্ষতার ভিতর দিয়া। ঠিক একইভাবে গঠিত মানুষের একইরকম ইচ্ছাশক্তির বলেই আজ এই সংগঠনীশক্তি সম্ভবপর হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। জার্ম্মাণ জাতির অংশগুলি পরস্পর এমনই অঙ্গাঙ্গীভাবে সংগঠিত হইয়াছে যে, দেখিলে মনে হয়, জার্ম্মাণি যেন একটি সমগ্র পরিপূর্ণ সত্ত্বা,—সে যেন নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে অখণ্ডভাবে ধাবিত হইতেছে।

সন্ধিপত্র যখন স্বাক্ষরিত হয়, তখন একজন জার্ম্মাণ-সদস্য, পরাজয়ে ম্রিয়মাণ হইয়া ক্ষোভে, দুঃখে বলিয়াছিলেন —"the war of ideas is only just beginning." একথাটা পাগলের চোখরাঙানি নয়, কথাটা একেবারে পুরোপুরি সত্যি।

মানুষের অন্তরতম প্রদেশ হইতে, পার্থিব এবং মানসিক কতকগুলি অদৃশ্যশক্তি ভাগ্যবিধাতারূপে, সর্ব্বদা মানুষের অনিচ্ছাসত্বেও তাহাকে অজ্ঞাতলক্ষ্যের দিকে লইয়া চলিয়াছে। কলকোলাহল এবং বিক্ষুব্ধস্রোতের ঘূর্ণিপাকে অস্থির হইয়া মানব যদি থমকিয়া দাঁড়ায় এবং নৈরাশ্যব্যঞ্জকস্বরে জগতের চিরন্তন প্রহেলিকা—"কঃ পন্থা ?" এই প্রশ্ন করিয়া বসে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য বিশ্বমানবের প্রাণে যে শাশ্বত ব্যাকুলতা রহিয়াছে, তাহা হইতেই ভাবসংঘর্ষের সৃষ্টি এবং স্থিতি। জার্ম্মাণদর্শন, "লাঠি যার মাটি তার" এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া অন্যান্য জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়াছিল। স্বরাট্ হইবার অধিকার, কিম্বা পরাধীনতার নিগড়বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবার দাবী, বিশ্বমানবের আছে কিনা তাহাই ছিল যুদ্ধের প্রধান বিচার্য্য বিষয়। এবং এই যুদ্ধের পরেও যে বিপুলতর যুদ্ধ আসিতেছে, তাহাতেও ইহাই বিচার্য্য বিষয় থাকিবে।

চার্লস ডারউইন যদি জানিতেন যে, তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি ভবিষ্যতে একদিন বিশ্বমানবকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবে, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেন। তিনি যখন "জীবনসংগ্রামে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন" এই সত্যটি জড় জগৎসম্বন্ধে বিবৃত করেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই সমাজ-ক্ষেত্র কিম্বা উন্নত সভ্যজাতিদের সম্বন্ধে তাহা প্রয়োগ করিবার কথা মনেও আনেন নাই। জার্ম্মাণি কার্য্যসাধনের জন্য এই সত্যটি State সম্বন্ধেও প্রয়োগ করিয়া বসিয়াছে।

নিট্শের Superman এর সিংহাসনতলে জার্ম্মাণি সমস্ত নীতি ও ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়াছে। বার্নহার্ডি স্পষ্টই বলিয়াছেন—"রাজ্য সম্বন্ধে কেবল শক্তিমানের ধর্ম্মই বজায় থাকিবে। যুদ্ধ ন্যায়সঙ্গত, সুমহান, উন্নতিমূলক এবং আবশ্যক; কেন না যুদ্ধদ্বারা বলবান এবং উন্নতিশীল জাতিরা, দুর্ব্বল এবং পতিত জাতিদের উচ্ছেদসাধন করে।"

"জার্ম্মাণিতে প্রস্তুত"—ডারউইনবাদ, একটা বৈজ্ঞানিক অসত্যের উপর অসিবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এই ধ্বংসমূলক আদর্শটি কেবল জার্ম্মাণিই গ্রহণ করে নাই। যেখানে যত "অসন্তুষ্টের দল" আছে, সকলেরই প্রাণে "জীবন-সংগ্রাম" কথাটি বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। শ্রমজীবির দল বর্ত্তমান সভ্যতার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়াছে। শ্রমজীবি ছাড়া আরও অনেকেই "জোর যার মুলুক তার" এই কথাটা এখনও ভুলিতে পারেন নাই। আজ সকলেরই জানা প্রয়োজন যে, সকলের উন্নতির জন্য প্রত্যেকের স্বার্থকে বিসর্জ্জন দেওয়াই জাতীয় উন্নতির মূল এবং সেই বিসর্জ্জনের ভিতর দিয়াই ষোল আনা লাভ সম্ভবপর। আজ বিশ্বের সমস্ত জাতিই এই চরম আদর্শটি ভুলিয়া গিয়াছেন। এই রকম আদর্শবাদ অনুসারে কাজ করা যদি সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে বিশ্বের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইবে।

প্রত্যেক রাজ্যের এক একটি নিজস্ব জাতীয় আদর্শ-

আছে। অদূরভবিষ্যতে এমন সময় আসিতেছে, যখন তাহাদের মধ্যে একটা বিরাট সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে। Pax Britannica একটা বাজে বুলি নয়। আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহের মধ্যে Pan-Islamism-কে উপেক্ষা করা চলে না। সময় আসিতেছে, যখন Pan-Americanism মাথা চাড়া দিয়া উঠিবে। ক্ষুদ্র প্রাচ্যদেশসমূহের অগ্রদূতরূপে জাপান এখনই "জগৎ মিথ্যা"কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া গাঝাড়া দিয়া অগ্রসর হইতেছে। আজ জার্ম্মাণিকে যদি জাতিসঙ্ঘের ভিতর স্থান দেওয়া না হয়, তাহা হইলে জার্ম্মাণির আদর্শের সঙ্গে বিশ্বের আদর্শের একটা সংঘর্ষ চলিতে থাকিবে।

সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের মেঘ এখনই নবোদিত সূর্য্যকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। ভবিষ্যতের যুদ্ধ কেবল 'জাতীয় আদর্শবাদ' লইয়াই হইবে না, এটা ঠিক। শত্রুপক্ষ 'সামরিক পটুতা'র উপর বিশ্বাস হারাইয়া বেশ বুঝিয়া লইয়াছে যে, গায়ের জোর ভাবরাজ্যেও হয়ত আসন পাইবে না। কাজেই সে পরবর্ত্তী যুদ্ধে জাতি ধর্ম্ম রাজনীতি এবং সমাজের মূলতত্ত্বগুলির ভিত্তি নাড়িয়া তবে 'আসরে' নামিবে।

প্রাচ্যদেশ সমূহ পাশ্চাত্যের বিপক্ষে, লাটিন জাতি স্লাভের বিপক্ষে এবং কেল্ট স্তাক্‌সনের বিপক্ষে এখন হইতেই কোমর বাঁধিতেছে। ইসলাম, তাহার লুক্কায়িত বিরাটশক্তি লইয়া হয়ত শীঘ্রই দাম্ভিক খৃষ্টানের বিপক্ষে যুদ্ধযাত্রা করিবে। বিশ্বের শ্রমজীবিসঙ্ঘ হয়ত ধনকুবেরের দলকে ভ্রাতৃযুদ্ধে আহ্বান করিয়া, উভয়েই ধরাশায়ী হইবে। গৃহবিচ্ছেদকাতর মিত্ররাজ্য সমূহ, পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিবে। শান্তির অন্তরেও যুদ্ধ ও পরাজয় লুক্কায়িত থাকে!!

শান্তি যাহাতে মিথ্যাস্বপ্নে পর্য্যবসিত না হয়, সেইজন্য এই সব মিথ্যা সংস্কার ছিন্ন করিয়া উদার ভাবুকতা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। "জিগীষাপরায়ণ সমরবাদ" কিম্বা "বাণিজ্যবিস্তারী শান্তিবাদ" উভয়ই বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে। পরার্থতাকে, স্বার্থসর্ব্বস্ব হৃদয়হীনতার আসনে, অধিষ্ঠিত করিতে হইবে। বিশ্বের কল্যাণ কামনা, শুকতারার মত উজ্জ্বল ও ভাস্বর হইয়া, প্রত্যেক মানুষকে, তথা সমগ্র মানবজাতিকে সার্থকতার পথে লইয়া যাইবে। মানুষের কিম্বা শ্রেণীবিশেষের নির্ম্মম অত্যাচার এই মহৎ আদর্শের সম্মুখে বলি দিতে হইবে। আর্থিক, রাজনৈতিক এবং মানবের সমস্ত আচার ব্যবহার হইতে এই বর্ব্বরতা দূর হইয়া, আজ নবযুগের সূচনা করুক।

"বিশ্বমানবের উন্নতি হইতেছে সুমহান, সর্ব্বজয়ী এবং অমরত্বমণ্ডিত ত্যাগধর্ম্মের একটা বিরাট মহাকাব্য। বর্ব্বরতার যুগ পর্য্যন্ত সৃষ্টির ইতিহাস, জড়শক্তিপ্রাধান্যের একটা একটানা কাহিনী। পরবর্ত্তী যুগের ইতিহাসে ব্যক্তি, সম্প্রদায় এবং রাজ্যসমূহ সার্ব্বজনীন আদর্শের পতাকাতলে নিজেদের বিকাইয়া দিয়া সত্য, সুন্দর ও সার্থক হইয়া উঠিতেছে।"—চিন্তাশীল Kidd সাহেব, বিশ্বমানবকে এই মহদ্বাণী, শেষদানরূপে, দিয়া গিয়াছেন।

এই যুগসন্ধির সময়েও মানুষের পাশবিক প্রবৃত্তিকে আরও উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা অনবরত চলিতেছে। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে, আদিমযুগের পশুত্বকে বলি দিয়া, মানুষ, "দেবজন্ম" লাভ করিয়া বিশ্বে নবযুগ আনয়ন করিবে।

The League of youth.

(the Review of Reviews, March, 20)

বিলাতে প্রায় বৎসরাধিক কাল হইল (The League of Youth নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। রিজ সাহেব (Mr. Aubrey Rees) ইহার প্রতিষ্ঠাতা। তরুণসম্প্রদায়কে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া জনহিতকর প্রত্যেক কাজে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাহাদের শক্তিপ্রয়োগ করিবার অবকাশ দেওয়া এবং নিজেদের সাফল্যের দরুণ তাহাদের প্রাণে আত্মনির্ভরতার এবং আত্মপ্রসাদের ভাবটুকু ফুটাইয়া তোলাই এই সমিতির উদ্দেশ্য। অন্যান্য অনেক দেশেও এইরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহাদিগকেও একই উদ্দেশ্যে চালিত করা হইতেছে। সমিতির ক্ষমতা ক্রমেই বর্দ্ধিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

দেশের তরুণ, তরুণীদিগকে একই আদর্শে পরিচালিত করিয়া যাহাতে একই পথের পথিক করা যায়, তাহার জন্য দেশের বহুদর্শী সুসন্তানদিগের আন্তরিক সাহায্য এবং সহানুভূতি নিতান্ত প্রয়োজন। আনন্দের বিষয়, শ্রদ্ধাস্পদ লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce) এবং ডক্টর ক্লিফোর্ডের

(Dr. Clifford) মত ব্যক্তিগণ সে ভার হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করিয়াছেন এবং লয়েড জর্জ্জ সভাপতি হইতে স্বীকৃত হইয়াছেন। যদিও তাঁহারা এই অভিনব ব্যাপারটিকে সাহায্যদানে অভিনন্দিত করিতেছেন এবং এতকাল ধরিয়া দেশমাতৃকাপূজার যে বর্ত্তিকা সসম্ভ্রমে ধারণ করিয়া তাঁহারা অগ্রসর হইতেছিলেন, আজ তাহাই তরুণ সম্প্রদায়ের হাতে সঁপিয়া দিতে উৎসুক হইয়াছেন, তাহা হইলেও সমিতির মূল প্রেরণা এবং অন্তর্নিহিত শক্তির উৎস তরুণ তরুণী-দিগকেই খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

রিজ সাহেব, সমিতি কোন পথে পরিচালিত হইবে, তাহার কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম করিয়া সভ্যদের মধ্যে প্রথম হইতেই একটা বিচ্ছেদ আনিয়া দেন নাই। তরুণ তরুণীদের আলোচনা এবং অনুসন্ধানের ভিতর দিয়া পথ আপনা হইতেই গড়িয়া উঠিবে বলিয়া তাঁহার ধারণা। তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া সমিতির উদ্দেশ্য নয়,—উদ্দেশ্য হইতেছে, তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া দেশের বর্ত্তমান সমস্যা-সমূহের মৌলিক সমাধানের অবকাশ দেওয়া। প্রবীণ যেখানে হটিয়াছেন, আজ নবীনের দ্বারা সেই পথ কুসুমিত করিবারই এ একটা বিচিত্র আয়োজন। প্রাচীন যুদ্ধ আনিয়াছেন,—নবীন পিতৃপিতামহের পাপের ফল হাড়ে হাড়ে ভুগিয়াছে। কিন্তু সে বাক্যব্যয় না করিয়া, মানুষের মত সবই সহ্য করিয়াছে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। তরুণ সম্প্রদায় আজ ঠিক করিয়াছে যে, অতীতের নির্ব্বুদ্ধিতাকে সে আর পুনরভিনীত হইতে দিবে না। সে ঊনবিংশ শতাব্দীর জড়তা এবং অকর্ম্মণ্যতাকে দূরে রাখিয়া, বিশ্বকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবে। এই মহৎকার্য্য সফল করিতে হইলে, যুবকদিগকে নেতৃত্ব এবং রাজ্যশাসনের গুরু দায়িত্বভার স্কন্ধে লইতে হইবে এবং এখনও অনেক-কিছু শিখিতে হইবে। অতীতের অভিভাবকরূপে, তাহাদিগকে বিশেষ সতর্কতার সহিত কাজ করিতে হইবে এবং নিজেদের সম্প্রদায়কে একই লক্ষ্যে পরিচালিত করিতে হইবে।"

"A Child's Love Affairs."

The Eugenics Review সম্প্রতি হ্যারল্ড এলিসন (Harlod Ellison) নামে তের বছরের একটি বালকের প্রেমের কাহিনী প্রকাশ করিয়াছেন। একটি বালিকা তাহার ভালবাসার প্রতিদান করে নাই বলিয়া, ছেলেটি বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।

প্রত্যেক বালক বালিকার জীবনে এমন সময় আসে যখন যৌন-নির্ব্বাচন এবং যৌন-সম্মিলন সম্বন্ধে অনেক সমস্যা তাহার প্রাণে উদিত হয়।" পিতা কিম্বা অন্যান্য অভিভাবকেরা যদি সময় থাকিতে এ বিষয়ে তাহার সমস্যা সমাধান করিয়া খাঁটি পথে চালিত না করেন, তাহা হইলে বালক বালিকারা তাহাদের অভিভাবকদের সন্দেহের চোখে দেখে এবং অন্তরের প্রকাশ করিতে সমীহা বোধ করে।

Coroner এর এজলাসে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় ছেলেটির পিতা বলেন—আমার ছেলে একগুঁয়ে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, স্বাস্থ্যবান এবং বেশ বুদ্ধিমান ছিল। আমি তার কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম যে, দুটি মেয়ের সঙ্গে তার ঝগড়া হয়েচে। 'কিন্তু কি নিয়ে যে ঝগড়া, তা কিছুতেই বলে নি'।'

Coroner জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'আচ্ছা, যৌন-সম্মিলন সম্বন্ধে তার সঙ্গে আলাপ করবার সময় হয়েচে বলে কি আপনার মনে হয় নি?' উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—'কথাটা আমি নিতান্ত দরকারি বলেই মনে করেছিলাম। কিন্তু, বিষয়টা উত্থাপন করতে ভারি বাধ'-বাধ' ঠেকত!'

বাস্তবিক এই গুরুতর বিষয়টাকে আমরা চিরকালই তাচ্ছিল্য করিয়া আসিতেছি। প্রত্যেক শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান অভিভাবকের, ছেলেদিগকে এই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। তাহা না হইলে কতকগুলি ভুল ধারণার বশীভূত হইয়া, তাহারা চিরকালই ভুলের রাজ্যে বাস করিয়া যাইবে।

দিলদার।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বার্বারার বেদনা।

বিবাহের পর কার্লাইল সাহেব ও লেডী ইজাবেল ঈষ্টলীনে সংসারযাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন,—ওয়েষ্টলীনের ভদ্রগৃহস্থবর্গ সকলেই একে একে তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। যার বাড়ীতে যে ভাল গাড়ী ছিল, যার যে ভাল ঘোড়া ছিল, গাড়ী ঘোড়ার সাজসরঞ্জাম যার ঘরে যত জাঁকাল ছিল, সব এই উপলক্ষে বাহির হইল। সহিস কোচোয়ানরাও যার যত পরিপাটি সাজপোষাক ছিল তাহা পরিল। কেহ চৌঘুড়ীতে আসিলেন, কাহারও গাড়ীর পাশে ঘোড়সোয়ার ছুটিয়া আসিল, কেহ পরচুলা পরা আর সোণায় বাঁধা বেত হাতে করা চোপদার সঙ্গে করিয়াও আসিলেন। কার্লাইল ঈষ্টলীনের অধিকারী হইয়াছেন, ইহাতেই যে এই সম্মান লোকে দেখাইত, তা নয়। তবে অত বড় একজন লর্ডের কন্যা লেডী ইজাবেলকে বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার মর্য্যাদা অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল। লোকে তাঁহাকে আর এক চক্ষে এখন দেখিত।

একদিন জাষ্টিস্ হেয়ার আসিলেন, সঙ্গে তাঁহার পত্নী ও কন্যা বার্বারাও আসিলেন। প্রাচীন ধরণের বড় একখানা পীতবর্ণের গাড়ী তাঁহাদের ছিল, বড় কোনও সমারোহের সময় ব্যতীত এই গাড়ী ব্যবহার করা হইত না। ভাল এক জোড়া ঘোড়া ভাড়া করিয়া আনিয়া সেই গাড়ী চড়িয়া আজ হেয়ার পরিবার ঈষ্টলীনে কার্লাইল-দম্পতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন।

ইজাবেল তখন জয়েসের ঘরে ছিলেন। জয়েসকে তাঁহার ভাল লাগিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন,—"তুমিই আমার কাজ করিতে পার কি না? আর একজন লোককে ঠিক করা হইয়াছিল, সে লিখিয়াছে, তার অসুখ আসিতে পারিবে না।"

আনন্দে জয়েসের মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কহিল, "আহা, লেডী সাহেবা! আপনার দয়ার পার নাই। আপনার কাজ করিতেই আমার বড় ইচ্ছা করে। যত দূর আমার শক্তি আছে, কাজে আপনাকে খুসী করিতেই চেষ্টা করিব। আপনি যদি দেন, আপনার চুলও আমি সাজাইয়া বাঁধিয়া এখনু দিতে পারি। রাত্রিতে আর সকালে আমি রোজ নিজের চুল সাজাই, বাঁধি; তাতে কাজটায় আমার বেশ হাত এখন আসিয়াছে।"

ইজাবেল হাসিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "মিস্ কার্লাইল কি আমার কাজে তোমাকে একেবারে ছাড়িয়া দিতে চাহিবেন?"

"তা দিবেন বোধ হয়। এই ত কাল না পরশু বলিতেছিলেন, যদি আমাকে দিয়া কাজ চলে, তবে আপনার কাজেই আমাকে আপনি রাখিতে পারেন। তবে তাঁর গাউনগুলি আমাকে তৈয়ারী করিয়া দিতে হইবে। তা আমি বেশ পারিব, কারণ আপনার কাজ এমন কঠিন নয়। আমি তাঁর পছন্দসই গাউন তৈয়ারী করি কিনা, তাই তা আমাকেই করিতে হইবে।"

ইজাবেল একটু হাসিয়া কহিলেন, "তাঁর টুপীও কি তুমি তৈরী কর?"

জয়েস্ও একটু হাসিয়া উত্তর করিল, "হাঁ তাও করি বই কি লেডী সাহেবা। তবে তাঁর যেমন পছন্দ তেমনই ত করিব।"

"তা আমার চাকরাণী যদি তুমি হও; তোমার কিন্তু ভাল টুপী পরিতে হইবে।"

"তা হইবে বই কি লেডী সাহেবা। এ রকম টুপী পরিলে ত চলিবেই না। তবে কি জানেন, মিস্ কার্লাইল আবার আমাদের সাজ পোষাক সম্বন্ধে বড় কড়া। মলমলের টুপী ছাড়া আর কিছু তিনি চাকরাণীদের পরিতে দেন না। তা আপনার যদি আপত্তি না হয়, আমি বেশ সাদা লেটের কাপড়ের টুপী পরিব, আর সাদা ফিতা কুচাইয়া তাতে লাগাইয়া দিব।"

"তাই বেশ হইবে। মার্ভেলের মত অমন জাঁকাল সাজ তুমি করিবে, তা আমি চাই না।"

"না না লেডী সাহেবা! সর্বনাশ আমি জাঁকাল সাজপোষাক একেবারেই ভালবাসি না।"

বোধ হয় ভগ্নী এফীর কথা মনে করিয়া জয়েস্ একটু শিহরিয়া উঠিল। আরও কি সে বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় দরজায় কে আঘাত করিল। জয়েস্ দরজা খুলিয়া বাহির হইল। ওয়েষ্টলীনের অধিবাসিনী সুসান নাম্নী নূতন এক দাসী সম্প্রতি নিযুক্ত হইয়াছিল। জয়েস্ দেখিল সে দাঁড়াইয়া। সুসান জিজ্ঞাসা করিল, "লেডী সাহেবা ঘরে আছেন?"

"হাঁ, কেন?"

"পিটার আমাকে পাঠাইয়া দিল,—দেখা করিতে কে কে আসিয়াছেন।" বলিতে বলিতে গলা একটু চাপিয়া সুসান্ কহিল, "কারা আসিয়াছেন জান? হেয়ার সাহেবেরা। 'সে'ও আসিয়াছে! টুপীতে নীলকিতার থোকা, আবার একটা সাদা পালক ঝুলিতেছে—সে একেবারে মার্থার ঝাঁটার মত লম্বা! গাড়ী হইতে নামিতে দেখিলাম।"

"বল কি? কে?"

"কে আবার? মিস্ বার্বারা। তিনিও আসিয়াছেন আবার এই বৈবাহিক সম্ভাবণের জন্ম এই বাড়ীতে! লেডী সাহেবার খাবারে বিষ মিশাইয়া না দেয়। সাহেব বাড়ীতে নাই, নইলে তিনজনে মুখামুখিটা কি রকম হইত একবার দেখিতাম!"

জয়েস্ ধমক দিয়া সুসান্‌কে নীচে পাঠাইয়া দিল। একটু চাপা মৃদু সুরেই কথাগুলি সে বলিতেছিল, কিন্তু লেডী ইজাবেলের কাণে তাহা গেল।

জয়েস্ ঘরে আসিয়া কহিল, "সুসান্ বলিয়া গেল, জাষ্টিস্ হেয়ার সাহেব, হেয়ার বিবি, আর মিস্ বার্বারা দেখা করিতে আসিয়াছেন।"

ইজাবেল নীচে নামিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁর মনটা বড় কেমন করিতে লাগিল। সুসান ওসব কি বলিতেছিল।

দেখাসাক্ষাৎ আলাপপরিচয় হইল। রোগক্লিষ্টা অথচ অতি শান্ত ধীরস্বভাবা মিসেস্ হেয়ারকে ইজাবেলের বড় ভাল লাগিল। হেয়ার সাহেব ও হেয়ার বিবি চলিয়া গেলেন। কর্ণীবিবির অনুরোধে বার্বারা ডিনার পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিল। ডিনারের পূর্ব্বে বেশ পরিবর্ত্তনের জন্য ইজাবেল তাঁহা পোষাকের ঘরে গেলেন, জয়েস্ তখন কহিল, "লেডী সাহেবা, মিস্ কার্লাইলের কাছে আমি সব বলিয়াছি। আপনার কাজেই আমাকে ছাড়িয়া দিতে তিনি রাজি আছেন। তবে আমার জীবনের কতকগুলি অপ্রীতিকর ঘটনার কথা আগে আপনাকে জানান উচিত, এই কথা বলিলেন। আমারও তাই মনে হইতেছিল। কি জানেন, লেডী সাহেবা, মিস্ কার্লাইলের ধরণটা বড় মিঠা নয়, তবে মানুষ তিনি বড় খাটি।"

"তা বল, কি বলিবে।"

ইজাবেল একখানি চেয়ারে বসিলেন, জয়েস্ তাঁহার চুল আঁচড়াইয়া দিতে দিতে বলিতে আরম্ভ করিল, "খুব সংক্ষেপেই আমি সব বলিব লেডী সাহেবা। আমার পিতা কার্লাইল সাহেবের পিতার আফিসে কেরাণী ছিলেন। আমার যখন আট বৎসর বয়স তখন আমার মাতার মৃত্যু হয়। বাবা তারপর কেন্ সাহেবের শালীকে বিবাহ করেন।"

"কার? ঐ সঙ্গীতশিক্ষক কেন্ সাহেবের?"

"হাঁ লেডী সাহেবা। তিনি গৃহশিক্ষয়িত্রীর + কাজ করিতেন। মিসেস্ কেন্‌ও আগে গৃহশিক্ষয়িত্রী ছিলেন। তাঁহাদের শিক্ষা আর চালচলন ভদ্রঘরের মেয়েদের মতই ছিল। তাই লোকে বলিত, আমার পিতাকে বিবাহ করিয়া তিনি আপনাকে খাটো করিয়াছেন। তবে তিনি দেখিতে বড় সুপুরুষ ছিলেন, বুদ্ধিশুদ্ধিও বেশ ছিল। আর নিজে লেখাপড়াও কিছু শিখিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিবাহের এক বৎসর পরেই এফী হইল।"

"কে?"

"আমার বৈমাত্র ভগ্নী এফী। তার এক বৎসর পরে আমার বিমাতারও মৃত্যু হইল। তাঁর এক পিসী এফীকে নিয়া গেলেন। বলিলেন, তিনিই তাকে প্রতিপালন করিবেন। আমি বাড়ীতে আমার পিতার কাছে রহিলাম। আগে স্কুলে পড়িতাম, তারপর বড় হইলে দর্জ্জির কাজ শিখিতে গেলাম। কাজ শেখা হইল, আবার বাড়ীতে আসিলাম। ঐ যে ওয়েষ্টলীনের রাস্তার ধারে বড় একটা বাগান আছে, তার মধ্যে বড় সুন্দর এক কুটিরে আমার বাবা থাকিতেন। সেটি ছিল তাঁর

+ গৃহশিক্ষয়িত্রীরা 'Governess' 'গভর্ণেস্' নামে পরিচিত। ভাল একটু লেখাপড়া জানে, এরূপ দরিদ্র ভদ্রঘরের মেয়েরা বড় লোকের বাড়ীতে ছোট ছেলেপিলেদের পড়াইবার জন্ম নিযুক্ত হয়। ইঁহারাই 'গভর্ণেস্' বা গৃহশিক্ষয়িত্রী নামে পরিচিত।

নিজেরই বাড়ী। লোকের বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়া আমি কাজ করিতাম, আর অবসর সময় ঘরে আসিয়া পিতার সেবা করিতাম। এই ভাবে কয় বৎসর গেল। তখন একী ফিরিয়া আসিল। তার সেই ঠানদিদির মৃত্যু হইয়াছিল, খুব আদর যত্নে বড়লোকের মেয়ের মতই একীকে তিনি এত দিন পালন করিয়াছেন, কিন্তু তার জন্ম রাখিয়া কিছু যাইতে পারেন নাই। একীর রকম সকম দেখিয়া আমাদের চমক লাগিয়া গেল।—কি তার সাজ পোষাকের ঘটা, কি তার রূপ চং, ঠাটঠমক! দেখিতেও ছিল খুব সুন্দর, আর ঠ্যাকারে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িত। একখানি কাজের গায়ে হাত দিত না। রাতদিন কেবল নভেল পড়িত, ওয়েষ্টলীনের লাইব্রারী হইতে সেগুলা আনিত। বাবা এ সব মোটেই পছন্দ করিতেন না। আমরা সাদাসিধা গরীব গৃহস্থ লোক, কাজ কর্ম্ম করিয়া খাই। একীর ভাব দেখিয়া মনে হইত, সে যেন বড় একজন লেডী হইয়া থাকিতে চায়। তার সেই ঠানদিদি তাকে বড় লোকের মেয়ের মত মানুষ করিয়াছিলেন, তাতেই এই ফল হইয়াছিল। অনেক ঝগড়া তার সঙ্গে আমার হইত। শেষে রিচার্ড হেয়ারের সঙ্গে তার পরিচয় হইল।"

ইজাবেল চমকিয়া মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

জয়েস্ একটু আস্তে আস্তে বলিতে লাগিল, "রাচিস্ রিচার্ড হেয়ারের ছেলে, ওই মিস্ বার্বারার ভাই। রিচার্ড সাহেব যেন একীর ভালবাসায় একেবারে পাগল হইয়া উঠি-লেন। সর্ব্বদা আসা যাওয়া করিতেন। একীও তাঁকে প্রশ্রয় দিত। তবে তিনি কিছু সাদাসিধা রকমের লোক ছিলেন, তাই আড়ালে তাঁকে খুব বিদ্রূপও করিত। আরও অনেকে আসিত যাইত—সবাইকে লইয়াই একী যেন খেলা করিত। বাবা বাহিরে কাজ করিতেন, ফিরিতে প্রায়ই রাত্রি হইত। আমিও ৯টার আগে বাড়ীতে ফিরিতাম না। বাড়ী তখন খালি থাকিত। একীর ভালবাসার লোক যারা, তারা কেউ না কেউ এই সময়ে আসিত।"

ইজাবেল একটু হাসিয়া কহিলেন, "তার কি মেলাই এমন ভালবাসার লোক ছিল?"

"প্রধান ছিল, রিচার্ড হেয়ার। আরও একটি বিদেশী —নক দূর হইতে ঘোড়ায় চড়িয়া আসিত। তবে —টা ভাব বোধ হয় একীর ছিল না। তা যা ছিল, সে ওই রিচার্ড সাহেবের সঙ্গে। শেষে রিচার্ড সাহেব বাবাকে খুন করিয়া ফেলিলেন।"

"কে!" ইজাবেল চমকিয়া উঠিলেন।

"রিচার্ড হেয়ার, লেডী সাহেবা। বাবা একদিন একীকে বলিয়াছিলেন, রিচার্ড সাহেবকে সে যেন বাড়ীতে এত আসিতে না দেয়। কারণ, ভদ্রলোকের ছেলেরা যে গরীব গৃহস্থ মেয়েদের পিছু নেয়, তাদের মতলব কখনও ভাল থাকে না,—বিবাহ করিবে একথা তারা মনেও কখনও ভাবে না। তবে বাবার একটা ভরসা এই ছিল যে রিচার্ড সাহেব ভাল লোক, একীর অনিষ্ট কিছু তাঁর দ্বারা হইবে না। তাই তেমন জোর করিয়া বাধা তিনি কিছু দেন নাই। যাহা হউক, লোকে শেষে একীর সঙ্গে রিচার্ড সাহেবের নাম তুলিয়া অনেক কুকথা বলিতে আরম্ভ করিল। এক-দিন রাত্রিতে বাবা আসিয়া একীকে বলিলেন, রিচার্ড সাহেবের সঙ্গে একী যেন একেবারে আর আলাপ না করে। তার পরদিনই রিচার্ড সাহেব বাবাকে গুলি করিয়া মারিলেন!"

"কি সর্ব্বনাশ!"

"মতলব করিয়াই তাঁকে খুন করেন, না হাতাহাতি হইতে বন্দুকের গুলি ছুটিয়া গিয়া লাগে, ঠিক জানিনা লেডী সাহেবা। তবে লোকে বলে, মতলব করিয়াই রিচার্ড সাহেব বাবাকে খুন করেন।"

"থাক জয়েস্! আমি আর শুনিতে পারি না। হাঁ, রিচার্ড হেয়ারের কি হইয়াছে?"

"তিনি পলাইয়া যান। সেই রাত্রেই কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, আর কোনও খবর কেহ জানে না। তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে খুনের রায় দেওয়া হইয়াছে। যদি খোঁজ পান, তাঁর পিতাই তাঁকে পুলিশের হাতে ধরিয়া দিবেন। হেয়াররা এখানে খুব সম্রান্ত পরিবার, এই ঘটনায় তাঁদের বড় মুখ ছোট হইয়াছে। মিসেস্ হেয়ার ত মনের দুঃখে শয্যায় দাখিল হইয়াছেন। একী——"

"হাঁ, তোমার বোনের নামটা কি বলিলে?"

"খুব জাঁকাল একটা নাম তাঁর রাখা হইয়াছিল লেডী সাহেবা,—এফ্রোডাইট*। তবে আমি আর বাবা তাকে

---

* গ্রীক্ দেশের দেবী—গ্রীক ভাষার নাম আফ্রোডিটি (Aphrodite, ইংরাজীতে সাধারণতঃ একে আফ্রোডাইট উচ্চারিত হয়। লাটিন ভাষায় ইহার নাম ভেনাস। ইয়োরোপীয় কামদেব কিউপিডের জননী ইনি।

একী বলিয়াই ডাকিতাম। এই যা বলিলাম, তার চেয়েও ভয়ানক আর এক কথা বলিতে হইবে, লেডী সাহেবা। আদালতে এই রায় যখন বাহির হইল, তার কেবল পরেই একী পলাইয়া রিচার্ডের সাহেবের কাছে যায়।"

লেডী ইজাবেল শিহরিয়া উঠিলেন। অশ্রুসিক্ত ছুটি নয়ন আর লজ্জায় আরক্ত ছুটি কপোল ফিরাইয়া নিয়া জয়েস্ কহিল, "হাঁ, তাই লেডী সাহেবা। কোথায় তারা আছে, কেউ জানে না। কোন খবর আর তাদের পাওয়া যায় নাই। এই সব দুর্ঘটনায়, লজ্জায় আর দুঃখে আমার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। জ্বরবিকার হইল। দেখিবার কেহ ছিল না। মিস্ কার্লাইল আমাকে তাঁর বাড়ীতে আনিয়া রাখিলেন। তিনি আর তাঁর চাকরাণীরা অনেক যত্ন অনেক সেবা শুশ্রূষা করিয়া আমাকে বাঁচাইয়া তুলিলেন। কি জানেন লেডী সাহেবা, প্রাণটা তাঁর বড় ভাল,—তবে মিষ্ট ব্যবহার তিনি জানেন না। আরও একটা বড় দোষ তাঁর এই যে সবারই কেবল খুঁৎ তিনি দেখেন,—আর মনে করেন, নিজের ত্রুটী কিছুতে নাই। সেই ব্যারামের পর এই বাড়ীতেই সর্দ্দার দাসী হইয়া আমি আছি, সেলাইয়ের কাজ করিতে যাই নাই।"

"কতদিন হইল এই সব ঘটনা ঘটিয়াছে?"

"আগামী সেপ্টেম্বরে চার বৎসর হইবে। বাড়ীটা সেই অবধি খালিই পড়িয়া আছে।—আমি একা বেচিতে পারি না, কারণ একী তার অর্দ্ধেক সরিক। তবে মধ্যে মধ্যে যাই, দেখিয়া আসি। আপনার কাজে নিযুক্ত হইবার আগে এই কথাই আপনাকে বলিতে চাহিয়াছিলাম। যার বোন্ এত কুকাণ্ড করিয়াছে, তাকে সকলে ত এ সব কাজে রাখে না।"

ইজাবেল উত্তর করিলেন, "তোমার বোন্ খারাপ, সে তোমার দোষ কি? তোমাকে কেন তার জন্য কাজে রাখিব না? বেশ, আমার কাজই তুমি করিও।"

বলিতে বলিতে ইজাবেল চেয়ারে হেলিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। জয়েস্ জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ পোষাকটা পরিবেন লেডী সাহেবা?"

ইজাবেল তার কোনও উত্তর না দিয়া সহসা জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলেন, "হাঁ জয়েস্, তুমি আর সুসান্ ও কি বলাবলি করিতেছিলে? মিস্ হেয়ার আমাকে নাকি বিষ খাওয়াইয়া মারিবেন? তা দেখ, সুসান্‌কে বলিও, কোনও গোপন কথা যেন অত বড় করিয়া না বলে।"

জয়েস্ একটু হাসিল—কিছু থতমত খাইয়াও গেল,—কহিল, "ও কিছু নয় লেডী সাহেবা! সুসানের যত পাগলামো কি জানেন, লোকে মনে করে মিস্ বার্বারা আমাদের সাহেবকে খুব ভালবাসেন,—তাই কেহ কেহ ভাবিত ইঁহাদের বিবাহ হইবে। তা যতই ভালবাসুন, মিস্ বার্বারাকে বিবাহ করিলে কার্লাইল সাহেব যে খুব সুখী হইতেন তা আমার মনে হয় না।"

ইজাবেলের মুখ ভরিয়া উষ্ণ একটা রক্তোচ্ছ্বাস বহিয়া গেল। কতকটা ঈর্ষার মত একটা জ্বালা তাঁহার চিত্ত ভরিয়া উঠিল। স্বামীকে আর কোনও নারী ভালবাসে কি বাসিত, কোনও স্ত্রীই ইহা শুনিলে সুখী হয় না। এমন একটা সন্দেহও মনে উঠে ভালবাসার প্রতিদানও সে হয়ত কিছু পাইয়াছে।

লেডী ইজাবেল নীচে নামিয়া আসিলেন। খুব দামী কাল লেসের বড় সুন্দর একটি পোষাক তিনি পরিয়াছিলেন। বুকের উপরে বডিসের 'কাট' একটু নামান ছিল,—সেখানে ও আস্তিনের নীচে খুব সুন্দর সাদা লেসের কালর আর সেই পোষাকের সঙ্গের মানান কয়েক খানি অতি উজ্জ্বল কালো রঙের অলঙ্কারও গায়ে ছিল। ইজাবেলকে ইহাতে যারপরনাই সুন্দর দেখাইতেছিল। বার্বারার চক্ষু যেন ঝলসিয়া গেল। বুকের মধ্যে অসহনীয় একটা ঈর্ষার তীব্র জ্বালা জ্বলিয়া উঠিল। একবার চাহিয়াই সে মুখ ফিরাইয়া নিল।

বার্বারাকেও সেদিন মন্দ দেখাইতেছিল না, ফিকা-নীল রঙের একটা রেসমী পোষাক তার পরা ছিল।—মনের উত্তেজনায় কপোলদুটিও রক্তাভ হইয়া উঠিয়াছিল,—আর ছিল কার্লাইলের দেওয়া সেই হারটিও তার গলায়। হায়, এখনও বার্বারা তা ত্যাগ করে নাই।

দুই জনে জানালার কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন, কার্লাইল আসিতেছিলেন। দুই জনকে দেখিয়া দূর হইতেই হাসিয়া তিনি মাথাটা একটু নাড়িলেন।—ইজাবেল লক্ষ্য করিলেন, কার্লাইলকে দেখিয়া বার্বারার গোলাপী কপোলদুটি একেবারে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল।

কার্লাইল ঘরে আসিয়া উঠিলেন, করমর্দ্দন করিয়া

কহিলেন, "এই যে, কেমন আছ বার্বারা? যাহ'ক তবু শেষে দেখা করিতে আসিয়াছ। এতদিন দেরী করিতে হয়? ছি!"

বলিতে বলিতে কার্লাইল স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া অতি মধুর স্বরে তাঁহাকে সম্ভাষণ করিলেন। কিন্তু রোজ যেমন আসিয়া তাঁহাকে চুম্বন করেন, আজ আর তা করিলেন না। তা বাহিরের এত লোকের সম্মুখে কি তাঁহাকে চুম্বন তিনি করিবেন? না, ছি! তাও কি হয়?—কিন্তু তবু আজ এই চুম্বনের অভাবটা ইজাবেল বড় তীব্রভাবে অনুভব করিলেন; তাঁর যেন মনে হইল, বার্বারা কি ভাবিবে, তাই স্ত্রীকে আদরে তিনি আজ চুম্বন করিলেন না।

ডিনার হইল। কর্ণীবিবি বার্বারাকে লইয়া বাহির হইলেন, ঈষ্টলীনের বাগানের শোভা তাহাকে দেখাইবেন। এ শোভা অবশ্য ঈষ্টলীনের পুষ্পবাটিকা সমূহের অপূর্ব্ব সুষমা নয়। --শাক শব্জী, তরীতরকারী, শসা কুমড়া প্রভৃতি কোথায় কেমন হইয়াছে, তাই তিনি বার্বারাকে দেখাইতে লাগিলেন। বিঘার পর বিঘা ভরিয়া হাজার সুন্দর ফুল ফুটিয়া থাক, তার চেয়ে দু কাঠা জমিতে কিছু শাক আর শসা কুমড়া হইলে কর্ণী বিবি তার কদর অনেক বেশী করিতেন।

তবে ফুল কি শসা কুমড়া কোনও দিকেই বার্বারার মন ছিল না। বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করিল, "ওঁকে আপনার কেমন লাগে?"

"মন্দ নয়! যা ভাবিয়াছিলাম তার চেয়ে অনেক ভাল। না, অমন বড় লোকের মেয়ে হউক, সে রকম ঠাট ঠমক দেমাকী চাল কিছুই নাই। তবে আর্কিবাল্ড ছাড়া আর কিছুই যেন জানে না। তাকে নিয়াই মত্ত হইয়া আছে একেবারে। আর্কিবাল্ড যখন বাড়ীতে ফেরে, পথের দিকে চাহিয়া থাকে সে কেমন, যেন বিড়াল ইন্দুরের আশায় চাহিয়া আছে। আর্কিবাল্ড বাহিরে গেলে একেবারে মনমরা হইয়া যায়।"

পথের পাশেই একটি গোলাপ-গাছ ছিল, --বার্বারা একটি ফুল তুলিয়া নিল, তার পাঁপড়ী ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে কহিল, "কি করে তখন বাড়ীতে?"

"কি করে? একদম কিছুই না। এই একটু গায়, আবার একটু বাজায়,—না হয় বই নিয়া একটু পড়ে, --, আর কেউ যদি আসে, তাদের সঙ্গে একটু কথাবার্ত্তা বলে! এইত! এই রকম একেবারে নিষ্কর্ম্মা ভাবেই দিনগুলা কাটাইয়া দেয়। সকালে ব্রেকফাষ্টের পর আর্কিবাল্ডকে ভুলাইয়া সে বাগানে বেড়াইতে নিয়া যায়। আফিসে যাইতে তার অনেক দেরী হইয়া যায়! এই রকম দেরী করা কি উচিত? বেড়ায় ত যত পারে, তারপর নাচিতে নাচিতে একেবারে ওই ময়দানের ফটক পর্য্যন্ত যায়। আরও দেরী তাতে হয়। একা হইলে আর্কিবাল্ড অর্দ্ধেক সময়ে ফটক পার হইয়া যাইতে পারে। সে দিন ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি পড়িতেছিল, তবু গেল। আমি বলিয়াছিলাম, বৃষ্টির জলে পোষাক নষ্ট হইয়া যাইবে। তা বলে কি জান? ওতে আর কি হইবে? আর্কিবাল্ড শেষে গায়ে একটা শাল জড়াইয়া দিয়া তাকে নিয়া গেল। বড়লোকের মেয়ে— পোষাক নষ্ট হইবে, সেটা যেন গ্রাহ্যই সে করে না! আবার বৈকালে গিয়া ফটকের কাছে দাঁড়াইয়া থাকে,— আর্কিবাল্ড আসিবে তাই! আজও যাইত। তুমি আছ, তাই যায় নাই। আর্কিবাল্ডের কি হইয়াছে জান?—আগে বউ, তারপরে তার কাজ!"

বার্বারা অতি প্রয়াসে একটা উদাসীন ভাব দেখাইয়া উত্তর করিল, "ইহাই বোধ হয় স্বাভাবিক।"

"স্বাভাবিক! না তার মাথা আর মুণ্ডু! আমি তাদের সাথে বড় একটা মিলি মিশি না, বৈকালে সন্ধ্যার দিকে ত একেবারে তাদের কাছেও ঘেঁসি না। দুজনে হাত ধরাধরি করিয়া বাগানে বেড়ায়—না হয় ত গান গায়,—আর আর্কিবাল্ড তার উপরে ঝুঁকিয়া থাকে সে কেমন—যেন সোণার গড়া একটা পুতুলও! ওর রকম দেখিয়া আমার মনে হয় কি জান? যত সোণা পৃথিবীতে আছে, তার চেয়েও তার স্ত্রীর কদর সে বেশী করে! কাল কি হইয়াছিল জান? গাড়ী চড়িয়া কোথায় দুইজনে বাহির হইল, সাতটা বাজিয়া গেল তবু ফেরে না। এক ঘন্টার উপরে ডিনারের জন্য আমাকে বসিয়া থাকিতে হয়। আর্কিবাল্ডের আবার খুব মাথা ধরিয়াছিল,—ডিনারের পরেই সে পাশের ঘরে গিয়া একটা সোফায় শুইয়া পড়িল।—বউটা এক কাপ চা লইয়া তার কাছে গেল,—আর দেখি ফেরে না। তার নিজের চা টেবিলে পড়িয়াই রহিল, একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গেল, তবু তার দেখা নাই। আমি তাকে ডাকিতে গেলাম।—দরজা খুলিয়াছি, ওমা! দেখি কি বউ তার রুমাল অডিকলোনে ভিজাইয়া আর্কিবাল্ডের

কপালে দিয়া রাখিয়াছে। আর নিজে হাঁটু গাড়িয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া হাঁ করিয়া বসিয়া আছে! আবার আর্কিবাল্ড তার হাত দুখানি বাড়াইয়া তাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। আচ্ছা, বল ত একটা পুরুষের সঙ্গে এ সব কি ন্যাকামো? আর কেনই বা এ সব ন্যাকামো? বিয়ের আগে আর্কিবাল্ডের মাথা কখনও ধরিলে আমি ঔষধ খাওয়াইয়া অমনি শুইতে পাঠাইয়া দিতাম। বেশ একটা ঘুম হইলেই মাথা ধরা টরা সব সারিয়া যায়।"

বার্বারা কোনও উত্তর করিতে পারিল না,—মুখখানি আর একদিকে ফিরাইয়া নিল।

এমন সময় বাগানের মালী এই দিকে আসিল।—কর্ত্রীবিবি তার সঙ্গে বাগানের কি কাজ নিয়া তর্কে তর্কে ঝগড়া বাধাইয়া তুলিলেন। বার্বারা বিরক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিল। একটি ঘরে লেডী ইজাবেল পিয়ানো বাজাইয়া গান করিতেছিলেন, কার্লাইলও সেই ঘরে ছিলেন। বার্বারা দরজাটা একটু ফাঁক করিয়া উঁকি দিয়া দেখিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, ঘরে তেমন আলো ছিল না, তবু বার্বারা স্পষ্ট দেখিতে পাইল, ইজাবেল পিয়ানোর কাছে বসিয়া বড় মিষ্ট একটা গান করিতেছেন, আর কার্লাইল মুগ্ধভাবে সম্মুখে ঝুঁকিয়া তার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছেন!

গান হইল, ইজাবেল জিজ্ঞাসিলেন, "এই গানটি তুমি কেন এত ভালবাস আর্কিবাল্ড?"

"কেন, তা ত জানি না। তোমার গান শুনিবার আগে এত ভাল আমার লাগিত না।"

ইজাবেল কহিলেন, "ওঁরা বোধ হয় ফিরিয়া আসিয়াছেন, চল, আমরা এখন ওঘরে যাই।"

"আর এই গানটি গাও আগে, তারপর যাইব, বড় চমৎকার গানটা।" আর্কিবাল্ড একটি গান ইজাবেলকে দেখাইয়া দিলেন। ইজাবেল গায়িলেন।—গানটির যেমন সুন্দর ভাব, সুরও তেমনই মধুর ছিল। ইজাবেল গায়িলেনও অতিমিষ্ট!—মৃদুকণ্ঠে ইজাবেল গায়িতেছিলেন, শেষ সুরগুলি যেন স্নিগ্ধ নীরব সান্ধ্য বায়ুতে ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল।

ইজাবেল ফিরিয়া স্বামীর দিকে তাঁর সুন্দর মুখ তুলিয়া কহিলেন, "অন্ততঃ দশটি গান তোমাকে আজ শোনাইলাম। তা আমাকে ইনাম দিবে না?"

কার্লাইল স্নেহে তার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া আবেগভরে কয়েকটি চুম্বন তাহাতে অঙ্কিত করিলেন। বার্বারা আর দেখিতে পারিল না। সরিয়া আসিল,—বাহিরের দিকে একটা জানালার কাছে গিয়া তার সাসির উপরে মুখখানা চাপিয়া ধরিল। বুক ভাঙ্গা একটা বেদনার ধ্বনি মুখে নির্গত হইল।

একটু পরেই কার্লাইল ও ইজাবেল সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। বার্বারাকে একা দেখিয়া ইজাবেল একটু লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "আপনি একা এখানে আছেন মিস্ হেয়ার? আমাকে মার্জ্জনা করুন। আমি ভাবিয়াছিলাম, আপনি মিস কার্লাইলের সঙ্গে বাগানে বেড়াইতেছেন।

কার্লাইল জিজ্ঞাসিলেন, "কর্ণেলিয়া কোথায় বার্বারা?"

"আমি ত এই আসিলাম। তিনিও বোধ হয় এখনই আসিবেন।"

বলিতে বলিতে কর্ণেলিয়ার উগ্র মূর্ত্তি ও তীব্রকণ্ঠ সকলের দৃষ্টির ও শ্রুতির গোচর হইল।

"আর্কিবাল্ড, মালীকে তুমি কি বলিয়াছ? জেরানিয়াম ফুল গুলি চৌকোঠা করিয়া লাগাইবার কথা বলিয়াছিলাম। তা সে বলে, তুমি নাকি আবার তা গোল করিয়া লাগাইতে বলিয়াছ।"

"হাঁ, ইজাবেল, তাই পছন্দ করে।"

"কিন্তু চৌকোঠাই যে ভাল দেখাইবে।"

"যাই হ'ক, মালীকে গোল করিয়া লাগাইতেই বলা হইয়াছে।"

"মালীটা একেবারে আস্ত গাধা, একগুয়ে একটা ষাড়! কোনও কথা যদি বোঝে, কি বলিলে শোনে।"

কার্লাইল ধীরভাবে উত্তর করিলেন, "আমি ত তাকে খুব ভাল চাকর বলিয়াই মনে করি।"

"তা ত করিবেই। কারও দোষ ত্রুটী তোমার চক্ষে পড়িলে ত? এ সব বিষয়ে বরাবরই তুমি এমনি আহাম্মক।"

কার্লাইল হাসিয়া উঠিলেন। স্বামীকে এইরূপ গালি দেওয়ায় ইজাবেলের মনে মনে বড় রাগ হইল, কিন্তু কোনও উত্তর তিনি করিলেন না। চায়ের টেবিলের কাছে যাইতে যাইতে কার্লাইল একটু হাসিয়া একবার

ইজাবেলের ও একবার বার্বারার দিকে চাহিয়া মাত্র কহিলেন, "তা সকলে এরকম মনে করে না।"

চা খাওয়া হইল,—গল্প উল্পও চলিল। হঠাৎ ঘড়ীতে ১০টা বাজিল। বার্বারা চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

"ইস্! এত রাত্রি হইয়াছে! আমাকে নিতে বোধ হয় লোক আসিয়াছে।"

"আচ্ছা দেখি," এই বলিয়া ইজাবেল উঠিলেন। কার্লাইল তাড়াতাড়ি গিয়া ঘণ্টাটা টিপিলেন। ভৃত্য আসিয়া জানাইল, মিস্ বার্বারাকে নিতে কেহ আসে নাই।

বার্বারা কহিল, "তা হলে পিটার আমাকে গিয়া দিয়া আসুক। মা বোধ হয় সকালেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। বাবাও আমার কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। এর পর দরজা বন্ধ হইলে আমাকে বাহিরে থাকিতে হইবে যে।"

এই বলিয়া বার্বারা একটু হাসিল।

কার্লাইল কহিলেন, "হাঁ, যেমন সেই একদিন তুমি প্রায় বাহিরে রহিয়া গিয়াছিলে।"

সেই যে রাত্রিতে রিচার্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল—সেই দিনের কথা মনে করিয়া কার্লাইল এই কথাটা বলিয়া ফেলিলেন।

বার্বারা একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া উত্তর করিল, "থাক্ আর্কিবাল্ড, সে কথা আর কেন?"

ইজাবেল বড় বিস্মিত হইলেন। ব্যাপার কি! ইহারা দুই জনে এত রাত্রি বাহিরে ছিলেন কেন?

বার্বারা কহিল, "পিটার যাইতে পারিবে কি?"

"পিটার কেন? চল, আমিই তোমাকে পৌঁছিয়া দিয়া আসি। রাত্রি বড় বেশী হইয়াছে।"

দুইজনে বাহির হইলেন। কতদূর গিয়া একটা মাঠের পথ ধরিয়া চলিলেন। বড় সুন্দর নিস্তব্ধ রাত্রি, আকাশ পরিষ্কার। জ্যোৎস্না ছিল না, কিন্তু নক্ষত্রালোকে চারিদিক বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। বার্বারার মনে পড়িল, সেই রাত্রির কথা—সেই যে আর্কিবাল্ড এমনই পথ চলিতে তার বিবাহের সম্ভাবনার কথা বার্বারাকে বলিতেছিলেন, আর কত আশাতেই বার্বারার বুক ভরিয়া উঠিতেছিল। হায়, কি বৃথাই আজ সব হইয়াছে! তার ব্যর্থ ভালবাসা, তার এই দারুণ ঈর্ষা, আশাভঙ্গের গভীর বেদনা, বড় মর্ম্মদাহকর একটা অবমাননার গ্লানি আর্কিবাল্ডের বিবাহ হইয়াছে অবধি তার চিত্তকে একেবারে ক্ষতবিক্ষত করিতেছিল। তবু এতদিন কোনও মতে সে আত্মসম্বরণ করিয়া চলিতেছিল। কিন্তু আজ গভীর নিশায় এই নিভৃত পথে আর্কিবাল্ডের এত কাছে বুকের সব বেদনা সকল সংযমের বাঁধ ছাড়াইয়া উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। কিছুতেই বার্বারা তাহা চাপিয়া রাখিতে পারিল না।

কার্লাইল সহজ ভাবে একথা ওকথা কত কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। হায়! তিনি ত জানেন না, কি তুমুল ঝটিকার আবর্ত্ত বার্বারার হৃদয় ভরিয়া বহিতেছিল। কি একটা কথা তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন,—বার্বারা উত্তর করিল না, উত্তর করিবার শক্তি তখন বার্বারার ছিল না। সহসা গভীর বেদনাময় একটা রোদনধ্বনি বার্বারার মুখে ব্যক্ত হইল। কার্লাইল চমকিয়া ফিরিয়া চাহিলেন।

"একি বার্বারা! কি হইয়াছে? তোমার কি হঠাৎ অসুখ করিল কিছু?"

বার্বারা আর পারিল না। সমস্ত দেহের বন্ধন আলোড়িত করিয়া সকল রুদ্ধ বেদনা তার প্রচণ্ডবেগে আপনাকে প্রকাশ করিল,—সমস্ত শরীর তাহাতে আক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। কার্লাইল তাড়াতাড়ি একটা বেড়ার দরজার কাছে তাকে নিয়া বসাইলেন। কিছুক্ষণ পরে বার্বারা কতকটা প্রকৃতিস্থ হইল। কার্লাইলের হাত ঠেলিয়া দিয়া সে উঠিল, সেই দরজার গায়ে হেলিয়া দাঁড়াইল।

কার্লাইল জিজ্ঞাসিলেন, "একটু সুস্থ বোধ করিতেছ বার্বারা? কি হইয়াছিল? কিসে এমন হইল?"

অধীর আবেগে বার্বারা বলিয়া উঠিল—

"কিসে এমন হইল? হায়! তুমি আজ এই কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ?"

কার্লাইল স্তব্ধ হইয়া গেলেন। কখনও যাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই, আজ যেন সেই অপ্রিয় সত্যের আভাস তাঁহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিতেছিল।

ধীরে ধীরে তিনি কহিলেন, "বার্বারা, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যদি আমার কোনও ব্যবহারে তুমি ব্যথা পাইয়া থাক, জানিবে তার জন্য বড় দুঃখিত আমি।"

"দুঃখিত! হাঁ, তা বই কি? আমার সুখ দুঃখে তোমার আসিয়া যায় কি? কাল যদি আমি কবরের তলে

যাই, তাতেই বা তোমার কি? তোমার স্ত্রী আছে, তাকে নিয়াই তুমি সুখে থাকিবে। আমি কে?"

"চুপ!"

এই বলিয়াই কার্লাইল ত্রস্ত একবার চারিদিকে চাহিলেন। সব তিনি এখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। বার্বারা একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছে। দৈবাৎ যদি কেহ শোনে, বার্বারার যে একেবারে মুখ থাকিবে না। তাই তিনি তাকে সাবধান করিয়া বলিলেন, "চুপ!"

"চুপ! হাঁ, চুপ করিতেই এখন আমাকে বলিবে বই কি? আমার এ দুঃখ তোমার কাছে এখন কিছুই ত নয়। আর্কিবাল্ড কার্লাইল, যে দারুণ দুঃখ আমি পাইতেছি, তার চেয়ে মরণও যে আমার ভাল হইত! উঃ! কি করিয়া এ দুঃখ আমি সহিব!"

কার্লাইল একটু ক্ষুণ্ন ভাবেই উত্তর করিলেন, "বার্বারা তোমার কথার মর্ম আমি বুঝি নাই, তা আর বলিতে পারি না। বাল্যাবধি ভগ্নীর ন্যায় তোমাকে স্নেহ করি। কিন্তু তার উপরে কোনও ভাব আমার আছে, এমন কি কখনও কোনও ব্যবহারে তোমাকে বুঝিতে দিয়াছি?"

"দেও নাই! কেন তবে সর্ব্বদা আমাদের বাড়ীতে আসিতে? ছায়ার মত আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতে? এই লকেট্ আর এই হার কেন তবে আমাকে দিয়াছিলে? ভাইএর চেয়েও বেশী ঘনিষ্ঠ ভাবে কেন তবে আমার সঙ্গে মিশিতে—"

"না বার্বারা, তোমার ভাইএর মতই তোমার সঙ্গে মিশিয়াছি, তার বেশী কোনও ভাব কখনও দেখাই নাই। সেরূপ কোনও ভাব অনুভবও কখনও করি নাই!"

"কর নাই! কর নাই! ভাইএর মত—তার বেশী নয়! উঃ! আমার মনের কথা কিছুই কি তুমি বুঝিতে পার নাই? আমার ভালবাসা পাইয়াছিলে, একথাটা একবারও কি ভাব নাই?"

অধীর উত্তেজনায় আত্মহারা বার্বারার কণ্ঠস্বর ক্রমে আরও উচ্চে উঠিতেছিল। কার্লাইল কহিলেন, "চুপ বার্বারা, শান্ত হও, ধীরভাবে একটু বিবেচনা কর। তোমার বড় ভাইএর মতই তোমাকে বড় স্নেহ করিয়াছি, আদর করিয়াছি। কিন্তু আমার কোন ব্যবহারে যদি তুমি এরূপ মনে করিয়া থাক যে প্রেমিকের চক্ষে তোমাকে দেখিয়াছি, তবে—কি আর বলিব? যারপরনাই দুঃখিত আমি হইতেছি, আমাকে ক্ষমা করিও। জানিও, আমি একেবারেই তা বুঝিতে পারি নাই?"

বার্বারা তখন কিছু শান্ত, কিছু প্রকৃতিস্থ হইয়া আসিতেছিল। উত্তেজনার উদ্বেলতাও অনেকটা নামিয়া পড়িয়াছিল। বিবর্ণ মুখখানি তুলিয়া স্থিরদৃষ্টিতে কার্লাইলের দিকে চাহিয়া সে কহিল, "যদি 'সে' আমাদের মধ্যে আসিয়া না পড়িত, তবে কি তুমি আমায় ভালবাসিতে?"

"জানি না, কেমন করিয়া জানিব? তোমাকে ত বলিলাম বার্বারা, বাল্যাবধি ভগ্নীর ন্যায়, বন্ধুর ন্যায়, তোমাকে দেখিয়াছি। পরে কি হইত, তা ত বলিতে পারি না।"

বার্বারা উত্তর করিল, "যদি না লোকে জানিত, তবে বোধ হয়, আর একটু সহজে এই ব্যথা আমি সহিতে পারিতাম। ওয়েষ্টলীনে সকলেই বলাবলি করিত, তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ হইবে। কিন্তু এখন সকলেই বড় একটা করুণার চক্ষে আমাকে দেখিতেছে। আমাকে যদি মারিয়া ফেলিতে আর্কিবাল্ড, এই দুঃখ এই গ্লানির চেয়ে তাও যে আমার ভাল হইত।"

"কি আর করিতে পারি বার্বারা? বড় গভীর বেদনা আমি পাইতেছি, আর ভরসা করি, শীঘ্রই এসব কথা তুমি ভুলিয়া যাইবে। আর, আজ এই যে কথাবার্ত্তা আমাদের হইল, তাও আমরা মনে রাখিব না। যেমন ছিলাম, তেমনই বন্ধু, তেমনই ভাইবোনের মত আমরা বরাবর থাকিব। একটা কথা বিশ্বাস করিও বার্বারা,—আজ যে সব কথা তুমি বলিলে তার জন্য তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধার হানি একটুও হইবে না।"

আর অপেক্ষা করা অস্বাভাবিক, সঙ্গতও নয়। কার্লাইল বেড়ার দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু বার্বারা নড়িল না। দুটি চক্ষু বহিয়া তার অশ্রুধারা বহিতেছিল।

"কে! মিস্ বার্বারা?"

সহসা যেন অস্ত্রাহতের ন্যায় বার্বারা চমকিয়া উঠিল। ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, বেড়ার দরজার ওধারেই তাদের

প্রধানা দাসী উইলসন্ † দাঁড়াইয়া। কে জানে, কতক্ষণ সে বেড়ার ওপারে দাঁড়াইয়া ছিল! উইলসন অবশ্য বলিল, তাদের চাকর জ্যাস্পার কোথায় গিয়াছে, অনেক দেরী হইতেছে দেখিয়া মিসেস্ হেয়ার বার্বারাকে লইয়া যাইতে তাকেই পাঠাইয়াছেন। কার্লাইল বার্বারাকে বেড়ার দরজা পার করিয়া দিলেন, বার্বারা কহিল, "তোমার আর আসিবার দরকার নাই।"

"না, তোমাকে বাড়ী পর্য্যন্তই পৌঁছিয়া দিয়া আসি।"

নিঃশব্দে তাঁহারা বাড়ীর দরজার কাছে আসিলেন। উইলসন পশ্চাতে একটু দূরে ছিল। বার্বারার হাত ধরিয়া কার্লাইল কহিলেন, "আসি তবে। ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন।"

বার্বারা ধীর স্বরে কহিল, "আমি একেবারে আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলাম। যা বলিয়া ফেলিয়াছি মনে রাখিও না।"

"না, বলিয়াছি ত মনে তা কিছু রাখিব না।"

"তোমার স্ত্রীর কাছে এসব কথা বলিবে না ত?"

"ছি বার্বারা! কি বলিতেছ?"

"ধন্যবাদ! এস তবে।"

কার্লাইল কহিলেন, "ভরসা করি বার্বারা, শীঘ্রই এমন কেহ আসিবে যে আমার অপেক্ষা তোমার ভালবাসার অধিকারে যোগ্যতর হইবে।"

"কখনও না। এত সহজে ভালবাসিয়া আমি ভুলিতে পারি না। আজীবন আমি বার্বারা হেয়ারই থাকিব।"

আর্কিবাল্ড ফিরিয়া গেলেন। বার্বারার কথাই তাহার চিত্ত ভরিয়া জাগিতেছিল। ঈষ্টলীনের বাগান কেবল পার হইয়াছেন, দেখিলেন ইজাবেল একটি গাছের নীচে দাঁড়াইয়া আছে।"

"একি ইজাবেল! তুমি!"

"হাঁ, তোমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছি। এত দেরী যে তোমার হইল?"

"হাঁ, একটু দেরীই হইয়া গেল। তাদের একটি দাসীও আসিতেছিল, তা একেবারে বাড়ী পর্য্যন্তই বার্বারাকে পৌঁছিয়া দিয়া আসিলাম।"

"হেয়ার পরিবারের সঙ্গে তোমাদের খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে?"

"হাঁ, কর্ণেলিয়ার আত্মীয় তাঁহারা।"

"বার্বারা খুব সুন্দরী—নয়?"

"হাঁ, সুন্দরী বই কি?"

"বার্বারা এমন সুন্দরী, আবার এত ঘনিষ্ঠতাও তাদের সঙ্গে তোমাদের আছে।—আমি এক একবার ভাবি, তাকে তুমি ভালবাসিলে না কেন?"

কার্লাইল হাসিয়া উঠিলেন। এইমাত্র যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তা মনে করিয়া কেমন যেন একটু কুণ্ঠিতও হইলেন।

ইজাবেল আবার জিজ্ঞাসিলেন, "সত্য তাকে কখনও ভালবাস নাই?"

"তাকে ভাল বাসিয়াছি! কি বলিতেছ ইজাবেল? মাথায় তোমার কি ঢুকিয়াছে? একজনকে বই কাহাকেও জীবনে আমি ভালবাসি নাই, আর সেই একজনকেই বিবাহ করিয়াছি।"

(ক্রমশঃ)

কোরিয়ায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার

কোরিয়ার আদিধর্ম্ম ও বিদেশীসংস্রব

প্রশান্ত মহাসাগরে চীন ও জাপানের মধ্যে যে বৃহত্তম উপদ্বীপটি আছে, তাহাকে আমরা কোরিয়া বলিয়া জানি। জাপান তদ্দেশবাসীর নিকট "উদীয়মান সূর্য্যের দেশ" নামে অভিহিত। চীনসাম্রাজ্য "স্বর্গরাজ্য" নামে খ্যাত। আমরা ভারতবর্ষকে দেবভূমি বলিয়া ভক্তি করি। ভৌগোলিক নাম ছাড়া অনেক দেশের একটি করিয়া আলাদা নাম আছে। সেই যে-বিশেষ নাম, যে দেশে জন্মিয়াছি তাহার প্রতি উহা আমাদের মমত্বের এবং আন্তরিক ভক্তির নির্দ্দেশক। কোরিয়ারও একটি বিশেষ নাম আছে—"সন্ধ্য প্রাতভূমি"

* উইলসন এই দাসীর পদবী, নাম নয়। অনেক সময় দাসদাসীদের কেবল পদবী ধরিয়া ডাকা হয়। এই দাসীটির নিজের নাম কোথাও উল্লেখ হয় নাই।

† এই প্রবন্ধের অধিকাংশ বিবরণ W. E. Griffis প্রণীত Corea? The Hermit Nation নামক পুস্তক হইতে গ্রহণ

বা প্রত্যুষের দেশ।" * কিন্তু দেশবাসী দেশের স্নিগ্ধতা ভোগ করিতে পারে নাই। দুর্ব্বল বলিয়া বহু পুরাকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত কখন চীন, কখন জাপান কোরিয়ার প্রতি অত্যাচার করিয়া আসিতেছে। একালে সুসভ্য য়ুরোপের পুজদৃষ্টির ঝাঁজ কোরিয়াকে কম সহিতে হয় নাই।

ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে কোরিয়ার কথা পাশ্চাত্য দেশবাসী জানিতই না। আরব বণিকেরা কোরিয়া হইতে পশুশৃঙ্গের দ্রব্য, ঘোড়ার জীন, সাটীনের কাপড়, চীনামাটির বাসন, কর্পূর, দারুচিনি, আদা প্রভৃতি স্বদেশে আমদানী করিত। আরবদের নিকট হইতে কোরিয়ার কথা য়ুরোপ-বাসী জানিতে পারে। য়ুরোপ ক্রমশঃ জ্ঞানে বিজ্ঞানে উন্নত হইল, দেশে দেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইল। খৃষ্ট-শিষ্যেরা কোরিয়ায় আসিলেন—ধর্ম্মপ্রচার করিতে, আরও অনেক তত্ত্ব প্রচার করিতে; সঙ্গে খাপে শাণিত তরবারী, এবং অন্য আধারে গোলাবারুদ আনিতে ভুল করিলেন না। এই সকল খৃষ্টশিষ্যদের কল্যাণকর্ম্মের ফলে বহু কোরিয়া-বাসীর রক্তপাত হইয়া গিয়াছে। খৃষ্টশিষ্যেরা ধর্ম্মপ্রচার উদ্দেশে যেখানেই গিয়াছেন, সেখানেই তাঁহারা স্বদেশের রাষ্ট্রশক্তির উপর নির্ভর করিয়া গিয়াছেন,—বিশুদ্ধ ক্ষমাধর্ম্মই একমাত্র সম্বল করিয়া যান নাই। অধিকন্তু অনেক মিশনারী —অনেক সময় হয়ত বা তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে—স্বদেশের রাষ্ট্রীয় স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্ররূপে ধর্ম্মপ্রচারার্থে পরদেশে গিয়াছেন। এই জন্যই দেখা যায় যে, ক্ষমাধর্ম্মের অবতারস্বরূপ ছিলেন যিনি, তাঁহার শিষ্যেরা একটু রাগিয়া সাড়া দিতেই সঙ্গীনের ঘায়ে বরষার বারিধারা প্রায় বহু "না-খৃষ্টানদের" রক্তপাত হইয়া গিয়াছে। প্রচার ধর্ম্মের ইতিহাসের সহিত প্রতিহিংসা, যুদ্ধবিগ্রহ, রক্তারক্তি ব্যাপার জড়িত আছে। "অক্কোধেন জিনে কোধং" ইহা বুদ্ধবাণী।* বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, মহাপুরুষের ঐ বাণী নিষ্ফল হয় নাই। কোরিয়ার ভিক্ষুরা রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় সাক্ষাৎভাবে যোগ দিয়াছিলেন, বহু সময়ে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু তরবারীর ঘায়ে তাঁহারা ধর্ম্মপ্রচার করেন নাই। কোরিয়ার শিক্ষা সভ্যতা, বৌদ্ধ ও কনফুশিয়াল ধর্ম্ম চীনের কল্যাণে প্রাপ্ত। চীন নানাসময়ে কোরিয়ার উপর কতরূপ অত্যাচার করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের ধর্ম্মপ্রচারের ইতিহাস রক্তপাতে কলঙ্কিত হয় নাই।

ঐতিহাসিক প্রমাণ যতদূর পাওয়া যায়, ৩৭২ খৃষ্টাব্দে কোরিয়ায় প্রথম বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়। ইহারপূর্ব্বেই কোরিয়ায় কনফুশাসের ধর্ম্মমত প্রচারিত হইয়াছিল। কোরিয়ার নিজস্ব ধর্ম্ম—অপদেববাদ। ভূতপ্রেত-পূজা প্রাগৈতিহাসিকযুগ হইতে কোরিয়ায় প্রচলিত। রোগ হইল কেন?—দেহে অপদেবতা প্রবেশ করিয়াছে। মৃত্যু অপদেবতারই কার্য্য। ঐ যে সমুচ্চ পর্ব্বত মেঘলোকে উঠিয়াছে উহা কোন দুরন্ত শক্তির লীলা। ঊর্দ্ধে আকাশে যে মেঘরাজি ঘুরিয়া বেড়ায়, উহারাও দৈবশক্তিশালী। স্রোতস্বতী নাচিয়া চলে, ফুলিয়া কাঁপিয়া তরঙ্গাঘাতে গ্রাম জনপদ ভাঙ্গে গড়ে, সে নিশ্চয়ই প্রাণবতী। নিজ খেয়ালবশে সেও মানুষের মঙ্গলামঙ্গল সম্পাদনের ক্ষমতা রাখে। যে বায়ুতরঙ্গে আমরা ডুবিয়া আছি, তাহার মধ্যে অসংখ্য মঙ্গলামঙ্গলকারী দেবতা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। স্বর্গ ও মর্ত্ত্যভূমি, সুদূর আকাশের শুকতারা—ইহারা সকলেই দৈবশক্তিবলে আমাদের সুখ-দুঃখের নিয়ন্তা। বৃক্ষের এবং শস্যের দেবতা আছেন। পাকের ঘরের দেবতা আছেন। এসব দেবতা এবং অপদেবতা যেখানে, সেখানে আপদ শান্তির জন্য পূজা-পার্ব্বণের ঘটা লাগিয়াই থাকে। বিভীষিকাগ্রস্ত কোরিয়ায় বুজরুকী এবং ভোজবাজীর একাধিপত্য। অসংখ্য ওঝা দৈবমঙ্গলত্রাতারূপে ভীতিবিহ্বল লোকসমাজের শ্রদ্ধাভক্তি ও অর্থ অর্জ্জন করিয়া বেড়ায়।

মৃত্যুর পর মানুষ নিঃশেষে শূন্য হইয়া যায় না। তাহারা জীবিত আত্মীয় স্বজনের কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করে—এই বিশ্বাসে কোরিয়ার ঘরে ঘরে পূর্ব্বপুরুষের, মৃত আত্মীয় স্বজনের পূজা কোন্ পুরাকাল হইতে আজিও চলিয়া আসিতেছে। মৃতব্যক্তির নাম ফলকে লেখা থাকে, তাহার নিকট পূজা হইতেছে।

রোগ হইল কেন? তাহার নিদান আবিষ্কার করিতে

করিয়াছি। অন্যান্য যে সকল গ্রন্থের সাহায্য পাইয়াছি তন্মধ্যে Angus Hamilton প্রণীত Corea, H. Hackmann প্রণীত Buddhism as a Religion J.L. Bird প্রণীত Corea and Her Neighbours প্রভৃতি গ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সকল গ্রন্থকারদের নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি—লেখক।

* Land of the Morning Calm.

* অক্কোধেন জিনে কোধং, অসাধু সাধুনা জিনে। জিনে কদরিয়ং দানেন, সচ্চেন অলিকবাদিনং—ধর্ম্মপদ।

না পারিয়া মানুষ অপদেবতার পূজা দেয়; মনে করে, মানবদেহে রোগ অপদেবতার ক্রোধজাত। যেখানে মানুষ নিজকে ছোট মনে করিয়াছে, সেই খানেই দেবতা কল্পিত হইয়াছে। ইহা সভ্যতার পূর্ব্ব অবস্থা। সেই সময়ে কোরিয়াবাসী

শশী, তারা, রবি,
সাগর নির্ঝর, ভূধর, অটবী

সকলের পূজা করিয়াছে।

খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব হইতেই কোরিয়ায় কনফুশাসের ধর্ম্ম প্রচলিত হয়। তৎপূর্ব্বে কোরিয়াবাসীর চিন্তাশক্তি বস্তুর গণ্ডীতেই আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। কনফুশাসের ধর্ম্ম সমাজে স্নেহ প্রেম ভক্তি, রাষ্ট্রে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার ধর্ম্ম। ইহাও প্রধানতঃ ইহজগৎ লইয়া। এই সময়ে কোরিয়াবাসী চীনের ধর্ম্ম এবং সাহিত্যের পরিচয় লাভ করে। বস্তুর গণ্ডীবদ্ধ কোরিয়াবাসীর বুদ্ধি ইহাতে ব্যাপকতা লাভ করে। বৌদ্ধদের সহিত কনফুশাসদের চির-বিরোধ। তবুও আমার মনে হয়, অনেকস্থলে পূর্ব্বপ্রচলিত কনফুশাস ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের অনুকূল ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে। অন্যথা পূর্ব্ব এশিয়ার অনেক ক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার কার্য্য অধিকতর কষ্টসাধ্য হইত।

প্রচার প্রারম্ভ।

চীনের সান্নিধ্যহেতু উত্তর কোরিয়ায় প্রথমে চীনের শিক্ষা সভ্যতা প্রচারিত হয়। উত্তর চীনের শেনসি নামক প্রদেশে "চীন" নামক একটি রাজ্য ছিল। এখান হইতে সুন্দ নামক বৌদ্ধ ভিক্ষু ধর্ম্মপ্রচার-উদ্দেশে কোরিয়ায় গমন করেন। তিনি বরাবর কোরিয়ার রাজদরবারে গমন করিয়াছিলেন, বলিয়া কোন কোন ঐতিহাসিক অনুমান করেন যে, সুন্দ "চীন" রাষ্ট্রের রাজার প্রেরিত প্রচারক। ভিক্ষু সুন্দ ৩৭২ খৃষ্টাব্দে কোরিয়ায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে কোকুরাই প্রদেশের রাজধানীতে দুইটি বিহার নির্ম্মিত হয়। হিয়াকুসাই ছিল কোরিয়ার একটি নগণ্য রাষ্ট্র। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হওয়ায় জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রদেশবাসীর মনে প্রবল হইয়া উঠে। ৩৭৪ খৃষ্টাব্দে কো-কেন নামক জনৈক অধ্যাপক চৈন সাহিত্য শিক্ষা দিবার জন্য নিযুক্ত হ'ন। রাজা নিজে ছিলেন একার্য্যের প্রধান উৎসাহদাতা। বহু মনীষী ছাত্র আচার্য্য কো-কেনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া নবোৎসাহে জ্ঞানার্জ্জন করিতে আরম্ভ করেন। চীনের উন্নত সাহিত্যের রসাস্বাদ লাভ করিয়া এই সময়ে কোরিয়াবাসীর মনে মাতৃভাষার উন্নতিসাধন করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়া উঠে।

৩৮৪ কি ৩৮৫ খৃষ্টাব্দে পাক্‌চী রাজার আহ্বানে চীন সম্রাট কর্ত্তৃক আর একজন ভিক্ষু প্রচারক কোরিয়ায় প্রেরিত হ'ন। নবাগত প্রচারকের নাম মরানন্দ। তিনি তিব্বতবাসী। মরানন্দ একক কোরিয়ায় যা'ন নাই, আরও দশজন ভিক্ষু সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। প্রচারসৌকর্য্যার্থ বহু বৌদ্ধ মূর্ত্তি ও বৌদ্ধ গ্রন্থ আনিয়াছিলেন। সুচিন্তা, সুনীতি এবং গভীর দার্শনিক তত্ত্বের আধার বলিয়া বৌদ্ধ সাহিত্য যেমন জ্ঞানীর, বুদ্ধজীবনের এবং বৌদ্ধ ইতিহাসের সরল সরস সকরুণ সুনীতিগাথা সাধারণ জনগণেরও তেমনই আদরের সামগ্রী। বৌদ্ধসাহিত্যের কথা ও কাহিনী মূর্ত্তিতে খোদিত হইয়া এবং চিত্রে অঙ্কিত হইয়া সহজে সাধারণের মন আকর্ষণ করিত। ইহা প্রচারকার্য্যের অত্যন্ত আনুকূল্য করিত। এই জন্যই প্রচারকেরা যে কোন নূতন স্থানে ঐসকল সঙ্গে না লইয়া যাইতেন না। একটি ক্ষুদ্র প্রদেশে প্রচারকার্য্য আবদ্ধ না থাকিয়া যাহাতে ক্রমশঃ সমগ্র কোরিয়ায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ছড়াইয়া পড়ে ভিক্ষু মরানন্দ এই উদ্দেশ্য লইয়াই কোরিয়ায় গিয়াছিলেন। এবং সেই জন্যই অন্যান্য ভিক্ষু সঙ্গী এবং প্রচারের অনুকূল দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়াছিলেন।

প্রথমে উত্তর কোরিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও দক্ষিণ কোরিয়ায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবপ্রতিপত্তি অধিকতর স্থায়ী ও ব্যাপক হইয়াছিল। মরানন্দের আগমনের প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পরে দক্ষিণপূর্ব্ব কোরিয়ায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশ লাভ করে। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে দক্ষিণ কোরিয়ার অনেক স্থানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়। ক্রমশঃ সমগ্র কোরিয়ায় বৌদ্ধধর্ম্ম ছড়াইয়া পড়ে।

কোরিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ যুগ।

কোরিয়ার বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে যে অধ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা গৌরব মণ্ডিত তাহার আলোচনা করিবার পূর্ব্বে কোরিয়ার ইতিহাসের দুই একটি আরম্ভের কথার উল্লেখ করা প্রয়োজন।

দশম শতাব্দীতে কোরিয়ার উত্তর পশ্চিমে পুহাই নামক

একটি নবরাজ্য অভ্যুত্থিত হয়। পুহাই অনেক সময়ে চীনের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত থাকিয়াও দুই শতাব্দী ধরিয়া আত্মপ্রাধান্ত রক্ষা করিয়াছিল। তৎপর ক্রমশঃ পুহাই সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ঐ সকল ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্য কীটান নামক আর একটি নবগঠিত রাজ্যের প্রাধান্ত স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু কীটানেরা পুহাইয়ের লোকদের সুশাসনে না রাখিয়া তাহাদের উপর অত্যাচার করিত। একে ত চীনের সহিত সংগ্রামহেতু বহুকালাবধি ইহারা শান্তি ভোগ করিতে পারে নাই, তাহার উপর এই নূতন উপদ্রব। এতকাল সংগ্রামসময়ে চীনের বিরুদ্ধে কোরিয়াবাসী পুহাইকে লোক দিয়া, অর্থ দিয়া সাহায্য করিয়াছে; এখন পুহাই হইতে দলে দলে লোক পলাইয়া অসময়ের বন্ধু কোরিয়ার আশ্রয় লইতে লাগিল। কোরিয়ার ভূমি সহজ উর্ব্বরা। বাহির হইতে এই সকল নবাগত লোক সমাগমে উত্তর কোরিয়াবাসীর মনেও নূতনতর উৎসাহের সঞ্চার হইতে লাগিল। কৃষি শিল্পের উন্নতি হইল, ধনসমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কীটানদের উপদ্রবে দেশে একস্থানে স্থির হইয়া বাস করা অসম্ভব হওয়ায়, যাযাবর হইয়া বাস করা অপেক্ষা স্বদেশ পরিত্যাগ করাই পুহাই অধিবাসীরা শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছিল। কাজেই কোরিয়ার নবাগত লোক সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া চলিল। ইহাতে কোরিয়ায় লোকবল ও অর্থবল যেমন বাড়িল, তেমনই দেশমধ্যে নানারূপ চাঞ্চল্যেরও সৃষ্টি হইতে লাগিল। এরূপ অবস্থায় লোকসাধারণ শক্তিশালী রাজার সুশাসন চাহে। কোরিয়া তখন বহু ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত। যাঁহারা রাজদণ্ড পরিচালন করিতেন, তাঁহারা ছিলেন দুর্ব্বল। ফলে লোকচিত্তে অসন্তোষের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একটু সুশাসনগুণে দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইত, কিন্তু কে সেই কল্যাণকর্ম্ম সম্পাদন করে? দেশের এই দুরবস্থা—এই অভিনব অবস্থা—যিনি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলেন, এবং কোন্ পথে দেশের হিত তাহা যিনি ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলেন, তিনি একজন ভিখারী। ভিখারী হইলেও তিনি ছিলেন জ্ঞানী—বৌদ্ধ ভিক্ষু।

"বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়"—ইহা বুদ্ধবাণী। কোন পথে চলিলে কোরিয়ার কল্যাণ হইবে, ভিক্ষু প্রথমে জ্ঞাননেত্রে তাহা লক্ষ্য করিলেন। একটি বৌদ্ধ মঠে জ্ঞানানুশীলনে এবং ধর্ম্মচর্চ্চায় তাঁহার দিন কাটিতেছিল। তিনি বুঝিলেন, ব্রহ্মচারীর দৈনিক নির্দ্দিষ্ট অপরিবর্ত্তনীয় কর্ত্তব্য কার্য্যের কিছু পরিবর্ত্তন করা এখন অবস্থাভেদে ধর্ম্মসঙ্গত হইয়াই পড়িয়াছে। পুথিপত্র বাঁধিয়া তিনি যাহাকে সঙ্গী করিলেন তাহা ভিক্ষুজনের সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য অস্পৃশ্য—শানিত তরবারী। ভিক্ষুর নাম ছিল কুঙ্-বো। কুঙ্-বো বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়া স্বদেশবাসীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—"তোমরা যদি সুশাসন, শান্তি ও জ্ঞানোন্নতি চাহ, তবে এই সকল ক্ষুদ্র রাজ্য ভাঙ্গিতে হইবে, এই সকল দুর্ব্বল রাজার রাজদণ্ড কাড়িয়া লইতে হইবে। তোমরা অনুকূল হইলে, তোমাদের সাহায্য লাভ করিতে পাইলে

"এক ধর্ম্মরাজ্যপাশে
খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত কোরিয়া
বেঁধে দিব আমি।"

দলে দলে লোক বিদ্রোহীর পতাকাতলে মিলিত হইতে লাগিল। কুঙ্-বো বিদ্রোহীদল লইয়া প্রথমে কেউ চৌ বর্ত্তমান (ক্যঙ-চেন) আক্রমণ করেন। নগর অধিকার করিয়া বিজয়ী ভিক্ষু নিজকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন। তাহার পর তাঁহার আশা যখন ফলবতী হইবে, এমন সময়ে এক দুর্ঘটনা ঘটিল। রাজসিংহাসনলুব্ধ সেনাপতি ভিক্ষুরাজকে হত্যা করিলেন।

সেনাপতির নাম ওয়াঙ-কেন্। ওয়াঙ-কেনের জন্ম রাজবংশে। ভিক্ষুকে হত্যা করিবার সময় তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, একজন ভিক্ষু আর একজন রাজপুত্র, রাজ্য সুশাসিত এবং সুপরিচালিত করিতে রাজপুত্র নিশ্চয় যোগ্যতর ব্যক্তি। ওয়াঙ ভিক্ষু প্রভুকে হত্যা করিয়া সমগ্র কোরিয়া নিজ শাসনাধীনে আনিতে সক্ষম হইলেন। তাঁহার দ্বিতীয় কার্য্য সমগ্র কোরিয়ার কেন্দ্রস্থলে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করা। সুয়েলের নিকটবর্ত্তী কেউসেঙ নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী নির্ম্মিত হইল। দশম শতাব্দীর প্রথম হইতে ১৩৯২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই প্রায় চারিশত বৎসর ওয়াঙ-প্রবর্ত্তিত বংশ ঐ নগর হইতে কোরিয়ার রাজদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। এই চারিশত বৎসর কোরিয়ার ইতিহাসে, তথা কোরিয়ার বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে "স্বর্ণযুগ" বলিয়া কীর্ত্তিত।

ভিক্ষুরাজ কুঙ-বোকে হত্যা করিবার পাপকার্য্যে লিপ্ত থাকিলেও ওয়াঙ ছিলেন ভক্ত বৌদ্ধ। সমগ্র কোরিয়ার শাসনযন্ত্র সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া এই বৌদ্ধসম্রাট বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে মনোনিবেশ করেন। তাঁহার উৎসাহে কোরিয়ার নানা স্থানে, বিশেষতঃ দক্ষিণ কোরিয়ায় বহুবিধ মন্দির, পেগোডা, বিহারাদি নির্ম্মিত হয়। এই সকল ধর্ম্মমন্দিরে জ্ঞানলিপ্সু, ধর্ম্মপিপাসু কোরিয়াবাসীরা সম্মিলিত হইতে লাগিলেন। এই সময়ে চীনে শুঙ বংশের রাজত্বকাল। এই বংশ জ্ঞানানুরাগী বলিয়া খ্যাত। চীনের জ্ঞান ও ধর্ম্মের আন্দোলনতরঙ্গ কোরিয়ায় পৌছিতে লাগিল। ইহার উপর সম্রাটের উৎসাহ। যাহাতে জ্ঞান ও ধর্ম্মচর্চ্চা অব্যাহত ভাবে পরিচালিত হয়, বিহার মন্দির সুগঠিত হয় ও সুরক্ষিত থাকে, সম্রাট তজ্জন্য বহু ভূমির রাজস্ব ভিক্ষুদের হিতার্থে অর্পণ করেন। এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের পথ সুগম হইয়া উঠে।

ভিক্ষুদের শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট কার্য্য কেবল বিহারে আবদ্ধ নহে। তাহাদিগকে ভিক্ষার্থে বাহির হইয়া গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইত—স্বধর্ম্ম প্রচার করিতে হইত। ভিক্ষুরা কোরিয়ার গ্রামে গ্রামে বৌদ্ধধর্ম্মের দর্শন, নীতি-গাথা, মর্ম্মস্পর্শী বুদ্ধ-জীবন-কথা কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইত, আর দলে দলে কোরিয়াবাসী এই ধর্ম্মমত গ্রহণ করিত।

জ্ঞানী ভিক্ষুকদের হাতে পড়িয়া কোরিয়ার বর্ণমালা সুসংস্কৃত হয়। এই সময়ে কোরিয় ভাষায় বৌদ্ধগ্রন্থ রচিত, চীনভাষা হইতে বিভিন্ন গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছিল। চীন সাহিত্য কোরিয়বাসীরা খুব যত্ন সহকারে পড়িতে আরম্ভ করে, কিন্তু ইহাতেই তাহারা সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। এই সময়ে কোরিয়ায় মূল সংস্কৃত হইতে বৌদ্ধগ্রন্থাদি পঠিত আলোচিত হইতে আরম্ভ হয়। জ্ঞানচর্চ্চা এতকাল কেবলমাত্র উচ্চবংশীয় এবং উচ্চশিক্ষিত কতিপয় লোক মধ্যে আবদ্ধ ছিল। এই সময়ে কোরিয় ভাষায় বহু সহজ সরল ধর্ম্মপুস্তক লিখিত প্রকাশিত হওয়ায়, জনগণ মধ্যে শিক্ষা ও ধর্ম্মপ্রচারের খুব সুবিধা হইয়াছিল।

৯৪৫ খৃঃঅব্দে সম্রাট্ ওয়াঙের মৃত্যু হয়। তৎপ্রতিষ্ঠিত রাজধানী কেই-রেঙ তাহার জীবিতকাল মধ্যেই কোরিয়ার সর্ব্বপ্রকার আন্দোলন, উন্নতির কেন্দ্ররূপে পরিণত হইয়াছিল। জ্ঞান ধর্ম্মশিক্ষা, শিল্পবাণিজ্যের প্রচার দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতির দিকেই ওয়াঙের সমান দৃষ্টি ছিল। এই সময়ে জাপানী বৌদ্ধেরা কোরিয়ার নিকট নানারূপে সাহায্য পাইয়াছে। চীন কোরিয়াকে বৌদ্ধধর্ম্ম দান করিলেও পরবর্ত্তী কালে মধ্যে মধ্যে চীনভিক্ষুদের জ্ঞানানুশীলনার্থে কোরিয়ায় আগমন সংবাদ জ্ঞাত হওয়া যায়।

ওয়াঙের বংশধর-সম্রাটেরাও প্রবল বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। তাহাদের এই অনুরাগ কেবল মাত্র বৌদ্ধদের প্রচার কার্য্যে উৎসাহ-দান-মাত্রে পর্য্যবসিত ছিল না। অনেকে বৌদ্ধশাস্ত্র রীতিমত অধ্যয়ন করিতেন। কোন কোন রাজপুত্র রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিজেরা যেমন এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতেন, তেমনই প্রজাসাধারণকে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-সেবায় উৎসাহিত করিতেন। তিনপুত্রে যে পিতা ভাগ্যবান, তাহার একটীকে ভিক্ষু সঙ্ঘে দান করিতে হইবে, ওয়াঙ আমলে এই রাজবিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ওয়াঙ ও তৎপ্রবর্ত্তিত বংশের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে কোরিয়ার নানারূপে উন্নতি হয়। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে কোরিয়ায় রাষ্ট্র-বিপ্লব হইয়া ওয়াঙ বংশের পতন হয়। এই বংশের পতনে বৌদ্ধধর্ম্মের গৌরবের দিনও শেষ হয়, কারণ নূতন রাজারা ছিলেন বৌদ্ধধর্ম্ম বিদ্বেষ্টা।

ক্রমশঃ

শ্রীশশিকান্ত সেন।

পল্লীবধু

—[•]—

পুরুষগণ			স্ত্রীগণ		
সত্যহরি	...	কলিকাতা প্রবাসী গ্রাম্য জমিদার।	গিরিবালা	...	সত্যহরির স্ত্রী।
বিভাস	...	ঐ পুত্র, উকীল, ব্রাহ্মভাবাপন্ন।	ছায়া ও মায়া	...	ঐ কন্যাদ্বয়।
মনীশ	...	ঐ পুত্র, বিভাসের ভ্রাতা।	স্বাতী	...	ব্যারিষ্টার লাহিড়ী সাহেবের কন্যা।
নিতাই গোস্বামী	...	গ্রামের সম্রান্ত অধিবাসী, পণ্ডিত।	বড় মা	...	গ্রামের কর্ত্রী।
কমল	...	গ্রামবাসী গ্রাজুয়েট শিক্ষিত।	অন্যান্য।		
ক্ষিতীশ	...	বিভাসের বন্ধু।			
শিরীষ	...	জাল গোয়েন্দা।			

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পল্লীভবনের একটী কক্ষ

মনীশ ও কমল।

কমল :—কি মনীশ বাবু, আপনি ত ভয়ানক সহরভক্ত, এবার আমাদের গ্রাম লাগছে কেমন ?

মনীশ : —আমি ত বহুবার বলেছি, অনেক চেষ্টা করেও আমি পাড়াগাঁকে ভালবাসতে পারলুম না। এটা যেন একটা বদ্ধ জলাধার, যার বাইরের বিশাল কর্ম্মস্রোতের সঙ্গে যোগ থেকেও যোগ নেই। এখানে থাকা আর মরণ ও দৈন্যকে বরণ করে নেওয়া একই কথা।

কমল :—আমরা গরিব, কেমন করে সহরে থাক্‌বো। আপনাদের জমিদারী আছে, এখান থেকে টাকা যাচ্ছে, আপনার দাদা রোজগার করছেন ; কাজেই সহরে সুখে আছেন। পল্লীর লোকেদের সে সুযোগ কোথায় ?

মনীশ :—আপনারা গরিব বলে সহরে থাকেন না একথা বল্লে ঠিক বলা হলো না। আপনাদের জানা উচিত, সহরে থাকেন না বলেই আপনারা গরিব। সহর হচ্ছে জ্ঞানের কেন্দ্র, ব্যবসার বন্দর, কর্ম্মের কারখানা, স্বাচ্ছন্দ্যের শিবির, রূপের অন্তঃপুর, স্বাস্থ্যের শিমলা।

কমল :—আপনার যে সত্যিই সহরের নামে লাল পড়ছে। কথা গুলোকেও সহরে করে ফেলেছেন। কিন্তু সহরের দোষও অনেক।

মনীশ : কুসুমে কীট আছে বলে, জীর্ণ পত্রকে কেউ আদর করতে পারবে না। পাড়াগায়ে প্রতিভা স্ফূর্ত্তি পায় না। আনন্দ এখানে মাথা গুঁজে থাকবার স্থান থেকেও বঞ্চিত। একটা বিরাট উদাসীনতা এর বক্ষে দৈত্যের ন্যায় চেপে বসেছে। একটা দুরন্ত প্রাচীনতা এর সমস্ত রক্ত শোষণ করে নিচ্ছে। যুগান্তরের একটা প্রচণ্ড লৌহশৃঙ্খলএকে এমনি আঁকড়ে ধরে রেখেছে যে,এটা একটা কংস-কারাগারে পরিণত হয়েছে। উল্লাসের একটা ঝিলিকও এর যুগান্তব্যাপী অন্ধকারকে আলোকিত করে না। জানিনে, কে এই দেবকীর লৌহশৃঙ্খল ভগ্ন করে, কারাগারকে বিধ্বস্ত করে আপনার জয়পতাকা গেড়ে দেবে।

কমল :—কিন্তু অনেক বড় বড় লোকও পল্লীগ্রাম ভাল বাসেন ; এমন কি ইংরাজরাও বলেন, "দেবতা পল্লীগ্রাম গড়েছেন আর মানুষ সহর গড়েছে।"

মনীশ :—একটা কথা অ·ছে—বিজ্ঞেরা প্রবাদ বাক্য রচনা করেন ; আর নির্ব্বোধেরা তাহা ব্যবহার করে। পাড়াগাঁর লোকদের দেখলে আমার কেবল বাদুড়ের কথা মনে পড়ে। তারা সেই আদিম অনন্ত রাত্রির একটা জটিল রহস্য ও একটা অনাদি তন্দ্রার ভাব নিয়ে চক্ষু বন্ধ করে একটা তেঁতুল গাছের শুষ্ক শাখাকে এমনি করে আঁকড়ে আছে যে, শত বৈশাখী রবির আলোতেও তাদের চক্ষু খুলবে না। সময়ের পদক্ষেপের সঙ্গে পা ফেলে চলবার শক্তিই ওরা হারিয়েছে। চীনদেশীয় সুন্দরীদের মত ওদের পা স্মৃতি ও প্রাচীন পদ্ধতির লৌহ খাপে এমনি দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ।

কমল :--এ কথা বলা শোভা পায় না। আমার ত

ঠিক উল্টোই মনে হয়। তারা সেই অদিম সরলতা ও উন্মুক্ত প্রাণকে অবিকলিত ভাবেই রেখেছে। ইংরাজী শিক্ষার সঙ্কর ভাব তাদের স্পর্শ করতে পারে নেই। রোম দেশের Vestal Virgin দের মত ধর্ম্ম ও পবিত্রতার শিখাকে, ত্রিযুগী নারায়ণের মত আমাদের সংযত হিন্দু জীবনের সাক্ষী হোমাগ্নিকে জাগিয়ে রেখেছে। আমি ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি ভিন্ন অন্য কোন চক্ষে তাদিকে দেখতেই পারিনে। ওদের সহানুভূতি ও ঔদার্য্য দেখে প্রকৃতই নিজেকে হীন বলে মনে হয়।

মনীশ :—ও একটা অন্ধভক্তি। পল্লীগ্রাম কবির কবিতায় ভাল লাগতে পারে, কারণ তাতে ম্যালেরিয়ার কাঁদুনি ও কর্দ্দমের ছিটা দুইটাই প্রবেশ করতে পারে না। বস্তুতান্ত্রিকের পক্ষে পাড়াগাঁ একেবারে খেলো একটা নগ্ন স্বার্থপরতার ভাব নিয়ে সবাই মগ্ন। নীরস জীবন থেকে একটু সময় কর্ত্তন করে, কাব্য সাহিত্যচর্চ্চা বা দেশহিতকর কার্য্যে ক্ষেপণ করতে যেন কুণ্ঠিত। Public life বাহ্যজীবন বলে যে একটা জিনিষ আছে তার ধারণাই এদের নাই।

কমল :—ওরা সাহিত্যচর্চ্চা অপেক্ষাও বেশী সরস জিনিষের সংবাদ রাখে। অন্নসংস্থানের শ্রমের পর যেটুকু সময় পায় সে টুকু তারা তাদের প্রাণের দেবতার কাছে অর্পণ করে। ওদের কাছে পরকাল ইহকাল অপেক্ষাও সত্য। বিদেশে চাকরী করার ন্যায় ওরা এখানে থাকে। কিন্তু জানে তাদের একটা স্থায়ী বাস আছে। এবং তাকে ভুলে প্রবাসকেই চির বাসভূমি বলে গ্রহণ করে না। এই দেখুন এখানে একটি লোক দেখছেন না, কিন্তু শ্রীপাট লোকে পরিপূর্ণ। তাঁরা কীর্ত্তনের অক্ষয় সুধা পান করছেন। যাই আমাকে শীঘ্রি যেতে হবে, গাঙ্গুলীদের ঠাকুরের শীতল দিতে হ'বে।

মনীশ :—(স্বগত) যাও হে ভ্রান্ত অন্ধীভূত বলদ,তোমার ঘানি যন্ত্রের পরিধিকে পরিবেষ্টন কর গে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পল্লীগ্রাম্ অন্তঃপুর

ছায়া, মায়া প্রভৃতি।

ছায়া :—দেখ মায়া, কয়দিন গাঁয়ে এসে যেন মানটায় মরচে ধরে গেল। একটা গহন একঘেয়ে ভাব যেন পাড়াগাঁয়ের মজ্জাগত। একটা নবীনতা বিচিত্রতা, নিত্য সবুজ ভাব, যেটা মস্তিষ্কের প্রধান খাদ্য,এখানে সেটার একান্ত অভাব অনুভব করছি। কেমন যেন খাপছাড়া হয়ে রয়েছি। ওই রায়েদের সতী আমাদের সমবয়সী, কিন্তু ও যেন এক শতাব্দীর পূর্ব্বের লোক! ও যেন একটা রহস্যের অন্তঃপুরে যক্ দেওয়া ছিল,হঠাৎ যেদিন জাগলে,দেখলে, পৃথিবীটা একবারে বদলে নূতন হয়েছে, কিন্তু সে সেই পুরাতন রয়ে গিয়েছে।

মায়া :—কিন্তু আমার ওকে বড় ভাল লাগে। ওর মধ্যে এমনি একটা স্বচ্ছন্দ সরলত, এমন একটা স্বচ্ছ লাবণ্য আছে যেটা লোককে মুগ্ধ না করে পারে না। আর সব চেয়ে পছন্দ করি ওর ন্যাকামি, যেটা অশান্ত সমুদ্রে তৈলের মত হৃদয়ের সমস্ত দুরন্ত ভাব গুলিকে থামিয়ে রাখে।

(দৌড়িয়া সতীর প্রবেশ)

ছায়া :—এসো সতী, কি করছিলে এতক্ষণ ?

সতী :—এই দাদারা খেলেন, পাতটাত ঘুচিয়ে বড় দাদার পাতে খেয়ে মাকে বল্লাম তোমাদের বাড়ী যাই—বলেই একছুট।

মায়া :—দেখ যা বলেছিলাম, সতীর একটা দ্বিধা বা সঙ্কোচের ভাব মোটেই নেই। কেমন একটা ঝির-ঝিরে সুন্দর স্বভাব।

সতী :—দিদি, আজকে শ্রীপাটে নরোত্তমের কীর্ত্তন হবে, শুনতে যাবে ?

ছায়া :— সেটা এখন ভেবে বলবো, এখন এসো তোমার কথামালার পড়া বলে দিই।

(শিবানীর প্রবেশ)

এই যে বৌদিদি, এতক্ষণে সময় হলো ? দেখুন, তিনটে বেজেছে।

শিবানী :—আজ যে মঙ্গলবার খেঁদী, আমি ত কোনও দিনই এর আগে খাইনে। ঠাকুরের সেবা হবে, ওঁরা খাবেন, তার পর ত।

ছায়া :—এমন করে শরীরটাকে টেনেটুনে নিয়ে গেলে সে বেচারা যে একান্ত নাচার হয়ে পড়বে, তাতে আশ্চর্য্যি হবার কি আছে ?

শিবানী :—বাড়ীতে তিন খানা লাঙলের রান্না, রাখালি

মুনীষ, তাদিকে খেতে দিতে হয়। আজ তবু মা নিজে দিতে চাইলেম তাই আসতে পেলাম।

ছায়া : বৌদিদি, আপনি যে রকম অসম্ভব গোছের খাটেন, ধোপার গাধাও তত খাটে না। জামাইকা দ্বীপে আকের চাষের কুলীরাও অত খাটে কিনা সন্দেহ। এতে আপনার কষ্ট হয় না?

শিবানী :—মোটেই না, বরং আনন্দ হয়। এই সব গৃহ-কর্ম্ম করাই যে আমাদের ধর্ম্ম। বেশ, এখন একটা চুপি চুপি গান কর। শুনেছি, খুব ভাল গাইতে পারো।

ছায়া : চুপি চুপি কেন বৌদিদি? বেশ, গাই। মায়া তুমি বাজাও।

গীত।

ভাসান্ নদীর স্রোতের মালা,
চলেছ তুমি চলেছ কোন্ সুদূরের
বুকের জ্বালা।
ফুটলে কোথা আলোকি বন
ভুলালে কোন্ ভ্রমরের মন
ছুঁ সনে তোরা ছুঁ সনে
ও কার করুণ নয়নী নীহার ঢালা।
তুমি বল কাহার কণ্ঠে ছিলে?
বল গো বল গো আজ কে জলে ভাসিয়ে দিলে?
কোন্ তাপিতের বক্ষ চেপে
আঁধার ঘরে স্তিমিত দীপে
ছিলে গো তুমি ছিলে গো
করি কোন্ দেবতার চরণ আলা
ভাসান্ নদীর স্রোতের মালা।

শিবানী। গলাটি খাসা। একটি নীলকণ্ঠের গান গাওনা ভাই।

ছায়া। নীলকণ্ঠের গান কি বৌদিদি? সেত বৈরাগীরা গায়। সতী তুমি জানো ত গাও, আমি বাজাই।

সতী। (লজ্জায় অর্দ্ধমৃতবৎ) ওমা, আমি গাবো।

শিবানী। তা হলেই হয়েছে। সাত চড়ে কথা বেরোয় না ও গাইবে? কাকে রাধাকৃষ্ণ বলবে।

(রাজাদিদি, গিরিবালা ও বড়মার প্রবেশ)

গিরিবালা। ও ছায়া, ও মায়া, ও বাড়ীর বড়মা এসেছেন, রাজাদিদি এসেছেন, প্রণাম করো।

(প্রণাম করণ)

বড় মা। এসো, আহা দিব্যি মেয়ে। রাঙা বর হ'ক।

রাঙ্গাদিদি। হাঁ বৌ, মেয়েদের বিয়ে দিস্ নেই কেনে? বয়েস হয়েছে, বাড়ন্ত মেয়ে, মানাবে কেনে? তোদের তো টাকার অভাব নেই, দিলেই পারিস্।

গিরিবালা। আমার ত বিয়ে দেবার ইচ্ছে, কর্ত্তা বলেন, পাসটা করুক তার পর দেখা যাবে।

রাজা দিদি। পাস করে ত তোর মেয়েরা চাকরী করতে যাবে না বৌ। তবে তোরা ত আর গাঁয়ের লোক নস্ যে আমরা জোর করবো। সুখের পায়রা, দুদিন এসেছিস, গাঁয়ের দুধ ঘি আক্রা করে দিয়ে পালিয়ে যাবি। তোরা এখন কলকেতাবাসী সেখানকার মতে ত চলবি।

গিরি। আমার ত কলকাতা দিদি একেবারে পছন্দ হয় না। কি করবো? ওঁর আর বিভাসের ইচ্ছে।

রাঙ্গাদিদি। কথায় বলে গাঁয়ে মায়ে সমান। এ ঠাঁই কি ছাড়তে আছে? মা মঙ্গলা জাগ্রত রয়েছেন। রোগ কোথা নেই? সহরে কি কম? ডাক্তার কবরেজের কথা বলবে? তা রাখে হরি ত মারে কে। আর ভাল কবরেজ ত রয়েছেন।

বড় মা। কই মেয়েরা, একটা গান শোনাও দিদিরা। তোমরা খুব গাইতে পার শুনিছি।

গিরি। ছায়া, বড় মা, রাঙাদিদিকে গান শোনাও।

ছায়া। গীত

ময়ুর পাখার ঝিক মিকিতে দাও দেখা
মিঠা গলার গিট্‌কিরিতে গাও একা।
তোমার তরী সন্ধ্যাকালের বন্দরে
পালটি তুলে যায় যে মধু মন্থরে।
রামধনুকের রঙমহলে রও সখা।
এসো তুমি নির্ঝরের তানটিতে,
বাদল রাতে আকুল আমার প্রাণটিতে,
তোমার রূপে বিশ্ব সমুদয় মাখা
ময়ুর পাখার ঝিকমিকিতে দাও দেখা।

বড়মা। খাসা মিষ্টি গলা। বেঁচে থাক।

রাজাদিদি। গানটি রাধিকার না কৃষ্ণের? ময়ুরপাখা রয়েছে।

ছায়া। এ রাধা কৃষ্ণের গান নয়। এতে এমন একটা উদাস করা সুর আছে, যেটা সমস্ত গানকে মহনীয় করে তোলে। হৃদয়ে একটা বিরাটের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে।

রাঙাদিদি। তোমাদের এমন কাঁচা বয়েস দিদি, ও সব গান ভাল লাগবে। আমাদের রাম হরি নইলে মনে ধরে না।

তৃতীয় দৃশ্য

পল্লীগ্রাম, বৈঠকখানা

সত্যহরি বাবু প্রভৃতি।

সত্যহরি। আসুন গোস্বামী মশায়, আছেন ভাল?

নিতাই। গৌরাঙ, গৌরাঙ, নারায়ণ, নারায়ণ! তার পর ভায়ার ত শুভাগমন হয়েছে, এখন কদিন থাকা হবে ত?

সত্যহরি। এই কটা দিন ত আছি। এ সময় বাড়ী না এলে মন কেমন করে।

নিতাই। তোমারা ত পৈত্রিক পূজাটা উঠিয়ে দিলে, ওটা ত ভাল হল না। কত কালের পুজো, পিতৃপিতামহের প্রতিষ্টিত।

সত্যহরি। উঠে যে গেল। বিভাসের ইচ্ছা নয় যে বাজে কাজে পয়সা নষ্ট করি।

নিতাই। গৌরাঙ পৌবাঙ; বলো কিহে? পুজো হলো বাজে কাজ? মানুষের এত অধঃপতনও হয়। তোমার ছেলে না হয় হাল ফেসিয়ান বাবু, আলো পেয়েছে। তুমি ত সেকেলে লোক। হামিংবার্ডের গল্প টল্প পড়ে দু একটা পাস টাসও করেছিলে। তা এ দুর্ম্মতি হল কেন? আমার ত বৈষ্ণব, কই দুর্গাপূজার ত দ্বেষ করিনে।

সত্যহরি। জানেন, কালে সব বদলে যাচ্ছে। মত দিন দিন পরিবর্ত্তন হচ্ছে। এখন ও সব দেবদেবীর পূজা থাকবে কিনা সে ও এক কথা দাঁড়িয়েছে। ওতে কতটুকু সাত্বিকতা আছে তাও ভাববার বিষয়। আমি অবশ্য সাধারণ লোকের কথা বলছি, ভক্তগণের কথা স্বতন্ত্র।

নিতাই। নারায়ণ! দেবদেবীর পূজা থাকলে বা না থাকলে তাঁদের যে বিশেষ ক্ষতি হবে এমনটা বোধ হয় না। তবে বিশেষ ক্ষতি এই যে, ওই সকল দেবতার স্থানে উপদেবতাকে বসানো হচ্ছে। সাত্বিকতা কেবল ধপ্‌ধপে ঘরে, তাড়িৎ পাখায়, আলোয়, এসেন্সের গন্ধে, ওর গানের সুরেই যে আসবেই তার এ পর্য্যন্ত কোন প্রমাণ পেয়েছ কি? এসব কলির কাণ্ড—তুমি কি করবে ভায়া?

সত্যহরি। রসকিন্ কার্লাইল পৌত্তলিকতা—

নিতাই। সে……বেটারা কারা?

সত্যহরি। আঃ! এগুলো বলা ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে।

নিতাই। উঃ। বড্ড যে টান দেখছি। তা'রা আমাদের ঠাকুর দেবতাকে কাঠ পাথর বলছে, মুনি ঋষিকে ভণ্ড-ভ্রান্ত বলছে, তাতে তোমাদের কষ্ট হয় না; আর আমি একটু মিষ্টি করে বেটা বলেছি, আর গাত্র জ্বালা উপস্থিত। এমন মজাটি ইংরাজী না শিখলে কিছুতেই হয় না। বাপু, শাস্ত্র ত পড়লেই না। বয়স হলো, অন্ততঃ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবৎও পড়ো! তা না পড়ে ডরবিন্ রসকিন্!—ওরা তোমাকে মুক্তি দেবে? কে একটা সাহেব বলেছিল, মানুষের পূর্ব্বপুরুষ হনুমান ছিল: পূর্ব্বপুরুষ কেন, এখনও কত মানুষই হনুমান রয়েছে। বাপু, জীবে প্রেম, নামে রুচি, ভগবানে ভক্তি। এর চেয়ে বড় কথা কেউ বলতে পারবে না। এ আমার শ্রীগৌরাঙ্গের দেওয়া।

সত্যহরি। যাক ও সব কথা, এখন গ্রামের রাস্তা-ঘাট যা দেখলাম তা ত অগম্য, এর একটা প্রতিকার করা উচিত।

নিতাই। তাতে তোমাদের বিশেষ ক্ষতি নাই। রাস্তা অগম্য, তোমরা অনধিগম্য হয়ে কলকাতায় থাকবে।

সত্যহরি। গ্রামে না থাকলেও গ্রামের উন্নতিতে আমার চিরদিন সহানুভূতি। পল্লীগ্রামের উন্নতি না করলে সমাজ অচল।

নিতাই। ও কেবল মুখের কথাই নয়, ও সখের কথা। গ্রামের সম্বন্ধ বিছিন্ন করে গ্রামের উন্নতি করা হয় না, ওতে সাম্য ও সহানুভূতির ভাব মোটেই থাকে না। ওটা নিজের যেখানে উদারতা, সেখানে উচ্চতা। আমরা চাই, আমাদের মধ্যে একজন হয়ে যে উন্নতি করবে করুক, তাকে কোলে তুলে নেব। আর যে কায়দা মাফিক্ গভীর সহানুভূতির অগভীর চিঠি পাঠিয়ে তত্ব করা গোছের উন্নতির কথা বলতে আসবে তাকে আমরা চাই নে।

সত্যহরি। আমরা গ্রামের সম্বন্ধ কিসে ছাড়লাম? এই ত বিভাস এই বিভাগ থেকেই লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের মেম্বর হবার চেষ্টা করচে।

নিতাই। এ সম্বন্ধে পল্লীগ্রামের কথা উঠলে আমার পৈঠার ওই পাথরখানার কথাই মনে হয়। দুটোই ঠিক এক রকমের কাজ করে। মন্দিরে ওঠবার ও নামবার সময় দরকার হয়। পল্লীগ্রাম উন্নতির মন্দিরে ওঠবার সোপানের কাজ করতে পারে, তখন তার দরকার হয়, আবার অবস্থান্তর ঘটলেও এতে নাবতে হয়। এতে আশ্রয় নেওয়া চলে, আবাস হয় না। কি বল?

সত্যহরি। আপনাদের পাড়াগাঁ ত অন্ন দিতে পারে না, কাজেই দূরে যেতে হয়?

নিতাই। তাতে ত দুঃখ নেই, এর সঙ্গে প্রাণের যোগ হারানই দুঃখের। এই যদি ছুটির সময়ও বিভাস প্রভৃতি একবার করে আসে, কত সুখের হয়।

সত্যহরি। কি করে আসা হয় বলুন, এই দেখুন কদিন এসেছি—গিন্নির জ্বর, ঝি চাকরদের জ্বর; আবার ছুটে পলাতে হচ্ছে। বিভাস ত ভয়ে এলোই না। বছর বছর একবার করে আসতাম, তাও আঁর হয়ে উঠবে না।

নিতাই। জ্বর হয় বলে এ গ্রাম ছাড়ছ, কিন্তু সেখানে যে—আহা, সোণার প্রতিমা!—তোমার পুত্রবধূ মারা গেল, কই কলকাতা ত ভাই ছাড়লে না।

—•—

চতুর্থ দৃশ্য

পল্লীপথ—চৌমাথা

বড়মা। ওমা একি কাণ্ড! এমন ত কখনো দেখিনি শুনিনি! রায়েরা কলকাতা যেতে না যেতে, আহা, অমন চমৎকার কাজ করা চণ্ডীমণ্ডপ পুড়িয়ে দিয়েছে! এ রকম বাদ সাধা ত দেখি নেই। গাছপালা গুলো কেটে, ঘর জ্বালিয়ে দিয়ে কি সুখ হলো? তারা কলকাতা গিয়ে শুনে ভাববে কি? অন্য গাঁয়ের লোক কি আর পোড়াতে এসেছে? এ কাণ্ড করলে কে? তারা ত কারু অপকারী নয়।

রাঙ্গাদিদি প্রভৃতি।—তাইত, কথায় বলে ঘরে আগুন লাগান। আহা চণ্ডীমণ্ডপ নয় ত যেন রাজ অট্টালিকে! আহা! মঙ্গলবার গাঁ ছেড়ে গেল, বারণ শুনলে না।

(কমলের প্রবেশ)

কমল। বড় মা, বড়ই অন্যায় কাণ্ড করেছে, চণ্ডীমণ্ডপ এমন করে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে শুনলে গাঁয়ের লোকের উপরই বাবুদের সন্দেহ হবে। গ্রামের একটা বনিয়াদী বংশ, এই ঘটনার পর গ্রামের উপর যেটুকু সম্বন্ধ ছিল তাও আর রাখবে না

বড়মা। আমরাও তাই বলাবলি করছি। একাণ্ড করলে কে?

(নিতাইয়ের প্রবেশ)

নিতাই। করলে চণ্ডী স্বয়ং। চণ্ডী রইল না আর মণ্ডপ থেকে কি হবে, তাই মহামায়াই কোপে ও চণ্ডীমণ্ডপ ভস্ম করে দিয়েছেন। রায়েরা এ শুনে সুখীই হবে,—ভাববে আপদ গেল, যদি কখনো ঠাকুর আনতে হতো সে লেটা মিটলো। দেখ, এই পূজো উঠিয়ে রায়েরা কত লাভ করেছে। ঢাকীর জমি, নাপিতের জমি, চিত্রকরের জমি, কুমারের জমি সব একে একে ছাড়িয়ে নেবে এবং নিচ্ছে। চণ্ডীমণ্ডপ মা স্বয়ং পুড়িয়েছেন।

রাঙ্গাদিদি। তাই বটে, বহুদিনের পূজা ফেললে, মার কোপ হবে বৈকি?

নিতাই। দেখনা, বলে, পূজো ভ্রম, বাজে কাজ।

বড়মা। মা মহামায়া তাদিকে সুমতি দেবেন। দয়া করবেন। চিরদিন কি এমনি যাবে? বিভাসেরও ছেলে পুলে নাই, আর বিয়েও করলে না, তা হলে কি এমন করে গাঁ ছাড়তে পারত?

(ক্রমশঃ)।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

মুক্তি।

(গল্প)

(১)

অমূল্য বি,এ, ফেল করিয়া যে ছয়মাস থিয়েটার, সিনেমা, সার্কাস্ দেখিয়া কাটাইতেছিল, তখনও মাঝে মাঝে সে এক একবার এ আফিস সে আফিসের দ্বারে উমেদার ভাবে দাঁড়াইত। কিন্তু সে ঢিল-মারা উমেদারীতে কি আর চাকরির দ্বার খোলে? তাহাতে মাথার অনেক ঘাম পায়ে ফেলিতে হয়, অনেক ভ্রূকুটি সহ্য করিতে হয়, "মান অপমান সবই সমান" মনে করিতে হয়—বিশেষতঃ যাহাদের তেমন আত্মীয়ের জোর নাই।

হঠাৎ যে দিন সন্ধ্যা বেলা অমূল্য বাড়ী আসিয়া খবর দিল যে, সে ৪০৲ মাসিক বেতনে কোনও এক আফিসে একটি চাকরি যোগাড় করিয়াছে, সে দিন তাহার পরিবারবর্গ আনন্দিত হইয়া তাহার ভাগ্য ফিরিয়াছে বলিয়া মনে করিলেন বটে, কিন্তু পাড়ার দাদা মহাশয় বলিলেন "অমূল্য আজ থেকে তুমি বন্দী হ'লে। বাঙ্গালীর চাকরি যে কি সুখের তা এইবার বুঝিতে পারিবে।"

অমূল্য দাদামশাইয়ের কথাটির মূল্য তখন বুঝিতে পারিল না। চাকরি পরাধীনতা বটে, কিন্তু তাহা দুঃখের কেন হইবে? অফিসের বাবুরা দিব্যি ৯ টার মধ্যে ভোজন সমাপন করিয়া, দুইটা পান মুখে এবং দুই এক ডজন কৌটায় পুরিয়া, সিগারেট টানিতে টানিতে ট্রামে চড়িয়া আফিসে যায়, আর আফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া কত সাহেব সুবার গল্প করে। শনিবারে আধ ছুটী, রবিবারে পুরা ছুটী, আবার মাঝে মাঝে এ তা উপলক্ষ করিয়াও ছুটী আছে। কিন্তু মাইনে ঠিক্ প্রত্যেক মাসের পহেলা আছেই। তাহাও আবার বছর বছর বাড়ে। এ হেন চাকরি কি মন্দ হইতে পারে?—যে বলে সে মন্দ!

চাকরির সুবিধা কত! কৃষক সমস্ত বৎসর মাঠে হাড়-ভাজা খাটনি খাটে, কিন্তু সময় কালে ফসলটা হয়ত কোনও প্রকারে নষ্ট হইয়া গেল। ব্যবসায়ী যে মূল্যে পাইকারী জিনিষ খরিদ করিল, হয়ত তাহার দাম কমিয়া গেল, সে বৎসর আর লাভ হইল না।

কিন্তু চাকরি—কি নিষ্কণ্টক! পোকায় নষ্ট করিবে না, লোকসানের ভয় নাই। চাকরি আবার যে সে চাকরি নহে। এ কলম পেশা। সমাজ সংস্কারকগণ বলিয়া থাকেন, কেরাণীদের চেয়ে কুলীরাও ভাল। বলিহারি বুদ্ধি তাদের! তারা এটাও কি বোঝে না যে, কুলিরা রোদ বৃষ্টিতে রাস্তায় মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, আর আফিসের বাবুগণ তখন কি আরামে ত্রিতল বাড়ীতে পাখার হাওয়ায় বসিয়া গম্ভীর স্বরে বেয়ারাকে বলে, "এ ট্রে মিত্তির বাবুকো দে আও।"

এই সব প্রত্যক্ষ যুক্তির সম্মুখে বুড়ো দাদামশাইয়ের বাজে কথা টিকিবে কেন? তিনি নিজেও ত একদিন চাকরি করিয়াছিলেন, তখন এ উপদেশ বাণী কোথায় ছিল? তাঁহার আর্থিক অবস্থা ভাল থাকিতেও তিনি তবে সখ করিয়া বন্দী হইতে গিয়াছিলেন কেন?

অমূল্য যে আফিসে চাকরিতে ঢুকিল, সে আফিসে বেশী লেখাপড়া শেখা লোক কর্ম ছিল। ফোর্থ ক্লাস, থার্ড ক্লাস, অবধি পড়ার দলই বেশী। সম্প্রতি যে সাহেব নিয়োগকর্ত্তা, তিনি একটু শিক্ষিত লোকের পক্ষপাতী বলিয়া লেখাপড়া, জানা লোক অপেক্ষাকৃত বেশী বেতনে নিয়োগ করিতে-ছিলেন

আফিসে কাজ শিখিবার জন্য অমূল্য যাঁহার সহকারী নিযুক্ত হইল, তাঁহার বিদ্যা ফোর্থ ক্লাশ, নাম সুবোধ বাবু তিনি অফিসে ৮বৎসর কাজ করিতেছেন,—এখন বেতন ৩২৲ টাকা। তাঁহার সহকারী প্রথমেই ৪০৲ বেতনে নিযুক্ত হওয়াতে তাহার দিকে তিনি প্রথম হইতেই বক্র নয়নে চাহি-লেন। হেড ক্লার্ক বলিয়া দিলেন "সুবোধ বাবু, আপনার সহকারীটি শিক্ষিত লোক, একে বেশ করে কাজটা বুঝিয়ে দেবেন। তা হ'লে অল্প দিনেই বেশ কাজের লোক হ'য়ে উঠবে।" সুবোধ বাবু তখন কোনও উত্তর করিলেন না, কিন্তু জলযোগের সময়ে ধূমপান ঘরের পাশ দিয়া যাইবার সময়ে অমূল্য শুনিল, সুবোধ বাবু ধূমপান করিতে করিতে তাঁহার এক বন্ধুকে বলিতেছিলেন, কলেজে পড়ছে আফিসের কাজের কি জানবে? আফিসে ত এই সবে মাত্র হাতে খড়ি। কিন্তু বিচার

দেখ, আমাদের চাইতে বেতন বেশী। এমন আফিসে চাকরি করা ঝকমারি!"

সুবোধ বাবু অমূল্যকে কাজটা কোনও রকমে বুঝাইয়া দিয়া একখানা চিঠির উত্তর লিখিতে বলিলেন। অমূল্য উপদেশানুসারে দুইখানি কাগজের মধ্যে কার্ব্বণ পেপার ভরিয়া পেন্সিল দিয়া চিঠিখানি লিখিয়া ফেলিল। লেখা হইলে কার্ব্বণ পেপার খানি বাহির করিয়া দেখিল, নীচের কাগজ খানিতে কার্‌বণের অক্ষর একটিও পড়ে নাই, সব পড়িয়াছে পেন্সিলের লেখা কাগজখানির অপর পৃষ্ঠে। দেখিয়া অমূল্য বিস্মিত ভাবে সুবোধ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল "এ কি?" সুবোধ বাবু দেখিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন "এ আপনি শিক্ষিত লোক ক'রলেন তাই রক্ষে। আমরা করলে আজ চাকরি রাখা দায় হ'ত।" বলিয়া দেখাইয়া দিলেন যে, কার্ব্বণ কাগজের দুই পিট কালো দেখাইলেও উহার এক পিঠে মাত্র কালি মাখান থাকে, সেই কালি মাখান পিঠটা নীচের কাগজখানির উপর না রাখিলে, তাহাতে কালির দাগ পড়িতে পারে না। অমূল্য নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হইল, এবং সুবোধ বাবুর মন্তব্যটা তিক্ত বোধ হইলেও হজম করিয়া ফেলিল।

আফিসে কতকগুলি ছাপান ফরম্ ছিল, তাহার এক একটি নির্দ্দিষ্ট ফরমে এক একটি নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের সম্বন্ধে চিঠি লিখিবার কথা। সুবোধ বাবু প্রথম দিনেই অমূল্যকে সে ফরমগুলির সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু নূতন সহরে প্রথম কিছুদিন যেমন গলি ভুল হইয়া যায়, সুবোধেরও ফরমসম্বন্ধে তেমনি হইতে লাগিল। আফিসে ঢুকিবার চারি পাঁচ দিন পরে অমূল্যের একদিন একটা ফরম্ সম্বন্ধে খট্‌কা লাগায় সুবোধবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, কোনটা ব্যবহার করিবে। সুবোধ বাবু বলিলেন তাহা ত ইতিপূর্ব্বেই তাহাকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। অমূল্য বলিল, তাহার ঠিক মনে নাই। তাহার উত্তরে সুবোধ বাবু বলিলেন, "ভোলানাথ! এমন মন নিয়ে পরীক্ষা পাস ক'রেছিলে কি ক'রে?"

অমূল্য অনেকবার ঐপ্রকার বাক্য সহ্য করিয়াছে। কিন্তু এবার আর করিল না। বলিল, "পরীক্ষা কি প্রকারে পাস করেছি না করেছি, আপনাকে তার কিফেস দিতে হবে না। আপনি সহজভাবে কাজের কথা ব'লতে হয় ব'লবেন, না হয় কিছুই ব'লবেন না।"

সুবোধ বাবুও চটিলেন, বলিলেন, "আমি আপনাকে কিছু ব'লতেও চাইনে কোনও কাজও দিতে চাইনে। একখানা চিঠি লিখ্‌তে আমাকে দশটা প্রশ্ন করে ব'সবেন। অত কথা বলার চাইতে আমি একাই সব কাজ ক'রব।"

পাশে বিনোদবাবু কাজ করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, "ঝগড়া করবার প্রয়োজন কি? উনি নূতন এসেছেন তাই প্রথম প্রথম একটু জিজ্ঞেস কচ্চেন। ও রকম সবারই হয়। উনি শিক্ষিত লোক, অল্পদিনেই কাজ আয়ত্ত ক'রে নেবেন।"

"অমন ঢের শিক্ষিত লোক দেখেছি"। সুবোধ বাবুর বাক্য সমাপ্তির পূর্ব্বেই অফিসের বড়সাহেব কি কাজের জন্য সেখানে আসিলেন। কাজেই বাগ্‌বিতণ্ডা বন্ধ করিয়া সকলেই কাজে মনোযোগী হইয়া পড়িল।

(৩)

অমূল্যদের আফিসের একটা শাখা বম্বে নগরীতে ছিল। হঠাৎ কলিকাতার আফিস হইতে একজন লোক সেখানে পাঠানর দরকার হইয়া পড়িল। বড় সাহেব হেডক্লার্কের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া অমূল্যকে নির্ব্বাচিত করিলেন। অপ্রত্যাশিত ভাবে এতদূর গমনের আদেশ পাইয়া অমূল্য একটু ইতস্ততঃ করিতেছিল। তাহা দেখিয়া সাহেব বলিলেন, "তোমাকে ২৪ ঘণ্টা সময় দিলাম ইহার মধ্যে তুমি তোমার কর্ত্তব্য ঠিক করিয়া লও। যদি না যাও, তবে চাকরি থাকিবে না।"

বিনা খরচে বম্বে দেখিবার সখটা যে অমূল্যের মনে উঠে নাই তাহা নহে, কিন্তু সে যে অনেক দূর। ততদূরে পরিবারবর্গ ছাড়িয়া সে কি প্রকারে থাকিবে ভাবিয়া আকুল হইল এবং অতি বিষণ্ণচিত্তে সে দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাড়ী আসিল।

অমূল্যের মা, স্ত্রী ও অন্যান্য পরিবারবর্গ খবর শুনিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা সকলেই একবাক্যে চাকরি ছাড়িয়া দিতে বলিলেন, কিন্তু অমূল্য তাহাতে সম্মত হইতে পারিল না। একে আপাততঃ কিছু বেতন বাড়িবে, বম্বের খরচ বাবদ কিছু টাকা পাইবে, তারপর আফিসের খরচে যাতায়াত চলিবে। এতদ্ভিন্ন সে কলেজের অধ্যাপকের নিকট শুনিয়াছে, যে সমুদ্র ও পর্ব্বত দেখে নাই তার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নাই। বম্বে গমন করিলে এ দুইই দেখা হইবে।

তবে প্রধান অন্তরায় বাড়ী ছাড়িয়া যাওয়া। তার বাড়ী কলিকাতায়। মাকে ছাড়িয়া সে কখনও দু'বে যায় নাই। বিবাহ হইয়াছে সেও কলিকাতায়। স্ত্রীর বিরহও বিশেষ সহ্য করিতে হয় নাই। অমিয়া তাহার চির আদরের স্ত্রী। তাকে ও স্নেহের পুত্তলী তিন বৎসরের কন্যা সুধাকে ছাড়িয়া থাকিতে হইবে ভাবিয়া তাহার মন অত্যন্ত দমিয়া গেল।

অমূল্য বুঝিয়াছিল যে, অমিয়া বুদ্ধিমতী হইলেও আজ তাহাকে কোন মতেই সে বুঝাইয়া শান্ত করিতে পারিবে না। ব্যাপার দাঁড়াইলও তাই। অমিয়া তাহার গলা জড়াইয়া বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। অমূল্য কোনও কথা বলিতে পারিল না। বলিতে গিয়া নিজেই কাঁদিয়া ফেলিল।

এই ভাবে অনেক সময় অতিবাহিত হইল। অনেক ক্ষণ কাঁদিয়া দুই জনেরই হৃদয়ের ভার অনেকটা কমিয়া গেল। তখন অমূল্য আস্তে আস্তে সকল কথা বুঝাইয়া বলিতে লাগিল। সেখানে গেলে তাহার যে কত শিক্ষা, কত অভিজ্ঞতা ও চাকরির যে কত উন্নতি হইবে তাহা বলিল। কলিকাতা হইতে দূরে সে কখনও যায় নাই। কাজেই তাহার অভিজ্ঞতা খুবই কম। যদি এমন সুযোগ ঘটিয়াছে তাহা ছাড়া কি কর্ত্তব্য? তারপর ছাড়াছাড়ি।— সেই বা কত দিনের? ছয় মাসের মধ্যে আবার আসিয়া সে তাহাকে বক্ষে ধরিবে।

"এ ক্ষুদ্র বিরহ কি সহ্য করিতে পারবে না অমি?" বলিয়া অমিয়ার চিবুকখানি ধরিয়া মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অমিয়া আবার কাঁদিতে লাগিল।

"ছি! কেঁদোনা, বল আমায় ভাল মনে বিদায় দিচ্ছ?"

"তুমি অমন কথা ব'লোনা"—মুখ তুলিয়া এই কথাটি বলিয়া অমিয়া আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পরে কহিল, "আচ্ছা, তুমি সুধাকে ছেড়ে কি ক'রে থাকবে?"

একথা যে অমূল্যের মনেও জাগে নাই তাহা নহে। সুধার জন্ম হইতে আজ পর্য্যন্ত তাহাকে কখনও সে বুক ছাড়া করে নাই। তারপর একটি পুত্র সন্তান হইয়া মারা গিয়াছে। তদবধি সুধার প্রতি টান আরও বাড়িয়াছে। অমিয়াকে ছাড়িয়া থাকা যদিও সম্ভব হইতে পারে, সুধাকে ছাড়িয়া থাকা অমূল্যর নিকট অসম্ভব মনে হইল।

অমূল্য আর্দ্রকণ্ঠে বলিল "কি আর করব? সাবধানে রেখো ওকে।" বলিয়া দুইজনে কাঁদিতে লাগিল। সে রাত্রে তাহাদের নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছিল কিনা সন্দেহ।

(৪)

বম্বে নগরী অমূল্যের কাছে প্রথমে অত্যন্ত ভালই লাগিল। সত্য বটে গড়ের মাঠ সেখানে নাই। কিন্তু সমুদ্রের উপকূল ত আছে। অমূল্য সমুদ্রতীরে বেঞ্চের উপর বসিয়া মুগ্ধচিত্তে অনিমেষ নয়নে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া থাকিত। যতদূর চক্ষু যায় শুধু সেই নীলজলের উপর সাদা ফেনা সহস্র সহস্র সর্পের মত ফণা তুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া কূলে কূলে আছাড় খাইতেছে।

প্রথম কয়েক দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া নগরীটি বেশ দেখিল। যাদুঘর ও চিড়িয়াখানা দেখিয়া প্রশংসা করিতে পারিল না। কলিকাতার তুলনায় কিছুই নহে। তবে ইডেনগার্ডেনের চেয়ে ভিক্টোরিয়া গার্ডেন কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে; বরং পাহাড়ের উপর বলিয়া আরও সুন্দর, আরও ভাল। অমূল্য কলিকাতা থাকিতে ভিক্টোরিয়া টারমিনাসের খুব নাম শুনিয়াছিল, কিন্তু সেখানে গিয়া দেখিল যে, উহা বাহির হইতেই সুন্দর, হাওড়া ষ্টেসনের তুলনায় অনেক ছোট। অল্পদিনের মধ্যেই কোলাবা বন্দর, এলিফেন্টা কেভ্ প্রভৃতি দেখিবার জিনিষ গুলিও দেখিয়া শেষ করিল।

জায়গার নূতনত্ব আর কয়দিন থাকে? টেনিসনের "কলাভবনে" (Palace of art) সুরম্যোদ্যানে প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য্য ও মধুরতার মধ্যে থাকিয়াও মানুষ সুখী হইতে পারিল না। অতি অল্পদিনের মধ্যেই বম্বের নূতনত্ব অমূল্যের চক্ষু হইতে অপসারিত হইল। "কলা ভবনে" যেমন সঙ্গীর অভাবে ক্ষুদ্র মানুষের প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল, জনবহুল বম্বে নগরীও শীঘ্রই অমূল্যের নিকট জনহীন বোধ হইতে লাগিল।

যে সাগরের লহরমালা দেখিয়া প্রথম প্রথম তাহার প্রাণ নাচিয়া উঠিত, এখন সেই তীরে বসিয়া সেই সমুদ্রের দিকে চাহিয়া থাকিত, কিন্তু চোখ তাহা দেখিত কিনা সন্দেহ, কারণ চোখ ত দেখেনা, দেখে মন। অমূল্যের মন থাকিত কলিকাতার কোনও এক গলির ক্ষুদ্র একখানি বাড়ীতে। আকাশে চাঁদ উঠিত, তারা উঠিত। অমূল্য ভাবিত তার সেই বাড়ীতে ছাদের উপর বসিয়া তাহার স্নেহের পুত্তলী সুধা

তার প্রিয়তমার কোলে বসিয়া এই চাঁদই ত দেখিতেছে। কিন্তু তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না কেন?

বিদেশে বিরহীর একমাত্র সম্বল চিঠি। পোষ্টাফিসের কৃপায় ভারতের হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত প্রেমিক প্রেমিকার হৃদয়ের ভাব দুই পয়সায় আদান প্রদান হইয়া থাকে। অমূল্যেরও বিদেশের সুখ দুঃখ পোষ্টাফিসের পিয়নের উপর নির্ভর করিত। চিঠি পাইলে মনটা কেমন আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠিত, না পাইলে পিয়নের উপর বিরক্ত হইত। এ সম্বন্ধে সে নূতন বিবাহিত যুবকদিগকে ও অতিক্রম করিল, তাহার দীর্ঘমিলনের পর এই প্রথম বিরহ।

(৫)

আফিসের কাজ অমূল্য বরাবরই বিশেষ মনোযোগ দিয়া করিত। কলিকাতা থাকিতে সুবোধবাবুর সহিত যেমন কথার কাটাকাটি হইত, বম্বেতে তাহা ছিল না। বম্বে আফিসে আসিয়া অন্য একজনের কাজ সে বুঝিয়া লইল। যাহার কাজ বুঝিয়া লইল সে পাঁচ সাত দিনের মধ্যে তাহাকে কাজটি বুঝাইয়া দিয়া নিজে অন্য কাজে লাগিয়া গেল। সে আফিসের নিয়মাবলীর বইখানি পাইয়া পড়িতে লাগিল ও আবশ্যক মত সেগুলি দেখিয়া সন্দেহ মিটাইতে লাগিল।

কয়েক মাস পরে একদিন বম্বে টাইম্‌সে বিজ্ঞাপন দেখিয়া অমূল্য এক সওদাগরের আফিসে ১০০৲ বেতনে নিয়োগ পত্র পাইল। সে আফিসেরও কলিকাতায় শাখা ছিল এবং চাকরি পাইলে ও চেষ্টা করিলে কলিকাতা যাইবারও সম্ভাবনা ছিল।

যেদিন সন্ধ্যাবেলা চিঠিখানি পাইল তাহার পরের দিন আফিসে গিয়া চাকরি ছাড়িবার দরখাস্ত করিল। তাহাতে সাহেব অত্যন্ত চটিয়া গিয়া বলিলেন, "যদি তোমাকে চাকরি ছাড়িতে হয় তবে অন্ততঃ এক মাসের নোটিস্ দিতে হইবে।" অমূল্য অত্যন্ত বিপদে পড়িল। যদি একমাস বিলম্ব হয়, তবে তাহার একশত টাকা বেতনের চাকরিটি আর তাহার জন্য বসিয়া থাকিবে না। অথচ এ সম্বন্ধে আর গোলমাল করিতে গেলে সাহেবের বিরাগভাজন হইবে। চাকরি ছাড়িলেও কাজে ভাল সার্টিফিকেট পাইবে না। বাধ্য হইয়া অমূল্যকে সেই খানেই থাকিতে হইল।

কিছুদিন পরে আফিসের অপেক্ষাকৃত ভাল কেরাণীদের মধ্যে "বোনাস্" বিতরণের সময় আসিল। অমূল্য যে প্রকার কঠিন পরিশ্রম করিতেছিল, তাহাতে সে যে কিছু পাইবে তাহাতে তাহার এবং তাহার বন্ধুবর্গের কোনও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু যখন তালিকা বাহির হইল, দেখা গেল যে অমূল্যের নাম তাহাতে নাই। আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সে তাহার উপরোয়ালার নিকট কারণ জিজ্ঞাসা করিল। উপরোয়ালা তাহাকে একটু খাতির করিত, সে বলিল যে, এ তাহার চাকরি ছাড়িবার চেষ্টায় ফল। বড় সাহেব তাহার উপর বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। প্রতিকারের কোনও উপায় না থাকায় কনে'-বৌয়ের মত অমূল্যকে চুপ করিয়া থাকিতে হইল।

আট নয় মাস চলিয়া গেল। কলের পুতুলের মত অমূল্যের কেরাণী জীবন অতিবাহিত হইতেছিল, হঠাৎ একদিন বাড়ী হইতে তার আসিল "তোমার মার অসুখ, অবিলম্বে বাড়ী এস।" তার পাইয়া অমূল্য অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিল। তখনই টেলিগ্রাম গাঁথিয়া কলিকাতা ফিরিয়া যাইবার দরখাস্ত করিল। দরখাস্ত পাইয়া বড় সাহেব অমূল্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমার মার অসুখ তাতে বাড়ী যাবার প্রয়োজন কি? টাকা পাঠিয়ে দাও। বল, তোমার কত টাকার দরকার?"

প্রশ্ন শুনিয়া অমূল্য ত অবাক্। মার অসুখ—বাড়ী যাইবার প্রয়োজন কি? মুহূর্ত্তের মধ্যে সে অন্তরে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই আপনার অবস্থা স্মরণ করিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইল। মনে মনে বলিল, "মার অসুখ বাড়ী যাইবার কি প্রয়োজন তাহা তুমি কি জানবে সাহেব! জন্মাবধি মা থাকতেও তোমরা মানুষ হও আয়ার কোলে, পান কর কৃত্রিম দুধ, কৈশোরে থাক বোর্ডিং স্কুলে, আর যৌবনে প্রণয়িনীর সঙ্গে চিরদিনের মত মার নিকট হইতে পৃথক্ হইয়া যাও। এতে যে মার জন্য প্রাণ কাঁদবে না সে আশ্চর্য্য কি?"

এতগুলি কথা নিমেষের মধ্যে অমূল্যের মনে আসিল। কিন্তু তাহা প্রকাশ না করিয়া বলিল, "সাহেব, আমি আমার মার একমাত্র ছেলে। ভগবান না করুন, যদি তাঁর কিছু ভাল মন্দ হয় তবে সে সময় হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে আমার

উপস্থিত থাকাই চাই।" বলিতে বলিতে অমূল্যের কণ্ঠ আর্দ্র হইয়া উঠিল, চোখ ছল্ ছল করিতে লাগিল।

সাহেব যেন অমূল্যের প্রাণের ব্যথা বুঝিলেন, বলিলেন, "কিছু ভেবো না, অসুখ ও রকম সকলেরই হয়। আবার ভালও হয়। আমি আজ কলিকাতার পুলিশ কমিশনারকে টেলিগ্রাম করিব। সে খবর জানিয়া আমাকে জানাইবে। যদি অসুখ না কমিয়া থাকে, তবে তোমাকে যেতে দেবো," বলিয়া তখনই টেলিগ্রাম লিখিয়া ফেলিলেন।

পুলিশ কমিশনারের উত্তর আসিল,—অমূল্যের মাতা কিছু অসুস্থ হইয়াছিলেন,—এখন আর ভয়ের তেমন কারণ নাই।

বলা বাহুল্য অমূল্যের সে যাত্রা ছুটী মঞ্জুর হইল না।

(৬)

ছুটী না পাইয়া অমূল্যের মন বড় খারাপ হইয়া গেল। যেদিন সে বিষয়টা মীমাংসা হইয়া গেল, সে দিন সে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সমুদ্রের তীরে হিমে বসিয়া রহিল। ফলে পরের দিন হইতে জ্বর হইয়া তিন চারিদিন আফিস বন্ধ করিতে হইল। সেই তিন চারিদিন যে সে কি অশান্তিতে ছিল তাহা যাহারা সেই অবস্থায় পড়িয়াছেন তাঁহারই বুঝিতে পারিবেন। অমূল্য যে হোটেলে ছিল সেখানে বাঙ্গালী আর কেহ ছিল না। অন্য যাহারা থাকিত, তাহাদের সহিত অমূল্যের তেমন মেলামেশা ছিল না। অসুখের সময় তাহারা তাহার কোনই খবর লইত না। একপ্রকার বিনা ঔষধে ও বিনা শুশ্রূষায় সে সারিয়া উঠিল।

আফিসের নিয়মানুসারে দুইদিনের বেশী অসুখের জন্য আফিসে অনুপস্থিত হইলে ডিপ্লোমাধারী ডাক্তারের সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হয়। অমূল্য ডাক্তার ডাকে নাই, কাজেই সার্টিফিকেটও দাখিল করিল না। চারি দিনের বেতন কাটা গেল। ইহাতে তাহার মন আফিসের উপর বড়ই চটিয়া গেল। এতদূরদেশে দুইদিন অসুখ হওয়াতে বেতন কাটা গেল, আবশ্যকমত ছুটী পাওয়া গেল না, বিনা অপরাধে 'বোনাস্' পাওয়া গেল না, একশত টাকা বেতনের একটি চাকরি নষ্ট হইয়া গেল ইহাতে চটিয়া যাওয়া আর আশ্চর্য্যের কথা কি ?

কিন্তু—চটিয়া সে কি করিতে পারে ? ভেক সাপের উপর চটিয়া যাহা করিতে পারে, সর্প গরুড়ের উপর চটিয়া যাহা করিতে পারে, গরুড় ব্যাধের উপর চটিয়া যাহা করিতে পারে, হত্যাপরাধী বিচারক জজ সাহেবের উপর চটিয়া যাহা করিতে পারে কেরাণীও তাহার সাহেবের উপর চটিয়া তাহাই মাত্র করিতে পারে !

অমূল্য 'গুঁতোর চোটে' আবার আফিস ঘানিতে ঘুরিতে লাগিল। আফিস হইতে সন্ধ্যাবেলা নিজের ক্ষুদ্র বিছানাটি উপর বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গাহিত, "মা আমায় ঘুরাবি কত।"

ওদিকে অমূল্যের অজ্ঞাতসারে তাহার ভাগ্যাকাশে আর এক কৃষ্ণ মেঘ ঘনীভূত হইতেছিল। তাহার স্নেহের পুত্তলী নিওমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইল। সুধা সুস্থ শরীরে দিনের মধ্যে একশত বার "বাবা, বাবা," করিত। অসুস্থ হইয়া রোগের ঘোরে সর্ব্বদা বলিয়া উঠিত "বাবা, এসেছ।"

তাহার অবস্থা দেখিয়া তখনই অমূল্যকে টেলিগ্রাম করা হইল। টেলিগ্রাম পাইয়া অমূল্য চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। তখন আফিসের কাজের বড় চাপ। অমূল্য এখন ভাল কাজ কর্ম্ম জানে। তাহাকে সহজে কলিকাতা ফিরাইয়া দিবে নাই ইহা অমূল্য ঠিক বুঝিয়াছিল। তবুও সেই টেলিগ্রাম গাঁথিয়া দ্বিতীয়বার কলিকাতা ফিরিয়া যাইবার দরখাস্ত করিল।

সাহেব তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "আজকাল কাজের বড় ভিড়। ১০।১৫ দিন পরে তোমাকে এক মাসের ছুটি দিতে পারি।" অমূল্য কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইল না।

সাহেব মুরুব্বিয়ানা দেখাইয়া বলিলেন, "এই জন্যই ত তোমাদের উন্নতি হয় না। তোমরা আফিসে কাজ কর আর তোমাদের মন থাকে সর্ব্বদা বাড়ীতে। দেখ ত আমরা কতদূর থেকে এসেছি। আমরা কি বাড়ী বাড়ী করে তোমাদের মত চীৎকার করি ?

অমূল্যের এ মুরুব্বিয়ানা সহ্য হইল না। বলিল, "ক্ষমা করুন, আপনাদের বাড়ী থাকলে ত বাড়ীর জন্য প্রাণ কেমন ক'রবে ? আপনাদের বে' হ'লে মেম সাহেব নিয়ে যেখানে যাবেন সেই আপনাদের বাড়ী। আমাদের বাড়ী ব'লতে আরও অনেক জিনিষ বুঝায়।"

সাহেব অমূল্যের উদ্ধত উত্তর শুনিয়া মুখে একটু হাসিলেন বটে, কিন্তু অন্তরে অত্যন্ত চটিলেন; বলিলেন,

"তোমাকে আপাততঃ কিছুতেই কলিকাতা ফেরৎ পাঠাইতে পারিব না। যদি চাও তবে এক পক্ষ পরে দরখাস্ত করিও।"

সেদিন রাত্রে অমূল্যের নিদ্রা হইল না। পরের দিন আফিসে গিয়াই চাকরি ছাড়িবার দরখাস্ত করিল। চুক্তি পত্র অনুসারে একমাসের নোটীস দিয়া যে যখন খুসী চাকরি—ছাড়িতে পারিত, কাজেই তাহা প্রত্যাখ্যান করিবার যো ছিল না। তাহার ত্যাগ পত্র গৃহীত হইবে।

সে বাড়ীতে খবর পাঠাইল, "এক মাসের পূর্ব্বে কিছুতেই যাইতে পারিব না। সুধা কেমন আছে?" সে টেলিগ্রামের কোনও উত্তর আসিল না এবং ১৫ দিনের মধ্যে কোনও চিঠি আসিল না। ১৫ দিন পরেও অমিয়ার চিঠি আসিল না। তাহার মায়ের চিঠি আসিল তাহাও অতি সংক্ষিপ্ত—"বাড়ীর সকলে ভাল আছে। তুমি কেমন আছ? যত সত্বর পার বাড়ীতে চলিয়া আসিবে।"

অমূল্য বুঝিল, যে একটা গুরুতর কিছু হইয়াছে। সুধাই বুঝি—না না, তা কি হয়? তাহা হইলে অমূল্য যে কাঁদিতে কাঁদিতে অন্ধ হইয়া যাইবে। অমূল্য অসহিষ্ণু হইয়া পড়িল। সেই একমাস তাহার নিকট একবৎসর হইতেও দীর্ঘ মনে হইতে লাগিল।

এক মাসের দুই দিন বাকী থাকিতেই অমূল্য কলিকাতা রওনা হইবার আদেশ পাইল, কারণ কলিকাতা যাইতেই দুই দিন লাগিবে। যেদিন কলিকাতা পৌঁছিবে তাহার পরের দিন হইতে তাহার আর চাকরি থাকিবে না। আহা, সে সুখের দিন অমূল্যের কবে আসিবে!

সে দিন তাহার আসিল। ৯টার সময়—নাগপুর মেল হাওড়া ষ্টেসনে পৌঁছিল, অমূল্য একখানা গাড়ী করিয়া বাড়ীতে আসিল।

তাহাকে দেখিয়া তাহার মা ও অমিয়া—"সুধা সুধা" বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। অমূল্য মাথায় হাত বসিয়া পড়িল। প্রায় আধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত তাহার জ্ঞান ছিল কিনা সন্দেহ।

আধ ঘণ্টা পরে হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া পাগলের মত চীৎকার করিয়া বলিল, "কাঁদিসনে অমি! আজ বড় আনন্দের দিন। আজ আমি আমার নিজ হাতে গড়া সোণার শৃঙ্খল হ'তে মুক্ত হ'য়েছি। সে আনন্দ আমায় যেন এ শোককে ছাপিয়ে উঠেছে।" এই বলিয়া সে বাড়ী হইতে ছুটিয়া দাদামহাশয়ের বৈঠকখানায় উপস্থিত হইয়া বলিল "দাদা মশাই! বন্দী আজ মুক্ত হইয়াছি।"

ইহার মাসখানেক পরে অমূল্য বড় রাস্তার ধারে এক চায়ের দোকান খুলিয়া বসিল।

শ্রীশ্রীধর সমাদ্দার।

গৃহ শিক্ষক

পরিপাক তত্ত্ব

(সাহিত্য পরিষদে শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয়ের বক্তৃতা হইতে সংগৃহীত)

আমাদের পরিপাক-যন্ত্রের গঠন ও পরিপাক-ক্রিয়া সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা বলিব। আমাদিগের খাদ্যের মধ্যে যে সকল ভিন্নজাতীয় সার পদার্থ আছে, পরিপাক-যন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন প্রণালীতে তাহাদের পরিপাক-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

আমাদের প্রধান পরিপাক-যন্ত্রের আকার একটি সুদীর্ঘ, নানা পাকে জড়িত নলের ন্যায়। এই নলের কোন অংশ প্রশস্ত, কোন অংশ বা নিতান্ত সরু এবং ইহার দুইটি মুখ আছে। আমাদের মুখগহ্বর ইহার প্রবেশদ্বার এবং মলদ্বার ইহার নির্গম-পথ। শেষোক্ত পথ দ্বারা খাদ্যের অসার অংশ মলরূপে বহির্গত হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত যকৃৎ (Liver) এবং ক্লোম (Pancreas) নামক অপর দুইটি যন্ত্র উদর-গহ্বরের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া পরিপাক-কার্য্যের সবিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে।

মুখগহ্বরের মধ্যে দন্ত, জিহ্বা এবং লালানিঃসারক গ্রন্থিগুলি (Salivary glands) দ্বারা খাদ্যের পরিপাকক্রিয়া

আরম্ভ হয়। খাদ্য উত্তমরূপে চর্ব্বিত হইয়া সূক্ষ্মাংশে বিভক্ত না হইলে জারক রস উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহাকে জীর্ণ করিতে পারে না। এ জন্য খাদ্য ধীরে ধীরে উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া গলাধঃকরণ করিলে পরিপাকের বিশেষ সুবিধা হয়।

জিহ্বার দ্বারা মুখস্থিত খাদ্য দন্তের নিকট সর্ব্বদা পরিচালিত হয় এবং মুখের মধ্যে যে তিনটি প্রধান লালাগ্রন্থি আছে, তাহা হইতে যথেষ্ট পরিমাণ লালা (Saliva) নিঃসৃত হইয়া খাদ্যের শ্বেতসার (Starch) অংশের পরিপাক সাধন করে। লালার মধ্যে টায়ালিন্ (Ptyalin) নামক এক প্রকার কিণ্ব পদার্থ (Ferment) আছে; ইহার সংযোগে মুখের মধ্যে শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ (Starch) প্রথমতঃ ডেক্‌ষ্ট্রিন্ (Dextrin) এবং পরে দ্রাক্ষাশর্করায় (Grape sugar) পরিণত হয়। শ্বেতসার দ্রাক্ষা-শর্করায় পরিণত না হইলে উহা রক্তের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না এবং আমাদের দেহের ব্যবহারে লাগে না। এ দেশের লোকের খাদ্যের মধ্যে শ্বেতসারজাতীয় পদার্থ অধিক পরিমাণে থাকে, সুতরাং তাড়াতাড়ি খাইলে এই জাতীয় খাদ্যের পরিপাকের ব্যাঘাত হয় এবং এই কারণে অনেক স্থলে অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হয়।

খাদ্যভেদে পরিপাক-প্রণালীর প্রভেদ হইয়া থাকে এবং একটি পরিপাক-প্রণালী অপরটির সহায়তা করে। মুখের মধ্যে শ্বেতসার আংশিকভাবে জীর্ণ হইয়া ডেক্‌ষ্ট্রিন্ নামক যে পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা আমাশয়ে উপস্থিত হইলে উহার সাহায্যে আমাশয় মধ্যে অধিক পরিমাণ জারক রস (Gastric juice) নিঃসৃত হইয়া থাকে। এ স্থলে ডেক্‌ষ্ট্রিন্ আমাশয়স্থিত জারক রস নিঃসরণের উত্তেজকের কার্য্য করে। সুতরাং ধীরে ধীরে চর্ব্বণ করিয়া মুখের মধ্যে পরিপাককার্য্য যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য।

খাদ্যদ্রব্য এইরূপে চর্ব্বিত, লালার সহিত মিশ্রিত এবং আংশিকভাবে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া মুখগহ্বরের পশ্চাদ্‌ভাগে অবস্থিত একটি অপ্রশস্ত নলের মধ্যে প্রবেশ করে। পরিপাক-নলের এই অপ্রশস্ত অংশের নাম অন্ননালী (Æsophagus) অন্ন-নালীর পুরোভাগ শ্বাস-নালী (Wind pipe) অবস্থিত; ইহার মধ্য দিয়া শ্বাসবায়ু আমাদের বক্ষোগহ্বরস্থিত ফুসফুস্ (Lungs) নামক যন্ত্রে প্রবেশ করে। সুতরাং খাদ্যকে শ্বাসনালীর ছিদ্র পার হইয়া অন্ন-নালীতে প্রবেশ করিতে হয়। গলাধঃকরণের সময়ে যদি কোন প্রকারে খাদ্যের এক কণামাত্র শ্বাস-নালীতে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে প্রবল কাসি উপস্থিত হইয়া বিষম ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। চলিত কথায় ইহাকে "বিষম লাগা" কহে।

এই বিপদ্ নিবারণের জন্য একটি সুন্দর ব্যবস্থা আছে। শ্বাসনালীর উপরিভাগে বাক্সের ডালার ন্যায় একখানি ঢাক্‌না সংযুক্ত থাকে। চর্ব্বিত পিচ্ছিল খাদ্য-পিণ্ড মুখগহ্বরের পশ্চাদ্-ভাগে (Pharynx) উপস্থিত হইবামাত্র ঢাক্‌নাখানি আপনাআপনি নিম্নগ হইয়া শ্বাসনালীর মুখ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দেয়, সুতরাং খাদ্যপিণ্ড স্বচ্ছন্দে উহার উপর দিয়া অন্ন-নালীতে প্রবেশ করে। তাড়াতাড়ি খাইলে "বিষম" লাগিবার সম্ভাবনা, এজন্য তাড়াতাড়ি খাওয়া কোন মতে উচিত নহে। শিশুরা যখন কাঁদে, তখন শ্বাসনালীর মুখ উন্মুক্ত থাকে। এ সময়ে শিশুকে জোর করিয়া দুধ খাওয়াইলে অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা।

অন্ন-নালীর মধ্য দিয়া চর্ব্বিত খাদ্য নিম্নমুখে গমন করে এবং উদরগহ্বরের ঊর্দ্ধদেশে অবস্থিত একটী নাতি-প্রশস্ত থলির মধ্যে আগমন করে। এই থলির নাম আমাশয় (Stomach)। ইহার আকার ভিস্তির মশকের ন্যায় এবং উহার অভ্যন্তরপ্রদেশ মৌচাকের ন্যায় বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বরে বিভক্ত। এক একটি গহ্বরের মধ্যে বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালীর মুখ অণুবীক্ষণ যন্ত্র-সাহায্যে দেখিতে পাওয়া যায়। খাদ্য আমাশয়ে পৌছিলে এক প্রকার জারক রস সেই সকল নালীর মুখ হইতে ক্রমাগত নিঃসৃত হইতে থাকে। আমাশয়-নিঃসৃত এই জারক রসকে ইংরাজিতে গ্যাষ্ট্রিক্ জুস্ (Gustric ku'ce) কহে। এই জারক রসের সাহায্যে মাছ, মাংস, ডিম, ডাল, ছানা প্রভৃতি যাবতীয় খাদ্যদ্রব্যের মধ্যস্থিত ছানাজাতীয় সার পদার্থ (Proteid) জীর্ণ হইয়া পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমাশয়ে প্রধানতঃ ছানাজাতীয় খাদ্যই পরিপাক প্রাপ্ত হয়। আমাশয়ে খাদ্য জীর্ণ হইয়া কর্দ্দমের আকার ধারণ করে, এই জীর্ণ খাদ্যকে ইংরাজীতে

কাইম্ (Chyme) বলে। আমাশয়ে খাদ্য পরিপাক হইতে প্রায় ৩ ঘণ্টা সময় লাগে।

আমাশয় হইতে জীর্ণ খাদ্য ক্রমশঃ ক্ষুদ্র অন্ত্রে (Small intestine) আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে আমাশয়মধ্যে যতক্ষণ পরিপাককার্য্য চলিতে থাকে, ততক্ষণ উহার নিম্নমুখ (Pylarny) এরূপ দৃঢ়ভাবে বদ্ধ থাকে, যে, খাদ্যকে কোন মতে ক্ষুদ্র অন্ত্রে প্রবেশ করিতে দেয় না। আমাশয়ের পরিপাককার্য্য শেষ হইলে পর নীচের মুখটি খুলিয়া যায় এবং জীর্ণ খাদ্য অল্পে অল্পে ক্ষুদ্র অন্ত্রমধ্যে প্রবেশ করে। আমাশয় হইতে যে জারক রস নিঃসৃত হয়, তাহার মধ্যে পেপসিন্ (Pepsin) নামক একটী কিণ পদার্থ (ferment) এবং হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড (Hydrocloric Acid) নামক একটি অম্ল পদার্থ থাকে। এই দুইটি জারক পদার্থের সাহায্যে ছানাজাতীয় সার-পদার্থ এইরূপে পরিবর্ত্তিত না হইলে উহার পরিপাক সাধিত হয় না। পেপ্টান্ ক্ষুদ্র অন্ত্রে গমন করিলে তৎস্থানে জারক রসের সহিত মিলিত হইয়া উহার পরিপাক ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় এবং জীর্ণ পেপ্টান্ রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া দেহের পুষ্টি সাধন করে।

আমাশয়ের জারক রস অম্লরসসংযুক্ত বলিয়া উহার জীবাণু নাশ করিবার শক্তি আছে। আমাদের খাদ্য দ্রব্যের সহিত রোগোৎপাদক জীবাণু কোন প্রকারে মিশ্রিত হইয়া থাকিলে আমাশয়ে যাইবামাত্র তথাকার অম্লরস-সংযোগে অবিলম্বে নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্য কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় খালি পেটে থাকা নিষিদ্ধ। কারণ, আমাশয়ে খাদ্য না থাকিলে তন্মধ্যে অম্লরস নিঃসৃত হয় না, সুতরাং আমাশয়ের রোগের কীটাণু নাশ করিবার শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

আমাশয় হইতে কোন খাদ্য—এমন কি, জল পর্য্যন্ত শোষিত হইয়া রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে না। জীর্ণ খাদ্য অন্ত্রের মধ্যে গমন করিলে পর দেহমধ্যে উহার শোষণ-কার্য্য আরম্ভ হয়।

(২)

সহজ-লভ্য সর্পাঘাতের ঔষধ।

—:০:—

ইংলিশম্যানের জনৈক সংবাদ দাতা ১২ই ফেব্রুয়ারীর ইংলিশম্যানে লিখিয়াছেন যে, বহুদিন গাঁজা খাইলে গাঁজাখোরদের কলিকার ঠিক্‌রায় এক প্রকার কাট্ জমিয়া যায়। সর্পদ্রষ্ট ব্যক্তির ক্ষত স্থান চিরিয়া তাহাতে এই গাঁজার কলিকারঠিক্‌রাতে যে কাট্ জমিয়া আছে, তাহা জলসংযোগে একখানা পাথরে ঘষিয়া সেই লাল জলটা দিলে সর্পবিষ নষ্ট হইয়া মুমূর্ষুপ্রায় রোগীও আরোগ্য হইয়া থাকে। ইহা সহজসাধ্য ঔষধ, এই ঔষধটাকে "Caked burnt ganja water" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা বাঙ্গালায় সহজবোধ্য হইবার জন্য 'গাঁজার ঠিক্‌রার কাট্' নাম দিলাম।

অর্থাৎ তামাকের নল বা কল্‌কে অনেক দিন পরিষ্কার না হওয়ার জন্য তাহাতে একটা জমাট পদার্থ যেরূপ জমিয়া যায়, সেইরূপ গাঁজার কল্‌কেতেও জমে, ইহাকে বাঙ্গালা ভাষায় আমরা কাট বলি, এই কাট্‌টিই সর্প বিষের মহৌষধ।

জনৈক শিক্ষিত দেশীয় খৃষ্টান ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট তিনি গবরমেণ্টের নিকট বিশেষ গণ্যমান্য—এই ঔষধ বহুবার পরীক্ষা করিয়া ইহার গুণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

ব্যবহারের বিধি

সাপে কামড়াইলে উপরে নীচে বান্ধন দিয়া উপরোক্ত প্রকারে ঐ ঠিক্‌রাকে প্রস্তরে ঘষিয়া সেই জল ক্ষতস্থান ছুরিকা দ্বারা চিরিয়া লালরক্ত বাহির হইলেই সেই স্থানে প্রয়োগ করিতে হইবে। উক্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন যে, একজন স্ত্রীলোককে গখুরা সাপে কাটিয়া ছিল। শরীরের কোনস্থানে লোহিত রক্ত পাওয়া যায় নাই, অগত্যা তিনি রোগিণীর চক্ষের মধ্যে এই ঔষধ প্রয়োগ করেন। প্রায় ২ ঘণ্টার মধ্যে রোগিণীর চৈতন্য হয় এবং সে বাঁচিয়া উঠে। তিনি বলেন "Treatment will cure effectually and permanently within two hours." অর্থাৎ ২ ঘণ্টার মধ্যে এই ঔষধ দ্বারাই রোগী স্থায়ীভাবে সুন্দররূপে আরোগ্য হইবে। ইহা সহজলভ্য ঔষধ। এদেশে গাঁজাখোরেরও অভাব নাই।

(৩)

আলু রক্ষার উপায়

ফ্রেঞ্চ মিনিষ্টার অফ্ এগ্রিকল্‌চার সরকারী বুলেটীনে আলু রক্ষার নিম্নলিখিত উপায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

আমরা নিম্নে তাহার অনুবাদ ও সারাংশ সংগ্রহ করিয়া দিলাম। আলু অধিক দিন থাকে না, পচিয়া যায়—নিম্নলিখিত উপায়ে আলু প্রায় ১৮ মাস অবিকৃত অবস্থায় থাকে।

Commercial Sulphuric acid—বাজার চলিত ব্যবসারিক সল্‌ফিউরিক আসিড্‌ ২ ভাগ এবং জল ১০০ ভাগ দিয়া যে সলুইশন হইবে, তাহাতে আলুগুলিকে ভিজাইয়া ১০ ঘণ্টা রাখিয়া তাহার পর শুষ্ক করিয়া গুদামজাত করিলে আলু নষ্ট হইবে না, এইরূপে আলুর গায়েও কোন দাগ হইবে না।

ঐ একই সলুইসনে বরাবর আলু নিমজ্জিত করিলেও ইহার শক্তি বিকৃত হয় না বা কমিয়া যায় না। একটা জালা বা টাঙ্কে ঐরূপ সলুইশন করিয়া আলুকে নিমজ্জিত করিবার সুবিধা হইবে।

রাসায়নিক পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে যে, উপরোক্ত প্রকারে রক্ষিত আলু স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর নহে। বরং পুষ্টিকর, সুস্বাদু। অধিকন্তু ১৮ মাস অবিকৃত অবস্থায় থাকিবে, যেন সদ্য জমি হইতে আলু খুঁড়িয়া আনা হইয়াছে।

এইরূপে রক্ষিত আলুর বীজে গাছ হইবে না, তবে খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে মাত্র।

[কাজের লোক]

(৪)

রোগের বাহন

মাছি অধিকাংশ রোগ বহন করিয়া থাকে, কলেরা, টাইফয়েড জ্বর, যক্ষ্মা, বসন্ত প্রভৃতি অতি ভীষণ ব্যাধি-সমূহ মাছির দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। মাছি এই সকল রোগ-বীজাণু এক স্থল হইতে স্থানান্তরে লইয়া যায়।

বঙ্গের স্বাস্থ্য কমিশনার ডাক্তার বেণ্টলী মাছির এই রোগবহন সংবাদ লোক সাধারণের গোচর করিবার জন্য নিম্নলিখিত রূপ বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন :—

১। মাছি কোথায় জন্মে?

পচা জিনিষ ও পচা সারের মধ্যে।

২। মাছি কোথায় বাস করে?

যেখানে সকল প্রকার নোংরা জিনিষ পচিতেছে, সেই স্থানে মাছি বিহার করে। মাছিরা উহাদের পা ও ডানায় করিয়া ঐ সকল নোংরা জিনিষ বহন করে।

৩। পচা সারের স্তূপ, পায়খানা এবং জঞ্জাল রাশির উপর হইতে মাছিরা কোথায় যায়?

সেখান হইতে মাছিরা সরাসরি রন্ধন ও ভোজন ঘরে, বাজার ও খাদ্য দ্রব্যের গোলায় গমন করে।

৪। মাছিরা ঐ সকল স্থলে যাইয়া কি করে?

তথায় যাইয়া অন্নব্যঞ্জন, চাউল, ডাল তরী-তরকারী প্রভৃতির উপর বসিয়া থাকে এবং পা ও ডানার দ্বারা বাহিত ময়লা লাগাইয়া ঐ সকল দ্রব্য কলুষিত করে।

৫। মাছি কি যক্ষ্মা, টাইফয়েড জ্বর, বিসূচিকা প্রভৃতি রোগীর দেহে বসে?

হাঁ, মাছিরা ঐ সকল সংক্রামক ব্যাধি পীড়িত ব্যক্তির অঙ্গে বসিয়া থাকে এবং ঐ সকল রোগের বীজাণু বহন করিয়া পরক্ষণেই তোমার শরীরে বসিতে পারে।

৬। মাছিরা কোন্ কোন্ ব্যাধির বীজাণু বহন করে?

কলেরা, টাইফয়েডজ্বর, যক্ষ্মা, উদরাময়, ডিফথিরিয়া প্রভৃতি সমস্ত রোগের বীজাণুই মাছিরা বহন করে।

৭। মাছির উৎপাত কিরূপে নিবারিত হইতে পারে?

তোমার বাড়ীর চারিদিকে যে সকল আবর্জ্জনা আছে, উহা দূর কর।

যেখানে সার পচাও, ঐ স্থান ঢাকিয়া রাখিও। পায়খানা ঢাকা রাখিবে, সমস্ত নোংরা জিনিষ পোড়াইয়া ফেল, ঘরের চারি দিকে পরদা লাগাইয়া দিও।

তুমি অবশ্যই মাছি বিনাশ করিবে, নচেৎ মাছি তোমাকে বিনাশ করিবে।

মাছি মারিবার উপায়

ঐ সকল আবর্জ্জনার স্থানে ফেনাইল দিয়া দেখিয়াছি, বাড়ীতে মাছির উপদ্রব কমিয়া যায়।

Fly paper বা মাছি ধরা কাগজ প্রস্তুত করিয়া বাড়ীর স্থানে স্থানে টাঙ্গাইয়া দিলে মাছি তাহাতে লাগিয়া যায়।

মাছিধরা কাগজ প্রস্তুত প্রণালী

১। প্রথমে একখানা কাগজে তৈল মাখাইয়া তাহাতে টারপিন বার্ণিস এককোট মাখাইয়া সেই কাগজ দেওয়ালে আটকাইয়া রাখ, মাছি বসিলেই আটকাইয়া যাইবে।

১। রজন ১ পাউণ্ড, ২ ক্রুইড্ড্রাম মসিনাতৈল একত্রে অগ্নির উত্তাপে ফুটাইতে থাক, যখন গলিয়া যাইবে,

সেই গরম অবস্থায় একখানা ফুলস্কাপ্ কাগজে মাখাইয়া দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া দাও। মাছি ধরা পড়িবে। উপরোক্ত মিশ্রনে কিঞ্চিৎ মধু মিশাইলে আরও ভাল হইবে।

৩। রজন ৮ ভাগ, টারপিনতৈল ৪ ভাগ, মসিনার তৈল ৩॥ ভাগ একত্র ফুটাইয়া ঘন হইলে কাগজে মাখাইয়া দাও।

প্রতি দিন বাড়ীতে ২।৩ বার ধুনার ধুম করিলে মাছি তিষ্ঠিতে পারে না। মাছিই যে রোগের বাহন, সে বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই কিন্তু পরিতাপের বিষয়, পল্লীগ্রামের লোকের কি যে মতিগতি হইয়াছে, তাহারা বাড়ীতে আবর্জ্জনা, বাড়ীর পাশে আস্তাকুড়, মলমূত্র ত্যাগ করাকে দোষের বিবেচনা করে না। সেইজন্য পল্লীগ্রাম নরকসদৃশ এবং যমালয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিজেরা ইচ্ছা করিয়া ভাল থাকে না। সেইজন্য বিবিধ প্রকার রোগে শোকে পল্লীগ্রাম শ্মশানে পরিণত হইতেছে। নিজ কর্ম্মদোষে ইহারা নারকীয় যন্ত্রণা ভোগ করে, ইহা তাহাদের স্বভাব দাঁড়াইয়াছে। পল্লী-মহিলাগণ খাদ্য দ্রব্যে ঢাকা দিতে চায় না। সহরের মহিলাদের তুলনায় পল্লী-মহিলাগণ এখন অতি জঘন্য কদাচারিণী হইয়া উঠিয়াছেন, কিন্তু আগে এই পল্লীগ্রামের মহিলারাই গার্হস্থ্য পবিত্রতা রক্ষণে অগ্রণী ছিলেন। তাহার কারণ নারীগণ এক্ষণে নিজেদের বেশ-ভূষা লইয়া বিলাসিতার জন্য যত ব্যস্ত, গৃহ সংসারের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পাদনে তত মনোযোগী নহেন।

কাঃ সঃ।

ছোট-কথা

১। 'মানত্'

(১)

মুক্তো' মেছুনির একটা ছাগ্লীর বাচ্ছা হ'লো না। ছাগ্লীটা কিনেছে পাঁচ-সিকে দিয়ে।

সে 'মানত' ক'র্‌ছে,—"মা-দুর্গা,—হে—মা দুর্গা!—আমার ছাগ্লীটের বাচ্ছা হোক্,—একেবারে তিনটে বাচ্ছা; আমি জোড়-মইশ দিয়ে তোমার পূজো দে'বো!"

(২)

কালু-মাঝি যাচ্ছিল সেই রাস্তায়; সে ব'ল্লে,—"হাঁ-রে, মুক্তো' দিদি,—পাঁঠা জন্মালে তিনটের দাম হবে বুড় জোর্ ছ-টাকা; দু-টো' মইশের দাম হবে কম্ ক'রে তিন কুড়ি টাকা! তা' তুই কি 'মানত' কচ্ছিস্?"

মুক্তা ব'ল্‌ছে,—"কালু-দা, দেবীকে 'মানত' ক'রে আগে ছাগলের বাচ্ছা হইয়ে নি; তারপর কি-আর মইশ দেবো? তুমিও যেমন।"

কালু ঘাড় নেড়ে ব'ল্লে,—"হাঁ, বোন্,—তা বটেন!"

২। জুতোর দাম

(১)

শিবনাথ দাস 'রগুড়ে' লোক,—অবস্থা তত ভাল নয়। এক জোড়া শত তালি বিশিষ্ট, সাত বছরের পুরোণো জুতো প'রে গিয়েছেন তাঁর বেয়াই রামতনু ধরের বাড়ী।

(২)

রামতনু র'সিকতা ক'রে জিজ্ঞেস্ ক'র্‌লেন,—"বেয়াই-এর জুতো জোড়াটার দাম কত?—বেচবে না-কি?"

শিবনাথ মস্তকে হস্ত সঞ্চালন ক'রে ব'ল্লেন,—"তা' কি ব'লব হে! জুতোটা কিনেছিলেম্ এই সওয়াই টাকা দিয়ে। তারপর সাতবছরের সেলাই খরচা প'ড়েছে সওয়া-পাঁচ টাকা,—এখন দাম হচ্ছে এই সাড়ে সাত টাকা; কিন্‌তে হয় বেয়াই এই বেলা কিনে ফেল,—না হয় বেচাই থাক্! এর পরে কিন্তু দাম আরো বেড়ে যাবে।"

৩। নাম-করণে সুবুদ্ধি

(১)

বিশ্বম্বর বাবুর জিদ ছিল তাঁর ছেলেদের নামে "ম্বর" থাকা চাই।

তাঁর দু-টী জমজ ছেলের নাম রাখা হবে। সবাই ব'সেছেন নাম ঠিক ক'রতে; কিন্তু যে নামটার কথা উঠ্‌ছে সেইটে-তেই আপত্তি।

(২)

বৃদ্ধ রামহরি ঠাকুর্দা ব'ললেন,—"এবার নাম রাখা যাক্‌,—'নীলাম্বর' আর 'পীতাম্বর',—কেমন?"

বিশ্বম্বর ব'ললেন,—"সে দু-টো' নাম আগেই দু-টো' ছেলের বেলায় রাখা গেছে—"

"তবে 'দিগম্বর' আর 'শুভাম্বর' রাখ,—তা' হ'লেতো আর—"।

"সে-দুটো' নামও আগেই আর দুটো ছেলের বেলায় হ'য়ে গিয়েছে—"।

একজন আফিম্‌-খোর সেখানে ছিলেন; তিনি তাঁর মুদ্রিত প্রায় চক্ষুদুটী সেই প্রায় মুদ্রিত অবস্থায়ই বিশ্বম্বর বাবুর দিকে ফিরিয়ে, মৃদুহাস্য ক'রে ব'ললেন,—

"বিশু-দা,—এবার দুজনার নাম রাখ তবে 'নবেম্বর' আর "ডিসেম্বর'—।"

শ্রীসুরেশ চন্দ্র ঘটক, এম্‌ এ।

বিবিধ প্রসঙ্গ

শাসন সংস্কার আইন

ভারতের শাসন সংস্কার বিষয়ক আইন বিলাতের মহাসভায় গত পৌষ মাসে পাশ হইয়াছে। ভারত সচিব জানাইয়াছেন, আগামী নবেম্বর (কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা সমূহের নির্ব্বাচন কার্য্য শেষ করা হইবে ও তদনুযায়ী (পৌষ মাঘ মাসে) নূতন সভা সকল কার্য্য আরম্ভ করিবে। আমাদের যুবরাজ আগামী শীতকালে ভারতে শুভাগমন করিবেন, তিনি ব্যবস্থাপক সভা সমূহের কার্য্যারম্ভ-অনুষ্ঠান সম্পাদন করিবেন। অতএব নূতন আইন অনুযায়ী নূতন ব্যবস্থা অচিরেই প্রচলিত হইবে।

আমাদের লাভালাভ

নূতন আইনে ভারতবাসী স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার কি পরিমাণে লাভ করিয়াছেন, ইহাতে দেশের নানা অভাব ও অভিযোগ মোচন করিবার ক্ষমতা ও সুযোগ কি পরিমাণে দেশবাসীগণের আয়ত্ত হইল—এ সকল বিষয় লইয়া মতভেদ হইতে পারে। কিন্তু নূতন আইনে বাস্তবিক যে কতকগুলি নূতন অধিকার এদেশবাসীদিগকে দেওয়া হইয়াছে যাহা হইতে তাঁহারা এ যাবত বঞ্চিত ছিলেন এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই! এ সকল অধিকারের মূল্য ও কার্য্যকারিতা বর্ত্তমানে যতই সামান্য হউক না কেন দেশবাসীগণ যদি উপযুক্ত ভাবে, সমস্ত বিষয় বুঝিয়া, দেশের কল্যাণের উদ্দেশ্যে, এই সকল অধিকার পরিচালনা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন তাহা হইলে যে সুফল লাভ হইবে ও অধিকারের পরিধি ক্রমশঃ প্রসারিত হইবে এ বিষয়েও সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই।

অধিকার ও দায়িত্ব

নূতন অধিকার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নূতন দায়িত্বও আসিয়া পড়ে। অধিকার পাইলেই তদানুসঙ্গিক দায়িত্ব বহন করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। আনুসঙ্গিক দায়িত্ব বহন করিতে না পারিলে নূতন অধিকার পাইয়া কোনও লাভ হয় না। অধিকার পরিচালনা করিবার উপযোগী শিক্ষা, ত্যাগ, কর্ম্মকুশলতা প্রভৃতির অভাবে প্রাপ্ত অধিকারের কোনও সদ্ব্যবহার হইতে পারে না।

প্রতিনিধিতন্ত্র শাসনপ্রণালী

এদেশে প্রতিনিধি তন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠা করা নূতন আইনের স্থূল উদ্দেশ্য। প্রজা সাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিবর্গের পরামর্শে ও কর্ত্তৃত্বে দেশের শাসন প্রণালী পরিচালনার ব্যবস্থা এই তন্ত্রের মূল নীতি। প্রতিনিধিবর্গের ক্ষমতা যে স্থলে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া স্বীকৃত হয় ও সর্ব্ব বিষয়ে তাহাদিগের ক্ষমতা অব্যাহতরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় সে স্থলে পূর্ণ প্রতিনিধিতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠা হইয়াছে বলা যায়। এইরূপ তন্ত্রের নামকরণ ইংরেজীতে Responsible Government, বাঙ্গলায় ইহাকে সর্ব্বদায়িত্বযুক্ত প্রতিনিধি

তন্ত্র শাসনপ্রণালী বলা যাইতে পারে। নূতন আইনের ভূমিকায় এদেশেও ক্রমশঃ এই প্রকার শাসন তন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হইবে এরূপ অঙ্গীকার করা হইয়াছে।

প্রতিনিধিতন্ত্র শাসনপ্রণালীর সফলতা

পূর্ণই হউক আর আংশিকই হউক প্রতিনিধিতন্ত্র শাসন প্রণালীর সফলতা দেশের জন সাধারণের শিক্ষা, দায়িত্বজ্ঞান, প্রভৃতির উপর সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করে। ভোট দেওয়ার অধিকারপ্রাপ্ত জন-সাধারণ প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করেন ; যাঁহারা নির্ব্বাচন করেন তাঁহাদের অভাব অভিযোগ কিভাবে দূরীভূত করা যায়, তাঁহাদের প্রকৃত কল্যাণ কিসে হইতে পাবে, তাঁহাদের এই সব বিষয়ে কি অভিপ্রায়—এ সকল প্রণিধান করিয়া কার্য্য করা উপযুক্ত প্রতিনিধিগণের কর্ত্তব্য। প্রতিনিধিগণ যদি যোগ্য ব্যক্তি না হন কিম্বা তাঁহারা যদি নিজ কর্ত্তব্য উপযুক্তরূপে সম্পাদন না করেন তাহা হইলে প্রতিনিধিবর্গের দ্বারা জন-সাধারণের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না প্রতিনিধিমূলক শাসন প্রণালীও সফলতা লাভ করিতে পারে না। অতএব যোগ্য ব্যক্তি বাছিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা, নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ উপযুক্তরূপে নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছেন কিনা এবিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা, এই তন্ত্রের শাসনপ্রণালীর সফলতার জন্য আবশ্যক।

জনসাধারণের দায়িত্ব

ভোট দেওয়ার অধিকারের সহিত এ সকল দায়িত্ব ভোটদাতার স্কন্ধে আসিয়া পড়ে। এই দায়িত্ব বহন করিবার জন্য ভোটদাতাগণের পক্ষে দেশের কল্যাণকর বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক, স্বেচ্ছায়, স্বাধীন ভাবে অনুরোধ, উপরোধ, ভয় প্রদর্শন বা স্বার্থ প্রভৃতি উপেক্ষা করিয়া যোগ্য ব্যক্তিকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা আবশ্যক,—নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি নিজ কর্ত্তব্য কিরূপভাবে শাসন করিতেছেন তাহার সংবাদ সদাসর্ব্বদা লওয়া আবশ্যক—নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি নিজ কর্ত্তব্য উপযুক্ত ভাবে সম্পাদন না করিলে পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনের সময় অন্য যোগ্য ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করা আবশ্যক।

অতএব প্রতিনিধিতন্ত্রমূলক শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠার সূচনা নূতন আইনের দ্বারা যাহা হইয়াছে তাহাকে সুফলপ্রদ ও প্রসারিত করিতে হইলে দেশবাসীগণের দায়িত্ব তাঁহাদিগকে উপযুক্তরূপে সম্পাদন করিতে হইবে। এজন্য তাঁহাদিগকে নূতন শাসনসংস্কার আইনের মর্ম্ম, শাসন প্রণালীর তত্ত্ব ও কার্য্যবিধি, দেশের অভাব অভিযোগ ও তাহার প্রতিকারের উপায়, এবং দেশের কল্যাণকর নানাবিধ সম্বন্ধে বিষয় জ্ঞান লাভ অবশ্যই করিতে হইবে।

সংবাদ পত্রের উপযোগীতা

এ সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ের জ্ঞান নানা পুস্তক ও বিবরণী হইতে পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহা সর্ব্বসারণের পক্ষে সুলভ ও সুবিধা জনক নয়। বর্ত্তমান যুগে সংবাদ পত্র এ সকল বিষয়ে জন সাধারণের সর্ব্বপ্রধান ও সহজলভ্য শিক্ষক। সংবাদ পত্রের একটি প্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে সহজভাবে সাধারণের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের আলোচনা করা। উপযুক্ত রূপে সম্পাদিত সংবাদ পত্র পড়িয়া সাধারণ একজন পাঠক সাধারণের প্রয়োজনীয় বিষয়ে যেরূপ সর্ব্বাঙ্গীন জ্ঞান লাভ করিতে পারেন এরূপ সহজ উপায় আর কিছুই নাই।

মালঞ্চের নিবেদন

এই সকল কারণে আমরা সঙ্কল্প করিয়াছি এ বৎসর মালঞ্চের প্রতি সংখ্যায় শাসন সংস্কার সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের সহজ আলোচনা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত করিব যদি আমরা সঙ্কল্পানুযায়ী কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি তাহা হইলে এই বৎসরের দ্বাদশ সংখ্যায় মোটামুটি এ বিষয়ের জ্ঞাতব্য অধিকাংশ প্রসঙ্গে আলোচনা বাহির হইবে। বর্ত্তমান সংখ্যায় শাসন সংস্কার আইনের স্থুল মর্ম্ম স্থানান্তরে আলোচনা করা হইল।

অধ্যাপক রামানুজ

"ভারতমাতার মণিমালা হইতে, একটি উজ্জ্বল মাণিক্য খসিয়া পড়িয়াছে। প্রসিদ্ধ গণিতবিদ অধ্যাপক রামানুজ আর ইহজগতে নাই। সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, গত ২৬শে এপ্রিল এই অসাধারণ প্রতিভাবান পুরুষের দেহান্তর ঘটিয়াছে। স্যর আইজাক নিউটনের পরে যিনি গণিতশাস্ত্রের মৌলিক গবেষণায় শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহার এমন অকালমৃত্যু ভারতের পক্ষে যে সুগভীর পরিতাপের বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। মৃত্যুকালে রামানুজের বয়স ত্রিশ পূর্ণ হয় নাই—এই অল্প বয়সেই এহেন অকালপারিজাত বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়িল। এই প্রতিভাবান যুবকের স্বল্প জীবনী কাহিনীর মতই বিচিত্র। আমরা নিম্নে তাহা প্রদান করিলাম। তাহাতে দেখা যাইবে, মান্দ্রাজ এবং কেম্ব্রিজের শ্বেতাঙ্গ সমাজের সহানুভূতি না পাইলে রামানুজের মত সামান্য অবস্থার একজন পোর্টট্রাষ্ট আফিসের কেরাণী কিছুতেই এত বড় হইয়া উঠিতে পারিতেন না। রামানুজের জীবনীতে কতিপয় শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীর সহৃদয়তা, উদারতা এবং বিদ্যানু-চিকীর্ষার পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

জীবনী

অধ্যাপক রামানুজ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত তাঞ্জোর জেলার প্রসিদ্ধ পল্লী কুম্ভকোনমে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে তিনি ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার। রামানুজের বয়স যখন মাত্র বার বৎসর, তখন তাঁহার গণিত বিষয়িণী প্রখর বুদ্ধির নিকট শিক্ষকদিগকেও হার মানিতে হয়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে রামানুজ ষোড়শ বর্ষ বয়ক্রম কালে মেট্রিকিউলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং কুম্ভ-কোনমের কলেজে ভর্ত্তি হন। অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি অতিমাত্র ঝোঁক দেওয়াতে তিনি পরীক্ষায় অন্য সব বিষয়ে ফেল হন। এ জন্য দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে উঠিতে পারেন না।

১৯০৬ সালে তিনি পাচিয়াপ্পা কলেজে ভর্ত্তি হন; কিন্তু অসুস্থ হইয়া পড়াতে কলেজের পড়াতে তাঁহাকে ক্ষান্ত দিতে হয়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রাইভেটভাবে এফ-এ পরীক্ষা দেন—কিন্তু সব বিষয়েই ফেল করিয়া বসেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে রামানুজ মান্দ্রাজ পোর্টট্রাষ্ট আফিসে ২৫ টাকা বেতনে একাউন্টেন্টের ক্লার্ক নিযুক্ত হন। ইহার আট মাস পরে মান্দ্রাজের ইন্‌জীনিয়ারিং কলেজের তৎকালীন অধ্যাপক মিঃ এল, টি গ্রিফিথ রামানুজের সম্বন্ধে পোর্টট্রাষ্টের বড় সাহেব সার ফ্রান্সিস স্প্রিংএর নিকট লিখেন—

"আপনার আফিসে রামানুজ বলিয়া একটি ছোক্‌রা কেরাণী আছে, সে একজন বড় গণিতবিদ। আমি আশা করি, যে পর্য্যন্ত এই ছোক্‌রাটির স্বাভাবিক প্রতিভা বিকাশের কোন সুবিধা না করিয়া দেওয়া যায়, সে পর্য্যন্ত আপনি তাঁহার উপর একটু সুদৃষ্টি রাখিবেন। আমি বিলাতের কোন গণিতবিদ অধ্যাপকের নিকট রামানুজের কথা লিখিতেছি এবং তাহার হিসাবপত্রের কিছু কাগজও পাঠাইতেছি। আমাদের এখানকার যাঁহারা গণিতের অধ্যাপক তাঁহারা বলিতেছেন, ঐ কাগজ-পত্রের ভুল বা দোষ ধরা, যাহার তাহার কর্ম্ম নহে, খুব কম লোকেরই এমন মাথা আছে।

স্যার ফ্রান্সিস স্প্রিং ১৯১৩ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী বিলাতের ট্রিনিটি কলেজের অধ্যাপক মিঃ জি, এইচ হার্ডির নিকট হইতে রামানুজের গণিতশাস্ত্রে গভীর ব্যুৎপত্তিসূচক একখানি প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হয়েন। অধ্যাপক হার্ডি ইণ্ডিয়া আফিসের মিঃ ম্যালেটকে ধরিয়া বসেন এবং তাঁহাকে রামানুজের যাহাতে কেমব্রিজের পড়িবার সুবিধা হয়, তাহা করিয়া দিতে বলেন। মিঃ ম্যালেট ষ্টুডেণ্টস এডভাইসরী বোর্ডের সেক্রেটারী মিঃ আর্থার ডেভিসের নিকট চিঠি লেখেন। তিনি আবার সেই চিঠি পাইয়া মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে চিঠি পাঠান। এই সময় রয়াল সোসাইটির সদস্য ডাক্তার গিলবার্ট ওয়াকার ঘটনাচক্রে মান্দ্রাজে উপস্থিত হন—স্যর ফ্রান্সিস এই সুযোগে মিঃ নারায়ণ আয়ারকে দিয়া রামানুজের কতকগুলি কাগজপত্র ডাক্তার ওয়াকারের নিকট উপস্থিত করেন। তিনি ঐ কাগজপত্র অধ্যাপক হার্ডির নিকট

পাঠাইতে পরামর্শ দেন এবং বলেন তিনিই ওগুলির প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিবেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ বিশ্ব-বিদ্যালয় রামানুজকে ৭৫ টাকা স্কলারসিপ দান করেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ১৭ই মার্চ্চ অধ্যাপক রামানুজ 'নেভাসা' জাহাজে চড়িয়া লণ্ডনে যাত্রা করেন এবং মে মাসে কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে প্রবেশ করেন। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার কেম্ব্রিজে পড়ার জন্য ১০ হাজার টাকা বৃত্তি দান করেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ১৭ই জানুয়ারী মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় আর এক বৎসর বৃত্তি কাল বাড়াইয়া দেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর পোর্টট্রাষ্ট রামানুজকে আরো এক বৎসরের ছুটি দেন। পরে হঠাৎ একদিন খবর আসিয়া পৌছে যে, মিঃ রামানুজ রয়াল সোসাইটির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে খবর আসে যে, তিনি কেম্ব্রিজ ট্রিনিটি কলেজের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই সংবাদে স্তর ফ্রান্সিস্ স্প্রিং তাঁহার টুপি ও গাউন মিঃ রামানুজকে দিতে প্রস্তুত হন এবং ইহাতে তিনি আপনাকে অত্যন্ত সম্মানিত মনে করিয়াছিলেন।"

(হিন্দুস্থান)

ভারতের অবস্থা

গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য

ডাঃ গিলবার্ট স্লেটে সম্প্রতি The Making of Modern Europe নামে একখানা পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে ভারতবর্ষের প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে হিসাবের খসড়ায় (Statistical Abstract) এই বিশেষ কথাটি স্বীকৃত হইয়াছে যে ১৯০৮ সালে যে দশ বৎসর শেষ হইয়াছে সেই সময়টার ভিতর সেখানে গড়পড়তায় হাজার করা ৩৪ হইতে ৩৫ জনের হিসাবে লোক মারা পড়িয়াছে। অর্থাৎ জাপানের মত দেশের তুলনায় সেখানে প্রতি বৎসর ৪০ লক্ষ বেশী মারা গিয়াছে। এই ভীতিপ্রদ মৃত্যুর কারণ যে দেশের দারিদ্র্য এবং জনসাধারণের অজ্ঞতা তাহাতে সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্টের প্রথম কর্ত্তব্যই হইতেছে এই ভীষণ দুঃখদুর্দ্দশার হাত হইতে জন-সমাজকে রক্ষা করা এবং তাহা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে দেশের লোকদিগকে এমনভাবে শিক্ষিত করিয়া তোলাই আবশ্যক যে তাহারা আপনাদিগকে চারিদিকের বিপদের ভিতর দিয়া ঠিকভাবে পরিচালিত করিয়া লইয়া যাইতে পারে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহার এই অবশ্য কর্ত্তব্যটি সম্বন্ধে যে কত উদাসীন তাহা ১৯১৯—২০ খৃষ্টাব্দের গ্রাজুয়েটদের কতজন কোন বিভাগে প্রবেশ করিয়াছে তাহা হইতে একটি হিসাব লইলেই বেশ বোঝা যায়।

দেশের ভিতর হইতে দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য এবং অজ্ঞানতা যাহাতে বিদূরিত হইতে পারে সে দিকে গবর্ণমেণ্টের নজর দেওয়া যে অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ কথাও অত্যন্ত সত্য যে নিজের ভিতর বড় হইয়া উঠিবার জন্য একটা স্বাভাবিক চাড় না থাকিলে কেহ কখনই সত্যকার শক্তি লাভ করিতে পারে না। গবর্ণমেণ্ট দেশবাসীকে সাহায্য করিতে পারে মাত্র—তাহাকে পূর্ণতা প্রদান করিতে পারে না। আমরা যদি আমাদের নিজেদের পা গুটাইয়া বসিয়া থাকি এবং পা মেলিতে বলিলেই যদি আমাদের মাথায় বজ্রাঘাত হয় তবে কেবলমাত্র সরকারী চেষ্টায় আমাদিগের কোনই উপকার করিতে পারিবে না।

[ত্রিপুরা হিতৈষী]

বিলাতে পত্নী বিক্রয়

গত ২২শে ফেব্রুয়ারীর "ইউকলি ডিসপ্যাচ" নামক বিলাতী পত্র তত্রত্য স্ত্রী বিক্রয় প্রথা সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন।

যাহারা অপেক্ষাকৃত অসভ্য তাহারা ডাইভোর্স ইত্যাদির ধার না ধারিয়া নিজেরাই একটা বন্দোবস্ত করিয়া লয়। ইংলণ্ডে এখনও পত্নী বিক্রয় হইয়া থাকে। যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে পারে তাহার নিকট, অথবা স্বামী স্ত্রীর সম্মতিক্রমে একটা বিশেষ বন্দোবস্ত সাধারণতঃ স্ত্রী বিক্রয় চলিয়া থাকে। ৫০ পাউণ্ডে স্ত্রী বিক্রয় করিয়া স্বামীও অর্থ পাইয়া সন্তুষ্ট হইল এবং স্ত্রী ও সুখে স্বচ্ছন্দে নূতন ঘরকন্না আরম্ভ করিল, এইরূপ প্রায়ই চলিয়া থাকে।

সংপ্রতি আদালতে একটী মোকদ্দমায় প্রকাশ পাইয়াছে যে স্বামী স্ত্রী দুইজনে লিখিত সম্মতি পত্রের দ্বারা সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছে। ঐ মোকদ্দমায় কৌন্সিলি বলিয়াছেন যে দক্ষিণ ওয়েলসের একটি জেলার কন্ট্রাক্টের দ্বারা স্ত্রীবিক্রয় চলিয়া থাকে। ঐরূপ-একজন ব্যারিষ্টার "উইকলি ডিস্প্যাচের" একজন প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন যে "কথাটা সম্পূর্ণ সত্য। সাধারণতঃ খনিপ্রধান ও পল্লীবহুল জেলাগুলিতে ঐরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে।" একজনে ২০।৫০ বা ১০০ পাউণ্ড দিয়া অপরের স্ত্রী ক্রয় করিয়া তাহার সঙ্গে সুখে সংসার করিয়া থাকে। সাধারণতঃ স্ত্রীলোকটী ক্রেতার প্রতি পূর্ব্ব হইতেই অনুরাগ প্রদর্শন করে এবং ডাইভোর্সের পরিবর্ত্তে আপোসেই বন্দোবস্ত চলিয়া থাকে। স্বামীদিগের ভবিষ্যতে কিপ্রকার স্বত্ব থাকিবে সাধারণে তাহা জানিতে চাহে, আমি এই সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়াছি। যাহারা এইরূপ ভাবে স্ত্রীবিক্রয় করিয়া থাকে তাহারা পত্নীকে সাধারণতঃ কুকুর বিড়াল বা গৃহসজ্জার কোনও দ্রব্যের অপেক্ষা গুরুতর বলিয়া মনে করে না, সুতরাং যখন তাহাদের উহাকে ভাল লাগে না তখন আর যাহার ভাল লাগে তাহার নিকট অনায়াসে বিক্রয় করিয়া ফেলে। ইহা যে সাধারণ ভাবে চলিত আছে তাহা আমি বলিতেছি না, তবে এরূপ ব্যাপার আমি জানিতে পারিয়াছি।" ডারহামের আর একটী উকীল ঐরূপ একটী ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে "একটি কয়লার খনির কর্ম্মচারীর স্ত্রীর সহিত আদৌ বনিবনাও না হওয়ায় একজন অবিবাহিত যুবকের নিকট স্ত্রীকে লইয়া যাইয়া বলিল যে তুমি আমার পত্নীকে গ্রহণ কর। আমার আর তাহাদ্বারা কোনও প্রয়োজন নাই। তদ্ব্যতীত তোমাকে পাঁচ পাউণ্ড নগদ দিয়া দিতেছি। এইরূপ অনেক ঘটনার কথা আমার জানা আছে। ২০ বৎসর পূর্ব্বে দেশের এই ভাগে ঐপ্রথা প্রচলিত ছিল। ইহাদের ডাইভোর্স আদালতের ব্যয় সঙ্কুলন করিবার অর্থ না থাকায় ইহারা নিজেরাই ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

প্রায় একশতাব্দী পূর্ব্বে এই দেশের নানা স্থানে প্রকাশ্য নীলামে স্ত্রীবিক্রয় হইত। নিড্ ল্যাণ্ডের এক জন কৃষক কুড়ি শিলিং ও একটী নিউফোণ্ডল্যাণ্ড কুকুরের পরিবর্ত্তে তাহার স্ত্রীকে বিক্রয় করিয়াছিল পণ্টিফ্রাক্ট একটি নীলামে ১১ শিলিং মূল্যে একটী স্ত্রী বিক্রীতা হইয়াছিল। ১৮ বৎসর পূর্ব্বে এক শিলিং মূল্যে বেড্ফোর্ডে একটী স্ত্রীলোক বিক্রীত হইয়াছিল। ইউগানে ১ পাউণ্ড মূল্যে একটী স্ত্রীলোক বিক্রীত হইয়াছিল। অধুনা নীলামে বিক্রয় না হইয়া আড্ডাঘরেই ক্রয় চলিয়া থাকে। এখন মূল্যও বাড়িয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ ২৫ পাউণ্ড হইতে ১০০ পাউণ্ড পর্য্য দর এখন হইয়া থাকে

ভাড়া দেওয়া

কার্ডিফোর একজন অধিবাসী বলিয়াছেন যে তিনি একটি বিধবাকে ভাড়া দেওয়ার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হন। বিধবাটি তাঁহাকে বলে যে সে গ্রামে ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে ঐরূপ প্রথা প্রচলিত।

[ত্রিপুরা হিতৈষী]

কলিকাতা
"পোষাক"
সকল রকম
তৈয়ারী ও
অর্ডারী
পোষাক
ও
থান
"কাপড়"
বেনারসী, পার্শী
ও সকল রকম
ধুতী
ও
শাড়ী
মফঃস্বলের
জন্য বিশেষ
বন্দোবস্ত
আছে

৭ম বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ—১৩২৭ | ২য় সংখ্যা

অশ্রুময়

(উপন্যাস)

[৩]

ষ্টেশন ত্যাগ করার পর প্রায় আধ ঘণ্টার পথ অতিক্রম করিয়া সতীশ সেই ক্ষুদ্র পাকা বাড়ীটার ফটকের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল এবং একবার এদিকে ওদিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

ঘাটলার উপর যে তরুণীটাকে দেখা গিয়াছিল, সেও একটু পূর্ব্বেই ভিতরে আসিয়া ডাকিল, "তোমার ছেলে নাও, দিদি! এ দুষ্টু ছেলের সঙ্গে পারে এমন মানুষ ভূভারতে জন্মেনি! চেনে কেবল ওর বাবাকে আর মাকে। আসুক্ ওর বাবা, ওর বিদ্যের কথা সব খুলে বল্‌ব!"

ঘরের দিক্ হইতে কেহ বাহির হইয়া আসিতে আসিতে কহিল, "তুই আমার ছেলের নিন্দা করিস্;—তবু ও তোকে যেমনটা ভালবাসে তেমন তো আর কাউকেই ভালবাসে না যে,—"

—"নিন্দে কর্‌ব না? একেবারে দস্যি ছেলে; স্থির হয়ে দাঁড়াতে দেয়, না কোনো কাজ কর্‌তে দেয়! ওকে মুখ তুলে দাও, পাখী দেখাও, জলের কাছে নিয়ে যাও! কে বাপু পারে, তাই বল!"—

—"সে আবার কি এমন দোষ হ'ল? তুই-ই তো ওকে অমনটা করে তুলেছিস্! কোথায় এত কোল পেত ও? ওকে নিয়ে তো বাসায় সব কাজ আমি মিটিয়েছি; কেমন দিব্যি একটা কিছু নিয়ে বসে রয়েছে। একটু নড়েনি, কিচ্ছু না! আর এখানে আসা অবধি তুই ওর যত বায়না মিটিয়ে মিটিয়ে ওকে দুরন্ত, দুষ্টু করে তুলেছিস্! কত বলিনি, যে ওকে অমন করে রাতদিন কোলে কোলে নিয়ে ফিরিস্‌নে, ওর যত আব্‌দার মেটাবার জন্যে প্রাণপণ করিস্‌নে; তা' কি তুই শুনিস্? এখন বলিস্ দস্যি ছেলে, ওর সঙ্গে পারা যায় না!"—

"ওমা, দিদির যে কথা! এতটুকু ছেলেকে কোলে কোলে রাখ্‌ব না ত কি কর্‌ব? আর ও এমনই বা কি করে"—

"তা' হলে ওকে দস্যি ছেলে বল্‌ছিলি কেনরে?—করে তুলেছিস্ দস্যি, এখন আবার দোষ চাপাতে চাচ্ছিস্! ওর জ্বালায় তিষ্ঠতে পারিস্‌নে তা' কি আমি জানিনে যে? তা' এবার যখন আমি বাসায় ফিরে যাব তখন ভাই, ছেলে নিয়ে আমার সঙ্গে তোর যেতে হবে!—নইলে ওকে কে রাখ্‌বে রে বাপু?"—

ছেলে বুকের কাছে দুই হাতে বেড় করিয়া চাপিয়া ধরিয়া সরযূ কহিল,—"আচ্ছা, আচ্ছা, তা, আমি বুঝ্‌লুম তুই আর ওকে 'দস্যি, দস্যি,' করিস্‌নে বাছা!"—

সরযূ একহাতে ছেলের মুখ তুলিয়া ধরিয়া তাহার ললাটে ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়াই, অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল

তখন তাহার চোখের কোণে বোধ হয় অশ্রুর একটা অস্পষ্ট আভাস জাগিয়া উঠিতেছিল।

ঘরের দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া কেহ কহিল, "ঠাকুরঝি তোরা হলি কি? খুব তো ছেলে নিয়ে দু'বোনে ঝগড়া কচ্চিস্, একবার পিছন ফিরে চেয়ে দেখ্তো! ওরে ঝগড়া করতে সুরু করলে তো তোদের দু'বোনের জ্ঞান থাকে না"—

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সতীশ দুয়ারের কাছ হইতে বলিয়া উঠিল, "আহা—হা! বৌদি, এমন মাটীই করে দিলে!"—

সতীশের গলার শব্দে দুই বোনই ফিরিয়া চাহিল।

উৎপল স্মিতমুখে মাথার কাপড়টা একটু ঠিক্ করিয়া দিয়া কহিল, "এ ভারি অন্যায়, চুরি করে ভদ্রমহিলাদের কথা শোনা!"—

বৌদিদিটীর মুখখানা শাণিত ছুরিকার উপর চকিত রৌদ্রপাতের মতই একবার ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল; তার পর সে ধীরে ধীরে কহিল,—"অতএব চোর!"—

উৎপল দাঁতে একবার তাহার রক্তপুষ্পদলতুল্য অধরপুট চাপিয়া ধরিল, তারপর একবার অপাঙ্গ দৃষ্টিতে সতীশের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল,—"চোর যদি, শাস্তি দেওয়া দরকার!"— তারপরই চক্ষু টিপিয়া প্রতিমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "ধর্‌বি না কি বৌদি? ধর্‌না!"—

"তুইই ধর্, ঠাকুরঝি, আমি শিকল নিয়ে আস্‌চি; শক্ত করে ধরিস্, দেখিস্, যেন পালায় না!"—হাস্যরঞ্জিত মুখে প্রতিমা ঘরের দিকে এক পা অগ্রসর হইয়া গেল এমন সময়ে সরযূর কোল হইতে সতীশের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দুই হাত বাড়াইয়া দিয়া ছেলে ডাকিল, "বা—বা"—

সরযু হাসিয়া কহিল, "হয়েছে, আর কাউকে ধর্‌তে হবে না, এ চোর ছেলেই ধর্‌বে! শিকল আর আন্‌তে হবে না, বৌদি!"—

প্রতিমা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "ঐ অতটুকু ছেলে, ধরে রাখ্‌তে পারবে কেন? ঠাকুরঝি, তুইও ধর্‌না, ভাই!"

"যা', তোর কাজে যা', রাক্ষুসি!"

"কেন, চোরের কাছে ঘুষ্ খেয়ে চোর ছেড়ে দিবি "তা' ঘুষ্ খাই তো, তুই বখ্‌রা নিস্!"

প্রতিমা চক্ষু ঘুরাইয়া কহিল, "আমি তো ঘুষ খাইনে বাপু, যে বখ্‌রা নেব! আমি যে কত সাচ্চা মানুষ তা' তো তুই জানিস্ নে"—কথাটা বলিয়াই প্রতিমার মুখখানা হঠাৎ ম্লান হইয়া গেল, এবং সেই ম্লানিমা, ভাসমান মেঘ-খণ্ডের মতই, সকলেরই হাস্যরঞ্জিত মুখের উপর মুহূর্ত্তের জন্য একটা ছায়াপাত করিয়া গেল।

কিন্তু প্রতিমা আর সেখানে দাঁড়াইল না। যাইবার পূর্ব্বে মুখের উপর হাসি টানিয়া আনিয়া কহিল, "তা তোর যত ইচ্ছে ঘুষ খা'। কিন্তু বুদ্ধিমান দারোগার মত ঘুষও খাবি, চোরও ছাড়্‌বিনে;—বুঝ্‌লি? তুই যে খুব বাহাদুর ওতে সেইটেই প্রমাণ হয়ে যাবে!"—

প্রতিমা চলিয়া গেল।

কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে জোর করিয়া অতগুলি বকিয়াও তাহার মনের অস্বস্তির ভাবটা দূর করিতে পারিল না!

ইতিমধ্যে ছেলে পিতার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সরযূকেও ছুটি দিয়াছিল এবং দুই হাতে সতীশের গলা জড়াইয়া ধরিয়া মুখের অত্যন্ত কাছে কোমল ক্ষুদ্র মুখখানি নিয়া আবার ডাকিল,—"বা—বা!"—

ছেলের ও স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া উৎপল মৃদুস্বরে কহিল,"—খুব শক্ত করে ধরিস্ রে খোকন্!—চোর না পালায়;—তোর মামীমা তা হ'লে অনর্থ ঘটাবে কিন্তু"—

"আর কেউ অনর্থ ঘটাবে না ত?"—

পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া সতীশ ছেলের দুই গণ্ডে চুম্বন করিল। দুই ছেলে মার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া মুখ তুলিয়া হাসিয়া অস্ফুটস্বরে কহিল, "বা—বা,—মা—"

এই এক বৎসরের শ্রীমান্ শিশুটি শব্দজগৎ হইতে শুধু ঐ দুইটী ক্ষুদ্র কথাই চয়ন করিয়া লইয়াছিল এবং সব্যসাচীর মতই, সময়ে অসময়ে, উহাই প্রয়োগ করিয়া বসিত।

স্বামী স্ত্রী উভয়ের মুখই হাস্যরঞ্জিত হইয়া উঠিল।

উৎপল মৃদুস্বরে কহিল, "ঘরে চল, এ অবোধ দস্যিকে নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকাটা ঠিক্ হচ্ছে না! ও বুঝ্‌বে না ত কিছু, শুধু লজ্জাটাকেই বাড়িয়ে তুল্‌বে!"

এমন সময়ে প্রতিমা ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "না! শিকল খুঁজে পেলাম না ত! চলুন্ ম'শায়, হাইকোর্টের শমন বেরিয়েছে!"—

—"মা ডাকছেন বুঝি ?"—সম্ভ্রমপূর্ণ স্বরে এই কথা বলিয়াই ছেলে প্রতিমার কোলে দিয়া সতীশ দ্রুতপদে উৎপলের নির্দ্দিষ্ট ঘরটীর দিকে চলিয়া গেল, এবং গায়ের অতিরিক্ত কাপড় জামাগুলি উৎপলের হাতে খুলিয়া দিতে দিতে কহিল,—"মাকে প্রণাম করে আসি, এই ঘরেই থেকো, কথা আছে।"—

উৎপল জামা কাপড় আলনার উপর রাখিতে রাখিতে কহিল, "দেখো, যেন পালিয়ে যেওনা,"—

দুইটী অঙ্গুলি দিয়া উৎপলের রক্তাধরপুট একটু টিপিয়া ধরিয়া, একটু নাড়িয়া দিয়া সতীশ পত্নীর মুখের দিকে গভীর দৃষ্টিতে একবার চাহিল, তারপর মৃদু হাসিয়া দ্রুতপদে ক্ষমাসুন্দরীর আহ্নিকের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

[৪]

ঘরের কাছে আসিয়া বাহিরে জুতা রাখিয়া সতীশ মুখ বাড়াইয়া ঘরের ভিতরটা একবার দেখিয়া লইল। ক্ষমাসুন্দরী আহ্নিকের যায়গাটিতেই বসিয়া মালা ফিরাইতেছিলেন। সতীশ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। বসিতে ইঙ্গিত করিয়া ক্ষমাসুন্দরী আরও কিছুকাল মালা ফিরাইলেন,—তারপর মালাগাছটা একবার কপালে ঠেকাইয়া কহিলেন, "বস বাবা, হাত মুখ ধুয়ে এসেছ ত ? ধোও নি বুঝি ? যাও, হাত মুখ ধুয়ে এখনি এস।"

সতীশ উঠিয়া গেল।

ক্ষমাসুন্দরী ডাকিলেন, "বৌ,—ও বৌ !"—

প্রতিমা ঘরের দুয়ারের কাছে আসিয়া কহিল, "আমায় ডাকলে, মা ?"—

"হাঁ মা, সতুর জন্যে কিছু খাবার গুছিয়ে নিয়ে এস ত মা। এই ঘরেই ঠাঁই করে দাও, এখানে আমার সামনে বসেই খাবে।"—

প্রতিমা কহিল, "খাবার আমি অনেকক্ষণ গুছিয়ে ঠিক করে রেখেছি তো' মা। জল নিয়ে এসে এখনি ঠাঁই করে দেব কি ?"—

"আ আমার লক্ষ্মী, এরি মাঝে খাবার গুছিয়ে ঠিক করেচ! আচ্ছা, জল এক গেলাস নিয়ে এস, আসন তো এখানেই আছে। আর দেখ মা, সতু পাথরের পাত্রে খেতে ভাল বাসে, জলটা শ্বেত পাথরের গেলাসে করেই এনো।"

প্রতিমা একটু হাসিয়া কহিল, "খাবারও তো শ্বেত-পাথরের রেকাবীতে গুছিয়ে রেখেছি, মা।"

"সব দিকেই তোমার দৃষ্টি রয়েছে, তা' তো আমি খুবই জানি, মা! তবু যে বলি—কি জান, ওটা বুড়ো মানুষ—অভ্যাস ছাড়াতে পারিনে বলেই, মা লক্ষ্মী!"

"সে কি মা, কতটুকুই বা আমি জানি ?—তুমি না শিখালে কোথায় শিখ্‌ব মা!"—প্রতিমা বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে ক্ষমাসুন্দরী পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল।—

"সুখী হও মা! আমি না হয় কত পাপই করেচি, কিন্তু স্বর্গীয় কর্ত্তাদের পুণ্যের জোর তো আর একটুও কম নয়। সেই জোরেই আজ ঠাকুরের পায়ের কাছে জানাচ্ছি যে, তিনি তোমার গায়ে দুঃখকষ্টের আঁচড়টিও যেন না লাগ্‌তে দেন।"

শাশুড়ীর কথা শুনিয়া প্রতিমা মনে মনে কহিল, "এমন মিষ্টি করেও কথা তুমি বল্‌তে পার, মা! তবু তোমার অদৃষ্টে এত দুঃখ বিধাতা পুরুষটি কেন লিখেছিলেন, তাই ভাবি।"

প্রতিমা চলিয়া যাইতেছে না দেখিয়া, ক্ষমাসুন্দরী কহিলেন, "কি মা ?"

কি বলিতে যাইয়া বধূ চুপ করিয়া গেল।

তাহার চোখের পাতা দুইটি যেন নিতান্ত অকারণেই ভিজিয়া উঠিতেছে বুঝিয়া সে দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ক্ষমাসুন্দরী বধূর মুখের ম্লান ভাবটি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া নিজের মনে মনেই বলিলেন, "আদর ক'রে মিষ্টি কথা বল্লেও তোমার চোখে জল আসে মা! এ জল, কই, আমি অভাগিনী তো রোধ কর্‌তেই পার্‌লাম না! এ জীবনে যে পারব সে ভরসাও তো আর দেখি না।"

জল ও খাবারের রেকাবী হাতে প্রতিমাকে ঘরের বাহিরে দেখিতেই ক্ষমাসুন্দরী তাড়াতাড়ি আঁচলে দুই চক্ষু মুছিয়া লইলেন। কিন্তু যাহার দৃষ্টি এড়াইবার জন্য এতটা তাড়াতাড়ি করিলেন, সে সবটাই দেখিয়া ফেলিল।

খাবারের রেকাবী ও জলের গেলাসটা যথাস্থানে রাখিয়া মৃদুস্বরে প্রতিমা কহিল, "মা,"—

এই আহ্বানটির জন্ত বোধ হয় প্রস্তুত ছিলেন মা, তাই একটু চমকিয়া উঠিয়া কমাসুন্দরী কহিলেন, "কি, মা?—

"একটা কথা বলব মা!—ঘরের বৌয়ের খাশুড়ীকে যে কতখানি লজ্জা কর্‌তে হয়, তা আমায় তুমি তো শেখাওনি মা! শুধু মেয়ের মত করেই নিজের হাতে গড়ে তুলেচ। আমিও তোমার পায়ের কাছে মেয়ের মতই এসে দাঁড়াই;—তোমার পেটে যে হইনি, সে কথাও তো আর আমি ভাব্‌তে পারিনে!—কিন্তু মা, সেই আমিই যদি সময়ে অসময়ে তোমার চোখের জলের কারণ হয়ে পড়ি, তা' হ'লে সে দুঃখ রাখ্‌বার তো আমার আর যায়গা থাকে না!"

কমাসুন্দরী মুহূর্ত্তের জন্ত তাঁহার দুই চোখের স্নেহপরিপ্লুত দৃষ্টি প্রতিমার মুখের উপর তুলিয়া ধরিলেন, তার পরই দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া হাতের মালাগাছটির উপর অত্যন্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়া হাসিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া কহিলেন, "তুই বলিস্ কিরে পাগলের মেয়ে, কখন আবার আমার চোখে জল দেখ্‌লি!"—

কিন্তু গলার স্বরটা যে একেবারেই বুজিয়া আসিতেছিল এবং দুই চক্ষুর সম্মুখ যে একেবারেই ঝাঁপ্‌সা, অস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল, তাহা কোনও মতে নিজের কাছেও অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না।

তাই অনন্যোপায় হইয়া দ্রুতহস্তে কেবল মালাই ফিরাইয়া যাইতে লাগিলেন। কিন্তু তখন ইষ্ট দেবতার নামটি মনে পড়াও দূরে থাকুক, সতীশ যে এখনই আসিয়া পড়িবে, এমন কি সে কথাটাও ভুলিয়া গেলেন।

প্রতিমা কহিল,—"তার চেয়ে আমি একটু দূরে দূরেই থাকব, মা! একেবারে সব সময়ে তোমার কাছটিতে নাই বা আস্‌লাম। কাছে এসে তোমার চোখের জলই যদি আমায় দেখ্‌তে হয়, মা, তা' হ'লে—"

কমাসুন্দরী তাঁহার অশ্রু-পরিপ্লুত মুখ তুলিয়া বধূর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—

"তুমি দূরে থাক্‌লেই বুঝি আমার চোখের জল বন্ধ হয়ে যাবে মা? আর এ পোড়াচোখের জল আমি কি ইচ্ছে করেই আনি? যিনি এ জল দিয়েচেন, তিনি যদি না ফিরিয়ে নেন, মোছ করে না নেন, কেমন করে যাবে, মা?"

দূরে পায়ের শব্দ শুনা গেল।

কমাসুন্দরী আঁচল তুলিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে কহিলেন,—"সতীশ আস্‌চে বুঝি!"—

"আমি পান নিয়ে আস্‌চি, মা"—বলিয়াই প্রতিমা দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল!

বারান্দার উপর আসিয়াই অন্ধকারের দিকে সরিয়া গিয়া একটু দাঁড়াইল। অশ্রুসিক্ত দুই চোখের দৃষ্টি সান্ধ্য-আকাশের দিকে স্থাপন করিয়া মনে মনে কহিল,—"হে ঠাকুর, আজ তুমি আমাকে এতখানি অসহিষ্ণু করে তুল্‌লে কেন? যার চোখের জল মোছাবার কেউ নেই, তাকে যে এ জল নিজ থেকে শুকিয়ে নিতেই হবে! চোখ্ দুটোকে শুষ্ক রাখ্‌তে পারি, আজ ঠাকুর, অন্ততঃ সেই শক্তিটুকুই আমাকে দাও!"—তার পর মুহূর্ত্তেই সেখান হইতে চলিয়া গেল!

সতীশ আসিতেই কমাসুন্দরী কহিলেন,—"একটু কিছু মুখে দিয়ে নাও বাবা, তারপর কটা কথা বলব। সেই জন্তই তোমাকে এত তাড়াতাড়ি আস্‌তে লিখ্‌তে বলেছিলাম।"

সতীশ কিছু খাবার মুখে তুলিয়া দিতে দিতে কহিল,—"আপনার শরীর এমন খারাপ হয়ে পড়েচে মা, আমি এতটা তো মনে করিনি!"—

"কি হবে, বাবা, শরীর দিয়ে? তোমাদের কটিকে রেখে এখন চলে যেতে পার্‌লেই যে রক্ষা পাই! মেয়ে-মানুষের দীর্ঘজীবন পাওয়াটা কিছু নয়!"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া একেবারেই বলিয়া উঠিলেন, "ও তো রেঙ্গুন যাবেই। বিছানাপত্র সব বাঁধা হ'য়ে গেছে, কাল সকালেই যাবে। বাড়ীতে কারু কথাই তো গ্রাহ্য কর্‌বে না, আর কে ই বা সাহস করে ওকে কি বল্‌বে? তুমি যদি বলে করে কিছু কর্‌তে পার, দেখ!"—

এক নিশ্বাসে সবটুকু নিঃশেষ করিয়া বলিয়া ফেলিয়া যেন খুব মস্ত একটা বোঝা নামাইয়া ফেলিয়াছেন এমনি ভাবে বসিয়া রহিলেন, কিন্তু হাতের মধ্যে মালাগাছটী যে অত্যন্ত দ্রুত ফিরাইতেছেন, তাহা নিজের কাছেও অজানিত রহিয়া গেল।

কমাসুন্দরী যে কাহার সম্বন্ধে কথাগুলি বলিলেন তাহা বুঝিতে সতীশের তো বেশী সময় লাগিলই না, কিন্তু মনে

সঙ্গে সে এটুকু বুঝিয়াও শিহরিয়া উঠিল, যে, কত বড় দুঃখে এই অত্যন্ত স্নেহশালিনী জননী একমাত্র পুত্রের নামটি পর্য্যন্ত গ্রহণ করিলেন না।

একটু হাসিয়া কথাটা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া সতীশ কহিল,—"শৈলেশ বুঝি এই সব পাগলামো করচে?"—কিন্তু সে মনে মনে বেশ জানিত, যে, ঐ এক রোখা শৈলেশ তাহার বাল্যকাল হইতে এ পর্য্যন্ত যাহা ধরিয়াছে তাহা করিয়াই ছাড়িয়াছে, কাহারও নিষেধ গ্রাহ্য করিবার মত পাত্র সে মোটেই নহে।

সুতরাং কাল সকালে সূর্য্যদেবের পূর্ব্বে দিকে ওঠাও যেমন খুবই ঠিক, তেমনি শৈলেশের রেঙ্গুনযাত্রাও অত্যন্ত সুনিশ্চিত।

তবু সতীশ কহিল,—"নাঃ, কোথায় যাবে। আমি যখন এসেই পড়েছি, তখন ওর যাওয়া ততটা সহজ হবে না, মা। আপনি ভাব্‌বেন না, আমি ওকে বুঝিয়ে ঠিক করব।"

ক্ষমাসুন্দরী কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, "পার ভালই, কিন্তু পারবে মনে হয় না। ছেলে বেলায় একদিন, তুমি যেখানে বসে আছ, ঠিক ঐখানটাতেই বসে, ছুরি নিয়ে কাটাকুটী কর্‌ছিল। বল্লাম, 'ছুরি দে, হাত কেটে ফেল্‌বি।' "ছুরি দেব না" একবারটি বলেছিল, কোনও মতেই কি ওর কাছ থেকে ছুরি কেড়ে নিতে পারলাম। হাতটা কেটে ফেল্‌ল, রক্তে ভেসে যাচ্ছিল, তবু লাঠিটা কাট্‌তেই থাক্‌ল! আবার আঙুল কাট্‌ল; এমনি তিনবার করে হাত কেটে রক্তারক্তি হ'ল, তবু যতক্ষণ লাঠি তৈরী না হয়ে গেল, ততক্ষণ লাঠিও ছাড়্‌লনা, ছুরিও রাখ্‌লনা। এতখানি বয়স ওর ঠিক্ এমনি করেই কাট্‌চে। কে জানে, বাবা, এর শেষ ফল কি দাঁড়াবে?"

দুয়ারের কাছ পর্য্যন্ত পানের ডিবা লইয়া প্রতিমা আসিয়াছিল। দূর হইতেই শ্বশ্রূর চোখে জল দেখিয়া ফিরিয়া গেল, এবং দূরে বারান্দায় এক কোণের অন্ধকারের মধ্যে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহার একবার ইচ্ছা হইয়াছিল যে কবাটের কাছটিতে দাঁড়াইয়া কথাগুলি শুনিয়া লয়, কিন্তু সে নিঃসন্দেহই বুঝিয়াছিল যে, সেখানে স্বামীর সম্বন্ধে আলোচনাই চলিতেছে। সুতরাং সে দূরে, যেখানে থাকিয়া কথাগুলি শুনিবার কোনও সম্ভাবনাই নাই, সেইখানটাতে যাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আজ যে বাড়ীর প্রত্যেকেরই বুকের মধ্যে তাহারই স্বামীর দেওয়া একটা তীব্র আঘাতের বেদনা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে, সকলেই যে তাহার মুখের দিকে সকরুণ দৃষ্টিতে সহস্রবার চাহিতেছে, একথাটা সে কোনও মতেই ভুলিতে পারিতেছিল না।

সে যে তাহার স্বামীর উপেক্ষিতা, এ সত্যটা তাহার নিজের কাছে একটা নূতন খবর না হইলেও, আজ যে সেই উপেক্ষা জিনিষটাকে চারিদিক হইতে জানাইয়া দিবার জন্য একটা বিপুল আয়োজন তাহার স্বামীর হাত দিয়াই বিশেষ করিয়া হইয়া গেল, একথাটা তাহাকে ক্রমাগতই অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে পীড়ন করিতেছিল।

এটা যে একটা মস্ত সত্য কথা, এবং একে মিথ্যা করিয়া দেওয়ার কোনও সম্ভাবনাই যে একেবারেই নাই, সব চেয়ে এই চিন্তাটাই বিশেষ করিয়া বুকের মধ্যে সহস্র ফণা তুলিয়া তাহাকে নির্ম্মমভাবে দংশন করিতেছিল।

বাহিরে আকাশে ভরিয়া নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিয়া স্থির লক্ষ্যে এই পৃথিবীর মেয়েটীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।

উহারও বুকের ভিতরে যে কত দুঃখের কথা, বেদনার কাহিনী নিবিড় হইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে! বেদনার রক্তরাগে তাহারাও যে ঠিক্ অমনি জল্ জল্ করিতেছে!

পায়ের শব্দ শুনিয়া প্রতিমা বুঝিল, সতীশ বাহির হইয়া আসিতেছে।

সে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া গিয়া কহিল, "এই যে পান নিয়ে এসেচি। অবিশ্যি ঠাকুরঝির ঘরেও বিস্তর রয়েচে, তবু এর দুটোও নিয়ে যান।"—

প্রতিমার প্রসারিত হাতের উপরকার খোলা ডিবাটার ভিতর হইতে দুটা পান তুলিয়া লইয়া মুখের মধ্যে পুরিয়া দিতে দিতে সতীশ প্রায় রুদ্ধস্বরে কহিল, "ধন্যবাদ আপনাকে।"—

কিন্তু তারপরই যে কি কহিবে বুঝিতে না পারিয়া যখন একটু ইতস্ততঃ করিতেছিল, ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তটিতেই জুতার শব্দ শুনা গেল।

সতীশ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, শৈলেশ আসিতেছে!

সে শৈলেশের দিকে একটু অগ্রসর হইয়া বাহিতেই শৈলেশ কহিল, "যাঃ, তুমি যে ঠিক্ সময়টিতেই হাজির আছ!—চিঠি লিখে আনা হয়েছে বুঝি তোমাকে?—এঃ!"

সতীশ অত্যন্ত গম্ভীর মুখে কহিল, "তোমাকে আমার কয়েকটা কথা বল্‌বার আছে!"—

—"তা' বেশ, আমিও কিছু বল্‌ব!"

প্রতিমা তখন জলখাবারের থালা গেলাসগুলি তুলিয়া লইয়া আসিয়া দুয়ারের কাছে বাহিরে যাইবার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল।

শৈলেশের কথা শুনিয়া সে তাহার ওষ্ঠ দংশন করিতে লাগিল। একবার মুহূর্ত্তের জন্য তাহার চক্ষু দুইটা জলিয়া উঠিল। তারপরই চোখের জলে সে আর পথ দেখিতে পাইল না। হাত বাড়াইয়া দুয়ারের কাঠটা চাপিয়া ধরিয়া সে একটু স্থির হইয়া দাঁড়াইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল।

শৈলেশ ও সতীশ ততক্ষণ বাহিরের বসিবার ঘরের দিকে চলিয়া গিয়াছে। [ক্রমশঃ]

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।

হিন্দুর সমাজশরীর

[A comparative Study of Hindu Society as a Social Organism.]

(৩)

নিরপেক্ষ ব্যষ্টিপ্রাধান্য ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সাধারণের মঙ্গল

(Individualism and general well-being from Political point of view.)

নিরপেক্ষ বা স্বাধীন বিচারবুদ্ধিতে আপনার মঙ্গলের পথ নির্দ্ধারণে ও সেই পথে স্বাধীন ভাবে আপনার মঙ্গল সাধন চেষ্টায় ব্যষ্টি মানবের সম্পূর্ণ অধিকার আছে, এই মত যাঁহারা প্রচার করিয়াছেন, ইয়োরোপে সাধারণতঃ তাঁহারা Rationalistic school নামে পরিচিত।

Human Reason বা মানবের নিরপেক্ষ বিবেক-বুদ্ধির নির্দ্দেশকেই তাঁহারা তাহার আচরণের একমাত্র বা প্রধান guide বা নিয়ন্তৃ বলিয়া মানেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত ইঁহাদের প্রচারিত নীতিই ইয়োরোপীয় সমাজে প্রভুত্ব করিয়াছে এবং ইয়োরোপীয় সমাজকে যেন এক নূতন আকার দিয়া নূতন পথে পরিচালিত করিয়াছে। এই পথে ইয়োরোপীয় সভ্যতা যে দিকে পরিচালিত হইতেছে; তাহাই Progress বা মানবসভ্যতার ক্রমোন্নতি বলিয়া ইয়োরোপীয় সুধীবর্গ অনেকেই মনে করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে আর এক মতের উদ্ভব হইয়াছে। এই মতবাদী পণ্ডিতগণ Scientific school নামে পরিচিত। Rationalistic school সমাজের প্রকৃতি ও ধর্ম্ম, এবং ব্যষ্টি মানবের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ কি, এই সব বিষয়ে যে সব কথা বলিয়াছেন, ইঁহারা সেই সব কথা মূলতঃ অপ্রামাণিক বলিয়া মনে করেন। ইঁহারা মানবসমাজের প্রকৃত অবস্থা কি তাহা পরীক্ষা করিয়া, সাধারণ জীবতত্ত্বের কতকগুলি সনাতন নীতির সহিত মানবের জীবননীতির সমতা দেখাইয়া, এমন কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, যাহা Rationalistic schoolএর মতের সঙ্গে মিলে না। নূতন Scientific schoolএর সিদ্ধান্ত সমূহ Inductive যুক্তিপ্রণালীর উপরে প্রতিষ্ঠিত। Science বা বিজ্ঞানের যুক্তি প্রণালীই হইল ইহা। Rationalistic schoolএর যুক্তি প্রণালী ছিল, Deductive অর্থাৎ কতকগুলি কথা সহজ সত্য বলিয়া ধরিয়া নিয়া তাহা হইতে তাঁহারা মানব জীবনের ধর্ম্ম কি, অধিকার কি, এই সব সম্বন্ধে একটা মত প্রচার করিয়াছেন। ইয়োরোপীয় সমাজের কতকগুলি অস্বাভাবিক বৈষম্যে ও অত্যাচার-শাসনে দরিদ্র ও দুর্ব্বল জনসাধারণ যারপরনাই পীড়িত হইত। সেই পীড়নের ফলে তাহারা প্রচলিত সমাজ-পদ্ধতি ও ধর্ম্মপদ্ধতির বিরুদ্ধে অতি প্রচণ্ডভাবে বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং তাহা হইতেই এই Rationalistic schoolএর উদ্ভব হয়। কেন, কি অবস্থা হইতে এই বিদ্রোহ হয়,

তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পূর্ব্ব প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। সামাজিক পীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যে মতের মূল, ধীর শান্ত ভাবে মানবজীবনের অবস্থার পরীক্ষা নয়, তাহাতে লোকপীড়ক প্রচলিত সমাজপদ্ধতির একেবারে বিপরীত নীতিই যে সত্য বলিয়া গৃহীত হইবে এবং সকল সিদ্ধান্তে সেই সব গৃহীত সত্য হইতে deductive যুক্তি প্রণালীতেই যে সকলে উপনীত হইবেন, ইহাই স্বাভাবিক।

প্রচলিত সমাজপদ্ধতিতে যারপরনাই অন্যায় বৈষম্য বর্ত্তমান ছিল, বহু অন্যায় বিধির বড় কঠোর শাসন ছিল, তাই তার বিপরীত ব্যষ্টি মানবের সাম্য ও স্বাধীনতাই তাঁহারা তাহার সর্ব্বোচ্চ অধিকার বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই অধিকারের অনুকূল যে সব নীতি তাহাই উৎকৃষ্ট নীতি বলিয়া গৃহীত হইল।

Scientific school, ব্যষ্টি মানবের এই অধিকার না মানিলেও ইহার সংস্কার হইতে যে তাঁহাদের বুদ্ধিকে একেবারে মুক্ত করিয়া নিতে পারিয়াছেন, এমন মনে হয় না।—সমাজেও ইহার প্রভাব এখনও চলিতেছে।

মানবের সাম্যের ও স্বাধীনতার অধিকারে এই Rationalistic schoolও একটা সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই সীমার মধ্যে থাকিয়া প্রত্যেক মানব তার এই দুইটি সনাতন অধিকার ভোগ করিলেই, সব চেয়ে বেশী সংখ্যক মানবের সব চেয়ে বেশী সুখ বা মঙ্গল হইবে, ইহাই তাঁহাদের মত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোনও মানব-সমাজকে তাঁহারা বিশিষ্ট ধর্ম্মে আশ্রিত স্বাভাবিক সংহতি অর্থাৎ Social Organism বলিয়া মনে করেন না। সুতরাং ব্যষ্টিনিরপেক্ষ তার কোনও বিশিষ্ট মঙ্গল থাকিতে পারে, তাও মানেন না। সমাজের সুখ বা মঙ্গল তাঁহাদের মতে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বহু ব্যক্তির সুখ বা মঙ্গল। তাই তাঁহারা বলেন, সবচেয়ে বহুসংখ্যক ব্যক্তির সবচেয়ে বেশী সুখ বা মঙ্গল (greatest happiness of the greatest number) যদি হয়, তাহাই জনসমাজের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলের ও উন্নতির অবস্থা। এবং সেই মঙ্গল ও উন্নতি ঘটিবে, ব্যষ্টি মানবের সাম্যের ও স্বাধীনতার অধিকারে তাঁহারা যে সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কোনওরূপে সংহতি শক্তি যদি সেই সীমা লঙ্ঘন না করে এবং সেই সীমার মধ্যে থাকিয়া প্রত্যেক ব্যক্তি যদি স্বকীয় জীবন-যাত্রায় এবং অন্যের সঙ্গে সকল সম্বন্ধে, নিজের ইচ্ছায় চলিতে পারে এবং নিজে যা ভাল বোঝে তাই করিতে পারে। এখন ইহাদের কথামতই সকল ব্যবস্থা হইলে অধিকাংশ মানবের সুখ বা মঙ্গল কতদূর হইতে পারে বা হইয়াছে, সেটা একবার আলোচনা করিয়া আমাদের দেখিতে হইবে।

ব্যষ্টি মানবের অধিকারের সম্বন্ধে এবং সংহতির শক্তির কর্ত্তব্যের ও দায়িত্বের ব্যাপ্তি কতটুকুমাত্র তার সম্বন্ধে তাঁহারা যাহা বলেন, তাহা বিস্তৃত ভাবে পূর্ব্ব দুই প্রবন্ধেই বলা হইয়াছে।

তার মোট চুম্বক হইল এই।

কেবল রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে, অর্থাৎ citizen রূপে মানুষের জীবনের যাহা কিছু দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য, সেই সব বিষয়ে মানুষ সংহতি-শক্তির অধীন হইয়া চলিবে। আর এই দায়িত্বের বাহিরে তার নিজের স্বার্থ ও সুখ বা মঙ্গল যাহা কিছু হইতে পারে,সব বিষয়ে সে স্বাধীন, নিজের নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধিতে চলিবে, সংহতিশক্তি তাহাতে কিছু মাত্র হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না।

এখন এই সংহতিশক্তি কি আকার ধরিয়া, কি ভাবে, কোন্ যন্ত্রের সাহায্যে নিজের কর্ম্ম সাধন করিবে? মানুষ সব সমান ও স্বাধীন। এ অবস্থায় এমন হইতে পারে না যে কোনও ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষের কর্ত্তৃত্ব বিনা ওজরে সকলে মানিয়া নিবে। এ অধিকারও কোনও ব্যক্তির বা সম্প্রদায়ের নাই, যদি না দেশের সব লোক স্বেচ্ছায় তাহাদের হাতে আপনাদের শাসন ভার দেয়।

কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল,—এরূপ নিয়োগ একটা Hypothesis অর্থাৎ অনুমান কি কল্পনার কথা ছাড়া বাস্তব ক্ষেত্রে হইয়া উঠে না। যেখানে এরূপ দৃষ্টান্ত দুই একটি দেখান হয়, সে একরূপ মনকে চোকঠার দেওয়া। ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের অধিকৃত ও পরিচালিত ক্ষমতার একটা ওকালতী সমর্থনচেষ্টা মাত্র,—কতকটা রুশোর Social Contract Theory বা সামাজিক চুক্তিবাদের মতই অযৌক্তিক। লোকমত গ্রহণের বাস্তব একটা চেষ্টা যেখানে হইয়াছে, তাকেও শক্তিশালী ব্যক্তিদের অভিনীত একটা প্রহসন বই আর কিছু বলা যায় না। রোমীয় Republicএর শেষ যুগে কল্পল, গ্রিটন,

ক্রোমওয়েল প্রভৃতি শাসকেরা এই অভিনয় করিতেন। আরব-সাম্রাজ্যে দুষ্ট খলিফারাও বাহুবলে সিংহাসন অধিকার করিয়া, এইরূপ একটা লোকমতের ফাঁকা অনুমোদন নিতেন। রোমের সম্রাটরাও এইরূপ লোক-মতের সমর্থনের দাবীতে সাম্রাজ্যের উপরে একাধিপত্য করিতেন।

সুতরাং Sovereignty of the people অর্থাৎ জন-সমাজের রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব তাহাদের নিজেদেরই অধিকারে, এই মতের উপরে প্রতিষ্ঠিত democracyই অবশ্য শ্রেষ্ঠ শাসনতন্ত্র বলিয়া এস্থলে মনে হইবে, আর এই democratic শাসনের পরিচালনা demos বা জনসাধারণ নিজেরাই অবশ্য করিবে। প্রাচীন গ্রীস অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এক একটি নগরই এক একটি state ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অনেক এইরূপ stateএ সকল প্রজা একত্র হইয়া শাসক সমিতি নির্ব্বাচন করিত। ইহাই হইল খাঁটি democracy অর্থাৎ প্রজাতন্ত্র বা গণতন্ত্র শাসন।

আধুনিক ইয়োরোপে যখন সকল শ্রেণীর প্রজাবর্গের সমান অধিকারের নীতি গৃহীত হয়, তার আগে সমাজে একটা শ্রেণী বিভাগ ছিল, সকল শ্রেণীর প্রজাদের প্রতিনিধি লইয়া বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত একটা প্রজা সমিতি হইত,—তাহাদের অভিমত জানিয়া রাজারা রাজ্য শাসন করিতেন। রাজা এই সব সমিতির মতানুসারে কতদূর চলিবেন, তাহার একটা ঠিক মাপ সকল দেশে ছিল না। ইংলণ্ডে সপ্তদশ শতাব্দীতেই প্রজা সমিতির মতের প্রাধান্য স্থাপিত হয়,—অন্যান্য অনেক দেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্তও রাজার ক্ষমতাই প্রধান ছিল। যাহা হউক, democracy বা গণতন্ত্রবাদের আদর্শই যখন শ্রেষ্ঠ বলিয়া গৃহীত হইল, তখন এই প্রতিনিধিমূলক প্রজাতন্ত্র শাসন অর্থাৎ Representative democracy সব চেয়ে সুবিধার পদ্ধতি বলিয়া সকলে গ্রহণ করিলেন,—কারণ একেবারে পুরা গণতন্ত্র-শাসন বা pure democracy, অর্থাৎ সকল প্রজা একত্র হইয়া যেখানে শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে মত দিতে পারে, এমন ব্যবস্থা বড় বড় দেশে লক্ষ লক্ষ প্রজার বাস যেখানে, সেখানে সম্ভব হয় না। কাজেই বিভিন্ন স্থানের প্রজারা প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া পাঠায়, আর সেই সব প্রতিনিধিদের যে সভা হয়, পার্লামেণ্ট, কংগ্রেস বা কাউন্সিল যে নামেই হউক, সেই সভার নির্দ্দিষ্ট বিধিব্যবস্থা অনুসারে, সেই সভারই নিকট দায়ী, কর্ম্মচারীবর্গ শাসন কার্য্য চালান। এখনকার Representative democracyর পদ্ধতি হইল এইরূপ।

বিধি ব্যবস্থা কিছু আর সকলের একমতে হইতে পারে না। প্রতিনিধি সভার majorityর অর্থাৎ অর্দ্ধাধিক সভ্যের মত যাহা হইবে তাহাই শাসনবিধি বলিয়া মানিয়া নিতে অপর ন্যূনার্দ্ধ বা minority বাধ্য, যতই এই সব বিধি অন্যায় ও অসঙ্গত বলিয়া তাঁহারা মনে করুন। তবে নিজেদের বড় কোনও স্বার্থ ব্যাহত যদি তাহাতে হয়, তবে বিদ্রোহই তাঁহাদের একমাত্র উপায়।

গত মহাযুদ্ধের কেবল পূর্ব্বে আয়র্লণ্ডকে স্বায়ত্ত শাসন দিবার প্রস্তাব বৃটিশ পার্লামেণ্টে উঠে। আয়র্লণ্ডবাসী ইংরেজ প্রজাবর্গের স্বার্থের হানি ইহাতে হইতে পারে, তাই তাঁহারা বহু আপত্তি করেন। কিন্তু যখন দেখা গেল, সব আপত্তিসত্বেও এই আইন পার্লামেণ্টে তখনকার মন্ত্রীসমাজের চেষ্টায় পাশই হইবে, ইহাঁরা অস্ত্রবলেই এই আইনের প্রতিরোধ করিবার আয়োজন আরম্ভ করিলেন। এমন সময় জর্ম্মাণযুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। এতবড় বিপদের সম্মুখে আত্মকলহে ও অন্তর্বিদ্রোহে একেবারে সর্ব্বনাশ হইবে বুঝিয়া সে চেষ্টায় ইহারা ক্ষান্ত হইলেন। বস্তুতঃ মেজরিটীর ভোট ছাড়া আইন করিবার আর কোনও উপায় democratic শাসন প্রণালীতে নাই। একটা ভোট মাত্র একদিকে বেশী হইলেও তাহাই মেজরিটী হইল,—প্রায় অর্দ্ধেক লোককে অপর অর্দ্ধের মতানুসারে চলিতে হয়, বিজয়ী অর্দ্ধসংখ্যার মত পরাভূত অর্দ্ধসংখ্যক লোকেরা যতই অন্যায় বলিয়া মনে করুন। আর সম্ভব হইলে, পরাভূত দল অস্ত্র ধরিয়া বিদ্রোহী হইয়া বিপ্লবও একটা ঘটাইতে পারে। সুতরাং এই শাসনকে একেবারে নিখুঁৎ শাসন বলা যায় না, ইহার ভিত্তিও একেবারে পাকা পাথুনি নয়।

আবার এই সব প্রতিনিধির নির্ব্বাচন ব্যাপারেও ইলেক্-টরদের মেজরিটীর ভোট যাঁহারা পান, তাঁহারাই নির্ব্বাচিত হন। মাইনরিটি হয়ত অর্দ্ধেকের কাছাকাছি হইয়াছে, কিন্তু তাদের নির্ব্বাচিত লোকদের রাষ্ট্রীয় প্রজাসমিতির মধ্যে কোন স্থান হয় না। কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধেক প্রজার প্রতিনিধিদের লইয়া হইল রাষ্ট্রীয় প্রজাসমিতি, আবার

তাদেরও কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধেকে যাহা বলিবে, তাহাই হইবে আইন। সুতরাং এই আইন যে সর্ব্বসাধারণের সম্মত নয়, এ কথা বলাই বাহুল্য। জর্ম্মাণ রাজনীতিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ব্লুণ্টস্লি (Bluntschli) এই ত্রুটি দেখাইয়া সত্যই বলিয়াছেন :—

"The peculiarity of representative democracy is that it ascribes the right of sovereginty to the majority ; but entrusts its excercise to the minority."

তারপর ভোটের অবস্থার কথা। রাষ্ট্রীয় শাসন ও রক্ষণাদির ব্যাপারে সকলের সমান স্বার্থ রহিয়াছে। সকলে একত্র মিলিতে পারে না, তাই প্রতিনিধির প্রথা হইয়াছে। এই প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে সকল প্রজার সমান অধিকার, সুতরাং সমান ভোটেরই ব্যবস্থা democracyর নীতিতে গৃহীত ব্যবস্থা দাঁড়াইয়াছে। অবশ্য এই 'প্রজার'ও একটা সংজ্ঞা প্রত্যেক দেশেই দেওয়া হয়। পরিণত বয়স্ক যে কোনও পুরুষ কোনও কর্ম্মে আপনাকে প্রতিপালন করিতেছে এবং রাজকর কিছু দিয়া থাকে, সেই এখন এই ভোটের অধিকারভোগী প্রজা। নারীরাও এখন এই অধিকার দাবী করিতেছেন এবং পাইতেছেন।

ভোট সকলেরই সমান, অর্থাৎ প্রত্যেক প্রজারই এক এক ভোট মাত্র। কিন্তু ধনে, পদে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, গুণে যোগ্যতায়, চরিত্রে সকলে ত সমান নহে। সাম্যবাদীরাও সকলের absolute বা নিরপেক্ষ সাম্য মানেন না। এই পর্য্যন্ত তাঁহারা বলেন, যোগ্যতা অনুসারে যে যা পাইতে পারে, সে তাই পাইবে, আর তার জন্য সমান সুযোগ সকলের থাকিবে। (Each according to his desert and equal opportunity for all)। সম্প্রদায় বিশেষের বা ব্যক্তি বিশেষের বংশগত কি পদগত এমন কোনও বিশিষ্ট অধিকার কিছু থাকিবে না, যাহাতে ইহার বাধা হইতে পারে। সকলের সমান যোগ্যতা নাই, যোগ্যতানুসারে যে যা পাইতে পারে, সে তাই পাইবে—ইহা যদি স্বীকার করা যায়, তবে মানুষ মানুষে এত বৈষম্যের মধ্যে রাষ্ট্রীয় শাসনের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে ছোট বড় সকলের সমান ভোট ন্যায়সঙ্গত কি করিয়া হয় ? যোগ্যতায় এমন মানুষ আছে হাজার মানুষের যোগ্যতা একত্র করিলেও যার সেই যোগ্যতার কাছেও দাঁড়াইতে পারে না,—অথচ এই হাজার লোকের হাজার ভোট তার সেই এক ভোটকে কোন্ অতলে ডুবাইয়া রাখিতে পারে। প্রতিভাবান্ সুবিজ্ঞ সুযোগ্য লোক সকল দেশেই অতি অল্প। মাঝামাঝি এক রকম লোক আছে, তাদের সংখ্যা নিতান্ত কম না হইলেও খুব বেশীও নয়।—কিন্তু সকল দেশের বেশীর ভাগ লোকই অজ্ঞ, অবিবেচক, গুরু কোনও দায়িত্ব পরিচালনায় অযোগ্য। সুবিজ্ঞ ও সুযোগ্য—অর্থাৎ লোকের মত লোক যাঁহারা, তাঁহাদেরই পরিচালনাধীন জনসাধারণ থাকিলে তবেই দেশের মঙ্গল হইতে পারে। মূঢ়তাবশতঃ অতি অমঙ্গলকর কোনও কুপথে চলিতে চাহিলে ইঁহারাই জনসাধারণকে সংযত করিয়া রাখিতে পারেন। কিন্তু প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে সমান ভোট হইলে দেশের মাথা যাঁহারা, দেশ যাঁহাদের বুদ্ধিতেও শক্তিতে আশ্রিত হইয়া কল্যাণের পথে চলিতে পারে, তাঁহারাই গিয়া একেবারে এই জনসাধারণের হাতে পড়িতে পারেন। তাঁহাদিগকে তলাইয়া রাখিয়া তারা যা খুসী তাই করিতে পারে।

কিন্তু জনসাধারণ যদি ইঁহাদের নেতৃত্বাধীন থাকে, তবে অবশ্য এরূপ আশঙ্কার কারণ কিছু নাই। এ পর্য্যন্ত ইয়োরোপ সেই অবস্থায় চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তাহাতেও সর্ব্বসাধারণের এই সমান ভোট একটা প্রহসনের মতই হইয়া পড়ে। সাধারণতঃ পদস্থ ও সম্পন্ন ব্যক্তিরাই সর্ব্বত্র প্রতিনিধির পদপ্রার্থী হইয়া দাঁড়ান। ইঁহাদের ভোট-যাচাই ব্যাপারটা যেরূপ হইয়া থাকে, এ দেশের মিউনিসিপালিটীর, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের ও লোকালবোর্ডের কমিশনার এবং ব্যবস্থাপক সভায় সদস্যদের নির্ব্বাচনে তাহার কতক নমুনা সকলে দেখিয়াছেন। সুশিক্ষিত লোকের মধ্যেও বিবেচনা [illegible] ভাল লোক বুঝিয়া ভোট কয়জনে দিয়া থাকেন বা [illegible] ? কেহ খাতিরে, কেহ চক্ষু লজ্জায়, কেহবা অন্য পাঁচ [illegible] স্বার্থের বিবেচনায় ভোট দেন। নির্ব্বাচনপ্রার্থীরাও যার হাতে ভোটার যার উপরে যতটুকু ক্ষমতা আছে, তা প্রয়োগ করিয়া থাকেন,—যে উপায়ে যাকে বাধ্য করিতে পারেন, তার কিছুই ছাড়েন না। শিক্ষিত ভদ্রলোকের মধ্যেই এই অবস্থা, অশিক্ষিত জনসাধারণের ভোট যে কি ভাবে লোকের হস্তগত হয় তাহা না বলিলেও চলে। কত জোর, কত

হরির লুট, কত রং তামাসা, তলে তলে কত ঘুষ, কত লোভ দেখান, কত বা ভয় দেখান—ইহাদের বাধ্য করিয়া রাখিতে কি যে না হয়, তাহা আর বলা যায় না। শেষে ভোটপ্রার্থীদের এজেণ্টরা ইহাদের যে ভোট দেওয়াইতে লইয়া যায়, কথাটা বলিলে বড় মন্দ শুনাইবে, কিন্তু সত্য বলিলে বলিতে হয়, ঠিক যেন—'রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে!'

এ দেশেরই অবস্থা যে এইরূপ তা নয়, ইয়োরোপেও ঠিক এইরূপ অবস্থা,—এই অদ্ভুত রকমগুলা ইয়োরোপেরই আমদানী। তুলনা করিলে অবস্থাটা আরও বিশ্রী বলিয়া মনে হইবে। প্রত্যেক নির্ব্বাচনপ্রার্থীকে এই সব ভোটারদের মদ খাওয়াইতেই প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে হয়। সম্ভ্রান্তমহিলারা চুম্বনের বিনিময়ে ভোট সংগ্রহ করিয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্তও আছে!

ইয়োরোপে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক দল আছে, প্রত্যেক দলে দলপতিও আছেন। প্রত্যেক স্থানে যেখানে ভোট দিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়, এই সব দলের শাখা আছে, শাখাদলের নায়কও আছেন,—ইঁহারা প্রধান দলপতিদের সহযোগী। নির্ব্বাচনের সময় যখন আসে, এই সব দলনায়কগণ নিজেরা প্রার্থী হইয়া দাঁড়ান, অথবা মনোমত প্রার্থী খাড়া করেন। তখন ভোট যাচাই আরম্ভ হয়। যার হাতে যতরকম উপায় আছে তার দ্বারা তিনি আপন দলের প্রার্থীর পক্ষে ভোট সংগ্রহে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যান। প্রত্যেক দলের মুখপাত্রস্বরূপ কতকগুলি করিয়া সংবাদপত্র আছে, ইহারা নিজ নিজ দলের নীতির ও নায়কগণের অজস্র সুখ্যাতি ও প্রতিপক্ষদলের নীতির ও নায়কগণের অজস্র নিন্দা প্রচার করিতে থাকে। নির্ব্বাচনের সময়কার দলের লড়াই বা electioneering campaign এর আট ঘাট বাঁধা, পাকা একটা বন্দোবস্ত বা orgahisation সর্ব্বত্র আছে এবং লড়াইটাও তেমনই পাকা কৌশলে চলে। কাহারও সাধ্য কি যোগ্য লোক বাছিয়া ভোট দিবে? যাদের এসব বিষয়ে ভালমন্দ বিবেচনার শক্তি আছে, তারাই পারে না,—কোনও না কোনও দলের মতে তাদের চলিতেই হয়। আর অজ্ঞ দরিদ্র জনসাধারণ—তাদের ত কথাই নাই। যেখানে যে দলের নায়কদের প্রতিপত্তি তাদের উপরে বেশী, তারাই বেশী ভোট তাদের পায়। অনেক স্থান একেবারে স্থায়ী ভাবেই এক একটা দলের করায়ত্ত হইয়া আছে।

নির্ব্বাচন প্রার্থী যাঁহারা হন, তাঁহাদিগকেও কোনও না কোনও দলের লোক গিয়া হইতে হয়, সেই দলের সাহায্যে নির্ব্বাচিত হইতে হয়। 'দলো' রাজনীতির মধ্যে অনেক কূটচাল কুচাল আছে—ভালতে মন্দতে দলকেই মানিয়া চলিতে হয়, অনেক স্থলে অনেক রকম হীনতাও স্বীকার করিতে হয়। এসব যাঁহারা পারেন না, বা অতিশয় সাধুবুদ্ধি হেতু করিতে চান না,—তাঁহাদের পক্ষে হাজার যোগ্যতা থাকিলেও সাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি হইয়া পার্লামেণ্টে স্থান লাভ করা একরূপ অসম্ভব।

প্রতিনিধিরা সব দলের লোক, নির্ব্বাচিত হন দলের জোরে বেশী ভোট পাইয়া,—শেষে পার্লামেণ্টে যে আইন পাশ হয়, শাসননীতি ধার্য্য হয়, তাও হয় দলের বুদ্ধিতে। প্রতিনিধিরা যার যার দলের নায়কগণের মতানুসারে ভোট দিয়া থাকেন। ইহার ব্যতিক্রম হয় অতি কম। যেখানে হয়, সেখানেও একদলের প্রতিনিধিরা আপনাদের নায়কদের ছাড়িয়া প্রতিপক্ষ দলের নায়কদের অনুবর্ত্তন করেন। সাধারণতঃ প্রধান দুইটি দলই থাকে, দুই দলের নির্দ্দিষ্ট নীতি কতকগুলি করিয়া থাকে, সংঘর্ষ যাহা কিছু হয়, এই দলের মধ্যে, কোন্ দলের নীতি শাসনযন্ত্রে প্রভুত্ব করিবে তাই লইয়া। বিভিন্ন লোকের মতের কোনও বৈচিত্র দেখা যায় না, কেহ নিরপেক্ষভাবে কোনও মত প্রকাশ করেন না, নূতন কোনও দিকে প্রতিনিধিবর্গের ভাব ও চিন্তার ধারা পরিচালিত করিবার একটা প্রয়াসও কাহারও মধ্যে দেখা যায় না।

মোট কথা সমগ্র রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যাপারটাই বিশেষ বিশেষ নির্দ্দিষ্ট নীতির অনুযায়ী দলগুলির হাতে গিয়া পড়িয়াছে। দলে দলে লড়াই চলিতেছে। যে দল বেশী ভোট সংগ্রহ যখন করিতে পারেন, সেই দল শাসনযন্ত্রে তখন প্রাধান্য করেন।

এই দলগুলি আবার বাছা কতকগুলি নায়কের হাতে। বড় বড় নায়ক কয়জন করিয়া আছেন—তাঁহাদের সহকারী বহু উপনায়কও আছেন। সুতরাং রাষ্ট্রীয় শাসন কখন কোন্ নীতি অনুসারে কি ভাবে চলিবে, তাহা একেবারেই এই সব দলনায়কবর্গের হাতে। লোকমতের সমর্থন

তাঁহাদের এই কর্ত্তৃত্বের ভিত্তি বলিয়া তাঁহারা গর্ব্ব করিয়া থাকেন। কিন্তু সে লোকমত যে তাঁহাদেরই গড়া, তাঁহাদেরই আয়ত্ত মত, লোকের নিরপেক্ষ স্বাধীন মত নয়, আর প্রতিনিধিগণও যে জনসাধারণের নিরপেক্ষ স্বাধীন বুদ্ধিতে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি নন, একথা বিশেষ করিয়া আবার না বলিলেও চলে। এই দলাদলি, এই electioneering campaign এর ব্যাপারটা যে কত বড় একটা বিশ্রী ব্যাপার, democracyর কেমন একটা প্রহসন মাত্র, তাহা কাহারও চক্ষেও বড় পড়ে না। কারণ, এই ব্রতের এই-ই কথা, আর এই ব্রতই শ্রেষ্ঠ ব্রত বলিয় সকল আমরা ধরিয়া নিয়াছি

এখন এই সব দলনায়ক কাহারা? যাঁহারাই হউন, জনসাধারণের স্বেচ্ছায় বৃত নায়ক তাঁহারা নন। দেশের সম্ভ্রান্ত, সম্পন্ন, পদস্থ, নানাদিকে শক্তিশালী লোক ইঁহারা—জনসাধারণ হইতে স্বতন্ত্র এক শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু উচ্চতর সম্পদ, পদমর্য্যাদা ও তৎপ্রসূত শক্তিবলে সাধারণ লোকের উপর যথেষ্ট প্রতিপত্তি ইঁহাদের আছে। আছে বলিয়াই জনসাধারণের ভোট ইঁহারা এত সহজে পান।

দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা বুদ্ধি ও প্রতিভার অধিকারী সর্ব্বদা ইঁহারা না হইলেও, মোটের উপর দেশের সামাজিক প্রাধান্য ইঁহাদেরই এবং রাষ্ট্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণেও ইঁহারা যোগ্য। ইঁহাদিগকেই একপ্রকার natural leaders of society বলা যাইতে পারে। সুতরাং এখন পর্য্যন্ত শাসননীতি নামে democracy হইলেও, কার্য্যতঃ শাসনব্যাপার যোগ্য লোকের হাতেই রহিয়াছে, এবং রহিয়াছে বলিয়াই রাষ্ট্রশাসন অতি বিশৃঙ্খল ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে নাই।

কিন্তু সর্ব্বসম্মত মূলনীতির সঙ্গে শাসনের বাস্তব রীতির এই বৈপরীত্য হেতু অসুবিধাও অনেক হইতেছে। অতি যোগ্যেরও এক ভোট, আবার হাজার অযোগ্যেরও ঠিক সেই এক এক ভোট। সুতরাং যোগ্যকে তার দায়িত্বের স্থান রক্ষা করিতে হইলে এই সব হাজার হাজার অযোগ্য লোকের মন যোগাইয়া চলিতে হয়, অথবা তাহাদের বাধ্য করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে হয়। আবার প্রতিপক্ষ অপর যোগ্য লোকের সঙ্গেও অতি সতর্ক হইয়া যুঝিতে হয়। Electioneering campaignএর উদ্দেশ্যও তাই। ইহাতে অনেক শক্তি তাঁহাদের ক্ষয় হয়। পার্লামেণ্টেও এইদিকে তাঁহাদের বেশী দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হয়, যে ভবিষ্যতের নির্ব্বাচনে তাঁহাদের পদ তাঁহারা কিসে রাখিতে পারেন। এক মনে ধীরভাবে কেবল সুনীতিসম্মত সুশাসনে দেশের মঙ্গল কিসে হইবে, এসব ভাবিবার, এবং তদনুসারে নিশ্চিন্ত হইয়া চলিবার অবসর কাহারও বড় হয় না। শাসন প্রকৃতপক্ষে democracy নয়, অথচ democracyর ঠাট একটা দেশে খাড়া করা হইয়াছে। তার সঙ্গে নিজেদের মানাইয়া চলিবার হাঙ্গামাতেই বড় বেশী ব্যস্ত তাঁহাদের থাকিতে হয়

তারপর দলের লড়াই আছে। এটাও পরাদমে চালাইতে হয়। ফলে তাঁহাদের বুদ্ধি, মতি গতি সব লড়ায়ের ধরণের হইয়া উঠে। নিজেরাও শান্তি স্বস্তি কি তা জানেন না, দেশেও তার মঙ্গল প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন না। সর্ব্বত্র জীবনের সকল সম্বন্ধে কেবল একটা লড়াই—দলে দলে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, অবিরাম একটা স্বার্থের লড়াই সর্ব্বত্র প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে democratic শাসন-প্রণালীই কেবল ইহার কারণ নয়—আরও কারণ আছে। যেদিক দিয়াই আসুক, সব কারণের মূল এই Individualism. রাষ্ট্রীয় শাসনই দেশের সর্ব্বোচ্চশক্তি, এই শাসন যাঁহাদের হাতে তাঁহারাও কেবল লড়াই লইয়াই আছেন। শান্তি ও স্বস্তির মঙ্গল প্রতিষ্ঠা যদি কেহ করিতে পারেন, তাঁহাদেরই পারিবার কথা। কিন্তু তাঁহারা এ অবস্থায় তা পারেন না।

এই লড়াই আর অবিরত সকলের পরস্পরকে ঠেলিয়া অধিকতর পার্থিব সুখসৌভাগ্যেও শক্তিতে অগ্রসর হওয়া, ইহাই নাকি উন্নতিশীল জীবনের লক্ষণ। পার্থিব সম্বন্ধে পরস্পরের সঙ্গে যতদূর সম্ভব শান্তিতে থাকিয়াও যে মানব অন্যদিকে —জ্ঞানে, আধ্যাত্মিক সাধনায়, ত্যাগে, ধর্ম্মে কত উন্নতি লাভ করিতে পারে, আর সেই উন্নতির পক্ষে পার্থিব সম্বন্ধে এই শান্তি যে নিতান্ত প্রয়োজন, ইহা পাশ্চাত্য বুদ্ধি ঠিক বুঝিতে পারে নাই। তাই কেবল এই লড়াইকেই উন্নত জীবনের লক্ষণ বলিয়া সে দেশের লোক মনে করেন।

এতটা বিশ্রী ব্যাপার হইত না, যদি মুড়ি মিছরীর সমান দরে সকলের সমান ভোট না হইয়া যোগ্যতার অনুপাতে

প্রত্যেকের ভোটের সংখ্যাও বেশী কম হইত। সাম্যের মধ্যেও স্বাভাবিক যোগ্যতার এবং যোগ্যতানুযায়ী ভাগ্যের বৈষম্য ইঁহারা মানেন। তাহাতে ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা ইহাই হয়। কিন্তু এই বৈষম্য রকমে এত বিচিত্র, আর যে দিকেই হউক যোগ্যতার পরিমাণ এবং যোগ্যতা লব্ধ ভাগ্যের পরিমাণ বিভিন্ন ব্যক্তিতে এমন ভাবে এতই তফাৎ যে, ইহার একটা মাপ করিয়া এই অনুসারে প্রত্যেকের ভোটের সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নয়, যেমন নাকি যৌথ কারবারে অংশী হিসাবে অংশীদের ভোটের তারতম্য করা হইয়া থাকে। সম্ভব হইলেও নির্দ্ধারণ করে—কার এ অধিকার আছে?—ইঁহারা শাস্ত্রশাসন মানেন না, জ্ঞানে ও সাধনায় উন্নত কোনও সম্প্রদায় বিশেষের কোনও কর্তৃত্বও মানেন না।

এ সম্বন্ধে বিখ্যাত জর্ম্মান রাজনীতিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ব্লুণ্টস্লি (Bluntschli) বলেন, "True representation can only be secured by arranging the elections so that every element and every interest in the nation shall be represented in proportion to its relation to the whole."

ঠিক কথা, কিন্তু তা যে হয় না।

যাক, যে কথা বলিতেছিলাম। শাসনের বাস্তব অধিকার শাসনে যোগ্য ব্যক্তিদের হাতেই আছে। কিন্তু যোগ্য যেমনই হউন, অন্যান্য দেশের সঙ্গে শক্তির সমতা একটা তাহাতে যতই রাখিতে পারুন, আভ্যন্তরিক শাসনে সকল বিধি ব্যবস্থার প্রণয়নে ইঁহারা যে একেবারে ন্যায়নিষ্ঠ থাকিবেন, সকলের স্বার্থ সমান ভাবে দেখিয়া চলিবেন, তাহা নাও হইতে পারে। সাধারণতঃ ইঁহারা জনসাধারণ হইতে পৃথক ও উচ্চতর এক শ্রেণীর লোক, অনেক বিষয়ে ইঁহাদের স্বার্থ সাধারণ লোকের স্বার্থ হইতে পৃথক, পরন্তু বিরোধীও হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় ক্ষমতা যাঁহাদের হাতে থাকে আপনাদের স্বার্থের দিকে টানিয়াই তাঁহাদের বেশী চলিবার সম্ভাবনা।' এরূপ কিছু যে না ঘটিয়াছে, তা নয়। কোনও একদল জনসাধারণের স্বার্থের দিকে একটু বেশী চান, এই ভাব না কোনর্ভেটিভ দলকে পরাভূত করিতে চেষ্টা করিতে দরিদ্র জনসাধারণ। ইংলণ্ডের পুরাতন লিবারেল দল জনসমূহের নায়ক . . জনসাধারণ অধিকতর অধিকার পাইতে পারে, তাঁহাদের হিত বেশী ঘটিতে পারে, এইরূপ ভাবে আইন সংস্কারের অভিলাষী তাঁহারা বলিয়া conservative বা রক্ষণশীল দলকে অনেক সময় পরাভূত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই লিবারেল দল দীর্ঘকাল একাধিপত্য ভোগ করিতে পারেন নাই। Conservative দলও তাঁহাদের প্রাধান্য বজায় রাখিতে এইরূপ আইন অনেক করিয়াছেন,—শাসনযন্ত্রেও পর্য্যায়ক্রমে সমান প্রাধান্য করিয়াছেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও conservative কি liberal, Tory কি Whig সকল দলের নায়কগণই সমাজে উচ্চতর সম্প্রদায়ের লোক, অনেক বিষয়ে তাঁহাদের স্বার্থ সমান এবং অনেক এমন স্বার্থ আবার জনসাধারণের বহু স্বার্থের বিরোধী। এরূপ অবস্থায় স্বভাবতঃ তাঁহাদের সকলেরই একটা প্রয়াস হইবে, বিধিব্যবস্থা এমন না হয়, যাহাতে নিজেদের স্বার্থ বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। কেবল এই মাত্র হইতেছে যে দরিদ্র জনসাধারণ যতটুকু তাহাদের স্বার্থ বুঝিতে পারিতেছে, যতটুকু বল সংগ্রহ করিয়া সেই স্বার্থের দাবী করিতে পারিতেছে, ততটুকুই আপনাদের স্বার্থ ছাড়িয়া রাষ্ট্রনায়কত্বের অধিকারী দলপতিগণ তাহাদের স্বার্থের দিকে চাহিয়া আইন করিতেছেন। কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের উপরে এমন কোনও একটা শক্তি নাই, সেই শক্তিতে স্থিত এমন কোনও বিধিব্যবস্থা নাই, যাহা এই সব বিপরীত স্বার্থের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রাখিতে পারে।

যাহা হউক, এত দিন এই ভাবে চলিতেছিল তবু এক রকম মন্দ নয়। রাষ্ট্রনায়কগণ শাসনযন্ত্র যোগ্যতা সহকারেই চালাইতেছিলেন। ইঁহারা সকলেই কিছু স্বার্থপর, সঙ্কীর্ণচেতা ও অবিবেকী নন। উচ্চজ্ঞানাধিকার, সুবুদ্ধি, উদারতা এসব গুণও অনেকের আছে। ধর্ম্মবুদ্ধিও একেবারে লোপ পায় নাই। জনসাধারণের দুঃখে করুণা বোধও অনেকে করেন। আর ইহাও অনেকে বুঝেন, জনসাধারণের উন্নতি ব্যতীত দেশের প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে না, নিজেদের এই মঙ্গলও জনসাধারণের মঙ্গলসাপেক্ষ। কতক এই সব প্রেরণায় ও বিবেচনায় এবং কতক অসন্তুষ্ট জনসাধারণের দাবীতেও, নিতান্ত যেরূপ প্রয়োজন তাদের স্বার্থ ও মঙ্গলের দিকে চাহিয়া বিধিব্যবস্থাও করিতেছিলেন।

কিন্তু সম্প্রতি কতকগুলি অবস্থা পাশ্চাত্যদেশে আসিয়া পড়িয়াছে, যাহাতে জনসাধারণ আর তাঁহাদের নেতৃত্ব না মানিয়া নিজেদের স্বার্থরক্ষা নিজেদেরই বলে নিজেরা করিতে চাহিতেছে। অনেকে বলিবেন, ইহা সুলক্ষণ। কিন্তু ঠিক তা নয়। ঊনবিংশশতাব্দীতে প্রচারিত এই সব সাম্য স্বাধীনতা, সকল কর্ম্মে সকলের সমান অধিকার প্রভৃতি নীতির প্রচার ও অনুসরণের ফলে ইয়োরোপের ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটা যুগান্তর হইয়া গিয়াছে। তাহাতে ধনী মহাজন ও বড় বড় ব্যবসায়িক নায়কদের হাতে সকল রকম ব্যবসায় গিয়া পড়িয়াছে, দরিদ্র জনসাধারণ একেবারে ইহাদের বেতনভোগী মজুরে পরিণত হইয়াছে। ভদ্রলোক যারা লেখা পড়া জানে তারা কেরাণী মজুর, আর নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত দৈহিকশ্রমজীবীরা কুলিমুজুর। কেরাণী মুজুরের অপেক্ষা কুলিমুজুরের সংখ্যা অবশ্য অনেক বেশী। মুজুরীর রীতি কড়া, খাট্‌নী বেশী, কিন্তু বেতন কম। ইহাতে এই সব শ্রেণীর সকলেরই যারপরনাই একটা ক্লেশের অবস্থা আসিয়াছে। কেমন করিয়া কিসে এই সব নীতির অনুসরণের ফলেই ঠিক এই অবস্থাটা আসিয়া পড়িয়াছে, এবং ইহা যে দরিদ্র প্রজাসাধারণের পক্ষে কেমন দুঃসহ ক্লেশকর হইয়াছে, তার বিস্তৃত আলোচনা অন্য এক প্রবন্ধে করিতে হইবে। কারণ তাহাই ইয়োরোপীয় বর্ত্তমান সমাজসমস্যার সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রাষ্ট্রশাসনের যে নায়কবর্গ, তাঁহারাই প্রধানতঃ আবার এই সব বড় বড় ব্যবসায় বাণিজ্যের নায়ক। সুতরাং ইহাঁদের স্বার্থে এবং দরিদ্র জনসাধারণ অর্থাৎ মুজুরশ্রেণীসমূহের স্বার্থে যারপরনাই একটা বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। জনসাধারণ এত দিনে যে ভাবে এই নায়কদের নেতৃত্ব মানিয়া চলিয়াছে, এখন আর তা চলিতে চাহিতেছে না। ক্লেশ তাদের এতদূর কঠোর হইয়া উঠিয়াছে যে আর তা পারিতেছেও না। উচ্চতর শ্রেণীর মধ্যে জ্ঞানী ও সহৃদয় ব্যক্তিগণ ইহাদের দুঃখ বোঝেন, প্রতিকারের চেষ্টাও করেন, কিন্তু স্বার্থান্ধ মহাজন ও ব্যবসায়িক নায়কবর্গের হাতে ক্ষমতা এত বেশী গিয়া পড়িয়াছে এবং দলবদ্ধ হইয়া তাঁহাদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিতেও তাঁহারা এত সচেষ্ট, যে তাঁহাদের বিরুদ্ধে কাহারও কোনও চেষ্টা সফল হইতেছে না। তাই কিছুকাল যাবৎ মজুররাও দল বাঁধিতেছে, দল বাঁধিয়া ধর্ম্মঘট প্রভৃতি উপায়ে আপনাদের সুবিধা কিছু করিয়া নিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু কেবল তাহাতেও সুবিধা হইতেছে না। রাষ্ট্রশাসনপদ্ধতিই ইয়োরোপের সংহতি শক্তির একমাত্র আকার, তাহার মধ্যেই তাঁহাদের প্রাধান্য তাহারা প্রতিষ্ঠা করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। Democratic নীতির তাৎপর্য্যও তারা এখন বুঝিতেছে। মনে করিতেছে। তারাই যখন দেশের বেশীর ভাগ লোক, তাদের শ্রমেই যখন রাষ্ট্রশাসন, যুদ্ধবিগ্রহ, ব্যবসায় বাণিজ্য সব চলিতেছে, তখন তার সকল সুফল ভোগ করিবার বেশী দাবী তাহাদেরই আছে। তারা কেবল খাটিবে আর দুঃখ পাইবে, উচ্চ শ্রেণীর অল্পসংখ্যক লোকেরা মাত্র সকল বিষয়ে কর্তৃত্ব করিবেন, সকল সুখ সুবিধা ভোগ করিবেন অশেষ আরামে বিরামে জীবন কাটাইবেন, ইহা কখনও হইতে পারে না।

তাই আপনাদের দলের লোককেই নির্ব্বাচন করিয়া শাসনযন্ত্রে তাহারা আপনাদের এরূপ প্রাধান্য স্থাপন করিতে চায়, যাহাতে প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি যার দরুণ ছোট বড় ভেদ জন্মাইতেছে, ধনীকে প্রভু, দরিদ্রকে তার অধীন করিয়া ফেলিতেছে, সব উঠিয়া গিয়া নূতন এমন সব নিয়মের প্রবর্ত্তন হইবে, যাহাতে ধনী দরিদ্রের ভেদ উঠিয়া যায়, দরিদ্র শ্রমজীবীরা বড় বড় লোকদের সমান হইয়া সমান সুখ ভোগ করিতে পারে— আর এই অবস্থাই স্থায়ী হয়।

যে বোলশেভিক বিপ্লবে রুষিয়া ধ্বংস হইয়াছে, জার্ম্মাণী অষ্ট্রীয়া প্রভৃতি মধ্য ইয়োরোপের শক্তিশালী রাজ্য সমূহ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, অন্যান্য দেশও কতকটা টলমল হইয়া উঠিয়াছে, সে Bolshevic বাদ ইহারই চরম একটা প্রকাশ। Demos বা জনসাধারণ সকলের সঙ্গে সমান সুখ ও সমান অধিকারের লোভে ক্ষেপিয়া উঠিলে, তাহার পরিণাম এইরূপই হইবে।

জনসাধারণ কোনও দেশেই সুশিক্ষিত ও সুবিবেচক নয়। উত্তেজনার বশে ইহারা না করিতে পারে, এমন কাজ নাই। শিক্ষিত, ধীরবুদ্ধি এবং উন্নত সংস্কারের অধিকারী উচ্চতর শ্রেণীর নায়কবর্গের পরিচালনাধীনে সংযতভাবে সুপথে ইহাদের না রাখিতে পারিলে, কোনও দেশেরই মঙ্গল হয় না। শক্তিমান্, অথচ দুর্বুদ্ধি লোক কেহ বড় বড় আদেশ

অর্থাৎ, সাম্য স্বাধীনতা মানবোচিত উচ্চ অধিকার প্রভৃতি সম্বন্ধীয় চিত্তগ্রাহী বক্তৃতার ছটায়, ভাবের উন্মাদনায় ইহাদিগকে প্রমত্ত করিয়া কি যে অত্যাহিত না ঘটাইতে পারেন, তা বলা যায় না। ফরাসী বিপ্লব আর সেই বিপ্লবসংসৃষ্ট যত কিছু লোমহর্ষণ ভীষণ ঘটনা, এই ভাবেই ঘটিয়াছিল। ছোট ছোট আরও বহু দৃষ্টান্ত ইয়োরোপের ইতিহাসে—জগতের অন্যান্য দেশের ইতিহাসেও পাওয়া যায়। বর্ত্তমান ইয়োরোপে Bolshevic বিপ্লবও ইহার একটি বড় দৃষ্টান্ত। ফরাসী বিপ্লব কতকগুলি কঠোর বৈষম্য ও অতি কঠোর শাসন হেতু ঘটিয়াছিল। বর্ত্তমান ইয়োরোপেও সাম্য ও স্বাধীনতাবাদ প্রচারের ফলে ধনগত যে ভয়ানক বৈষম্য এবং জনসাধারণের যে আর্থিকদাসত্ব ঘটিয়াছে, জনসাধারণের বর্ত্তমান এই অভ্যুত্থান—যাহা ইয়োরোপীয় সমাজবিধান ও রাষ্ট্রবিধানকে পর্য্যন্ত চূর্ণ করিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহাও সেই বৈষম্য ও দাসত্বের বিরুদ্ধে বড় একটি বিদ্রোহ। নিছক Democracy—যাহাতে সংখ্যায় অধিক বলিয়াই জনসাধারণের প্রাধান্য হইবে, তাহা যে প্রকৃত সুশাসন হয় না, রাষ্ট্রশাসনে যে বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা, গভীর রাজনীতিজ্ঞান আবশ্যক তাহা সর্ব্বদা লাভ করা যায় না, অসংযত অবিবেচক অস্থিরমতি সাময়িক উত্তেজনার বশেই পরিচালিত জনসাধারণ বা mobএর কর্ত্তৃত্বই সকলের উপরে গিয়া উঠে, দুষ্টবুদ্ধি লোকের প্ররোচনায় ইহারা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া এমন সব কাণ্ডও করিয়া ফেলে যাহাতে দেশের একেবারে সর্ব্বনাশ হইয়া যাইতে পারে, অভিজ্ঞ রাজনীতিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তাহা বেশ বুঝেন, এবং অসংযত Democracyর পক্ষপাতীও তাঁহারা নহেন। এই যে কারণের উল্লেখ করিলাম তাহা ছাড়া আরও অনেক কারণ তাঁহারা দেখান; প্রধান প্রধান কারণগুলি পূর্ব্বেই আমরা আলোচনা করিয়াছি। এ সম্বন্ধে জর্ম্মণ রাজনীতিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ব্লুইণ্টস্‌লি সাহেবের দুইটি মন্তব্য পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। আরও কয়েকটি কথা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

"Montesquieu declared the principle of democracy to be virtue. But virtue, as a political principle, presupposes not the equality of all, but respect for the moral worth of the rulers which is not to be found in pure democracy."

"Its principle is that the best men of the nation govern in the name and by the commission of the nation. But the great difficulty lies in organising the elections so as to secure that the best men both in intellect and character shall be chosen."

"The democratic tendencies of the present are in favour of elections simply by the number of electors. Democracy placing, as it does, great value upon equality, really adopts mathematical rules for its institutions. It counts the citizens and assigns equal right to an equal number."

"The frequent elections make the rulers dependent upon the ruled and yet the latter have to obey during the interval. The freedom of the subjects is more securely founded than the authority of the government."

"The frequency of elections makes its position insecure and dependent upon the changeable opinions of the people."

Democracy এই সব ত্রুটি যাহাতে দূর হয়, mob ruleই গবর্ণমেণ্টের উপরে সর্ব্বোচ্চ না হয়, তার জন্য শাসনযন্ত্রে অন্যরূপ কোনও কোনও শক্তির প্রতিষ্ঠাও অনেকে সমীচীন মনে করেন,—যেমন Aristocacy, monarchy, clergy প্রভৃতির বিশেষ বিশেষ শক্তি। ইংলণ্ডে লর্ড সভা এবং রাজা এইরূপ aristocracyর এবং monarchyর শক্তির প্রতিভূ। কিন্তু ইঁহাদের কোনও না কোনওরূপ কর্ত্তৃত্ব মানিলেই ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের বংশগত এবং পদগত বিশেষ বিশেষ অধিকার মানা হইল। খাঁটি Democracy তাহাতে থাকে না। এইরূপ লর্ড সভা যে দেশে নাই, সে সব দেশেও জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিসভা ছাড়া আরও বিশেষ এক একটি সভার স্থান রাষ্ট্রীয় যন্ত্রে আছে। ইহার সদস্যগণ জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি নন।

দেশে বিভিন্ন প্রণালীতে ইহাঁদের বাছাই হয়। যে ভাবেই হউক ইহাতে Demos-এর পুরা অধিকার থাকে না।

তারপর শেষ আর একটি কথা বলিয়া আজ এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

Rationalistic Individualism-এর কথা এই যে সংহতিশক্তির অধিকার রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে মাত্র। ব্যক্তিগত স্বার্থসম্বন্ধীয় কোনও ব্যাপারে এই সংহতি শক্তি হস্তক্ষেপ করিবে না। কিন্তু যদি করে, কে তাহা ঠেকাইবে? জনসাধারণ তাহাদের সংখ্যাধিক্যের বলে শাসনযন্ত্রে তাহাদের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহাদের বড় একটা লক্ষ্য এই যে বড়কে বড় যোগ্যতার বলেও বড় হইতে দিবে না, ব্যক্তিগত যে সব অধিকারের বলে তাহা সে করিতে পারে তাহাও লোপ করিতে হইবে। ব্যষ্টি মানবের সর্ব্বপ্রধান অধিকার হইতেছে স্বোপার্জ্জিত সম্পদে প্রত্যেকের পূর্ণ অধিকার—যাকে বলা হয় rights of private property. নূতন যে সমাজের আদর্শ ইহারা প্রতিষ্ঠা করিতে চায়, তার মধ্যে rights of private property বলিতে যাহা কিছু বুঝায় তাহা থাকিতে পারে না। পারিবারিক জীবন, স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধ, পিতাপুত্রের সম্বন্ধও তারা আর এক রকম করিয়া ফেলিতে চায়। আর ও যে কি চাহিবে,—তাহা কেহই বলিতে পারেন না। যদি তা ইহারা পারে ও করে, তবে যে ব্যষ্টির স্বাধীনতার জন্য এত কথা এত হাঙ্গামা, তাহা যে কত দিকে কত ভাবে ক্ষুণ্ণ হইবে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এ পর্য্যন্ত অন্যান্য মানবসমাজে বহু বৈষম্য ও বাধার মধ্যেও অতি দীন হীন ব্যষ্টিমানব যে টুকু স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে—তাহাও তার ভাগ্যে এই democracy-র ফলে কিছু থাকিবে এমন সম্ভাবনা বড় কম।

Democracy-র ত্রুটিই কেবল দেখাইলাম। ইহার ভাল দিক যে একেবারেই কিছু নাই, তা বলিতে পারি না। কিন্তু ভালটুকু ভাল কাজ করিতে পারে, তার জন্য যে সব checks বা safeguards আছে—যেমন monarchy, aristocracy, clergy প্রভৃতির শক্তি সমূহের বিশেষ বিশেষ অধিকার—তা যদি রাখা যায় তবে কিন্তু তাহাকে absolute democracy বলা যায় না। Democracy-কে অন্য উপায়ে অনুরূপ শক্তিদ্বারা সংযত করিয়া রাখিতে পারিলেই তবে তাহা তার ভালটুকু দেখাইতে পারে। নতুবা ভালটুকু চাপিয়া দিয়া মন্দটাই অতি অশুভ আকার ধরিয়া জাগ্রত হইয়া উঠিবে।

বিকাশ

প্রাণের মাঝারে যে কুসুম-কলি
এত দিন ছিল গোপনে,
পাগল করিয়া পরাণ আমার
ফুটে গেল আজি স্বপনে।
সে গোপন কলি ছড়ায়ে পড়েছে
পরিমল-মকরন্দে,
ভ্রমর-চঞ্চল হাসি-টল-টল
শতদল-গীতি-ছন্দে।

ফুটাতে চেয়েছি, ফুটাতে পারিনি,
বরষা-বাদল-ধারা,
কুহেলী-নিবিড় শীতের শিশির—
পারেনি' ফুটাতে তারা।
স্বপনে কেমনে ফুটে গেছে আজি
প্রণয়ের মধুমাস,
গোপনে ফুটিলে এত কি মাধুরী—
এত কি উথলে হাস!

শ্রীসদাশিব বন্দ্যোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(কলিকাতায় বাড়ীর অন্তঃপুর)

গিরিবালা—দেখ, ছায়ার আর মায়ার আর বিবাহ না দেওয়া একেবারেই ভাল দেখাচ্ছে না।

সত্যহরি—ছায়া যে এখন বিবাহ করতে চায় না, মায়ার একটা পাত্র স্থির করেছি।

গিরিবালা—বকো না, এ রকম কথা ত কখনো শুনিনি, বড় থাকতে ছোটর বিয়ে। মেয়ের মতামত নিয়ে বিয়ে ঠিক করতে হবে নাকি? আগে ছেলেরই মত কেউ জিজ্ঞেস করতো না।

সত্যহরি—মেয়ে বয়স্থা হলে মতামত নিতে হয় বৈকি। একটা ভাল ঘরের ছেলে আছে, এবার ডেপুটী হয়েছে; কিন্তু তার বাবা বলে, অত বড় মেয়ে এতদিন বিয়ে হয় নাই, ওখানে বিয়ে দেব না। লোকটা প্রাচীন গোছের গোঁড়া হিন্দু।

গিরিবালা—কেবল পাড়াগাঁয়ের দোষ নয়। দেখ্‌লে, মেয়ে বড় হলে, গাইতে বাজাতে পারলে বা পণ্ডিত হলেই সহরের সমাজও তাকে লুফে নেয় না। আমি ত বরাবরই বলেছিলাম যে, যে ছেলেটীর সঙ্গে সম্বন্ধ হয়েছিল তার সঙ্গেই দিতে। তখন ছায়ার বয়স ১২ বৎসর, খাসা হতো। তারা লালায়িত ছিল। বাচা বর ছাড়তে নেই।

সত্যহরি—সে ত খাসা হ'তই। সে ছেলে ত আজ-বাদে কাল হাইকোর্টের জজ হবে। তখন তার টিকী দেখেই মনীশ, বিভাস অপছন্দ করলে। গিন্নী একটা পাত্রের সংবাদ আছে, বলতে হাসিও আসছে, রাগও হচ্ছে।

গিরিবালা—কি শুনিই না।

সত্যহরি—অভিকার বাবু এসেছিলেন, তার ছেলে নীলিমের সঙ্গে ছায়ার সম্বন্ধ করতে। নীলিম ব্যারিষ্টারী পাস করে এসেছে। বলে প্যাটেলের অসবর্ণ বিবাহ বিল ত পাস হচ্ছে, দোষ কি? আরও কত উদাহরণ দিলে। সাহসও ধন্ত!

গিরিবালা—বলোকি, অভিকার বাবুর ত সাহস হবেই। আমার যে শুনে কান্না আসছে। বামুন—কুলীন বামুনের মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ করতে আসছে কিনা—আমার ছায়াকে আমি গঙ্গায় কলসী বেঁধে ভাসিয়ে দেব, তবু তার বাড়ী দেব না, তাকি জানে না। এ হলো কি! শুনে যে ঘেন্নায় মরে যাচ্ছি।

সত্যহরি—আমি তাকে ফিরিয়ে দিলাম, রাগের চেয়ে হাসিই পেতে লাগলো। সে বলে, এখন উদারতার, আলোকের দিন, সাম্যের যুগ। তার বক্তৃতায় বিরক্ত হয়ে, আমার অন্য কাজ আছে, মাপ করবেন, বলে বিদায় দিলাম।

গিরিবালা—না, আমি বিভাসকে বলে আজই গাঁয়ে যাব। সত্যি বলছি, সহর আমাকে ভাল লাগে না কর্ত্তা। এই না হিন্দু, না মুসলমানী ভাব, এই চাল চলন, এই ঢঙ ঢাঙ, এই যাত্রায় সেজে থাকা গোছের ধরণ, বামুনের মেয়ের বুকে বড় বাজে। আর ভগবান ত পাড়াগাঁয়ের সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বাসিত হয়েছেন, তেমন ভক্তি তেমন সশ্রদ্ধ ভাবে কোন কাজই হয় না।

সত্যহরি—গিন্নী, আমিও তাই ভাবি, গ্রামের বাস উঠিয়ে এলাম বটে, কিন্তু সহর আমাদের ঠিক স্থান নয়। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে সনাতন পথে চলেছিলেন তাতে অভাব অতি অল্প ছিল। এখন এক একটা দর্জ্জির বিলেই একটা দুর্গোৎসবের খরচ হয়ে যাচ্ছে।

গিরিবালা—একটা কথা শোন, বলবো বলবো করে বলা হয় না। মনীশ যে সব ছেলেদের সঙ্গে বেড়াচ্ছে তা আমি একেবারেই পছন্দ করিনে। চারিদিকে হুলস্থুল, ছেলের দল বিগড়ে খুন ডাকাতিতে যোগ দিচ্ছে। আমাদের খুব সাবধান হওয়া উচিত। কত সুখের বাড়ী শ্মশানে পরিণত হচ্ছে। সব চেয়ে আমার বেজায় খারাপ লাগে ওই শিরীশ না শ্রীশ বলে ছোঁড়াকে। ওকে দেখলেই ধূর্ত্ত ও দুষ্ট-বুদ্ধি বলে মনে হয়।

সত্যহরি—হাত চেয়ে আম বড় হয়ে পড়েছে। একটা স্বাধীনতা স্বাতন্ত্র্যতার ভাব ওদের মধ্যে ঢুকেছে। বাপ মাকে মানতে চায় না।

গিরিবালা—এই সব হল সহরবাসের ফল। সহরের সভ্যতা জীর্ণ করতে পারলে না। বাইরের খোসা ও জোল-

গুলোই আদর করে নিলে। এ সমুদ্রের অমৃত পেলে না, কেবল বিষই উঠলো।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(কলিকাতার বাড়ী)

ছায়া—মায়া, লাহিড়ী সাহেবের কন্যা, আমাদের সহপাঠী স্বাতী আসছেন, চল দোর থেকে আগিয়ে নিয়ে আসি, তাঁদের মটরই বটে।

(হাস্য অভিবাদন করিয়া ভিতরে আনয়ন)

স্বাতী—কালকে আপনারা কোন partyতে যাবেন বলে আমি আসি নাই।

ছায়া—আমার যাবার ইচ্ছা একটা পাগলা ঘোড়ার মত ছটফট করছিল, তাকে বহুকষ্টে রাশ টেনে সংযত করতে হয়েছিল। কারণ হাতে এমন কতকগুলো কাজ ছিল, যা ফেলে রেখে গেলে কর্ত্তব্যটা ঠিক পালন করা হত না।

স্বাতী—আমি সম্প্রতি শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছি। আমার পল্লীগ্রামে শ্বশুর বাড়ী কি না, এসে এখনো যেন সহরের সঙ্গে মিশে যেতে পারি নি, গোলমালটা বড় বেশী লাগছে।

ছায়া—দেখুন, সত্যি বলুন, পল্লীগ্রামের নির্জ্জনতা বিচিত্রবিহীনতা আপনাকে ক্লান্ত করে তোলেনি কি? বারবার মনে পড়ে নাই কি এই কর্ম্মময় নাগরিক জীবন, যার মধ্যে অনিন্দ্যসৌন্দর্য্যে আপনার জীবনটী ফুলের ন্যায় প্রস্ফুটিত হয়ে উঠলো? না জানি এই সযত্নরোপিত টবের গোলাপ পল্লীগ্রামের অকরুণ অরণ্যে কি রূপ ধারণ করবে, কতটুকু লাবণ্য হারাবে। আমি বুঝতে পারলাম না আপনি কেমন করে সেই পর্ণবাসকে, সেই একঘেয়ে পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বরণ করে নিতে পারবেন?

স্বাতী—পল্লীগ্রাম ও পল্লীবধূ আমার অত্যন্ত ভাল লাগে। তাদের অনুকরণ করতে, তাদের মতন হতেই আমি চেষ্টা করছি। তারা ফুল ফুলই আছে। আমাদের মত মোমের ফুল হয়ে যায়নি। স্বাধীন বা লজ্জাহীন স্ত্রীলোক আমি মোটেই পছন্দ করতে পারিনে। ও সব স্ত্রীলোককে দেখলে আমার মনে হয়, ফুলগুলোকে রাতারাতি কে যেন স্বর দিয়ে টাকসোণা পাখী করে ছেড়ে দিয়েছে, না আছে সৌরভ, না আছে গৌরব।

ছায়া—আপনি দেখছি নিতান্তই একদেশদর্শী। আমি শুনতে চাই, পল্লীবধূর জীবনের আদর্শ কি?

স্বাতী—তাদের আদর্শ, তাদের স্বামী-দেবতার জন্য ফুটে ওঠা, তাঁর জন্য গৃহ কাজ, রান্না বান্না, গুরুজনের সেবা। তাদের আদর্শ তাদের স্বামীর জন্য আত্মত্যাগ, মরণেও কি আকাঙ্ক্ষা দেখুন—

স্বামীর কোলে পুত্র দোলে
মরণ হয় যেন গঙ্গার জলে।

এই আপনাকে পরকরা ভাব, এই সর্ব্বস্বত্যাগ ভাবই স্ত্রীলোকের স্ত্রীত্ব। এই সুন্দর সলজ্জ সশ্রদ্ধ সশঙ্ক ভাবই তাহার গরিমা।

ছায়া—আপনি স্বামীতে এমনি হারা হয়েছেন যে, তাঁর সম্বন্ধীয় প্রত্যেক জিনিষই আপনার চক্ষে উজ্জ্বলবর্ণে প্রতিভাত হচ্ছে। তা নইলে পাড়াগাঁয়ে শ্বশুরবাড়ী পাড়াগাঁয়ে শ্বশুর বাড়ী মাত্র।

A primrose is a primrose
and nothing more.

আমার ত মনে হয়, বিসুবিয়সের অগ্ন্যুৎপাতে পম্পী নগরী যেমন তার সৌন্দর্য্য নিয়ে চাপা পড়েছিল, পল্লীগ্রামের নিঝুম নীরবতার মধ্যে আপনার ভাবময়, শোভাময় হৃদয়ও তেমনি চাপা পড়েছে। উপমাটা অশোভন হল, সদয়ভাবে গ্রহণ করবেন আশা করি।

স্বাতী—সত্যই আমি পল্লীগ্রামে বড় সুখে থাকি। কোলাহলময় নগরী কর্ম্মপ্রিয় পুরুষের উপযুক্ত, আর সঙ্গীতময়ী পল্লী কুলবধূর প্রকৃত স্থান। সে সেই পুণ্য-নীরবতার মধ্যে ধ্যানমগ্না ঋষিবালিকার মত একরূপ ধ্যান করতে করতেই মধুময় জীবন অবসান করে।

ছায়া—আপনি এমন করে স্বামীতে আত্মহারা হলে প্রশংসা করতে পারিনে। স্ত্রীলোকেরও একটা স্বতন্ত্রতা একটা সত্ত্ব আছে, যেটার জন্য বিলাতে সাফ্রাজিষ্ট দল গঠিত হয়েছে। তারা সর্ব্ববিষয়ে পুরুষদের সমকক্ষতা করতে চায়।

স্বাতী—আমি এ সমকক্ষতা বা বিপক্ষতার পক্ষপাতী নই। তাঁরা আমাদিগকে দেবী করে রেখেছেন। যদি

দেবীরা স্বর্গ থেকে নেমে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন, তা হ'লে তা এ যুদ্ধের যুগেও অশোভন হবে।

ছায়া—আপনি ব্যারিষ্টারের কন্যা। উচ্চ সমাজে সভ্যতার মধ্যে প্রতিপালিত। এত ভাবের দৈন্ত কেন? নিতান্ত পল্লীবধূর মত আপনাকে স্বামীর চরণে যদি এমনি করে লুটিয়ে দেন তাহলে পুরুষেরা যে আমাদের সত্ব অগ্রাহ্য করবে সেটা ত স্বতসিদ্ধ।

স্বাতী—Right নেবার যে ইচ্ছে নেই। আমার শিক্ষার গৌরব, রূপের গৌরব, তাঁর আলোকে একেবারে ম্লান হয়ে যায়। মনে হয় বলি (কিছু মনে করবেন না)

বঁধু তুমিহে আমার প্রাণ।
তিল ও তুলসী দেই দেহ সমর্পিনু
দয়া নাহি ছাড়বি মোই।

ছায়া—আপনি এখন তর্কের বাহিরে গিয়ে পড়েছেন দেখছি।

মায়া—আপনি আদর্শ হিন্দু বধূ, আপনাকে এখন উপহাস না করে ভ.ক্ত করতেই ইচ্ছে হচ্চে।

স্বাতী—আম সর্ব্বাংশে পল্লীবধূ হবার চেষ্টা করছি মাত্র। আমি মুড়ি ভাজতে, গোবর নেদি দিতে, বড়ি দিতে শিখেছি। মা আদর করে বলেন,—"বেটী কোন গয়লার মেয়ে এমন সুন্দর, দই পাতাতে, এমন পাতলা ঘুটে দিতে শিখলি। আমার হাতের রান্না খেয়ে যে দিন সবাই সুখ্যাতি করলেন, তখন মনে হল, স্কুলের প্রাইজ এর কাছে অতি তুচ্ছ।

ছায়া—আপনার একটা বাহাদুরী স্বীকার করতেই হবে। ক্ষুদ্র তুচ্ছ ধুলা মাটিকে তিলক মাটিতে পরিণত করতে পেরেছেন। শিখেছেন ত অনেক, ভুগেছেন যে ঢের বেশী। আপনার সে মধুর কণ্ঠ, যা এই ঘরে স্বর্গের সৌন্দর্য্য এনে দিত তা কোথায়? সে উচ্চ অঙ্গের কাব্য-চর্চ্চা এখন রামায়ণের পঞ্চবটীতে ও মহাভারতের দ্বৈতবনে পর্য্যসিত। আপনার হৃদয় প্রমোদ উদ্যানে—যাতে ফুটেছিল কত রমণীয় কুসুম, ফুটতে পারতো কত রমণীয়তর কুসুম, তা ভগ্ন ও উৎপাটিত করে বনতুলসীর চারা রোপণ করতে কি কষ্ট হলো না?

স্বাতী—আমরা সেখানে রামায়ণ মহাভারত ও চৈতন্ত ভাগবৎ পড়ি।

ছায়া—আজকাল যে সমস্ত উচ্চ অঙ্গের উপন্যাস প্রকাশিত, তা ছেড়ে ও সব পাঠের সময় করা যায় কি? যে সব নভেল দেশের ভাব স্রোত ফিরিয়ে দিচ্ছে, মনস্তত্বকে বিশ্লেষণ করে টাইমটেবিলের মত দেখাচ্ছে। যা মনের X ray এক্স রে স্বরূপ তা পড়েছেন কি?

স্বাতী—আমার ও সব পড়ে আর নভেল ভাল লাগে না, দেবীকে দেখলে যেমন চেড়ীদিগকে কেউ পছন্দ করে না।

ছায়া—আপনাকে পারবো না। আপনার সঙ্গে তর্ক করে বুঝানো, আর সুইস্ টিপে প্রদীপ আলো জ্বালতে যাওয়া একই।

মায়া—সত্যি বলছি, আমার কিন্তু ওঁর কথা বড় মনে লেগেছে, পল্লীগ্রামের উপর যেন একটা নূতন আলোকপাত করলেন।

তৃতীয় দৃশ্য

কলিকাতার বাড়ী—বিভাসের কক্ষ

বিভাস ও ক্ষিতীশ

—০—

বিভাস—লাহিড়ী সাহেবের কাণ্ডটা দেখলে, তিনি নবদ্বীপ হতে ব্যবস্থা আনিয়ে, মাথা মুড়িয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে হিন্দু হলেন। একটা অসৎ দৃষ্টান্ত দেখালেন। স্বাতীর বিবাহ দিলেন বহু খুঁজে পেতে, অল্প লেখা পড়া জানা পল্লীগ্রামের এক সামান্ত জমিদারের ছেলের সঙ্গে। সৎসাহস বলে যে একটা জিনিষ এদেশে সেটার একান্ত অভাব।

ক্ষিতীশ—লাহিড়ী সাহেব ত চিরদিনই হিন্দু আচার ব্যবহার ঠিক রেখেছেন। রীতিমত আহ্নিক পূজা করেন। বাড়ীতে কখনো বাবুর্চ্চি রাখেন নাই। স্বাতীকে দেখুন। অত লেখা পড়া জানা, অত বড় লোকের মেয়ে, বিলাসের ক্রোড়ে প্রতিপালিত,—কিন্তু সেই পল্লীগ্রামের শশুরবাড়ীর প্রশংসা ধরে না। পল্লীগ্রামে গিয়ে খুব সুখ্যাতি নিয়েছে। স্বাতীর শশুরকে সামান্ত জমিদার বলে অবিচার করা হয়। বাড়ীতে চল্লিশখানা লাঙলের চায; অত বড় ঘর বাঙলার

খুব কম আছে। শুনছি স্বয়ং বড়লাট তাদের চাষ দেখতে যাবেন এমন কথাও উঠেছে।

বিভাস—চল্লিশখানা লাঙলের চাষ কিহে ?

ক্ষিতীশ—আমি বিবাহে গিয়াছিলাম। পরিবারে ১৪০ জন লোক। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপর চাষ ও সংসারের ভার। বাড়ীর পাঁচ ছয় জন উচ্চ রাজকর্ম্মচারী মাহিনার সমস্ত টাকা বাড়ীতে পাঠান। খরচের টাকা বড় ভ্রাতা ঠিক করে দেবেন। এক লবণ ও বস্ত্র ছাড়া কিছুই কিনতে হয় না। সব চাষে উৎপন্ন হয়। পুষ্করিণী-গুলি মৎস্যে পরিপূর্ণ। কৃষি প্রদর্শনীতে তাঁদের ফল ও শস্যই প্রথম পারিতোষিক প্রতি বৎসর পায়।

বিভাস—তবে ত ভাল। আমাদেরও দেশে চারখানা লাঙলের চাষ ছিল। সেটা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ধান যে এত দুর্ম্মূল্য হবে তা কে জানতো। যাক, তা হলে স্বাতী ভাল ঘরেই পড়েছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় লাহিড়ী সাহেব সাধারণের চক্ষে একটু খাটো হয়ে গিয়েছেন।

ক্ষিতী—সাধারণের বলা চলে না, কারো কারো চক্ষে। আমারত মনে হয়, অপর পক্ষে তিনি অধিকতর আদৃতই হয়েছেন। যখন বুঝলেন আমি হিন্দু, তখন হিন্দুসমাজের দাবী পূর্ণ মাত্রায় মিটিয়ে ব্রাহ্মণের মতই কাজ করেছেন। আমাদের বিলাতফেরৎদের দোষ, তাঁহারা সমাজের জন্য কিছুই ত্যাগ করবেন না, সমাজের গরজ হয় তাঁদিকে লউক, এই যেন তাঁদের ভাব। তাঁদের মাথা এতই উঁচু হয়ে পড়ে যে, সমাজের কাছে তা নত করতে যেন হেয় বোধ হয়।

(ধর্ম্মদাসের প্রবেশ)

ধর্ম্মদাস—বিভাসবাবু কবে বাঁকিপুর থেকে ফিরলেন।

বিভাস—সেখানে ৭ দিন ছিলাম। সে caseএর কথা বোধ হয় কাগজে পড়েছ।

ধর্ম্মদাস—কাগজেই ত পড়লাম, আজই আমি যে শ্রীখণ্ড গিয়াছিলাম, আজ এসেছি।

বিভাস—সেখানে কি আছে হে ? কোন কাজ ছিল নাকি ?

ধর্ম্মদাস—কাজ কি থাকবে ? শ্রীখণ্ডে কি আছে জিজ্ঞেস করছেন, জানেন না নাকি ? ও যে নরহরি ঠাকুরের পাট। আপনাদের দেশেই ত।

বিভাস—হাঁ, শুনেছি বটে, তবে তুমি যে দেখছি ভক্ত বৈরাগী হয়ে গেলে হে।

ধর্ম্মদাস—ভক্ত হবার ভাগ্য কোথায়। সত্যি শ্রীখণ্ডের ঠাকুরদের কি ভক্তি ! "নরহরি প্রাণ আমার গৌরাঙ্গ হে" বলে যখন সংকীর্ত্তন করেন তখন পাষাণও গলে যায়। মা ও সঙ্গে গিয়াছিলেন। আজ কাজ আছে, উঠি। আপনি কবে বাঁকিপুর থেকে ফিরলেন,—দেখা হয় নেই, তাই একবার দেখা করে যাই মনে করলাম।

বিভাস—অসংখ্য ধন্যবাদ।

দেখ ক্ষিতীশ, ধর্ম্মধাস এবার ডেপুটী হয়েছে। খুব ছোট বেলায় ওর বিবাহ হয়েছিল, সে স্ত্রী অনেকদিন মারা গিয়েছে। ওর সঙ্গে আমি ছায়ার বিবাহের সম্বন্ধ করতে চাই। কিন্তু ওঁর বাবা গোঁড়া হিন্দু, এখানে বিয়ে দিতে চান না ; আমরা অহিন্দুও নই। দেশ কালের মত মিলে মিশে থাকি এই দোষ। গ্রামের লোকও আমাদের উপর খাপ্পা। এই দেখ, আমাদের চণ্ডীমণ্ডপটা জ্বালিয়ে দিয়েছে, দোষ, এবার পূজাখানা হয় নাই। এই সব পল্লীগ্রাম থেকে কি সহানুভূতি আশা করা যায়, বল দেখি ?

চতুর্থ দৃশ্য

মণীশের কক্ষ

মণীশ, শিরীশ ও দুটী বন্ধু।

মণীশ—শিরীশবাবু, ছাত্রদের অবাধ্যতার ভাব ক্রমে ক্রমে রাজদ্রোহের ভাবে পরিণত হতে চললো। ইংরাজ গভরমেন্টের মত উহাদের গভরমেন্টের বিরুদ্ধে হস্ত উত্তোলন করা নিতান্ত অকৃতজ্ঞের কাজ। আমার মনে হয়, যারা কয়েকটা নিরীহ লোক হত্যা করে গভরমেণ্টকে ভয় দেখাবে মনে করে, তারা যেমন ভ্রান্ত তেমনি নির্ব্বোধ।

শিরীশ—"সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে"।

মণীশ—শিরীশবাবু যে একেবারে কেঁদে ফেললেন ? এমন সরল মাতৃভক্ত দেখিনি।

শিরীষ—আপনারা যুগান্তর পড়েন নি, তাই অবস্থা

বোঝেন না। আহা গত রাত্রে স্বপ্নে প্রতাপসিংহকে অশ্রুভারাক্রান্ত লোচনে বলতে শুনলেম—

"মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি"।

সমস্ত রাত কান্নাতেই কেটে গেল।

মণীশ—আপনি এক রকম স্বদেশী সন্ন্যাসী। রাজাকে ও স্বদেশকে যে একসঙ্গে ভালবাসতে পারা যায় সেটা ভোলেন কেন?

শিরীশ—ও সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞেসা করে আমায় কাঁদাবেন না। আমি অহোরাত্র চামুণ্ডার 'ভু খি হুঁই' শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

১ম বন্ধু—আপনি যে অবাধে গভরমেণ্টের নিন্দা করে যান, ভয় করেন না, তার কারণ কি? এটা যে রাজদ্রোহ।

শিরীশ—দেখুন, এ ক্ষণভঙ্গুর জীবনের প্রতি বিন্দুমাত্র মমতা থাকলে তা করতেম না। হিন্দুর ছেলে, জানি—"বাসাংসি জীর্ণানি—"

২য় বন্ধু—তা হলেও যারা এই শান্তির রাজ্যে অশান্তির বিষবৃক্ষ বপন করে তারা ভাল লোক হতে পারে না।

শিরীশ—"আমার যায় যাবে জীবন চলে"

(সহসা বিভাসের প্রবেশ)

বিভাস—শিরীশবাবু! প্রবেশ করেই বলছি, ক্ষমা করবেন, আপনাকে দেখে আমাদের বিপ্লববাদী বলে সন্দেহ হয়। অনুগ্রহ করে আর এখানে আসবেন না।

শিরীশ—যে আজ্ঞা, আমার কার্য্য হয়েছে, আমি চললাম।

[প্রস্থান

বিভাস—মণীশ আজকালকার দিনে ওসব লোকের সঙ্গে মিশো না।

মণীশ—না দাদা, ওঁকে ও রকম সন্দেহ করবার কোন কারণ নেই। ও একটা উদ্‌ভ্রান্ত মন নিয়ে স্বদেশের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ও ভ্রান্ত হতে পারে, কিন্তু ভাবের ত একটা মূল্য আছে, সেটা থেকে ওকে বঞ্চিত করা চলে না।

১ম বন্ধু—লোকটাকে 'আমি প্রায়ই কলেজ স্কোয়ারে ঘুরে বেড়াতে দেখি। এমনি উদাসীন যেন এক প্রেতাত্মা তার প্রিয়ের সমাধিক্ষেত্রে পাহাড়া দিচ্ছে।

২য় বন্ধু—একদিন এক পুলিশ কর্ম্মচারীর কাছে ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম। বোধ হয়, ক্ষমা ভিক্ষা করছিল। মুখে একটু হাসির রেখা তার হৃদয়ের সমস্ত সরলতাটুকুকে আকার দিচ্ছিলো।

বিভাস—হতেও পারে ও গোয়েন্দা, ওর বাক্‌-বিনিময়ের অভ্যন্তরে একটা কুটিলতা ও ভীতিপ্রদর্শনের ভাবই আমি দেখলেম।

সকলে—না তা কোন ক্রমেই হতে পারে না, লোকটার উপর অবিচার করা হবে।

[সকলের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

বিভাসবাবুর কলিকাতার বাড়ী

সশস্ত্র পুলিশ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত।

পুলিশ—এবাড়ীতে খানাতাল্লাসি হবে, এই সার্চ্চ ওয়ারেণ্ট। বাড়ীর মেয়ে ছেলেকে আলাদা ঘরে সরিয়ে দিন।

বিভাস—(Search warrant দেখিয়া) বেশ খানা-তাল্লাসি করতে পারেন, তবে তার পূর্ব্বে আপনাদের সঙ্গে কি কি আছে দেখতে চাই, অনেক স্থলেই এ নিয়ে গোল-যোগ হয়েছে, তাই এ সতর্কতা অবলম্বন করতে হলো।

পুলিশ—তাতে আমরা প্রস্তুত, আপনি দেখতে পারেন।

বিভাস—বেশ: এখন আপনারা খানাতল্লাসি। আরম্ভ করতে পারেন।

(অন্যান্য ঘর দেখিয়া মণীশের ঘরে প্রবেশ এবং টেবিলের ড্রয়ার হইতে যুগান্তর ও চিঠি বহিষ্করণ)

মণীশ—এ প্যাকেটই শিরীশবাবু রেখে গিয়েছেন, এটা তাঁর।

পুলিশ—যারই হ'ক, তাতে কিছু আসে যায় না। আপনার দেরাজে পেয়েছি সেটা কি অস্বীকার করতে চান?

মণীশ—না।

পুলিশ—(পত্রাদি পাঠ করিয়া) দেখুন বিভাসবাবু, আপনারা শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত লোক। এই গলিতেই ইনস্‌পেক্টর ঘোষের শোচনীয় হত্যা কাণ্ডের কথা শুনে থাকবেন। সে হত্যাকাণ্ডে আপনার ভ্রাতার যোগ থাকা সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ আছে, এই চিঠি দেখুন—এই শুনুন।

"মণী, তুমি যে বাঁশী দিয়েছ তার ফুৎকারেই পাবও শৃঙ্খনিনাদ করেচে।"

বিভাস—আমি জানি আমার ভ্রাতা নির্দ্দোষ, এ সেই শিরীশের কাজ। ভগবান অবশ্যই নির্দ্দোষীকে রক্ষা করবেন।

পুলিশ—নির্দ্দোষ হলে অবশ্যই মুক্তি পাবেন, কিন্তু এখন আমরা এঁকে নিয়ে যেতে বাধ্য।

বিভাস—হাঁ, নিয়ে যেতে পারেন। (মণীশের প্রতি) ভাই মণীশ, চিন্তিত হয়ো না, দুঃখ করো না, ভগবানে নির্ভর করতে শেখো। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। তুমি নির্দ্দোষী, ভয় করবার কিছুই নেই।

সত্যহরি—তোমার মা একবার দেখতে চাইছেন, মণীশকে কি দুই মিনিটের জন্য এঁরা ছাড়তে পারেন?

পুলিশ—তাঁকে এই পাশের ঘরে আসতে বলুন, উনি গিয়ে দেখা করবেন।

(মণীশকে ও পত্রাদি লইয়া পুলিসের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

গ্রাম—বকুলতলা

নিতাই—ওহে কমল, শুনেছ সত্যের ছেলে মণীশ খুনের মামলায় পড়েছে। এমনি বিগড়েছে যে, শুনছি নাকি পিস্তল হাতে করে 'রণং দেহি' বলে, পুলিসকে আহ্বান করেছিল। তাকে কি সহজে ছাড়বে? যত দোষ ওই সত্যর। হিন্দুধর্ম্ম হল জাগ্রত ধর্ম্ম, দেখ এ বৎসর মহামায়াকে না এনে কি বিপদেই না পড়ছে। এই যে গ্রামে বনে বাদারে আমরা মা মনসাকে প্রণাম করে চলচি ফিরছি, কখনো কি অনিষ্ট হয়েছে। ছেলেটার জন্য দুঃখ হচ্চে। হাজার হ'ক গাঁয়ের ছেলে, মা বাপের কাছে যেখানে থাকুক সুখে থাকুক।

কমল—আজ কাগজে দেখলাম, মণীশ খুনের মামলায় খালাস পেয়েছে। কিন্তু ভারতরক্ষা আইনে 'নান্নুর' থানায় অন্তরীণ করেছে।

নিতাই—কোথা নান্নুর, চণ্ডীদাসের পাট। সে যে অজ পাড়াগাঁ। মনীশ পাড়াগাঁয়ের উপর যে রকম চটা তা যে তার প্রাণদণ্ডের চেয়ে অধিক কষ্ট হবে। সে যে পাড়াগাঁর নামে ঘেমে ওঠে। আহা, তার সে কল্‌কাতার পেঁচানো ঘোড়ানো কথা সেখানে যে বুঝতেই পারবে না। যা হ'ক, কিন্তু বাহাদুরী আমাদের এই ইংরাজরাজের। সহরঘেষা ছেলেদিগকে কেমন পল্লীগ্রামের সৌন্দর্য্য উপভোগ করবার সুবিধা দিচ্ছে। এক সঙ্গে শাস্তি ও শিক্ষা। এত বুদ্ধি না ধরলে কি, বাপু, এত বড় রাজ্য চালাতে পারে?

বড় মা—নিতাই, শুনলাম সত্যের ছেলে খুনের মামলায় পড়েছে। আহা মা মঙ্গলচণ্ডী বাছাকে রক্ষা করুন।

নিতাই—বড় মা, সে খালাস পেয়েছে, তবে তাকে আটক রেখেছে।

বড় মা—তা রাখুক, যেখানে থাকুক বেঁচে থাকুক। তাদের এসময় একটা তত্ত্ব করা দরকার। না করলে ভাববে গাঁয়ের লোকে খবর নিলে না।

নিতাই—তারা খোজ না নিলেও আমরা ত মায়া কাটাতে পারব না, কি বলেন? (ক্রমশঃ)

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

মহাবিরাটের ভার

বিরাট বিশাল আকাশ বারিধি
হ্রদ নদনদী ধারা,
ধরিতে পারেনা তাঁহারে ভূধর
চন্দ্র সূর্য্য তারা
বিশ্বভরে বিশ্বের রথ
বহিতে কভু না পারে

মহাকাল মহা ব্রহ্মাণ্ডেও
তাঁহারে ধারিতে নারে।
লঘু হয়ে দীন ভক্তের হৃদি
করেছেন অধিকার
চিরদিন ভাই ভক্ত বহিছে
মহাবিরাটের ভার।

শ্রীকালিদাস রায়।

"খণ্ডব্রতী"

(গল্প)

[১]

সেদিন বাহিরে যখন প্রকৃতির তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছিল, সেই সময় ঘরের মধ্যে বিপিন একটু উত্তেজিতভাবে বলিল, "তুমি যাই বল না ললিত, আমি এ কথা কিছুতেই মানতে পারিনে যে, স্বাধীনভাবে নিজের জীবিকা ও স্ত্রীপুত্রের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহে সক্ষম হওয়ার পূর্ব্বে বিবাহ করাটা আমাদের উন্নতির পক্ষে একটা কঠিন অন্তরায় নয়। ম্যাল্‌থাস (Malthus)-এর "Doctrine of population" নিশ্চয়ই তুমি পড়েছ। তাতে তিনি কি বলেছেন? তাঁর সেই theory থেকে বাল্যবিবাহের যে বিষময় ফল আমরা infer ক'রতে পারি সে বিষময় ফল আমাদের এই অধঃপতিত দেশকে কি জর্জ্জরিত ক'রে তুলছে না?—সেই জন্যই আমি স্থির করেছি যত দিন না সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কলত্রপরিবারের ভরণ-পোষণে সক্ষম হই, ততদিন কিছুতেই বিয়ে ক'রব না। শুধু তাই নয়, যত দিন আমি আমার এই দুঃখদৈন্যনিপীড়িত দেশের কাজের সম্পূর্ণ যোগ্য না হ'তে পারি ততদিন আমি—তোদের কাছে ব'লতে আর লজ্জা কি—ততদিন আমি ঘোম্‌টা দেওয়া, মল পায়ে একটা ছোট মেয়েকে আমার পায়ের বেড়ি ক'রতে কিছুতেই রাজি নই। এ আমার প্রতিজ্ঞা। দেশ আগে না বিয়ে আগে ব'ল্ ত ভাই?"

সতীশ একটু মুচ্‌কি হাসিয়া গাহিতে আরম্ভ করিল—

"Time it is for Indian Regeneration
ছেড়ে দিয়ে আয় তোরা সব rotten avocation.
—এখন যদিও ভাতের কাঙ্গালী—রণে পিছপাও ছিল না
বাঙ্গালী
—প্রতাপ কেদার মোগলের সনে করেছিল ভীমরণ।
ছুটে আয় তোরা ছুটে আয় ওরে—
থাকিস্‌নে পড়ে থাকিস্‌নে দূরে;
বঙ্গসেনা দলে নাম লিখে কেন বেঁধেনে তোদের মন
Fulfiled হ'ল এতকাল পড়ে Queen's proclamation."

ললিত সতীশকে একটু ধমকাইয়া বলিল—"চুপ্ কর সতীশ।"

তার পর বিপিনের দিকে ঘুরিয়া বসিয়া বলিল—"দেখ্ বিপিন, শুধু একটা doctrine নিয়ে মাথা ঘামালে যদি তুই মনে করিস্ যে আমাদের এই পতিত জাতির উদ্ধার হ'বে, তবে তোর সঙ্গে আমার মতের মিল নেই। বাল্যবিবাহ খারাপ সেটা আমি মানি। স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ব্বাহ ক'রতে সক্ষম হওয়ার পূর্ব্বে বিবাহ করা অন্যায়—দেশের প্রতি, জাতির প্রতি, নিজের ভাবী স্ত্রীপুত্রের প্রতি অন্যায়—তাও আমি মানি। কিন্তু তাই ব'লে যদি তুই বলিস্ যে যতদিন না এই অধঃপতিত দেশকে উদ্ধার করবার যোগ্য হ'বি তত দিন বিবাহ করা অন্যায় তা হ'লে কথা আমি মানতে প্রস্তুত নই। আমি ত বিয়ে ক'রেছি;—তুই কি ব'লতে চাস্ যে যদি ইচ্ছা থাকে, তা হ'লে আমি বিয়ে ক'রেছি আর তুই বিয়ে করিসনি ব'লে, তুই আমার চেয়ে দেশের কাজের বেশি যোগ্য হয়েছিস্? যদি দেশের লোক তোর principle অনুসরণ ক'রে "চিরকুমার" পণে আবদ্ধ হয়, তা হ'লে ৫০ বৎসরের মধ্যে দেশের লোক যে প্রায় নিঃশেষ হ'য়ে যাবে। বর্ত্তমানে দেশ overpopulated ব'লে population এর উচ্ছেদের উপায় দুটি—ম্যাল্‌থাস্ (Malthus) যাকে Preventive ও positive check বলে গেছেন—সে দুটি পথ উন্মুক্ত রেখে population এর growth এর পথ একেবারে বন্ধ ক'রে দিলে দেশ থাকবে কাকে নিয়ে? হয়ত তুই ব'লবি আমি বিয়ে ক'রেছি ব'লে বিয়ের necessity এত বেশী ক'রে উপলব্ধি ক'রছি। কিন্তু তা নয়। আমার মোটা বুদ্ধিতে আমি যা বুঝি তাই বললুম। ভেবে দেখ্ আমি ঠিক ব'লেছি কিনা।"

সুরেশ বাধা দিয়া বলিল—"ললিত, এখানে তুই একটা ভুল ক'রলি। বিপিন এ কথা বলেনি' বিয়ে করাটাই অন্যায়। সে শুধু বলেছে যে যতদিন না সে দেশের কাজের

যোগ্য হয় ততদিন সে বিয়ে করাটা উচিত বিবেচনা করে না।”

বিপিন বলিয়া উঠিল—“ঠিক বলেছিস্ সুরেশ। বিবাহ জিনিষটাকেই আমি একেবারে উড়িয়ে দিতে চাই না। সব দেশ ও সব সমাজের জন্যই বিবাহ আবশ্যক। কিন্তু এও বলি, আমাদের দেশে এখন অনেক bachelor এর প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আমাদের এই দরিদ্র দেশের দরিদ্র অধিবাসীরা বিয়ে করেই কিছুদিন পরে স্ত্রী-পুত্র সংসার নিয়ে এত বিব্রত হ'য়ে পড়ে যে দেশের কোন কাজে যোগ দেওয়ার অবসর আর তাদের থাকে না। তাই আমি প্রতিজ্ঞা করেছি বিয়ে না ক'রে দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ ক'রব।

ললিত বাধা দিয়া বলিল—“দেখ্ বিপিন, তোর একথা আমি মানতে রাজ নই। সমস্ত সভ্যদেশের লোকেই বিয়ে ক'রে থাকে। বিবাহিত লোকের চেয়ে bachelorদের প্রয়োজন বেশী—বিবাহিত লোকের চেয়ে bachelorরা দেশের কাজে অধিক অগ্রগামী—কোন উন্নত দেশেই এ দৃষ্টান্ত আমি দেখতে পাই না। আর তোর ত বিবাহে আপত্তি থাকার কোন কারণই আমি দেখতে পাইনে। চাকুরী ক'রবার তোর কোন প্রয়োজন নেই। দেশের পক্ষে এখন যা প্রয়োজন সেই ব্যবসাতেই তোরা দু ভাই লেগে আছিস্। ঘরে অন্নের সংস্থান আছে। পরিবারের ভরণপোষণের কোন চিন্তা নাই। এ রকম অবস্থায় আমার বিশ্বাস তুই বিয়ে ক'র্লে, যদি তোর ইচ্ছা থাকে, তবে দেশের কাজে বিবাহটা তোর বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক হবে না।”

সতীশ একটু মুচ্কি হাসিয়া বলিল—“নাহে তা একটু হবে বৈকি? নূতন নূতন বিয়ের পর চাঁদের আলো, ফুলের হাসি, মলয় হাওয়া—এই সবের মাধুর্য্য অনুভব ক'রবার শক্তিটা এত তীক্ষ্ণ ও সরস হ'য়ে উঠে যে কিছুদিন আর কোন কাজে হাত দেওয়ার মত অবসর থাকে না।—তা কি বুঝলে বিপিন, সে ভাব বেশিদিন টেকে না। কিছুদিন গেলেই পায়ের পুরাণ চটির মত বিয়েটাও বেশ সহজ স্বাভাবিক হ'য়ে আসবে। তখন আর নূতন একটা কিছুর সঙ্গে পায়ের যে সংযোগ হয়েছে তা অনুভব ক'র্তে পার্ব্বিনে। নূতন চটি পরবার আগেও যেমনি স্বাভাবিক ভাবে চল্ছিলি তেমনি চ'ল্তে থাকবি

সুরেশ একটু কটাক্ষ করিয়া বলিল—“তাই বুঝি সতীশবাবু আজকাল punctualityর কাটাটাকে ঠিক জায়গায় রাখ্তে পারে না। প্রায়ই সেটাকে পিছনে ফেলে আসে?”

সতীশ একটু হাসিয়া বলিল,—“তা ভাই মিছে কথা ব'লে আর লাভ কি? তবে এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে এ ভাব বেশী দিন থাক্বে না। প্রিয়ামুখ সন্দর্শন-সুধা এখন আর ততটা মধুর ঠেকে না যতটা প্রথম প্রথম ঠেক্ত'। তাঁর নিত্য নূতন নূতন বায়নায় এখন এটুকু বেশ বুঝছি যে দেশের কাজের দিক থেকে না হোক্, অন্ততঃ নিজের পকেটের দিক থেকে বিচার ক'র্তে গেলেও বিয়ে করাটা একটু অন্যায়ই হয়ে গেছে।”

বিপিন একটু অন্যমনস্ক ভাবে বলিল,—“তোমরা যাই বল, আমাকে কিছুতেই নেওয়াতে পারবে না—আমি আমার প্রতিজ্ঞা ঠিক রাখ্ব। দেশের কাজের জন্যে—”

সতীশ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল,—“দেখিস্ দেখিস্, বিপিন অত জোর ক'রে গলাবাজি করে প্রতিজ্ঞা করিস্নে। অতখানি স্বার্থত্যাগ ক'রবার মত শক্তি তোর নেই।”

[২]

তর্কের কথাগুলি ওলোট পালোট করিয়া ভাবিতে ভাবিতে অনেক রাত্রে যখন বিপিন গৃহে আসিয়া পৌছিল, তখন মোহিনী গৃহকর্ম্ম প্রায় সমাধা করিয়া শয়ন ঘরের বাতিটি একটু কমাইয়া দিয়া, দরজার নিকট হাঁটুর মধ্যে মুখ গুজিয়া বসিয়া নীরবে সবে একটা নিদ্রার মোহময় আকর্ষণের বিরুদ্ধে ঘোরতর বিদ্রোহের প্রয়াস করিতেছিল। এমন সময় বিপিন আসিয়া ডাকিল,—“বৌদি।”

এক মুহূর্ত্তে মোহিনীর নিদ্রার আবিলতা কাটিয়া গেল। সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া একটু হাসিয়া বলিল,—“এই যে ঠাকুরপো! এত রাত্রি হ'ল! আচ্ছা, তোমাদের সভার সবাই কি তোমার মত চিরকুমার পণে আবদ্ধ নাকি?”

বিপিন এ কথায় একটু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—“কেন?”

মোহিনী বলিল,—"নইলে যাদের বাড়ীতে ফিরে জবাব-দিহি করবার আশঙ্কা থাকে তারা কি আর রোজ এত রাত্রে বাসায় ফিরতে সাহস করে?"

বিপিন বলিল,—"কেন, আমি কি এখন কচি খোকা, যে বাসায় ফিরতে দেরী হ'লে আমাকে জবাবদিহি ক'রতে হবে? কার কাছে জবাবদিহি ক'রব? তোমার কাছে?"

মোহিনী একটু হাসিয়া বলিল,—"আমার কাছে কেন? যার কাছে তোমাদের মত নব্য বাবুদের ক'রতে হয় তার কাছে। তোমার না হয় সে জবাবদিহি নেওয়ার লোক এখনও হয়নি; কিন্তু জিজ্ঞাসা কচ্ছিলাম যে তোমাদের সভায় কি সকলেরই তাই? না, তোমার দাদার মত গোয়ালও দুই একজনের আছে?"

বিপিন এবার হাসিয়া ফেলিয়া বলিল,—"কেন, দাদাকেও কি তোমার কাছে জবাবদিহি ক'রতে হয় নাকি?"

মোহিনী একটু মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল,—"তা একটু আধটু হয় বৈকি? তা যাক্। যা জিজ্ঞাসা করলাম তাই বলনা—তোমরা কি সবাই অবিবাহিত?"

বিপিন বলিল,—"না, তা হবে কেন? আমাদের হরিহর বাবুই ত' বিবাহিত;—আরও কয়েকজন আছে।"

মোহিনী,—"তা জিজ্ঞাস্ করি, তাঁরা কি তোমার চেয়ে কাজ কম করেন? তাঁরা যখন বিবাহিত তখন নিশ্চয়ই দেশের কাজে তাঁদের একটু শৈথিল্য দেখা যায়। কেমন, নয়?"

বিপিন,—"না, সে কথা ব'লতে পারিনে। তাঁরা সকলেই খুব উৎসাহী সভ্য।"

মোহিনী,—"আচ্ছা, তা হ'লে জিজ্ঞাসা ক'রতে পারি তোমার বিয়ে ক'রতে এত আপত্তি কেন? তোমার দাদাও ত' বলেন, অনেক সময় অনেক সাধারণ কাজে তাঁরও যোগ দিতে হয়। বিবাহিত ব'লে তাতে ত' তিনি কোন অসুবিধা বোধ করেন না।"

বিপিন,—"তিনি না ক'রতে পারেন। কিন্তু আমার মনে হয় বিবাহ করাটা একটা জঞ্জাল। আমাদের সম্মুখে এখন যে সমস্ত কাজ পড়ে রয়েছে, আমাদের নানাপ্রকার অভাব অভিযোগ পদে পদে তার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তারপর যদি আবার পায়ে একটা শিকলি পরিয়ে দি, তবে আর স্বাধীনভাবে হেঁটে বেড়াবার ক্ষমতাটুকুও থাকবে কি না সন্দেহ।"

মোহিনী একটু ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল,—"কেন আমরা কি তোমাদের কাজে শুধু প্রতিবন্ধকই জন্মাই? আর তাই যদি সত্যিই হয়, তা হ'লে সে দোষ কি ঠাকুরপো, যে ক্ষুদ্র বালিকা বধূ হয়ে গৃহে আসে তার, না তোমাদের? তোমাদের কি এতটুকু স্বাধীন স্বত্ত্বা নেই যে একটা ক্ষুদ্র বালিকাকে তোমাদের কার্য্যের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে দেবে? তা যদি হয়, তা' হলে তোমরা জাতের কোন কাজ করবার যোগ্য নও, একথা আমি জোর করে বলতে পারি।"

বিপিন বাধা দিয়া বলিল,—"বৌদি, এই তুমি একটা মস্ত ভুল করলে। বিবাহের ফল শুধু স্ত্রী মাত্রই নয়। তুমি ভুলে যাচ্ছ যে বিয়ে হলেই সন্তান হয়—পরিবার বৃদ্ধি হয়—সাংসারিক অনেক বিড়ম্বনা এসে ঘাড়ের উপর চেপে বসে।"

মোহিনী,—"সংসার ধর্ম্ম পালন করতে গেলে সে ত' হয়েই থাকে। তা'তে কি দেশের কাজের ক্ষতি হয়? সংসার ধর্ম্ম যদি ক'রতে না চাও, সাংসারিক কর্ম্মের ভারে যদি তোমরা নুয়ে পড়, তবে সংসার থেকে অনেক বড় যা'—সেই কাজ তোমরা ক'রবে কি ক'রে? সংসার নিয়েই ত' সমাজ। সমাজ নিয়েই দেশ—জাতি। সংসারকে বাদ দিলে জাতিকে কোথায় পাবে, দেশকে কোথায় পাবে? যদি এই সংসারধর্ম্ম করতে না চাও, তবে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ কর। কিন্তু সন্ন্যাসধর্ম্ম কখনও একটা দেশকে, একটা জাতিকে বজায় রাখতে পারে না—একথা ঠিক জেন? না, ঠাকুরপো, ও' সমস্ত পাগলামি ছেড়ে দাও। বিয়ে ক'রে একটি চাঁদপানা বউ ঘরে আন; আমরা দেখে সুখী হই।"

বিপিন উচ্চহাস্য করিয়া বলিল,—"চাঁদপানা, ও বাবা! একে ত' চাঁদের মুখখানা বিশ্রী রকমের গোল। তার উপর আবার বীভৎস ব্রণের দাগ। না, ও'তে আমি রাজি নই।"

মোহিনী হাসিয়া বলিল,—"না, তোমার সঙ্গে ত' কথায় পারবার যো নাই। যাই হোক, কি বল, বিয়ে ক'রবে ত'? ওঁকে বলি পাত্রী দেখতে?"

বিপিন মৃদু হাসিয়া বলিল,—"থেমে যাও বৌদি, থেমে

যাও। একেবারে অতখানি excited হয়ে প'ড়না। নইলে, তোমার উৎসাহের তাপ হঠাৎ এত বেশী হয়েছে যে আমার উত্তর শুনলে হয়ত হঠাৎ collapse হয়ে heart fail ক'রবে।"

মোহিনী, অন্যমনস্কভাবে বলিল,—"না, এ একেবারে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা—আচ্ছা দেখি কতদিন থাকে!"

[ ]

পরদিন সকালে উঠিয়া বিপিন যখন খবরের কাগজের পাতা উল্টাইতেছিল, সেই সময় মোহিনী হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিল,—"ঠাকুরপো, একটা কথা—শুভ খবর! কি বকশিশ্ দেবে আগে বল।"

বিপিন একটু আশ্চর্য্যভাবে বলিল,—"শুভ খবর! কিসের? কই, আমি ত' কিছুই বুঝতে পারছিনে।"

মোহিনী হাসিয়া বলিল,—"শুভ খবর, শুভ খবর—তোমার এক নিমন্ত্রণ এসেছে—এই দেখ।" এই বলিয়া একখানি চিঠি বাহির করিয়া দেখাইল।

খামের উপর বড় বড় গোটা গোটা করিয়া মেয়েলি অক্ষরে তাহারই নাম ও ঠিকানা লেখা ছিল। বিপিন দেখিয়াই বলিল,—"ও! মলিনা লিখেছে বুঝি?"

মোহিনী হাসিয়া বলিল,—"ঠাকুপো, এই মলিনাটি কে জিজ্ঞেস্ ক'রতে পারি? হঠাৎ এসে উদয় হলেন আমার ঠাকুরপোর হৃদয় গগনে?"

বিপিন কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল,—"যাও বৌদি! তুমি যে কি বল! মলিনা আমাদের হরিহরবাবুর বড় মেয়ে। আমাদের ললিতের সাথে তার বিয়ে হয়েছে। অনেককাল তাদের সাথে দেখা হয় না।"

মোহিনী বলিল,—"তা বেশত', যাওনা আজই একবার দেখা ক'রে এস না। এই দেখনা, তোমাকে সন্ধ্যের সময় আজ একবার যেতে লিখেছে।"

বিপিন একটু অন্যমনস্কভাবে বলিল,—"আচ্ছা দেখি।"

[৪]

ঠিক সন্ধ্যার সময় বিপিন যখন হরিহর বাবুর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন শোভা হারমনিয়ম বাজাইয়া গাহিতেছিল—

"তোমার পরাণে পরাণ সঁপিব
নন্দন কাননে চন্দন পবনে
কুসুম শয়ন যতনে রচিব।
নয়নে নয়নে গোপনে গোপনে,
মেঘের পিছনে চাঁদের কিরণে
স্বপন মিলনে ভুবনে ভ্রমিব।"

সে গানের মধুর মূর্চ্ছনা বিপিনের কাণে সত্যই কি যেন এক নবীন স্বপ্নরাজ্যের কুজ্‌ঝটিকা বিস্তার করিয়া দিল। অনেকক্ষণ সে স্তব্ধ হইয়া বাহিরেই দাঁড়াইয়া রহিল।

মলিনা আসিয়া বলিল,—"শোভা, তোর কি গান ছাড়া দুনিয়ার আর কোন কাজ নেই?"

শোভা হারমনিয়ম বন্ধ করিয়া একটু মৃদু হাসিয়া বলিল,—"কি আর কাজ থাকবে দিদি? জল তোলে বাসন মাজে ঝি, রাঁধে বামুন, অন্যকাজ রামদীন বেয়ারাই সব করে শুধু খাওয়া দাওয়া, ঘুমুন আর সময়ে অসময়ে গান—এ ছাড়া আমি ত' আর কোন কাজ খুঁজে পাই না দিদি।"

মলিনা বলিল,—"তাই কি? এ ছাড়া কি দুনিয়ায় আর কাজ নাই? দেখ্‌তে পাস্ এঁরা কত কাজ করেন। দেশের কাজে দশের কাজে এঁদের যোগ্য না হ'তে পারলে আমাদের স্থান কোথায়?"

শোভা হাসিয়া বলিল,—"ও! তুমি ললিতবাবুর কথা ব'লছ? তুমি ত' তাঁদের কত কাজ করতে দেখ। আমি কিন্তু শুধু ঘরের খেয়ে বনের মহিষ তাড়ান ছাড়া তাঁদের আর কোন কাজই দেখ্‌তে পাইনে। বাঙ্গালীরা কাজ করে মানে আমি ত' এই বুঝি যে তারা হয় ওকালতী নয় ডাক্তারী ব্যবসা অথবা চাকরী করে। দশটায় খেয়ে পেণ্টুলনের বোতাম আঁটতে আঁটতে আফিসে যায়—আর ৫টায় চিনির বলদের মত গা ছেড়ে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাসায় ফিরে আসে। এই ত' বাঙ্গালীর কাজ। কই এঁরা ত' এর কিছুই করেন না।"

মলিনা,—"তুই এখনও একেবারে ছেলেমানুষ। উঁরা বলেন আমাদের দেশে প্রত্যেক মেয়ের উচিত ঘরে বসে চরকা দিয়ে সুতো কাটতে শিক্ষা করা। আমি একটা কেমন নূতন চরকা এনেছি দেখ্‌বি আয়।"

শোভা বলিল,—"তুমি দেখগে—আমার ওসবটাতে

দরকার নেই। ওসব উপদেশ তোমার জন্য হতে পারে, কিন্তু আমার জন্য নয়। কি হবে ও ক'রে? দেশে কি "মিল্" নেই? সুতো কাট্‌বার, কাপড় তৈরি কর্‌বার কল নেই?—দিদির যেমন—ললিতবাবু বিপিনবাবুর কাছ থেকে এক একটা শুনে আসে, আর সেই হুজুগে নাচ্‌তে থাকে।"

মলিনা বলিতে যাইতেছিল,—"তুইও একদিন এমনভাবে নাচ্‌বি"—এমন সময় সম্মুখে বিপিনকে দেখিয়াই হাত তুলিয়া ছোট্ট একটা নমস্কার করিয়া বলিল,—"আসুন বিপিনবাবু—বাঃ, আপনি বাহিরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন?"

বিপিন একটু অপ্রস্তুত হইয়া কহিল,—"না—এই—আপনাদের কথাবার্ত্তা শুনছিলাম।"

মলিনা হাসিয়া বলিল,—"এইবার বেশ হয়েছে—শোভা আমার সাথে খুব পারে—এখন বিপিনবাবুর সাথে বোঝ—আমি চল্‌লাম।"

শোভা তাহার আয়ত চক্ষুদুটি একবার বিপিনের উজ্জ্বল মুখের উপর ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ আবার ফিরাইয়া লইল। তারপর মাটির দিকে তাকাইয়া আঙ্গুলের নখে আঁচলের এক প্রান্ত খুটিতে খুটিতে জিজ্ঞাসা করিল,—"আচ্ছা, আপনি কি বলেন—"

বিপিন বাধা দিয়া বলিল,—"আমি নিজে কিছুই বলিনা—যা শিক্ষা পেয়েছি তাই বল্‌তে পারি।"

শোভা বলিল,—"আমি বল্‌ছিলাম কি যে কোন লোক চাকুরী কর্‌লেই কি দেশের কাজের একেবারে অযোগ্য হয়ে উঠে? দেশের কোন কাজে হাত দেওয়ার আর তার অধিকার থাকে না?"

বিপিন একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল,—"না, না, ঠিক্ তা নয়। তবে কি জানেন, পরের চাকর হ'লে পরের কাজেই সমস্ত সময় নিয়োজিত ক'র্‌তে হয়—অন্য কাজের অবসর থাকে না। ইউরোপে অবশ্য চাকুরী করেও অনেক লোক দেশের অনেক কাজ করে থাকে। কিন্তু সেখানে তা'রা তাদের নিজেদেরই চাকর। কিন্তু আমাদের দেশে তা নয়। আমরা পরের চাকর।"

শোভা কহিল,—"তা হ'লে ত' বড় মুস্কিলের কথা। আচ্ছা, আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে শতকরা ৯০ জনই ত' চাকুরী করেন। শতকরা যে দশজন থাকে, তাঁদের মধ্যেও অনেকের প্রবৃত্তি দেশের কাজের দিকে ঝোঁকে না। তা হ'লে ত' এ দেশের কোন উপায়ই নাই।"

বিপিন শোভার নিতান্ত ছেলেমানুষি উৎকণ্ঠা দেখিয়া একটু মৃদু হাসিয়া বলিল,—"এক পক্ষে তা ঠিক। কিন্তু দেশের লোকে চাকুরী করে কেন? অন্য কোন উপায়ে অন্নসংস্থানের পন্থা তারা হারিয়ে বসেছে বলে। সেই পন্থা যখন তারা জান্‌তে পার্‌বে, সেই পন্থা যখন তারা অবলম্বন ক'র্‌বে, তখন তাদের আর চাকুরী করবার দরকার হবে না।"

শোভা,—"সে পন্থাটা কি তাকি কেউ জান্‌তে পারেনি? আপনারা যদি জান্‌তে পেরে থাকেন, বলে দিন না?"

বিপিন বলিল,—"এটা ত' শুধু বল্‌বার জিনিষ নয়। বুঝ্‌বার জিনিষ—প্রাণে প্রাণে অনুভব কর্‌বার জিনিষ। যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের দেশের লোক ঠেকে না শিখ্‌বে, ততদিন পর্য্যন্ত সহস্র ব্যক্তি একত্রে চিৎকার ক'রে গলা ফাটিয়ে দিলেও তাদের হুস্ হবে না। আমাদের দেশে যদি স্বচ্ছন্দ অন্নের সংস্থান থাক্‌ত', তা হ'লে সে স্বতন্ত্র কথা ছিল। কিন্তু পেটের জন্যে যখন সকলকে দিন রাত ছট্‌ফট্ করে বেড়াতে হয়, তখন দেশের চিন্তা ব্যবসা বাণিজ্যের কথা তাদের মনে কিছুতেই উঠ্‌তে পারে না। এজন্য তাদেরও ঠিক দোষ দেওয়া যেতে পারে না।"

শোভা বলিল—"আচ্ছা, আপনারা যে বলেন ব্যবসার উপর আমাদের দেশের উন্নতি নির্ভর কর্‌ছে—তা' না হয় মানলুম; কিন্তু ব্যবসা কর্‌তে ত' প্রচুর অর্থের দরকার—সে মূলধন (Capital) আমাদের দেশে আস্‌বে কোত্থেকে?"

বিপিন—"Capital আমাদের দেশে যে একেবারে নেই—এ কথা আমি মান্‌তে রাজি নই। শুধু প্রবৃত্তির প্রয়োজন। আমাদের দেশে প্রায় সকলেই গরীব বটে; কিন্তু বড় লোকও দুচার জন আছেন। তাঁদের যদি প্রবৃত্তি হয় তা হ'লে তাঁরা ব্যবসায় অনেক টাকা খাটাতে পারেন। এতে তাঁদের নিজেদের লাভও হয়, আর তা ছাড়া বহু গরীব লোকেরও অন্ন সংস্থান হয়।"

শোভা—"আপনি কি তা হ'লে বল্‌তে চান্ যে এই

দুষ্টিমেয় ধনী আমাদের দেশের এই বিরাট জনসংঘের দারিদ্র্য মোচন করতে পার্বেন ?

বিপিন—"আমি একথা বলি না যে এই কয় জন বড় লোকেই আমাদের দেশের এই কার্য্য সাধন ক'র্তে পার্বেন। তবে আমি বলি যে সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে বড় লোকের দ্বারাই দেশের সবিশেষ উপকার হয়ে থাকে। তাই জর্ম্মানিরা আজকাল দেশে বড় লোক সৃষ্টি করবার বেশ একটা উপায় ঠিক করেছে। তারা এটা বেশ বুঝেছে যে দেশে বড় লোকের দ্বারাই সব চেয়ে বেশি উপকার হয়ে থাকে। এই জন্য দেশে বড় লোকের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পায় ততই মঙ্গল।"

শোভা—"কি ক'রে তারা একাজ করছে ?"

বিপিন—"জার্ম্মানিতে আজকাল অনেক Lottery centre খোলা হয়েছে। প্রত্যেক centre এ যে প্রথম পুরস্কার পাবে, সে এক কোটি না দেড় কোটি টাকা পাবে। এমনি ক'রে প্রত্যেক বৎসরেই অন্ততঃ পাঁচ ছয় জন করে কোটি পতি তৈ'রী হবে।"

শোভা—"বেশত', তবে আমাদের দেশেও কেন এমনি ব্যবস্থা করা হয় না ?"

বিপিন—"আমাদের ঘরে অন্নের সংস্থান নেই—টিকিট কে কিনবে ? তা ছাড়া আমাদের দেশে প্রবৃত্তি নেই। আমাদের দেশের বড় লোকের মধ্যে প্রথম প্রবৃত্তি জন্মাতে হবে, তার পর অন্য কথা।"

শোভা—"আপনি শুধু বড় লোকদের কথাই বল্‌ছেন ; মধ্যচিত্ত, গরীব লোকরা তা হ'লে কি ক'র্‌বে ? তারা কি তা হ'লে দেশের কোনই উপকার করতে পারে না ? শুধু বড় লোকের কবে প্রবৃত্তি হবে, সেই আশায় চাতকের মত উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে থাক্‌বে ?"

বিপিন—"না আমি তা বলি না। ইতিমধ্যে মধ্যবিত্ত ও গরীব লোকরাও তাদের ক্ষমতানুযায়ী কাজ ক'র্‌বে। সব কাজেই Co-operation চাই ; নইলে কিছুই সম্ভব নয়।"

শোভা—"তাদের ক্ষমতা কি আছে বলুন ?"

বিপিন—"ক্ষমতা ও কাজ তাদের অনেক আছে, যদি তারা করে। আর একটা দিকে আমাদের সকলের লক্ষ্য রাখা উচিৎ—সেটা হচ্ছে আমাদের দেশের যে আদিম যন্ত্র ব্যবসায়াদি ছিল সে গুলিকে আবার জাগিয়ে তুলতে হবে। প্রত্যেকেই এ বিষয়ে কিছু কিছু সাহায্য কর্‌'ত পারে যদি তাদের এতে প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু আমাদের সভ্যতা আজকাল এমনভাবে বেড়ে চলেছে যে দেশের সমস্ত জিনিষের উপরই আমাদের একটা ঘৃণাভাব জেগে উঠেছে।"

শোভার বুকের মধ্যে দ্রুত স্পন্দন জাগিয়া উঠিল ; সে ভাবিল একি তাহারই উপর কটাক্ষ !

[৫]

সে দিন বিপিন চলিয়া গেলে শোভা অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাহার কথাগুলি সমস্ত ওলোট পালোট করিয়া ভাবিল। বিপিনের কথাগুলি ভাবিতে ভাবিতে তাহার আবল্য সংস্কার দুই একবার সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু তাহার কথাগুলি আগাগোড়াই যে একটা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহা অস্বীকার করিবার মত ক্ষমতা তাহার ছিল না। পূর্ব্বেও সে অনেকের সাথে অনেকদিন তর্ক করিয়াছে। কিন্তু তখন তাহার মতের বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিলেই শোভা চটিয়া যাইত। কিন্তু আজ বিপিনের সহিত তর্কে সে কোন কথাই বলিতে পারিল না ; শুধু তাহারই মত মানিয়া লইয়া তাহারই মতের সমর্থন করিয়া বসিল। তখন সে চিন্তা করিবার অবসর পায় নাই ; এখন ভাবিল,—যতই ভাবিল, ততই আশ্চর্য্য হইল। কিন্তু আজ তাহার রাগ হইল না—একটা অজ্ঞাত পুলক হিল্লোলে সে মাঝে মাঝে শিহরিয়া উঠিতেছিল।

বিপিন যখন বাড়ী ফিরিল,—মোহিনী আসিয়া হাতমুখ ধুইবার জল দিয়া যায়গা করিয়া তাহাকে খাওয়াইতে বসাইল। একখানি পাখা হাতে করিয়া তাহারই কাছে বসিয়া মোহিনী দুই একটি করিয়া বিপিনের নিকট হইতে অনেকগুলি কথা বাহির করিয়া লইল।

শোভার গল্পে বিপিন আজ একেবারে মাতিয়া উঠিয়াছিল। সে বলিল—"সত্য বল্‌ছি বৌদি, আমাদের দেশের মেয়েরা যে দেশের কথায় এতদূর উৎসাহিত হইতে পারে এ ধারণা আমার ছিল না। শোভার মত মেয়ে যে দিন আমাদের ঘরে ঘরে জন্মাবে, সে দিন আমাদের দেশ একটা

বিরাট উল্কাপিণ্ডের মত জেগে উঠ্বে। সে কি সুখের দিন বৌদি, ভাব্তেও আমার আনন্দে গা শিউরে উঠ্ছে।"

মোহিনী একটু মৃদু হাসিয়া মনে মনে বলিল, "এইবার ঔষধে ধরেছে।" মুখে বলিল—"আচ্ছা ঠাকুর পো, শোভা মেয়েটি দেখ্তে শুন্তে কেমন? আমার একবার তাকে দেখ্তে ইচ্ছে হয়।"

বিপিন উত্তেজিত ভাবে বলিল, "খুব সুন্দর বৌদি, খুব সুন্দর! কিন্তু এ সৌন্দর্য্যের মধ্যে একটুকুও গার্ব্বিত ভাব নাই। চোখে মুখে সব সময়ই যেন তার একটা কোমল ভাব ছড়িয়ে রয়েছে। তুমি তাকে নিশ্চয়ই খুব পছন্দ করবে।" বলিয়াই বিপিন একটু অপ্রস্তুত হইয়া আবার বলিল,—"যদিও তোমার পছন্দের জন্য কিছু এসে যাচ্ছে না। তোমায় ত আর তাকে নিয়ে কোন দিন ঘর করতে হবে না।"

মোহিনী একটু হাসিয়া বলিল—"তা কি বলা যায় ঠাকুর পো? ভগবানের ইচ্ছা কোন দিক থেকে পূর্ণ হয় তা যদি তুমি আমি বুঝ্তে পার্বো। সে যাক্, চলনা এক দিন আমাকে নিয়ে ঠাকুর পো।"

এ কথায় বিপিনের কাণ দুইটা লাল হইয়া উঠিল। আজ আর সে কোন প্রতিবাদ করিল না। শুধু মৃদুভাবে বলিল, "আচ্ছা, দেখি।"

এর পর বিপিন আর কোন কথা বলিল না। নীরবে আহার সমাধা করিয়া আপনার বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

[৬]

নিউটনের আকর্ষণ বিকর্ষণ সূত্র বোধ হয় মনোবৃত্তিতেও প্রযোজ্য। সে দিন শোভার সহিত দেখা হওয়ার পর হইতেই বিপিনের বিভিন্ন হৃদয় বৃত্তিগুলির ভিতর একটা বিপ্লব চলিতেছিল। একদিকে শোভাকে পুনরায় দেখিবার জন্য একটা আকর্ষণ তাহাকে অদম্যভাবে তাহাদের বাটীর দিকে টানিতেছিল, অন্যদিকে তাহার এই দুর্ব্বলতাটা তাহার নিজের নিকটই ধরা পড়িয়া তাহাকে শোভার প্রতি বিমুখ করিয়া তুলিতেছিল। হয় ত এ আকর্ষণের সমতা রাখিয়া সে স্বস্থানে ঠিক থাকিতে পারিত; কিন্তু যৌবনের তাড়নায় তাহা ঘটিয়া উঠিল না। আকর্ষণের বেগ ক্রমশই বাড়িয়া চলিল; এবং অবশেষে একদিন বিপিন মোহিনীকে সঙ্গে করিয়া অনাহূত ভাবেই হরিহরবাবুর অন্তঃপুরে আসিয়া পৌঁছিল।

বিপিন যখন জলযোগে বসিয়াছিল—সম্মুখে মোহিনী ও মলিনা বসিয়াছিল ও তাহারই একটু দূরে একটা চৌকির পার্শ্বে আপনাকে আংশিক আবৃত রাখিয়া শোভা বসিয়াছিল।

মোহিনী বলিল,—"আমার এই ঠাকুরপোটির মুখে দিদি, তোমাদের প্রশংসা আর ধরে না। ওর মন পাওয়া শক্ত—আমি এত করেও পেয়েছি কিনা জানি না। তাই ভাবি, তোমরা কি যাদু মন্ত্রে ওকে বশ করেছ।"

মলিনা হাসিয়া বলিল, "সেটা ওঁর নিজের গুণে। উনি নিজে আমাদের স্নেহের চক্ষে দেখেন তাই আমাদের প্রশংসা করেন। ওর ক্ষমতাও বড় কম নয়। আমার এই বিদ্রোহী বোনটিকে তর্কে কেউ এতদিন পরাস্ত ক'র্তে পারেনি; কিন্তু সে দিন যে উনি কি ভাবে আমার এই বোনটিকে সুমতি দিয়ে গেছেন তা আমি এখনও বুঝ্তে পারি নি। আগে ওদের সভার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করার জন্য শোভা সর্ব্বদা উন্মুখ হয়ে থাকত। কিন্তু কাল ও স্বীকার করেছে যে ওদের সভায় একটা সত্যিকারের ভিত্তি আছে। কাজ কতদূর হয় তা না জান্লেও ওদের উদ্দেশ্য যে মহৎ এবং তাতে যে সকলেরই সহানুভূতি থাকা উচিত, তা' ও স্বীকার করে নিয়েছে। এমনটি কিন্তু ওকে দিয়ে আগে কিছুতেই সম্ভব হ'ত না।"

বিপিন উৎসাহের সহিত বলিল,—"দেখুন, এটা আপনি নিরর্থক ওঁকে নিন্দা করছেন। সেদিন ওঁর শিক্ষার স্পৃহা ও উপলব্ধি ক'র্বার ক্ষমতা দেখে সত্যই আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। দেশের প্রতি ওঁর যে আন্তরিক একটা মমতা আছে তা আমি সেদিনই টের পেয়েছি। এ সব কাজে যে ওঁর উৎসাহ আছে তা' জেনে আরও সুখী হলুম। এঁরা ইচ্ছে করলে দেশের কাজে পুরুষের যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন।"

অসাবধানে চৌকির উপর শোভার হাত পড়িয়া হাতের সোণার চুড়িগুলা শিঞ্জন করিয়া উঠিল। লজ্জায় তাহার কর্ণমূল পর্য্যন্ত রাঙাইয়া গেল।

বিপিনের বক্তৃতায় উৎসাহে মোহিনী মনে মনে হাসিতেছিল। সে শোভার দিকে ফিরিয়া হাসিয়া বলিল,—"এটা তোমার পক্ষে কম গৌরবের কথা নয় বোন্। আমার এই ঠাকুরপোটির চিরকাল থেকেই স্ত্রীজাতির উপর একটা বিশেষ বীতস্পৃহা ছিল। স্ত্রীলোকে নাকি পুরুষের সকল কাজেই অন্তরায় মাত্র, এই এতদিন ওর ধারণা ছিল। তুমি যে ওর এই ভুল ধারণা ভেঙে দিতে পেরেছ এতে আমি খুব খুসী হয়েছি; আরও খুসী হই যদি তুমি ওকে একেবারে গৃহী হওয়ার যোগ্য করে দিতে পার। স্ত্রীজাতি পায়ের বেড়ি মাত্র এই ওর ধরণা; সেই স্ত্রীজাতিরই একজন জীবনের কাজে সব চেয়ে ওর বড় সহায় হয়ে দাড়াবে—তাই দেখ্‌লে সত্যই আমি বড় আনন্দিত হই। আর ওর মনের সে পরিণতি দিতে বোধ হয় একমাত্র তুমিই পারবে শোভা—"

মোহিনী অনেকদূর গিয়াছিল। শোভা হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া অন্যদিকে চাহিয়া বলিল—"আমি নীচে গেলুম দিদি, রাঁধবার জিনিষ গুছিয়ে দিতে হবে।"—বলিয়াই আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে দ্রুতপদে গৃহের বাহির হইয়া গেল।

[৭]

হিতে বিপরীত ঘটিল। সেদিন মোহিনীর কথায় শোভার মনে একটু বেসুরা ভাব জাগিয়াছিল। সে ভাবিতে লাগিল,—"সত্যই কি তাই? স্ত্রীলোক কি সত্যই পুরুষের পায়ের বেড়ি মাত্র;' সব কাজে অন্তরায় মাত্র—সে শুধু বাধা দিতেই জানে—পরামর্শ দিতে—সাহায্য করতে কেউ নয়? কই মলিনা ত' ললিতের কাজে কোন অন্তরায় হয় না—বরঞ্চ আপনার অল্পবুদ্ধি, অল্প সামর্থ্য নিয়ে যতটুকু সম্ভব সমস্ত কাজেই তাঁকে সহায়তা করে। গৃহে নারীই ত' সব—পুরুষকে ত' সমস্ত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তার উপরেই নির্ভর করিতে হয়। বাহিরের কার্য্যেও ত' নারী পুরুষকে সৎপরামর্শ বই অসৎ পরামর্শ দেয় না। স্বাধীনতা পাইলে, ক্ষমতা থাকিলে সাহায্যও ত' সে করিয়া থাকে। তবে বিপিন ওরূপ বলে কেন? এটা তাহার দম্ভ মাত্র—স্ত্রী জাতির উপর তাহার এ ঘৃণা তাহার গর্ব্বিত স্বভাবের পরিচয় মাত্র। এ গর্ব্বের—এ অবিচারের প্রশ্রয় দেওয়া যায় না।"—শোভার মন বাঁকিয়া বসিল; সে ঠিক করিল আর বিপিনের সহিত মিশিতে গেলে সে তাহার নিকট হেয়, অবজ্ঞের ও কারুণ্যের পাত্রী বলিয়া বিবেচিত হইবে। সুতরাং সেই দিন হইতে সে বিপিনের নিকট হইতে সাবধানে আপনাকে দূরে রাখিতে লাগিল।

এদিকে বিপিনের মনে ঘুন ধরিয়াছিল। সে ভাবিতেছিল সত্যই কি নারীর স্থান মনুষ্য-সমাজে পুরুষের চেয়ে এত নীচে? তাহারা কি সমাজেরই একটা দিক নয়? পুরুষ যদি পুরুষের মত হয়—যদি সে নারীকে তাহার সমান করিয়া লইবার চেষ্টা করে, অথচ নিজের স্থান অক্ষুণ্ণ রাখে, তবে কি উভয় পক্ষেরই কর্ম্মে অনেক সহায়তা হয় না? সত্য বটে সংসারী হইলেই সংসারের অনেক বিড়ম্বনা আসিয়া জুটে। কিন্তু তাই বলিয়া নারীকে বাদ দিলেও ত' সংসার চলে না। সমাজে যখন তাহাকে একান্তই প্রয়োজন তখন তাহাকে শিক্ষার ও স্বাধীনতার মহিমায় মণ্ডিত করিয়া তাহার স্থান পুরুষের সহিত একাসনে দিলে হয়ত সে প্রতিবন্ধক না হইয়া সর্ব্ব কর্ম্মে সহায় হইয়া দাঁড়াইতে পারে।

বিপিনের ভাবপ্রবণ চিত্ত একবার যখন শোভার দিকে উন্মুখ হইয়া উঠিল, তখন আর তাহাকে ঠেকাইয়া রাখা বিপিনের পক্ষে সম্ভব হইল না। সে অতি শীঘ্রই আর একদিন কোন কাজের অছিলায় মলিনার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু যাহার জন্য আসা তাহাকে সে দেখিতে পাইল না। বিপিন আসিতেই শোভা গিয়া নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করিল ও মলিনার পুনঃ পুনঃ ডাকিতে ঝিকে দিয়া বলিয়া পাঠাইল তার বড় মাথা ধরিয়াছে, সে উঠিয়া আসিতে পারিবে না,—বিপিনবাবু যেন তাকে ক্ষমা করেন।

শোভার অনুপস্থিতি বিপিনকে পীড়া দিল। কিন্তু তাহারই অনতিদূরেই কোথাও যে শোভা আছে ইহাতেও তাহার মন একটা অজানা পুলকে থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। সে মলিনার নিকট তাহাকে উদ্দেশ করিয়াই অনেক কথা বলিয়া যাইতেছিল; কিন্তু নারী চরিত্রের যে নূতন চিত্র তাহার চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহারই একটা আভাস তাহার বক্তব্যের ভিতর দিয়া নবীন উৎসাহে প্রস্ফুটিত হইয়া যেন আপনাকে আর কাহার উদ্দেশ্যে

নিবেদন করিয়া দিতেছিল। সে বলিল,—"দেখুন, নারী-চরিত্রটা এতদিন যে সম্পূর্ণভাবে আমার নিকট পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি, তার কারণ এতদিন আমার ধারণা ছিল গৃহের কার্য্যে ছাড়া সমাজে নারীর আর কোন স্থানই নাই। আর সেই গৃহের কার্য্যেও তাহাদের স্থান খুব উঁচুতে বলে আমার ধারণা ছিল না। আমি মনে ক'রতুম সে পুরুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের একটা উপাদান মাত্র। সে পুরুষকে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারে, উৎসাহ দিতে পারে না, শক্তি দিতে পারে না। পুরুষ নিজের সবল সতেজ আগ্রহে অগ্রসর হতে গেলে নারী তার দুর্ব্বলতা, তার সঙ্কীর্ণতা দিয়ে তাকে পিছনে টেনে রাখে। বিবাহিত জীবন আগে আমার নিকট বিড়ম্বনা মাত্র মনে হত,—মনে হ'ত তা'তে যেন মানুষের মনুষ্যত্বটুকু লোপ পেয়ে যায়; মনের তেজ, কর্ম্মে উৎসাহ বিপদে ধৈর্য্য সব তা'তে কমে যায়। কিন্তু কি জন্যে জানি না—আমি আজ ক'দিন ধরে এ বিষয়ে অনেক ভেবেছি। ভেবে দেখ লুম, এতদিন কি একটা অন্ধভ্রমে ঘুরে মরছিলুম। নারীর একটা অভিনব মহিমামণ্ডিত চরিত্র এতদিন পর আমার নিকট ধরা পড়ে গেছে—আমি জেনেছি নারীকে শিক্ষা দিলে—তার যোগ্য অধিকার তাকে দিলে সে পুরুষের যোগ্য হয়ে উঠ্‌তে পারে এবং তাতে একদিকে পুরুষের জীবনও যেমন সম্পূর্ণ সার্থক হয়ে ওঠে, সমাজও তেমনি উপকৃত হয়। কেমন ক'রে কোনদিন থেকে যে এ গোপন সত্যটা আমার কাছে ধরা পড়েছে, তা' আমি এখনও ঠিক ক'রতে পারিনি।"

বিপিন আরও বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ ঘড়ির দিকে দৃষ্টি পড়ায় বলিল—"ও, কথায় কথায় রাত ১০টা বেজে গেছে তা জান্‌তে পারিনি। আচ্ছা, আজ তা' হলে আসি।" বলিয়া নমস্কার করিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

মলিনা প্রতিনমস্কার করিয়া বলিল—"আপনার কথাগুলি শুন্‌তে সত্যিই বড় আনন্দ হয়। আবার শীগ্‌গির একদিন আস্‌বেন কিন্তু।"

"আচ্ছা, আস্‌ব।" বলিয়া বিপিন গৃহের বাহির হইয়া গেল।

বিপিন বলিয়া গেল, নারী চরিত্রের এ অভিনব তথ্যটা কবে কিরূপে তাহার নিকট ধরা পড়িয়াছিল তাহা সে জানে না। সে না জানুক, মলিনার কিন্তু তাহা বুঝিতে বাকি রহিল না। বিপিন চলিয়া গেলে সে ছুটিয়া শোভার কক্ষের দরজার নিকট দাঁড়াইয়া বলিল "শোভা, শোভা, একটা নূতন কথা শুন্‌তে চাস্?—সুসংবাদ—বখ্‌শিস্ কি দিবি বল?" শোভা হাসিয়া বলিল—"কি খবর শুনি।"

মলিনা তাহার কাণের কাছে মুখ লইয়া বলিল,—"বিপিন বাবু তোকে ভাল বাসেন।"

শোভা আরক্তিম গণ্ডে দিদিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল,—"দূর!"

[৮]

সত্য হউক, মিথ্যা হউক কথাটা গোপন রহিল না। মলিনা আনন্দের আতিশয্যে ললিতের নিকট কথাটা ব্যক্ত করিয়া ফেলিল এবং ক্রমে ক্রমে মোহিনীর নিকটও এই গোপন কাহিনীটি প্রকাশ হইয়া পড়িল। সে দিন বিপিন তাহার ঘরে বসিয়া একখানা ইংরাজি উপন্যাস পড়িতেছিল, এমন সময় মোহিনী আস্তে আস্তে পা টিপিয়া গৃহে প্রবেশ করিল এবং বিপিনের চেয়ারের পার্শ্বে হাঁটু ভাঙ্গিয়া বসিয়া পড়িল। বিপিন পড়িতেছিল,—বৌদির গৃহে প্রবেশ তাহার তন্ময়তার বিঘ্ন করিতে পারিল না।

কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া মোহিনী বলিল,—"বাপ্‌রে বাপ্,—কি ভয়ানক মনোযোগ! এত তন্ময় ভাবে উপন্যাস পড়্‌তে ত' তোমাকে আর কখনও দেখিনি' ঠাকুরপো। উপন্যাসের কাহিনীটি কি ঠিক তোমার প্রণয়োপাখ্যানের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে নাকি?"

বিপিনের এতক্ষণে হুঁস হইল। সে মোহিনীর কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিল,—"কি যে বল তুমি বৌদি,—আমার কি আবার একটা প্রণয়োপাখ্যান আছে নাকি?"

মোহিনী গম্ভীর হইয়া বলিল—"কি জানি ভাই; আমি ত এতদিন জানতুম তোমার ও সব বালাই নাই। তবে কত লোকে কত কি বলে। সে যাক্, লোকের কথায় কি এসে যায়? হাঁ; একটা কথা বল্‌তে তোমার কাছে এলুম। মলিনা আজ আবার আমাকে নিমন্ত্রন করে পাঠিয়েছে। তোমার দাদাকে বল্লুম নিয়ে যেতে। কিন্তু তিনি ত জান ঐ এক কথা বলেই খালাস। বল্লেন,—বিপিনকে নিয়ে যাও। তাই আর কি করি? তোমার

কাছেই এসেছি। তবে তোমার কোন কাজের ক্ষতি ক'র্‌তে চাইনে আমি। তুমি ত' সভায় যাচ্ছ, অমনি পথে আমাকে ওখানে নামিয়ে দিয়ে যেও।"

বিপিন হঠাৎ বলিল—"কিন্তু সভায় ত আমি যাই না বৌদি।"

"কেন? তুমি যে অবাক কর্‌লে দেখ্‌ছি। সভায় না গিয়ে তোমার পেটের ভাত হজম হয় ঠাকুরপো?"

বিপিন গম্ভীর ভাবে বলিল,—"না বৌদি, ঠাট্টা নয়। সভায় না যাওয়টা যে আমার পক্ষে কতখানি কষ্টের তা তুমি জান। কিন্তু কি করব? কি জন্যে জানি না, বৌদি, যেতে যেন মোটেই ইচ্ছে হয় না। কেমন যেন একটা হয়ে গেছে আমার।"

মোহিনী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল—"বল কি, তা' হলে নিশ্চয়ই তোমার কোন একটা শক্ত ব্যারাম হয়েছে। আমি ত' তোমাকে বরাবর বল্‌ছি শরীরকে একটু বিশ্রাম দাও। তা ত' তুমি শুন্‌বে না। রোস, আজই আমি তোমার দাদাকে বলে তোমার পশ্চিম যাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।"

বিপিন চম্‌কিয়া বলিল—"না না, অমন কাজটি ক'রো না বৌদি; শরীর আমার বেশ আছে। আমি জানি তোমাকে কিছু বল্‌লেই তুমি আমার শরীরের দোহাই পাড়বে। না, তোমায় আর কিছু বল্‌ব না।"

মোহিনী বলিল—"কিন্তু আমায় কিছু না বল্‌লে কি ক'রে বুঝি ভাই? শরীর খারাপ না হ'লে আর কি হ'তে পারে? দেখছি, সত্যিই আজ ক'দিন তুমি ঘর থেকে বেরোও না। মনে করেছিলুম ঘরেই বুঝি কোন লেখা-পড়ার কাজ পড়েছে। কিন্তু তোমার যে অসুখ—না—কই—অসুখও ত নাকি করে নাই।—তবে কি হয়েছে বল না ঠাকুরপো।"

বিপিন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"না, চল তোমাকে পৌছে দিয়ে আসি। তোমাকে আমার কথা ব'লে লাভ নেই বৌদি। কিছু হবে না।" বলিয়া বিপিন চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

মোহিনী মনে মনে হাসিয়া বলিল—"যদি কাউকে দিয়ে কাজ হয় তবে আমাকে দিয়েই হবে।" প্রকাশ্যে বলিল—"আহা, বাঁচালে ঠাকুরপো, নইলে এখুনি আবার তোমার দাদার খোসামোদ ক'র্‌তে হত। তুমি কাপড় ছাড়, আমিও তৈরি হয়ে আসি।"

(৯)

বিপিনের সভায় না যাওয়ার একটা কারণ ছিল। সাত আট দিন পূর্ব্বে যখন সে সভায় গিয়াছিল তাহার পূর্ব্বেই সভার সদস্যেরা ললিতের প্রমুখাৎ বিপিনের নারীচরিত্র সম্বন্ধে নব জ্ঞানোন্মেষের পরিচয় পাইয়াছিল; এবং সুরেশ সেই সুযোগে এমন দুই একটা উক্তি প্রকাশ করিয়াছিল যাহা বিপিন একেবারে অস্বীকার করিয়াই উড়াইয়া দিতে পারে নাই;—অথচ নীরবে মানিয়া লইয়া নিজের দুর্ব্বলতাকে ধরা দিতে পারিতেছিল না। তার পরদিনও সভায় এমনই কতকগুলা কথা উঠিয়া বিপিনকে সভার প্রতি একেবারে বিমুখ করিয়া তুলিল। এদিকে অন্তরবিপ্লবেও তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। একদিকে যেমনই সে জোর করিয়া নিজে পূর্ব্বের মতই কৌমার প্রতিজ্ঞায় অটল আছে বলিয়া মনে করিতে চাহিতেছিল, অন্যদিকে তেমনই তাহার অন্তরের অন্তস্থলে একটা নব জাগরিত হৃদ্‌বৃত্তি কিসের অভাবে হা হা করিয়া উঠিতেছিল। তাহার হৃদয়ের অভ্যন্তরে একখানি ব্রীড়ানম্র, অথচ লিপ্সায় উদ্ভাসিত, লাবণ্যে উচ্ছ্বসিত মুখচ্ছবি যেন থাকিয়া থাকিয়া উঁকি মারিতেছিল;—নিদ্রায় সে মুখ স্বপ্নে ভাসিয়া উঠে—চক্ষু বুজিলে সে আরও উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠে। বাহির ও ভিতরের এই বিপ্লবে বেচারা অতিষ্ঠ হইয়া আপনাকে আটদিন পর্য্যন্ত গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। সেখানে সে বন্ধুদের শ্লেষ ও ব্যঙ্গের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইলেও মন তাহার তেমনই অশান্ত উদ্দাম হইয়া হা হা করিয়া ফিরিতেছিল। তাই বৌদি যখন সেদিন তাহাকে নলিনদের বাসায় পৌছাইয়া দিতে অনুরোধ করিল, তখন আর কিছু না হউক অন্ততঃ সেই বাড়ীটার সম্মুখ হইতে একবার ঘুরিয়া আসিতে পারিবে এই আশ্বাসেই তাহার মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; এ বিশেষ কোন আপত্তি না করিয়া সে বৌদির সহিত যাইতে স্বীকৃত হইল।

এ দিকে বিপিনকে প্রস্তুত হইতে বলিয়া মোহিনী ছুটিয়া স্বামীর গৃহে উপস্থিত হইল। স্বামী তখন একটা নবীন

মামলার কাগজপত্র লইয়া বড় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন—তিনি কাগজ হইতে মুখ উঠাইলেন না।

মোহিনী স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিল,—"ওগো শুনছ ?"

নবীন মুখ না তুলিয়াই বলিলেন—"কি ?"

"আমার সে কথাটা মনে আছে ত ?"

নবীন পূর্ব্ববৎ বলিলেন,—"কি, এমাসে চালটা আর ২ মন বেশী আনতে হবে, এই ত' ? তা দোকানে ব'লে পাঠাব এখন।"

"ওগো, না, তা নয়, ঠাকুরপোর সেই সম্বন্ধের কথা।"

নবীন কাগজের উপর ঝুঁকিয়া লাল পেন্সিলের একটা দাগ টানিয়া বলিলেন,—"সম্বন্ধ! বিপিনের! কই পাত্রী টাত্রীত' দেখা হয় নি। মত হয়েছে তার ? তা হ'লে খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দেব এখন।"

মোহিনী কৃত্রিম ক্রোধের সুরে বলিল,—"এই কথা বলেছিলুম তোমাকে আমি ? একটা কথা শতবারেও মনে পড়ে না। মরণ আর কি আমার ? এমন সংসারী করতেও ভগবান পাঠিয়েছিলেন আমাকে ?"

এইবার নবীনের চেতনা হইল। তিনি কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন,—"কি, কি হয়েছে ? এই কাগজটা দেখতে দেখতে—হাঁ কি, বলেছিলে তুমি ?"

মোহিনী হাসিয়া বলিল,—"নাও, 'সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার বাপ"—এতক্ষণে কি হয়েছে!—তবু ভাল যে হুস্ হ'ল। সকালে কি বললুম তোমাকে আমি ? হরিহর বাবুর কাছে তোমার নাম ক'রে তাঁর মেয়ের সঙ্গে ঠাকুরপোর বিয়ের প্রস্তাব ক'রে পাঠিয়েছিলুম। তিনি রাজি। আজই তুমি পাকা দেখে আশীর্ব্বাদ ক'রে আসবে তাঁদের বলে পাঠিয়েছি। আমি ঠাকুরপোকে ভুলিয়ে সেখানে নিয়ে যাচ্ছি। তুমি আর এক ঘণ্টা বাদেই গিয়ে মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করে এস। কেমন মনে থাকবে ত ?"

নবীন মাথার চুলের ভিতর অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে বলিলেন—"এবার থেকে আমি বাড়ীর ভেতর গেরস্তালী ক'রব—তুমি কর্ত্তা হ'য়ে বাইরের কাজ দেখ শুনো। কি বল ?"

মোহিনী কৃত্রিম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "যেমন আমার কপাল! তুমি যদি পুরুষ মানুষের মত সবদিক দেখতে শুনতে তা হ'লে কি আর মেয়েমানুষ হয়ে আমার এই সব ক'রতে হয়" ?—তার পর গম্ভীর ভাবে বলিল—"বেশ, আমি এ সব বন্দোবস্ত করেছি ব'লে যদি দোষ হ'য়ে থাকে ত' আমি আর এর ভেতর থাকতে চাই নে। তুমিই যা হয় দেখে শুনে কর। কিন্তু, ভাই বড় হয়েছে—তাঁকে বিয়ে না দিয়ে যদি চুপ ক'রে বসে থাক, তা হ'লে সে বা কি মনে করবে—আর লোকেই বা কি বলবে বল ত ?"

নবীন স্ত্রীর গাম্ভীর্য্যে মনে মনে শঙ্কিত হইয়া বলিলেন—"তা ত বলবেই—তা ত বলবেই। তা বেশ করেছ। কিন্তু বিপিন ত শেষে কোন গোল ক'রবে না ?"

মোহিনী বলিল,—"সে ভার আমার; তার জন্যে তোমার ভাবতে হবে না। তবে তুমি যেও কিন্তু ঠিক সময়। আমি এখন চললুম। আবার যেন তোমাকে ডাকতে লোক পাঠাতে না হয়।"

নবীন হাসিয়া বলিলেন,—"না, না, তুমি যাও। আমি এই আসছি—কাগজটা দেখা প্রায় শেষ হ'ল।" বলিয়াই আবার কাগজের উপর ঝুঁকিয়া লাল পেন্সিল হাতে তুলিয়া লইলেন।

মোহিনী স্বামীর দিকে একটা প্রশান্ত গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে গৃহের বহির্গত হইল।

(১০)

বিপিনকে নীচে রাখিয়া উপরে আসিতেই মলিনা আসিয়া মোহিনীর হাত ধরিয়া গভীর যত্নের সহিত বলিল—"এস দিদি, এস।"

মোহিনী বলিল—"আসছি; কিন্তু ঠাকুরপো ত' নীচে থেকে এখুনি চ'লে যাবে তার কি হবে ?"

মলিনা হাসিয়া বলিল—"সে জন্য কোন ভয় নেই দিদি, সে বন্দোবস্ত আমি ক'রেছি। বিপিন বাবুও আর এখান থেকে না খেয়ে ফিরতে পারবেন না।"

মোহিনী মলিনার সহিত ধীরে ধীরে আসিয়া শোভা গৃহে প্রবেশ করিল। সেখানে শোভা একটা জানালা পাশে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়াছিল। মলিনা আহ্বানে চকিত হইয়া সে ফিরিয়া মোহিনীকে প্রণা

করিল। মোহিনী গাঢ়স্বরে বলিল—"আশীর্ব্বাদ করি বোন্, তুমি রাজরাণী হও।" তার পর হাসিয়া কহিল—"কিন্তু ঠাকুরপোকে পছন্দ হয়েছে ত' শোভা? ঠাকুরপো ত' একদিন মাত্র তোমাকে দেখেই ভীষ্মের পণ ভঙ্গ করতে বসেছে। আর তারই বা দোষ কি? আমার এ বোন্‌টিকে দেখ্‌লে কোন্ পুরুষই বা ঠিক থাকতে পারে?"

শোভা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। তথাপি সে ধীরে ধীরে আপনার অনিন্দ্য সুন্দর শান্ত চক্ষুদুটি মোহিনীর মুখের উপর ন্যস্ত করিয়া কহিল—"আশীর্ব্বাদ কর দিদি, আমি যেন তাঁর যোগ্য হ'তে পারি। একদিন তাঁর কথা শুনে মনে বড় ভয় হয়েছিল। শুনেছিলুম, তাঁর ধারণা নারী পদে পদে বিঘ্ন হয়ে পুরুষের জীবনের পথ জটিল ক'রে তোলে—সে বাধা দিতে জানে, উৎসাহ দিতে জানে না—প্রতিবন্ধক হয়ে সাম্‌নে এসে দাঁড়ায়—সহায়তা করতে পারে না। শুনে মনে বড় দুঃখ হ'ল—ভাব্‌লুম সত্যই কি তাই? কিন্তু মনে মনে ভেবে দেখলুম, তাত' ঠিক নয়। সহধর্ম্মিনী নারীর চিত্র আমাদের দেশে যতটা প্রস্ফুটিত হয়েছিল তা'তে করে তাকে ঘৃণা করা অবজ্ঞা করা চলে না। তাই সে দিন তাঁর কথা শুনে মনে বড় একটা ক্ষোভ হয়েছিল। কিন্তু তাই নয়—আর একদিন দিদির কাছে বসে যে সব কথা বল্‌লেন তা আমি ঘর থেকে শুনে বুঝলুম তাঁর ভুল সংস্কার তিনি নিজেও বুঝতে পেরেছেন। সেই থেকে তাঁর পর আর আমার কোন ক্ষোভ নেই। আর মনে হচ্ছে চেষ্টা করলে হয়ত জীবনের কাজে নিজেকে তাঁর যোগ্য ক'রে তুল্‌তে পারব। আমাকে আশীর্ব্বাদ কর দিদি।"

সুশিক্ষিতা শোভার মুখের এই সরল কথা কয়টি শুনিয়া আনন্দে মোহিনীর চক্ষু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে শোভাকে গভীর আগ্রহে বক্ষে টানিয়া লইয়া তাহার ললাট চুম্বন করিয়া বলিল—"পারবে বই কি শোভা; নিশ্চয়ই পারবে। তার পৌরুষের গর্ব্বে সে এতদিন নারীকে তার নির্দ্দিষ্ট অধিকার দিতে চায় নি; নারী বলতে সে এতদিন এতটুকু একটা নোলোক পরা, অশিক্ষিতা, ভীতিবিহ্বলা বালিকা বধূকেই কল্পনা ক'রত—সহধর্ম্মিনীর ছবি, মাতৃত্বের মহিয়সী মূর্ত্তি এতদিন তার কাছে ধরা পড়েনি; তাই নারীকে সে করুণার চক্ষে দেখত—সম্ভ্রম করত না। তুমি তার সেই ভুল সংস্কার ভেঙেছ। তুমি তোমার নিজের গৌরবে তাকে তোমার যোগ্য করে নিয়েছ—এখন তুমিও চেষ্টা করলে তার যোগ্য হতে পারবে।

* * * * *

এদিকে বৌদি উপরে চলিয়া গেলে বিপিন চলিয়া যাইবে বলিয়া পিছন ফিরিল। কিন্তু মন তাহার কিছুতেই যাইতে চাহিতেছিল না। কে যেন বার বার ডাকিয়া বলিতেছিল—"ওরে মূঢ়, ওরে নির্ব্বোধ, সামান্য একটু দুর্ব্বলতার জন্য কেন তোর হৃদয়ের সুধাকে এমন করিয়া শুকাইয়া দিতে চাস্? দ্বারের অন্তরালেই ত' তোর প্রাণের নিভৃত কন্দরের লুকান প্রতিমা বসিয়া আছে—একবার তাহাকে দেখিয়া যাইতে দোষ কি?" বিপিনের মনের মধ্যে তোলপাড় চলিতে লাগিল ও আপনার হৃদয়ের দ্রুত স্পন্দন-ধ্বনি পাছে কাহারও নিকট ধরা পড়িয়া যায় এই ভয়ে সে গৃহের ভিতর দ্রুত পদচারী করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কিন্তু সে স্পন্দন যেন ক্রমেই বাড়িয়া চলিতে লাগিল। অবশেষে বিপিন আর না থাকিতে পারিয়া যেমন বাহির হইল, অমনি সম্মুখে ললিত, সতীশ ও আরও ৩।৪টি বন্ধু একযোগে আসিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সতীশ বলিল—"Caught redhanded sir! কেমন মজা, ওরে বিপিন, পেটে খিদে মুখে লজ্জা ক'র্‌লে আর কি চ'লে? নে নে, কোথায় যাচ্ছিস্? ওঠ্। সুরেশ যে একদিন বলেছিল এ বাড়ীতে যে একবার ঢুকেছে সে আর একলাটি বেরোয় নি, সে কথা দেখছি ঠিক। নে চল্—"

বিপিন অকস্মাৎ এই আক্রমণে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। সে ব'লল, "পাগলের মত কি বকছিস সতীশ? আমি ত বৌদিকে এখানে পৌঁছে দিতে এসেছি।"

সতীশ হাসিয়া বলিল "বটে, ডুবে ডুবে জল খেতে চাও বাবা; এখনও চালাকি! তবে এই ন্যাখ"—বলিয়া সে পকেট হইতে একখানা লাল চিঠি বিপিনের সম্মুখে ধরিল।

বিপিন এক নিশ্বাসে চিঠিখানা পড়িয়া ফেলিল। হরিহর বাবুর কন্যা শোভার সহিত তাহার বিবাহ স্থির হইয়াছে। আজ পাকা দেখা হইবে ও বরপক্ষ কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। তাই এই নিমন্ত্রণ পত্র।

পত্রখানার ভিতর হইতে একটা কেমন গন্ধ উঠিয়া বিপিনের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া সেখানে একটা মৃদু মধুর আবেশ সঞ্চারিত করিয়া তুলিল। তাহার বক্ষের দ্রুত

স্পন্দনটা যেন একটা মোহন সাহানার তানে দুলিয়া দুলিয়া পুলক হিল্লোলে নাচিতে লাগিল। কিসের লজ্জা? কিসের সঙ্কোচ?—সে যাহাকে চাহিয়াছে—তাহার হৃদয় যাহার জন্য নিরন্তর ক্রন্দন করিয়া ফিরিয়াছে সে আজ তাহারই হৃদয় দুয়ারে অতিথি। সে কি তাহাকে সাদরে বরণ করিয়া গৃহে না তুলিয়া নিয়া ফিরাইয়া দিতে পারে? না, না, তাও কি হয়? বিপিন স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চক্ষের সম্মুখে শোভার সুন্দর চল চল মুখখানি ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এমন সময় সম্মুখে একখানা গাড়ী আসিয়া থামিল। তাহার ভিতর হইতে ছোট একটি "কেস্" বাক্স হাতে করিয়া নবীন অবতরণ করিলেন। ললিত বিপিনকে একটা ঠেলা দিয়া কহিল,—"ওরে, তোর দাদা এসে গেছেন আশীর্ব্বাদ করতে। ওঠ্, ওঠ্, ঘরে চল্।" বিপিন কলের পুতুলের মত সকলের সহিত গৃহে প্রবেশ করিল।

উপরে নবীন যখন কন্যা দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছিলেন। মাঙ্গলিক শঙ্খের মধুর ধ্বনি কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাড়ীময় ঘুরতেছিল। নীচে তখন বিপিন বন্ধুদের উদ্দেশ করিয়া বলিতেছিল—"সত্যি কথা, ভাই, সকলের আগে মানুষ নিজে। মানুষ তার প্রবৃত্তিকে নিংড়ে ফেলে তা'র সরস রসের উৎস নিঃশেষ করে যদি তার মনুষ্যজীবনই ব্যর্থ ক'রে দেয়, তবে কোথায় থাকে সমাজ—কোথায় থাকে জাতি? কই, এত ক'রেও ত' আমি আমার প্রবৃত্তিকে দমন করতে পারিনি। আমার নবীন হৃদয়ের সেই শাশ্বত চিরনবীন প্রণয়বৃত্তি—আমার অন্তরের ক্ষুধা যেদিনই জাগরিত হয়েছে—সেই দিনই তার কাছে আমি পরাস্ত হয়েছি। কি ভুলের পিছনেই না এতদিন ঘুরেছি।।"

সতীশ কহিল,—"কিন্তু, তোর ম্যাল্‌থাসের (Malthas theory—সে ত' আর ভুল নয়।"

বিপিন উৎসাহিত ভাবে বলিল,—"ভুল নয়,—কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সত্যও তার ভিতর কিছু নেই। ম্যাল্‌থাস যে সময়ে ঐ theory বের করেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে কেবলমাত্র ইংলণ্ডেই সেটা খাটত। এখন সেখানেও ওটা খাটে না। আমাদের দেশে এখন কতকটা সেটা প্রযোজ্য বটে, কিন্তু তাই ব'লে লোকসংখ্যা কমাবার চেষ্টা না ক'রে খাদ্য সরবরাহ (food sapply) বাড়াবার চেষ্টা করা কি ঠিক নয়? তাতেই দেশের প্রকৃত উপকার হয়। বাল্য-বিবাহের আমি পক্ষপাতী নই—কিন্তু ফ্রান্সে এ যুদ্ধের পূর্ব্বে যে ভাবে preventive check চল্‌ছিল, তাতে ক'রে দেশের অনিষ্ট বই ইষ্ট কিছুই হয় নাই। কত বৎসর ধরে ফ্রান্সের লোক সংখ্যা একই ভাবে স্থির র'য়েছিল। তার চেয়ে লোকসংখ্যাও বাড়্‌বে, অথচ দেশের জমি হ'তে আর বিদেশ হতে এতটা খাদ্য সংগ্রহ ক'রব যাতে ক'রে তারা না খেয়ে মরবে না। সেই সকলের চেয়ে দেশের পক্ষে বেশী ইষ্টকর।"

ললিত কহিল,—"কিন্তু নারী যে প্রতিবন্ধক—"

বিপিন লজ্জিত হইয়া কহিল,—"আমায় ক্ষমা কর ভাই। সেইটেই আমার সব চেয়ে বড় ভুল। হিন্দুর সন্তান হয়েও সহধর্ম্মিণী নারী—নারী মাতা—এর চিত্র আমার কল্পনায়ই আসে নি। আধুনিক উন্নত ইউরোপীয় আদর্শের পাশে আমাদের বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের বালিকা বধূর চিত্র কল্পনা করেই বুঝি আমার এ বুদ্ধিভ্রম হয়েছিল। নইলে আমার গৃহেই যে নারীমূর্ত্তি চক্ষের উপর নিরন্তর দেখ্‌তে পাই—আমার পুণ্যময়ী বৌদি—যাকে না হ'লে আমার দাদা কি ঘরে কি বাইরে এক পা' চ'ল্‌তে পারেন না—তাকেই কি পুঁথিগত বিদ্যার চাপে এতদিন সম্যক দেখ্‌তে পেয়েছি? আমি মূর্খ, তাই প্রকৃতি আমাকে নিজের প্রবৃত্তির কাছে পরাস্ত করে আমাকে শ্রেয় শিখিয়েছে।"

সতীশ হাসিয়া কহিল,—"কিন্তু তবু তোমার ব্রত ভঙ্গ যে হয়েছে তাতে আর ভুল নেই।"

বিপিন কহিল,—"তাই কি? এতদিন ত' শুধু একটা ভুলের পিছনেই ঘুরে মরছিলুম;—আজই বরং আমার ব্রতারম্ভ।"

উপর হইতে খবর আসিল আহার প্রস্তুত।

সকলকে উঠাইয়া চলিতে চলিতে ললিত বলিল,—"তবু আমরা আজ থেকে তোমাকে বল্‌ব খণ্ডব্রতী।"

শ্রীসুশীল সেন

আশীর্ব্বাদ

হাসির মত হওগো তুমি
সুখের মত হও।
আলোর মত উষার মত
আশার কথা কও।
দুঃখ যদিই আসে দ্বারে
ভয় পেয়ো না দেখে তারে
রঙীন রাখি পরিয়ে দিয়ে
বরণ করে লও॥

দেখবে তখন দুঃখ তোমার
আপন জনা হবে,—
জীবন ভরা অন্ধকারে
আশার কথা কবে।
তাই ত বলি জীবন মাঝে
কাজ কি থাকা মলিন সাজে ?
সুখে দুঃখে সমান ভাবে
বিভোর হ'য়ে রও॥

"বনফুল"

কোরিয়ায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার

(২)

বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি ও স্থায়িত্ব।

বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ—এই "ত্রিরত্নের" উপর বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি নির্ভর করে। ভিক্ষুদের সমিতি সঙ্ঘ নামে অভিহিত। ভিক্ষুদের জ্ঞান বৈরাগ্য ও কর্ম্মচেষ্টা এক এক দেশের বৌদ্ধধর্ম্মের গতি ও পরিণতির নিয়ামক। অবস্থাভেদে একই ধর্ম্ম বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকারে প্রকাশ পাইয়াছে। তুরস্কের ও পারস্যের ধর্ম্ম বিশ্বাসে ও অনুষ্ঠানে ইস্লাম ধর্ম্মে বহু প্রভেদ, অথচ মহম্মদের ধর্ম্মই দুই দেশে প্রচলিত। রুষ দেশে ও ইংলণ্ডে খৃষ্টধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত, কিন্তু দুই দেশবাসীর মতিগতি একরূপে নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। শ্যাম সিংহল ব্রহ্মদেশে, তিব্বত চীন জাপানে এবং কোরিয়া দেশে প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম্মে যথেষ্ট ঐক্য পরিলক্ষিত হইলেও এক এক দেশের ধর্ম্মে বহু প্রকার বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হইবে।

কোরিয়ায় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস আলোচনা করিলে অন্যান্য দেশের ভিক্ষুদের তুলনায় কোরিয়ার ভিক্ষুদের বহু প্রকারের পার্থক্য সর্ব্বাগ্রে চোখে পড়ে। ইঁহারা কেবলমাত্র ধর্ম্মজ্ঞান ও বৈরাগ্য-সাধনা লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন না। দেশের কল্যাণকর সর্ব্ববিধ আন্দোলনে ইহারা লিপ্ত হইতেন। শিক্ষা বিস্তার, ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি, সমাজ সংস্কার, রাজ্যের সুশাসন, এমন কি সৈন্যপরিচালনা পর্য্যন্ত এই ভিক্ষুরা করিতেন। জ্ঞানী বলিয়া রাজসভায় ইহারা যথেষ্ট সম্মান পাইতেন। সমাজের প্রত্যেক স্তরে ইহাদের গতিবিধি ছিল। লোকমত গঠন ও পরিবর্ত্তন করিতে ইহারা ছিলেন সিদ্ধহস্ত। কাজেই যে কোন আন্দোলন চালাইতে এই ভিক্ষুরা অপরিমিত শক্তিশালী হইয়া পড়িয়াছিলেন। কোরিয়ায় সর্ব্বদাই বহিঃশত্রুর আক্রমণের ভয় ছিল, কাজেই দেশবাসীকে সর্ব্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইত। সর্ব্বদেশে, বিশেষতঃ কোরিয়ায়, বৌদ্ধবিহার সুন্দর সুরক্ষিত স্থানে অবস্থিত। কোরিয়ায় বিহারে বহু ধনরত্ন মজুত থাকিত। এই সকল রক্ষণাবেক্ষণ আবশ্যক। এই কারণে এবং দেশহিতৈষণার প্রেরণায় কোরিয়ার বিহারে একদল ভিক্ষু রীতিমত যুদ্ধকার্য্য

শিক্ষা করিতেন। ইঁহারা সিউঙ কুম (Siung Kum) নামে অভিহিত। বিহারে বিহারে যেমন শাস্ত্রগ্রন্থ সংগৃহীত হইত, তেমনই অস্ত্রশস্ত্র, খাদ্য শস্য—যুদ্ধের সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যসম্ভার সঞ্চিত থাকিত। কোন রাজাই এই ভিক্ষুদিগকে খাতির না করিয়া পারিতেন না। রাজ্য পরিচালন কার্য্যে বহুবিভাগের কার্য্যাধ্যক্ষরূপে, মন্ত্রী ও ব্যবস্থাপকরূপে ভিক্ষুরা নিযুক্ত হইতেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম সাম্যসংস্থাপক, ভিক্ষুরা সাম্যমন্ত্রের উপাসক। এই ভিক্ষুদের সর্ব্বত্র মাতব্বরী করা, সর্ব্বত্র ভিক্ষুদের এই প্রাধান্য, উচ্চ বংশ-জাত অনেকে ভয়ের ও বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতেন। যে কোন গণ্ডগোলে, বিপ্লবাদিতে এক পক্ষে ভিক্ষুরা থাকিতেনই। সাধারণতঃ ভিক্ষুরা আদর্শচরিত্রের লোক বলিয়া খ্যাত ছিলেন।* তবুও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালন করিতে গেলে প্রভুত্ব করিবার বাসনা, স্বদল ও স্বমত রক্ষা ও পুষ্টির জন্য স্বার্থপরতা, অনেক সময় অতর্কিতে মনের চারিদিকে জড়াইতে থাকে। পরে ইচ্ছা হইলেও ঐ বিষ অনেক সময় পরিত্যাগ করা সাধ্যাতীত হইয়া পড়ে। কিন্তু যাঁহারা বৈরাগ্য সাধন করিয়া লোককল্যাণে আত্মনিয়োগ করেন, সেই ভিক্ষুদের কার্য্যে যদি স্বার্থসিদ্ধির লেশমাত্র প্রকাশ পায়, প্রভুত্বপ্রয়াস লক্ষিত হয়, তবে তাহা অবশ্য নিন্দনীয়। সকল ভিক্ষুই বুদ্ধদেবের উপযুক্ত শিষ্য হ'ন না। তদুপরি যাঁহারা বিবিধ কার্য্য পরিচালন করেন, একদল লোক স্বভাবতঃ সর্ব্বত্র তাহাদের বিরোধী হয়। ভিক্ষুরাও নানাবিধ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া কাহারও কাহারও অপ্রিয় হইয়া পড়িতেছিলেন। কিন্তু যাঁহারা মেধাবী, মনীষী, কর্ম্মী, তাঁহাদিগকে এড়াইয়া রাজকার্য্য চলে না। কিন্তু যতদিন বৌদ্ধ রাজা ছিলেন ততদিন তাহাদের বিচলিত হইবার আবশ্যক হয় নাই, ততদিন তাহাদের একাধিপত্য অক্ষুণ্ণ ছিল। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ওয়াঙ বংশ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; চীনে রাষ্ট্রবিপ্লব হয় এবং তাহার ধাক্কা কোরিয়ায় আসিয়া পৌঁছে। কোরিয়াতেও রাষ্ট্রবিপ্লব হয় এবং ওয়াঙ বংশের পতন হয়। নূতন রাজা ছিলেন সর্ব্ববিষয়ে চীনের অনুকারী। এই সময়ে চীনে কনফুশাসের ধর্ম্মের প্রাধান্য খুব বিস্তার লাভ করিতেছিল। কোরিয়ার নূতন রাজা কনফুশাসের ধর্ম্মমত গ্রহণ করেন। ইঁহার প্রবর্ত্তিত বংশ সে দিনও পর্য্যন্ত কোরিয়ার রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিল। ঐ নূতন রাজার সময় হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের পরিবর্ত্তে কোরিয়ায় কনফুশাসের ধর্ম্ম রাজধর্ম্ম রূপে পরিগণিত হয়। একেবারে রুদ্ধ না হইলেও ইহার পর প্রায় শতাব্দীকাল বৌদ্ধধর্ম্মের গতিপথ খুব অনুকূল ছিল না। কোরিয়ার বৌদ্ধধর্ম্মের দুর্দ্দিন ক্রমশঃ ঘনাইয়া আসিতেছিল।

বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি বৌদ্ধভিক্ষুদের কার্য্যের উপর নির্ভর করে। ইঁহাদের জব্দ করিতে পারিলে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি সুনিশ্চিত, বৌদ্ধবিদ্বেষী রাজা তাহা বুঝিয়াছিলেন এই জন্য তিনি এই ভিক্ষুদের প্রভাব এড়াইবার এবং ঠেকাইবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। অবশেষে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে এক রাজাদেশ ঘোষিত হইল। এই ঘোষণা বলে কোরিয়ার যে কোন সহরে ভিক্ষুমাত্রেরই প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল। যে ভিক্ষু এই আদেশ অমান্য করিবে তাহার দণ্ড নির্দ্দিষ্ট হইল – মৃত্যু!

এই নিষ্ঠুর রাজাদেশ প্রচারের প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে কোরিয়ার রাষ্ট্রবিপ্লবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে সেই বিপ্লবে জাপ-সৈন্যেরা কোরিয়ার প্রতিকূলে ছিল এই জাপ-সৈন্যেরা কোরিয়ার ভিক্ষুর প্রভাব প্রতিপত্তির কথা অবগত ছিল, তাহাদের সর্ব্বত্র অবাধ গতি লক্ষ্য করিয়াছিল

* During the first centuries of its sway in the peninsula the ablest intellects were fed and the ablest men were developed by it, so that it was the most potent factor in Corea's civilisation. Over and over again, have the political and social revolutions been led by Buddhist priests, who have proved agitators and warriors as well as recluses and students. Possessing themselves of learning they have made their presence at court a necessity. Here they have acted as scribes, law-givers, councillors and secretaries. Often they have been conservers of patriotism. The shaven-pated priest has ever been a standard character in the glimpses of Corean history we are allowed to catch.

—Corea : The Hermit Nation by W. E. Griffis.

বহু জাপ-সৈন্ত ভিক্ষুর পোষাক পরিয়া, আত্মগোপন করিয়া, কোরিয়ায় প্রবেশ করে। ইহাঁদের আক্রমণে বহু কোরিয়-সৈন্তের প্রাণ বিনষ্ট হয়। এই ঘটনায় প্রায় দুই শত বৎসর পরে ইহারই উল্লেখ করিয়া রাজা কোরিয়ায় ভিক্ষু-মাত্রেই নগর প্রবেশ বন্ধ করিয়াছিলেন। *

এতদিন যে রাজসাহায্যে বৌদ্ধধর্ম্ম পুষ্ট হইতেছিল, তাহা বন্ধ হইয়া গেল। নগর সর্ব্ববিষয়ের কেন্দ্র; ভিক্ষু প্রচারকেরা সেই কেন্দ্রস্থানচ্যুত হইলেন। ফলে কোরিয়ায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব প্রতিপত্তি শিথিল এবং প্রাধান্য বিনষ্ট হইতে লাগিল। চতুর্দ্দশ শতাব্দে আরম্ভ করিয়া ষোড়শ শতাব্দের পরবর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত কোরিয়ায় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস পতন ও অবনতির ইতিহাস।

কিন্তু লোকসাধারণের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম এতকাল যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার উচ্ছেদ সহজ নহে। কোরিয়ার বৌদ্ধবিহার পর্ব্বত-গাত্রে অতি সুরক্ষিত স্থানে অবস্থিত ছিল। † যুদ্ধ কার্য্যে অভিজ্ঞ সৈনিক-ভিক্ষুও কম ছিল না। কাজেই রাজ-বিদ্বেষ নগরে কার্য্যকরী হইলেও ঐ সকল স্থানে প্রতিহত থাকিত। বৌদ্ধবিহার কেন্দ্র করিয়া গ্রামের উপর অল্লাধিক প্রভাব রাখিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম আত্মরক্ষা করিল। তারপর ভিক্ষুদের নগর প্রবেশের নিষেধ বিধিও কাল প্রভাবে ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিতে-ছিল। সেই জন্যই দেখা যায়, কন্‌ফুশাসের ধর্ম্মাবলম্বী রাজারাও পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধভিক্ষুদিগকে রাজসরকারে উচ্চ কার্য্যে, যুদ্ধকার্য্যের উপদেষ্টা এবং প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তারূপে নিযুক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। * ভিক্ষুরা বৌদ্ধবিহার নির্ম্মাণ ও পরিচালন কার্য্যে মধ্যে মধ্যে রাজ-সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৮৬৫ অব্দে এবং তৎপরে ভিক্ষুদের অনুরোধে কোরিয়ার রাজারা বৌদ্ধবিহার নির্ম্মাণ কার্য্যে, পুরাতন মন্দিরাদির সংস্কার করিতে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। রাজসরকারের বহু অর্থ বৌদ্ধবিহারে উপঢৌকন প্রেরণেও ব্যয়িত হইয়াছিল। †

দেশবাসীর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও যখন য়ুরোপের "স্বদেশ ভক্ত এবং স্বাধীনতা প্রিয়" জাতিরা বল পূর্ব্বক কোরিয়ায় প্রবেশ করে এবং মহাত্মা যিশুর ক্ষমা ও প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করে, তখন হইতে কোরিয়ায় বৌদ্ধধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আরম্ভ হয়। ১৯০৪ খ্রীঃ অব্দে স্বয়ং কোরিয় রাজ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার কল্পে নানারূপে উৎসাহ দেন। তিনি বহু অর্থব্যয়ে নগর বাহিরে কতকগুলি জীর্ণ বৌদ্ধ মন্দিরের সংস্কার করাইয়া দিয়াছিলেন। ‡

---

*—Koreans account for the severe enactments against priests by saying that in the Japanese invasion three centuries ago Japanese disguised themselves as Buddhist priests and gained admission to cities putting their garrisons to the sword.

—Korea by Mrs Bishop

† Many of their monasteries are built on the summit or slopes of high mountains to which access is to be gained only with the greatest difficulty up the most rocky and narrow passages. Into these fastnesses royal and noble professors of the faith have fled in time of persecution, or pious kings have retired after abdication. In time of war they serve to shelter refugees. It was in attacking one of these strong holds, on Kang-wa Island, in 1866, that the French marines were repulsed with such fearful loss.

Corea Etc. by W. E. Griffis.

* Mr W. E. Griffis ১৯০৫ অব্দে তাহার Corea : The Hermit Nation পুস্তকে লিখিয়াছেন:—Even at the present day, Buddhist priests are made high officers of the Government and governors of provinces and military advisers.

† The Building of one of these (Buddhist temples) at great expense and the endowment of others from government funds, sometimes happens even during the present dynasty, as was the case in 1865, when the regent was influenced by the bonzes. He rebuilt the temple in an unparalleled style of magnificence, and made immense presents to other temples out of the public treasury.—Ibid.

‡ The Emperor has also shown himself interested in the propagation of this faith (Buddhism)

১৮৭৬ সনে জাপান হইতে কতিপয় বৌদ্ধ ভিক্ষু ধর্ম প্রচারোদ্দেশে কোরিয়ায় গমন করেন। তাঁহারা একটি প্রতিভাশালী কোরিয় যুবককে তাঁহাদের ধর্মমত গ্রহণ করান। যুবকটিকে "নব্য বৌদ্ধধর্ম" শিক্ষার্থে ১৮৭৮ অব্দে জাপানের কিয়োটো নগরে প্রেরণ করা হয়। তিনি শিক্ষাশেষে স্বদেশে প্রচার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে আরও পাঁচটি কোরিয় যুবক কিয়োটোর "শিন্ নীতি বিদ্যালয়ে" ছাত্ররূপে যোগ দেন। এই শিন্ সম্প্রদায় 'সংস্কৃত' (reformed) বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারক। জাপান ও কোরিয়া—এই দুই দেশই ইহাঁদের কর্ম্মক্ষেত্র। শিন্ বৌদ্ধ ভিক্ষুরা খৃষ্ট মিশনারীদের প্রতিদ্বন্দ্বী। ঐ দুই দেশে যাঁহারা খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে নিজ সম্প্রদায়ে পুনরানয়ন করা ইহাঁদের একটী প্রধান কার্য্য।

বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতিকালে কোরিয় ভিক্ষুদের জ্ঞানানুশীলন একরূপ রহিত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাঁরা আচার অনুষ্ঠান পালন করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। বিভিন্ন দেশবাসীর ও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের সংঘাতে আসিয়া কোরিয় ভিক্ষুরা মূল বৌদ্ধশাস্ত্রের আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের হিতার্থীর নিকট ইহা সুসংবাদ সন্দেহ নাই। আচার অনুষ্ঠানকেই ধর্ম্মের প্রধান অবলম্বন না করিয়া, ধর্ম্মের মর্ম্মকথা বুঝিয়া তদনুসরণ করিতে পারিলে অনেক হিংসা বিরোধ ঘুচিয়া যায়, আমাদের অন্তঃকরণও বলশালী হইয়া উঠে।

কোরিয়ার বিহারাদি ও ভিক্ষু ভিক্ষুণী

একমাত্র কোরিয়া দেশের ভিক্ষুরাই যে সৈনিকের কার্য্য করিয়া থাকেন, সেই বিশেষত্বের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করিবার সময় কতকগুলি বিধি নিষেধ পালন করিবার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হইতে হয়। এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ ব্যাপারেও কোরিয় ভিক্ষুর একটু বিশেষত্ব আছে। ভিক্ষু-ব্রত গ্রহণকালে তাহাদিগকে অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়। বাহুতে একটী জ্বালানী জিনিষ জড়াইয়া তাহাতে অগ্নি ধরাইয়া দিতে হয়। সেই অগ্নি-দগ্ধ-জ্বালা সহিয়া তাহাকে ভিক্ষুব্রত গ্রহণের প্রতিজ্ঞা করিতে হয়। কোন ভিক্ষু কোন সময়ে ব্রতচ্যুত হইলে এই কঠোর পরীক্ষায় তাহাকে পুনঃ উত্তীর্ণ হইতে হইবে। ভিক্ষু হইয়া কিছুকাল শিক্ষানবিশ হইয়া থাকিতে হয়। অধ্যয়ন করা, শাস্ত্র গ্রন্থাদি লেখা, আচার অনুষ্ঠান শিক্ষা করা—এই সময়ের প্রধান কার্য্য। তৎপর ইহাদিগকে জনসাধারণের নিকট ভিক্ষা করিতে বাহির হইতে হয়। শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া, বৌদ্ধসাহিত্যের গল্প বলিয়া যেখানে যে ভিক্ষা মিলে, ইহারা পরম যত্নে তাহা সংগ্রহ করা হয়। এই ভিক্ষালব্ধ অর্থে ভিক্ষুদের জীবিকা নির্ব্বাহ এবং বিহারের কার্য্য পরিচালনের সাহায্য হয়। ভিখারী ভিক্ষুরা যুঙ নামে অভিহিত। সঙ্ঘের প্রধান পরিচালক (নায়ক থের?) ভিক্ষু-সাধারণ দ্বারা নির্ব্বাচিত হ'ন। এই নির্ব্বাচন কার্য্য প্রতি বৎসর হইয়া থাকে। কাজেই নায়ক থেরকে সতর্ক হইয়া কাজ করিতে হয়। বিশেষ অপরাধ না করিলে, ভিক্ষুসাধারণের বিরাগ ভাজন না হইলে, যিনি একবার নির্ব্বাচিত হ'ন, তাহার পদচ্যুতির ভয় অল্পই থাকে।

বিহারে প্রধানতঃ দুই প্রকার ভিক্ষুণী আছেন। একদলের মাথা মুড়াইতে হয়। এই মুণ্ডিতমস্তকা ভিক্ষুণীরা সুকঠোরব্রতধারিণী। অন্যদল কেশগুচ্ছ রাখিতে অধিকার পান। ইহাঁদের বিধিনিষেধের কঠোরতাও কম। এই শেষোক্ত ভিক্ষুণীরা পো-সল নামে অভিহিতা। বিহারে যেমন লোলচর্ম্মা বৃদ্ধা আছেন, তেমনি অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকাও আছে। এই বালিকাদের অনেকে অবশ্য ভবিষ্যৎ ভিক্ষুণী।

যেখানে ভিক্ষুণীরা থাকেন সেই বিহারের কথা উল্লেখ-যোগ্য। সর্ব্বদেশে বিহারের স্থান-নির্ব্বাচন অতীব যত্নে সাধিত হইয়াছিল। কোরিয়াও ইহার কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। অতি পুরাকালে—বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম প্রচার সময়ে—কোরিয়ায় যে সকল বিহার নির্ম্মিত হইয়াছিল আজিও তাহা যেরূপে রক্ষিত ও তাহার কার্য্যাদি যেরূপ যত্নে পরিচালিত হইতেছে, সে কথা পাঠ করিলে ঐ দেশে বৌদ্ধধর্ম্মে যে টিকিয়া বর্ত্তিয়া আছে তাহা সম্যক উপলব্ধি হয়।

---

and, with Lady Om, he has given large sums to the ...oration of certain dilapidated temples without

Korea by Angus Hamilton.

কোরিয়ার হীরকপর্ব্বতস্থ * বিহারগুলি সমধিক বিখ্যাত। গিরি শিখরে সুবিস্তৃত বৃক্ষরাজি মধ্যে বিহার। সন্নিকটে ধীরস্রোতা বঙ্কিমগতি নদী। গ্রামনগরের কোলাহল ব্যস্ততা বহুদূরে পড়িয়া আছে। ক্ষণে ক্ষণে পাখীর সুমধুর কাকলি ভাসিয়া আসে। স্থানমাহাত্ম্যে দেহ মন অচপল শান্ত হইয়া আসে। ধ্যানধারণা করিবার, শোক দুঃখ ভুলিবার এমন তীর্থ বুঝিবা অতুল। তাই আজিও কি বৌদ্ধ, কি কনফুশিও ধর্ম্মাবলম্বী, এমন কি ধর্ম্মস্পৃহা বর্জ্জিতও বহু কোরিয়াবাসী গিরিসঙ্কটের পথকষ্ট ভুলিয়া হীরক পর্ব্বত ভ্রমণ করিতে আগমন করেন।

হীরক পর্ব্বত বহুপর্ব্বতসমষ্টি। তন্মধ্যে কেউম্-ক্যোং-সনে ৩৪টী বিহার আছে। ইহাদের মধ্যে চ্যেঙ-এন্ সর্ব্বপুরাতন। শিল্লা প্রদেশের রাজা পো-ফেঙের রাজত্বকালে য়ুল-সা এবং চিন-কো নামে দুইজন ভিক্ষুর চেষ্টাযত্নে ৫১৫ খৃষ্টাব্দে এই বিহারের সংস্কার কার্য্য সাধনের প্রমাণ পাওয়া যায়। উহার উচ্চতা ৪৮ ফিট। প্যো-উন্ এবং চ্যেঙ-আন বিহার উল্লিখিত পর্ব্বতের পশ্চিমভাগে, য়ু-চোম এবং সিন-গা উহার পশ্চিমভাগে অবস্থিত। ৩৪টী বিহারে ৩০০ শত ভিক্ষু এবং ৬০ জন ভিক্ষুণী আছেন। তন্মধ্যে ১৭০ জন ভিক্ষু এবং ৩০ জন ভিক্ষুণীর কার্য্যক্ষেত্র প্রধান চারিটী বিহারেই আবদ্ধ। †

বিহারের গঠন প্রণালী ভারত শ্যাম চীন প্রভৃতি দেশীয় বৌদ্ধবিহারের সমতুল। কোরিয়ার বিহারগুলিও বুদ্ধজীবন এবং বৌদ্ধ ইতিহাস সম্বন্ধীয় নানাবিধ চিত্র ও মূর্ত্তিদ্বারা সজ্জিত। বর্ত্তমান কালে এই সকল বিহার সুশৃঙ্খলায় ও যত্নে কিরূপ পরিচালিত হইতেছে একজন ইংরেজ ভ্রমণকারী তৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"পরিষ্কার মন্দিরগুলি, কোথাও একটী দাগ পর্য্যন্ত নাই। বিহারগুলি যে পরম যত্নে রক্ষিত হয়, দর্শনমাত্রেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়, ভিক্ষু ভিক্ষুণী, পুরোহিত চাকর— সকলের জন্য নির্দ্দিষ্ট কক্ষ রহিয়াছে। বহির্দর্শক আগমন করেন; তাহাদের অশ্বযানাদি রাখিবার স্থান আছে। স্বামীহীনা, পিতৃমাতৃহারা, অন্ধ খঞ্জ অসহায়, বৃদ্ধবয়স প্রযুক্ত অসমর্থ, স্বজন পরিত্যক্ত যাহারা, এই বিহারের ভিক্ষুরা তাহাদের আশ্রয় দেন, রক্ষা করেন। ভিক্ষুরা সরল প্রাণ, বিনয়ী—প্রাণীমাত্রেই ইহাদের অটুট দয়া।

"দিনে রাত্রে যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে বিহারে বুদ্ধদেবের, বোধিসত্ত্বের পূজা পুরাকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত অব্যাহত ভাবে চলিয়া আসিয়াছে। পুণ্যকামী, শোকাতুরা নরনারী শান্তিলাভ কামনায় অর্থসম্ভার বহিয়া এই দুরারোহ পর্ব্বতে আজিও আগমন করিতেছেন।" *

সাধারণ দর্শক শ্রদ্ধাভরে, বৌদ্ধেরা ভক্তিভরে নানারূপে বিহারে দান করেন। ভিক্ষুদের ভিক্ষালব্ধ অর্থ আছে, রাজপ্রদত্ত বহু জমি আছে। বিহারগুলি যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ইহার কার্য্যাদিও তেমন সুনির্দ্দিষ্ট। তাই বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ইহার কার্য্যাদি সুশৃঙ্খলায় ও অব্যাহত ভাবে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে।

বিহার ছিল জ্ঞানী ও গুণীদের সম্মেলনস্থান। কোরিয়ার বিহারে আজিও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কোরিয়ার ইতিহাস লেখক গ্রিফিস সাহেব তং-তো-সা বিহারের পুস্তক সংগ্রহ দেখিয়া লিখিয়াছেন—

"সংগৃহীত পুস্তকের জন্য এই বিহার বিখ্যাত। সমগ্র বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ এখানে পাওয়া যায়। যে সকল য়ুরোপীয় এবং আমেরিকান অনুসন্ধিৎসু পাঠক দুর্লভ সংস্কৃত গ্রন্থরত্নের অনুসন্ধানে আছেন এই বিহার তাহাদের অনুকূল ক্ষেত্র। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী দেশবাসী জ্ঞানীদের নিকট প্রবেশের দ্বারও উন্মুক্ত।"

বুদ্ধদেবের যাহারা স্বদেশবাসী তাহারা এই সকল রত্নরাজীর অন্বেষণে বাহির হইবেন না কি ?

---

*Diamond mountains.

† কোরিয়ার রাজধানী হ্যেন নগরীর এবং সহরতলীর লোক গণনা করা হইয়াছিল। ইহাতে মোটামুটি জানা যায় যে, ৪৫৩৫০ সংখ্যক গৃহে ২১৯৮১৫ জন লোক আছে। ইহার মধ্যে ৩৬ বৌদ্ধ বিহারে ৪৪২ জন ভিক্ষু এবং ২০৪ জন ভিক্ষুণীর বাস। Coron. The Hermit Nation.

* লেখক (Angus Hamilton, তৎপ্রণীত Korea পুস্তক দ্রষ্টব্য।) য়ু-চোম-সা বিহারে ৫০টী ভিক্ষু এবং ১২টী ভিক্ষুণী এবং ৮টী বালক দেখিয়াছিলেন। এই বালকেরা ভাবী ভিক্ষু। প্রাপ্তবয়সে অনেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ভিক্ষু হইতেন। তা' ছাড়া অনেক পিতামাতা শিশু বালক বালিকা ভিক্ষু সঙ্ঘে দান করিতেন। কখন কখন দীন দরিদ্রের শিশু সন্তানেরা বিহারে আশ্রয় পাইত। ইহারা সকলেই পরম যত্নে লালিত পালিত হইত, এবং শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রভাবে ইহাদের ভবিষ্যতের ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী জীবন গড়িয়া উঠিত।

কোরিয়ায় ভারতীয় ভিক্ষু ।

ভারতবর্ষীয় ভিক্ষু প্রচারকেরা কোরিয়ায় গিয়াছিলেন কি ?—যু-চোম্-সা বিহারের একটী মন্দিরে কয়েকটী বুদ্ধমূর্ত্তির ইতিহাস পাঠ করিলে মনে ঐ প্রশ্নের উদয় হয়।

একটী উৎপাটিত বৃক্ষমূল, মূলের নিম্নভাগ উল্টাইয়া ঊর্দ্ধমুখে স্থাপিত। তাহাতে ৫৩ বুদ্ধমূর্ত্তি শোভা পাইতেছে। প্রত্যেক মূর্ত্তি শতদলে উপবিষ্ট। ইহার পরিকল্পনা যেমন অদ্ভুত, রচনা কৌশলে চিত্রগুলি তেমনই মনোজ্ঞ। বিহারের ভিক্ষুরা এই দৃশ্যটী সম্বন্ধে পুরাকালাগত একটী গল্প বলিয়া থাকেন। কথিত আছে, অতীতকালে ভারতবর্ষ হইতে ৫৩ জন ভিক্ষু বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার মানসে কোরিয়ায় আগমন করিয়াছিলেন। পথশ্রান্তি বশতঃ ভিক্ষুদের বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা হয়। তাহারা যে স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন তাহারি সম্মুখে একটী কূপ ছিল। কূপের তীরে একটী শাখা-প্রসারিত-বৃক্ষছায়ায় চারিদিক মণ্ডিত। এ হেন সুন্দর নির্জ্জন স্থানটীতে ভিক্ষুরা বসিয়া আরামে বিশ্রাম করিতেছেন এমন সময়ে হঠাৎ কূপমধ্য হইতে তিনটী ভীষণকায় দৈত্য বাহির হইয়া ভিক্ষুদের সংহার করিতে উদ্যত হইল। দৈত্য-ত্রয় যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াই বায়ুরাজ্যের অপদেবতাকে সাহায্যার্থ আহ্বান করে। অপদেবতা আসিয়াই কূপের নিকটের বৃক্ষটী সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলে। কিন্তু হঠাৎ এই অঘটন-ঘটনে ভিক্ষুরা ভয়ে দিশহারা হইবার লোক ছিলেন না। তাহারা প্রতিজনে উৎপাটিত বৃক্ষের প্রত্যেকটী শিকড়ে একটী করিয়া বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপন করেন। এই মূর্ত্তি প্রভাবে দৈত্যেরা শক্তিহীন হইয়া পড়ে, এবং প্রাণভয়ে কূপ-গর্ভে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়। তাহাদের কূপে প্রবেশ মাত্র ভিক্ষুরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর-খণ্ড দ্বারা কূপটী ভর্ত্তি করিয়া ফেলেন। এইরূপে কূপ-মধ্যে দৈত্যদের চিরসমাধি হয়। এই দৈত্য-সমাধির উপরে ভিক্ষুরা উ-চোম্-সা বিহারের প্রধান মন্দিরটী নির্ম্মাণ করেন।

এই তো গল্প! ইহা কি বুদ্ধমূর্ত্তির প্রভাবপ্রচারার্থ আজগুবি কাহিনী, অথবা বৌদ্ধ ধর্ম্মের শুভ-প্রভাবে অমঙ্গল কিরূপে পরাজিত দূরীভূত হয়, তাহার ইঙ্গিত? অথবা, ঐ উ-চোম্-সা বিহার সত্যই ভারতীয় ভিক্ষুপ্রচারকদের কোরিয়া গমনের স্মৃতি-সৌধ—আজ এতকাল পরে তাহার যাথার্থ্য কে নির্ণয় করিবে?

জাপানে কোরিয়ার প্রভাব

রীতিমত যুদ্ধকৌশল আয়ত্ত করিয়া নিজেরা মরিয়া এবং শত্রুকে মারিয়া যে দেশবাসী আত্মরক্ষা করিতে পারেনা, আক্রমণকারী বিদেশীকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারেনা, সহস্রবিধ গুণ থাকা সত্ত্বেও সে দেশের যশ ও মান ম্লান হইয়া থাকে। জাপান ও কোরিয়ার ইতিহাস একত্রে পাঠ করিলে একথার সত্য বুঝা যায়। যে জাপান আজ এত উন্নত সেই জাপানের সহিত সভ্য জগতের প্রথম পরিচয় করাইয়া দিয়াছিল কোরিয়া। অথচ এই জাপান কোরিয়ার অপমান বড় কম করে নাই।

শুনা যায় ২৯ হইতে ৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে কোরিয়ার সিমরা প্রদেশ হইতে জনৈক দূত জাপানের রাজসভায় উপস্থিত হ'ন এবং মিকাডোকে আয়না তরবারী, এবং আরও কতক শিল্পদ্রব্য উপঢৌকন প্রদান করেন। ১৫৭—৩০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে নিপনে প্রথমে গ্রন্থাদি নীত হইয়াছিল—জাপ ইতিহাসে এরূপ একটী কাহিনী আছে। তবে এ কাহিনী তেমন বিশ্বাসযোগ্য নহে বলিয়া ইহার ঐতিহাসিক মূল্যও তেমন বেশী নহে। জিক্ষু নামক জনৈক ব্যক্তি কোরিয়ার সিনরা প্রদেশ হইতে গ্রন্থাদি সহ প্রথম জাপানে গিয়া থাকিবেন। বাণী (Wani) যে ৩য় শতাব্দে গ্রন্থাদিসহ জাপানে গিয়াছিলেন ইহা অবিসম্বাদী সত্য। ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রথমে কোরিয় ভিক্ষুদের দ্বারা জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। এই ভিক্ষুদের উৎসাহে ও প্ররোচনায় কোরিয়ার বর্ণমালা গ্রথিত হয়, সাহিত্য শিল্পে নবশক্তি সঞ্চারিত হয়। হোরিউজি স্থানে, কিওটায় এবং নারায় যাদুঘরে রক্ষিত প্রাচীন চিত্রে, মূর্ত্তিতে, দ্রব্য সম্ভারে কোরিয় শিল্পীর প্রভাব আজিও সুস্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে। ৭ম শতাব্দীতে চীনের মিঙ্ সম্রাটের সহিত যুদ্ধে কোরিয়ার হিক্কসেই প্রদেশ পরাজিত হয়। এই সময়ে বহু কোরিয়াবাসী নরনারী জাপানের ওমি, কুয়ানতো প্রদেশে চলিয়া যায়। জাপানী শিল্পে ইহাদের প্রভাব কম নহে। বিহার নির্ম্মাণে, জীর্ণ বিহার সংস্কার কার্য্যে, গ্রন্থ সংগ্রহ কার্য্যে জাপানীরা বহুবার কোরিয়ার সাহায্য প্রার্থনা

করিয়াছে, গুরু যেমন প্রিয় শিষ্যকে জ্ঞান দান করেন, কোরিয়াও তেমনই শ্রদ্ধাভরে জাপানকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়াছে। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার হয় প্রথমে চীনে। কোরিয়াবাসীরা চীনের অনুকরণে তাহা স্বদেশে প্রবর্ত্তন করে। কোরিয়ার অনুকরণে জাপানীরা দ্বাদশ শতাব্দীতে মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। উপরে উক্ত ঐ সকল কারণে জাপানীরা কোরিয়ার নাম রাখিয়াছিল—"Treasure-Land of the West," অর্থাৎ পশ্চিমের ধন-ভাণ্ডার।

কোরিয়ার জ্ঞানী ভিক্ষুরা স্বদেশের সমাজবিধি, চীনের সাহিত্য, ভারতের ধর্ম্ম জাপানে প্রচার করেন। এই তিনের উপর ভিত্তি করিয়া জাপানের সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে।

কোরিয় সভ্যতায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব

খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে চীনের শিক্ষাসভ্যতা কোরিয়ায় প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়। কেহ কেহ বলেন, খৃষ্টপূর্ব্ব ২য় কি ৩য় শতাব্দীতেই চীনসভ্যতার আলো কোরিয়ায় প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। তৃতীয় শতাব্দীতে কোকুরাই প্রদেশবাসীদের দ্বারা চীন গ্রন্থাদি কোরিয়ায় নীত হয়। ৪র্থ শতাব্দে কোরিয় সম্রাট হেন্‌কেন্ নামক জনৈক পণ্ডিতকে চীন সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। দেশে শিক্ষাপ্রচারের আবশ্যকতা এই প্রথম রাষ্ট্রপরিচালকদের দ্বারা স্বীকৃত হয়। চৈন সাহিত্য শিক্ষার কল্যাণে কোরিয়ায় বহু গুণীব্যক্তির অভ্যুদয় হইয়াছিল। কিন্তু কোরিয়ায় শিক্ষা ও সভ্যতার প্রকৃত বলসঞ্চার হইয়াছিল বৌদ্ধধর্ম্ম ও সংস্কৃত ভাষার প্রচলনে।

বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে যেমন চীনে তেমনি কোরিয়ায়, শিক্ষা ছিল রাজকুলে এবং রাজদরবারী এবং দরবারী-সংশ্লিষ্ট সমাজে—দেশের উত্তমর্ণদের মধ্যে আবদ্ধ। বিপুল জনসাধারণ জ্ঞান-ভাণ্ডারের সর্ব্বরসে বঞ্চিত ছিল। জন্মগত, বংশগত এবং পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন সঞ্জাত পাপ ও সংস্কার আমরা সাধনাদ্বারা, কল্যাণকর্ম্মদ্বারা দূরীভূত করিতে পারি, ব্রাহ্মণ পারে, শূদ্র পারে, পথের ভিখারীও পারে, সিংহাসনের রাজাও পারে—একেবারে মুক্ত শুদ্ধ বুদ্ধ হইতে পারে। বৌদ্ধশাস্ত্রের এই নির্দ্দেশগুণে কোরিয়ার বিহারে যেমন সংসারবিরাগী রাজপুত্রেরা স্থান পাইয়াছিলেন, তেমনই উঞ্ছ কুড়াইয়া যাহাদের দিন চলে তাহারাও স্থান পাইয়াছিল,—একই শিক্ষা লাভ করিয়া সকলেই জ্ঞান রাজ্যে সমান অধিকারী হইয়াছিল। প্রধানতঃ এই কারণে দেখিতে পাওয়া যায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তনপ্রভাবে কোরিয়ার সমাজে সকল স্তরের লোকমধ্যে শিক্ষা প্রচারের সুবিধা হইয়াছিল।* বৌদ্ধ মূর্ত্তিশিল্প, চিত্রশিল্প নির্ম্মশিক্ষার যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী দেশমাত্রেই জনগণের বোধগম্য সহজ সরল পুস্তক পুস্তিকা প্রচারিত হইত, কোরিয়াতেও হইয়াছিল। কোরিয়ার যে সকল ভিক্ষু সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং শিক্ষা সম্বন্ধীয় কার্য্য পরিচালনে নেতৃত্ব করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকে দীন দরিদ্র ও নীচ-কুলে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। সর্ব্বভূতে শ্রদ্ধা—এই শিক্ষা প্রভাবে কোরিয়ার নিম্নশ্রেণীর লোকেরা যথেষ্ট আদর পাইয়াছিল। কি নীচকুলজাত, কি উচ্চকুলোদ্ভব কোরিয়ায় মেধাবী, তীক্ষ্ণধী, মনীষী, ছাত্রমাত্রই বৌদ্ধগুরুর নিকট শিক্ষা লাভ না করিয়া তৃপ্তি পাইত না।

কোরিয়ায় প্রচলিত বর্ণমালা বৌদ্ধধর্ম্মের ফল। নিদো বর্ণমালা বিখ্যাত পণ্ডিত শ্সেল্ চওঙ্ ৮ম শতাব্দীতে আবিষ্কার করেন। কোরিয়াবাসার উচ্চারণ সাদৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই বর্ণমালা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। শ্সেল্ চওঙ্ ছিলেন বৌদ্ধভিক্ষু। কোরিয়ায় বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত বর্ণমালা ১৪৪৭ খৃষ্টাব্দে প্রবর্ত্তিত হয়। এই বর্ণমালার নাম উন্‌মেন্। তিব্বতীয় বর্ণমালার আদর্শে উহা গঠিত। তিব্বতীয় বর্ণমালা ভারতীয় ভিক্ষুদের শিক্ষাপ্রভাবে সংস্কৃত বর্ণমালার আদর্শে গ্রথিত হইয়াছিল।

* "As in most Asiatic countries into which Chinese culture penetrated, popular education was for centuries a thing unthought of. Learning was the privilege of a few courtiers who jealously guarded it from the vulgar, as an accomplishment for those about the royal person, or in the noble families.

Buddhism furnished the popular or democratic element, which brought learning to the lower strata of society."

তিব্বতরাজ স্রন-চান-গাম্পো স্বদেশী ভাষায় লিপি প্রবর্ত্তন মানসে স্বীয় মন্ত্রী থন্মি সম্ভোত কে ষোলজন সঙ্গীসহ ভারতবর্ষে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সম্ভোত সঙ্গীগণ সহ সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া, "উ-চান" এবং "উ-মে" বর্ণমালা সৃষ্টি করেন। এই তিব্বতীয় লিপির অনুকরণে কোরিয়ার বর্ণমালা উন্‌মেন গ্রথিত হয়। দুই দেশের বর্ণমালাই বৌদ্ধধর্ম্মের সুফল। বিশেষজ্ঞেরা বলেন—কোরিয়ার উন্‌মেন বর্ণমালা পৃথিবীর বর্ণমালামধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও কার্য্যোপযোগী।

বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে কোরিয়াবাসী শত শত অপদেবতার ভয়ে ভীত সঙ্কুচিত চিত্তে জীবন যাপন করিত। কোরিয়াবাসীর বিশ্বাস যে, অসংখ্য অশরীরী অপদেবতা পৃথিবীময় কিলবিল করিয়া বেড়াইতেছে। হাওয়ায় হাওয়ায়, মেঘরাজ্যে, বৃক্ষোপরে, জলস্রোতে, পাহাড়ে পর্ব্বতে, ঝোপে ঝাড়ে কেবল ভূত আর পেত্নী। মানুষের অমঙ্গল সাধন ইহাদের একমাত্র কার্য্য। কাহারও পা ভাঙ্গিয়াছে, মাথা ধরিয়াছে, পেটের ব্যারাম হইয়াছে। কাহারও বা মৃত্যু হইয়াছে—এ সকলের একমাত্র কারণ অপদেবতার ক্রোধ। অতএব কোরিয়ায় ওঝাঝাড়া, জলপড়া, ভেল্কিবাজির একাধিপত্য। আজিও ইহার সমূলে উচ্ছেদ হয় নাই, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাবে কোরিয়াবাসী মানুষের শক্তিসাধনার অন্য দিকটা দেখিতে পাইয়াছিল। মারের পরাজয় বার্ত্তা, মানুষের মঙ্গলকামী দেবতাদের কাহিনী, ঔষধ প্রয়োগে রোগ তাড়াইবার কৌশল, সাধনা বলে মানুষের অপ্রতিহত শক্তিলাভের কথা বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত কোরিয়ায় প্রচারিত হইয়াছিল। চরিত্রের দৃঢ়তাবলে সাধনাবলে মানুষ দেব-শক্তি লাভ করে। মানুষ অপদেবতাকে ভয় করেনা,—অপদেবতা মানুষকে ভয় করে। বৌদ্ধধর্ম্মের এই বীরবাণী এই অভয়বাণী, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার ফলে, কেবল কোরিয়ায় নহে, এশিয়ার অনেক অনুন্নত জাতিমধ্যে, সদা সঙ্কুচিত ভীত জনগণের মনে সাহস ও আশার সঞ্চার করিয়াছিল।

ভূতপ্রেত অপদেবতার বাস অন্ধকারে, আমাদের মনের কুৎসিত কল্পনা ইহাদের জন্মস্থান। আমাদের সৌন্দর্য্যবোধ হইতে দেবতার কল্পনা। যেখানে দেবতা, সেইখানে আমাদের চিন্তাশক্তি বন্ধকে ছাড়াইয়া চলে। যেখানে দেবতা সেখানে পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতা। কোরিয়ার বিহারে প্রবেশ করিলে একথার যথার্থ উপলব্ধি হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধবিহার কোরিয়াবাসীর মনে দেবত্ব ও সৌন্দর্য্যবোধ জাগ্রত করিয়া দিয়াছে। জন্মান্তরবাদ প্রচার হেতু সর্ব্বভূতে দয়া ও প্রীতি-জ্ঞান এদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের আর একটী সুফল।

কোরিয়ায় বুদ্ধদেব "পুল" নামে অভিহিত। "ন-মু আমি তাবুল" অর্থাৎ নমো অমিতাভ—এই মন্ত্রে আজিও কোরিয়াবাসী বুদ্ধদেবকে নমস্কার করিতেছে। নমো অমিতাভ—এই বাণী কোরিয়ার বিহারে বিহারে আজিও প্রত্যহ উচ্চারিত হইতেছে। একথা যখন পাঠ করি, তখন ভারতবর্ষের সহিত কোরিয়ার তথা বৌদ্ধজগতের যোগাযোগ যে কতটা, সেই চিন্তা মনকে কি আনন্দের উচ্ছ্বাসেই জাগ্রত করিয়া তোলে!

কোরিয়ায় বিহারে বিহারে বৌদ্ধদেবতা, বিহার প্রাচীরে বৌদ্ধচিত্রাদি বিভিন্ন দেশের বৌদ্ধবিহারের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বৌদ্ধমূর্ত্তি সর্ব্বত্রই একই আদর্শে রচিত হইয়াছে। অন্যান্য বৌদ্ধশিল্পরচনাতেও চীন, জাপান, ভারতবর্ষ, শ্যাম, সিংহলের সহিত আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান। আমাদের সামাজিক আচার, ধর্ম্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠান এবং চিন্তাধারার সহিত এই সকল দেশের সঙ্গে বিভিন্ন স্বার্থ সংঘাত এবং বৈপরীত্য বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাচ্য এশিয়াখণ্ডে মিলনের একটী মূল সূত্র রাখিয়া গিয়াছে। সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিলে প্রাচ্য এশিয়ার প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। আমরা বহুকালাবধি পাশ্চাত্য জগতের ইতিহাস পাঠ করিয়া আসিতেছি। এইবার তাহার সহিত প্রাচ্য এশিয়ার ইতিহাস পাঠ করিতে এবং ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধান করিতে বুদ্ধদেবের স্বদেশবাসীকে আহ্বান করিতেছি। ঐতিহাসিক এবং ইতিহের ভক্ত পাঠকেরা এক্ষেত্রে ইতিহাস আলোচনার আনন্দ লাভে বঞ্চিত হইবেন না—একথা আমরা বলিতে পারি।

শ্রীশশিকান্ত সেন।

ব্যর্থ-প্রতিদান

সকলি দিয়ে তুমি পাওনি প্রতিদান,
নীরব ছিলে সদা কওনি কথা,
দেখায় ছল ক'রে করেছি অভিমান,
কত যে সয়ে ছিলে প্রেমের ব্যথা!
বলেছি কতবার 'ভাল ত নাহি বাসো,'
চেয়েছ তুমি শুধু নয়ন তুলি—
বুঝাতে চাহিতে যা প্রাণের ভাষা দিয়ে
নিঠুর আমি তাহা যেতাম ভুলি।

উজাড় করি প্রাণ সকলি দিয়ে ছিলে,
নেবার নেশা ছিল ঘিরিয়া মোরে;
তোমারি যাহা কিছু দেওয়া ত হয় নাই,
কি ভুল করেছি গো দারুণ ঘোরে!
আজিকে দিতে চাই ঢালিয়া সারা প্রাণ,
কর গো কর ক্ষমা সকল ত্রুটি;
তুমি ত চলে গেছ, কে নেবে প্রতিদান,
হৃদয় কাঁদে আজ ধূলায় লুটি।

শ্রীকানাইলাল দে বিএ,।

শ্বেতাশ্বতর

উপক্রমণিকা

উপনিষদের কথা আরম্ভ হইলেই বুকের ভিতর আমাদের গর্ব্ব জাগিয়া উঠে। বিশেষ ভাবে মনে পড়িয়া যায়, যে দেশবাসী বিদ্যাবত্তায় আজ জগতে অনেকের পশ্চাতে, তাহারাই একদিন সকলকে বিশ্বের অমৃতোপম শ্রেষ্ঠ বাণী শুনাইয়াছিল, তাহারাই একদিন জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া জ্ঞানের মন্দিরে পথ প্রদর্শন করিয়া চলিয়াছিল। সে গৌরবও আর নাই—সে জ্ঞানও নাই। তবে সকলই যে কালের অতল গর্ভে বিলীন হইয়াছে তাহা নহে। অনেকই গিয়াছে, স্বল্পই আছে। আর যাহা আছে, তাহার মধ্যে উপনিষদই শ্রেষ্ঠতম। প্রাচীন ইতিহাস ও গাথা, বিজ্ঞান ও শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে অন্যান্য দেশ বিদেশ আসিয়া—বলে—"দেখিয়া যাও আমাদের দেশ, অনেকটা বোধ হয় আমাদের কাছ হইতেই তোমাদের নেওয়া।" কিন্তু উপনিষদের কথা আরম্ভ হইলে সকলে বিস্ময়ে আপ্লুত নেত্রে চাহিয়া থাকে, আর ভাবে যেন এ এক স্বপ্নরাজ্যের অস্পষ্ট মধুর ছবি—যেন কত জ্ঞান ও কত ভাবুকতা উহার প্রতি বর্ণে বর্ণে উদ্ভাসিত হইতেছে।

তবে ইহা স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য যে ঠিক নিজের চক্ষু দ্বারা দেখিতে গেলে এই গর্ব্বানুভব করার জন্য আমরা যথার্থ ভাবে উপনিষদ বিচার করিতে পারি না। অনেক দোষকে হয়তঃ গুণ বলিয়া ভাবি, অনেকগুলি ভ্রম হয় ত আমাদের দৃষ্টিই আকর্ষণ করে না। সুতরাং বাধ্য হইয়া সচরাচর আমাদিগকে বৈদেশিক লেখকদের সমালোচনা লইয়া উপনিষদের মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিতে হয়। নতুবা সত্য বস্তুর যথার্থতা আমরা যেন ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না। এই জন্য যাহারা ইংরাজী ভাষায় রূপান্তরিত উপনিষদ পাঠ করিয়া থাকেন এবং বৈদেশিক লেখকের ব্যাখ্যা হইতে উপনিষদের সার লাভ করেন, তাঁহাদিগকে ততটা দোষ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। এই প্রবন্ধে বৈদেশিক ব্যাখ্যা সাধারণতঃ ব্যবহার করা হইবে না।

সর্ব্বপ্রথমেই কথা উঠিতে পারে কেন আমি আর আর উপনিষদ পরিত্যাগ করিয়া এই শ্বেতাশ্বতর লইয়া বসিলাম। ঐতিহাসিক হয়তঃ প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা দ্বারা বুঝাইয়া দিবেন অপেক্ষাকৃত প্রাচীন আরও উপনিষদ আছে, সাহিত্যিক

হয়তঃ বলিবেন, তোমার ভাল লাগিবে বলিয়াই শ্বেতাশ্বতর কেন? ঈশ, কেন, কঠ ইত্যাদি সহজশ্রাব্য ও কথ্যগুলি থাকিতে কেন ঐ শ্বেতাশ্বতরের প্রথম অবতারণা। ভাল লাগিল বলিয়াই কি সর্ব্বপ্রথম উহাই বলিতে হয়? এই সকল কথার প্রত্যুত্তর না থাকিলেও শুধু এইটুকু আমি বলিতে চাই, যে রাজ্য লইয়া উপনিষদের তত্ত্বালোচনা, সে রাজ্যে অগ্রপশ্চাৎ কিছুই নাই, আছে শুধু—এক বিরাট—বর্ত্তমান (Eternal Now)। কালকে সেখানে এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান করিয়া—তাহাকে প্রশ্ন করা হইতেছে, তুমি কি করিতে পার, দৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় তোমার স্থান কোথায়? যদি কালের অবস্থা এই প্রকার দাঁড়াইল, তবে কেমন করিয়া বলিব, ঐতিহাসিক, তোমার স্থান সে রাজ্যে কোন স্থানে যাইয়া পৌছে? এটুকুও বলা প্রয়োজন, ভাল লাগা আর মন্দ লাগার উপর উপনিষদের কোনও তত্ত্বের সত্যাসত্য নির্ভর করে না। করে শুধু সুযুক্তির উপর। সুতরাং ভাল লাগিলেও তাহাকে কষ্টিপাথরের ঘর্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে, আর মন্দ লাগিলেও তাহাকে অবিচারে নির্ব্বাসন দেওয়া যাইতে পারিবে না।

এখন কথা উঠিতে পারে "শ্বেতাশ্বতর" দ্বারা আমরা কি বুঝি? অভিধান হয় ত অনেক অর্থ বলিয়া দিতে পারে, কিন্তু আমরা জানি, শব্দের অর্থ নির্ণীত হয়, যে প্রসঙ্গে ঐ শব্দ ব্যবহৃত হয় তাহা দ্বারা। এখন শ্বেতাশ্বতর নামীয় উপনিষদে এইশব্দের অর্থ সম্বন্ধে কোনও আভাস কি নাই? আছে ষষ্ঠ অধ্যায়ের একবিংশ শ্লোকে লিখিত আছে—

> তপঃ প্রভাবাদ্ দেব প্রসাদাচ্চ
> ব্রহ্ম হ শ্বেতাশ্বতরোঽথ বিদ্বান্।
> অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিত্রং
> প্রোবাচ সম্যগৃষিসঙ্ঘজুষ্টম্।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে শ্বেতাশ্বতর নামা এক ব্যক্তি তপোদ্বারা ব্রহ্মের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন। তিনিই এই উপনিষদের বর্ণিত বিষয়গুলি ঋষি সঙ্ঘের সকাশে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহা হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে শ্বেতাশ্বতর একটী ব্যক্তির নাম। এবং তিনিই এই উপনিষদের বক্তা বা রচয়িতা। সেই জন্যই এই উপনিষদের নাম হইয়াছে শ্বেতাশ্বতর। তবে বক্তাটীর নাম রাম রহিম না হইয়া শ্বেতাশ্বতর কেন হইল সে কথার উত্তর দিবার ক্ষমতা আমাদের এখনও হইয়া উঠে নাই।

এই শ্লোকের "ঋষি সঙ্ঘ" শব্দটী প্রণিধান যোগ্য। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে তৎকালে বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় সভাসমিতিই বলুন বা সঙ্ঘ, সংসৎ বা পরিষৎই বলুন, ঐরূপ কিছু না কিছু ছিল। এই সঙ্ঘে পণ্ডিত লোক আসিতেন এবং তাহাদের সম্মুখে প্রবন্ধ পঠিত না হইলেও কথিত যে হইত সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। এবং কথনের পর আলোচনা ও মীমাংসা উভয়ই হইত বলিয়া বোধ হয়। আরও অনুমান হয় এই, যে প্রবন্ধ কথিত হওয়ার জন্যই সূত্রকারে গ্রথিত হইত এবং বর্ত্তমান সময়ের পঠিত প্রবন্ধের মত সুদীর্ঘ হইবার অবকাশ পাইত না। এই সঙ্ঘের উল্লেখ অপরাপর উপনিষদে খুঁজিয়া পাইলাম না। তবে তিন চারিজন পণ্ডিত সমক্ষে ব্রহ্মতত্ত্ব বর্ণনের কথা অধিকাংশ উপনিষদেই দেখা যায়।

এখন কথা হইতেছে এই যে শ্বেতাশ্বতর কি উদ্দেশ্য লইয়া উপনিষদ ব্যক্ত করিয়াছেন, আর কোন প্রকার প্রমাণের উপর তাহার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন?

প্রথমতঃ প্রমাণের কথাই বলিব। বেদে আছে কাজেই উহা স্বীকার করিতে হইবে,—অমুক ঋষিপ্রবর বলিয়াছেন, সুতরাং তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই এরূপ যুক্তি প্রমাণের কথা ধর্ম্ম দর্শন সম্বন্ধীয় অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতরে পাই না। সুযুক্তি ও গবেষণার উপরই তাহার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি প্রতিষ্ঠিত। তবে দুঃখের বিষয় ধারাবাহিক যুক্তি প্রমাণগুলি ভারতীয় দর্শনই বলুন বা উপনিষদই বলুন কিছুতেই আমরা পাই না। দর্শন ও উপনিষদগুলি লিখিত না হওয়ার ফলেই আমরা প্রমাণের সিদ্ধান্তটুকু অর্থাৎ conclusionটাই উল্লিখিত আছে দেখিতে পাই। কেমন করিয়া ঐ সব সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল তাহা বড় বেশী খুঁজিয়া পাইলাম না। অধুনা যাঁহারা ভারতীয় চিন্তাপ্রণালীর পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকে ঐ সমস্ত প্রমাণাবলী আবিষ্কার করিতে হইবে। নতুবা উপনিষদের সম্যক্ মহিমা বা তাৎপর্য্য ভাল করিয়া উপলব্ধি করা যাইবে না।

বৈদেশিক লেখকবৃন্দও ভারতীয় উপনিষদ ও দর্শনকে গ্রন্থাবলীর মধ্যে না ধরিয়া সংক্ষিপ্ত সূত্রাবলী বা aphorism

বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। তবে কথা উঠিতে পারে, যখন ঐ সকল উপনিষদের মধ্যে প্রমাণাবলীর নিতান্ত অভাব, তখন আমরা তাহা প্রস্তুত করিতে যাইব কেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে প্রমাণের অভাব থাকিলেও ভারতীয় দর্শন ও উপনিষদের সূত্রগুলি যে সুযুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহার আভাস যথেষ্ট আছে। স্বেচ্ছাচারিতার দোষ ভারতীয় দর্শনে তেমন ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে যাঁহারা অত প্রাচীনকালে ক্যান্টীয় দর্শনের তত্ত্ব জিজ্ঞাসায় সুনিয়ন্ত্রিত অত্যাবশ্যকীয় প্রথাগুলি আশা করেন তাঁহাদিগকে ব্যর্থমনোরথ হইতে হইবে। কিন্তু যদি সর্ব্ব প্রথমে ধরিয়া লওয়া যায়, কি যে তত্ত্বজ্ঞান আমাদের পক্ষে সম্ভবপর এবং যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ, মানুষের প্রকৃতি, কর্ত্তব্য ও মুক্তি, জগৎ উৎপত্তি ও ধ্বংস ইত্যাদি প্রশ্ন সম্পূর্ণভাবে না হইলেও আংশিক ভাবে মীমাংসা করা যায়, তবে ক্যান্টীয় পথ অবলম্বন না করিলেও ভারতীয় উপনিষদ ও দর্শন যে সুযুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার আভাস আমরা যথেষ্ট পাই। তবে ইহা স্বীকার্য্য যে এমন অনেকগুলি উপনিষদ আছে যাহাদের মধ্যে যুক্তিপ্রণালীর ধারা প্রয়াগের সরস্বতীর মত কোথায় যে লোপ পাইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায় না। অতি বিশ্বাসী পাণ্ডাদের মত ধর্ম্মবিশ্বাসীগণকে বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে,—"আছে আছে, আছে, এইখানেই আছে, তবে চর্ম্মচক্ষে তাহা দেখা যাইবে না।" এইরূপ যুক্তির পক্ষপাতী আমরা নই। আমরা যখন চর্ম্মচক্ষুসংযুক্ত মানুষ, তখন যুক্তিতর্ক যাহাই থাকুক না কেন, তাহাই আমাদের দৃষ্টিগোচর হওয়া আবশ্যক। এখন শ্বেতাশ্বতরের কথা বলা যাউক। উচ্চ অঙ্গের বিজ্ঞান ও আধুনিক দর্শন যে প্রকার প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত এই উপনিষদখানিতে অনেকটা সেই প্রকার প্রমাণ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই বিশ্বজগতের ঘটনাবলী ও বস্তুসমূহ এত অদ্ভুত ভাবে পরস্পরের সহিত সংমিশ্রিত যে ন্যায় শাস্ত্রানুমোদিত Deductive ও Inductive প্রমাণ কার্য্যকরী হইতে পারে না। এই সব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ Hypothetical প্রমাণের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। দর্শনের অধিকাংশ তত্ত্বই এই Hypothetical প্রমাণের উপরই নির্ভর করে। শ্বেতাশ্বতরও এই প্রমাণ অবলম্বন করিয়া তাহার প্রতিপাদ্য বিষয় সমূহ প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি সৃষ্টি রহস্য অর্থাৎ problem of creation হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। এবং প্রথমেই ঐ বিষয়ের প্রচলিত মত গুলি ক্রমান্বয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে উহা যুক্তিসঙ্গত নয়। এই প্রকারে তিনি দেখাইয়াছেন যে একমাত্র ব্রহ্মই জগদুৎপত্তির কারণ, অন্য কিছু হইতে জগৎ উৎপন্ন হইতে পারে না। নিম্নলিখিত শ্লোকটী পাঠ করিলেই উল্লিখিত কথাগুলি সমর্থিত হইবে। প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে লিখিত আছে—

> কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা
> ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যম্।
> সংযোগ এষাং ন ত্বাত্মভাবা
> দাত্মাপ্যনীশঃসুখদুঃখহেতোঃ॥

অর্থাৎ কাল (time) স্বভাব (nature) নিয়তি (law or fate) যদৃচ্ছা অর্থাৎ বিনা কারণে (chance) কি জগৎ উৎপন্ন করিয়াছেন, না আকাশাদি ভূতপঞ্চক (elementary matter = atoms) দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড গঠিত হইয়াছে, না উহারা সকলে একত্র হইয়া পরস্পর সাহায্যে এই ব্রহ্মাণ্ড প্রস্তুত করিয়াছে? অথবা ইহাও কি সম্ভব যে জীবাত্মাই এই জগতের মৌলিক কারণ? এই শ্লোক হইতে সুস্পষ্ট ভাবে বোঝা যাইতেছে শ্বেতাশ্বরের সময়ে দার্শনিক চিন্তা প্রণালীর ধারা অনেকদূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছিল। আধুনিক দার্শনিকগণের ন্যায় তৎকালীন জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিগণও সৃষ্টি প্রক্রিয়ার অধিকাংশ বিষয়ের মীমাংসার জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন। এখনও সকলে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন জগৎব্রহ্মাণ্ডের আদি আছে কি নাই? ভগবান উহা কোনও সময়ে (in time) সৃষ্টি করিয়াছেন কিনা? সৃষ্টি প্রক্রিয়া ও ভগবান সময় রাজ্যের বাহিরে অবস্থিত কিনা? মানুষের জন্ম মৃত্যু বৃদ্ধি ক্ষয় যেমন সময়ে সঙ্ঘটিত ও পর্য্যবসিত ভগবানও কি সেইরূপ সময়ের মধ্যে অবস্থান করেন, না সময়ই ভগবানে অবস্থিত? জগতের আদিতে কোনও আদ্যাশক্তি নিহিত আছে, না বিনা কারণেই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, না এই ব্রহ্মাণ্ড স্বয়ম্ভু (causasui)? অসংখ্য অণুপরমাণুর ঘাতপ্রতিঘাতেই এই জগতের উৎপত্তি না উদ্দেশ্যসম্পন্ন পরম শক্তিশালী ও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন দেবপুরুষ দ্বারা এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব হইয়াছে? নিয়ম দ্বারাই যাবতীয় জাগতিক বস্তু নিয়ন্ত্রিত ও গঠিত, না জাগতিক বস্তুর ব্যবহার

হইতেই নিয়মের উৎপত্তি? আরও দেখা যাইতেছে, যে সমস্ত বস্তু হইতে বিশ্বসৃষ্টি সম্ভব ছিল, তাহা লইয়াই শ্বেতাশ্বতর তাঁহার hypothesis গঠন করিয়াছিলেন। আমি ভাল বুঝি ও সমস্ত জানি বলিয়াই যে অপরাপরের মতাবলী প্রকাশ করিব না বা বিবেচনা করিয়া দেখিব না, এরূপ ভাব শ্বেতাশ্বতর পোষণ করিতেন না। তিনি আধুনিক দর্শনবিদের ন্যায় অপরাপর মতামত সমালোচনা করিয়া আপনার স্বকীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। শ্বেতাশ্বতর দেখাইলেন জাগতিক বস্তুসমূহ ও কার্য্য প্রণালী কাল, প্রকৃতি, নিয়ম, দৈব (chance) অণুপরমাণুর ঘাতপ্রতিঘাত কিম্বা এই সকলের সমবেত চেষ্টা অথবা জীবাত্মা দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। সুতরাং জগতের মধ্যে ঐ সকল পাওয়া গেলেও, জাগতিক অনেক বস্তু ও কার্য্য ঐ সকল দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারিলেও, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিপ্রক্রিয়া সম্যক বুঝিতে হইলে আমাদিগকে সৃষ্টিকর্ত্তা পরমাত্মার শক্তি মানিয়া লইতে হয়। একমাত্র পরমাত্মা দ্বারাই এই বিশ্ব সৃষ্টি ও বিশ্বের লীলা ও ঐশ্বর্য্য সম্ভবপর হইতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক পাঠ করিলেও আমরা দেখিতে পাই যে শ্বেতাশ্বতর উল্লিখিত বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি প্রণালী—যাহাকে সুধীগণ Hypothetical reasoning বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, সেই প্রণালীই অবলম্বন করিয়াছেন। যথা—

> স্বভাব মেকো কবয়ো বদন্তি
> কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ
> দেবস্যৈব মহিমা তু লোকে
> যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্।

যাঁহারা কবি তাঁহারা বলেন স্বভাব অর্থাৎ nature দ্বারাই এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে আবার অনেকে বলেন কালই (time) জগদুৎপত্তির মূল কারণ। কিন্তু শ্বেতাশ্বতর বলেন তাহা হই ও পারে না। ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে পরমেশ্বরের মাহাত্ম্যই জগৎসৃষ্টির প্রকৃত কারণ।

এখন প্রমাণের কথা হইল। এইবার শ্বেতাশ্বতরের প্রমেয়ের কথা বলা যাউক। অর্থাৎ তাঁহার উপনিষদে তিনি কি প্রমাণ করিয়াছেন এবং কোন নিগূঢ় উদ্দেশ্য লইয়া তিনি এই প্রমাণ কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, সেই কথাই এখন যথাসংক্ষেপে বর্ণিত হইবে।

উল্লিখিত শ্লোক হইতেই বোঝা যায় যে ঈশ্বর প্রমাণই শ্বেতাশ্বতরের অভিপ্রায়। তিনি আস্তিক অর্থাৎ ঈশ্বর বিশ্বাসী বা ব্রহ্মবাদী। তিনি ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন অথবা ঈশ্বরই তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়াছিলেন কারণ উল্লিখিত ষষ্ঠ অধ্যায়ের একবিংশ শ্লোকে লিখিত আছে—"ব্রহ্ম হ শ্বেতাশ্বতরোঽথ বিদ্বান্।" এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে রাম যেমন শ্যামকে দেখিতে পায়, শ্বেতাশ্বতরও কি ভগবানকে সেইরূপ দেখিতে পাইয়াছিলেন? হিন্দু ধর্মে ভগবানের সহিত ভক্তের দেখা সাক্ষাৎ ব্যাপারটার একটু বাহুল্য দেখা যায়। এই দেখা সাক্ষাৎ ব্যাপারটার উপর বৈদেশিক বিদ্বৎ সমাজ সমালোচনার অগ্নিবৃষ্টি করিয়াছেন আর হিন্দুসমাজের অধিকাংশ ব্যক্তি ধর্মের গভীরত্ব অত্যধিক ভাবিয়া পশ্চাৎপদ হইতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এই "দেখা সাক্ষাৎ" ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখা আবশ্যক। ইহা যে চর্ম্মচোখের দেখা বা অবয়বসম্পন্ন বস্তুবিশেষের দেখার মত নয় তাহা ভগবানের স্বরূপ বুঝিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। মানসনয়নে দেখাই শ্বেতাশ্বতরের সম্ভব হইয়াছিল। চর্ম্মচক্ষে ভগবানকে কেহ দেখে নাই, শ্বেতাশ্বতরও দেখেন নাই। ভগবানকে চর্ম্মচক্ষে দেখা যায় না। কারণ ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১৯ শ্লোকে লিখিত আছে—

> "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।"

অর্থাৎ তিনি অবয়বহীন নির্লিপ্ত অবিকারী অনিন্দনীয়। অন্যান্য স্থানে তাহাকে অনন্ত, হস্তপদাদিশূন্য, বিরাট, অসীম, সর্ব্বব্যাপী ইত্যাদি বলিয়া বর্ণিত করা হইয়াছে। এইরূপ স্থানকাল কার্য্য কারণ ইত্যাদির বহির্গত পরমাত্মাকে যাঁহারা চক্ষু দ্বারা দেখিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগকে হয় ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিতে হয়, নয় মনে মনে ঈশ্বরের একটী পার্থিব অবয়ব গঠন করিয়া রাত্রিদিন সেই মূর্ত্তিখানি ভাবার অগ্র মনোবিজ্ঞান বর্ণিত ভ্রমদর্শন বা Hallucination দেখিয়া তাহারা আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া উঠেন।

তবে কথা উঠিতে পারে, ঈশ্বর যদি অবয়বহীন বিরাট নিগূঢ় হন, তবে মানসচক্ষেই বা কেমন করিয়া দেখিব। শ্বেতাশ্বতর বলিয়াছেন, অনন্ত সান্তের মধ্য দিয়া অনা

প্রকারে প্রকাশিত হইতেছে এবং পরমাত্মা জীবাত্মার মধ্যেও প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশিত আছেন।—

"সর্ব্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ।
সর্ব্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ॥"

তৃতীয় অধ্যায় ১১ শ্লোক।

অর্থাৎ—এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুই সেই পরমাত্মার মুখ, মস্তক ও গ্রীবা স্বরূপ। তিনি সর্ব্বজীবের বুদ্ধিরূপ গুহাতে শয়ন করিয়া আছেন। সেই ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বগত। সুতরাং তাঁহাকে জানিতে পারিলেই সর্ব্ব বিষয়ে কল্যাণ হয়।

শ্বেতাশ্বতর আরও বলিয়াছেন—

"বেদাহ মেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হয়নায়॥"

তৃতীয় অধ্যায় ৮ শ্লোক।

অর্থাৎ—আমি পরমপুরুষকে অবগত আছি। তিনি স্বয়ং প্রকাশিত এবং তাঁহাকে জানিলেই অজ্ঞানতিমির বিনষ্ট হয় এবং মৃত্যুকে লঙ্ঘন পূর্ব্বক মানুষ পরম পদ প্রাপ্ত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত মুক্তিলাভের আর উপায় নাই।

সুতরাং দেখা যাইতেছে ব্রহ্মজ্ঞান এবং তদ্বারা মৃত্যুকে লঙ্ঘন করিয়া মোক্ষলাভ করাই শ্বেতাশ্বতরের নিগূঢ়তম উদ্দেশ্য।

শ্রীপ্রিয়গোপাল দত্ত এম এ, বি এল।

পাহাড়ী বাবা

একমাত্র কন্যা সুকুমারীর বাম বাহু তাবিজ ও কবচে ভারাক্রান্ত করিয়া যখন তাহার বৃদ্ধা মাতা জগত্তারিণী একটি দৌহিত্রের শুভাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার ডাক আসিয়া পৌঁছিল।

বৃদ্ধার শরীর শেষ হইল বটে, কিন্তু আকাঙ্ক্ষার শেষ হইল না। যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে এজগতের বায়ু আর তাহার নিশ্বাস প্রশ্বাসের আদান প্রদান করিতে বাধ্য নহে তখন জামাতা মথুরবাবুকে ডাকিয়া কহিয়া গেলেন—"বাবা, আর একটা বিবাহ করিও; কিন্তু আমার খুকুর যেন কোন কষ্ট না হয়।"

জননীর সহিত সুকুমারীর পার্থিব সম্বন্ধ ছিন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাবিজের সহিত তাহার বাহুর সম্বন্ধও বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

মথুরবাবু রাণাঘাটের একজন হাকিম। তাঁহার বয়স ছত্রিশ বৎসর এবং তাঁহার পত্নী সুকুমারী চব্বিশ বৎসরের। বিবাহের পর বার বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু একটি ক্ষুদ্র বালিকাও যখন তাহাদের দাম্পত্যমিলনের মাঝখানে তাহার আধিপত্য বিস্তার করিতে আসিল না, তখন স্বামী স্ত্রী উভয়েই পরিপূর্ণ আনন্দের মধ্যে বেশ একটু অভাব বোধ করিতে লাগিলেন!

স্বামী অফিসে চলিয়া গেলে একটা কর্ম্মহীন দীর্ঘ দিন সুকুমারীকে বড়ই বিব্রত করিয়া তোলে। ঘুমাইয়া, নভেল পড়িয়াও সে ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিত যে সবে মাত্র দুইটা বাজিয়াছে। কখনও নিকটস্থ গির্জ্জার "পাদ্রী দিদি" তাহাকে মথি লিখিত সুসমাচার শুনাইয়া যাইতেন। কিন্তু কেবলমাত্র অবকাশবিনোদনের জন্য একদিন তিনি তাঁহার অমূল্য উপদেশগুলি খরচ করিতে স্পষ্টই অস্বীকার করিয়া গেলেন। এই অলস অবকাশের মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া কেবল একটা কথাই তাহার মর্ম্মে আঘাত করিয়া যায়। তাঁহার উন্মুখ মাতৃস্নেহ যেন ব্যর্থ আলিঙ্গনে একটি সুন্দর শিশুকে বুকে জড়াইয়া ধরিতে চাহে। কত কাল্পনিক শিশুর সুকুমার মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া গড়িয়া এইরূপে কত দীর্ঘ দিন অতীত হইয়া গেল।

শনিবার দুইটার সময় কাছারির কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া

মথুরবাবু বাড়ী ফিরিয়াছেন। মুক্তদ্বার দিয়া তিনি যে কখন পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সুকুমারী তাহা জানিতে পারে নাই। মথুরবাবু দেখিলেন, শয়ন ঘরের জানালা খুলিয়া সুকুমারী কি যেন দেখিতেছে, আকাশ ভরা কাল মেঘের মত একরাশি চুল তাহার পিঠের উপর অযত্নে পড়িয়া রহিয়াছে। নারীত্বের নিষ্ফলতার গভীর চিহ্ন তাহার সুন্দর মুখখানিতে যেন একটা কাল ছায়া আঁকিয়া দিয়া গিয়াছে। তাহার ব্যর্থ মাতৃস্নেহ গভীর বেদনায় দেবতার চরণে কত নীরব মিনতি জানাইয়াছিল। কিন্তু নিষ্ঠুর বিধাতা তাহার সে বাসনা পরিপূর্ণ করিলেন না;—করিবেন কিনা তাহা কে জানে? ফুলের সার্থকতা সৌরভে, নারীত্বের বিকাশ মাতৃত্বে। কি হইল সে নারীজীবনের বাকা গন্ধহীন ফুলের মত ফুটিয়া, শুকাইয়া, ঝরিয়া পড়িল।

মথুরবাবুর জুতার শব্দে সুকুমারী সেই দিকে ফিরিয়া চাহিল। মথুরবাবু কহিল,—"আহা, অত কষ্ট ক'রে কাজ নেই। তুমি যা কচ্ছিলে তাই কর।"

"কি কচ্ছিলাম তুমি বল দিকি।"

"কার ও ছেলের উপর নজর কচ্ছিলে।"

"কেন আমি কি ডাইনী যে পরের ছেলের উপর নজর করতে যাব?"

মথুরবাবু কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে কহিলেন,—"তবে সে কাজটার চেষ্টায় থাকা যাক্, কি বল? মিয়াদ ত ফুরিয়ে গেল।"

"কোন কাজটা?"

"তোমার মায়ের সেই শেষ আদেশ। এত শীগ্‌গীর ভুলে গেলে সুকু?"

বেদনাপ্রাপ্ত শিশু যেমন নিজের বাহাদুরী দেখাইবার জন্য মলিন মুখে হাসির রেখা ফুটাইয়া তোলে, সুকুমারীও তদ্রূপ অনর্থক হাস্যের সহিত উত্তর করিল,—"বেশত, তা হ'লে এই আসছে বৈশাখেই শুভ কর্ম্মটা শেষ করে ফেল। শুভস্য শীঘ্রং।"

"আহা, তা সংস্কৃতটা কেন? বাঙ্গালাতেই বল যে এতে তোমার অমত নাই।

"এক রত্তি অমত নাই। বরং মত আছে।"

সুকুমারী তাহার বিস্তৃত উদাস নেত্র স্বামীর মুখের উপর বিন্যস্ত করিয়া পুনরায় কহিল,—"আমার এতে বিশেষ মত আছে। আমি কে? আমার জন্য তোমার পরকাল নষ্ট করবে কেন? স্ত্রীর সন্তান না হইলে স্বামী আবার স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে, স্ত্রীর মৃত্যু হ'লে স্বামী আবার বে করতে পারে। এত তোমাদের তৈরি, আইন চিরকাল চ'লে আস্‌ছে। নিয়ম ত আর আমার চাকর নয়। তুমি ফের বে কর।"

বেদনাতুরা পত্নীর এই অভিমানমাখা বাক্যগুলি মথুরবাবুর মর্ম্মে খোঁচা মারিয়া গেল। নারীজীবনের সমস্ত ব্যথা ঐ একটি স্থানে পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে; সেখানে হাত বুলাইয়া দিলেও রমণী তাহা সহ্য করিতে পারে না।

মথুরবাবু সুকুমারীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া সস্নেহে কহিলেন,—"ক্ষেপি, ছেলে হবে কিনা ভেবে আমি তোমায় বে ক'রেছিলুম?"

যে দিন মথুরবাবুর বদলীর হুকুম আসিল, সুকুমারীর ভ্রাতা অমরনাথ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অপরিচিত স্থানে একেবারে পরিবার নিয়া হাজির হইলে একজন হাকিমের অন্ততঃ থাকিবার অসুবিধা না হইতে পারে, কিন্তু খরচ ত বটে। এদিকে অমরনাথ প্রস্তাব করিলেন যে সুকুমারী কয়েকদিন তাহার বাসায় বেড়াইয়া আসিলে ভাল হয়।

অমরনাথের কর্ম্মস্থান কোচবেহারে। মথুরবাবু কহিলেন—"তোমরা স্বাধীন মুল্লুকের লোক। তোমার ভগ্নীকে যদি বারাসতে পৌঁছাইয়া দিবার অধীনতা স্বীকার করতে পার তবে নিয়ে যাও, কিন্তু দেখ হে অমরবাবু, একখানা খৎ সই ক'রে দিয়ে যেতে হবে।"

"কথাটা সদর আলার মতই বটে, যাদের কিছু বল্‌তে হ'লেই পেনাল কোডের ধারা মনে পড়ে। আচ্ছা তাই হবে। আমার ছুটির জন্য বাপের অসুখ ব'লে জাল টেলিগ্রাম দেখাবার দরকার হবে না। সুকুকে, না হয় আমিই দিয়ে যাব।"

সেই দিন সুকুমারীকে লইয়া অমরনাথ কোচবিহারে রওনা হইলেন,—মথুরবাবুও বারাসতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

কোচবিহারে অমরনাথের দুই বৎসরের ছেলেকে নিয়া সুকুমারীর এক নূতন কাজ বাড়িয়া গেল।

একে নীল— ণির অসম্ভব লালনপালনের দৌরাত্ম্যে খোকা মাটিতে পা ফেলিবার অবকাশ পাইত না, তদুপরি আর একটা মেহের উৎপাত আসিয়া তাহার শিশু জীবনের চঞ্চলতাকে একেবারে লোপ করিয়া দিল।

সেদিন নীলমণির বাজার হইতে ফিরিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইতেছিল। অমরনাথ বাবুর পত্নী অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সুতরাং এই মাহেন্দ্রক্ষণে খোকা মেজেতে পড়িয়া খুব গড়াগড়ি দিয়া লইল এবং নীলমণির ক'লকের ছাই সমস্ত মুখে মাখিয়া এক কিম্ভুত-কিমাকার ভোম্‌-ভোলানাথ সাজিয়া বসিল।

সুকুমারী সহসা ঘরে ঢুকিয়া ডাকিল, "বৌদি, শীগ্‌গীর বাইরে এস।"

"কি হয়েছে" বলিয়া বৌদিদি রান্নাঘরের বাহির হইলেন। সুকুমারী অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া খোকাকে দেখাইয়া দিল। খোকা কিঞ্চিৎ ভয় পাইয়া হস্তস্থিত ছাই মাথার চুলের মধ্যে গুঁজিয়া দিতে লাগিল। সুকুমারী গম্ভীর হইয়া কহিল, "হা ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে বৌদি, তুমি ত কেবল নভেল নিয়েই দিন কাটাবে। আমি তোমায় কতদিন ব'লেছি ছেলে মানুষ করা কি নীলুর কাজ? ধরনা, এই ছাইয়ের ভিতরে যদি কিছু বিষাক্ত জিনিশ থাকে।"

"ও ছাইর ভিতরে তোমার মাথা আছে।" এই বলিয়া খোকার মাতা পুনরায় রান্নাঘরে প্রবেশ করিলেন।

সুকুমারী খোকাকে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখের মধ্যে আঙ্গুল দিয়া লালামিশ্রিত ছাই বাহির করিতে করিতে কহিল—"আসুক আগে দাদা আফিস থেকে ফিরে। চাকরের হাতে ছেলের ভার দিয়ে উনি নির্ব্বাটে গিন্নিপনা কচ্ছেন।"

নীলমণি ঠিক তখন বাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহার ঐ নিদারুণ অযোগ্যতার মন্তব্যটা শুনিতে পাইল এবং চীৎকার করিয়া কহিল, "গিন্নিমা, শুনুন, শুনুন, আমি ছেলে মানুষ ক'রতে ক'রতে বুড়ো হ'য়ে গেনু, উনি কিনা ব'লছেন, ছেলে মানুষ করা কি চাকরের কাজ?"

গিন্নি রান্নাঘর হইতে ডাকিয়া কহিলেন, "হাঁরে নীলু, তুই বাছা এসে আমার এই মস্‌লাটা বেটে দে ত? ও পাগলীর কথায় কাণ দিস্‌নি।"

মস্‌লা বাটার সঙ্গে সঙ্গে নীলমণি ক্রমাগত বকিতে লাগিল, "এতবড় কথা! আমি একাজ ক'রতে ক'রতে বুড়ো হ'য়ে গেনু। আর ওঁর কিনা গায়ে লাগ্‌ল না।"

গিন্নি তাহাকে সুস্থ করিয়া বলিলেন, "ও ঐ রকম লোক। তুই ওর কথায় কাণ দিস কেন না?"

সুকুমারী এই সকল কথা শুনিয়া খোকাকে লইয়া উপরের ঘরে চলিয়া গেল এবং ঘুমপাড়ানো গীত গাহিতে গাহিতে তাহাকে বুকের উপর শোয়াইয়া রাখিল।

আজ সুকুমারীর প্রাণে একটা রুদ্ধ অভিমান মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে। তার ছেলে নাই, সে বন্ধ্যা। তার বৌদি ত সেই ইঙ্গিত করিয়াই নীলমণিকে নিরস্ত করিয়া দিল। সহসা একটা ঝাপ্‌টার মত তার দুই চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। হায় বন্ধ্যানারী! কেন এতখানি প্রয়োজনহীন স্নেহ বুকে করিয়া রাখিয়াছ?

অমরনাথ ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন যে সুকু রাগ করিয়া খোকাকে নিয়া শুইয়া রহিয়াছে। তাহার বৌদিদি অনেক সাধিয়াছে। কিন্তু সে কিছুতেই খাইবে না।

অমরবাবু গভীর স্নেহে ডাকিলেন, "সুকু, উঠে এস দিদি আমার।"

সুকুমারী ছলছল চোখে খোকাকে দাদার কোলে ফেলিয়া দিয়া আবার আসিয়া শুইল। অমরনাথ ছেলেকে ফিরাইয়া দিয়া কহিলেন, "তুমি না খেলে খোকাকে ত খেতে দেব না। আমিও খাব না। উঠে এস দিদি।" সুকুমারী খোকার মুখচুম্বন করিতে করিতে উঠিয়া গেল।

অনেক লোক পাহাড়ে বেড়াইতে যায় দেখিয়া সুকুমারী অমরনাথের কাছে এক বায়না ধরিয়া বসিল "দাদা আমাকে পাহাড় দেখাতে হবে।"

অমরবাবু কহিলেন, "আচ্ছা চল কাল বিকেলে সবাই মিলে পাহাড়ে বেড়িয়ে আসা যাক্‌।"

"বৌদিও যাবে! বেশ ত। কিন্তু খোকা কার কাছে থাক্‌বে?"

"কেন, নীলমণি রইল।"

"নীলমণির কাছে খোকাকে রাখা হবে না। আমার পাহাড় দেখে কাজ নেই।"

"আচ্ছা বরং ওকে নিয়েই চল।"

পরদিন সকল আয়োজন হইল। কোচবিহারের অনতিদূরে জয়ন্তিয়া পাহাড় একটা মেঘের প্রাচীরের মত দূরের পথিকের চক্ষে এক বিরাট সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তোলে। সুকুমারী এই প্রথম পর্ব্বত দর্শন করিল এবং নির্ভীক হৃদয়ে সর্ব্বত্র স্বচ্ছন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। অমরবাবু ক্লান্ত হইয়া একটা টিলার পাশে খোকাকে লইয়া বসিয়া রহিলেন। আর সুকুমারী তাহার বৌদি এবং নীলমণি এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বেলা শেষ হইয়াছে। একটু একটু করিয়া মেঘ জমিয়া জয়ন্তিয়ার কণ্ঠদেশে যেন মাল্য রচনা করিয়া দিল। ক্রমে ক্রমে দুরন্ত মেঘের মত বাতাসের ঝাপ্‌টা আসিয়া তাহার ক্রোড়ে খেলা করিতে লাগিল। অমরবাবু ঝড়ের উপক্রম দেখিয়া চিন্তিত হইলেন। সুকুমারী ও তাহার বৌদি একটা গুহার পাশে বসিয়া জয়ন্তিয়ার মহিমাময় সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছিল। এমন সময় সুকুমারী দেখিল, খানিকটা দূরে কাল কুচকুচে একটি ছেলে যেন ঘুমাইয়া রহিয়াছে। নীলমণি সিদ্ধান্ত করিল যে ওটা একটা কুলীর ছেলে টেঁসে হবে; মরা বলিয়া ওখানে ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

কিন্তু সুকুমারীর তাহা বিশ্বাস হইল না। সে ঐ কাল ছেলেটাকে সস্নেহে কোলে তুলিয়া লইল।

মৃতপ্রায় শিশু অতিকষ্টে চক্ষু মেলিয়া চাহিল। সুকুমারী কহিল, "বৌদি দেখ, শালগ্রামের মত কাল ছেলেটি ক্ষুধায় অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিল।"

অমরনাথ বাবুর স্ত্রী উত্তর করিলেন, "কাজ নেই ভাই, পরের ছেলে নিয়ে। ওখানে রেখে চলে আয় না, জল আস্‌বে এখন। ও যে কুলীর ছেলে, ছুঁতে নেই।"

সুকুমারী সে কথায় কর্ণপাত করিল না। বরং গভীর স্নেহে শিশুটিকে বুকে লইয়া কহিল, "বৌদি, ভাই, একটু মাই দাও মা। দেখ ক্ষিদেয় কেমন জিভ বে'র ক'চ্ছে।"

"ওসব নিয়ে আমায় ছুঁয়ো না—ছুয়ো না বলছি। ও শালগ্রাম যেখানে ছিল সেইখানে রেখে এস।"

"তাহ'লে আমিও বাড়ী যাব না বৌদি।"

তিনজনে অমরবাবুর কাছে ফিরিয়া আসিল। অমরনাথ দেখিলেন, চন্দ্রের কলঙ্কের মত একটি কাল শিশু সুকুমারীর বুকে যেন মাতৃত্বের আশ্রয় প্রাণপণে শক্ত করিয়া ধরিয়াছে।

অমরনাথের পত্নী কহিলেন, "দেখ দেখি কীর্ত্তি, এক পাহাড়ীর ছেলে কুড়িয়ে এনেছে। ওকে মানা কর। আমার গা কিন্তু বমি বমি কি যেন্না!"

অমরনাথ নীলমণির মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনিলেন। তাঁহার জানা ছিল যে এই পার্ব্বত্য অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হইলে পাহাড়ীয়া মনে করে যে শস্যপ্রদায়িনী বসুন্ধরা তাহাদের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। সেই কুপিতা ধরিত্রীর পরিতৃপ্তির জন্য তাহাকে একটি মানবশিশু উৎসর্গ করিতে হইবে। এই পার্ব্বত্য প্রদেশে এরূপ ঘটনা পূর্ব্বেও অনেকবার ঘটিয়াছিল। এই শিশুটিও যে সেই কুসংস্কারের উপহার তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

অমরনাথ কহিলেন "সুকু, তুমি ত ও ছেলে নিয়ে বাঁচাতে পারবে না, আমার কাছে দাও। পাহাড়ীর ছেলে, ওকে আবার ওখানে রেখে আসি।"

সুকুমারী উত্তর করিল, "দাদা, এযে কুড়ানো ছেলে, এর উপর আর কারো দাবী নাই। এ ছেলে আমি কাউকে দেব না।"

অমরনাথ সুকুমারীর প্রকৃতি বিলক্ষণ জানিতেন। সুতরাং বৃষ্টির উপক্রম দেখিয়া আর দেরী করা সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। সেই ছেলে নিয়াই বাড়ীর দিকে রওনা হইলেন।

কয়েকদিনেই সুকুমারী বালকটিকে নিতান্ত আপনার করিয়া লইয়াছে। অমর বাবু তাহার জন্য এক সের দুধ রোজ করিয়া দিলেন। তাঁহার পত্নী ঠাট্টা করিয়া কহিলেন, "আহা, তাদের কি আদর!"

সুকুমারী ছেলের নাম রাখিল শালগ্রাম। তাহার বৌদিদির নামটা পছন্দ হইল না। তিনি নাম দিলেন পাথুরে গোপাল।

সুকুমারী একদিন কহিল "দেখ, বৌদি আমার শালগ্রাম, খোকার মতন কেমন হামাগুড়ি দিচ্ছে।"

তাহার বৌদিদি উত্তর করিলেন, "ও, কাটখোট্টা পাহাড়ীর ছেলে। ও ত দুদিন পরে গাছে চড়তে শিখ্‌বে।"

পরকাল নষ্ট আবার স্ত্রী আবার যে চিরকাল তুমি

"বৌদি, আমার গোপালের যদি নাকটি আর একটু ঈষৎ উচু হ'ত, তা হ'লে কিন্তু চমৎকার চেহারা খুল্‌ত।"

"ওঃ, একেবারে লোহার কার্ত্তিক!"

"চোক্ দুটি যদি আর একটু বড় হ'ত!"

"তা হ'লে ওর চাহনীতে স্বর্গ থেকে সব অপ্সরী নেমে আস্‌ত, না? কর্ত্তার কাছে একখানা চিঠি দাও না যে আমি কেষ্ট পেয়ে যশোদা হ'য়ে ব'সেছি।"

"তা দিয়েছি" বলিয়া ক্রীড়াপরায়ণ গোপালকে কোলে লইয়া সুকুমারী গভীর স্নেহে মুখ চুম্বন করিল।

যাহার জীবন বন্যজন্তুর নিকট উৎসৃষ্ট হইয়াছিল, বিধাতা কি কৌশলে তাহাকে মাতৃক্রোড়ে পাঠাইয়া দিলেন!

অমরনাথের পত্নী কহিলেন "ভাই সুকু, একটা পাহাড়ী ছেলে এনে তুমি ভাই জাত জন্ম খোয়া'লে।"

সুকুমারী উত্তর করিল "হোক্ না ও পাহাড়ী ছেলে, তাতে কি হ'ল? ও ত পাহাড়িদের ভাত খায়নি।"

"মরণ দশা! ওর বাপ মা বিষ্টু ঠাকুরের সন্তান!"

"হ্যাঁ বৌদি, গোপাল আমার মস্ত কুলীন।"

"কুলীন বৈ কি, বাপের সঙ্গে দেখা নাই ক, হিদে জোলার নাতি?"

"ফের যদি তুমি অমন ক'রে বল, তা হ'লে বলছি তোমার দিব্যি আছে। ডিম থেকে পাখী হ'য় ব'লে কি ডিমকে কেউ পাখী বলে?"

সুকুমারী মথুর বাবুর নিকট চিঠি লিখিল, কি ভাবে পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়া গোপালকে কুড়াইয়া পাইয়াছে। এই সকল কথা বিস্তৃতরূপে জানাইয়া সাতখানা ডাক কাগজ লইয়া পাথুরে গোপালের রূপ বর্ণনা করিল। অবশেষে উপসংহারে লিখিল, "আজ আমি তোমার ছেলেধরা ডাক সার্থক করিয়াছি।"

মথুর বাবু চিঠির জবাব দিলেন। অন্যান্য কথার পর তিনি লিখিয়াছেন যে তোমার কুড়ানো ছেলেটিকে নিয়ে সত্বর এখানে এস। আর ও ছেলের নাম রাখিও পাহাড়ী বাবা। তোমাদের নাম রাখা ভাল হয়নি।

নামটা শুনিয়া সুকুমারীর বৌদিদি হাসিয়াই খুন, "কি কিম্ভুতে নাম বাবা! এমন নাম ত আমি কোন পুরুষে শুনিনি। ও তোমার কর্ত্তাবাবুর চৌদ্দপুরুষের বাবা।"

সুকুমারী বারাসতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। অমরনাথ বলিলেন, "আর ক' দিন থেকে যা' না দিদি।"

সুকুমারী উত্তর করিল, "না দাদা, আমার গোপালের জন্য মাষ্টার রেখে দিতে হবে। আমায় কালই পাঠিয়ে দাও।"

সুকুমারী পাহাড়ীকে লইয়া বারাসতে আসিয়া পৌছিল। মথুরবাবু কহিলেন, "ও গো, এযে পাথরের রং, তুমি কি পুষ্যিপুত্তুর ক'রে রাখ্‌বে না কি?"

"বাট, আমার পাহাড়ী আমারই আছে। ওকে আবার পুষ্যিপুত্তুর করতে যাব কেন?"

"যা হোক, তোমার বরাত ভাল, তাই পাহাড়েতেও ছেলে জুট্‌ল।"

পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। পাহাড়ীর আব্দারের আক্রমণে বাড়ীর ঝি চাকর ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার জন্ম পত্রিকায় সকলের অজ্ঞাতসারে যে কি নিগূঢ় ইতিহাস লিপিবদ্ধ ছিল তাহা বারাসতের কেহই জানিতে পারিল না। বাহিরে লোকে কাণাকাণি করিত যে ডেপুটিবাবুর ছেলেটি যেমন সুন্দর গিন্নিও তেমনি হবে। সুন্দর পুরুষ হইলেই সুন্দরী স্ত্রী ঘটে না, ইত্যাদি।

পাহাড়ী সুকুমারীকে মা বলিয়া ডাকে। সে সম্বোধনে পুত্রহীনার প্রাণ যে কি এক তৃপ্তির আস্বাদনে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে! সে ডাক শুনিতে শুনিতে হয়ত সে উত্তর করিতে ভুলিয়া যাইত। ভৃত্য রামচরণ একদিন ভুল ধরিয়া কহিল,—"মা, পাহাড়ীবাবু তোমায় ডাক্‌ছে সাড়া দিচ্ছনা যে।"

সুকুমারী বিরক্ত হইয়া কহিল,—"চুপ কর্! আমায় শুন্‌তে দে।"

কিছু বুঝিতে না পারিয়া রামচরণ চুপ করিয়া চলিয়া গেল।

বালক বালিকা যেমন খেলার পুতুলকে নিত্য নূতন পোষাক পরাইয়া, কাল্পনিক খাদ্য খাওয়াইয়া, খেলনার বিছানায় শোয়াইয়া কতপ্রকার আনন্দ উপভোগ করে, সুকুমারীও পাহাড়ী বাবাকে ঠিক সেইরূপ একটি জীবন্ত খেলনার মত আনন্দের সামগ্রীতে পরিণত করিল। মথুর বাবু একদিন কহিলেন,—"সুকু, তোমার পাহাড়ীকে পাঠশালায় পাঠিয়ে দাও। একটু একটু লেখা পড়া শিখুক।"

সুকুমারী ভাবিয়া উত্তর করিল,—"পাঠশালার গুরুমশাই যদি ওকে মারে! তার চেয়ে বাড়ীতে বরঞ্চ মাষ্টার রেখে দাও।"

অগত্যা মথুরবাবু একটি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ প্রাইভেট্ শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। শিক্ষক মহাশয় নিয়মিত মত পাহাড়ীকে "এ, বি, সি, ডি" এবং "অজ, সম" পড়াইয়া যাইতে লাগিলেন। কিন্তু বাল্যের নানারূপ পরিবর্ত্তনের গোলেমালেই বোধ হয় বিধাতা তাহার অদৃষ্টে বিদ্যা লিখিবার অবসর পান নাই। সুতরাং প্রাইভেট্ শিক্ষক বিনা পরিশ্রমে বিগত আট মাস ধরিয়া দশ টাকা করিয়া বেতন পাইতে লাগিলেন। তাঁহার কর্ত্তব্যেরও লাঘব হইল, কেননা গিন্নি স্বমুখে তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছেন, "মাষ্টার, পাহাড়ী যদি পড়তে না চায় তাহ'লে ওকে ছেড়ে দিও।"

মথুরবাবু লক্ষ্য করিলেন, পাহাড়ীর বুদ্ধি পাথরের মতই শক্ত। তাহাতে কোনও রূপ চাষ দিবার সম্ভাবনা নাই। তিনি সুকুকে ডাকিয়া চাহিলেন,—"দেখ, এ বুনো গাড়োলের বাচ্ছা না পুষে যদি একটা ডালকুত্তা পুষ্‌তে।"

সুকুমারী পাহাড়ীকে কোলে লইয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল।

এই পাঁচ ছয়বৎসর পর্য্যন্ত পাহাড়ীর শত অপরাধ শত ত্রুটি সে স্নেহের পক্ষপুটে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে।

পাহাড়ীর শিক্ষা তাহার বয়সের সঙ্গে আটিয়া উঠিতে পারিল না। এক এক করিয়া তিনজন মাষ্টার, দুইখানা স্পেলিং বুক এবং তিনখানা বর্ণ পরিচয় শেষ হইয়া গেল। অবশেষে সুকুমারী স্থির করিল যে পাহাড়ীর বিদ্যা অর্জ্জন করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। ওর একটু চিঠি পত্র লিখিতে শিখিলেই চলিবে।

এই ব্যবস্থানুসারে বালি কাগজের আমদানি করা হইল। কিন্তু পাহাড়ী দেখিল, বাড়ীর সম্মুখে প্রশস্ত মাঠ, সেখানে কত ছেলে সন্ধ্যার পূর্ব্বে ঘুড়ি উড়াইতে আসে; বালি কাগজে হাতের লেখা মক্স করার চেয়ে সে কাজটা নিতান্ত সহজ। সুতরাং সে তাহাতেই মনোনিবেশ করিল। সুকুমারী রামচরণকে সতর্ক করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

মথুরবাবু আফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন,—"সুকু, এক জানোয়ার ধ'রে এনে, সেটাকে আস্‌কারা দিয়ে দিয়ে তুমি আমার এম্নি ক'রে অপমানী করবে?"

সত্যিকার অপরাধ গোপন করিবার সময় মানুষের মুখে যেমন সাহস ও দৃঢ়তার চিহ্ন মাত্র থাকে না, সুকুমারীর মুখ খানিও সেইরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। মনের ভাব চাপিয়া রাখিয়া বেশ পরিষ্কার গলায় সুকু উত্তর করিল,—"কেন, কি হয়েছে?"

"হবে আর কি? তোমার নন্দদুলাল একটা কোচম্যানের সঙ্গে ব'সে গরুর গাড়ীতে রাস্তায় বেড়াচ্ছে। এই বুড়ো বয়সে তোমার ঐ খেলনা নিয়ে থাকাটা কি ভাল দেখায়? ওকে একটু শাসিয়ে দাও।"

সুকুমারী স্বামীর কথায় কোন উত্তর করিল না। একটা উদ্বেগের চিহ্ন তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল। গাড়ীতে উঠিয়া পাহাড়ী কোথায় যা। এই চিন্তা তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। তাড়াতাড়ি রামচরণকে সন্ধানে পাঠাইয়া নিজে স্বামীর খাবার আনিতে গেল।

মথুরবাবু খাবার খাইতে খাইতে কহিলেন,—"দেখ, একটা কালো পাহাড়ী ছেলেকে নিয়ে তুমি এত অস্থির হ'য়ে পড়লে, তোমার পেটের ছেলে হ'লে কি করতে—জানিনা।"

সুকুমারী কোন কথা কহিল না। মনে মনে উত্তর করিল, কাল ত আর কালির দাগ নয় যে সাবান মেখে ধুয়ে ফেলব? প্রকাশ্যে কহিল,—"ও গো, তোমার ভয় নেই। পাহাড়ী তোমার জমিদারীর অংশ নিতে আসে নাই। তুমি দিন রাত ওকে অমন ক'রে বল কেন?"

মথুরবাবু সুকুমারীর মুখের দিকে চাহিলেন, তখনও তাহার অধরোষ্ঠ ঈষৎ কম্পিত হইতেছিল।

দিন দুই বাদে রামচরণ অভিযোগ করিল যে পাহাড়ী বাবু একতারা কিনিতে তাহার ভাঙ্গা বাক্সে যে দুইটি টাকা ছিল তাহা নিয়া গিয়াছে।

সুকুমারী রামচরণের হাতে দুইটি টাকা দিয়া কহিল,—"খবরদার, বাবু যেন না শোনে।" ঘুষ দিয়া রামচরণকে বশ করা হইল, কিন্তু পরের দিন আন্ত ঝি কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—"মা, এই দেখ আমার নতুন কাপড়খানা পাহাড়ীবাবু ছিঁড়ে নিয়ে গেল। বল্লে যে ঘুড়ির সুতো মাজতে হবে। আমি ছেঁড়া নেকড়া দিচ্ছি, তা নিলে

না কো। আমার কি উপায় হবে গো। বাবু সেদিন এক জোড়া কাপড় দিয়েছে। আমার বোনঝিকে একখানা দিয়ে এসেছি, আর আমি নিজে একখানা রেখেছিনু।"

কাঞ্চনমণি ক্রমশঃ সুর চড়াইতে লাগিল। সুকুমারী বলিল,—"দেখ্ বাছা, এই টাকা নে, এক জোড়া কাপড় কিনে নি গে যা। বাবুর কাণে যেন এ কথা না যায়।"

প্রতিদিনই পাহাড়ী বাবার বিরুদ্ধে এইরূপ দুই এক নম্বর অভিযোগ আসিতেছিল। সুকুমারী কোথাও ক্ষতি পূরণ করিয়া, কোথাও জামিন থাকিয়া সকল মোকর্দ্দমাই মিটাইয়া দিতে লাগিল। তথাপি মুখ ফুটিয়া পাহাড়ীকে একটি কথাও বলিতে পারিল না। সে কতদিন শপথ করিয়াছে,—"হতভাগাটা এলে 'দূর ক'রে দেব। ও আমার কে? কেন ওর জন্য আমি স্বামীর কথা শুনতে যাই? কেন ওর জন্য ঝি চাকরের অনুযোগ শুনি!"

কিন্তু পাহাড়ীর শুষ্ক মুখখানি দেখিলে অমনোযোগী ছাত্রের মত মুখস্থ করা সকল শপথই ভুলিয়া যাইত। ঐ কালো শুষ্ক মুখখানিই ত, জীবনের প্রথম প্রত্যূষে না জানি কোন সত্বে তাহার হৃদয়ে অন্যায্য অধিকার বিস্তার করিয়াছিল।

বলি বলি করিয়া পাহাড়ীকে কোন কথাই বলা হইল না। বরং অবিরত ঢাকিয়া রাখিয়া একটু ক্ষুদ্র ঘাকে দুশ্চিকিৎস্য মহাব্যাধিতে পরিণত করা হইল। স্নেহের মহিমাকে খর্ব্ব করিবার জন্য, ক্ষমার মহত্ত্বকে দুর্ব্বলতার নিম্নস্তরে টানিয়া আনিবার জন্য এই প্রশ্রয় যেন ধীরে ধীরে পাহাড়ীকে অধঃপাতের দিকে ঠেলিয়া দিতে লাগিল।

দুপুর বেলা, বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। সমস্ত দিনটা মেঘ থাকাতে ঘুড়ি উড়াইবার বড় সুবিধা হইতেছিল না, সুতরাং পাহাড়ী সুকুমারীর কাছে ঘুমাইয়াছিল। কিছুক্ষণ পরেই পাহাড়ীর ঘুম ভাঙ্গিল এবং বালিশের নীচে তাহার মাতার চাবিগুচ্ছ দেখিয়া বাক্স খুলিতে বড়ই কৌতুহল হইল। শিয়রের কাছে ক্যাশবাক্সটি সুকুমারীর মূল্যবান গহনাগুলিতে পরিপূর্ণ ছিল। অনেক চেষ্টার পর পাহাড়ী দেখিল বাক্সের ডালা বেশ উপরে উঠিয়া আসিতেছে।

এই কয়েকদিন হইল বেমিলটনের বাড়ী হইতে কয়মাইস্ দিয়া সুকুমারী একছড়া নূতন নেকলেস্ তৈয়ার করাইয়া আনিয়াছে। তাহার লকেটে মথুর বাবু ও তাহার দুই খানা ক্ষুদ্র ফটো ও তাহার চতুর্দ্দিকে মূল্যবান জহরে কারুকার্য্য-খচিত। বাক্স খুলিতেই পাহাড়ী সেই লকেটটি দেখিতে পাইল এবং মুচড়িয়া মুচড়িয়া সেটি ছিঁড়িয়া বিছানার পাশে রাখিয়া দিল। তারপর দশখানা গিনি বাহির করিয়া নিয়া যখন নেক্‌লেস্‌টি বাক্সে রাখিতে গেল তখন উহা ঝপাং শব্দে বাক্সের ভিতরে পড়িয়া গেল।

শব্দ শুনিয়া সুকুমারীর নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং পাহাড়ীর কীর্ত্তিকলাপ দেখিতে পাইয়া রুক্ষস্বরে কহিল, "পাহাড়ী, তুই বাক্স খুলেছিস্ কেন রে?"

পাহাড়ী কোন কথা কহিল না।

সুকুমারী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "বল্ হতভাগা, বাক্সে তোর কি কাজ ছিল? বল্—বল্—নইলে তোকে—"

পাহাড়ী নিরুত্তর।

সুকুমারী তখন—এই বোধ হয় পাহাড়ীর জীবনের প্রথম দিন—তাহার কাণ ধরিয়া কহিল, "বল্, কেন বাক্স খুলেছিলি। যদি না বল্‌বি ত—"

পাহাড়ী ছল ছল নেত্র দুটি সুকুমারীর মুখের উপর বিস্তৃত করিয়া নীরবে জানাইয়া দিল যে এ কর্ম্মের কোনও উত্তর নাই। সুকুমারী আরও একটু দৃঢ় হইল। ডান হাতে পাখাখানা তুলিয়া কহিল—"কি বল্‌বিনি—বল্‌বিনি—"

পাহাড়ী গাল ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া অতি কষ্টে ক্রন্দন সম্বরণ করিতেছিল। সুকুমারী তাহার মুখের দিকে চাহিল। সেই দৃষ্টির সম্মুখে পাহাড়ী স্থির থাকিতে পারিল না। ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল এবং ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া অবিরত চক্ষের উপর রগড়াইতে লাগিল।

সুকুমারী একদৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। চাহিয়া চাহিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল সেই জয়ন্তিয়া পাহাড়ের তপ্ত পাষাণের উপর যখন পাহাড়ীর অসাড় দেহ প্রথম দেখিয়াছিল সেই দিনের কথা। তারপর তাহার বৌদিদি "ছুঁতে নেই, ছুঁতে নেই" বলিয়া কতদিন পাহাড়ীকে ফেলিয়া দিবার পরামর্শ করিয়াছিল; সেদিন ত এই কুৎসিৎ কাল ছেলেটিকে কেহই তাহার বক্ষের সিংহাসন হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। সে আজ নয় বৎসরের কথা। ভাবিতে ভাবিতে সুকুমারীর হৃদয়ে স্নেহ উথলিয়া উঠিল।

সমস্ত বিরসতার যেন এক বাক্যে বলিয়া গেল—"আহা, পাহাড়ীর কেউ নাই।"

সুকুমারী পাহাড়ী বাবাকে কোলে করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। পাহাড়ী তাহার বুকে মুখ লুকাইয়া কম্পিত দীর্ঘশ্বাসে সুকুমারীকে আকুল করিয়া তুলিল।

সুকুমারী জিজ্ঞাসা করিল "বাবা, কাণে খুব লেগেছে কি? কি হ'য়েছে, এই যে আমি হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।"

পাহাড়ী উত্তর করিল না। তাহার তপ্ত অশ্রু সুকুমারীর ব্যথিত বক্ষ সিক্ত করিতে লাগিল।

অবশেষে যশোদার মত সেই কৃষ্ণবর্ণ গোপালকে বুকের উপর তুলিয়া লইয়া সুকুমারী ঠিক তেমনি জোরে নিজের কাণ টানিয়া দেখিতে লাগিল, তাহার পাহাড়ীর কতখানি ব্যথা লাগিয়াছে; এবং নির্ব্বাক্ পাহাড়ীকে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিতে লাগিল, তাহার খুব লাগিয়াছে নাকি।

অন্তকার ঘটনা কাহারও কর্ণগোচর হইল না এবং ইহার জন্ম সুকুমারীর কাছে কেহ নালিশ রুজু করিতে আসিল না।

শনিবার মথুর বাবু দুইটার সময় কোর্ট হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, পাহাড়ী বাবা তাঁহার বড় যত্নের ছড়িখানা কাটিয়া তাহাতে ঘুড়ির সুতা জড়াইতেছে। মূল্যবান্ হেজেলের ছড়ি মথুরবাবু এই কয়েকদিন হইল, লেইডলয়ের দোকান হইতে কিনিয়া আনিয়াছিলেন।

এক হাতে সুতা জড়ানো ছড়ি, অপর হাতে পাহাড়ীর হাত ধরিয়া মথুরবাবু অন্তঃপুরে আসিয়া সুকুমারীকে কহিলেন "দেখ, তুমি এর একুল ওকুল দুকুল নষ্ট ক'রে দিলে। আমি ত একদিন বলেছি, ও গাড়োলের বাচ্ছা—ও কখনো পোষ মানে না। এখনো এই ইডিয়টকে বাড়ী থেকে দূর ক'রে দাও।"

পাহাড়ী ক্রমাগত চক্ষু রগড়াইতে লাগিল। সুকুমারী একটু চুপ করিয়া থমকিয়া উত্তর করিল, "ওগো, আমি দিন-রাত হাড়ে হাড়ে জলে যাচ্ছি। ওকে তুমি যা খুসী তাই কর। বারে বারে নালিশ জানাতে এসো না।"

সুকুমারী পাশের ঘরে গিয়া গোপনে চখের জল মুছিল। এক পা দুই পা করিয়া পাহাড়ী যথারীতি ঘুড়ী উড়াইতে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যা হইলে পাহাড়ী বাড়ী ফিরিয়া আসিল। কিন্তু আজ বিলম্ব দেখিয়া সুকুমারী রামচরণকে পাঠাইয়া দিল, এবং যেখানে গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানরা থাকে সেখানটা দেখিয়া আসিতে কহিল।

আলো জ্বালিয়া ঝি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা, ঠাকুর বসে আছে, কি রান্না করতে দেবে?"

সুকুমারী সে কথায় কর্ণপাত করিলনা। জানালা খুলিয়া দিয়া এক এক খানি গরুর গাড়ীর পানে আকুল-নেত্রে চাহিয়া রহিল এবং প্রত্যেক বালককে প্রখর দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল।

রামচরণ আটটার সময় ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, "মা, পাহাড়ী বাবুর কোন সংবাদ পাওয়া গেল না।" সুকুমারী সত্রাসে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কি গাড়োয়ানের বাড়ী গিয়েছিলি?"

"তা আবার যাই নি? দেখ না কত রাত হ'য়েছে। সবাই বল্লে যে সে আজ আর এখানে আসেনিকো।"

"যাদের সঙ্গে নিত্য ঘুড়ি উড়াত।"

"হাঁ, তাদের ঠেঁয়ে খবর নিলুম। কোথাও যাই নি।"

"তুই কি ঠিক্ ঠিক্ খবর নিয়েছিস্?"

"হাঁ, তিন কোশ হেঁটে গিয়ে সব্বাইর কাছে শুধিয়ে এনু।"

সুকুমারীর বুকের মধ্যে ছ্যাৎ করিয়া উঠিল। আর কোন কথা তাহার মুখে উচ্চারিত হইল না। সেইখানে বসিয়া পড়িল।

মথুর বাবু বেড়াইয়া আসিয়া সকল কথা শুনিলেন এবং দুইজন পেয়াদা ও একজন কনেষ্টবল ডাকিয়া পাহাড়ীর সন্ধানে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারাও রাত্রি এগারটার সময় ফিরিয়া আসিল, পাহাড়ীর কোনও সংবাদ নাই।

সুকুমারী সমস্ত রাত্রি জলগ্রহণ করিলনা। রামচরণকে কহিয়া দিল সদরের দরজা যেন খোলা থাকে।

রামচরণ কহিল "ভয় কি মা, সকালে ফিরে আসবে এখন।"

"তোর কাছে কিছু ব'লে গেছে রামচরণ?"

"বল্‌বে কি মা, দেখ্‌বে সকালে এসে হাজির।"

সুকুমারী একবার শুইল। আবার গরুর গাড়ীর শব্দ শুনিয়া জানালা খুলিয়া পথের দিকে চাহিয়া রহিল। কেরোসিনের ডিবা লণ্ঠনে পুরিয়া সেই অন্ধকার পথে

কত গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান মনের সুখে গান গাহিতে গাহিতে গরু তাড়াইয়া বাড়ী ফিরিতেছে। কিন্তু কেহই পাহাড়ী বাবাকে তাহার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া গেল না। সুকুমারী উঠিয়া গিয়া সদর দরজার কবাটের আড়ালে অন্ধকারে হাত দিয়া দেখিল। পাহাড়ী যদি সেখানে ভয়ে ভয়ে লুকাইয়া বসিয়া থাকে। কিন্তু পাহাড়ীকে পাওয়া গেল না; কাঠের কবাট যেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া স্বস্থান অধিকার করিয়া দাঁড়াইল। আবার ঘরে ঢুকিয়া খাটের নিয়ে উকি মারিয়া দেখিতে লাগিল। একটা নির্ম্মম নিস্তব্ধতা যেন জমাট অন্ধকারের সঙ্গে মিশিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর সুকুমারী প্রাণভরিয়া ডাকিতে লাগিল, "হে ঠাকুর, হে দেবতা, একটিবার ব'লে দেও আমার পাহাড়ী কোথায় গেল! একটিবার সন্ধান ক'রে দাও!" তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল সে প্রাণভরিয়া চীৎকার করিয়া পাহাড়ীকে ডাকে।

লোকে যেমন হারাণো জিনিশ এক স্থানেই পুনঃ পুনঃ অন্বেষণ করিয়া থাকে, সুকুমারীও সেইরূপ এক একটি স্থান তন্ন তন্ন করিয়া পুনঃ পুনঃ দেখিতে লাগিল। কিন্তু পাহাড়ীর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

সুকুমারী বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। কাঁদিতে কাঁদিতে শেষ রাত্রিতে তন্দ্রাঘোরে স্বপ্নে দেখিল, যেন পাহাড়ী তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতেছে। তাহা দেখিয়া তাহার বৌদিদি তাহাকে যশোদা বলিয়া ঠাট্টা করিতেছে। আবার দেখিল, পাহাড়ী যেন কোনও গরুরগাড়ীর গাড়োয়ানের সঙ্গে মিশিয়া কোন দূরদেশে বেড়াইতে গিয়াছে এবং সেখানে গাড়ী চাপা পড়িয়া তাহার মৃত্যু হইয়াছে। এইবার সুকুমারী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মথুর বাবু অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাকে শান্ত করিতে পারিলেন না।

পরের দিনও পাহাড়ী আসিলনা। এক দিন দুই দিন করিয়া তিন দিন অতীত হইয়া গেল। কিন্তু সে অকৃতজ্ঞ বালকের কোন সন্ধান জুটিলনা।

মথুর বাবু দেখিলেন অনাহারে অনিদ্রায় সুকুমারীর দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। তিনি সস্নেহে তাহার রুক্ষ মস্তক কোলের উপর তুলিয়া কহিলেন "সুকু, এইভাবে আত্মঘাতী হয়োনা। দেখ্‌লে ত সন্ধানের কোনও ত্রুটি হচ্ছে না। কিন্তু কি করব?" সুকুমারীর কথা কহিবার সামর্থ্য ছিল না। কেবল উদাস চক্ষু দুটি বহিয়া তপ্ত অশ্রুবিন্দু মথুর বাবুর কথার উত্তর জানাইয়া গেল।

সেইদিন রাত্রিতেই সুকুমারীর জ্বর হইল। মথুর বাবু থারমোমেটার দিয়া দেখিলেন জ্বর ১০৫ ডিগ্রি উঠিয়াছে। তিনি তখনই রামচরণকে ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইয়া দিলেন।

ডাক্তার রোগিণীকে পরীক্ষা করিয়া বলিয়া গেলেন যে হৃৎপিণ্ড অতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, খুব সাবধানে ঔষধাদি ব্যবহার করাইতে হইবে। রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিল, সুকুমারী একটু একটু প্রলাপ বকিতে লাগিল। মথুর বাবুর বন্ধুবান্ধব এই সংবাদে সকলেই আসিয়া শুশ্রূষাদির ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

মথুরানাথ অমরের কাছে কোচবিহারে তার করিয়া দিলেন।

দিবাভাগে প্রলাপ একটু কমিয়া আসিল। মথুর বাবু আফিসে গেলেন না। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, স্নেহময়ী সুকুর প্রবল স্নেহে ব্যাঘাত করিয়া তিনিই ত তাহার মৃত্যুর পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। সুকুমারীর রুক্ষ চুলের মধ্যে অঙ্গুলী সঞ্চালন করিতে করিতে তিনি গভীরস্বরে ডাকিলেন, "সুকু।"

বাসিফুলের মত সুকুর নিষ্প্রভ মুখখানি যেন একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অতি কষ্টে নিজের শীর্ণ হাতখানি স্বামীর হাতের উপর রাখিয়া সুকুমারী একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সমস্ত দিন সুকুমারী আর প্রলাপ বকিলনা। মথুর বাবু শিয়রে বসিয়া স্বহস্তে ঔষধ পথ্য সেবন করাইতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার পর আবার জ্বর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আবার সেই জয়ন্তিয়ার গল্প, রামের মারামৃগ অন্বেষণের কথা, পাহাড়ী বাবার দুঃখময় জীবনের করুণ ইতিহাস সে অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিল। মথুর বাবু বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িলেন।

রাত্রি দশটা অতীত হইয়া গিয়াছে। আকাশে ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে নবমীর চাঁদ অতি ধীরে ধীরে চলিতেছিল। চঞ্চল শিশুর মত জ্যোৎস্না বালিকা পৃথিবীর বক্ষে ছুটাছুটি করিতেছে।

অমর নাথ ও তাঁহার পত্নী টেলিগ্রাম পাইয়া এইমাত্র আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

অমরনাথকে দেখিয়া মথুর বাবু তাঁহার গলা ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। অমর বাবু দিবসের চন্দ্রের মত জ্যোতিহীন সুকুর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে ডাকিলেন, "সুকু, দিদি আমার, এই যে আমি এসেছি।"

সুকুমারী স্খলিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কই, পাহাড়ী এল কি?"

শ্রীজনার্দ্দন মুখোপাধ্যায় বি, এ, সরস্বতী।

জাগৃহি

[১]

জেগে উঠ মোর মন,
এ নব আলোক-উৎসব মাঝে
জাগো অন্তর ধন।
একি আনন্দ ভুবনে-ভবনে,
তরুবীথিকায় — আকুল-পবনে,
সাগরের বুকে—ফুলের নয়নে,
একি মধু-জাগরণ!
নবরূপে আজ সবার মাঝারে
প্রকাশিলে নারায়ণ!

[২]

এ নব-আলোকে আজি,
অন্তরবাসী বন্ধু আমার
উঠগো নয়ন মাজি।
মুছে ফেল মোর—ঘুচুক বেদন,
টুটুক শঙ্কা—শোক-আবরণ,—
করমের শাঁখ ওই শোন মন
উঠিছে সঘনে বাজি;
কর্ম্মশালায় এ মহাযজ্ঞে
জেগে উঠ মন আজি।

[৩]

"ওরে মোর বীণা খান!
নবীন-মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে
সঙ্গীত কর' দান।
সবই সুন্দর—সবই মধুময়,
মহা জননীর সকল তনয়
একই রাখী-ডোরে বাঁধা যেন রয়,"
ধরার এ মহাগান—
ঝঙ্কৃত হোক্ সব তারে তোর
ওরে মোর বীণা খান!

[৪]

ওগো সুন্দরতম!
লহ হৃদয়ের প্রীতি-বন্দন—
পূজা-আয়োজন মম।
সত্যরথের হে মহা-সারথী,
মানবসঙ্ঘ জানায় প্রণতি,
যাচিছে করুণা—চাহিছে শকতি—
তৃষিত চাতক সম;—
সত্যের পথে জাগাও সবারে
ওগো সুন্দরতম!

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

কুলীন

কুলীন এবং কুলীনের সন্তান বলিয়া আমার খ্যাতি আছে। লোকে বলে আমার ভাগ্যে লক্ষ্মীর দৃষ্টি খুব প্রখর। জন্ম হইতেই আমাতে যে বিশিষ্টতা আরোপিত হইয়াছে, তাহার পরিণতিতে লোকে কেবলমাত্র লক্ষ্মীর কৃপার অবতারণা কল্পনা করিয়া থাকে। লোকের মুখে "কুলচূড়ামণি"—আখ্যা, বৈষয়িক হিসাবে তাহার ব্যাখ্যা ও আমার করুণায় বহু ব্যক্তির কুলোদ্ধারের সম্ভাবনার কাহিনী অনেক শুনিতে পাই।

আমি যে 'কুলীন' এ ধারণাটি আমার হৃদয়কে বেশ অধিকার করিয়াছে ; সংসারে যেখানেই থাকি না কেন, এ ধারণাটি আমি বেশ অনুভব করি। কিন্তু আশ্চর্য্য এই লোকে যেভাবে আমার মর্য্যাদার প্রতিষ্ঠা করে তাহাতে যেন আমার ধারণার কোন সহায়তা হয় না। লোকের কথায় যে রস আছে তাহাতে আপাততঃ তৃপ্তি পাই বটে ; কিন্তু আমার সত্তা নিভৃতে যেভাবে আপনাকে কুলীন বলিয়া বর্ণনা করে সে ভাবের স্পন্দন, সে কথার মর্ম্ম আমি কেমন করিয়া বুঝাইব !

সমাজে স্ত্রীজাতির নিগ্রহ, তাহাদের দুর্ব্বলতা ও তাহার কারণের কথা যখন মনে হয়, পুরুষের স্বার্থের নিকট তাহাদের অবহেলা ও লাঞ্ছনার ব্যাপার যখন প্রত্যক্ষ করি, তখন আমার লৌকিক গৌরব যেন কোথায় মিলাইয়া যায়, আমার সমগ্র সত্তা যেন অনুতাপ ও লজ্জায় মরিয়া গিয়া মনুষ্যত্বের অবমাননার প্রতিশোধ লইবার জন্য আমাকে আকুল করিয়া তোলে। স্বার্থত্যাগে প্রায়শ্চিত্তের কল্পনা আমাকে স্বতঃই প্রবুদ্ধ করে, কারণ আমি যে কুলীন !

দুর্নীতির অভাবের সংকীর্ণ দীনতা ও কদাচারের লোকমর্য্যাদাহীনতা যেন এক কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রের সৃষ্টি করিয়াছে, যেন প্রধান কর্ত্তব্য ও অধিকার সমূহ আমার অপেক্ষায় রহিয়াছে, কারণ আমি যে কুলীন !'

মানুষের ভিতরে যাহারা অনুন্নত, নীচ ও অস্পৃশ্য বলিয়া সমাজের প্রান্তভাগে কোনমতে ঠাঁই লইয়াছে তাহাদের অজ্ঞতা, বর্ব্বরতা ও দুর্ব্বলতা, তাহাদের সকল ইন্দ্রিয়গ্রামের ও আত্মার কাতরতা যেরূপ কোন আঁধারের অন্তরালে বিষাদ-নাট্যের অভিনয় করিয়া যাইতেছে, তাহা যেন আমারই দৃষ্টির পুরোভাগে স্পষ্ট আকারে জাগিয়া উঠিতেছে। সকল হাসি ও প্রমোদের মাঝে আমার চিত্ত এই বিষাদের রাজ্যে আপনাকে সঁপিয়া দিয়াছে !

যখন দেখি অর্থের অসঙ্গতির নিমিত্ত কোন ব্যক্তি কুলীন পাত্র জুটাইতে না পারিয়া দুঃখিত ও অবমানিত হইয়া অবসন্নগতিতে একাকী ফিরিয়া যায়, তখন আমারই সত্তা আপনাকে শত অপরাধী মনে করিয়া এই দুর্দ্দৈবের প্রতিবিধান মানসে তাহার চরণে লুটাইয়া পড়িয়া মার্জ্জনা-ভিক্ষা ও তাহার মনের দুঃখ দূর করিয়া তাহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য শত মিনতি জানাইয়া ব্যগ্র উচ্ছ্বাসে বলে, "ওগো দুঃখিত হইও না ; ভুলের পথ ত্যাগ কর ; ওখানে তুমি কুলীনকে পাইবে না—উহা দাম্ভিকতার আশ্রয় ; মনুষ্যত্বের বিনিময়ে লভ্য হইলে অবশ্যই পাইতে।"

যখন মানুষের মনে দ্বেষ, দ্বন্দ্ব, ঈর্ষ্যার প্রকাশ দেখি, জ্যোতির পথ হারাইয়া ফেলিয়া আঁধার-ঘোরে প্রমাদ-গ্রস্ত তাহাদের চিত্ত যে ভাসিয়া সারা হইতেছে, ইহাই মনে পড়ে। তখন অভিমানের পরিবর্ত্তে আমার হৃদয়ে বেদনা ও অনুকম্পা জাগিয়া উঠে। স্তব্ধ মৌন আমি—সকল বিষাদে আমার আত্মা পরিপূর্ণ হইয়া উঠে !

ভয়ের কারণে যাহাদের চিত্ত নিরাশ্রয় হইয়াছে, ভ্রান্তি বশে যাহারা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া ক্লেশ পাইতেছে, তাহাদের প্রতি আকুল আবেগে আমার হৃদয় আকৃষ্ট হইয়া পড়ে ; স্তোকবাক্য ও লৌকিক সান্ত্বনার অন্তরালে আমার হৃদয়-মধ্যের পরিত্রাতা তাহাদের কল্যাণের জন্য আপনাকে দান করে।

যাহাকে বিশ্বের মানব তাচ্ছিল্য বা ঘৃণা করে, সে যে নীরবে কোন্ প্রাণের আহ্বানে আমাকে তাহার আপন করিয়া ফেলিয়াছে ! জগতের সকল উৎসবের মাঝে তাহার চিন্তা আমার মনে জাগিয়া উঠে।

যখন ভ্রান্তিমোহের গাঢ় তিমিরে অশেষ বাধা জন্মাইয়া মানবকে পদে পদে ব্যাকুল করিয়া তোলে, যখন কর্ত্তব্যাবধারণের দৃষ্টি নিয়ত প্রতিহত হইতে থাকে, যখন মানব রুদ্ধ বেদনার অস্তিত্ব অনুভব করিয়া প্রমাদকে আলিঙ্গন করে, জীবনের সরল উচ্ছ্বসিত ধারা যখন উদ্বেল হইয়া

সুদূরের সন্ধানে অগ্রসর হইবার জন্য পথ খুঁজিয়া খুঁজিয়া শুধু গুমরিয়া ফিরে, বিপুল নৈরাশ্য ও বিষাদ যখন ঘিরিয়া আসে, তখন পথ-নির্ণয়ের চিন্তা আমার হৃদয়কে এমনি অধিকার করে—আমার আত্মায় এমনি স্পন্দন জাগাইয়া তোলে—এমন গভীর আকুল সুরে আমার প্রাণের বীণা বাজিয়া উঠে, যে সে ঝঙ্কার সকল হৃদয়কে গিয়া স্পর্শ করে,—সকল হৃদয়ে আমার প্রাণের বাণী ধ্বনিত হইয়া এক মহা ওঙ্কারে সমগ্র সৃষ্টি, সকল আঁধার মিলাইয়া যায়;—এক মহা জাগরণের উৎসবে তেজের ও গৌরবের ছটায় প্রদীপ্ত শতহৃদয়ের জীবন্ত প্রতিভার মাঝখানে আমার আত্মার অতুল অভিসার-লীলার দৃশ্যে আমি যে আবার মোহিত হইয়া যাই!

সংসারে মানবের চরিত্রে যে সমস্ত গুণ ও বৃত্তির সমাবেশ দেখা যায় তাহাদের মধ্যে বিরুদ্ধ স্বভাবের নিদর্শন ও তাহার ফলে যে দ্বন্দ্ব, যে চঞ্চলতা, যে বিভেদের সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহাতে মানব-জীবন নিয়তই অস্থির ও শঙ্কাকুল থাকে। একদিকে যেমন বৃদ্ধির আবেগ, অপর দিকে তেমনই পতনের আশঙ্কা। এই উভয়বিধ ভাব ও কার্য্যের উদ্যম ও সংঘর্ষ যে বৈষম্যের সূচনা করে তাহাতে প্রকৃত শান্তির আশা কোথায়? একে অপরকে সহ্য করিতে পারে না, একের কর্ম্ম অপরের নিকট প্রতিকূল, একে অপরকে পরাস্ত করিতে চাহে;—এই চিরন্তন বিরোধের মধ্যে মানবকে যে কতখানি উদ্বেগ ও অশান্তি ভোগ করিতে হয়, কত প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইয়া তাহাকে চিরকাল ঘোরতর সংগ্রাম করিতে হয়,—সেই চিন্তাই মনে জাগে। এই বিরোধের কি কোন মিমাংসা নাই?—সকল বিরোধ ঘুচিয়া গিয়া সাম্যের সুখময় শ্যাম ছায়ায় কি মানবের জীবনব্রতের শুভ উদ্‌যাপন হইতে পারে না? এই যে রাগ-দ্বেষ, শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন গুণচয় মানবের সমগ্র সত্তার মূলে বিরোধের কারণরূপে অবস্থান করিতেছে, ইহারা কি কোনও কালে স্বত্যাগ করিতে পারে না?—অথবা মানুষের উদার হৃদয়ে এককালে ঠাঁই পাইয়া নিবৃত্তি পাইতে পারে না? একের আদরে অপরের অনাদর অবশ্যম্ভাবী, তাহাতেই যত বিরোধ—যত অশান্তি! পরা নিবৃত্তির স্পৃহাই ত চিরশান্তির সন্ধান বলিয়া দেয়! এহেন পরম পদের, পরম প্রশান্তির আদর্শের স্বরূপ শিবময় শিব-ব্রহ্মের লোকাতীত সত্তার সকল বাধাবন্ধ অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে; মুক্ত উদার তাঁহার হৃদয়ের মাঝে বৈরাগ্য ও ভোগ, ক্ষমা ও ক্রোধ প্রশান্ত হইয়া অবস্থান করিতেছে। তাই সকল অমঙ্গলের মধ্যেও মঙ্গল রূপে তাঁহার সত্তা বিরাজ করিতেছে। সমদর্শী জ্ঞানীজনও এইরূপ উত্তম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া চিরশান্তিময় পদে অধি[illegible] হইয়া থাকেন;—

> "ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
> নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাৎ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥"
>
> ১৯।৫ম অঃ; গীতা।

যাহাদিগের মন সুখদুঃখাদির অতীত হইয়া অপূর্ব্ব সাম্য লাভ করিয়াছে, তাঁহারা ইহ জীবনেই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হন। তাঁহারা ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়া থাকেন কারণ ব্রহ্ম যে অপূর্ব্ব সাম্য ও দোষরাহিত্যের স্বরূপ!

জগতের সকল বৈচিত্র্যের অন্তরালে এই যে শান্তরসাস্পদ, সকলের শরণ, অব্যয় ধাম আছে, যেখানে অপূর্ব্ব মুক্ত সাম্য চিরপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহার কথা সংসারের সকল কর্ম্মের অবসরে আমার মনে জাগিয়া উঠে। দ্বন্দ্বময় জীবনের শুভ অবসরে যাঁহার আভাসমাত্রে অপার শান্তিলাভ হইয়া থাকে, সেই পরম নিবৃত্তির চিন্তায় আমার আত্মায় যে অনন্ত প্রশান্তি জাগিয়া উঠে, তাহা ক্রমে ক্রমে আমার সকল ইন্দ্রিয়, আমার সত্তা হইতে জগতের সকল ইন্দ্রিয় ও তাহার সত্তার বিস্তার লাভ করে!—বিপুল প্রশান্তির মাঝে আমার আত্মা অপূর্ব্ব সমাধিলাভে বিভোর হইয়া যায়।

জগতে হৃদয়ে হৃদয়ে যে আকর্ষণ সচরাচর দেখা যায়; তাহার সকলতায় মানব কত সুখী হয়; আবার দয়িতের বিচ্ছেদে যে বিরহব্যথা বাজিয়া উঠে তাহার কাহিনীতে কত করুণ গাথার সৃজন হয়। হৃদয়ের মিলন-ক্ষেত্রে এই যে বিরহের অস্তিত্ব আছে তাহাতে ত উৎকণ্ঠার হেতু রহিয়া যায়। হে আমার দয়িত! কবে তোমার প্রতি আমার প্রীতি এমন পূর্ণত্ব পাইবে যে আমার বাসনা আর বিরহের ব্যথায় তোমার প্রতি ধাবিত হইবে না, আমার প্রাণের সকল বাসনা আমাতেই চরিতার্থ হইবে, চিত্তবৃত্তির সকল অভাব ঘুচিয়া যাইবে, হৃদয় আপনার মাঝে পূর্ণ হইবে,—যখন তুমি আমিময় হইয়া যাইবে! ওগো, কবে তোমার

করুণায় এই অপূর্ব মিলনের বাণী জগতের তৃষিত হিয়ায় চির মিলনের আবন্তি আনিবে !

আমাকে সাংসারিক লোকে ভাগ্যবান্ বলে, নানা স্তোকবাক্যে আমার পদমর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তন করে, আমার মুখে উজ্জ্বল হাসি আনিতে চাহে ; কিন্তু ওগো তোমরা কি বুঝিবে আমার ভিতর হইতে কে আমাকে অতি নিশ্চিত তাহার তপঃ-পরায়ণ হইতে বলে,—জগতের জন্ত আপনাকে দান করিতে বলে ! আমি যে অলীক ভ্রান্ত উৎসবে আপনাকে নিযুক্ত করিতে পারি না—তাহা কেমন করিয়া বুঝাইব ! নিজের জন্ত সমাজের জন্ত, আমার আত্মাকে ঊর্দ্ধে উন্নীত করিতে হইবে—ওগো আমি যে কুলীন !

শ্রীলোকেন্দ্রনাথ গুহ, বি-এ।

চিরবাঞ্ছিত

হিয়ায় আমার কে এলো লো আজ
নবীন মোহন সাজে,
ধীরে ধীরে একি প্রেমের উৎস
বহা'ল হৃদয়মাঝে।
শিরে শোভে তার দীপ্ত-কিরীট,
কণ্ঠে জ্যোতির মালা ;
সুন্দর তার মধুর হাস্যে
হৃদয় করিল আলা।
চির জনমের বাঞ্ছিত সে যে—
আরাধ্য দেব মম,
শত জনমের সাধনার ফলে
দেখা দিলে প্রিয়তম !

শ্রীমতী ভক্তিসুধা রায়।

ঈষ্টলীন

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সঙ্কটে

এক বৎসর চলিয়া গেল। বৎসরটা ইজাবেলের খুব সুখেই কাটিত, যদি না কর্ত্রীবিবি ঈষ্টলীনে থাকিয়া খুঁটিনাটি লইয়া এত অশান্তি তার ঘটাইতেন। কর্ত্রী বলিয়া ইজাবেলকে তিনি উপর উপর মানিতেন বটে, কিন্তু গৃহের প্রকৃত কর্ত্রী ছিলেন তিনি নিজে। ইজাবেলকে তাঁহার হাতে কলের পুতুলের মতই চলিতে হইত। স্পষ্ট কথায় নিষেধ কিছু না করিলেও কর্ত্রীবিবি সর্ব্বদা এমন একটা ভাব দেখাইতেন, যাহাতে ইজাবেল তাঁর ইচ্ছামত বড় একটা চলিতে পারিতেন না, যা ভাল লাগিত করিতে পারিতেন না, আর এটা বেশ অনুভব করিতেন, যেভাবে তিনি চলেন ফেরেন, যাহাই করেন, ননন্দা কিছুই বড় পছন্দ করেন না, নীরব একটা অসন্তোষের ভাবই প্রকাশ করেন। যারপরনাই কোমলপ্রাণা ও শান্ত শিষ্টস্বভাবা ইজাবেলের পক্ষে কর্ত্রীবিবির মত দাম্ভিকা ও তেজস্বিনী নারীর বিরুদ্ধে আপনার কোনওরূপ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠিল। নিজের গৃহেই ইজাবেলকে অতি ক্লেশকর এক অধীনতার চাপ বহন করিয়া চলিতে হইত। ইজাবেলের যে এরূপ কোনও অশান্তি ঘটিতেছে, কার্লাইল কখনও তা বুঝিতে পারিতেন না। সকালে ও সন্ধ্যায় মাত্র তিনি বাড়ীতে থাকিতেন, তখন একা স্ত্রীর সঙ্গেই তাঁহার সময়টা কাটিত। এদিকে ক্রমেই বৈষয়িক কাজ

কর্মের দিকে বেশী মনোযোগ তাঁহাকে দিতে হইত, কাজের খাটুনিও বাড়িতেছিল। বাড়ীতে যে অন্যায় কিছু হইতেছে, সেদিকে দৃষ্টিও বড় কম পড়িত। একবার কোনও জিনিষের জন্ম দুইজনের বিপরীত দুই রকম ফরমায়েস গিয়াছিল, তাহাতে গৃহে একটা গোলমাল ঘটে। কর্ণীবিবি তৎক্ষণাৎ তাঁহার ফরমায়েস প্রত্যাহার করিলেন। কিন্তু করিবার ভঙ্গীতে তাঁহার কঠোর অপ্রসন্নভাব একেবারে চরমে গিয়া উঠিয়াছিল। তখন ইজাবেল স্বামীকে জানাইয়াছিলেন, পৃথক থাকিতে পারিলেই তাঁহারা সুখ শান্তিতে থাকিতে পাবেন। কিন্তু এই কথাটি এত সঙ্কুচিত ও কুণ্ঠিত ভাবে বলিয়াছিলেন, যেন কর্ণীবিবির উপরে তিনি বড় একটা অন্যায় করিতেছেন। যাহা হউক, কার্লাইল ভগ্নীর নিকট প্রস্তাব করিলেন, তিনি তাঁহার নিজের বাড়ীতে গিয়া থাকুন।

কর্ণীবিবি চটিয়া কহিলেন, "হাঁ, দেখিতেছি, ইজাবেলের পক্ষ টানিয়া তুমি কথা বলিতেছ।"

কার্লাইল সহজভাবে উত্তর করিলেন, "হাঁ, তাই বলিতেছি বই কি।"

কর্ণীবিবি তখনই উঠিয়া ইজাবেলের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন,—জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কি অপরাধ করিয়াছেন আর কেনই বা এই বাড়ী এত ছোট হইল যে ইহার এক কোণে তাঁহার মাথা রাখিবার একটু জায়গা হইতে পারে না? ইজাবেল যেন লজ্জায় মরিয়া গেলেন, মনে বড় দুঃখও হইল। অতি বড় শত্রুর মনে কোনও ব্যথা দিতেও তিনি কখনও পারিতেন না। আর আজ কিনা মিস্ কার্লাইল তাঁহার ব্যবহারে এতখানি দুঃখ পাইলেন, এরূপ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াই তিনি ননদাকে সন্তুষ্ট করিলেন এবং স্বামীকে বলিলেন, যা হইয়া গিয়াছে গিয়াছে—আর ওসব কথা তুলিবার কোনও প্রয়োজন নাই। কার্লাইলও আর সে কথা মনে রাখিলেন না। স্বভাবতঃই তিনি অতি সরল ও অসন্দিগ্ধ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তবে প্রকৃত অবস্থা এতটুকুও যদি বুঝিতে পারিতেন, তৎক্ষণাৎ তিনি ভগ্নীর দাসত্ব হইতে ইজাবেলকে মুক্ত করিতেন।

কিন্তু কর্ণীবিবি ইহাতে নিরস্ত হইবার পাত্রী ছিলেন না। এমন একটি দিন যাইত না যাতে তিনি নানা ভঙ্গীতে নানা ইঙ্গিতে ইজাবেলকে না বুঝিতে দিতেন, এই বিবাহে আর্থিক সম্বন্ধে কত বড় একটা ক্ষতি কার্লাইলের হইয়াছে, এবং কত বড় একটা ব্যয়ের ভার ইজাবেল এই পরিবারের স্কন্ধে আনিয়া ফেলিয়াছেন। ইজাবেলের প্রাণের সকল আনন্দ উৎসাহ ইহাতে নিভিয়া যাইত। সর্ব্বদাই তাঁহার মনে হইত, সত্যই স্বামীর উপরে বড় একটা কঠোর ভার-বোঝার মত তিনি আসিয়া পড়িয়াছেন। বড়দিনের সময় লর্ড মণ্টসেভার্ণ তাঁহার বালক পুত্রকে লইয়া কয়দিনের জন্ম বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। ইজাবেল কথায় কথায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে বিবাহ করিয়া কার্লাইলের খরচ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে কিনা। লর্ড মণ্টসেভার্ণ স্পষ্ট তাহাতে বলেন, খরচ সত্যই অনেক বাড়িয়া গিয়াছে এবং ইজাবেলের এজন্য স্বামীর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। ইজাবেল গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন,—আর মনে মনে এই স্থির এই সংকল্প করিলেন, যতই অশান্তি ঘটুক মিস্ কার্লাইলের সঙ্গে একত্রই তিনি থাকিবেন। নিজের পদোপযোগী একটি গৃহস্থালী চালাইতে যত খরচ হইতে পারে, তত পরিমাণ অর্থ নিয়মমত কর্ণীবিবি ভাইকে দিতেন। মোট খরচের নিতান্ত কম সাহায্য তাহাতে হইত না। যদি নিজের খরচ চালাইবার জন্ম তিনি আসিয়া ইষ্টলীনে থাকিতেন, তবে সে আলাদা কথা ছিল। তা ত নয়ই, বরং তাঁহার অর্থেই ইষ্টলীনের খরচ অনেকটা কুলাইয়া যাইতেছে। আর ইষ্টলীনে তিনি নিজে কিছু খরচ বহন করুন বা না করুন, তাহাতেও বড় বেশী কিছু আসিয়া যায় না। কারণ দেহান্তে তাঁহার সকল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ত কার্লাইলই হইবেন।

একে অতি কোমলপ্রাণা ও ভীরুস্বভাবা, তাতে আবার একমাত্র পিতার গৃহে কতকটা শান্ত ও অনাড়ম্বর অবস্থায় তাঁহার জীবন কাটিয়াছে। লর্ডদুহিতাদের সাধারণতঃ যেরূপ সামাজিক অভিজ্ঞতা একটা জন্মে, ইজাবেলের তা জন্মিবার কোনও সুযোগ হয় নাই। সংসারের সঙ্গে—বিশেষ কর্ণীবিবির মত কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিনীর সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া চলিবার মত যোগ্যতা তাঁহার একেবারেই ছিলনা। পিতার মৃত্যুর পর নিজের নিঃস্ব অবস্থা, গৃহাভাবে বিপদে আশ্রয় গ্রহণ, তাঁহার সেই নিতান্ত অসহায় অবস্থা বুঝিয়া কার্লাইলের সেই একান্ত

পাউণ্ডের নোট সব যান রক্ত দারুণ একটা গ্লানি তাঁহার চিত্তে জন্মাইত। ঠিক লর্ডদুহিতার উপযোগী না হইলেও কার্লাইল এই যে গৃহে তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছেন, কোন অসুবিধা বোধ করা দূরে থাক, অতি কৃতজ্ঞচিত্তেই তিনি তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন অবিরত এই কথাই তাঁহাকে শুনিতে হইতেছে, স্বামী এত ব্যয় চালাইতে পারেন না, তাঁহাকে প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করায়, জীবনে উন্নতি লাভ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিবে! ইহাতে তাঁহার মনটা যে দারুণ একটা বিরাগে পূর্ণ হইবে, ইহাই স্বাভাবিক। আহা, যদি খুলিয়া তিনি স্বামীকে সব কথা বলিতেন, একটি কথায় তাঁর চিত্তের সব ভার তিনি দূর করিয়া ফেলিতে পারিতেন। তিনি বুঝিতেন, বুঝিয়া কতই না সুখী হইতেন, এই অভিযোগ তাঁহার সঙ্কীর্ণচিত্তা ননন্দার অন্যায় কল্পনা মাত্র, বাস্তবিক ইজাবেলকে বিবাহ করিয়া কার্লাইল ক্ষতিগ্রস্ত ত কিছু হনই নাই, বরং জীবন ধন্য মনে করিতেছেন। কিন্তু ইজাবেল কিছুই তাঁহাকে বলিতেন না। কর্ণীবিবি যখন এইসব কথা তুলিতেন, কোনও উত্তর তিনি করিতেন না, বেদনাপীড়িত মাথাটি হাতের উপর রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন।

একদিন দুপুরের পর কর্ণীবিবি অনেকক্ষণ চাকর দাসীদের কাজের কি ছুতা ধরিয়া বকাবকি করিতেছিলেন। সাক্ষাৎভাবে ইজাবেলকে কিছু না বলিলেও ইজাবেলের মোটেই তাহা ভাল লাগিতেছিল না,—বড় মনমরা হইয়া তিনি বসিয়াছিলেন। বকাবকি থামিল, কতক্ষণ পরে ইজাবেল আপনমনে বলিয়া উঠিলেন,—"কখন যে ছাই সন্ধ্যা হইবে!"

"কেন, সন্ধ্যার জন্য এত ব্যস্ত কেন?"

"সন্ধ্যা হইলেই আর্কিবাল্ড আসিবে।"

বিরক্তি প্রকাশক একটি শব্দ কর্ণীবিবির মুখ হইতে নির্গত হইল,—কহিলেন; "আপনার যেন কিছুই ভাল লাগিতেছে না; লেডী ইজাবেল।"

"না কিছুই ভাল লাগিতেছে না।"

"তা আশ্চর্য্য কি? কোনও কাজ না করিয়া সারাদিন কেবল বসিয়া থাকিলে কারও কিছু ভাল লাগে না। আমি ত মরিয়াই যাইতাম।"

"কি করিব? কাজ যে কিছুই নাই।"

"কাজ যে করিতে চায়, কাজের অভাব তার হয় না। একেবারে নিকর্ম্মা বসিয়া না থাকিয়া আমার সঙ্গে এই টেবিলের ঝাড়নগুলি তৈরী করিলেও ত পারেন।"

"আমি টেবিলের ঝাড়ন তৈরী করিব! বলেন কি?"

"কি করিবেন তবে মেমসাহেব? এর চাইতে ভাল ত কিছু করিবার দেখি না।"

ইজাবেল শান্তভাবেই উত্তর করিলেন, "ওসব কাজ আমি কিছু বুঝি না!"

"চেষ্টা করিয়া না দেখিলে কেউ কোনও কাজ বোঝে না। আমার কথা আমি বলিতে পারি, বরং জুতা মেরামত করিব, তবু হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিবনা। বৃথা এরূপ সময় নষ্ট করা পাপ।"

ইজাবেল যেন অপরাধীর ন্যায় কুণ্ঠিতভাবে কহিলেন, "আজকাল আমার শরীর ভাল নয়,—কোনও কাজ আমি করিতে পারি না।"

"আমি হইলে খোলা গাড়ীতে হাওয়া খাইতে বাহির হইতাম। ঘরের মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে অসুস্থ শরীর আরও অসুস্থ হয়।"

"কে লইয়া যাইবে? গেল হপ্তায় ঘোড়া দুইটা ক্ষেপিয়া গিয়াছিল, বড় ভয় আমি পাইয়াছিলাম। তাই আর্কিবাল্ড বলিয়াছে, সে নিজে গাড়ী হাঁকাইয়া না নিতে পারিলে, আর কারও সঙ্গে আমি না যাই।"

কর্ণীবিবি রুক্ষস্বরে উত্তর করিলেন, "জন ত বেশ গাড়ী হাঁকায়। তোমার স্বামীর চাইতে এ বিদ্যায় সে একটুও খাটো নয়।"

"সেদিন ত জনই গাড়ী হাঁকাইয়াছিল।"

"এক দিন ঘোড়া ভয় পাইয়াছিল বলিয়া রোজই পাইবে, এমন কি কথা আছে? ঘণ্টাটা একটু টিপিয়া জনকে ডাকুন না, তাকে বলুন না সে গাড়ী জুড়িয়া আনুক।—অন্ততঃ আমি ত এই বলি।"

ইজাবেল এবার দৃঢ়ভাবেই উত্তর করিলেন "না, আর্কিবাল্ড আমাকে নিষেধ করিয়াছে যে আজকাল আমার জন্য কত সাবধান সে থাকে। সে বেশ জানে, ঘোড়া লাফালাফি করিলেও তার কাছে আমি ভয় পাইবনা।"

"আজকাল আপনার খেয়ালও বেশ বড় বাড়িয়াছে, লেডী ইজাবেল।"

"তাই হয় ত হইবে।—তবে খোকা হইলে এভাব আর থাকিবেনা।—তখন অনেক কাজ আমার হইবে, এমন খালি খালিও লাগিবেনা। এত খেয়ালও কেবল মন ভরিয়া উঠিবে না।"

"ওমা, এই যে আর্কিবাল্ড! এত সকালে কেন বাড়ী আসিল?"

"আর্কিবাল্ড! কই।" আনন্দে অধীর হইয়া ইজাবেল ছুটিয়া বাহির হইলেন।

"আরা, আর্কিবাল্ড। তুমি আসিয়াছ? বেশ হইয়াছে। তা এখনই আসিলে যে?"

"তোমাকে নিয়া একটু বেড়াইতে বাহির হইব।" এই বলিয়া কার্লাইল ইজাবেলকে লইয়া ঘরে ঢুকিয়াই ঘণ্টাটা টিপিলেন।

ইজাবেল কহিলেন "কই, সকালে ত আমাকে বল নাই।"

"সুযুক্ত হইবে কি না ঠিক বুঝিতে পারি নাই।—পিটার, এখনই গাড়ী আনিতে বল।"

ইজাবেল ছুটিয়া পোষাক বদলাইতে গেল। কর্ণীবিবি কহিলেন,—"গাড়ী চড়িয়া কোথায় যাইবে এখন?"

"ইজাবেলকে লইয়া একটু বেড়াইতে যাইব। এখন কেবল জনের সাথে তাকে আর আমি পাঠাইতে পারি না।"

কর্ণীবিবি উত্তর করিলেন, "এই ভাবেই তোমার কাজ করিবে নাকি?—এই দুপুরবেলায় আফিস ছাড়িয়া আসিয়াছ, কাজ কি করিয়া চলিবে?"

কার্লাইল হাসিয়া কহিলেন,—"কাজের চেয়েও ইজাবেলের স্বাস্থ্য এখন অনেক বেশী দরকারী যে। আর কি যে বল তুমি! ডিল আছে, অতগুলি কেরাণী খাটিতেছে, কাজের জন্য ভাবনা কি?"

"জন তোমার চাইতে ভাল গাড়ী হাঁকায়।"

"তা হাঁকায়।—কিন্তু তা নিয়া ত কথা হইতেছে না। ইজাবেলকে আমি নিজে সাবধানে নিয়া যাইতে চাই।"

ইজাবেল নীচে নামিয়া আসিলেন,—মুখখানি আনন্দের হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, সেই গাছাড়া বিরস ভাবের চিহ্নমাত্র এখন দেখা যাইতেছিল না।—কার্লাইল যত্নে তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া বসাইয়া দিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিলেন। কর্ণীবিবি এমনই এক মুখভঙ্গীসহ চাহিয়া রহিলেন যে গোয়ালার গোয়াল জুড়িয়া গরুর কাড়ি কাড়ি দুধও তাহাতে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।*

এইরূপ অনেক ঘটনাই ঘটিত এবং ইহাতে ইজাবেলের দিন যে বড় শান্তিতে কাটিত না, তাহা বলাই বাহুল্য। কার্লাইলের সম্বন্ধে অবশ্য কর্ণেলিয়া ইজাবেলের প্রতি কোনও রূপ বিরক্তির ভাব দেখাইতেন না। তবে মিরালায় কার্লাইলকে ভগ্নীর অনেক ঝাঁজ সহিতে হইত। কিন্তু বাল্যাবধি তিনি ইহাতে এতই অভ্যস্ত ছিলেন যে কিছুই গায় তুলিয়া নিতেন না। তবে ইজাবেলকেও যে এতখানি ভাগ তার পাইতে হইত, ইহা স্বপ্নেও কখনও তাঁহার মনে হয় নাই।

যথা সময়ে ইজাবেলের প্রসববেদনা উপস্থিত হইল,—অবস্থা এতই সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল, যে জীবনের আশা বড় কেহ করিতেছিলেন না। সূতিকাগৃহের পাশের একটি ঘরে জয়েস্ বসিয়া কাঁদিতেছিল। কর্ণীবিবি অতি সাবধানে একেবারে নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিলেন,—এত মৃদুপদ সঞ্চারে জীবনে আর কখনও তিনি বিচরণ করেন নাই। একেবারে যেন মাটির মত হইয়া একখানি চেয়ারে তিনি বসিলেন,—এতটা ভীত বিনত ভাবও কর্ণীবিবির আর কখনও দেখা যায় নাই। সাহস করিয়া সূতিকাগৃহে তিনি প্রবেশ করেন নাই,—কিন্তু ভ্রাতৃবধূর এতটা সঙ্কটাপন্ন অবস্থার কথা শুনিয়া যারপরনাই দুঃখ তিনি বোধ করিতেছিলেন। জয়েস্ সত্যই বলিয়াছিল, ব্যবহার যতই কঠোর হউক, প্রাণে করুণার অভাব কর্ণীবিবির ছিল না।

চুপি চুপি তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"জয়েস্, কোনও বিপদ ত হইবে না?"

"না মেম সাহেব, বালাই! বিপদ কেন হইবে? তবে এ ক্লেশ চক্ষে দেখা যায় না। কি করিয়া লোকে সহ্য করে, তা ভাবিয়া পাই না।"

"এটি আমাদের নারীজীবনের একটা অভিশাপ! তুমি আর আমি যে ইহা মাথায় তুলিয়া নিতে যাই নাই, বড় ভাগ্য বলিতে হইবে।"

একটু কাল নীরবে থাকিয়া আবার কহিলেন,—

---

* তীব্র অম্লরস মুখে দিলে মুখখানার একটা বিকটভঙ্গী হয়, তাই বিরক্তিজনক মুখভঙ্গীকে ইংরেজিতে Sour বা অম্লভঙ্গী বলা হয়।

"জয়েস্, আমিও আশাকরি বিপদ কিছু হইবে না। আহা, বাঁচিয়া থাক্ ! কিছু যেন ভয় হয় না—"

কর্ত্রীবিবি অতি মৃদু ও শঙ্কিতভাবে কথাগুলি বলিতে-ছিলেন। কে জানে কি ভাবিতেছিলেন ? হয়ত, মনে হইতেছিল, তরুণী এই ভ্রাতৃবধূ মরিয়া গেলে দারুণ একটা অনুশোচনার ভার তাঁহার প্রাণে থাকিয়া যাইবে। একটি বৎসর মাত্র তাঁহাদের গৃহে সে আসিয়াছে। আহা, এই কালটুকু মনে করিলেই তিনি তাহাকে সুখে রাখিতে পারিতেন। কিন্তু তা করেন নাই—ইচ্ছা করিয়াই স্নেহ করুণার সকল পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। খুব সম্ভব, এই সব কথাই তাঁহার মনে হইতেছিল। তখন ভোর কেবল হইতেছিল। আধা আলোকে তাঁহার মুখখানিতে যারপনাই একটা উৎকণ্ঠিত ও শঙ্কিত ভাব দেখা যাইতেছিল।

"আহা, যদি কোনও বিপদ ঘটে জয়েস্—"

"না, না, কেন বিপদ ঘটিবে ? কেন আপনি একথা বলিতেছেন ? সকলেরই ত এই রকম কষ্ট হয়।"

"বোধ হয় এত ক্লেশ কেহ পায় না। লীন্‌বরো সহর হইতে ডাক্তার মার্টিনকে আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করা হইল কেন তবে ?"

জয়েস্ আতঙ্কে একেবারে লাফ দিয়া উঠিল।

"বলেন কি মেম সাহেব ! ডাক্তার মার্টিনকে আসিবার জন্য টেলিগ্রাম গিয়াছে ! কে পাঠাইল ? কখন গেল ?"

"এই ত কতক্ষণ আগে ডাক্তার ওয়েন্‌রাইট আর্কিবাল্ডের ঘরে গেলেন,—একটু পরেই জন্ ঘোড়া ছুটাইয়া টেলিগ্রাফ্ আফিসে গেল। আমি আর্কিবাল্ডকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কিছুই সে বলিল না।"

জয়েস্ আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। বিশুষ্ক বিবর্ণ মুখে বসিয়া রহিল। পাশের ঘর হইতে মধ্যে মধ্যে কেবল এক একটি অতি গভীর কাতরধ্বনি নির্গত হইতেছিল।

কর্ত্রীবিবি উঠিয়া দাঁড়াইলেন—কহিলেন, "না না, আমি আর এ বরদাস্ত করিতে পারি না। কাফি টাফি যদি কেউ চায় আমাকে খবর দিও, তৈরী করিয়া পাঠাইব।"

"আচ্ছা তা দিব। আপনি কি একবার ভিতরে গিয়া দেখিবেন না ?"

"না না, দেখিয়া কি করিব ? প্রতিকার ত কিছুই করিতে পারিব না। আমাদের মত আনাড়ির ওখানে না যাওয়াই ভাল।"

কর্ত্রীবিবি উঠিয়া গেলেন। জয়েস বসিয়া রহিল।

ডাক্তার মার্টিন আসিয়া পৌঁছিলেন, কার্লাইল একটি গৃহে উন্মাদের ন্যায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিলেন। ডাক্তার ওয়েনরাইট আসিয়া কহিলেন, "পাদ্রি লিট্‌ল্ সাহেবকে আনিতে লোক পাঠান।"

"কেন—কেন"—কার্লাইল একেবারে কাঁদিয়া উঠিলেন। ডাক্তার কহিলেন, "আপনার স্ত্রীর জন্য ভয়ের কোনও কারণ নাই। তবে শিশুটির কথা কিছুই বলা যায় না। যদি না টেকে, সময় থাকিতে ব্যাপ্টাইজ * করা হইলে তবু আপনাদের একটু শান্তির কারণ হইবে।"

"ধন্যবাদ ! এখনই তাঁহাকে আনিতে লোক পাঠাইতেছি।"

কতক্ষণ পরে ইজাবেল একটি কন্যা প্রসব করিলেন। প্রসবের দীর্ঘকাল স্থায়ী ক্লেশ হেতু শিশুটিকে কিছু ক্ষীণজীবী বলিয়াই আশঙ্কা হইল। সুতরাং জন্মিবার অল্পপরেই গৃহেই তাকে ব্যাপ্টাইজ করা হইল। একটি টেবিলের উপরে পবিত্র জলের পাত্র ছিল। পাদ্রি সাহেব, কার্লাইল ও কর্ত্রীবিবি তার পাশে দাঁড়াইলেন। জয়েস উষ্ণ বস্ত্রাবৃত শিশুটিকে লইয়া আসিল।

পাদ্রি সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি নাম হইবে ?'

কার্লাইল কহিলেন, "ইজাবেল লুসী"। তাঁহার স্ত্রী ও মাতার নামে শিশুর নামকরণ তিনি করিলেন—কিন্তু কর্ত্রীবিবির মুখে ভ্রুকুটি দেখা গেল। বোধ হয় ইচ্ছা হইয়াছিল, তাঁহার নিজের নামে শিশুর নামকরণ হয়।

* ব্যাপ্টাইজ করা অর্থাৎ যথাবিধি খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করা। শিশু জন্মিবার কয়েকদিন পরেই তাকে ব্যাপ্টাইজ করা হয়। এই অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে শিশুর মৃত্যু হইলে তার সুগতি হইবে না, এইরূপ বিশ্বাস খ্রীষ্টান্ সমাজে আছে। সাধারণতঃ গির্জ্জায় গিয়া শিশুকে ব্যাপ্টাইজ করা হয়। প্যালেষ্টাইনের অন্তর্ব্বর্ত্তী জর্ডন্ নদীর জলে অবগাহন করিয়া যিশুখ্রীষ্ট তাঁহার গুরু যোহনের নিকট দীক্ষা লাভ করেন। গির্জ্জায় গির্জ্জায় পাদ্রিদের কাছে আমাদের গঙ্গাজলের ন্যায় জর্ডনের জল থাকে। জলের গামলায় সেই জল কতকটা মিশাইয়া তার মধ্যে শিশুকে অবগাহিত করিয়া অথবা কিছু জল তার গায়ে ছিটাইয়া দিয়া তাকে দীক্ষিত করা হয়। এই সময়ে একটি নামও শিশুর রাখা হয়।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

উইলসনের মামলা

খুকীটি বাঁচিয়া রহিল, এবং বাঁচিয়া থাকিবে এইরূপ লক্ষণই দেখা গেল। কিন্তু ইজাবেলের শরীর সুস্থ হইলনা, অল্পস্বল্প জ্বর এবং স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় তিনি বড় ভুগিতে লাগিলেন। খুকীকে পালনের জন্য একজন ধাত্রীর প্রয়োজন। ইজাবেল একদিন যথাসাময়িক পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া তাঁহার আরাম কেদারায় বসিয়া আছেন,—এমন সময় কর্ত্রীবিবি আসিয়া কহিলেন, "ধাত্রীর কাজের জন্য একটি লোক আসিয়াছে। কে জানেন ?"

"না, কে ?"

"মিসেস হেয়ারের দাসী উইলসন। এই সাতে তিন বৎসর সেখানে সে কাজ করিতেছে। এখন বার্ব্বারার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া ছাড়িয়া আসিতেছে। তাকে কি আপনার কাছে পাঠাইব ?"

"তাকে দিয়া কাজ চলিবে ত ? ভাল লোক ত সে ?"

"এই চাকরাণীরা যেমন হয়—মন্দ বলা যায় না। তবে তাঁর মুখ বড় আলগা—পেটে কোনও কথা রাখিতে পারে না।"

"তাতে আর খুকীর কি ক্ষতি হইবে ? খাস দাসীর কাজ সে করিয়াছে, ছেলেপিলের যত্ন কিছু জানে কি ?"

"তা জানে। পিনার সাহেবের বাড়ীতে আগে ধাইএর কাজ করিত। পাঁচ বছর সেখানে ছিল।"

"আচ্ছা, তবে পাঠাইয়া দিন এখানে।"

কর্ত্রীবিবি কহিলেন, "তা দেখুন, লেডী ইজাবেল, একেবারেই তাকে কাজে বহাল করিবেন না। কথা বলিয়া দেখুন, যদি বোঝেন সুবিধা হইবে, কাল তাকে আসিতে বলিবেন। আমি আজ বৈকালে হেয়ারদের বাড়ী যাইব, জানিয়া আসিব, আসলে ভিতরের কথা কি। সে ত বার্ব্বারার ঘাড়েই সব দোষ চাপাইতেছে। তবে দুই পক্ষের কথাই শোনা ভাল।"

কর্ত্রীবিবি গিয়া উইলসনকে পাঠাইয়া দিলেন। ইজাবেল জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও বাড়ীর কাজ ছাড়িয়া তুমি আসিতেছ কেন ?"

উইলসন উত্তর করিল, "লেডী সাহেবা, মিস বার্ব্বারার জ্বালায় আর টিঁকিতে পারিলাম না।—কিছু দিন ধরিয়া—এই ধরুণ বছরখানেক হইবে—মিস্ বার্ব্বারার যে কি হইয়াছে—কিছুতেই তিনি খুশী হ'ন না,—জাষ্টিস্ সাহেবের মতই মেজাজ তাঁর কড়া হইয়াছে। অনেক দিন বলিয়াছি, আমি কাজ ছাড়িয়া যাইব। তা কিছুতেই কিছু হইলনা। কাল রাত্রিতে আবার আমাদের বড় ঝগড়া বাধিয়া গেল,—কাজেই আজ সকালে চলিয়া আসিয়াছি।"

"একেবারে কাজ ছাড়িয়াই চলিয়া আসিয়াছ ?"

"হাঁ লেডী সাহেবা। মিস্ বার্ব্বারা খামোকা এমন গালাগাল করিলেন, যে আর থাকিতে পারিলাম না। তখনই বলিয়াছিলাম, আজ ব্রেকফাষ্টের পর আমি কাজ ছাড়িয়া দিব।—তাই জবাব দিয়া আসিয়াছি। আপনি যদি দয়া করিয়া রাখেন, এই কাজই আমি করিব। অন্ততঃ রাখিয়া দেখুন কাজ চলে কি না।"

"মিসেস্ হেয়ারের ঘরে তুমি ত সর্দ্দার দাসী ছিলে ?"

"হাঁ, লেডী সাহেবা।"

"তবে হয় ত এ কাজ তোমার তেমন ভাল না লাগিতে পারে। জয়েস্ এখানে সর্দ্দার দাসী,—তোমাকে কতকটা তার হুকুমবরদারী করিতে হইবে। জয়েস্ বড় ভাল লোক, তার উপরে খুব আস্থা আছে আমার। আমার অসুখ বিসুখ কিছু হইলে ধাত্রীর কাজের তদারক সেই করিবে।"

"তা হউক লেডী সাহেবা। তাতে আমি কিছু মনে করিব না। জয়েসকে এখানে আমরা সবাই খুব শ্রদ্ধা করি।"

"আচ্ছা, সন্ধ্যার পর তুমি আসিও, তখন যা হয় বলিব।"

উইলসন বিদায় হইল। বৈকালে কর্ত্রীবিবি মিসেস্ হেয়ারের কাছে গেলেন। মিসেস্ হেয়ার সরলভাবেই বলিলেন, হঠাৎ ছাড়িয়া গেল, এই যা ত্রুট করিয়াছে,—নহিলে উইলসন লোক মন্দ নয়। আর ইহার জন্যও তিনি মনে করেন, বার্ব্বারার দোষই বেশী। আপত্তির আর কোনও কারণ নাই,—পরদিন সকাল হইতেই উইলসন কাজে নিযুক্ত হইল।

পরদিন বৈকালে ইজাবেল তাঁহার শয়নগৃহে একখানি সোফার উপরে চক্ষু বুজিয়া শুইয়া আছেন। পাশের ঘরে উইলসন খুকীকে কোলে লইয়া বসিয়াছিল, কাছেই আর এক-

খানি চেয়ারে জয়েস্ বসিয়া কি সেলাই করিতেছিল। মাঝের দরজাটা একটু খোলা ছিল। ইসাবেলকে দেখিয়া মনে হইবে তিনি নিদ্রিত, কিন্তু বস্তুতঃ নিদ্রা নয়, দুর্ব্বলতাবশতঃ আধা-তন্দ্রার ঘোরেই নিদ্রিতের ন্যায় তিনি শুইয়াছিলেন। পাশের ঘরে দাসীদের মুখে নিজের নাম শুনিয়া ইসাবেলের তন্দ্রার ঘোরটুকু ভাঙ্গিয়া গেল,—কিন্তু ঠিক তেমনই চক্ষু বুজিয়া শুইয়া রহিলেন।

উইলসন বলিতেছিল, "ইস! কি রোগাই হইয়া গিয়াছেন উনি! দেখিলে মনে হয় আর বুঝি সারিয়া উঠিবেন না।"

জয়েস্ উত্তর করিল, "এখন ত বেশ তাড়াতাড়িই সারিয়া উঠিতেছেন। এক হপ্তা আগে যদি দেখিতে, আজ বলিতে না যে উনি এমন রোগা হইয়াছেন। সে যা চেহারা হইয়া গিয়াছিল!"

"ওমা, তাই নাকি? তা যদি ওঁর কিছু হয়, আর এক জনের আশা আবার জাগিয়া উঠিবে।"

"দূর হ পাপ! কি যে ছাইপাঁশ বলে!"

"তা যাই বল জয়েস্, কথাটা সত্য। এবার তা হইলে সে সাহেবকে ঠিক পাকড়াইবে, এড়াইতে পারিবেন না।"

"যত বাজে কথা! ওয়েষ্টলীনের লোকের যেমন আর কাজ নাই। সাহেব তাঁকে কখনও ভালবাসিতেন না।"

"তুমি জানও বড়। আমি খবর কিছু রাখি। হাঁ, একদিন তাঁকে চুমো দিতে পর্য্যন্ত আমি দেখিয়াছি।"

"ও সব কিছু নয়।—ওতে এমন এসেযায়ও না কিছু।"

"তা বলিতে পার।—তবে ঐ যে হার আর লকেট সে পরে, তাও সাহেব দিয়াছেন।"

"কে পরে? থাক্, ও সব কথা আমি কিছু শুনিতে চাই না।"

"কে পরে! ন্যাকা যেন! আর কে? ঐ মিস্ বার্বারা। সে হার এ পর্য্যন্ত সে গলা হইতে খোলে নাই। আমার মনে হয়, যখন শোয়, তখনও তা ওর গলায় থাকে।"

"সেটা তবে আরও আহাম্মকী তাঁর।"

উইলসন বলিতে লাগিল,—"যে রাত্রিতে সাহেব লেডী ইসাবেলকে বিবাহ করিতে যান—খবরটা আচম্বিত যেন বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতই আসিয়া পড়িল। যা হ'ক্, সেই রাত্রেতে মিস্ বার্বারা কর্ত্রীবিবির এখানে আসিয়াছিলেন। সাহেব তাঁকে শেষে বাড়ীতে পৌঁছিয়া দিয়া যান। বড় সুন্দর জোছনা রাত ছিল। ফটকের কাছে যখন তাঁরা আসিলেন,—বলিব কি জয়েস্, যা দেখিলাম—সে রীতিমত এক প্রেমের দৃশ্য!"

জয়েস্ বিদ্রূপ করিয়া কহিল,—"তুমি বুঝি তৃতীয় পক্ষ একজন সখীর পাঠে ছিলে?"

"তা একরকম বলিতে পার, যদিও সে মতলব আমার ছিল না। জাষ্টিস্ সাহেব এমনই কড়া যে কোনও লোকের ভিতরে আসিবার যো নাই। রান্নাঘরের সামনে যে ঐ তরকারীর বাগান, তার দেওয়াল আবার এত নীচু যে সেখানে দাঁড়াইয়া মনের মানুষ কারও সঙ্গে দুটি কথা বলিব তারও যো নাই। কাজেই ওধারে সেই গাছের ঝোপের মধ্যে যাওয়া ছাড়া আর গতি ছিল না। একটি লোকের আসিবার কথা ছিল, সেই ঝোপের মধ্যে তার জন্যে আমি গিয়া দাঁড়াই। লোকটা এমনি হতভাগা—তিনমাস আমার সঙ্গে ভালবাসাবাসি করিয়া শেষে মদের দোকানের একটা ছুঁড়ীকে গিয়া বিবাহ করিল! মরুক্! তা আমি সেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম,—কতক্ষণ পরে দেখি সাহেব আর মিস্ বার্বারা জোড়ে আসিতেছেন। দরজার কাছে দুজনে দাঁড়াইলেন। সেই লকেটের কথা হইল, লকেটে রাখিবার জন্য মিস্ বার্বারা সাহেবের চুল চাহিলেন, আরও কত কি কথা হইল—সব কাণে আসিল না। বেশী কাছে যাইতেও ভরসা পাইলাম না। কিজানি যদি ধরা পড়ি। তবে যা দেখিলাম, আর যা শুনিলাম, বুঝিলাম দুজনে বেশ একটু পিরীতের খেলাই হইতেছে! সব, এও বলিতে পারি, মিস্ বার্বারা বেশ তখন তা ভাবিতেছিলেন তিনিই মিসেস্ কার্লাইল হইবেন।"

"কি যে বলে! আস্ত ন্যাকা যেন! সেই রাত্রিতেই না সাহেব লেডী সাহেবাকে বিবাহ করিতে গেলেন?"

"তা হইলই বা! তবে মিস্ বার্বারা যে তখন এই কথাই ভাবিতেছিলেন, তাতে আর সন্দেহ নাই। সাহেব চলিয়া গেলে দেখিলাম একেবারে আহ্লাদে আটখানা হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'কত ভালবাসি তোমাকে' বিবাহের পরে তা বুঝিবে আর্কিবাল্ড!' এটা ঠিক জেনো জয়েস্, অনেক এমন ভালবাসাবাসির কথা তাঁদের হইয়াছে।

তবে কি জান, লেডী সাহেবাকে যখন দেখিলেন, তাঁর অমন রূপ, আর অত বড় ঘরের একটা গৌরব—এর লোভ সাহেব সামলাইতে পারিলেন না। পুরান ভালবাসা কাজেই তখন ভুলিয়া গেলেন। পুরুষের মন এই রকমই হালকা হয়—আরও আমাদের সাহেবের মত দেখিতে অমন চমৎকার যারা।"

"কার্লাইল সাহেব অমন হাল্‌কা লোক নন।"

"আরও বলিতে পারি। কয় দিন পরে কর্ণীবিবি আসিয়া এই বিবাহের সংবাদ দিলেন। তাঁরা নীচে বসিয়াছিলেন,—আমি ঠিক তার উপরের ঘরে তখন ছিলাম। জানালা খোলা ছিল, শুনিলাম কর্ণীবিবি এই সব কথা বলিতেছেন। কি একটা ছুঁতা করিয়া মিস্ বার্বারা উপরে ছুটিয়া আসিলেন, নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। আমি সিঁড়ির কাছে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। একটু পরেই ঘরের মধ্যে এমন একটা চাপা গলার কান্নার শব্দ শুনিলাম, সে আর বলিতে পারি না জয়েস্। আস্তে আস্তে গিয়া দরজাটা একটু খুলিয়া উঁকি দিয়া দেখিলাম। মিস্ বার্বারা একেবারে মেঝের পড়িয়া সে যে কি ছটফট্ করিতেছেন! বলিতে কি জয়েস্, দেখিয়া আমার যেন বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। এত দুঃখ কারও জন্য আর কখনও পাই নাই। মনে হইল, একটা সান্ত্বনার কথাও যদি তাঁকে বলিতে পারি, তার বদলে পুরা তিনমাসের মাইনে গেলেও দুঃখ হইবে না। তা ভরসা হইল না। অমন সময় অমন দুঃখে কি আমাদের গিয়া কোনও কথা বলা সাজে? আস্তে আস্তে আবার দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া আমি চলিয়া আসিলাম। তিনি কিছু টেরও পাইলেন না।"

জয়েস্ উত্তর করিল, "মিস্ বার্বারা দেখিতেছি বড়ই কাঁচাবুদ্ধির মেয়ে। যে ভালবাসে না, তাকেও কেউ এমন ভালবাসে?"

"সাহেব যে ভালবাসিতেন না, তা কিসে বুঝিলে? তোমারও দেখিতেছি জাষ্টিস সাহেবের মতই একগুঁয়ে একটা ভাব আছে। নিজে যা বুঝিবে তার আর নড়চড় কিছুতে হইবে না। আচ্ছা, তবে আরও শোন।"

পাঠকবর্গের অবশ্য স্মরণ আছে, বিবাহের পর সেই তুমি আসিতেছে রাত্রিতে কার্লাইল বার্বারাকে বাড়ীতে উইলসন উত্তান্, পথে সেই যে বেড়ার ধারে বার্বারা কাঁদিয়া কার্লাইলকে কত অনুযোগ করিতেছিল—উইলসন্ আবার তখন সেখানে আসিয়া পড়িয়াছিল। সেই ঘটনা সে এখন জয়েসের কাছে বর্ণনা করিল।

জয়েস্ সব শুনিয়া একটু যেন বিরক্তভাবেই উত্তর করিল, "যাই বল, এখনও যদি মিস্ বার্বারা মনে মনে সাহেবের উপর ভালবাসা পুষিয়া রাখিয়া থাকেন, তবে তাঁর মত অবোধ মেয়ে আর এই পৃথিবীতে দুটি নাই।"

"তা ঠিক্; তবে এ ভালবাসা তাঁর এখনও আছে। সাহেব মধ্যে মধ্যে ঐ পথ দিয়া কোথায় যান। যখন যান, মিস্ বার্বারা তাঁকে দেখিবার জন্য পথের ধারে আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। মনে এতবড় দুঃখ আর লেডী সাহেবার উপরে দারুণ একটা হিংসা—এতেই মেজাজটা তাঁর এমন খিট্‌খিটে হইয়া গিয়াছে। আগে ত এমন ছিলেন না তিনি। আর যদি এমন কখনও হয় যে সাহেবের আর লেডী সাহেবাকে ভাল লাগে না, তবে—"

জয়েস্ ধমক দিয়া কহিল, "উইল্‌সন্! ছিঃ ওসব কি বলিতেছ তুমি? একেবারে কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়াছ?"

"কেন, অন্যায় কি বলিয়াছি? একটি কথাও মিথ্যা নয়। পুরুষের স্বভাবই এই। এম্‌নি মনের মানুষ তবু এরকম, স্বামীগুলো একেবারে লক্ষ্মীছাড়া!—হাঁ যা বলিতেছিলাম—তা এটা ঠিক জানিও লেডী সাহেবার যদি ভালমন্দ কিছু হয়, মিস্ বার্বারা আসিয়া তাঁর আসন জুড়িয়া বসিবেন।"

"বালাই! লেডী সাহেবার ভালমন্দ কিছু হইবে না।"

"আমিও তাই বলি, কখনও যেন না হয়। অন্ততঃ এই খুকুমণির ভাল চাহিয়াও একথা বলি। মিস্ বার্বারা বড় ভাল সৎমা হইবেন না। লেডী সাহেবার উপর যে দ্বেষদৃষ্টি তাঁর, তাঁর পেটের সন্তানকে কি আর তিনি ভাল চক্ষে দেখিবেন? সাহেবের মনই তিনি বিগড়াইয়া দিবেন—"

জয়েস্ কঠোর ভাবে বলিল,—"দেখ উইলসন, তোমাকে স্পষ্ট বলিতেছি, ঈষ্টলীনে যদি তুমি এই সব কথার তোলাপাড়া কর, লেডীসাহেবাকে আমি বলিব, এ বাড়ীতে কোনও কাজে তোমাকে রাখা যাইতে পারে না।"

"বটে!"

"তুমি জান, যে কাজ আমি করিব স্থির করি, তা না করিয়া ছাড়ি না। কর্ণীবিবি যা বলেন মিথ্যা নয়, তোমার

মস্ত জালগা-মুখ মেয়ে ওয়েষ্টলীনে আর দুটি নাই। একটু আক্কেল থাকিলে, এটা তোমার বোঝা উচিত, হেয়ার সাহেবের খুনই খাও আর কার্লাইল সাহেবের খুনই খাও, এ সব কথা মুখে আনাও তোমার সাজে না। আমার মনে হয়, হেয়ার সাহেবের বাড়ীতে আড়ি পাতিয়া তুমি লুকাইয়া ঘরের কথা সব শুনিতে। এখানে ও-সব চাল কিছু চালিও না, বলিতেছি।"

উইলসন্ হাসিয়া কহিল,—"তোমার কিছু বাড়াবাড়ি ধর্ম্মিষ্ঠীপনা আছে, তা জানি জয়েস্। তা আমার যা বলার সব বলিয়াছি। নূতন আর কি বলিব? আর এত অবোধও আমি নই যে ঝি চাকরদের কাছে এই সব গল্প করিব।"

কথাগুলি সবই লেডী ইজাবেলের কাণে গেল। তাঁর মনের অবস্থা যে কি তখন হইল, তাহা কি আর বলিতে হইবে? দুর্ব্বল দেহে তখন জ্বরের তাপ, অবসন্ন মনে ঈর্ষ্যার আগুন,—ইজাবেলের বিশীর্ণ মুখ, কোটরমগ্ন চক্ষু-দুটি অস্বাভাবিক এক বিকট দীপ্তিতে জ্বলিতে লাগিল। ডিনারের সময় তখন হইয়াছে। কার্লাইল গৃহে প্রবেশ করিলেন।

"ইজাবেল! একি! তোমার জ্বর কি বেশী হইয়াছে!"

ইজাবেল সোফা হইতে একটু উঁচু হইয়া স্বামীকে জড়াইয়া ধরিলেন,—উন্মত্তার ন্যায় উত্তেজিত স্বরে কহিলেন,—"আর্কিবাল্ড! আর্কিবাল্ড! দোহাই তোমার! ওকে বিবাহ করিও না। কবরেও যে তা হইলে আমি একটু শান্তি পাইব না।"

কার্লাইল বিস্ময়ে একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন। একবার মনে হইল, জ্বরের রাগে ইজাবেলের মাথায় বুঝি বিকার দেখা দিয়াছে। মিষ্ট কথায় তাঁকে শান্ত করিতে একটু প্রয়াস তিনি পাইলেন; কিন্তু ইজাবেল দুটি চক্ষের জল ছাড়িয়া দিলেন, ফোঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আবার কহিলেন, "না না! ওকে বিবাহ করিও না! আমার খুকুকে দুঃখ দিবে! তোমার সব ভালবাসা কাড়িয়া নিবে! একটিবারও আমাকে মনে করিবে না! না, না! দোহাই তোমার, ওকে বিবাহ করিও না!"

কার্লাইল কহিলেন, "ইজাবেল, তুমি কি স্বপ্ন দেখিয়াছ কিছু? ঘুমাইয়াছিলে, এখনও বুঝি ঘোর কাটে নাই। শান্ত হও, দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটিয়া যাইবে। এই যে—লক্ষীটি! আমার বুকের উপর মাথাটি রাখিয়া ব'স দেখি।"

ইজাবেল তবু বলিতে লাগিলেন,—"সে তোমার স্ত্রী হইবে, একথা মনে হইলেও যে যাতনায় আমি মরিয়া যাই। বল আর্কিবাল্ড, শপথ করিয়া বল. তাঁকে কখনও বিবাহ করিবে না! বল—বল—"

"যা দরকার সবই বলিতে পারি। কিন্তু তুমি যে কি চাও. বুঝিতে পারিতেছিনা। তুমি আমার স্ত্রী, আর কাকে আমি আবার বিবাহ করিতে পারি?"

"যদি আমি মরি? মরিতেও ত পারি। অনেকেই মনে করে, আমি এবার বাঁচিব না। যদি না বাঁচি, বল, তাকে আমার স্থানে আনিয়া বসাইবে না!"

'না, তা বসাইব না। কিন্তু কে সে? কার কথা তুমি বলিতেছ? কি স্বপ্ন তুমি দেখিতেছিলে? কার কথা ভাবিয়া তুমি মনে এত দুঃখ পাইতেছ?"

ইজাবেল উত্তর করিলেন, "আর্কিবাল্ড! তাও আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ?—কেন,তুমি কি জান না কিছু? জিজ্ঞাসা করিয়া কি সে কথা তোমার জানিতে হইবে? আমাকে বিবাহ করিবার পূর্ব্বে তুমি কি আর কাউকে ভালবাসিতে না? হয়ত এখনও ভালবাস—"

কার্লাইল বুঝিলেন, ইহা স্বপ্ন নয়, প্রলাপ নয়,—ইজাবেল বাস্তবিক কি একটা সন্দেহ করিয়া, বুঝিয়াই বড় দুঃখে এই সব কথা বলিতেছে। কথার হাসি হাসি ভাব তাঁহার দূর হইল। গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কার কথা তুমি বলিতেছ?"

"বার্বারা হেয়ারের কথা।"

কার্লাইল একটু ভ্রূকুটি করিলেন,—গম্ভীরভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "ইজাবেল, আমার আর বার্বারার সম্বন্ধে কি ধারণা তোমার জন্মিয়াছে জানি না। বার্বারাকে আমি কখনও ভালবাসি নাই। বিবাহের পরে কি আগে, কখনও এমন একটা কথাও আমার মনে কখনও ওঠে নাই। কিসে তোমার এমন ধারণা হইল, আমাকে বলিতে হইবে।"

ইজাবেল ধীরে ধীরে কহিলেন, "কিন্তু সে ত তোমাকে ভালবাসে—"

কার্লাইল একটু থমকিয়া গেলেন। কথাটা সত্য, তিনি জানেন। কিন্তু স্ত্রীর কাছেও তিনি তাহা স্বীকার করিতে পারিলেন না। কি করিয়া পারেন? বার্বারার প্রতি বড় দারুণ একটা অন্যায় যে তাহাতে করা হয়। ধীরস্বরে শেষে কহিলেন, "যদি তাই হয়, তবে বলিব, বার্বারা বড় ভুল করিয়াছে। তার মত বুদ্ধিমতী মেয়ের পক্ষে এটা যে বড় একটা বিশ্রী ভুলই হইয়াছে, একথা আমাকে বলিতে হইবে। সে যদি আমাকে ভালবাসিয়াই থাকে, অন্ততঃ আমি তার কিছুই জানিতাম না। সত্য বলিতে কি ইজাবেল, এই কথা ভাবিয়া বার্বারাকে যদি তুমি ঈর্ষ্যা কর, কর্ণেলিয়াকেও করিতে পার। দুইই সমান অকারণ।"

ইজাবেল একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। মনটাও তখন বেশ শান্ত হইয়া আসিয়াছে। কার্লাইল কাছে বসিয়া সস্নেহপূর্ণ অথচ একটু ক্ষুণ্ণ স্বরে কহিলেন, "একটি বৎসর আমাদের বিবাহ হইয়াছে,—বৎসরটা কি একেবারেই বৃথা গেল, ইজাবেল? কোনও স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি ভালবাসার আর কি প্রমাণ দিতে পারে বল ত?"

যারপরনাই অনুতপ্ত হইয়া স্বামীর হাত দুখানি ধরিয়া ইজাবেল কহিলেন,—"আমায় মাফ কর আর্কিবাল্ড, রাগ করিও না। তোমার উপরে আমার টান যদি কম থাকিত, তবে এ সব কথা ভাবিয়া এত অধীর হইতাম না।"

কার্লাইল একটু হাসিয়া তখন কহিলেন,—"এ সব কথা তোমার মাথায় কিসে ঢুকিল বলিতে পার?"

একবার ইজাবেলের মনে হইল, সব কথা তিনি খুলিয়া বলেন। সেই যে বিবাহের পর সুসান্ জয়েস্‌কে যাহা বলিয়াছিল, আর আজ উইল্সন্ যা বলিল—সব। কিন্তু এখন লব্ধ বিশ্বাস-জাত এই আনন্দের মধ্যে সে কথা আর নূতন করিয়া তুলিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। আবার চাকরাণীদের কথা আড়ালে শুনিয়া তিনি যে এতটা আত্মহারা হইয়াছিলেন, ইহা স্বীকার করিতে বড় একটা লজ্জাও হইল। তাই চুপ করিয়া রহিলেন।

কার্লাইল আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেউ কি তোমার মন ভাঙ্গিবার জন্য এই সব মিথ্যা কথা তোমাকে বলে?"

"না, না! তাও কি হয়? এত দুঃসাহস কার হইবে।"

"তবে কি স্বপ্ন দেখিয়াছিলে? জাগিয়াও তার ঘোর একটা ছিল?"

ইজাবেল উত্তর করিলেন, "বৈকালের দিকে জ্বরটা যখন একটু বাড়ে অনেক আজগুবী স্বপ্ন আমি দেখি। কখনও মাথাটাও যেন গোলমাল হইয়া যায়। কোন্‌টা ঠিক, কোন্‌টা ভুল, তা ভাল বুঝিতে পারি না।"

কার্লাইল মনে করিলেন, ইহাই ইজাবেলের এই উত্তেজনার কারণ। হাসিয়া কহিলেন,—"তা, সাবধান, এ রকম স্বপ্ন আর দেখিও না। এটা সর্ব্বদা মনে রাখিও, কেবল ভালবাসার নয়, আইনের বন্ধনেও আমরা আবদ্ধ। বার্বারা হেয়ারের সাধ্য নাই, এই সব বন্ধন ছিন্ন করিয়া আমাদের মধ্যে আসিয়া কোনও বাধা হইয়া দাঁড়ায়।"

তখনকার মত ব্যাপারটা মিটিয়া গেল। ইজাবেলও আর এ সম্বন্ধে কিছু বলিলেন না। কিন্তু ঈর্ষ্যার মত এমন অঘটনঘটক, এমন মোহকর, অনিষ্টসাধনে এত তৎপর বৃত্তি বুঝি মানবচিত্তে আর কিছু নাই। স্বামীর ভালবাসার গভীরতা অনুভব করিয়া ইজাবেল তখন বড় আনন্দিত হইলেন, সেই ভালবাসার আকাঙ্ক্ষাও আরও প্রবল হইয়া উঠিল—সত্য, কিন্তু বার্বারা হেয়ারের কথাটা প্রচ্ছন্ন একটা ক্ষতের মত তাঁহার অন্তরে রহিয়াই গেল—একেবারে দূর হইল না।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

নূতন শাসনে ভারতীয় প্রজাপক্ষের স্থান।

প্রজাসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া রাজসরকারের আইনসভা হয়, আর সেই সভার সদস্য এই সব প্রতিনিধিদের ভোটে আইন হয়, গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতির প্রধান ব্যাপারই হইল এই। ইহার উপরে আরও একটা বড় কথা আছে এই যে, এই সব আইন অনুসারে শাসনকার্য্য যাঁহারা চালাইবেন সেই সব রাজকর্ম্মচারী বা অমাত্যবর্গের নিয়োগ ও স্থিতি এই আইনসভার মতের উপরে নির্ভর করিবে কিনা, আর তাঁহাদের কার্য্যের জন্য আইন সভার নিকট তাঁহারা দায়ী কিনা।

তা যদি হয়, তবে সেই গবর্ণমেণ্ট হইল Responsible গবর্ণমেণ্ট এবং শাসন কার্য্যও প্রকৃত পক্ষে প্রতিনিধিদের আয়ত্ত।

আর তা না হইলে, কেবল আইন পাশ করিয়া প্রতিনিধিগণ বড় বেশী কিছু করিতে পারেন না। অমাত্যবর্গের নিয়োগ ও স্থিতি যেখানে খোদকর্ত্তা রাজা বা রাজপ্রতিনিধির হাতে, সেখানে তাঁহারা যে সেই খোদ কর্ত্তার অনুগত হইয়াই চলিবেন, এ কথা বলাই বাহুল্য। ইঁহারা সাধারণতঃ অতি পাকাবুদ্ধির লোকও বটেন, হাতে ক্ষমতাও যথেষ্ট থাকে। ছলে বলে কৌশলে, নানা রকম চালে, বহু আইনকে ইঁহারা ব্যর্থ করিয়া দিতে পারেন। আবার সেই সব আইনের কর্ত্তা প্রজাপ্রতিনিধিগণ কত রকম ভয়ে ও লোভে এই সব অমাত্যগণের একেবারে হাতের পুতুলের মত হইয়াও পড়িতে পারেন। এ অবস্থায় অমাত্যগণ যেমন চান, আইন তেমনই হয়। কেহ বলিতে পারেন, অমাত্যদের বাধ্য হইয়া প্রজার স্বার্থের পরিপন্থী কোনও আইন করিলে পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনে প্রজারা আর সেই সব সদস্যকে প্রতিনিধি করিয়া পাঠাইবে না,—এই ভয়ে অন্ততঃ তাঁহারা সাবধানে থাকিবেন, প্রজাদের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিবেন। কিন্তু বর্ত্তমান এই সংখ্যায় প্রকাশিত 'হিন্দুর সমাজতরীর' প্রবন্ধটি যাঁহারা একবার পড়িয়া দেখিবেন, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন, সাধারণ প্রজাদের ভোট কি ভাবে আদায় করা হয়, প্রতিনিধিনির্ব্বাচন ব্যাপারটা কেমন বাজে একটা প্রহসনমাত্র,—আর ভাল দল বাঁধা থাকিলে, সম্পন্ন ও শক্তি প্রতিপত্তিশালী কাহারও পক্ষেই প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচিত হওয়া কিছু শক্ত হয় না। তারপর শাসনযন্ত্র পরিচালক অমাত্যবর্গ যেখানে আইনসভার নিকট responsible নন, তার আয়ত্তির (controlএর) অতীত, সেখানে তাঁহাদেরই অধীন ছোট বড় রাজকর্ম্মচারীবর্গ সর্ব্বত্র এই চেষ্টাই করিবেন, যাহাতে অমাত্যগণের অনুগত ব্যক্তিরাই বেশী ভোট পাইয়া আইনসভায় আসিতে পারেন। গবর্মেণ্টে যেখানে অমাত্যশক্তিরই প্রাধান্য, সেখানে রাজকর্ম্মচারীদের ক্ষমতা প্রতিপত্তি বড় কম নয়।

যে কোনও গবর্মেণ্টই হউক, তার সকল শক্তির প্রধান আশ্রয় হইতেছে তার পুলিশ আর সেনাবল।—যেদিক দিয়া কথাটা আমরা আলোচনা করিতেছি, তাহাতে মোটের উপর গবর্মেণ্টের মধ্যে দুইটি পক্ষ আমরা ধরিয়া নিতে পারি। এক পক্ষ রাজা ও রাজ-অমাত্যবর্গ, আর এক পক্ষ প্রজাদের প্রতিনিধি-সভা। রাজপক্ষ ও প্রজাপক্ষ—এই দুই নাম আমরা দুই পক্ষকে দিতে পারি। এই দুইয়ের মধ্যে পুলিশ আর সেনাবল যে পক্ষের হাতে, সকলের বড় বল তাহার হাতে,—সকল বাদপ্রতিবাদে ও বিরোধে শেষ জয় লাভ হইবে সেই পক্ষেরই। পুলিশ প্রকৃতপক্ষে সেনাবলদ্বারা রক্ষিত। সুনিয়ন্ত্রিত বড় সেনাবলের কর্ত্তৃত্ব যেখানে রাজপক্ষের হাতে, রাজপক্ষের শক্তি সেখানে দুষ্প্রতিবাধ্য। প্রজাপক্ষের আইনের অধিকার দপ্তরে যতই পাকা লেখাপড়ায় নির্দ্দিষ্ট থাক্ না, রাজপক্ষের বিরুদ্ধে তাহারা তেমন মাথা তুলিয়া কোথাও দাঁড়াইতে পারে না। জর্ম্মাণ কৈসরের অমিতশক্তির পরিচয় যুদ্ধের প্রথম কয় বৎসর সকলেই পাইয়াছেন। ইহার মূল কারণ এই যে জর্ম্মাণ সেনাবলের উপরে সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব ছিল তাঁহার। নহিলে, প্রজাদের প্রতিনিধি-সভার আড়ম্বর জর্ম্মাণীতেও বড় কম ছিল না। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রায় শেষভাগ পর্য্যন্ত কত

হাঙ্গামা করিয়া ক্রমে ইংলণ্ডের প্রজাপক্ষ রাজপক্ষের উপরে আপনার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। করিতে পারিয়াছে, তার প্রধান হেতু এই যে রাজপক্ষের হাতে বাঁধা কোনও কোনও সেনাবল (Standing Army) ছিল না।

১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে শেষ যখন প্রজাপক্ষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন রাজার হাতে যে Standing Army ছিল, তার সংখ্যা ছিল মাত্র দশ হাজার। তখন এইরূপ একটা বিধিও ঘোষিত হয়, পার্লামেন্টের অনুমোদন ব্যতীত রাজা কোনও Standing Army রাখিতে পারিবেন না। ইহার পর রাজ-অমাত্যগণ যখন সম্পূর্ণরূপে পার্লামেন্টের কর্তৃত্বাধীন হইলেন, তখন হইতে ইংলণ্ডের Standing Army ক্রমে বাড়িয়া এখন এত বড় হইয়া উঠিয়াছে। এই সেনাবল যে অমাত্যের হাতে, তিনি পার্লামেন্টের লোক,—সেনানিয়ামক আইনও প্রতিবৎসর পার্লামেন্টে নূতন করিয়া পাশ হয়। যে রাজকোষের অর্থে সেনার ব্যয় চলে, সে রাজকোষও পার্লামেন্টের অনুমোদিত অমাত্যের হাতে,—কোন্ বৎসর একন্য কত ব্যয় হইবে, তাহাও পার্লামেণ্ট নির্দ্দেশ করেন।

রাজাকে মাথার উপরে রাখিয়া সকল কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন অমাত্যসভা (cabinet)। এই অমাত্যসভা বা cabinet আবার একেবারে পার্লামেন্টের অধীন। সুতরাং রাজপক্ষ বলিয়া ইংলণ্ডে এখন আর কোনও পক্ষ নাই, এক প্রজাপক্ষই প্রধান দুই পক্ষে বিভক্ত হইয়াছে। ইহাদের বড় একটা দলাদলি চলিতেছে, যে পক্ষ যখন দলে বড় হয়, শাসনের কর্ত্তৃত্ব তাহার হাতে গিয়া পড়ে।

এই কথাগুলি একবার ভাবিয়া দেখিলে, কোন্ অবস্থায় কোন্ পক্ষের হাতে কি পরিমাণ শক্তি থাকিতে পারে, সব একবার ধারণা করিয়া নিতে পারিলে, আমরা বুঝিতে পারিব, বর্ত্তমান শাসনসংস্কার আইনে প্রজাদের প্রতিনিধি লইয়া যে আইন সভা আমাদের এখন হইবে, আর যে দুই চারি জন মন্ত্রী দুইচারিটি বিভাগের ভার পাইবেন, তাহাতে প্রজাসাধারণের ত কথাই নাই, আইনসভার সদস্যদের হাতেও বড় বিশেষ কিছু ক্ষমতা আসিবেনা। ভোটের বিলি ব্যবস্থা ঠিক যেমন হওয়া উচিত তাও যদি হয়, শাসনভার মন্ত্রীদের হাতে আরও বড় আসা বাঞ্ছনীয় তাও যদি আসে, তাতেও আসল কিছু ক্ষমতা ভারতীয় প্রজাপক্ষের হাতে আসিবে না। আসিবে, যদি কখনও কেবল শাসনবিভাগ নয়, সেনাবিভাগও প্রজাসভার নিকট responsible অর্থাৎ প্রজাসভার অধীন অমাত্য দ্বারা পরিচালিত হয়।

কিন্তু তা যে কত দিনে কি ভাবে হইতে পারে, তাহা কল্পনা করাও শক্ত।

অথচ এই আইনসভার সদস্যপদ লাভের জন্য কি দলাদলি—ঠিক দলাদলিও বলিতে পারি না—কি বিশ্রী একটা কুকুরে কামড়াকামড়িই না আরম্ভ হইয়াছে!

অবশ্য একথা আমরা বলি না যে, নূতন এই বড় আইনসভার যেটুকু স্থান আমরা পাইয়াছি, তাহা উপেক্ষা করিব বা করা আমাদের উচিত। ইহার বেশী কিছু পাওয়া গেল না, নিতে আমরা পারিলাম না। প্রকৃত স্বায়ত্ত শাসনের স্তরে উঠিতে লম্বা সিঁড়ির এইমাত্র প্রথম ধাপটায় পা দিবার অধিকার যদি পাইয়াছি, তা ছাড়িয়া এমন লাভ কি? ছাড়িলেই ত আর পাঁচটা ধাপের বেড়া অমনই খুলিয়া যাইতেছে না। একটা ধাপ যদি পাইয়াছি, তাতেই দাঁড়াই, পরপর উচু ধাপগুলি ক্রমে কত দিনে কি ভাবে ভাঙ্গিয়া উঠিব, সে পরের কথা। সে লড়াই বরং প্রথম এই ধাপে দাঁড়াইতে পারিলেই অপেক্ষাকৃত একটু সহজ হইবে।

তবে আমাদের এ কথাটি বেশ বুঝিয়া নিতে হইবে, এটা লম্বা সিঁড়ির প্রথম একটি ধাপ মাত্র, তার বেশী কিছু নয়। সেইটি বুঝিয়া চলিতে হইবে। দীর্ঘ সংগ্রামের এইমাত্র প্রারম্ভ। এইখানেই নিজেরা খাওয়াখাওয়ি করিয়া ভাঙ্গিয়া না পড়ি, বোধনে না বিসর্জ্জন হয়, সেইদিকে বড় বেশী হিসাব করিয়া আমাদের চলিতে হইবে। কিন্তু চলে কে?—চালায়ই বা কে?

দলাদলি।

মানবের সকল কর্ম্মক্ষেত্রেই মতে ও আদর্শে বিভিন্ন লোকের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্য, কলা—যে কোনও দিকেই কোনও জাতির চিন্তা ও কর্ম্মোদ্যম যখন প্রেরিত হইবে, সেই দিকে মতের ও আদর্শের একটা সংঘর্ষ ঘটিবেই। সাধারণতঃ পরস্পর বিপরীত দুই মত ও আদর্শের অনুবর্ত্তনে দুইটি পক্ষের

উদ্ভব হয়। অনেক লোক থাকেন, কোনও পক্ষেই একেবারে ঝুঁকিয়া পড়েন না,—দুইদিকেরই ভালমন্দ দেখিয়া ও বুঝিয়া মাঝামাঝি চলিতে চান। কিন্তু যে কোনও কারণে যে প্রয়োজনেই হউক, কোনও ক্ষেত্রে অতি প্রবল কর্ম্মোদ্যম যদি জাগ্রত হয়, প্রত্যেক পক্ষই দল বাঁধিয়া নিজ নিজ মত ও আদর্শের প্রবর্ত্তনের জন্ম উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যান। বিপরীত দুই পক্ষে তখন কেবল কথায় নয়, কাজেও বড় একটা সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। সংঘর্ষের ধর্ম্মই এই, পরস্পরের প্রতি মনটাকে বড় বিরূপ করিয়া তোলে, এমন একটা উত্তেজনা জন্মায় যাহাতে ধীরভাবে বিচারের শক্তি থাকে না, একের ভাল কিছু অপরের চক্ষে পড়ে না, কেবল দোষ দেখিতে দোষ ধরিতেই সকলের চিত্ত উন্মুখ হইয়া থাকে। নিন্দাবাদ, বিবাদবিসম্বাদ, প্রতিপক্ষকে যেভাবে হউক জব্দ করিবার জন্ম সর্ব্বদা একটা আগ্রহ ও চেষ্টা—এই সবই দেখা যায়। ইহাতে যে কোনও অন্যায় কোথাও হইতেছে, এটা বুঝিবার মতও মন কাহার থাকে না। ইহাই দলাদলি। মাঝামাঝি মতের লোক যাঁরা, প্রবল দলাদলির মধ্যে তাঁহাদের বড় একটা প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। কারণ, মাঝামাঝি মতটা দুইদিকেরই নানারকম টানে নানাজনের মধ্যে এখনই নানারকম হয়, যে ইঁহাদের পক্ষে কোনও রকম একটা দল বাঁধাই সম্ভব হয় না। অসাধারণ প্রতিভাবান্ ব্যক্তি কেহ কেহ ইঁহাদের মধ্যে থাকিলে, কখনও হয়ত দুইদলে একটা সামঞ্জস্য তাঁহারা ঘটাইতে পারেন, কিন্তু এরূপ ঘটে বড় কম। কাজ কিছু করিতে হইলে সাধারণতঃ ইঁহাদিগকে দুই দলের কোনও না কোনও পক্ষে গিয়া মিশিতে হয়। যে পক্ষের দিকে যার মন বেশী টানে, তিনি সেই পক্ষেই গিয়া মিশেন।—যাঁরা তাহা পারেন না, তাঁহাদিগকে এই দলাদলির বিবাদসঙ্কুল কর্ম্মক্ষেত্র হইতে একেবারে দূরে সরিয়া থাকিতে হয়। দলাদলি যেখানে নাই বা অতি ক্ষীণ, অগত্যা সেইরূপ কোনও কর্ম্মে তাঁহাদের শক্তি নিয়োগ তাঁহারা করেন।

দোষ গুণ যাই থাক, প্রবল কোনও প্রেরণার বশে লোকের কর্ম্মোদ্যম যে ক্ষেত্রে বিশেষভাবে জাগ্রত হইবে, দলাদলি সে ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী।—কাহারও সাধ্য নাই, হাজার উপদেশ দিয়া, হাজার যুক্তি দেখাইয়াও সকলকে একেবারে এক মতে বা এক পথে আনিতে পারেন, যদি না অতি বড় কোনও সমান বিপদের বিরুদ্ধে সকলের সমবেত উদ্যম নিতান্ত প্রয়োজন হয়। আর সেই সমবায় মাত্র ততদিনই থাকে, যতদিন না এই বিপদের ভয় দূর হয়। কোনও এক দলের মধ্যেও সকলেরই যে ঠিক এক মত হইবে, তা সম্ভব নয়। মতে সকলের ঠিক মিল না হউক, লক্ষ্যের একটা একতা এবং সেই লক্ষ্যসাধনে সকলের যোগ্য নায়কের সমান অকুণ্ঠ অনুবর্ত্তন নিতান্ত আবশ্যক। নতুবা কোনও দলই শক্তি সঞ্চয় করিয়া জয়ী হইতে পারেন না। মত যার যেমনই থাক, কর্ম্মসফলতার জন্ম এইটুকু ত্যাগ দলের মধ্যে ছোট বড় সকলকেই করিতে হইবে। আমি যা বুঝিতেছি তাই ঠিক, তাই আমার বিবেকানুমত, তার নির্দ্দেশমত আমাকে কাজ করিতেই হইবে, এই ভাবিয়া চলিলে দল বাঁধে না, দলের জোর হয় না, দল কোনও কাজ করিতে পারে না,—ভাঙ্গিয়া বহু ছোট ছোট দলে ভাগ হইয়া পড়ে, তার একটিও দলের মত আর থাকে না। মত বা আদর্শ যেমনই হউক, নায়কগণ বুদ্ধিতে ও শক্তিতে তেমন উচ্চদরের লোক না-ই হউন, লক্ষ্যের ও নেতৃত্বের একতায় দল যদি বেশ বাঁধা থাকে,—তবে তার সঙ্গে এই একতার অভাবে শিথিল ও বিচ্ছিন্ন প্রতিপক্ষ কোনও দল কখনও আঁটিয়া উঠিতে পারেন না, যতই উন্নত আদর্শের প্রচার তাঁহারা করুন, শক্তিতে ও ত্যাগে যতই উচ্চদরের লোক তাঁহাদের মধ্যে থাকুন।

এদেশে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কিছুকাল যাবৎ বিশেষ একটা কর্ম্মোদ্যম জাগ্রত হইয়াছে, তার ফলে দলাদলিও একটা দেখা দিয়াছে। এতদিন এই দলাদলি রাজসরকারের বাহিরে কংগ্রেসেই মাত্র সীমাবদ্ধ ছিল,—কিন্তু নূতন শাসনসংস্কার আইন পাশ হইবার পর গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ধরণে যে নূতন আইনসভা হইবে, সেই আইন সভায় সদস্যপদ লাভ করিয়া কে কি লক্ষ্য ধরিয়া কাজ করিবেন, তাহা লইয়া নূতন ধরণের একটা দলাদলির সূচনা হইয়াছে,—অথবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে কংগ্রেসের পুরাতন দলাদলি নূতন ধরণে রাজসরকারের বিশেষ এক কর্ম্মক্ষেত্রের অভিমুখে আকৃষ্ট হইতেছে। কংগ্রেসে যে দলাদলিটা ছিল, তার মধ্যে 'রাজপক্ষ' একটা ছিল না। রাজসরকারের শাসনপ্রণালীর আলোচনা, তৎসম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ আর তাহাকে প্রজার দাবীর কথা জানান,—

কংগ্রেসের কাজ হইতেছিল মোটের উপরে এই।—এখন এই আলোচনা ও মন্তব্য কিরূপে হইবে, আর প্রজার দাবী কতটা হইবে, এইসব লইয়া প্রাচীনপন্থী ও নবীনপন্থীদের মতের একটা পার্থক্য আছে। সেই পার্থক্য হেতুই কংগ্রেসওয়ালাদের মধ্যে দুইটা দল হইয়াছে। প্রাচীনপন্থীরা সংখ্যায় ও প্রভাবে অনেকটা খাট হইয়া পড়ায় বৎসর দুই যাবৎ ত্যাগ করিয়াছেন, এবং কংগ্রেস এখন একরূপ নবীনপন্থীদের সম্মিলনেই পরিণত হইয়াছে। তার মধ্যে দলাদলি আর নাই বলিলেও চলে। কংগ্রেসে মাত্র মন্তব্য প্রকাশ হয়, দাবী ঘোষণা করা হয়,—এই মন্তব্যের বা ঘোষণার কার্য্যকর কোনও প্রভাব নাই, আইনের বলের মত কোনও বল নাই, কাহাকেও ইহার মতে বাধ্য করিয়া রাখিবার কোনও ক্ষমতা তার নাই। কাজেই যাঁদের ভাল লাগে না, তাঁরা কংগ্রেস হইতে অনায়াসে দূরে থাকিতে পারেন। নিজেরা পৃথক একটা সমিতি গঠনও করিতে পারেন, যেমন প্রাচীনপন্থী বা মডারেটরা করিয়াছেন। কিন্তু আইনসভা রাজসরকারের অন্তর্ভুক্ত বিশেষ একটি বিভাগ,—যে আইন এখানে পাশ হইবে, তদনুসারেই দেশের শাসনকার্য্য চলিবে, প্রজাদেরও তার বাধ্য হইয়া চলিতে হইবে। সুতরাং দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে যাঁহারা কাজ কিছু করিতে চান,—যে মতের লোকই হউন, নূতন এই আইনসভায় তাঁহাদের স্থান গ্রহণ করিতে হইবে। আর আইনে নিজেদের মত চলুক না চলুক, ঐ সভা ছাড়িয়া আসিতেও পারিবেন না। কোথায় গিয়া আর দাঁড়াইবেন?—এইরকম আর একটা সভা ত তাঁহারা গড়িয়া নিতে পারেন না? এই কংগ্রেসই ছিল দেশের রাষ্ট্রনায়কগণের প্রধান সম্মিলন-স্থান ও কর্ম্মক্ষেত্র। নূতন আইনসভা এখন তার চেয়ে অনেক বড় এবং প্রকৃত দায়িত্বপূর্ণ নূতন এক সম্মিলন স্থান ও কর্ম্মক্ষেত্র হইতেছে। কংগ্রেস নবীনপন্থীদের হাতে গিয়াছে, সেটা এখন নবীনপন্থীদেরই একটা party organistion বা দলের সভায় পরিণত হইবে। তার কাজ হইবে নবীনপন্থীদের দলের জোর বাড়ান, যাহাতে আইন সভায় তাঁহাদের প্রাধান্য হয়। সেইরূপ প্রাচীনপন্থী বা moderateদের সভাও হইবে, তাঁহাদেরই একটা party organisation, যার চেষ্টা হইবে আইনসভায় যাহাতে তাঁহাদেরই প্রভাব বেশী হয়। কিন্তু আইনসভায় এই দুই দলের লক্ষণ কি হইতে পারে?

কংগ্রেসে রাজপক্ষ একটা ছিল না। আইনসভায় অতি প্রবল একটা রাজপক্ষ আছে, স্বভাবতঃই যার বিশেষ একটা চেষ্টা হইবে, আপন পক্ষের প্রাধান্য যাহাতে বজায় থাকে আর প্রজাপক্ষ তার অনুগত হইয়া চলে। আর একটা পক্ষ হইতে পারে প্রজাপক্ষ, যাহারও বিশেষ চেষ্টা হইবে রাজপক্ষের হাত হইতে শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা ক্রমে যাহাতে প্রজার হাতে আসে। এই অবস্থায় প্রজাপক্ষের মধ্যে দুইটি দল কিরূপ হইতে পারে, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। যদি হয়, এক দল হইবে রাজপক্ষের সমর্থক, আর এক দল হইবে তাহার বিরোধী। এই পক্ষই প্রজার স্বার্থের অনুকূল প্রকৃত প্রজাপক্ষ হইতে পারে। কংগ্রেসী রাষ্ট্রনীতি (Congress politics) হইতে প্রাচীনপন্থী ও নবীনপন্থী—Moderate ও Extremist বা Nationalist—যে দুইটি দলের উদ্ভব দেশে হইয়াছে, নূতন আইন সভায় সেই দুই দলের পরিণতির সম্ভাবনা ইহা ছাড়া আর কিছু দেখা যাইতেছে না। প্রাচীনপন্থী বা moderate বা যাহাই বলুন, তাঁহাদের লইয়া হইবে রাজপক্ষ। আর নবীনপন্থী বা Nationalist যাঁহারা, তাঁহারাই হইবেন প্রজাপক্ষ—যদি দল বাঁধিয়া তাঁহারা দাঁড়াইতে পারেন।

কিন্তু দল বাঁধিয়া দাঁড়াইবার পক্ষে লক্ষ্যের ও নেতৃত্বের যে ঐক্য একান্ত আবশ্যক, তাহা তাঁহাদের মধ্যে ঘটিতেছে না। তার জন্য আত্মমতের এবং আত্মপ্রাধান্য-লিপ্সার যে সংযম আবশ্যক, সে সংযম বা ত্যাগ নায়কবর্গের মধ্যে এখনও কিছু দেখা যাইতেছে না। লক্ষণ যাহা দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, বহুবিধ মত ও আদর্শের প্রবর্ত্তক বহু নায়কের অধীনে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে তাঁহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবেন, প্রজাপক্ষের কোনও প্রভাব আইনসভায় হইবেনা। ইঁহাদের তুলনায় প্রাচীনপন্থী বা মডারেট নায়কগণের দলের জোর অনেক বেশী হইবে বলিয়া মনে হয়, কারণ যেমনই হউক, তাঁহাদের programme বা কার্য্য-প্রণালী একরূপ ঠিকই আছে, সংখ্যায় অল্প হইলেও একতার বলে বলবান্ তাঁহারা।—তাঁহারাই হয় ত আইনসভায় প্রাধান্য করিবেন।

সাম্প্রদায়িক দলাদলি ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ।

কংগ্রেসী দলাদলির অনুবর্ত্তনে আইনসভার দলাদলি যদি ঘটে, তবে সে দলাদলির পরিণতি এইরূপই হইবে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এই দলাদলি স্বাভাবিক। সমাজ, ধর্ম্ম, জাতিবর্ণ প্রভৃতি যত বৈষম্যই কোনও এক দেশের অধিবাসীদের মধ্যে থাক, প্রজারূপে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সকলের স্বার্থ সমান, দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যও সমান; এখানে সমাজ ধর্ম্ম বর্ণ গত সাম্প্রদায়িক ভেদ মানা চলে না। কোনও সুবিধাও কোনও সম্প্রদায়ের বড় তাহাতে হয় না। গণতান্ত্রিক বা democratic নীতি যদি চালাইতে হয়, সকলেই সমান প্রজা বা citizen রূপে সমান রাষ্ট্রীয় অধিকারভোগী হইবে,—হিন্দু মুসলমান, ইহুদি খৃষ্টান, ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ, যে যাহাই হউক, প্রজা বা citizenএর দায়িত্ব সকলেরই সমান, প্রজা বা citizenরূপে এইরূপ সাম্প্রদায়িক সংস্কারের অতীত হইয়া তাহাকে উঠিতে হইবে,—প্রতিনিধি নির্ব্বাচন ও সেইভাবে করিতে হইবে। প্রতিনিধি সদস্যগণও সাম্প্রদায়িক বিশেষ বিশেষ স্বার্থের কথা ভাবিবেন না, তার সীমার মধ্যেই মাত্র আপনাদের কর্ম্মশক্তি বাঁধিয়া রাখিবেন না,—প্রজারূপে সকলের সমান স্বার্থ যাহাতে রক্ষিত হয়, সমান মঙ্গল সাধিত হয়, সেই চেষ্টা করিবেন। নতুবা আইনসভায় তাঁহাদের স্থান গ্রহণ অনেক পরিমাণে বিফল হইবে,—সকলে মিলিয়া শক্তিমান্ একটা প্রজাপক্ষ হইয়া দাঁড়াইতে পারিবেন না, স্বায়ত্ত শাসনে প্রজার ন্যায্য অধিকারও রাজপক্ষের হাত হইতে আদায় করিয়া নিতে পারিবেন না। শাসনসংস্কার আইনে communal representation এরই পুরাপুরি ব্যবস্থা হইয়াছে। ভারতীয় সমাজ নানা ভাবের বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত, প্রজারূপে সকলের সমান হইয়া দাঁড়াইবার, সমান হইয়া মিলিবার এমনিই যথেষ্ট অন্তরায় আছে। অন্য রূপ ব্যবস্থা হইলে যদিও সে সব অন্তরায় দূর হইয়া তা ঘটিয়া উঠিতে পারিত, বর্ত্তমান অবস্থায় সহজে ঘটিবে না। সুতরাং আইনসভায় প্রবল একটা প্রজাপক্ষ সহজে গড়িয়া উঠিবে না। প্রজারূপে সকলের সমান স্বার্থের কথা না ভাবিয়া প্রতিনিধিগণ যাঁর যাঁর সম্প্রদায়ের স্বার্থের কথাই হয়ত বেশী ভাবিবেন। কিন্তু প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই প্রতিনিধির সংখ্যা এত অল্প যে রাজপক্ষ প্রতিকূল হইলে এই স্বার্থই বা তাঁহারা কি প্রকারে রক্ষা করিবেন? যে ভাবে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া আইনসভা গঠনের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে রাজপক্ষ ও প্রজাপক্ষ—বর্ত্তমান অবস্থায় এই যে দুটি দল লইয়াই ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে স্বাভাবিক দলাদলি হইতে পারে, তাহা গড়িয়া উঠিবে, এরূপ ভরসা বড় করা যায় না। প্রজাপক্ষ সাম্প্রদায়িক বহুদলে বিভক্ত হইয়া দুর্ব্বল হইয়া থাকিবে। কেবল তা নয়,—সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ—যেটা ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছিল, আবার প্রবল হইয়া উঠিবে। ভারতবাসীর জাতীয় মিলন, জাতীয় শক্তিতে অভ্যুত্থান সুদূরপরাহত হইবে।

আইনের ব্যবস্থায় এই দারুণ একটা অমঙ্গলের সূচনা দেখা যাইতেছে। আমরা নিজেরাও সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার বুদ্ধিতে আরও তাহা বাড়াইয়া তুলিতেছি। দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর সম্প্রদায়ের মধ্যে দারুণ একটা বিদ্বেষের আগুন ইতিমধ্যেই জ্বলিয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালায় আবার রায়তজমিদারের মধ্যে বড় একটা বিরোধের ভাব মাথা তুলিতেছে। রায়তের সংখ্যা বেশী, ভোট বেশী,—রায়তের ভোট মেলাই পাইলে আইনসভার সদস্যপদ লাভ সহজ হইবে,—তাই পদপ্রার্থী কেহ কেহ রায়তদের পক্ষ হইয়া জমিদারের বিরুদ্ধে তাহাদের উত্তেজিত করিতেছেন, জমিদারকে মারিয়া জমির মালিকরূপে তাহাদেরই প্রাধান্য দেশে প্রতিষ্ঠা করাইবেন, এইরূপ লোভ তাহাদের দেখাইতেছেন। ইহাতে জমিদারে রায়তে কতকটা রাজা প্রজার মত যে একটা সম্বন্ধ ছিল, যাহাতে জমিদার রায়ত উভয় পক্ষেরই অনেক উপকার হইত, তাহা ত থাকিবেই না, বরং ভয়ঙ্কর একটা শত্রুতাই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মিবে,—জমিদারীতে একটা বিপ্লব উপস্থিত হইবে। দাক্ষিণাত্যের হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণের সামাজিক প্রভুত্ব বড় কঠোর, ব্রাহ্মণেতর বহু জাতির সামাজিক অবস্থা তাহাতে বড় হীন হইয়া রহিয়াছে। বাঙ্গলার বহু স্থানেও জমিদারের নানারূপ অত্যাচারে রায়ত পীড়িত হয়। কিন্তু ধনে, পদে, সামাজিক গৌরবে, যে ভাবেই যারা প্রবল হউক, প্রবলের কোনও না কোনরূপ পীড়ন দুর্ব্বলের উপরে সর্ব্বত্রই এ পৃথিবীতে আছে। ভারতে ইহা একভাবে দেখা যাইতেছে, অন্যদেশেও খোঁজ করিলে অন্যভাবে দেখা

যাইবে।—ইহার যথাসম্ভব প্রতিকার অবশ্য প্রয়োজন। কিন্তু প্রতিকারের উপায় সাম্প্রদায়িক এই বিদ্বেষ, শত্রুতা ও বিচ্ছেদ নয়। তাহাতে কেবল সমাজবিপ্লবই ঘটে, অনুরূপ আরও ভীষণ সব অমঙ্গল দেখা দেয়। একটা কথা আমাদের ভুলিলে চলিবেনা এই যে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ, জমিদার রায়ত, সকল সম্প্রদায়ই একই দেশের, একই সমাজের বিভিন্ন অঙ্গ, সকলেরই বহু মঙ্গল পরস্পরের সহযোগিতা সাপেক্ষ।—এক অঙ্গ অপর কোনও অঙ্গকে মারিয়া নিজে টি'কিয়া থাকিতে কি চলিতে পারে না।—প্রত্যেকেই আপনাকে প্রধান ভাবিয়া, আপন স্বার্থকেই সর্ব্বস্ব করিয়া চলিতে চাহিলে সকলের স্বার্থই বিনষ্ট হইবে। —আমি অপর সকল হইতে পৃথক, আমার স্বার্থ অপরের স্বার্থ হইতে ভিন্ন, এই বুদ্ধিতে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে মোট সমাজশরীরই ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইবে,—সমাজ মরিবে, ছিন্নবিচ্ছিন্ন অঙ্গগুলিও একে একে পচিয়া শুকাইয়া মরিবে।

কথাগুলির একটু বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক,—ক্রমে তার চেষ্টা করিব।

অষ্ট্রীয়া সম্রাটের মৃত্যু রহস্য

অষ্ট্রীয় হাঙ্গেরীর ভূতপূর্ব্ব সম্রাট-ফ্রান্সিস্ জোসেফের মৃত্যু সম্বন্ধে সম্প্রতি এক নূতন সংবাদ বাহির হইয়াছে।

মালঞ্চের পাঠক পাঠিকাবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে, গত মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি ১৯১৬ সালের নবেম্বর মাসের শেষ ভাগে হঠাৎ প্রকাশ হয় যে, বৃদ্ধ সম্রাট সামান্য জ্বর ও সর্দ্দি রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি সে খবর বাহির হইয়াছে, তাহাতে প্রকাশ যে পারিবারিক গোলমালে উত্যক্ত হইয়া সম্রাট আত্মহত্যা করিয়াছেন। সংবাদটি কত দূর সত্য তাহা ঠিক করিয়া বলা শক্ত। তথাপি মালঞ্চের পাঠক পাঠিকাগণকে এ সংবাদটি দিতে আমরা কোন বাধা দেখি না।

প্রকাশ এই যে বর্ত্তমান সাম্রাজ্ঞী (আর্চ্চ ডাচেস্ জিটা) তাঁহার উগ্র ব্যবহারে সম্রাটের শেষ জীবন বিষময় করিয়া তুলিয়াছিলেন। কারণে অকারণে তিনি বৃদ্ধ সম্রাটকে—দরবারের লোকজনের সম্মুখে তাঁহার মুখের উপর নানা কুৎসিৎ ভাষায় গালাগালি করিতেন। নানা প্রকারের ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে অপদস্থ করিতে চেষ্টা করিতেন।

জর্ম্মাণ কৈশর যুদ্ধের সময় অষ্ট্রীয়ার সম্রাটের সহিত দেখা করিতে একবার ভিয়েনায় যান। সেখানে তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য এক রাজভোজের আয়োজন হয়। সেই ভোজে জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রীয়ার অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। কি কথায় জিটা অত্যন্ত রাগিয়া কৈশরকে লক্ষ্য করিয়া রিভলবার তুলিয়া গুলি করেন। গুলি অবশ্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, কিন্তু কৈশর তখনই গুলি করিয়া জিটাকে জখম করেন। ভোজ সেখানেই শেষ হইল। অষ্ট্রীয়ার সংবাদপত্রে প্রকাশ হইল যে আর্চ্চডাচেস্ সামান্য পীড়িত হইয়াছেন এবং কয়েক দিন ঘরের বাহির হইবেন না।

প্রিন্সেস্ জিটা বুরবোঁ পার্ম্মা পরিবারের কন্যা। এই ঘটনার পর হইতে উক্ত পরিবারের ধ্বংস সাধন করা জার্ম্মাণীর অন্যতম চেষ্টা হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ সম্রাটেরও মাঝে মাঝে মস্তিষ্কের বিকৃতি দেখা যাইতে লাগিল।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরে ১৯১৬ সালের ২১শে নবেম্বর বেলা ১০।৷০টায় দেখা গেল যে সম্রাট নিজের শুইবার ঘরে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছেন।

রাজপ্রাসাদের মহিলারা তখনই এই মৃত্যু সংবাদ সাধারণে প্রকাশ করা যুক্তিসঙ্গত কি না এই বিষয়ে পরামর্শ আরম্ভ করেন এবং বহু গোলমালের পর স্থির হয় যে, ইহা সাধারণে প্রকাশ করা উচিত হইবে না। অতএব জগতের সম্মুখে প্রকাশ হইল যে, সম্রাট রাত্রি ৯টায় সময় জ্বর রোগে হঠাৎ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

অষ্ট্রীয়ায় প্রকৃত মৃত্যুরহস্য গোপন রহিল না। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যরাও এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিল। ক্রমে এ বিষয় লইয়া এরূপ কথা হইতে লাগিল যে, সৈন্য-বিভাগের কর্ত্তাকে অবশেষে এই আদেশ জারি করিতে হইল যদি কাহাকেও এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে দেখা যায়, তাহাকে তখনই গুলি করিয়া বধ করা হইবে। এই ভাবেসে সংবাদ তখন চাপা পড়িয়া গিয়াছিল।

('বাঙ্গালী' হইতে উদ্ধৃত)

"বিলাতের "দীন ইঙ্গে" একজন বড় পাদরী, বড় লেখক, বড় বক্তা, বিলাতের বিদ্বজ্জন সমাজে তাঁহার যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিষ্ঠাও আছে। ইনি সম্প্রতি একখানি পুস্তিকা লিখিয়াছেন। তাহাতে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—"ইহা কি উন্নতি?" এই যে তোমাদের সভ্যতা, এই যে আকাশে উঠিতেছ, জলের ভিতর দিয়া মীনের মত যাইতেছ, এই যে রসায়ন বিদ্যার উন্নতি করিতেছ, এ সব কি উন্নতির লক্ষণ? যুদ্ধের সময় মনুষ্যত্ব অনেকটা ফুটিয়া উঠে। দয়া, ক্ষমা, ঔদার্য্য, তিতিক্ষা প্রভৃতি গুণ যুদ্ধের সময়ই প্রকাশ পায়। এবার জর্ম্মণ যুদ্ধে তাহার কিছু পরিচয় পাইয়াছ কি? যে যুদ্ধে লুসিটানিয়া জাহাজ ডুবান হইয়াছে, এরোপ্লেনে চড়িয়া লণ্ডন-প্যারিস প্রভৃতি সহরে বোমা ফেলা হইয়াছে, গ্যাসের অনল প্রবাহে যোদ্ধ‍ৃগণকে ইঁদুর বিড়ালের মত মারা হইয়াছে, —দয়া, ক্ষমা, তিতিক্ষা ইহার কোনও নিদর্শন কোনখানে পাইয়াছ কি? রুষ সীমান্তের দিকে সার্ভিয়ায়, রুমেনিয়ায়, টাইফয়েড প্রভৃতি উৎকট রোগের জীবাণু পর্য্যন্ত ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। যোদ্ধায় যোদ্ধায় যুদ্ধ নহে, এ যুদ্ধ অপূর্ব্ব। তুমি আমার শত্রু, যেমন করিয়া পারি তোমাকে ছারপোকা মারা করিব, ইহাই ছিল এই যুদ্ধের নীতি। ইহা কি উন্নতির পরিচায়ক?

এই ভাবে অনেক উদাহরণ তুলিয়া, রুষে বোল-শেভিকদের উপদ্রবের কথার আবৃত্তি করিয়া কমিউনিষ্টদের সিদ্ধান্তের বিরোধ করিয়া 'দীন ইঙ্গে' পুস্তিকা লিখিয়াছেন—ব্যাখ্যান বক্তৃতা করিতেছেন এবং বিলাতের লোককে বুঝাইবার চেষ্টায় আছেন যে ইহা উন্নতির পরিচায়ক নহে, ইহা অবনতিরই সূচক। দুটো এরোপ্লেন গড়িতে পারিলে এবং উড়িয়া বিলাত হইতে ভারতবর্ষে আসিতে পারিলে, মানুষ সুসভ্য ও উন্নত হইল, এমন কথা বলা চলে না। কথাটা ঠিক। আমাদের পুরাণ এই সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া নানা আখ্যায়িকা উপাখ্যান লিখিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে গুরু-বিদ্যা পাণ্ডিত্য, সিদ্ধি, কিছুতেই মনুষ্যত্বের উপচয় সাধক হয় না যদি তাহার মধ্যে ধর্ম্ম ভক্তি এবং শীলতা না থাকে। রাবণ একটা প্রকাণ্ড পণ্ডিত, বেদের ব্যাখ্যাতা, দর্শনশাস্ত্রের প্রচারক, অশেষ সিদ্ধিসম্পন্ন যোগী। রাবণ জড়বিজ্ঞানের উপর অধিকার বিস্তার করিয়াছিল। তাহার পুষ্পক রথ ছিল। নিজে উড়িতেও পারিত। সূর্য্যকে বাঁধিয়া রাখিয়া লঙ্কায় অহর্নিশি জ্যোতিঃ বিদ্যমান রাখিতে পারিয়াছিল। বায়ু তাহার অধীন ছিল এবং সে দিগ্বিজয়ী অপরাজেয় বীরও ছিল। কিন্তু রাবণ আমাদের হিসাবে আদর্শ পুরুষ নহে। তাহা অতিশয় দর্প ছিল। সে ইহকাল পরকাল মানিত না, সে ভগবানকে ভয় করিত না। তাই আদর্শ পুরুষ রামচন্দ্রের কাছে তার পরাজয় হইল। কেবল রাবণই বলি কেন? হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ, কংস প্রভৃতি অসুরগণ ভীমপরাক্রমশালী পুরুষ ছিলেন। বিদ্যার পাণ্ডিত্যে কেহ ন্যূন ছিলেন না, কিন্তু কেবল আদর্শ মনুষ্যত্বেই তাঁহাদের ত্রুটি ছিল। কংস মাতুল, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভাগিনেয়—হিরণ্যকশিপু পিতা, প্রহ্লাদ তাঁহার পুত্র। রাবণ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ—ইহাঁরা কেহ সমাজের বাহিরের লোক ছিলেন না, পর ছিলেন না। ব্যবহারদোষেই দৈত্য দানব অসুর রাক্ষস প্রভৃতি পদবাচ্য হইয়াছিলেন। এই হিসাবে আমরা বর্ত্তমান ইউরোপকে রাক্ষস পদবাচ্য করিয়া রাখিয়াছি। এই যুদ্ধে তাঁহারা মনুষ্যত্বের যে নমুনা দেখাইয়াছেন, তাহা আমাদের পুরাণের রাক্ষসের নমুনা। বুঝিবা রাক্ষস অপেক্ষাও হীন, কারণ রাবণ নিরস্ত্র নির্ব্বন্ধ শত্রুর প্রজাকে—শিশু, বৃদ্ধ, যুবতী বৃদ্ধা প্রভৃতিকে মারে নাই। এ যা নমুনা দেখাইলে এ নমুনা দেখিয়া আমরা এসিয়ার বর্ব্বর জাতি সকল সত্যই বিস্ময়ে অবাক হইয়াছি। যুদ্ধের এ পদ্ধতি আমাদের কল্পনার অতীত। ইহা যদি উন্নতি হয়, ইহা যদি সভ্যতা হয়, তাহা হইলে বর্ব্বরতাটা যে কি, তাহা ত ভাবিয়া পাই না। মজা দেখ, ১৮৭০-৭২ খৃঃ অব্দে ঐ জর্ম্মণ জাতি যখন ফ্রান্স আক্রমণ করে, তখন ফ্রান্সের কৃষকগণের অঙ্গে কেহ হস্তক্ষেপ করে নাই। একটা জর্ম্মণ সৈনিক বা সেনানী ন্যায্য মূল্য না দিয়া কোনখানে আহার করে নাই। আর্কিবাল্ড ফরবস্, লাবু-সেয়ার প্রভৃতি পত্রলেখকগণ এ পক্ষে যথেষ্ট সাক্ষ্য সাবুদ

দিয়াছিলেন। আর চল্লিশ বৎসর পরে সেই জর্ম্মণজাতি কি হইয়া গেল! কাজেই জিজ্ঞাসা করিতে হয় ইহা উন্নতি না অবনতি? প্রশ্নটা সময় মতনই জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। কারণ এ কলঙ্ক ত কেবল জর্ম্মণজাতির নহে, সমগ্র ইউরোপের শ্বেতাঙ্গ খ্রীষ্টান সভ্যতার। এশিয়ার দৃষ্টিতে শ্বেতাঙ্গ খৃষ্টান সভ্যতাকে ঠিক রাখিতে হইলে এ কলঙ্ক ক্ষালন করিতে হইবে।

কালা আদমির প্রতি তোমাদের যে প্রেম তাহা ত জানি। এই সেদিন মাসেককাল পূর্ব্বেই আমেরিকার এক নিগ্রো কাফ্রিকে ধরিয়া লিঞ্চ আইন অনুসারে পোড়াইয়া মারা হইয়াছে। সহস্র সহস্র শ্বেতাঙ্গের নরনারী সে তামাসা দেখিয়াছে। আমরা কালা আদমি, তোমাদের সহিত মনুষ্যত্বের সমান দাবি করি না, করিতে পারি না। পারিলে জালিয়ানওয়ালাবাগ ঘটিত না। পারিলে জালিয়ানওয়ালার কাণ্ডের পঞ্জাবের পুরুষগণ রাজরথ্যার ধুলি চাটিয়া বুকে হাটিয়া অগ্রসর হইতেন না। আমাদের সে দাবি নাই, কিন্তু তোমরা যে বকের মাংস বকে খাইতেছ। জর্ম্মণী ইংলণ্ডকে মারিতেছে, ফ্রান্স জর্ম্মণীকে চূর্ণ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে; আর রুষ আপনার রসে আপনি কাটিয়া ফুটিফাটা হইয়া পড়িয়া আছে। এই ভাব চলিলে ইউরোপ ত বেশীদিন টি*কিবে না। 'দীন ইঙ্গে' সেইটুকু বুঝিয়াছেন; বুঝিয়া তাহার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিতেছেন।

শেষে বলি,—"বলিহারি আমাদের—আমরা ইংরেজী শিক্ষিত, বিলাতী সভ্যতা বিমুঢ়, তরুণ ভারতবাসীর। পাঁচ বৎসরকাল ইউরোপের মনুষ্যত্বের নমুনা অহরহঃ দেখিয়া, শুনিয়া, পড়িয়া, পঞ্জাবের কাণ্ডে ঠেকিয়া ও ঠকিয়া, খেলাফতে আক্কেল পাইয়া, এখনও সাহেব সাজিতে ছাড়িতেছিনা,—এখনও বিলাতী সভ্যতার মোহে মুগ্ধ হইয়া আছি। দীন ইঙ্গে যদি বলিয়া কহিয়া তাহার দেশের লোককে সামলাইতে পারেন, তাহা হইলে অনেকটা কাজ করিবেন। কারণ দেশের নরনারী সামলাইলে কালে আমাদের দেশের নকলনবীশ নরনারীর দল সামলাইতেও পারে।"

আশীর্ব্বাদ

আজি এ দিনে ধন কি রতন দিব রে?
ধারিনা ধার তার দীনতার বিবরে!
এ হেন উৎসব কলরব-বিহীনে
কেমন শুভদিন শোভাহীন সে সে দিনে!
মমতা মাখা মুখ ভরা বুক কোথা সে
কোথা সে আকুলতা ব্যস্ততা সদা সে!
মায়ের যত মায়া ধরি কায়া ঘুরিত
সকল প্রয়োজনে আয়োজনে উরিত
সবার মাঝে আজি উঠি বাজি সে কথা
করিছে আনমনা উন্মনা, কেন গা?
সেই যে কি থর্কিত আজিবীত বলিয়া
যাবে কি হেন দিন সুখহীন চলিয়া?
শ্রেষ্ঠ ধন মম নিরুপম মমতা
দিতেছি শত হাতে তব মাথে লহ' তা!

এবে যে আমি, ধন, দুইজন তোমারি
তুমিই আছ জুড়ে বুক পুরে আমারি!
নিয়ত চিত মাঝে নানা সাজে রচি এ
তোমারি কল্যাণ সব প্রাণ যাচিছে!
আসুক্ শত বার ফিরি আর দিন এ
মাগি রে বিভু পাশে বহু আশে বিনয়ে!
পিতা এ ধন দীন মনহীন ভেব' না—
হয়ত তুমি যবে বড় হবে—থব' না
আমি এ ধরণীতে; গাথাটিতে এ কবির
পিতার পরাণের ও মনের সুগভীর
স্নেহের সমুদয় পরিচয় লিখিনু,
সকল শুভ আশা ভালবাসা রাখিনু।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

শাসনসংস্কার আইন

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা

শাখাসভা।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার দুইটী শাখা থাকিবে (১) কাউন্সিল অব ষ্টেট বা উচ্চ সভা (২) লেজিস্‌লেটিভ এসেম্‌ব্লি বা নিম্ন সভা।

কোনও আইনের প্রস্তাব এই উভয় সভায় একই আকারে পরিগৃহীত হইলে তবে তাহা ব্যবস্থাপক সভায় পাশ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

উচ্চ সভা।

(১) এই সভায় সভ্যের সংখ্যা বাইটের অধিক হইবে না। ইহাঁদিগের মধ্যে নির্ব্বাচিত ও মনোনীত এই দুই শ্রেণীর সভ্য থাকিবেন। মনোনীত সভ্যদিগের মধ্যে বিশ ভাগের অধিক সরকারী কর্ম্মচারী থাকিবে না। বিশেষ বিধি দ্বারা এসকল বিষয়ের ব্যবস্থা করা হইবে।

(২) প্রধান শাসনকর্ত্তা সভ্যদিগের মধ্য হইতে একজন সভাপতি ও অবস্থাবিশেষে তাঁহার স্থলে কার্য্য করিবার জন্য অন্যান্য ব্যক্তিবিশেষ মনোনীত করিবেন।

(৩) প্রধান শাসনকর্ত্তা এই সভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার বক্তব্য জ্ঞাপন করিতে পারিবেন এবং তজ্জন্য এই সভার অধিবেশন করাইতে পারিবেন।

নিম্নসভা।

(১) বিশেষ বিধি অনুসারে নির্ব্বাচিত ও মনোনীত সভ্য লইয়া এই সভা গঠিত হইবে।

(২) ইহার মোট সভ্য সংখ্যা ১৪০ জন থাকিবে, মনোনীত সভ্যের সংখ্যা ৪০ জন হইবে, তন্মধ্যে ২৬ জন সরকারী কর্ম্মচারী থাকিবেন এবং নির্ব্বাচিত সভ্যের সংখ্যা ১০০ জন হইবে।

বিশেষ বিধিদ্বারা উপরোক্ত সংখ্যার পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে। তবে নির্ব্বাচিত সভ্যসংখ্যা কখনও মোট সংখ্যার সাত ভাগের পাঁচ ভাগের কম হইবে না এবং মনোনীত সভ্যসংখ্যার অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ সরকারী কর্ম্মচারী ব্যতীত অন্য লোক হওয়া চাই।

(৩) প্রধান শাসনকর্ত্তা এই সভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার বক্তব্য জ্ঞাপন করিতে পারিবেন এবং তজ্জন্য এই সভার অধিবেশন করাইতে পারিবেন।

(৪) এই সভার একজন সভাপতি নিযুক্ত হইবেন। প্রথম চারিবৎসর প্রধান শাসনকর্ত্তা এই সভাপতি নিযুক্ত করিবেন। পরে সভার নির্ব্বাচিত ব্যক্তি এই পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। নির্ব্বাচিত ব্যক্তি প্রধান শাসনকর্ত্তার অনুমোদিত হওয়া চাই।

(৫) এই সভার একজন সহকারী সভাপতি থাকিবেন। সভাপতির অনুপস্থিতিতে ইনি তাঁহার স্থলে কার্য্য করিবেন। সভ্যগণকর্ত্তৃক তাহাদিগের মধ্য হইতে একজন এই পদে নির্ব্বাচিত হইবেন। নির্ব্বাচিত ব্যক্তি প্রধান শাসনকর্ত্তার অনুমোদিত হওয়া চাই।

(৬) সভাপতি ও সহকারী সভাপতি নির্দ্দিষ্ট বেতন পাইবেন। প্রধান শাসনকর্ত্তা কর্ত্তৃক নিযুক্ত সভাপতির বেতন তিনিই নির্দ্দিষ্ট করিবেন। নির্ব্বাচিত সভাপতি ও সহকারী সভাপতির বেতন ব্যবস্থাপক সভা আইন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করিবেন।

উভয় সভার স্থায়িত্বকাল।

(১) প্রত্যেক নবগঠিত উচ্চসভা পাঁচবৎসর ও নিম্নসভা তিনবৎসর পর্য্যন্ত চলিবে।

তবে প্রধান শাসনকর্ত্তা উক্ত যে কোনও সভা উক্ত মেয়াদের পূর্ব্বেই ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবেন (dissolve), অথবা তাহার মেয়াদ বাড়াইয়া দিতে পারিবেন। এইরূপ ভাঙ্গিবার তারিখ হইতে ছয়মাসের মধ্যে, অথবা ভারতসচিবের অনুমোদিত হইলে, নয় মাসের মধ্যে, নূতন সভার বৈঠকের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২) প্রধান শাসনকর্ত্তার নির্দ্দেশ অনুযায়ী স্থানে ও সময়ে ব্যবস্থাপক সভার বৈঠক বসিবে ও তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে সাময়িক ভাবে ইহার বৈঠক বন্ধ থাকিবে (prorogue.)।

(৩) সভাপতি কোনও সভার অধিবেশন প্রয়োজন অনুসারে স্থগিত রাখিতে (adjourn) পারিবেন।

(৪) আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কোনও সভায় মত সভাপতি ব্যতীত অন্যান্য উপস্থিত অধিকাংশ সভ্যের মতানুযায়ী নির্দ্দিষ্ট হইবে। উভয় দিকে ভোটসংখ্যা সমান হইলে সভাপতি যে কোনও দিকে একটি ভোট দিতে পারিবেন।

(৫) কোনও সভার কোনও সভ্যপদ খালি থাকিলেও সভার কার্য্য চলিতে পারিবে।

উভয় সভার সভ্য সম্বন্ধীয় নিয়ম।

(১) কোনও সরকারী কর্ম্মচারী কোনও সভায় নির্ব্বাচিত সভ্যের পদপ্রার্থী হইতে পারিবেন না। কোনও নির্ব্বাচিত সভ্য ভারত সরকারের অধীন কোনও কর্ম্মচারীর পদ গ্রহণ করিলে তাঁহার উক্ত সভাপদ শূন্য হইবে।

(২) উক্ত দুইটি শাখা সভার মধ্যে কোনও সভার নির্ব্বাচিত সভ্য যদি পরে অপর সভায় নির্ব্বাচিত হন, তাহা হইলে তাঁহার প্রথম সভার সভ্যপদ শূন্য হইবে।

(৩) যদি কোনও ব্যক্তি এককালীন দুইটি শাখাসভার সভ্য নির্ব্বাচিত হন, তাহা হইলে তিনি উক্ত কোন্ সভার সভ্য থাকিতে ইচ্ছা করেন তাহা লিখিয়া জানাইবেন। তদনুসারে তাঁহার অপর সভার সভ্যপদ শূন্য হইবে।

(৪) প্রধান শাসনকর্ত্তার অমাত্যসভার প্রত্যেক অমাত্য উক্ত কোনও একটি শাখা সভার সভ্য মনোনীত হইবেন। তিনি প্রয়োজনানুসারে অপর শাখাসভায় উপস্থিত হইয়া স্বীয় বক্তব্য জ্ঞাপন করিতে পারিবেন, কিন্তু উক্ত সভায় সভ্যরূপে পরিগণিত হইবেন না।

উভয় সভার গঠন প্রণালী সম্বন্ধীয় নিয়ম।

(১) বিশেষ বিধি দ্বারা নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা হইবে।—

(ক) উভয় সভার মনোনীত সভ্যগণের কার্য্যকাল, এবং কোনও সভ্যের ভারতবর্ষ হইতে স্থানান্তরে গমন, সভার কার্য্যে যোগদান না করিতে পারা, সরকারী কার্য্য গ্রহণ করা, পদত্যাগ, মৃত্যু অথবা অন্যান্য কারণে শূন্য সভ্যপদে নূতন সভ্য নিয়োগ।

(খ) যে সকল সর্ত্ত ও নিয়মানুসারে উভয় সভার মনোনীত সভ্য নিযুক্ত করা হইবে।

(গ) ভোটদাতাগণের যোগ্যতা, সভ্যনির্ব্বাচনের স্থানীয় বিভাগ নির্দ্দেশ, সভ্যনির্ব্বাচন-প্রণালী ও তদানুষঙ্গিক বিষয় প্রভৃতি।

(ঘ) উক্ত উভয় সভার সভ্যপদে নির্ব্বাচিত বা মনোনীত হইবার যোগ্যতা কি হইবে।

(ঙ) নির্ব্বাচনের বৈধতা ও তৎসম্বন্ধীয় বিরোধের নিষ্পত্তি কিরূপে হইবে।

(চ) কি প্রণালীতে বিশেষবিধি সকল প্রচলিত করা হইবে।

(২) পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে ভারতবর্ষের করদ ও মিত্র রাজগণ অথবা তাঁহাদের প্রজাগণ উক্ত উভয় সভার সভ্যপদে মনোনীত হইতে পারিবেন।

আইন প্রণয়নের অধিকার।

(১) ব্যবস্থাপক সভা নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে আইন প্রণয়ণ করিতে পারিবেন:—

(ক) ব্রিটীশ ভারতের সীমার মধ্যে অবস্থিত যাবতীয় ব্যক্তি, আদালত, স্থান ও বিষয় সম্বন্ধে।

(খ) ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে অবস্থিত ব্রিটিশ প্রজা ও সরকারী কর্ম্মচারীদিগের সম্বন্ধে।

(গ) ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে অথবা বাহিরে যে কোনও দেশে অবস্থিত ব্রিটিশ ভারতীয় প্রজাদিগের সম্বন্ধে।

(ঘ) যে কোনও স্থানে অবস্থিত, ভারতীয় সেনার অন্তর্ভুক্ত সৈন্য, আকাশসৈন্য, সেনানায়ক বা সেনা-সমভিব্যাহারী অপর ব্যক্তিগণ যে সকল বিষয়ে সেনা বা আকাশসেনা সম্বন্ধীয় ব্রিটিশ আইনের অধীন নহে, সেই সকল বিষয় সম্বন্ধে।

(ঙ) ভারতের রাজকীয় নৌসেনাবিভাগে নিযুক্ত যাবতীয় ব্যক্তি সম্বন্ধে ;

(চ) ব্রিটীশ ভারতের কোনও অংশে প্রচলিত যে কোনও আইন অথবা যে সকল ব্যক্তি সম্বন্ধে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার আইন প্রণয়ণ করার অধিকার আছে, তাহাদিগের সম্বন্ধীয় প্রচলিত কোনও আইন পরিবর্ত্তন বা রদ করা সম্বন্ধে।

(২) কিন্তু বিলাতের মহাসভায় প্রণীত কোনও আইনের দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইলে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা এরূপ কোনও আইন করিতে পারিবেন না যদ্বারা নিম্নলিখিত আইন সকল রদ বা পরিবর্ত্তিত হয় :—

(অ) সেনা আইন, আকাশসেনা আইন প্রভৃতি ১৮৬০ সন হইতে ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্ট কর্তৃক পাশ করা যে সকল আইন ভারতবর্ষে প্রযোজ্য ;

(আ) ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টের যে সকল আইন দ্বারা ভারতবর্ষের শাসনকার্য্যের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যুক্তরাজ্যে কর্জ্জ করিবার ক্ষমতা ভারতসচিবকে দেওয়া হইয়াছে।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা এরূপ কোনও আইন পাশ করিতে পারিবেন না, যদ্বারা পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার ক্ষমতা কোনও প্রকারে ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, অথবা যদ্বারা সম্মিলিত গ্রেটব্রিটেন ও আয়র্লণ্ডের যুক্তরাজ্যে প্রচলিত কোনও অলিখিত আইন কিম্বা রাষ্ট্রীয় বিধান যাহার উপর যুক্তরাজ্যের অধীশ্বরের প্রতি কোনও ব্যক্তির রাজভক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা কোনও পরিমাণে নির্ভর করে, তাহার কোনওরূপ ব্যত্যয় হইতে পারে, অথবা যদ্বারা ব্রিটীশ ভারতবর্ষের কোনও অংশে উক্ত অধীশ্বরের ক্ষমতা কোনও প্রকারে ক্ষুণ্ণ হইতে পারে।

(৩) ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা, ভারতসচিব ও তাঁহার অমাত্যসভার অনুমতি পূর্ব্বে না লইয়া কোনও আইন দ্বারা ইউরোপে ভূমিষ্ঠ কোনও ব্রিটিশ প্রজা অথবা তাহার সন্তানদিগকে মৃত্যুদণ্ড দিবার অধিকার হাইকোর্ট ব্যতীত অপর কোনও আদালতকে দিতে পারিবেন না ; কোনও হাইকোর্ট উঠাইয়া দিতে পারিবেন না।

নৌসেনা বিভাগ সংক্রান্ত আইন।

(১) পশ্চিমে উত্তমাশা অন্তরীপ ও পূর্ব্বে ম্যাগডেলেন অন্তরীপ উভয় সীমানার মধ্যে অবস্থিত যে বিস্তৃত জলভাগ তাহাই ভারতীয় সমুদ্র। কোনও ব্যক্তির কোনও অপরাধ অনুষ্ঠানের সময় সেই জাহাজ উক্ত সীমানার মধ্যে না থাকিলে অনুষ্ঠিত অপরাধ সম্বন্ধে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার কোনও আইন প্রযোজ্য হইবেন।

(২) এই সকল আইনের নির্দ্দিষ্ট দণ্ডাদির প্রকৃতি ও পরিমাণ ব্রিটিশ আইনের অনুরূপ হইবে ও তাহার অতিরিক্ত হইবেনা।

সভার কার্য্যপ্রণালী।

(১) সভার যে প্রণালীতে কার্য্য নির্ব্বাহ করা হইবে, অর্থাৎ সভার শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা, সভাপতি ও সহকারি সভাপতির অনুপস্থিতিতে কার্য্য চালাইবার নিমিত্ত সভাপতি নির্ব্বাচন, অন্যূন কতজন সভ্য উপস্থিত থাকিলে সভার কার্য্য চলিতে পারিবে, কোন্ কোন্ বিষয় সম্বন্ধে সভায় প্রশ্ন উত্থাপন করা চলিবে বা চলিবেনা—এই সকল বিষয় সম্বন্ধে বিশেষবিধি দ্বারা ব্যবস্থা করা হইবে।

(২) প্রধান শাসনকর্ত্তার অনুমতি না লইয়া নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে কোনও আইনের প্রস্তাব ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা যাইতে পারিবেনা :—

(ক) ভারতের সরকারী ঋণ অথবা রাজস্ব সম্বন্ধে অথবা ভারতের রাজস্ব কোনওপ্রকারে দায়াবদ্ধ করা সম্বন্ধে ;

(খ) ভারতবাসী ব্রিটিশ প্রজাদিগের কোনও শ্রেণীর ধর্ম্ম বা ধর্ম্মবিষয়ক আচার নীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে ;

(গ) রাজকীয় স্থলসেনা অথবা নৌসেনার কোনও অংশের সংরক্ষণ অথবা শাসন সম্বন্ধে ;

(ঘ) ভারত সরকারের সহিত অপরাপর রাজ্য বা রাজগণের সম্বন্ধ বিষয়ে ;

(ঙ) যে সকল প্রাদেশিক বিষয় সম্বন্ধে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা আইন প্রণয়ন করিতে পারিবেন, বিশেষ বিধি দ্বারা এইরূপ নির্দ্দেশ করা না হইয়া থাকে, তৎসম্বন্ধে ;

(চ) কোনও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা প্রণীত কোনও আইন রহিত অথবা পরিবর্ত্তন করা সম্বন্ধে ;

(ছ) প্রধান শাসনকর্ত্তার কর্তৃক-প্রণীত কোনও আইন বা অনুশাসন সম্বন্ধে ;

(২ক) কোনও শাখাসভায় কোনও আইনের প্রস্তাব উপস্থিত করিবার পর, অথবা প্রস্তাবিত আইনের কোনও বিধান সম্বন্ধে কোনও সংশোধনের প্রস্তাব উপস্থিত করিবার অনুমতি চাহিবার সময় বা উপস্থিত করিবার পর, প্রধান শাসনকর্ত্তা প্রয়োজন হইলে এইরূপ নির্দ্দেশপত্র প্রচার করিতে পারিবেন যে উক্ত আইন বা তাহার অংশ, অথবা সংশোধনের প্রস্তাব দ্বারা ব্রিটিশ ভারত বা তাহার কোনও অংশের শান্তি ও সুরক্ষার ব্যবস্থার ব্যাঘাত হইতে পারে, এবং এইরূপ নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন যে উক্ত আপত্তি-

জনক আইন বা তাহার অংশ অথবা সংশোধনের প্রস্তাব সম্বন্ধে আর কোনও আলোচনা সভায় হইতে পারিবেনা।

(৩) কোন শাখা সভা হইতে যে আইনের প্রস্তাব পাশ হইবে, যদি তাহা পরিবর্ত্তী ছয়মাসের মধ্যে অপর শাখা সভা হইতে ঠিক সেই আকারে অথবা প্রথম শাখার সম্মত কোনও পরিবর্ত্তিত আকারে পাশ না হয়, তাহা হইলে প্রধান শাসনকর্ত্তা ইচ্ছা করিলে এইরূপ প্রস্তাব উভয় শাখার সম্মিলিত অধিবেশনে মীমাংসার জন্য পাঠাইতে পারিবেন। এই উদ্দেশ্যে যাহাতে উভয় শাখা একত্র সভা করিয়া দুই শাখার মতভেদের বিষয় আলোচনা করিতে পারেন, এতৎসম্বন্ধে স্থায়ী নিয়ম প্রণয়ণ করা হইবে।

(৪) উভয় শাখা কর্ত্তৃক পরিগৃহীত কোনও আইনের প্রস্তাব প্রধান শাসনকর্ত্তা পুনর্ব্বিবেচনার জন্য ব্যবস্থাপক সভায় ফেরত পাঠাইতে পারিবেন।

(৫) বিশেষ-বিধি প্রণয়ণের দ্বারা এই দফা অনুযায়ী কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হইবে।

(৬) ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার কোনও শাখার কার্য্যপরিচালনা ও কার্য্যবিধি সম্বন্ধীয় যে সকল বিষয় বিশেষ বিধি দ্বারা ব্যবস্থা করা না হয়, স্থায়ী-নিয়ম প্রণয়ণ দ্বারা তাহার ব্যবস্থা করা হইতে পারিবে। প্রথম স্থায়ী নিয়ম-সমূহ প্রধান শাসনকর্ত্তা ও তাঁহার অমাত্যসভা কর্ত্তৃক প্রণীত হইবে, পরে তাঁহার সম্মতি লইয়া যে শাখায় প্রতি যে স্থায়ী নিয়ম প্রযোজ্য, সেই শাখা সভা কর্ত্তৃক তাহা পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রণীত কোনও স্থায়ী নিয়ম যদি সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবেও কোনও বিশেষ বিধির বিরুদ্ধ হয়, তবে সেই বিধিবিরুদ্ধ নিয়ম বা তাহার অংশ রহিত বা পণ্ড বলিয়া গণ্য হইবে।

(৭) প্রত্যেক শাখা সভার সভ্যগণ স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করিতে পারিবেন। তবে এতৎসম্বন্ধীয় বিশেষ বিধি ও স্থায়ী নিয়ম সমূহ প্রতিপালন করিয়া চলিতে হইবে। কোনও শাখা সভায় কোনও প্রকার বক্তৃতা অথবা ভোট দেওয়া, অথবা যে সকল বিষয় উক্ত সভার কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশিত হইবে, তজ্জন্য কোনও সভ্যের বিরুদ্ধে কোনও আদালতে কোনও প্রকার মোকদ্দমা চলিতে পারিবে না।

বজেট বা বার্ষিক আয় ব্যয়ের বিবরণী।

ভারতসরকারের আগামী বর্ষের আয়ব্যয়ের হিসাব বিবরণীর আকারে প্রতি বৎসর উভয় সভায় উপস্থিত করা হইবে।

(২) প্রধান শাসনকর্ত্তার অনুমোদন ব্যতীত উক্ত আয়ের কোনও অংশ কোনও কার্য্যে ব্যয় করিবার প্রস্তাব কোনও সভ্য উত্থাপিত করিতে পারিবেন না।

(৩) উক্ত বিবরণীতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে ভারত সরকারের যে সকল ব্যয়ের প্রস্তাব থাকিবে, তাহা মঞ্জুর করিবার জন্য নিম্ন সভায় কোনও ভোট গ্রহণ করা আবশ্যক হইবে না; অথবা প্রধান শাসনকর্ত্তার নির্দ্দেশ ব্যতীত উক্ত বিবরণী কোনও সভার বিবেচনাধীন থাকার কালে, ঐ সকল বিষয় সম্বন্ধে সভায় কোনও আলোচনা হইতে পারিবে না।

বিষয় যথা—

(অ) সরকারী ঋণের সুদ অথবা তাহার পরিশোধ তহবিল,

(আ) যে সকল ব্যয়ের পরিমাণ কোনও আইন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট আছে;

(ই) সম্রাট্ অথবা ভারতসচিব ও তাঁহার অমাত্য-সভার সম্মতি অনুসারে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের বেতন ও পেন্সন;

(ঈ) চিফ-কমিশনার ও জুডিসিয়াল-কমিশনারগণের বেতন;

(উ) খৃষ্টীয়-ধর্ম্ম-প্রচার বিভাগ, রাষ্ট্র-নীতি বিভাগ ও রাজ্যরক্ষা-বিভাগ সংক্রান্ত ব্যয় বলিয়া ভারত-সরকার কর্ত্তৃক যে সকল ব্যয় নির্দ্দিষ্ট হইবে;

(৪) কোনও ব্যয়ের প্রস্তাব উপরোক্ত কোনও বিভাগ সংক্রান্ত কি না, এ বিষয়ে কোনও তর্ক উপস্থিত হইলে প্রধান শাসনকর্ত্তা যে মীমাংসা করিবেন, তাহাই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) উপরোক্ত বিষয় ব্যতীত বার্ষিক আয়ব্যয়ের বিবরণীতে অন্যান্য যে সকল বিষয়ের ব্যয়ের প্রস্তাব ভারত সরকার করিবেন, তাহা নিম্ন সভার মঞ্জুরির জন্য পৃথক পৃথক প্রস্তাবের আকারে উপস্থিত করিতে হইবে।

প্রস্তাবিত আইন বিষয়ে প্রধান শাসনকর্ত্তার সম্মতি।

(১) পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উভয় শাখাসভা হইতে যে আইনের প্রস্তাব পাশ হইবে, তৎসম্বন্ধে প্রধান শাসনকর্ত্তা তাঁহার সম্মতি আছে অথবা নাই, অথবা উহা সম্রাটের মঞ্জুরির জন্য মুলতুবি রাখা হউক, ইহা বিজ্ঞাপিত করিবেন।

(২) পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উভয় শাখা সভা হইতে পাশ হওয়া কোনও আইনের প্রস্তাব, তৎসম্বন্ধে প্রধান শাসনকর্ত্তার সম্মতি, অথবা সম্রাটের মঞ্জুরির জন্য মুলতুবি রাখা হইয়া থাকিলে সম্রাটের মঞ্জুরি, বিজ্ঞাপিত না হওয়া পর্য্যন্ত আইনরূপে পরিগণিত হইবেনা।

সম্রাটের নামঞ্জুর করিবার অধিকার।

(১) উক্তপ্রকারে উভয় সভার পাশ হওয়া কোনও আইনে প্রধান শাসনকর্ত্তা সম্মতি দিলে, তিনি তাহার এক প্রস্ত সহি মোহরের নকল ভারতসচিবের নিকট প্রেরণ করিবেন; তদনন্তর সম্রাট ও তাঁহার অমাত্যসভা উক্ত আইন নামঞ্জুর করিতে পারিবেন।

(২) উক্তপ্রকারে কোনও আইন নামঞ্জুর হওয়া বিজ্ঞাপিত হইলে প্রধান শাসনকর্ত্তা উক্ত নামঞ্জুরির বিষয় ঘোষণা করিবেন এবং ঐ ঘোষণার তারিখ হইতে উক্ত আইন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

প্রধান শাসনকর্ত্তার অনুশাসন।

কোনও সঙ্কট উপস্থিত হইলে প্রধান শাসনকর্ত্তা ব্রিটিশ ভারত বা তাহার কোনও অংশের শান্তি ও সুশাসনের ব্যবস্থার জন্য যে কোনও অনুশাসন প্রচার করিতে পারিবেন; প্রচারের তারিখ হইতে ছয় মাস পর্য্যন্ত উহা ব্যবস্থাপক-সভার প্রণীত আইনের তুল্য বলবৎ থাকিবে। যে সকল বিষয়ে ব্যবস্থাপক সভার আইন প্রণয়ন করিবার অধিকার আছে মাত্র সেই সকল বিষয়ে প্রধান শাসনকর্ত্তার এইরূপ অনুশাসন প্রচার করিবার অধিকার থাকিবে এবং এতদনুযায়ী প্রণীত অনুশাসন সমূহ ব্যবস্থাপক সভা প্রণীত আইনের অনুরূপভাবে সম্রাট নামঞ্জুর করিতে পারিবেন; ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন দ্বারা এই সকল অনুশাসন পরিবর্ত্তিত বা রহিত হইতে পারিবে।

ভারতীয় আইনের বৈধতা।

(১) নিম্নলিখিত কোনও কারণে ব্রিটীশ ভারতে প্রণীত কোনও আইন অবৈধ বলিয়া পরিগণিত হইবেনা:—

(ক) ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা অথবা কোনও প্রাদেশিক সভার প্রণীত কোনও আইন দ্বারা সম্রাটের রাজকীয় বিশিষ্ট অধিকার কোনও প্রকারে ক্ষুণ্ণ হওয়ার হেতুতে;

(খ) কোনও আইনের প্রস্তাব উপস্থিত করিবার সময়ে অথবা উহা পাশ হইবার সময়ে কোনও ব্যবস্থাপক সভার নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বেসরকারী সভ্যপদ পূরণ না হওয়া হেতুতে;

(গ) অন্যান্য ব্রিটীশ প্রজা সম্বন্ধে যে সকল বিচার ইত্যাদির ক্ষমতা কোনও প্রাদেশিক সভা আইন দ্বারা কোনও ম্যাজিষ্ট্রেটকে দিতে পারেন, ইউরোপীয় ব্রিটীশ প্রজা সম্বন্ধে উক্ত সভা কোনও আইন দ্বারা সেই সকল বিচার ইত্যাদির ক্ষমতা, জষ্টিশ-অব-দি-পিস্ পদে নিযুক্ত কোনও ম্যাজিষ্ট্রেটকে দেওয়া হেতুতে;

(ঘ) ব্রিটীশ ভারত প্রণীত কোনও আইন বা তাহার অংশ বর্ত্তমান আইন বা ব্রিটীশ পালিয়ামেণ্ট সভা প্রণীত অপর কোনও আইনের বিরুদ্ধ হইলে, সেই বিরুদ্ধ আইন বা অংশমাত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) বর্ত্তমান আইনের কোনও বিধান, অথবা কোনও বিশেষ বিধি দ্বারা, পূর্ব্বোল্লিখিত ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার আইন প্রণয়নের অধিকার সংক্রান্ত বিধানের কোনও প্রকার সঙ্কীর্ণ অর্থ করা যাইতে পারিবেনা। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার কোনও আইন অথবা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার কোনও আইন দ্বারা কোনও প্রাদেশিক বিষয় অথবা কেন্দ্রীয় বিষয় সম্বন্ধে বিধান করা হইয়াছে বলিয়া তাহা অবৈধ, অথবা গবর্ণর প্রণীত কোনও আইন সংরক্ষিত বিষয় সংক্রান্ত না হওয়া হেতুতে অবৈধ, এইরূপ আপত্তি কোনও আদালতে উপস্থিত হইলে তাহা অগ্রাহ্য হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মজুমদার এম্.এ, বি এল্।

চুক্তির দাবী

"নাঃ, আর যে পারিনে দিদি? কি ক'রব? কি হবে?"

"কি আর হবে কোমু? মন যে শক্ত করে বাঁধতে হবে,—আর সব ভুলে যেতে হবে। ভাবতে হবে যা হ'য়েছে,—একটা দুঃস্বপ্ন—"

"দুঃস্বপ্ন!—না দিদি! দুঃস্বপ্ন নয়, স্বপ্নই যদি বল—সেই যে ছিল জীবনের বড় একটা সুস্বপ্ন—যদি না ভাঙিত দিদি—সারাটা জীবন যাতে মধুর হ'য়ে থাকৃত। কেন ভাঙল দিদি? ভেঙে কই—আমার সেই আগেকার জাগাজীবনটাত আর পাচ্ছি না!—না, না যা ছিল, তাই সত্যি-কার ছিল, এই দুঃস্বপ্ন! তাই না দিদি?—বল, তাই না?"

"কোমু, ছি! বড়সড় হয়েছিস্। অতটা পাগলামো ক'ত্তে আছে? লোকে কি ব'লবে?—তোর পড়ার সাথীরা আসছে আরও কত লোক আসছে। এই কেলেঙ্কারী হবার পর, আরও বেশী ক'রে আস্ছে,—আসছে দেখছি, শুনছি। বাইরে কত চাস্কি টিটকারী দিচ্ছে। অপমান এম্নিই যা হবার তা হ'য়েছে—"

"অপমান! দিদি, শুধুই অপমান যদি হ'ত—"

"হাঁ, অপমানটাই সব চেয়ে বড় এখানে হ'য়েছে—আর গায় তুলে না নিয়ে উপেক্ষা ক'ত্তে পারলেই অপমানটা আর অপমান থাকে না।"

কৌমুদী বসিয়াছিল,—দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া শুইয়া পড়িল। দুটি চক্ষের জল ছাড়িয়া দিল, যতদূর সাধ্য চাপিয়া চাপিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

দিদি কিছুক্ষণ নীরবে ভগ্নীর মাথায় হাত বুলাইয়া শেষে কহিল,—"কোমু, আমার কথাটা বুঝলিনি বোন্?"

"বুঝেছি দিদি,—কিন্তু পাচ্ছিনা যে, কেউ সে ছিল না, কিছুই আমাদের হয়নি—হাঁ, এখন এই ভাবটা নিয়েই চ'লতে পারলে ভাল হ'ত। সব বুঝি দিদি, কিন্তু পাচ্ছিনা, কিছুতেই তা পেরে উঠছিনা,—মনটা যেন একেবারে ভেঙে পড়েছে,—কেন এমন হ'ল দিদি?"

"ছেলে মানুষ, কোনও অভাব কোন ক্লেশ কষ্ট কখনও কিছু জানিস্নি,—আর হঠাৎ আজ এত বড় একটা আশা ভঙ্গ—এমন একটা দুঃখ পেলি—"

"না, না! তা ব'লছিনি দিদি,—বলছিলাম, দুঃখটা কেন পেতে হ'ল? কেন এমন হয়? কি অপরাধ আমি ক'রেছিলুম?"

তামসী উত্তর করিল,—"ভুল, গোড়া থেকেই বড় একটা ভুল তোদের হ'য়েছিল,—ভুল ক'রলেই দুঃখ পেতে হবে! কোথাকার কে, পরিচয় কিছুই জানা নেই, এতটা প্রশ্রয় তাকে দেওয়া ঠিক হয় নাই।"

"কি ক'রে বাবা বুঝবেন? শিক্ষিত বিলেত-ফেরতা—অমন নামযশ—"

"তাতেই কি মানুষ ভাল হয় কোমু? এই ত হ'য়েছে-আমাদের সর্ব্বনেশে দশা! বিলেত ঘুরে এলেই সে ছেলেকে যেন সাত রাজার ধন মাণিক পেয়ে বসে সবাই। আর কিছু খোঁজ কেউ নেবে না। সবাই যেন পাগল হ'য়ে ওঠে, কি ক'রে তার সাথে মেয়ের বিয়ে দেবে। যে সব চাল এর জন্যে দেখি, ছি! ঘেন্নায় যেন আমার ম'রে যেতে ইচ্ছে হয়!"

কথাটার অবতারণায় কৌমুদীর চিন্তার গতি যেন নূতন এক পথে কিছু আকৃষ্ট হইল,—দুঃখের বেগটাও ইহাতে কিছু শান্ত হইয়া আসিল,—ধীরে ধীরে সে উঠিয়া বসিল। কহিল,—"সবার কাছে সুখ্যাতি শুনেছিলেন,—বাবা অতটা বুঝতে পারেননি। আর আমি—আমি কি ক'রে জানব দিদি?"

"তোর দোষ কি কোমু? আর বাবারই বা দোষ দেব কি? এ পোড়া সমাজেরই ধরণ এই! কবে যে এ ভুল তাদের ভাঙবে, কবে যে এরা বুঝবে, বিলাত-ফেরতা হ'লেই মানুষ হয় না,—ময়ূরপুচ্ছ পরলেই কাক ময়ূর হয় না!"

কৌমুদী একটি নিশ্বাস ছাড়িল,—ধীরে ধীরে শেষে কহিল,—"জামাইবাবুও ত বিলেত-ফেরতা দিদি?"

তামসী উত্তর করিল,—"আগে এই ধাঁচেরই ছিল, এখন সব দেখে মতি গতি যেন বদ্লে যাচ্ছে। বলে ত সেকেলে হিন্দুসমাজের আচার নিয়মই মোটের উপর ভাল,—তাই মেনে চ'ললেই আমাদের মঙ্গল বেশী হবে। আমিও

দেখ্‌ছি এই সব খিচুড়ী ব্যাপার অন্ততঃ তাদের মত হয় না! এত বেশী বয়েসে বিয়ে—আর বিয়ের আগে সাহেবী কোর্টসিপের মত একটা ঢলাঢলি—এটা, যাই বলিস, কোমু—না হওয়াই ভাল।"

"বাবা ত বলেন, আমরাও হিন্দু—"

"ব্রাহ্ম নই, খৃষ্টান নই, বিয়েটা পুরুত ডাকা ক'রে মন্তর প'ড়ে দেওয়া হয়, কেবল একটা সিভিল ম্যারেজ হয় না,—এই যা হিন্দু আমরা। আমি তেমন বুঝিনি কিছু—তবে উনিত বলেন, আজকাল দেখ্‌ছি শাস্তর বই-টই পড়েন, হিন্দুসমাজেও ঘোরেন ফেরেন খুব,—তা বলেন, আমরা কিছুই নয়, একেবারে নির্ব্বিয়ে একদল লোক,—নিজের দেশ,দেশের ধর্ম্ম, দেশের সমাজ ছেড়ে যারা আমাদের পশুর মত দেখে, তাদের সাজ পোষাক প'রে বাহার দিয়ে বেড়াচ্ছি,—যদ্দূর যে পারি, তাদের নকল ক'রে চ'ল্‌ছি, আর ভাবছি, খুব বড় হ'য়েছি তাতে! দেশের লোকও দূরে সরে থাকে, আর তারাও দূরে ঠেলে রাখে। কোথাও আমাদের দাঁড়াবার ঠাঁই নেই, ঠিক যেন ভুঁই ছাড়া পরগাছার মত ঝুলছি, শুকিয়ে কি ঝড় ঝাপ্‌টায় মাটিতে যদি পড়ি, মাটিতেই শুকিয়ে প'চে ম'রতে হবে, অথচ সেই মাটিই ছিল আমাদের।"

কৌমুদী কহিল, "হ'তেও পারে—জানিনি দিদি! তবে এখন আর এসব বিবেচনায় লাভ কি? আমার যা হবার তা ত হ'ল।"

"হবার যা হয়েছে—এখন সাম্‌লে নিতে হবে। আবার বল্‌ছি কোমু, অতটা গায় তুলে এটা নিস্‌নি। তাকে বুঝতে দিস্‌নি—কাউকে বুঝতে দিসনি—কিছু একটা তোর এতে হয়েছে।"

কৌমুদী আবার কাঁদিয়া ফেলিল,—কহিল, "তুমি বুঝ্‌ছ না দিদি! বুঝতেও পারবে'না, কি মর্ম্মান্তিক একটা আঘাত আমি পেয়েছি। তবে সাম্‌লে নিতেই হবে, উপায় আর নেই। কিন্তু এখনও যে পাচ্ছি না। হঠাৎ যে এ কি হ'য়ে গেল দিদি, কিছুইত বুঝতে পারিনি। ক'দিন আগেও এসেছিল, কত কথা ব'লে গেল—মনে যে অন্যরকম কিছু আছে, একটু আভাসও তার পাইনি। হঠাৎ সেদিন কাগজে দেখলাম বিয়ে হ'য়ে গেছে।"

"লোক ভাল নয় কোমু—একেবারেই ভাল নয়। তোকে নিয়ে ক'দিন খেলা ক'রেছে—হঠাৎ বড় টাকার লোভ পেয়েছে, অমনি গিয়ে বিয়ে ক'রেছে, শুনেছি একলাখ টাকা তারা যৌতুক দিয়েছে।"

"তাতেই কি শিক্ষিত ভদ্রলোক কেউ এমন ক'র্‌তে পারে। নিজেও ত রোজগার বেশ করে, না, ছি! তাও কি হয়? আরও কিছু একটা রহস্য এর ভেতর আছে। বাবা শুনেই নিষেধ ক'রে দিয়েছেন, এবাড়ীতে সে আর না ঢোকে। কিন্তু সেও আর আসে না।"

"আস্‌বে আর কোন্ মুখে? যা সে ক'রেছে—"

"কিন্তু তবু যদি একবার আস্‌ত! অন্ততঃ আগে এসে কি চিঠি লিখেও একটা কৈফিয়ৎ যদি দিত। আট নয়দিন হ'য়ে গেল, কোনও খোঁজ খবর নেই। বাড়ীতে আস্‌তে না হয় লজ্জা হ'তে পারে। কিন্তু আমাকে লিখেও ত জানাতে পার্‌তো, কেন সে এমন ক'র্‌লে?"

"তাতে আর কি লাভ হ'ত বোন?"

"লাভ আর কি হবে, দিদি! তবু কি ভাব্‌ল সে, কি ভাবছে, কি বলে জান্‌তে বড় ইচ্ছে হয়। তবু দুটো কথা তাকে শোনাতে পার্‌তাম—মনের ঝাল্‌টা হয়ত একটু মিটত। কিন্তু এই যে দারুণ অবজ্ঞা, এটা যে কিছুতেই বরদাস্ত ক'র্‌তে পাচ্ছি না। ছি—ছি! ঘেন্নায় যে আমার ম'রে যেতে ইচ্ছে হয়!"

"ওসব আর ভাবিসনি কোমু, মনটা শক্ত ক'রে তোল্, হাসিমুখে বেড়া চেড়া, সেও দেখুক, তুইও তাকে ঠিক তেমনিই অবজ্ঞা করিস্। সে কেবল খেলা করেনি, তাকে নিয়ে তুইও খেলা করেছিস।"

কৌমুদী কহিল, "বাবা যখন হুকুম দিলেন, সে আর বাড়ীতে না ঢোকে, আমিও ভেবেছিলুম, হাঁ এই ঠিক হয়েছে!—আর তার মুখও যেন দেখ্‌তে না হয়, যদি আস্‌ত খুব লজ্জিত অনুতপ্ত তাকে দেখাবে ত—মনটা হয়ত তেমনই কড়া বিরাগে ভরা হ'য়ে থাকত। চোরের মত দেখে হয়ত ঘেন্নাও একটা জন্মাত। কিন্তু আমাদের এই অপমানের কথা, একেবারে গ্রাহ্যই যে সে ক'র্‌লে না! যত দিন যাচ্ছে, ততই মনে হ'চ্ছে, একবার যদি আস্‌ত, কি চিঠি একখানা লিখ্‌ত! ব'ল্‌তে লজ্জা ক'রে দিদি, জানালায় দাঁড়িয়ে পথের দিকে আমি চেয়ে থাকি,—ভাবি যদি সে মুখখানি চুন ক'রে, ভয়ে ভয়ে এদিকে আসে।

ডাকের চিঠি যখন আসে—বুকটা আমার কাঁপতে থাকে—না, দিদি, এযে আমি একেবারেই সইতে আর পাচ্ছিনি,—অন্ততঃ—একটা কথা আমি জানতে চাই—কেন সে এমন ক'রে,—এ বিয়ের রহস্যটা কি! বাবা কেন একবার খোঁজ নিন না দিদি? তিনি যদি না নেন, জামাইবাবুকে তুমি একটিবার বল না দিদি—"

তামসী উত্তর করিল,—"কোমু, কিছু দরকার তার নেই। খোঁজ নিতে গেলেই সে হয়ত জানবে। ছোট মন, ভাববে খুব একটা বাহাদুরী ক'রে নিয়েছে। জৌলুস ক'রে লোকের কাছে গল্প ক'রে বেড়াবে। আর কি হবে, খোঁজ নিয়ে! রহস্য আর যাই থাক, একটি কথা ত স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, আমাদের সঙ্গে এতদিন এই খেলা ক'রে এক লাখ টাকার লোভে বেণের মত একটা লোকের মেয়ে গিয়ে বিয়ে ক'রেছে, একটা কৈফিয়ৎ কিছু দিলে না, অনুতাপ ক'রে একবার মাফ চাওয়াও দরকারে মনে কল্লে না। এমন ভাবে চ'লছে যেন কিছুই হয়নি—আমরা যেন তার এমনিই হেলা খেলার যোগ্য লোক। কে সে?—কোথাকার একটা ভুঁইফোড়—কেউ তার কুলশীলের খবর জানে না। তার আর ডি ঘোষের মেয়ে—একটু ইজ্জৎ বোধ তোর নেই!—সেই ছোট লোকের এত বড় অপমানটা আবার এমনি ক'রে গায় তুলে নিবি? তাকে বুঝতে দিবি, আমাদের এত বড় একটা দুঃখ দেবার—এমন অপমান ক'রবার ক্ষমতা তার আছে?"

কৌমুদীর মুখখানাও দৃপ্ত হইয়া উঠিল,—কহিল,—"না, তা আর ক'রব না। ঠিক ব'লেছ তুমি,—গায় তুলে আর নেব না। থাক্, কোনও খোঁজ খবরে আর কাজ নেই। না, আজ এমন ঘরে ব'সে কাঁদবনা,—বাবা মা কত দুঃখ পাচ্ছেন—না, আর তাদের দুঃখ দেব না! কাল থেকে আবার বেরোব—যদি তাকে দেখি—তবে—তবে—কি ক'রব দিদি? পরিচয় স্বীকার ক'রব না! অচেনা লোকের মত মুখ ফিরিয়ে চলে যাব?"

"না, তাই বা কেন ক'রবি? তাতেও তাকে বুঝতে দেওয়া হবে সে আমাদের বড় একটা দাগা দিয়েছে। না, তা হতেই পারে না। সে যে তোর মনে এতটুকুও একটা রেখাপাত ক'র্ত্তে পেরেছে, এটা যেন সে একেবারেই না ভাবতে পারে? কেন, দেখা যদি কখনও হয়, হেসে ব'লবি, বিয়ের নেমন্তন্ন কেন আমাদের ক'রলে না! প্রাণান্তেও বুঝতে দিবি না, এতটুকুও দুঃখ তুই এতে পেয়েছিস্,—তার সঙ্গে বিয়ে হবে, একথা কখনও তোর মনেও হ'য়েছিল। কেমন পারবি ত?"

"পা—র—ব দিদি। তবে, তুমি দিদি, জামাইবাবুকে বলে কেন কদিন এখানে থাক না? তোমার সঙ্গেই বেরোব,—কি জানি—যদি—যদি—না পারি—যদি সে কিছু বুঝতে পারে! থাকবে দিদি? বল থাকবে?"

"আচ্ছা, থাকব।"

"বাবাকেও তবে ব'লে দিও দিদি, দারোয়ানদের ব'লে দেন, সে যদি আসে ত আসুক, এমনি ভাবে কেউ বাড়ীতে এলে যেমন ব্যবহার করা হয়, তেমনি ব্যবহারই তার সঙ্গে করা হবে। সব তাকে বুঝিয়ে ব'লো,—তার এই আচরণটা একেবারেই উপেক্ষা ক'রে আমরা চলব। কি বল, দিদি! ব'লবে বাবাকে?"

"হাঁ, ব'লব সেইটেই ঠিক হবে। আর একটা কথা মনে হচ্ছে কোমু—খুব শীগ্‌গির যদি তোর বিয়ে হ'ত—"

বিয়ে! দিদি—!"

"হাঁ, বিয়ে! কেন, মুখখানা অমন শুকিয়ে কালি হ'য়ে কেন তোর গেল রে কোমু? আজীবন কি ঐ হতভাগার জন্যে কুমারী হ'য়ে থাকবি? সে যে তার বড় পদ বাড়িয়ে দেওয়া হবে রে!"

"না—আজীবন কেন থাকব, তবে—"

"তবে,—না কোমু, ও সব কিছু মনে ভাবিস্‌নি। অবিশ্যি মেয়েমানুষের মন—তা ভুলতেই যে হ'বে, ও কাঁটা তুলতেই যে হবে। সব চেয়ে ভাল উপায় তার এই—লোকও বলে, কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে হয়।—হাঁ, তাই কত্তে হবে। ভাল কাঁটা, বেশী শক্ত ধারাল কাঁটা, এমন কোনও লোক—ধনে, পদে, বংশে—ওর চেয়ে অনেক বড়, ওকে একেবারে আঁধার ক'রে রাখতে পারে—খুঁজে যত শীঘ্র হয়, বাবাকে বলি, তোর বিয়ে দিয়ে ফেলুন। এত একটা খেলার মত ব্যাপার হ'য়ে গেছে, বড় হয়ে পাঁচ জনের মধ্যে এত মেলা মেসা ক'রে এমন কত হ'তে পারে,—হয়ও ত কত দেখি। তা বিয়ে কর,—দেখবি তাকেই কত জ্বালা লাগবে, তার ভালবাসা আদর যত্ন পেয়ে, মনে হবে, আঃ! এটা কি পাগলামোই ক'রে ছিলাম—"

"কি বলিস্ কোন্, বাবাকে বলি ?"

"একটু ভেবে দেখি দিদি। আজ থাক কাল বরং ব'লো।"

"আচ্ছা, তাই তবে হবে, কিন্তু একটা কথা ভাব্‌চি বোন্। সে যা অপমানটা ক'রেছে, তার প্রতিশোধ যদি দিতে চাস্, তবে এই তার সব চেয়ে ভাল উপায়। সে বুঝ্‌বে,—না, ওরা আমার অনেক উপরে, ওদের মেয়ে যে বিয়ে ক'রব ভেবেছিলাম, সেইটে আমার পক্ষে বড় একটা ধৃষ্টতা হ'য়েছিল !"

"ঠিক দিদি ! আচ্ছা বল, আজই বাবাকে বল না, থাক্, আজ থাক্ দিদি কালই ব'লো, ভেবোনা কিছু দিদি, আমি বিয়ে ক'র্‌ব, ঠিক ক'র্‌ব, কেন ক'র্‌বনা ? কে সে আমার ! কেন তাকে এত বড় একটা বাহাদুরী নিতে দেব যে আমাকে তার মোহে ভুলিয়ে খুব জব্দ সে ক'রেছে, বাবার মত একজন মানী লোককে নিয়েও এমন একটা খেলা ক'ত্তে পেরেছে ?"

(ক্রমশঃ)

গৃহশিক্ষক

মুষ্টিযোগ

হাঁপানি।—১২ ফোটা আদার রস + আধ ছটাক গাওয়া ঘি + তালমিছরি মাড়িয়া খালি পেটে সেবন।

পায়ের ঘা।—কুক্‌সিমের রসের প্রলেপ।

বন্ধ্যা।—কৃষ্ণ অপরাজিতার শিকড় ছাগ দুগ্ধ সহিত বাটিয়া ঋতু কালে ৪ দিন সেবন।

মৃত বৎসা।—গো দুগ্ধের সহিত ফুটাইয়া ফলন্ত দাড়িম্ব শিকড়ের কাথ কিছুকাল সেবন।

অর্শ।—১০ আনা ওজন অপাং মূল খাঁটি গাওয়া ঘিয়ের সহিত বাটিয়া ৭ দিন (স্নান করিয়া ভিজা কাপড়ে) খাইতে হয়। তাল হইলে ৺শিবপূজা।

কুষ্ঠরোগের মহৌষধ

ইংলিসম্যানের জনৈক সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন যে, কোন মফঃস্বল আদালতের জনৈক উকিল ভয়ঙ্কর কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ৩ মাসের মধ্যেই তাঁহার হস্ত পদের অঙ্গুলি গুলি খসিয়া পড়ে, তিনি ওকালতি পরিত্যাগ করিয়া জীবনে হতাশ হইয়া একটা বৃক্ষতলে একদিন বসিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিলেন, এমন সময় জনৈক ফকির তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলেন, যদি তুমি আমার পরামর্শ মত চল, তাহা হইলে আরোগ্য হইতে পার, কিন্তু তাঁহা পালন করা অতিশয় সুকঠিন। উকিলটী যতই কঠিন হউক, তাহা পালন করিতে স্বীকৃত হইলেন। ফকির বলিলেন যে, তুমি ছোলা (চানা) ব্যতীত আর কিছু খাইতে পাইবে না, এমন কি পিপাসার জলও ঐ ছোলা ভিজান জলই খাইতে হইবে। ছোলা সিদ্ধ করিয়া লবণ না দিয়া অথবা কাঁচা ছোলা মাত্র খাইতে পাইবে, অন্য কোন খাদ্যদ্রব্যই গ্রহণ করিতে পাইবে না। ব্যাপার বাস্তবিকই গুরুতর। কিন্তু উকিল মহাশয় তাহাই করিয়াছিলেন। ফলে তিন মাসের মধ্যেই তিনি আরোগ্য লাভ করিয়া দিব্যকান্তি হইতে পারিয়াছিলেন। প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে এই আরোগ্য সমাধান হইয়াছিল এবং তাঁহাকে এখন দেখিলে কেহ মনেই করিতে পারেন না যে, এমন হৃষ্টপুষ্ট শরীর কখনও কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। তাঁহার আরোগ্যের পর আরও ২।৪ জন এই চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্য হইয়াছিল। তবে কাহারও কাহারও ৩ মাসের স্থলে রোগের অবস্থা বিশেষ ২।১ মাস অধিক সময় লাগিয়াছিল। শুষ্ক ছোলা খাইয়া জীবনধারণ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। ছোলার এইরূপ কুষ্ঠ আরোগ্যের কি উপাদান আছে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাহার পরীক্ষা হইলে এই ঘৃণিত রোগের হয়ত প্রতিকার হইতে পারে।

(কাজের লোক)

আমিষ ও নিরামিষ

ডাক্তার বাবু অন্নদাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখিয়াছেন ;—আমরা নিম্নলিখিত দ্রব্যদ্বারা শরীর ধারণে সক্ষম হই।

১। প্রোটীন বা য়্যালবুমিনয়েডস্। গোধূমের অন্তর্গত (গ্লুটেন), ডিমের অন্তর্গত (এলবুমেন বা শ্বেতাংশ), দুগ্ধ হইতে (কেসেইন), কনেকটিভ টিস্থর অন্তর্গত (জিলাটিন), পেশী বা মাংসের অন্তর্গত (ফাইব্রিন্), উদ্ভিজ্জ প্রোটিন তন্মধ্যে গ্লোবালিন প্রধান ইহা প্রায় সমুদয় উদ্ভিজ্জেই বিদ্যমান।

২। কার্বোহাইড্রেটস্ সমগ্র উদ্ভিজ্জ পদার্থে পাওয়া যায়, ইহা সাধারণতঃ টার্চ্চ, শ্বেতসার বা (ডেক্সট্রিন) শুষ্ক উত্তাপে ষ্টার্চ্চই ডেক্সট্রিনে পরিণত হয়। রুটী ও চিনিতে ইহা বিদ্যমান।

৩। তৈল (অয়েল) ইহা সকল উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ খাদ্য আছে।

৪। ধাতব পদার্থ ইহা প্রাণিজ উদ্ভিজ্জ খাদ্য হইতে পাই। ক্ষার, লবণ, কেলসিয়ম, ম্যাগনেসিয়া, পোটাস্, সোডা, ফসফেট্, সলফেট্ ও ক্লোরাইড্ ইহা দ্বারা অস্থির ধাতব অংশ গঠন হয়।

৫। জল উভয়বিধ খাদ্যে বর্ত্তমান আছে। উল্লিখিত পঞ্চবিধ পদার্থ দ্বারা মানবদেহের পুষ্টি সাধন হয়। কতকগুলি পক্কাবস্থায়, লঘু ও সহজপাক হয়। উদ্ভিজ্জ খাদ্য পক্কাবস্থায় লঘু হয়। ডিম কাঁচাবস্থায় লঘু। খাদ্যে যে ৫টী বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের উল্লেখ হইল (প্রোটিন্, কার্বোহাইড্রেট, তৈল বা চর্ব্বি, ধাতবপদার্থ) এবং জল, ইহারা জীবদেহের এক এক অংশ পুষ্টি করে। অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর খাদ্যগুলি (প্রোটিন মূলক) টীস্থ গঠন করে এবং দেহের তাপ ও তেজ উৎপন্ন করে। দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদ্যগুলি ও তৃতীয় শ্রেণীর খাদ্যগুলির প্রায় একরূপ গুণ, ইহাদের দ্বারা তাপ ও তেজ উৎপাদন হয়। ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর খাদ্য দ্বারা টীস্থ গঠন হয়।

মাংস ও মৎস্য ভিন্ন যে প্রোটিন সংগ্রহ হয় না এটা ভুল ধারণা। জীবনধারণ ও শরীরের পুষ্টিসাধন জন্য আমিষ ও নিরামিষ উভয় খাদ্যই মূলে এক দাঁড়ায়। মাংসে আলু অপেক্ষা প্রোটিন বেশী নাই। সুতরাং দেহরক্ষার জন্য বর্ত্তমান যুগে শীতপ্রধানদেশীদের অনুকরণ না করিলেও চলিতে পারে। অর্থনীতির হিসাবেও সুবিধা বটে।

(কাশীপুর নিবাসী)

ছোট কথা

১। বরযাত্রীর অভ্যর্থনা

(১)

জয়গ্রামে একটা বিয়ে। 'বরযাত্র' আসছেন দুদিনের পথ দূর থেকে। তাঁরা ষ্টীমারে এসে নামবেন আলিমপুর ঘাটে; সেখান থেকে তাঁদের আস্তে হবে তিন মাইল,—তবে জয়গ্রাম্।

বরযাত্রের সঙ্গে তাঁদেরি দলভুক্ত হ'য়ে আসছেন,—বিখ্যাত সুরসিক কবি এবং গায়ক শিশিকান্ত রায়।

(২)

বরযাত্রদের অভ্যর্থনা ক'রবার জন্য গিয়েছেন কর্ত্তা পক্ষীয় দুজন ভদ্র ব্যক্তি,—হরিশ আর ভগীরথ। তাঁরা দুজনই ক'নের ভাই।

যখন সব বরপক্ষীয়েরা জাহাজ থেকে নাম্‌লেন তখন এঁরা দুজন তাঁদের খুব সাদর-অভ্যর্থনা ক'রে নীচে নিয়ে এলেন। কিন্তু তাঁদের তিন মাইল পথ যাবার কোন ব্যবস্থাই নাই, এবং আহারাদি ষ্টীমারে হয়নি,—তারো কোনো জোগাড় নেই। খালি 'পাত্রের' জন্য একখানা পাল্কী ছিল।

অনাহারক্লিষ্ট বরপক্ষীয়গণ তাঁদের সঙ্গে যে 'চাল-ডাল' ছিল তাই বের ক'রে বালুর চড়ায় রেঁধে খেলেন। তারপর তাঁরা সব হেঁটে এলেন জয়গ্রাম,—যেখানে বিয়ে হবে।

(৩)

বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হ'য়েছে।

পরদিন জয়গ্রামের সমবেত ভদ্রমণ্ডলী ধ'রলেন কবিবর শিশিবাবুকে,—'একটা গান গাহিতে হবে।'

তিনি মুখে মুখে একটা 'বিবাহের গান' বেঁধে গাইলেন তার দুটো লাইন মনে পড়ছে,—

"সঙ্গে যাহা ছিল খেলেম্ তাই রেঁধে,—
হরিশ আর ভগীরথ খাওয়ায় যেমে গেছে।"

২। 'কেসের' চেঁচামেচি

একবলপুর হাঁসপাতালে একজন রুগীর অবস্থা বড্ড খারাপ দাঁড়িয়েছে। একটা compound fracture [কম্পাউণ্ড ফ্রাক্‌চার] 'কেস' (case) গিয়ে gangrene [গ্যাংগ্রীন] এ দাঁড়াচ্ছে। লোকটার জন্য খুব চেষ্টা হচ্ছিল,—বাঁচানো যায় কি না ; কিন্তু আর বোধ হয় তা হ'লো না।

(২)

নূতন ডাক্তার অমিয় বাগচী পুরোনো ড্রেসার dresser নীলমাধব ঘোষ-কে নিয়ে পড়েছেন ভারি জ্যালাতে। ডাক্তারটী সহৃদয়,—এখনও দৈনিক ব্যাপারে অভ্যস্ত নন্‌। ড্রেসার পাকা লোক,—অনেকদিনের পুরোনো।

(৩)

সকাল বেলায় ডাক্তার অমিয়বাবু জিজ্ঞেস ক'রছেন ড্রেসারকে,—

"আমি তোমায় ব'লনুম যে রাত্তি তিনটের তুমি 'কেস' (case) দেখে আমায় জানাবে,—এখন যে gangreneটে spread (বিস্তার) ক'রে ব'সেছে!—এখন করা যায় কি?"

ড্রেসার ব'ললে,—"কি আর করা যাবে? অমন কত হয়! এই দেখুন মশায়, আমি রাত্তিরে মোটেই ঘুমুতে পাইনি। তিনটের যখন শু'তে যাই তখন case দেখলুম ঘুমুচ্চে; আর disturb (বিরক্ত) ক'রলেম না। তারপর ভোর চারটেয়,—মশায় ব'লবো কি! শুনলুম case চেঁচাচ্চে! caseএর সেই চেঁচামেচি শুনে অবধি আমি আর মোটেই ঘুমুতে——"

অমিয় বাবুর হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ; তিনি বাধা দিয়ে ব'ললেন,—"heartless" (হৃদয়হীন)! আরও বুঝি কি ক'রে ব'সলেন।

শেষটায় বুঝি অমিয় চাকুরীই ছাড়লেন!

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক, এম্‌-এ

বার বছর পার

(গাথা)

কমলী সে যে আট বছরের মেয়ে
ভক্তি যখন আস্‌ত তাদের বাড়ী
তাহারি পানে চেয়ে
বলত' সকল লোক,—
সেটা সত্যি কিম্বা মিথ্যা না হয় হোক্‌;
"ঐ যে তোমার বর—
ওরে কমলি, হাসিমুখে একটু' আদর কর।"

জীবন প্রাতে সেই যে পড়্‌ল কথার দাগটি তার
সারা জীবন শেষটি হ'লেও মুছ্‌ল নাক' আর॥
ভক্তি যখন আস্‌ত' তাদের বাড়ী
অনেক সময় থাক্‌ত' সে তার পাশে
সমস্ত কাজ ছাড়ি'।
কেউ যদি বা ঠাট্টা করত' তা'তে—
বল্‌ত' কমলী তখন তা'দের
দুষ্ট হাসির ছলনাতে
—"ওই যে আমার বর।"
পাজী মেয়ের বাঁদরামীতে সবাই দিত ভর।
এমনি করে কাটলে কত দিন এই দাঁড়াল শেষে
বলত' সবে ভক্তি এলে পরে—
—"তোর বর এয়েছে এগিয়ে নিবি এসে।"

ভক্তি এলে পরে—
দেখ্‌লে কমলী বল্‌ল না কেউ কিছুই তারি তরে
খানিক থেকে চুপটি করে বললে কথার ছলে—
"একার দেও একার সেও আমার বর এয়েছে বলে।"

ছোট কালের প্রণয়েতে বিধির আছে শাপ
ভক্তির বিয়ে অক্লেশে দিলেন তাহার বাপ।
বিয়ের বাকি কিছুক্ষণ—
বললে কমলী "কর্‌লে না কই আমায় নিমন্ত্রণ।
বেশ লোক ত' বাবা!"
কাষ্ঠ হেসে ভক্তি কহে "ভুল হয়েছে আহা!
আঙুল দিয়ে চুলকে তাহার সিঁথির দু'টি চুল
বললে কমলী—"আমার বেলায় সকল স্থানেই ভুল।"
বয়স হ'ল তার
বার বছর ছাড়িয়ে চলে কমুতে হ'বে পার।
আর ত' তারে যায় না রাখা ঘরে
পিতৃ-পুরুষ নরকস্থ হ'বে তাহার তরে।
খুবড়ো মেয়ে ঘরে রাখা আর ত উচিত নয়
পিতা তাহার ব্যস্ত অতিশয়।
দিদির কাছে গিয়ে
বললে কমলী ধরা গলায় "লাইক হ'ল বিয়ে।"
"তাই কি কখন হয়—
জন্ম নিলেই কমুতে হ'বে বিয়ে" দিদি হেসে কয়।

অনেক দেখে অনেক শুনে শেষে একটা পাত্র হল স্থির
শশাঙ্ক সে আদর্শ ভাই রূপে গুণে বাঙ্গালীর।
তিনটে পাশ করা—
সবাই বলে এমন পাত্র যায় না ত আর ছাড়া।
কেবল কমলী ভাব্‌ল হেসে
এই দাঁড়াল শেষে
যাহার কথায় কোনওখানে একদম ঠিক নাই;
সেই কি হ'ল আমার ভাগ্যে যোগ্যপাত্র ছাই!
এণ্টান্স পাশ করে
শশাঙ্ক ভাই গীতার দেখে বল্‌লে খুবই জোরে;
"ওর সাথে মোর নাই যদি হয় বিয়ে—
সন্ন্যাসী ত' হ'ব নিশ্চয় লোটা কম্বল নিয়ে।"
কিন্তু বাবা দিলেন না তার বিয়ে—
বাবার তাড়া খেয়ে সে ত কলেজেতে ভর্ত্তি হ'ল গিয়ে,
এলে পাশের পর—
সে যে রাণীর আপনা হ'তে হ'ল স্বয়ম্বর।
এই বিয়েতেই ঝোঁক
না হলে পর স্বদেশীতে দেবেই দেবে ঝোঁক্।
কিন্তু বাবা তার
কিবে চমৎকার
হৃদয়হীনের মতন সে যে ভীষণ কঠিন হ'য়ে
প্রেসিডেন্সি জেলের মত
ভর্ত্তি করে দিলেন তারে প্রেসিডেন্সি বিদ্যালয়ে।
পাশটি করে বিএ, ভুল্‌ল এগ্‌জামিনের জ্বালা
কমলীর এবার পালা,
বাবার মতটা আছে—
তাইতে এবার বড় করে জানায় সবার কাছে॥
দেখে শুনে সকল কমলী ক্রমে হ'ল ধীর
সেইত হ'ল যোগ্য পাত্র যার নেই মতি স্থির।
ব'লবে সে কি আর
হিন্দুর মেয়ে বার বছর পার হ'য়েছে তার।
এখন তাহার উচিত হ'ল সকল কাজেই
চুপটি ক'রে থাকা
আর কিছুতেই যায় না তারে ঢাকা।

বিয়ের সাথে শশাঙ্ক সে ফুলছে অতিশয়
কমলী ক্রমে হচ্ছে তাতে ক্ষয়
শশাঙ্ক সে শুক্লপক্ষের শশী
কমলী বুঝি কৃষ্ণপক্ষের চাঁদে ধরা মসি।
ভক্তি যখন বউ আন্‌লে ঘরে
কমলী নিয়ে কতই আদর করে।
নববধূ মুচ্‌কি হেসে জিজ্ঞাসিল "ভাই—
আদরের যে শেষ সীমানা নাই।"
চাপা শ্বাসের তার—
আটকে রেখে কমলী তখন জবাব দিল তার
"আমার বরের বউ যে তুমি আমার বুকের ধন
আদর ক'রে তৃপ্তি তোমায় হয় না অনুক্ষণ।"

বন্ধুদলের মাঝে—
ভীমের মত ফুল্‌ছে ভক্তি ধর্ম্মবীরের সাজে
কেউবা কহে "এইত হ'ল ঠিক
বড়ই উজ্জ্বল ভক্তির ঐ পিতৃভক্তির দিক।
যাহার তরে শিবের মত ভস্ম করি প্রেমে
সংসারেরি মাঝে এলে নেমে।"
আবার কেহ ব'ললে হেসে "এইত উচিত জপ
পিতা ধর্ম্ম পিতা স্বর্গ পিতাই পরম তপ।"

গায় হলুদের দিনে
চৌকি হ'তে পড়ে কমলী কাটল মাথা টিনে।
রক্ত গঙ্গায় ভেসে সেই যে মূর্চ্ছা হ'ল তার
ভাঙ্‌ল নাক আর।
কেঁদে উঠ্‌ল দিদি যে তার জড়িয়ে তারে ধরে
এই করে কি ছেড়ে মোদের গেলি প্রেমের তরে।
সায় দিল না কেউ কথাতে তা'র
হ'য়ে গেল কমলীর এবার বার বছর পার।
আটচালারই আড্ডা ঘরে বল্‌লে সকল
বন্ধুগণে হেসে
নভেল পড়ার এই ফলটা ফল্‌তে থাকে দেশে।
বিজ্ঞগণে জনে জনে বুঝিয়ে দিলেন চমৎকার—
"এই জন্যেই কর্‌তে নেইক' বার বছর পার।"

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ।

শৈলেশ্বরের মন্দিরে—

"পোষাক"
সকল রকম
তৈয়ারী ও
অর্ডারী
পোষাক
ও
থান
"কাপড়"
বেনারসী, পার্শী
ও সকল রকম
ধুতী
ও
শাড়ী
মফঃস্বলের
জন্য বিশেষ
বন্দোবস্ত
আছে

মালঞ্চ

৭ম বর্ষ } আষাঢ়—১৩২৭ { ৩য় সংখ্যা

পল্লী-মধু

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কলিকাতার বাড়ী—অন্তঃপুর

বিভাস।—মা, যা হক ভগবানের দয়ায় মনীশ ত নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হলো। তবে ভারতরক্ষা আইনে তাকে কিছু দিনের জন্য বীরভূম জেলায় থাকতে হবে। শুনলাম স্থানটী স্বাস্থ্যকর। গবরমেণ্ট মাসিক ৪০ টাকা করে দেবে, দরকার হলে আমিও কিছু করে পাঠাবো, কোন কষ্ট হবে না। অধিকন্তু সেখানকার পুলিস সাহেব আমার পরিচিত,—তিনিও তাঁর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যাতে একটু দৃষ্টি রাখেন তার জন্য বলেছি।

গিরিবালা।—বাবা বিভাস, ও একটা উড়ো বিপদ, দেখ আমি কর্ত্তাকে কত আগে ওই শিরীশের সঙ্গে মিশতে মনীশকে বারণ করতে বলেছিলাম।

বিভাস।—সেই ত যত নষ্টের আদি, তার দ্বারাই এ সমস্ত কাজ হয়েছে।

গিরিবালা।—বিভাস বাবা, মায়ার বড় অধিক মায়া, মনীশ গিয়ে অবধি বাছা 'দাদা দাদা' বলে খুন হলো। সর্ব্বদা তার চোক্ ছল ছল করছে। চুপ করে থাকে, কিন্তু ওর মায়া বড় বেশী।

বিভাস।—হাঁরে মায়া, কান্না কিসের? আজ বাদে কাল মনীশ এখানে আসবে। যাও পড়গে।

গিরিবালা।—ছায়া বেশ একটু উদাসীন, কোন কিছু গায়ে মাখে না। মায়া সামান্য কিছুতেই বড় কাতর হয়। দেখ নেই তোমার ব্যারামে? তা বাবা, ওদের বিয়ে আর না দিলে যে ভাল দেখাচ্ছে না। কর্ত্তার কাছে অতিকায় বাবুর কথা শুনলে তো, ও সব কথা প্রকাশ হলে আর মেয়েদের বিবাহ হওয়া দুষ্কর হবে। কি ঘেন্নার কথা!

বিভাস।—আমি একটু খাতির করি বয়েস বেশী বলে। লোকটার স্পর্দ্ধা দেখে অবাক্ হয়েছি। তবে দোষ নেই। ও মনে করেছিল, আমরা বোধ হয় ঐ রকম গোছের লোকই। মায়ার সম্বন্ধ ত স্থির আছেই। ধর্ম্মদাসের সঙ্গে ছায়ার বিয়ের ঠিক করছি। তাঁর পিতা সদাশয় লোক্ যে সব আপত্তি করেছেন, তাঁর নিকটে গিয়ে সে দিন আমি তা খণ্ডন করে এসেছি আর বলে এসেছি, তিনি আমাদিগকে যেমন ভাবে থাকতে আদেশ করবেন তাই থাকবো। এই বলতেই তিনি গলে গেলেন। বল্লেন, বাপু, বামুনের ছেলে মেয়েকে আমি বামুনের মতই দেখতে চাই, দেখ এই খড়ম পায়ে তসর গরদ পরে আমাদিকে যেমন মানায় এমনটী আর কিছুতেই নয়। তিনি যেটুকু অস্বীকার ছিলেন, আমাদের এই আকস্মিক বিপদ শুনে

আর কোন আপত্তিই তুললেন না। প্রকৃতই মহৎ লোক। মত টত ঠিক, কেবল একটা দিন স্থির করলেই হলো।

গিরিবালা।—যাক্ বাবা, একটা বুকের বোঝা নেমে গেল। তিনি অতি দয়ালু লোক শুনেছি।

(সত্যহরি বাবুর প্রবেশ)

বিভাস।—বাবা, ধর্ম্মদাসের সঙ্গে ছায়ার বিবাহের সম্বন্ধ ত স্থির করে এলাম।

সত্যহরি।—তিনি রাজি হয়েছেন? প্রায়শ্চিত্তের কথা তুললেন নাকি?

বিভাস।—না, কেবল বললেন সম্পূর্ণ হিন্দুভাবে থাকাই উচিত, বৌমারও সেই ভাবে সুশিক্ষিত হওয়া চাই। বিশেষ আমাদের এই বিপদের কথা শুনে তিনি কোন বিষয়েই অধিক কিছু না বলে একেবারেই মত দিলেন। প্রকৃতই ব্রাহ্মণ। মায়ার সম্বন্ধ ত হিরণপুরের জমিদার রামশরণ বাবুর ছেলের সঙ্গে ঠিক আছেই।

দ্বিতীয় দৃশ্য

নান্নুর থানা

দারোগা।—মনীশ বাবু আপনার এখানে কোন কষ্ট হয় নি ত? যখন যা দরকার হবে আমায় বলবেন। যতটুকু পারি আপনার অসুবিধা হতে দেব না। ব্রাহ্মণ ঠিক হয়েছে, আজ থেকেই আসবে।

মনীশ।—আপনার অনুগ্রহে প্রকৃতই বাধিত হলাম। আমার জন্য যে ক্লেশ নিচ্ছেন তা আপনার মহৎ হৃদয়ের পরিচায়ক। মা বাপের কাছ ছাড়া হয়ে আসবার সময় যে একটা ভয়ঙ্কর স্থানের ছবি মনে এঁকেছিলাম আপনাকে দেখে তার অর্দ্ধেক বিভীষিকা কমে গিয়াছে।

দারোগা।—মনীশবাবু, এই নান্নুর বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসের জন্মভূমি, বঙ্গসাহিত্যের মহাতীর্থ। ওই একটু দূরেই চণ্ডীদাসের ভিটা, ওইখানেই একটী মন্দিরে তাঁর বিশালাক্ষী দেবী আছেন। সুমুখে যে এই 'দেওতা' দীঘি দেখছেন, "চলে নীল সাড়ী নিঙ্গারি নিঙ্গারি পরাণ সহিত মোর" গান এই খানেই জেগেছিল। থানার সম্মুখ দিয়ে এই যে পথটী গ্রামে গিয়েছে, এই পথে চণ্ডীদাসের চরণ-রেণু এখনো মিশে আছে।

মনীশ।—দারোগা বাবু, আপনি যে একেবারে সাহিত্যিক! সাহিত্যের এত সংবাদ রাখেন! আমার বৈষ্ণব সাহিত্য পড়া নেই, তবে চণ্ডীদাসের নাম ও গান দুইই শুনেছি।

দারোগা।—দেখুন এ বীরভূম বীরভূমই বটে, এখানে কেন্দুলীতে জয়দেবের পাঠ, এখানে প্রথম 'ললিত লবঙ্গ-লতা পরিশীলন' গান উঠেছিল, আর এখানে প্রথম শ্যামের নাম কাণের ভিতর দিয়া জগতের প্রাণে পশিয়াছিল। আমি মফঃস্বল থেকে এসে আপনাকে সব দেখাবো।

(প্রস্থান)

মনীশ।—(স্বগত) আজ আমি খাঁচার পাখী. অনন্ত শ্যামল শোভার মধ্যে রুদ্ধ খাঁচাটী কে যেন রেখে গিয়াছে। বাইরের আনন্দ, বাইরের আলো গীত গন্ধ, এসে উঁকি মারছে, কিন্তু মেশামিশি করতে পারছে না। এখানে এসে একটা বিষয়ে একটু উন্নতি হয়েছে। যেটাকে ঘৃণ্য ও তুচ্ছ ভাবতাম, সেটা ক্রমে ক্রমে বরেণ্য ও স্পৃহনীয় হয়ে উঠছে। আহা, আমাদেরও একটা গ্রাম ছিল। তার কাছে গিয়ে তার বনজঙ্গলে তার প্রকৃত সত্তা হারিয়ে ফেলতুম। সে তার সমস্ত স্নেহ নিয়ে করুণ নয়নে দাঁড়িয়ে থাকতো, আমরা তাকে ঘৃণায় প্রত্যাখান করতুম। সহরের কাঠ পাথরের মধ্যে তাকে স্মরণই হত না। সহর আমাদের মনকে বিক্ষিপ্ত করে, পল্লীগ্রাম যেন সেগুলিকে কুড়িয়ে বুকের কাছে ফিরে নিয়ে আসে।

যাই কোন চিঠি এলো কিনা জিজ্ঞাসা করে আসি।

জমাদার।—কি চাওহে?

মনীশ।—কলকাতা থেকে আমার কি কোন চিঠি আসে নাই?

জমাদার।—নাঃ। তুমি কি করেছিলে হে? সত্যি খুনে ছিলে নাকি? আমার কাছে বল্‌তে দোষ কি? দেখ বাপু যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

মনীশ।—আপনি কি বলছেন, নিতান্ত হৃদয়হীনের ন্যায় এমন সব কথা বলছেন যা বিনয় ও ভদ্রতার বাইরে।

জমাদার।—তোমাদের মত হৃদয়বান্ হলে আর গোটা দুই ইনস্পেক্টার খুন হতো। থানার আর গোটা দুই

ছুরিটী তৈয়ার করতে হতো। বাপু, খুন ডাকাতি করলেই লৌহবলয় পরে ফাঁসি কাঠে গিয়ে দোদুল্যমান হতে হয়।

মনীশ।—এ সকল কথা পাগলা গারদের মধ্যে শোভনীয় হতে পারতো, কিন্তু এই স্থান কাল ও পাত্র তিনই তার অনুপযুক্ত। আপনার কথা ইতরতার সীমায় পদার্পণ করছে।

জমাদার। ডাকাত খুনের সঙ্গে বাক্যব্যয় করবার সময় আমার বেশী নেই। যাও, এখন নির্জ্জন গৃহে গিয়ে বন্ধনে শক্তি ব্যয় করগে, ব্রাহ্মণ আসে নাই, নতুবা ২।৪ দিন অনাহারে প্রাণটিকে অপব্যয় করে যেতে হবে।

(দারোগার প্রত্যাগমন)

দারোগা।—আজ আর যাওয়া হল না। কি মনীশ বাবু, কি বলছেন?

মনীশ।—জমাদার বাবু এমনভাবের কথা বলছেন যা নিতান্ত অসম্মানসূচক।

জমাদার।—উনি আমায় অশুদ্ধ আপনি বলেছেন, ওই চৌকীদার সাক্ষী আছে।

দারোগা।— মনীশকে দেব ডাকিয়া ওরা অশিক্ষিত, ওদের কথায় রাগ করবেন না। যা দরকার হয় আমায় বলবেন। আজ ব্রাহ্মণ আসেনি, আপনার বাড়ীই খাবেন।

মনীশের প্রস্থান

জমাদার বাবু, একটু বুঝে সুঝে কথা বলবেন উনি আপনার চৌকিদার নন। এ সব কথা S P বা S. D O র কাণে উঠলে চাকরী নিয়ে টানাটানি হবে, আপনি ত ডুববেন, আমাকেও ডোবাবেন।

জমাদার।—তবে বলুন ওদিকে জামাইয়ের ন্যায় ব্যবহার কর্ত্তে হবে।

দারোগা।—হ্যাঁ ঠিক তাই, বুঝলেন কি না?

—•—

তৃতীয় দৃশ্য

—•—

কলিকাতার বাড়ী

বিভাস।—মা, ঘাড় থেকে বোঝা নামলো। যা হক বিবাহ ত নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে গেল। পদ্মদাসের পিতা যেমন ভদ্রতা দেখিয়েছেন, রামশরণ বাবুরা তেমনি অভদ্রতা দেখিয়েছেন। ছেলেও তেমনি গুণধর,—বলে, ইংরেজী ব্যাণ্ড নহলে আমি ষ্টেসন থেকে যাবোই না। কলকাতার লোকে দেখ কি বলবে? ও ছাড়া রামশরণ বাবু তো খৃষ্টান, জাতচোরা, দেনদার, কত কথাই বল্লেন। শুধু বলা, একেবারে ঘর ও দোর প্রত্যাখ্যান। ভাগ্যে গ্রামের ছেলে সতীশ হঠাৎ এসে পড়েছিলো, নৈলে বড়ই অপ্রতিভ হতে হত। মা, সতীশকে এমন বরে ধরে বিয়ে দেওয়া গেল, ওর মামা কিছু বলবে না ত?

গিরিবালা।—ও আমাদের পালটী ঘর। লক্ষ্ণৌ-এ ওর মামা থাকেন, তিনি অতি মহৎ লোক, এ বিপদে উদ্ধার করেছে শুনলে খুসীই হবেন।

বিভাস। বাবা তাঁকে টেলিগ্রামও করে দিয়েছেন। সতীশ লক্ষ্ণৌ-র পথেই এসেছিল। মামাকে সেই খানেই নিয়ে যাবে।

(সত্যহরির প্রবেশ)

সত্যহরি।—বাবা বিভাস, মনীশের পত্র পেলাম, একটু অসুখ করেছে। কন্যাদায়ে ত উদ্ধার হওয়া গেল, এইবার একবার তার সংবাদ নিতে যাব মনে করেছি।

বিভাস।—আপনার যাবার দরকার নেই, আমিই যাবো, এদিকে ছায়া ও মায়াকে পাঠাবার সমস্ত ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

সত্যহরি।—গিন্নি, ছায়া গৌড় হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাড়ী পড়লো। মায়া দূরে গরীবের ঘরে পড়লো। ওদিকে যা বলে কয়ে দিতে হয় দিও, যেন সুখ্যাতি লাভ করে।

(ছায়া ও মায়ার প্রবেশ)

মায়া।—মা, মনি দাদার অসুখ করেছে।

বিভাস।—সামান্য অসুখ, ভাল হয়ে যাবে। তুমি দূরে যাচ্ছো বেশী ভেবোনা, আমি পত্র দেব।

গিরিবালা।—দেখ মা ছায়া, তোমাকে সৎপাত্রে অর্পণ করেছি। তোমার শ্বশুর শাশুড়ী মহৎ লোক। তাঁরা সদাচারী ব্রাহ্মণ। তাঁদের মনের মতন হতে চেষ্টা করবে। খুব লজ্জাশীলা হবে, অল্প কথা কইবে, ভক্তি সেবাশুশ্রূষা ও গৃহকর্ম নিয়ে থাকবে, তর্ক করবে না। লজ্জাই স্ত্রীলোকের অঙ্গের সৌন্দর্য্য। দেবদেবীকে প্রণাম করবে, কথাগুলো সর্ব্বদা স্মরণ রাখবে।

ছায়া।—যেমন বললেন তাই করবো।

গিরিবালা।—দেখ মা মায়া, তুমি শ্বশুর ঘরে পড়লে, দুঃখ করোনা। সতীশ শিক্ষিত, নম্র, ভাল ঘরের ছেলে, এখান থেকে তোমাকে লক্ষ্ণৌ নিয়ে যাবে। তোমার শ্বশুর শাশুড়ী নাই। মামী ও মামা শ্বশুর আছেন, তাঁদিকেই শ্বশুর শাশুড়ীর মত দেখবে ও ভক্তি করবে। যতটুকু পার গৃহকাজ করবে, মোটামুটি সব কাজই তোমাদিকে শিখিয়েছি। আবার সেখানে গিয়ে শিখবে।

মায়া।—মা, আমার বড় মন কেমন কচ্ছে। তোমাদিকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

(অশ্রু বিসর্জন)

গিরিবালা।—মা চিরদিন ওই ঘর করো, কেঁদনা।

বিভাস। মায়া, তোদিকে শীঘ্র নিয়ে আসবো, মন কেমন করিসনে। তোরা চলে গেলে বাড়ীটেতে টেঁকাই ভার হবে। কি বল মা!

চতুর্থ দৃশ্য

গ্রাম্য পথ

নিতাই।—কমল হে, একটা খবর আছে শোন। আমি প্রবাস গিয়েছিলাম, সেখানে আমার এক শিষ্য, যত পুলিশের কর্ত্তা, গোয়েন্দা পুলিশের সর্ব্বে সর্ব্বা, গভরমেণ্টের ঘরে ভারি মান। অত বড় কাজ বাঙালীকে দেয় না, কেবল খুব খাঁটি আর ভক্তিমান বলেই হয়েছে। আমি তার কাছে মনীশের কথা তুললাম, বললাম, বাবা নির্দ্দোষী ছেলে, বিনা কসুরে ফাঁসে পড়েছে যদি তুমি কিছু উপকার করতে পার নারায়ণ তোমার প্রতি প্রসন্ন হবেন। তিনি দেখবো বলে মনীশ আর সত্যহরির নাম, বাড়ী সব লিখে নিলেন। দেখ ভগবান যদি রাজী হন।

কমল।—যে নাম করলেন, তিনি যে সত্যিই খুব বড় পুলিস কর্ম্মচারী আর সরকারের খুব বিশ্বস্ত। তিনি চেষ্টা করলে নির্দ্দোষী বলে মনীশ খালাস পাবেই।

নিতাই।—তিনি বললেন, প্রভু সরকার চান না যে নিরীহ লোক কষ্ট পান। তবে দু-একটা নির্দ্দোষী দোষীর সঙ্গে মিলে কষ্ট পাচ্ছে বটে, তাদের নির্দ্দোষিতার প্রমাণ পেলেই প্রতীকার করা যাবে।

কমল।—আপনি গোঁসাই মানুষ, এত বুঝিয়ে দেবেন এতে বিশেষ উপকার হবার সম্ভাবনা।

(বড়মার প্রবেশ)

বড়মা।—কমল, আর শুনেছ, ছায়া মায়ার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। মায়ার সঙ্গে সতীশের বিয়ে হয়েছে, পাত্র জেনে গিয়েছিল। ছায়ার সঙ্গে ধর্ম্মদাস বলে একটি ছেলের বিয়ে হয়েছে, সেটী হাকিম। বেশ হয়েছে।

কমল।—আপনি ত খুব মাছ আর কদমা দিয়ে তত্ত্ব করতে পাঠিয়ে ছিলেন, একেবারে অধিবাস।

বড়মা।—মায়াকে নিয়ে সতীশ লক্ষ্ণৌ গিয়েছে, তার মামার কাছে। আহা মা বাপ মরা ছেলে সতীশ, তার একটা হিল্লে হল।

পঞ্চম দৃশ্য

—:o:—

আলমুর থানা

মনীশ ও বিভাস

মনীশ।—আমার সামান্য জ্বর সেরে গিয়েছে, আপনি কেন কষ্ট করে এলেন! এ জায়গাটা আমার মন্দ লাগছে না। সুমুখেই ওই চণ্ডীদাসের 'দেওতা' দীঘি, তার পরেই ওই বাংলো খানি, ওই খানে বসে আমি আমাদের সেই গ্রামখানির জন্য কত দীর্ঘশ্বাসই সান্ধ্যবায়ুতে মিশিয়ে দিই। এখনকার দারোগাটী খুব ভদ্র লোক, যথেষ্ট যত্ন করেন।

বিভাস।—দারোগা বাবু ছোট ভায়ের মত আমার যেমন করছেন তাতেই বুঝেছি উনি কত স্নেহশীল। পাড়াগাঁয়ে থাকলে মানুষের চরিত্রটা. যেন কেমন হয়ে যায়। এই দারোগা বাবুকেই দেখনা, সমস্ত এলাকার সঙ্গে একটা আত্মীয়তা পাতিয়ে রয়েছেন, অথচ পুরাপুরি আপনার কর্ত্তব্য করে যাচ্ছেন। এখানকার গাছপালাগুলিও কেমন সবুজ, যেন কত দয়ার্দ্র। কলকাতায় যে আত্মীয়তা আমরা পাই, তা তালগাছের ছায়ার মত, ঊর্দ্ধে ব্যাকুলতা বা নিবিড়তা থাকতে পারে কিন্তু তা নিয়ে আসে না; আর পল্লীগ্রামের আত্মীয়তা যেন আম বা বটের ছায়া, তার সঙ্গেই

যে ভালবাসা ও কমনীয়তা দিয়ালো। একবারে সমস্ত বুক দিয়ে আলিঙ্গন করে নেয়। আমার ইচ্ছা আছে গ্রামের বাড়ীটে এবার সাজাবো, মাঝে মাঝে গিয়ে থাকা যাবে। ছায়া ও মায়ার বিবাহের সংবাদ ত চিঠিতেই পেয়েছ ; এখন কতকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

মনীশ।—গ্রামের বাড়ীটে ফেলে দিলে চলবে না। গ্রামের জমি উর্ব্বরা, চাষটাও রাখা উচিত। দাদা বারম্বার পায়ে হাত বুলুচ্ছেন, লাগে নাই ত!

বিভাস।—তেমন কিছু নয়, তবে হঠাৎ বোধ হয় হিম লেগে পাটায় একটা ব্যথা বোধ হচ্ছে। ওই খাবার তৈয়ার হয়ে এসেছে। এসো মনীশ, দুই ভাই একসঙ্গে বসে আহার করি, জীবনে এটা ত আমাদের দুর্ল্লভ হয়েছে।

(দারোগাবাবুর প্রবেশ)

দারেগা।—আমি এখন বাইরে যাই, আপনারা খেতে বসেছেন।

বিভাস।—বিলক্ষণ, আসুন ; ভাই দারোগা বাবু আপনার যত্নে প্রকৃতই মুগ্ধ হলাম। মনীশ রৈলো দয়া রাখবেন। স্নেহের চক্ষে দেখেন এবং দেখবেন। আমাকে আজ রাত্রির ট্রেনেই কলকাতা যেতে হবে। একখানা গাড়ী কি পাল্কীর জোগাড় করে রেখে দেবেন।

দারোগা।—পাল্কী ঠিক আছে, ঠিক সময়ে পৌঁছে দেবে।

———

ষষ্ঠ দৃশ্য

—০—

কলকাতা, চিৎপুর রোড—
জুয়েলারি দোকান

শিরীশ।—আপনার নাম রাম ভজন, এই দোকানের মালিক ?

রামভজন।—হাঁ মহাশয়।

শিরীশ।—(নির্জ্জনে) একটা গুরুতর কথা আছে। আপনার পুত্রের নাম রাজদ্রোহীর তালিকাভুক্ত হয়েছে! শীঘ্রই আপনার বিষম বিপদের সম্ভাবনা। আপনার ছেলের প্রতি বহুদিন আমাদের দৃষ্টি আছে, সে স্কুলে কলেজেও বিদ্রোহের বীজ বপন করছে। তার বিরুদ্ধে প্রমাণাদি যথেষ্ট পাওয়া গিয়েছে। আমার নিকটেই মজুদ, এখন কেবল দাখিল করার অপেক্ষা।

রামভজন।—আমার পুত্র নির্দ্দোষ, কিন্তু তা বল্লে কেউ শুনবে না। এখন কি উপায়ে সে রক্ষা পায় তা আপনাকে করতে হবে।

শিরীশ।—উপায় এক আছে। কাগজখানি এখনো হাত ছাড়া করি নাই। একটু সরে আসুন। এই প্রথমতঃ আজই আমাকে দিতে হবে ১০০০৲ এক হাজার টাকা তার পর সমস্ত চুকে গেলে আর একহাজার। যদি খরচে সম্মত হন, চেষ্টা করে দেখি, না হন আমাকে ক্ষমা করবেন। তবে বলে রাখছি, আপনার ছেলে শুধু নয়, আপনাকে পর্য্যন্ত টান ধরতে পারে।

রাম ভজন।—যো হুকুম, ওই টাকাই দেবো, তবে এটা বিনা কসুরে শাস্তি হলো। (গুণিয়া নোট দেওয়া)

শিরীশ।—কি করবো বলুন।

(নোটগুলি লইয়া পকেটে রাখিবার উদ্যোগ)

[হঠাৎ মটর হইতে একটি বাবু নামিয়া শিরীশের হাত টিপিয়া ধরিল।]

শিরীশ।—পুলিস, পুলিস, মটর ডাকাত, মটর ডাকাত (চীৎকার) Armed মটর ডাকাত ! armed ডাকাত !!!

(রাম ভজন তাড়াতাড়ি লৌহ সিন্দুকের চাবি দিতে ব্যস্ত চতুর্দ্দিকে ভীষণ গোল, দোকান পাট বন্ধ।)

বাবু।—কোন ভয় নেই আমি একেই চাই।

[শিরীশ ও রামভজনকে লইয়া মোটরের অন্তর্দ্ধান। চারি দিকে লোকের পলায়ন ও চীৎকার।]

(ক্রমশঃ)

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

হিন্দুর সমাজশরীর

(A comparative Study of Hindu Society as a Social-organism)

৪। ব্যক্তিতন্ত্র ও আর্থিক সম্বন্ধে সাধারণের মঙ্গল

Individualism and general well being from economic point of view.

দশম শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্য্যন্ত যে সমাজপদ্ধতি ইয়োরোপে প্রচলিত ছিল, তাহাতে মোটের উপর চারিটি শ্রেণী বিভাগ দেখা যাইত, (১) চার্চ্চ (Church) বা যাজকমণ্ডলী (২) ফিউডাল শিভাল্‌রী Feudal Chivalry (যোদ্ধা ও রাজ্যশাসক ভূস্বামী সম্প্রদায়) (৩) বূর্জ-ওয়াজে (Bourgeoisie) নাগরিক ব্যবসায়ী ও সমাবস্থাপন্ন স্বাধীন ক্ষেত্রস্বামিবর্গ এবং সার্ফ (Serf) দরিদ্র ও প্রায়-দাসবৎ কৃষি শ্রমজীবিসমূহ।

ভারতীয় সমাজবিন্যাসে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারি বর্ণের সহিত এই চারিটি শ্রেণীর একরূপ তুলনা করা যাইতে পারে। শেষোক্ত এই শূদ্রবৎ সার্ফ (Serf) গণ ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায়ের অবস্থা মোটের উপর মন্দ ছিল না। রোমীয় চার্চ্চ বা যাজকমণ্ডলীর সঙ্গে রাজন্য বর্গের বিশেষ বিশেষ কতগুলি ব্যাপারে অধিকার লইয়া বিবাদ বিসম্বাদ কিছু হইত বটে, কিন্তু মোটের উপর প্রথম তিন সম্প্রদায় যার যার বৃত্তি ও সামাজিক অধিকারের মধ্যে একরূপ শান্তিতে বাস করিতেন। উচ্চ নীচ ক্রমে সামাজিক পদের পর্য্যায় যাহা ছিল, তাহার জন্য বিশেষ অসন্তোষ বা তাহা লঙ্ঘন করিয়া সম পদ বা সম অধিকার পাইবার জন্য একটা আগ্রহ সর্ব্বত্র দেখা যাইত না। তবে সার্ফ বা শূদ্র সম্প্রদায় সময়ে সময়ে বড় পীড়িত হইত, তাহাদের মধ্যে বিদ্রোহও মধ্যে মধ্যে ঘটিত। যে চাপ তাহাদের উপরে ছিল, তাহাতে যে ক্লেশ তাহারা পাইত, তাহা প্রধানতঃ আর্থিক বা Economic। সামাজিক অবস্থাতেও অতি হীন তাহারা ছিল। দীনতার সঙ্গেই এই হীনত্ব এমন ভাবে সংসৃষ্ট ছিল যে, এই বিদ্রোহের ভাব হীনতার বিরুদ্ধেও মধ্যে মধ্যে প্রকাশ পাইত।

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে একবার ইংলণ্ডে বারত বিদ্রোহ ঘটে,—সেই বিদ্রোহের উত্তেজনার সময় রাষ্ট্রবা একটি শ্লোক আবৃত্তি করিত যথা—

> **When Adam dived and Eve span**
> **Who was then a gentleman ?**

ইহা হীনাবস্থায় অসন্তুষ্ট মানবের সম্ভ্রান্ত বংশী উচ্চপদস্থের সঙ্গে সাম্যেরই দাবী।

এই সব শ্রেণী বা সম্প্রদায় বিশেষে বৃত্তিরও অব একটা বিভাগ তখন ছিল। যাজক মণ্ডলী বিদ্যার আলোচন করিতেন, শিক্ষা দিতেন, ধর্ম্ম-অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করিতেন,— উচ্চনীচ পদগত একটা পর্য্যায় তাঁহাদের মধ্যে ছিল, ধর্ম্মক একটা আদায় হইত,—পদানুসারে এই কর তাঁহারা ভো করিতেন। বাঁধা একটা পদ্ধতিই ইহার ছিল। উচ্চত যাজকগণ অনেকে বড় বড় রাজকার্য্য করিতেন,—কো কেহ জমিদারের মত ভূসম্পত্তিও শাসন রক্ষণ করিতেন। ক্ষাত্র সম্প্রদায় অর্থাৎ অভিজাত ভূস্বামিবর্গ যুদ্ধ করিতেন, রাজ কার্য্য করিতেন, ভূমির উপস্বত্ব তাঁহাদের প্রধান জীবিক ছিল। ব্যবসায় বাণিজ্য অর্থাৎ বৈশ্যবৃত্তি গ্রহণ কর তাঁহারা গ্লানিকর মনে করিতেন, কেহ করিলে স্ব-সমাজে তাহার মর্য্যাদা থাকিত না। Bourgeoisie বা বৈশ্য সম্প্রদায় ব্যবসায় বাণিজ্য করিতেন,—ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ে হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ইহাদের মধ্যে গঠিত হয় এব প্রত্যেক সম্প্রদায় কঠোর কতকগুলি বিধির অনুবর্ত্তন করিয়া বাঁধা একটা শৃঙ্খলা মত কাজ কর্ম্ম করিত, নিজ নিজ ব্যবসায়ের উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিত, বাহিরের প্রতিযোগিত হইতে আত্মরক্ষা করিত। এবং সম্প্রদায়টিকে মোটে উপর বলিষ্ঠ করিয়া তুলিত, যার যার সম্প্রদায়ের মধ্যেও বড় একটা সমযোগিতা ছিল,—সম্প্রদায়ভুক্ত দরিদ্র তাহাতে রক্ষা পাইত, ছোটতে বড়তে, মনিবে ভৃত্যে পার্থক্য বড় দেখ যাইত না। প্রত্যেক ব্যবসায়ী গৃহস্থ নিজের গৃহে কাজ কর্ম্ম করিত, একা না পারিলে এপ্রেন্টিস (apprentice) রাখিত। প্রচলিত কতকগুলি বিধি মানিয়া এই এপ্রেন্টিসরা কাজ করিত, যথা সময়ে এই

সব রীতি অনুসারেই সেই সম্প্রদায়ভুক্ত স্বাধীন ব্যবসায়ী গৃহস্থ হইয়া বসিত। কারখানার মালিকে আর কুলিতে যে প্রভেদ, সেরূপ কোনও প্রভেদ সামাজিক কি ব্যবসায়িক ব্যবহারে এই সব মনিবে ও এপ্রেন্টিসে কোথাও দেখা যাইত না। এই সব ব্যবসায়িক সম্প্রদায় গুলির নাম ছিল ইংরেজিতে guild এই—guild গুলি কতকটা আমাদের দেশের ব্যবসায়িক জাতিসমূহের মত ছিল। ব্যবসায়ের সব কাজ কর্ম্ম—মনিবে এপ্রেন্টিসের সকল সম্বন্ধ প্রচলিত প্রথা বা Custom অনুসারেই নির্দ্দিষ্ট হইত।

সকলেই পরম্পরাগত প্রথা বা রীতি মানিয়া চলিত। স্বাধীনভাবে নিজ নিজ সুবিধার খাতিরে প্রথা লঙ্ঘন করিয়া কেহ কিছু করিত না, করিতে পারিতও না। কারণ সকল ব্যবসায়ই এইরূপ সব নিয়মাধীন সম্প্রদায়গত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রত্যেক ব্যবসায়ীকেই তার guild বা জাতির মধ্যে থাকিয়া তার সব রীতি নীতি মানিয়া চলিতে হইত।

সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়েও কোনরূপ প্রতিযোগিতা ছিল না। প্রতিযোগিতা যাহা কিছু ছিল কোনও এক গিল্ডের গৃহস্থদের পরস্পরের মধ্যে,—তাতেও কোন গৃহস্থ একাই সেই গিল্ডের সকল ব্যবসায় অধিকার করিয়া ফেলিত না। অন্য গিল্ডের কোনও কর্ম্মে ত হস্তক্ষেপ করিবারই যো কাহারও ছিল না। ব্যবসায়িক নীতিপদ্ধতির এতই জোর তখন ছিল।

যেমন ধরুন, কোনও নগরে কামারদের গিল্ড আছে, কুমারদের গিল্ড আছে, চামারদের গিল্ড আছে। বহু স্বাধীন গৃহস্থ এক এক গিল্ডের অন্তর্ভুক্ত। ধরুন, কামার গিল্ডের সকলেই যার যার বাড়ীতে কাজ কর্ম্ম করিবে,—সেই ভাবে সেই কাজে যতটুকু প্রতিযোগিতা পরস্পরের সঙ্গে চলে, তাই মাত্র তাহাদের ছিল। বিশেষ কোনও কামার গৃহস্থ—যতই ওস্তাদ সে হউক, এমন একটা কারখানা ফাঁদিয়া বসিতে পারিত না, যাহাতে অন্যান্য সব গৃহস্থের কাজ কর্ম্ম একেবারে অচল হইয়া পড়ে, আর তারা নিরুপায় হইয়া তার কারখানায় গিয়া মজুরী গ্রহণ করে। রীতিই এরূপ ছিল না, এমন কল্পনাও কাহারও মনে আসিত না, এমন প্রয়াসও কেহ করিত না,—করিলেও অন্যান্য সব গৃহস্থদের সমবেত প্রবল একটা সামাজিক বাধা তার এই অতিলোভকে দমন করিয়া ফেলিত। মোটের উপর প্রত্যেক গিল্ডের গৃহস্থদের মধ্যে এমন একটা সামাজিক সহযোগিতার ভাব ছিল, যাহাতে আধুনিক এই cut-throat competitionএর আবির্ভাবই সম্ভব হইত না। এপ্রেন্টিস বা শিক্ষানবীশরা নির্দ্দিষ্ট কয়েক বৎসরের জন্য একটা এগ্রিমেণ্ট করিয়া কোনও না কোনও গৃহস্থের সঙ্গে কাজ আরম্ভ করিত। এগ্রিমেণ্টের সময় উত্তীর্ণ হইলে, গিল্ডের অন্যান্য গৃহস্থদের অনুমোদনে তারাও এক একজন স্বাধীন গৃহস্থ হইয়া বসিত। সুতরাং স্বাধীন গৃহস্থ শিল্পী ও তাহার এপ্রেন্টিসদের মধ্যে সামাজিক পদমর্য্যাদার কোনও পার্থক্য ঘটিতে পারিত না। গিল্ডের মধ্যে এইরূপ ব্যবহার ছিল। বাহিরের সম্বন্ধেও, ধরুন, কামার গিল্ডের কোনও বিশেষ গৃহস্থ অথবা সমগ্র গিল্ড বা কামারসমাজ কুমার কি চামার কি অন্য কোনও সমাজের ব্যবসায়েও যাইত না, তাহাদের সামাজিক কোনও ব্যবহারের মধ্যেও হস্তক্ষেপ করিত না।

ছোট ছোট নগরে এই সব গৃহস্থ শিল্পীরা বাস করিত, স্বাধীন ও সচ্ছল ভাবে নিজেদের কাজ কর্ম্ম করিত, যেমন নাকি আমাদের দেশে এখনও বহু শিল্পী জাতির মধ্যে দেখা যায়। সমাজবন্ধন ও সামাজিক ব্যবহারও তাদের মধ্যে এমন ছিল, যাহাতে মোটের উপর তারা বেশ সুখে শান্তিতেই জীবন যাপন করিত। স্বাধীন গৃহস্থ জীবনের যে আরাম বিরাম, যে সচ্ছন্দতা, সবই তারা বেশ ভোগ করিত। নিজ নিজ ব্যবসায়ের মধ্যে নিজের শ্রমে যে যাহা পাইতে পারে তাহা পাইবার পক্ষে বিশেষ কোনও বাধা ছিল না। অভিজাত ভূস্বামী সম্প্রদায় হইতে সামাজিক পদমর্য্যাদায় তাহারা নিম্নতর ছিল, উচ্চতর রাজকার্য্যাদিতে তাহারা বড় গৃহীত হইত না, কিন্তু তাহাদের স্বক্ষেত্রে অর্থাৎ ব্যবসায়বাণিজ্যের মধ্যে তারাই ছিল সর্ব্বে সর্ব্বা। উচ্চতর রাষ্ট্রীয় অধিকারের বলে অভিজাত ভূস্বামী সম্প্রদায় তার মধ্যে কোনও হাত দিতে চাহিতেন না। জীবনের বৃত্তিতে তাঁহারাও custom বা রীতি মানিয়া চলিতেন। জমিদারী ও রাজকর্ম্মই ছিল, তাঁহাদের পুরুষপরম্পরাগত বৃত্তি। বাণিজ্যে লক্ষ্মী যতই 'বসতি' করুন, সে লক্ষ্মীর প্রসাদ ভোগে কোনও কামনা তাঁহাদের ছিল না।

তবে উদ্ধত ও দুর্দ্ধর্ষ ভূস্বামী অনেকে বাহুবলে তাঁহাদের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ব্যবসায়িক সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে অত্য

রূপ পীড়নে, অত্যধিক কর আদায়ে, নানারূপ ক্লেশ ঘটাইবার চেষ্টা অনেক স্থলে করিয়াছেন। কিন্তু এক ফরাসী দেশে ব্যতীত অন্য কোথাও ভূস্বামীরা বিশেষ সফল ইহাতে হইতে পারেন নাই। অনেক দেশেই ব্যবসায়ীরা রাজার নিকট হইতে সনন্দ লইয়া নিজেদের আভ্যন্তরিক শাসনভার স্বতন্ত্রভাবে নিজেরা গ্রহণ করিয়াছিল। জমিদারীর সীমানার মধ্যে অবস্থিত হইলেও ব্যবসায়িক নগরগুলিতে এক একটি স্বতন্ত্র শাসনক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যে নগরের ব্যবসায়িগণ যত অধিক এই স্বতন্ত্র শাসন লাভ করিত ও তাহা রক্ষা করিতে পারিত, ভূস্বামীদের পীড়ন হইতে ততই তারা অব্যাহতি পাইত। ভূস্বামীদের ক্ষমতা তখন এত প্রবল ছিল, রাজাকে এত বেশী তাঁহাদের বাধ্য হইয়া চলিতে হইত যে, নাগরিক ব্যবসায়িগণকে এই অধিকার সহজেই তাঁহারা দিতেন। ইহাদের নিকট এজন্য বিশেষ এক একটা কর বা সেলামীও রাজারা পাইতেন, আরও তাহাদের আনুগত্য লাভ করিতেন। প্রবল ভূস্বামীদের উপরে অনেক দেশেই রাজারা ইহাদের সহায়তায় আপনাদের প্রভুত্ব চালাইবার বেশ একটা সুযোগ পাইয়াছেন। অন্ততঃ ভূস্বামীদের শক্তি অনেকটা সংযত করিবারও ইহাতে রাখিতে পারিয়াছেন।

এ সব বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনার মধ্যে যাইবার অবকাশ এ প্রবন্ধে নাই। মোট যে বিষয়টি আমার আলোচ্য, তার পক্ষে তার প্রয়োজনও তেমন নাই। সাধারণভাবে এই কথাটি বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে পূর্ব্বে ইয়োরোপে স্বাধীন গৃহস্থ ব্যবসায়িগণ কি ভাবে বাস করিত, এবং মোটের উপর তাহারা সুখশান্তিতেই ছিল, স্বাধীন গৃহস্থ জীবনের সচ্ছন্দতাও বেশ ভোগ করিত। দশম হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে এইরূপ সমাজবিন্যাস ও ব্যবসায়পদ্ধতি গড়িয়া উঠে। ষোড়শ শতাব্দী হইতে রাজারা প্রায় সর্ব্বত্র প্রবল হইয়া উঠেন,—রাজা এবং তাঁহার অনুগত অভিজাত পারিষদ ও কর্ম্মচারিবর্গ নিম্নতর সম্প্রদায় সমূহের উপরে নানারূপ পীড়ন করিবার সুযোগ পান। ফরাসী দেশেই এই পীড়নের মাত্রা অতি উচ্চে গিয়া উঠিয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবও তার ফলে ঘটে।

অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে ইয়োরোপের ব্যবসায় ক্ষেত্রে আমূল এক পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। পূর্ব্বের অবস্থা এমন ভাবেই ইহাতে বদলিয়া গেল যে, এই পরিবর্ত্তনকে সাধারণতঃ Industrial Revolution বা 'ব্যবসায়িক যুগান্তর' এই নাম দেওয়া হয়। এক সময়ে বড় দুইটি কারণের সমবায়ে এই পরিবর্ত্তন ঘটে। একটি কারণ হইতেছে, বৃত্তি ও অধিকারভেদ সম্বন্ধে প্রাচীন সংস্কারের পরিবর্ত্তন, নূতন সংস্কারের প্রভাবে লোকের প্রাচীন প্রথা সমূহের বর্জ্জন—এবং আগ্রহে নূতন নীতি নূতন আদর্শের অনুবর্ত্তন। সকলেই সমান, সকলেরই সকল বিষয়ে সমান অধিকার, জীবনের বৃত্তি প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে যার যার রুচি ও ইচ্ছামত বাছিয়া নিতে পারে, সাম্প্রদায়িক কোনওরূপ গতানুগতিক পন্থার অনুবর্ত্তন অনাবশ্যক, অনিষ্টকর, তথা স্বাধীনতার পরিপন্থী।—প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের উন্নতির জন্য যে কোনও উপায় অবলম্বন করিতে পারে, এবং ইহাতে অপরের স্বাধীন অধিকারের সীমা লঙ্ঘন না করিলে, গবর্ণমেণ্টের আইন অথবা সামাজিক কোনও বিধি তাহাতে ন্যায়তঃ বাধা দিতে পারে না। কর্ম্মক্ষেত্রে স্বাধীন ভাবে ইচ্ছামত সকলেই সকলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া উন্নতি লাভের চেষ্টা করিবে। যার সঙ্গে যে কাজ করিবে নিজের সুবিধা বুঝিয়া স্বেচ্ছায় তার চুক্তি করিয়া নিবে, কেবল প্রচলিত প্রথার অধীন হইয়া চলিবে না।

ইহাতেই সকলের শক্তির সম্যক স্ফুরণ হইবে, দেশের ও জাতির সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ হইবে। এই সব কথাই সকলের চিত্ত আকৃষ্ট করিল, এই সব নীতিরই অনুসরণ করিতে সকলের প্রাণ উন্মুখ হইয়া উঠিল। ফরাসীদেশে যে সামাজিক বৈষম্য ও তার পীড়ন ঘটে, এই সব নীতির আবির্ভাব যে প্রধানতঃ তাহার ফল ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দরিদ্র যাহারা দুঃখ পাইতেছিল, বাঁধা গণ্ডীর মধ্যেই চলিতে বাধ্য হইত। উচ্চতর কাহারও সঙ্গে সমান পদমর্য্যাদা, সমান অধিকার ভোগ করিবার সম্ভাবনা কিছু দেখিত না. তারা ভাবিল, স্বাধীনভাবে নিজের বৃত্তি বাছিয়া নিতে পারিলে, উন্নতির জন্য সকলের সঙ্গে সমান সুযোগ পাইলে অবাধে সে যত বড় হইতে পারে তা হইবে, কোনও দুঃখ তার আর থাকিবে না। তাই ত। কেন সে বাঁধা প্রথা মানিয়া চলিবে? নিজের সুবিধা বুঝিয়া স্বাধীনভাবে, যার সঙ্গে যে ব্যবসায়িক সম্বন্ধে তাকে আসিতে হয়, তাহা সে স্থির করিয়া নিবে। স্বাধীন মানবের সেই ত উন্নত অধিকার!

পূর্ব্বে ব্যবসায় বাণিজ্যাদি সমাজের সকল কর্ম্মের মূল নীতি ছিল পুরুষ পরম্পরাগত প্রথা বা Customs এর অনুসরণ। এখন মূল নীতি হইল—স্বাধীন চুক্তি বা free contract আগে লোকের বৃত্তি ছিল সম্প্রদায়গত, এখন সম্প্রদায়ের সকল বন্ধন মুক্ত হইয়া লোকে স্বেচ্ছাবৃত্তিক হইতে আরম্ভ করিল। এই বৃত্তি নির্ব্বাচনে, নির্ব্বাচিত বৃত্তিগ্রহণ করিয়া নিজ নিজ উন্নতিসাধনে, অবাধ একটা প্রতিযোগিতা করিয়াই অবশ্য সকলে সকলের সঙ্গে চলিবে। যার যে ক্ষমতা আছে, অবাধে তার বলে যে কোনও ব্যবসায়ে যে যতদূর উন্নতিলাভ করিতে পারে তা করিবে। Freedom of labour, freedom of contract, freedom of competition—ইহাই হইল এখন সকল ব্যবসায়ের মূল কথা।

সময়মত বড় কতকগুলি সুযোগও উপস্থিত হইল। এই সব সুযোগের অবস্থাকে এই পরিবর্ত্তনের দ্বিতীয় কারণ বলা যাইতে পারে। পূর্ব্ব হইতেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইউরোপীয় জাতি সমূহের বাণিজ্য, উপনিবেশ ও অধিকার বিস্তৃত হইতেছিল,-এই সময় আরও তার প্রসার ঘটে। ইহাতে প্রচুর ধনাগম ইয়োরোপে হয়। এই সব বাণিজ্যে যাঁহারা ব্যাপৃত ছিলেন, বৈদেশিক অধিকার সমূহের শাসনকার্য্যে যাঁহারা নিযুক্ত হইতেন, এই ধন অবশ্য তাঁহাদের হাতে গিয়াই জমে। ব্যবসায়ে এই ধন নিয়োগ করিবার জন্য নূতন নূতন ব্যবসায়ের পথও তাঁহারা খুঁজিতে থাকেন। দেশের শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া বিদেশে তাহা রপ্তানি করিতে পারিলে প্রচুর লাভ হয়। এদিকেও তাঁহারা মনোযোগী হইলেন। গৃহে গৃহে গৃহস্থ শিল্পীরা এত দিন যাহা উৎপাদন করিত, দেশের অভাব তাহাতে কুলাইয়া যাইত, রপ্তানী বড় বেশী হইত না। রপ্তানির জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে ইঁহারা স্থানে স্থানে কারখানা স্থাপন করিয়া গৃহস্থ শিল্পীদের বেতন দিয়া তাহাতে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। নানারকম কলের আবিষ্কারও এই সময়ে আরম্ভ, ক্রমে ষ্টীম এঞ্জিনের সাহায্যে সব কল চালাইবারও উপায় হইল।

এই সব কলে অল্পশ্রমে অল্প সময়ে দ্রব্য উৎপন্ন হয়, কলের কারখানা প্রতিষ্ঠা করিবার টাকারও অভাব নাই। নানাস্থানে কলের কারখানা বসিয়া গেল; দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া উঠিতেও লাগিল। দরিদ্র স্বাধীন গৃহস্থশিল্পী যারা ছিল, ঘরে তাহারা হাতে যাহা করিতে পারিত, কলে প্রস্তুত দ্রব্যের মত সুলভ তাহা হইত না, তেমন প্রচুরও তাহা হইত না। সুতরাং তাহাদের ব্যবসায় ক্রমে অচল হইয়া পড়িল। নিরুপায় হইয়া ক্রমে তাহারা গিয়া কারখানায় মজুরে খাটিতে লাগিল। বিদেশে অধিকার বিস্তারের সঙ্গে বাণিজ্যের ক্ষেত্রেরও প্রসার হইতেছিল। যত জিনিশ প্রস্তুত হয় তাহা কাটে, যত কাটে তত টাকা বাড়ে। যেমন টাকা বাড়ে, কলের কারখানাও বাড়ে। বিজ্ঞানচর্চ্চার উন্নতির সঙ্গে কলের আবার আরও উন্নতি ক্রমে হইতে লাগিল - নূতন নূতন আরও কত রকম কল হইল। শিল্পের কাজ যতদূর হাত ছাড়িয়া কলের অধিকারে আসিতে পারে, তা আসিল। রেল হইল, ষ্টীমার হইল, টেলিগ্রাফ হইল, ব্যাঙ্কের পর ব্যাঙ্ক হইতে লাগিল, দেশ বিদেশে ব্যবসায় বাণিজ্য হু হু করিয়া বাড়িয়া উঠিল। মহাজনরা সব বড় বড় কারখানা, বড় বড় বাণিজ্যের মালিক হইয়া উঠিল। ব্যবসায়ের ধরণই বদলিয়া গেল। অতি বেশী মূলধন যে সব ক্ষেত্রে প্রয়োজন সেখানে joint-stock বা যৌথ মূলধনের কারবার আরম্ভ হইল। তার পদ্ধতি স্বতন্ত্র। বড় বড় মালেকান কারবারগুলিও সেই পদ্ধতিই ধরিল। এই সব বড় বড় ব্যবসায় বাণিজ্য নূতন পদ্ধতিতে—বড় বড় আফিস করিয়া—তদনুরূপ লোকজন রাখিয়া চালাইতে যেরূপ যোগ্যতার প্রয়োজন, দরিদ্র প্রাকৃত জনসাধারণের মধ্যে সেরূপ যোগ্যতাও বড় দেখা যায় না। প্রাচীন গৃহস্থশিল্পজীবীরা প্রধানতঃ এই শ্রেণীরই লোক ছিল। স্বাধীনভাবে কোনরূপ ব্যবসায় করা ইঁহাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হইল। ধনী মালিকদের মজুরী ব্যতীত গত্যন্তর কিছু আর তাহাদের রহিল না।

এই পরিবর্ত্তনের পূর্ব্ব হইতেই বণিক ও শিল্পী গৃহস্থদের মধ্যে একটা ভেদ ও বিরোধের ভাব দেখা দিয়াছিল। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে, 'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।' কৃষিকর্ম্মকে এখানে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদনের সাধারণ একটা নাম বলিয়াই বুঝিয়া নিতে হইবে। কৃষিতে হউক, কি শিল্পে হউক, গৃহস্থ নিজের গৃহে নিজের ও পরিজনবর্গের শ্রমে যাহাই উৎপাদন করিতে পারুক তাহাতে প্রভূত ধনাগম সাধারণতঃ তার হয় না। কিন্তু বণিক যারা যেখানে যাহা সুলভে মিলে তাহা [illegible]

ঘুরে যেখানে তাহা মিলে না সেখানে নিয়া অধিক দরে বিক্রয় করিতে পারে, তাদের লাভ অনেক বেশী হয়। যত বেশী লাভ হয়, মূলধন বাড়ে, তত আরও সস্তায় বেশী মাল কিনিয়া মজুত করিয়া আরও বেশী লাভে বিক্রয় করিবার সুযোগ করিয়া নিতে তারা পারে, এবং ক্রমেই অধিকতর সম্পন্ন হইয়া উঠে। সম্পদবৃদ্ধির সঙ্গে তাদের পদমর্য্যাদা বাড়ে, ক্ষমতা যোগ্যতা বাড়ে। দেশ বিদেশে গমনাগমনে নানাবিষয়ে অভিজ্ঞতা বাড়ে, সন্তানসন্ততিগণের উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা তারা করিতে পারে। ক্রমে আরও উন্নত ও শক্তিমান্ তাহারা হইয়া উঠে। এই জন্য সর্ব্বত্রই প্রায় দেখা যায়, সাধারণ কৃষক ও শিল্পীগৃহস্থদের অপেক্ষা বণিকদের অবস্থা উন্নত। তেমন সুযোগ উপস্থিত হইলে, বাণিজ্যের প্রসার তেমন ঘটিলে, ইহারা কৃষক ও শিল্পীগৃহস্থদের অনেক নীচে ফেলিয়া অনেক উপরে গিয়া নিজেরা উঠে।

দেশবিদেশে সমুদ্রযাত্রা, নূতন নূতন অনেক দেশের আবিষ্কার, সেই সব দেশে উপনিবেশ ও অধিকারস্থাপন এবং বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কারণে ষোড়শ শতাব্দী হইতেই ইয়োরোপে বৈদেশিক বাণিজ্যের বিশেষ প্রসার আরম্ভ হয়। অনেক দেশের বহু ধনরত্ন, বহুস্বর্ণরৌপ্যাদি মূল্যবান্ ধাতু, ধাতুর খনি, নানাউপায়ে ইয়োরোপীয় বণিকগণের মধ্যে যাহারা সুযোগ্য ও উদ্যমশীল, তাহাদের হস্তগত হয়। ফলে এই সব লোক সম্পদে, পদমর্য্যাদায় ও সর্ব্ববিধ ক্ষমতায় অনেক উপরে গিয়া উঠিল। অভিজাত ভূস্বামী সম্প্রদায়ের একরূপ সমকক্ষই তাহারা হইল। নগরে নগরে ইহারাই প্রধান হইয়া উঠিল, শিল্প কারখানা সব ইহারা প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিল, ধনবলে আবিষ্কৃত কল সমূহ ইহাদেরই হাতে গিয়া পড়িল। ধনবান্ ভূস্বামীরা অনেকে বাণিজ্যে ইহাদের সহযোগী হইতে লাগিলেন। বস্তুতঃ বড় বড় ধূম কল (steam engine) ছোট গৃহস্থেরা বাড়ীতে বাড়ীতে বসাইয়া বড় এক একটা কারখানা কিছু আর করিতে পারে না। আবার ঘরে ঘরে হাতে কাজ করিয়াও বড় কলকারখানার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া চলিতে পারে না। সুতরাং যাঁর যার স্বাধীন বৃত্তি ছাড়িয়া কারখানায় মজুরী ছাড়া তারা আর কিই বা করিতে পারে?

এই সব কল কারখানার প্রতিষ্ঠা এবং তার জন্য বহু জনসমাগম যে পুরাতন নগরগুলিতেই কেবল হইত তা নয়, নূতন নূতন স্থানেও হইত। যেখানে হইত, সেইখানেই বড় এক একটা নগর হইয়া উঠিত। পুরাতন নগরগুলিরও আকার একেবারে বদলিয়া গেল। নূতন সব নগরে নূতন করিয়া ত হইতেই পারে না, পুরাতন নগর গুলিতেও স্বাধীন গৃহস্থ শিল্পীদের গৃহবাস সব উঠিয়া গেল। কারখানার বাড়ী ঘরেই নগর ছাইয়া পড়িল। কারখানার সঙ্গে কুলীব্যারাকও হইল,—মজুরীরা সপরিবারে এই সব ব্যারাকে গিয়া আশ্রয় নিল। গৃহস্থ শিল্প ব্যবসায়েও কেবল বয়স্ক পুরুষরাই কাজ করে না; নারীরা, বালক বালিকারা, সকলেই অবসর মত এবং যার যার সামর্থ্য মত ছোটখাট অনেক কাজে পুরুষদের সাহায্য করে। সকলেই সাধ্যমত কাজ করে, তাই সংসার চলিয়া যায়। নতুবা কেবল বয়স্ক পুরুষরাই সব কাজ করিয়া উঠিতে পারে না, আর তাহাতে সংসারও চলে না। এদেশে গৃহস্থ শিল্প ব্যবসায় এখনও বহু পরিমাণে বর্ত্তমান আছে, ইহাদের কাজকর্ম্মের রীতি যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, গৃহকর্ম্মের অবসরে নারীরা এবং ক্রীড়ার অবসরে বালক বালিকারাও কি পরিমাণ ও কত রকম সাহায্য ব্যবসায়ের কার্য্যে করিয়া থাকে।

ঘরে যদি সকলেরই কাজের দরকার হয়, কারখানায় কেবল বয়স্ক পুরুষদের মজুরীতেই বা চলিবে কেন? বস্তুতঃ তা চলিত না, ব্যারাকবাসী মজুররা সপরিবারেই কারখানার কাজে নিযুক্ত হইত। প্রতিদিন হয়ত ১০ ঘণ্টা ১২ ঘণ্টা করিয়া কারখানা চলিত। যতক্ষণ চলিত, স্ত্রীপুরুষ, বালক বালিকা সকলকেই কাজ করিতে হইত। গৃহস্থ শিল্প ব্যবসায়ে নারীরা স্বামী পুত্রের ব্যবসায়ে সাহায্য করে, বালক বালিকারা পিতা ভ্রাতার কাজে খাটে। মজুরীর রুটিন ইহার মধ্যে কিছু নাই, নির্মম চুক্তির নিয়মে বাঁধা কেহ থাকে না, রন্ধনাদি গৃহ কর্ম্ম, সন্তান পালন প্রভৃতি গৃহস্থ নারীদের সকল কর্ত্তব্য সব নির্ব্বাহ করিয়া অবসরকালে তারা এই সব কাজে হাত দেয়। গৃহস্থ জীবনের সুখস্বচ্ছন্দতার ব্যাঘাত তাহাতে বড় হয় না। কিন্তু কারখানার কুলী ব্যারাকে গৃহস্থালী চলে না, গৃহ ধর্ম্ম বলিয়াও কিছু থাকিতে পারে না। বাঁধা দুই এক ঘণ্টা ছুটির সময় কোনও মতে দুটি আহারের যোগাড় করিয়া মাত্র নারীরা নিতে পারে। ৭।৮ বৎসর বয়স হইলেই বালক বালিকারা

কারখানার কাজে নিযুক্ত হইত। কিন্তু কাজ করিতে পারে না, এমন ছোট ছোট শিশু যারা, তাদের লালন পালন জননীদের পক্ষে একেবারেই সম্ভব হইত না। বৃদ্ধা স্ত্রীলোক দুই চারিজন কহিয়া থাকিত; মায়েরা কাজে যাইবার সময় শিশুদের তাদের কারও কাছে ফেলিয়া যাইত। শতাধিক অসহায় শিশুও হয়ত এইরূপ এক একটি বুড়া বুড়ীর হাতে থাকিত! সে যে কি যত্নই তাহাদের করিত তাহা আর না বলিলেও চলে।

মানুষ যতই দরিদ্র হউক, নিজের কুটীরে তার স্বাধীন গৃহস্থ জীবন, নিজের গৃহে থাকিয়া খাটিয়া খাওয়া, সেই এক রকম,—আর ব্যারাকের এই কুলীর জীবন এই এক রকম। এই ধরণে এই সব ব্যবসায় প্রসার যত বাড়িবে, যত বড় বড় কারখানা; বড় বড় firm প্রতিষ্ঠিত হইবে, যতই দেশের সকল ব্যবসায় এই সব কারখানার আর firm এর আয়ত্ত হইবে, ততই দরিদ্র জন সাধারণের স্বাধীন গৃহস্থ জীবন লুপ্ত হইবে, ব্যারাকবাসী কুলী পরিবারে তারা পরিণত হইবে। লেখা পড়া যারা কম জানে, গতরেই কেবল খাটিতে পারে, তারা হইবে কুলী বা দৈহিক মজুর। আর দরিদ্র ভদ্র সন্তান যারা কিছু লেখা পড়া শিখিয়াছে, তারা হইবে কলম পেশা কেরাণী মজুর। মজুরীর হার উভয়েরই এত অল্প যে, তাহাতে গৃহস্থ জীবন, নিজ নিজ গৃহে সপরিবারে বসবাস, কাহারও পক্ষেই সম্ভব হইতে পারে না। কুলীদের মত কেরাণীদেরও ব্যারাক বাস অবলম্বন করিতে হয়। অজ্ঞ অশিক্ষিত কুলীদের অপেক্ষা কিছু শিক্ষাপ্রাপ্ত ভদ্রোচিত সংস্কারে উন্নতবুদ্ধি কেরাণীদের হিতাহিত বিবেচনা কিছু বেশী, তাই তারা বিবাহের দায়িত্ব সহজে গ্রহণ করিতে চায় না। অধুনা ইয়োরোপে অবিবাহিত বহু নরনারী এইরূপ কেরাণীর কাজে বা বড় বড় দোকানের কেনাবেচার কাজে যৎসামান্য জীবিকা অর্জ্জন করে। ব্যারাকের মত বাড়ীতে, ইহারা বাস করে। যারা বিবাহ করে, স্ত্রীপুরুষ উভয়েই কাজ করে আর ব্যারাকেই ঘর ভাড়া করিয়া থাকে। ইয়োরোপে, বিশেষ ভাবে আমেরিকায় এত বড় বড় ব্যারাক এখন হইয়াছে যে, শত শত—কখনও সহস্রাধিকপরিবার এক একটি ব্যারাকে থাকে। ছোট বড় সব ফ্লাটগুলি ভাগ করিয়া রাস্তার মত সব corridor তার মধ্যে আছে। সেখানে পুলিশ পাহারা মোতায়েন থাকে। পারিবারিক আবরু বা প্রাইভেসি ইহাদের একেবারেই সম্ভব হয় না। সুখশান্তি যাহা হয়, তাহা আর না বলিলেও চলে। দরিদ্রের যেখানে এই গতি—আর দরিদ্রই সব দেশে বেশী,—সেখানে জন সাধারণের প্রকৃত সুখ যে কি আছে, তাহা বেশী আর না বলিলেও চলে।

আধুনিক শিল্প ব্যবসায়ে এবং বাণিজ্যে যে সব দেশ বড় হইয়া উঠিবে, সেখানে দরিদ্র জনসাধারণের ইহা ছাড়া গতি নাই। তবে কৃষি ব্যবসায়ে সর্ব্বত্র ঠিক এইরূপ হয় না। ইয়োরোপে কোনও দেশে ছোট ছোট জমির মালিকরূপে ছোট ছোট গৃহস্থ কৃষকেরা চাষ বাস করে। ইহাদের অবস্থা মন্দ বলা যায় না। কিন্তু যেখানে জমির মালিক এই গৃহস্থেরা নয়, খাজনা দিয়া জমিদারের জমি অস্থায়ী ভাবে জমা নিয়া চাষ করে, আর জমিদার ইচ্ছা মত খাজনার হার বাড়াইয়া নিতে পারেন, সেখানে গৃহস্থ হইলেও কৃষকদের দুঃখ বড় ঘোচে না। ইংলণ্ডে এবং অন্য কোনও কোনও স্থানে চাষ বাসের রীতি আবার আলাদা। চাষের যোগ্য জমি বড় বড় ফার্ম্মে বা কৃষি ক্ষেত্রে ভাগ করা থাকে। ফার্ম্মার নামক অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থগণ জমিদারদের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট খাজনার চুক্তিতে এই সব ফার্ম্ম জমা নেয়, মজুর রাখিয়া চাষ বাসের কাজ করায়। এইরূপ প্রত্যেক ফার্ম্মেও চাষী মজুরদের ব্যারাক আছে,—সেইখানে তারা থাকে। প্রবন্ধের প্রারম্ভে যে serf সার্ফ সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তারাই কালে এই কৃষি মজুরে পরিণত হইয়াছে। কতক গ্রাম ছাড়িয়া নগরে গিয়া কারখানার মজুর হইয়াছে; যারা রহিয়া গিয়াছিল তারাই এখনকার কৃষি মজুর। তারপর শিল্পে ও বাণিজ্যে যত বৃহৎ মাত্রায় ব্যবসায় করা যায়, সাধারণ কৃষিতে তা হয় না। তাই কৃষিব্যবসায় বড় বড় মহাজনদের হাতে একেবারে গিয়া পড়ে নাই। তবে আমেরিকায়, আফ্রিকায়, এবং ভারতেও নানা স্থানে তুলা, কাফি প্রভৃতি এমন অনেক কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়, যার জন্য বড় বড় ফার্ম্ম করিয়া কুলীর দ্বারা কাজ করান দরকার হয়। এই সব স্থানে, এই সব কৃষি ব্যবসায়ের মধ্যে কুলীর আমদানী যথেষ্ট হইতেছে, কুলীদের ব্যারাকজীবনও বেশ দেখা দিতেছে। সকলেই জানেন, ভারত হইতে বহু কুলী এই সব অঞ্চলে চুক্তিবদ্ধ হইয়া যায়,—তাদের জীবনের দারুণ দুর্গতির কথাও সকলে শুনিয়া থাকেন। শ্বেত দেশে শ্বেতাঙ্গ কুলীর ব্যারাক-

জীবনই সুখের নয়। শ্বেতাঙ্গের কার্য্যে কালো কুলির যে কি গতি হইতে পারে, তাহা কি আর বলিতে হইবে ?

দরিদ্র যে স্বাধীন ভাবে কোনও বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে না, তাকে মুজুরী বা চাকরী নিয়া অন্যের অধীনে কাজ করিতেই হইবে। এরূপ মুজুর বা চাকর চিরদিনই মানব সমাজে আছে। মুজুরীর হার বা চাকরীর বেতন কম হইলে দুঃখক্লেশও তাহাদের পাইতে হয়। কিন্তু আধুনিক ব্যবসায়বাণিজ্যের রীতিতে ইহাদের সংখ্যা বড় বেশী বাড়িয়া গিয়াছে। দরিদ্র প্রায় সকলেই এখন মুজুরী করিতে বাধ্য হইতেছে। পূর্ব্বে কোন্ মুজুরীতে কে কি পাইবে, তারও একটা বাঁধা নিয়ম ছিল। সে সব নিয়ম এখন উঠিয়া গিয়াছে, কাজের পাওনা স্থির হয় স্বাধীন চুক্তিতে। চুক্তিতে কোন পক্ষ কি পাইবে, তাহা স্থির হয় demand ও supplyএর কড়া নিয়মে। আমার টাকা আছে, কাজ করাইব, লোক চাই। তোমার টাকা নাই, কাজ করিতে আসিয়াছ। আমি দেখিব, কত কম দিয়া আমি পারি। তুমিও দেখিতে পার কত বেশী তুমি নিতে পার। অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় মুজুরী বা labour ও একটা বেচাকেনার জিনিষ হইয়াছে। সে সবের দর যেমন demand ও supply বা চাহিদা ও যোগানের অনুপাতে স্থির হইয়া থাকে, মুজুরীর দামও তাই হইবে। কাজে আমার যত লোক চাই, তার চেয়ে অনেক বেশী লোক যদি তোমরা কাজ নিতে আইস, তোমাদের কাজের দাম বা মুজুরীর হার স্বাভাবিক নিয়মেই কম হইবে। তাতে তোমাদের চলে না ? তা আমার কি ? ব্যবসায়ের সব চুক্তিতে 'fair field and no favour ! তোমরা পার, বেশী নেও। দুঃখ পাও, যদি পারি, দয়া যদি হয়, দানখয়রাৎ কিছু কখনও করিতে পারি। সে হইল আলাদা কথা। কিন্তু মুজুরীর হার কেন তার জন্য বেশী করিয়া দিব ? ইচ্ছা হয়, পোষায়, এস, কাজ কর। না পোষায়, আর যেখানে খুশী যাও, দেখ বেশী কোথাও পাও কি না।

কলকারখানা সব যখন প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল,— গৃহস্থেরা যখন নিরুপায় হইয়া কলের মুজুরী নিতে আসিল, স্বাধীন চুক্তি বা free contract নির্ম্মম এই demand ও supplyএর নিয়মেই হইত। দুর্ভাগ্যক্রমে ইয়োরোপে সর্ব্বত্রই প্রায় demand এর তুলনায় মুজুরের supply অনেক বেশী অর্থাৎ কাজে যত লোক লাগিত, তার চেয়ে অনেক বেশী লোক কাজের প্রার্থী হইয়া আসিত Contract নামে free বটে,—কিন্তু এক পক্ষ একেবারে নিরুপায়, আজ কিছু না পাইলে তাদের একেবারে অনাহারে থাকিতে হয়,—অপর পক্ষের সেরূপ দায় কিছু নাই। এ অবস্থায় দুর্ব্বল পক্ষ প্রবলের সঙ্গে ঠকিয়াই contract করিতে বাধ্য হয়। অল্প বেতনে কাজ নিলে তবু একবেলা আধ পেটাও সে খাইতে পাইবে। কিন্তু না নিলে, বেতন যাহা হ[উক] কিছু না পাইলে, তাকে যে একেবারেই উপবাসী থাকিতে হয়। সুতরাং অগত্যা একবেলার আধপেটা অন্নের সংস্থান তখন সে করিয়া নেয়, আর সেই রকমই একটা contract করে। অতি প্রবলে আর অতি দুর্ব্বলে free contract এইরূপই হইয়া থাকে। তখনকার প্রচলিত নীতি অনুসারে যে কোনও ব্যবসায়ে অবাধ অধিকার সকলের[ই] হইয়াছিল। আমার শক্তি আছে, ধন আছে, অমুক ব্যবসা[য়ে] যথেষ্ট লাভ হইতে পারে, কেন সে ব্যবসায় আমি অবলম্বন করিব না ? অন্য যারা সেই ব্যবসায় করিতেছে, তাদের ক্ষতি হইবে ? হউক, আমার কি ? তাদের ব্যবসায় ত আমি লাঠি মারিয়া ভাঙ্গিয়া দিতেছি না। আমার টাকার জোরে উন্নত প্রণালীতে সেই ব্যবসায় আমি করিব। অল্প ব্যয়ে, অ[ল্প] শ্রমে বহু দ্রব্য উৎপন্ন হইবে। দ্রব্য সুলভ হইবে, দেশ বিদেশে চালান যাইবে, বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, দেশে ধনাগম হইবে আরও কতও নূতন নূতন ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা হইবে। এ স[ব] ত উন্নতির কথা, দেশের মঙ্গলের কথা ! পুরাতন ছো[ট] ব্যবসায়ীদের ক্ষতি যদি হয়, সে আর কতটুকু ক্ষতি ? তাদে[র] দ্বারা দেশের ব্যবসায়ের উন্নতি, দেশের ধনবৃদ্ধি, এ সব ত তেমন কিছুই হইতেছে না। আর তারা পারে, আমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া আমারই মত কি আমার চেয়েও ভাল ব্যবসায়ই করুক না ? সে অধিকার ত তাদের আছেই।

হাঁ, অধিকার আছে—আইনে। কিন্তু আইন ক[ি] দুর্ব্বলকে প্রবলের সঙ্গে প্রতিযোগিতার শক্তি কিছু দিতে পারে না ? প্রবল জীবনের সকল ক্ষেত্রে সকল বৃত্তিতে অবাধ অধিকার পাইলে, দুর্ব্বলের সাধ্য আছে কোথাও মাথা তুলিয়া তার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইতে পারে ? এ অবস্থায় তার সব কাজে সমান অধিকার আছে, অবাধ প্রতিযোগিতা করিয়া সে উন্নতি লাভ করিতে পারে, এ সব কথা বলা তাকে বড় নিষ্ঠুর বিদ্রূপ করা বই আর কিছুই নহে। এমন হইলে

যা ঘটে, তাই ইয়োরোপে ঘটিয়াছে,—ধনী মহাজনগণ ক্রমে সকল ব্যবসায় এমন করিয়া দখল করিয়া ফেলিয়াছে যে, অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল দরিদ্র জনসাধারণ সকল স্বাধীনতা হারাইয়া—ইহাদের মুজুরী নিতে বাধ্য হইয়াছে। হাজার যোগ্যতা হাজার প্রতিভা থাকিলেও এই মুজুরী বই তাহাদের আর গতি নাই।

এই মুজুরীতে তাহারা কত খাটিয়া কি পাইবে, তাও নির্দ্ধারিত হইবে, স্বাধীন চুক্তিতে বা free contract এ তাহাতে তাহাদের ভাগ্য যে কিরূপ হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি।

Freedom of labour, freedom of competition free contract—ব্যবসায়ে ও জীবনের বৃত্তি নির্ব্বাচনে ব্যষ্টি মানবের স্বাধীনতার পূর্ণতা যত দূর হইতে পারে, তা এই কয়টি কথাতেই বেশ সূচিত হইতেছে। —এই স্বাধীনতার নীতি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যখন অনুসৃত হইল,—নীতির প্রবর্ত্তকগণ মনে করিয়াছিলেন, এই স্বাধীনতার অধিকার ভোগে পৃথিবীতে মানবের যত দূর সুখসচ্ছন্দতা হইবার তা হইবে!—কিন্তু ফলে দেখা গেল এই। ইহার অবশ্যম্ভাবী স্বাভাবিক পরিণতি যে ইহা! আর কি হইতে পারে?—পৃথিবীর বাঞ্ছিত ভোগ্য একস্থানে সঞ্চিত করিয়া রাখ,—সবল দুর্ব্বল, সাবালক নাবালক, সুস্থ রুগ্ন সকলকে বল ঐ ভোগ্যে তোমাদের সকলের সমান অধিকার আছে, কারও কোনও বাধা নাই, যে যা পার, নেও, ভোগ কর।—তখন সবল সাবালক সুস্থ যাহারা, দুর্ব্বল নাবালক ও রুগ্নকে ঠেলিয়া পিছনে ফেলিয়া সব গিয়া তারাই কাড়াকাড়ি করিয়া নিবে। দুর্ব্বলের, নাবালকের কি রুগ্নের ভাগ্যে কি মিলিবে? ভোগ্য বহিয়া ঘরে নিতে কি তাহা ভোগ করিতে ইহাদের সাহায্য যেটুকু নিতে হয়, প্রবলেরা তাই মাত্র নিবে, তাতে যৎসামান্য যা দিতে হয়, তাই মাত্র দুর্ব্বলকে দিবে।—মানব সমাজেরও মোটের উপর এই অবস্থা। সেখানে সবল আছে দুর্ব্বল আছে, সুস্থ আছে রুগ্ন আছে, সাবালক আছে নাবালক আছে। প্রবল যারা তাদের অত্যধিক লোভ ও স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াস হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিয়া রাখিতে হইবে। ধন যাহাতে আসে, জীবিকা যাহাতে নির্ব্বাহ হয়, অর্থাৎ জীবনের ব্যবসা বা বৃত্তির ক্ষেত্রে সকলেরই ইচ্ছামত, সাধ্যমত ও প্রয়োজন মত একটু নড়িবার চড়িবার অবসর রাখিতে হইবে। প্রবল যাহাতে দুর্ব্বলকে একেবারে কোণঠাসা করিয়া সব নিজরা দখল করিয়া রাখিতে পারে, এমন নীতি সুনীতি, সমীচীন নীতি, মঙ্গলের নীতি কখনও হইতে পারে না। কিন্তু সেই সুনীতি, সমীচীন নীতি ও মঙ্গলের নীতি—যাহাতে দুর্ব্বল একেবারে প্রবলের আর্থিক দাসে পরিণত না হইয়া যথাশক্তি স্বাধীনতা ও সচ্ছন্দতা কিছু ভোগ করিতে পারে, কে তার প্রবর্ত্তন করিবে? কার এ অধিকার আছে? সমস্যা ত এইখানে।

এই অবস্থার সমর্থনে এক গুরুগাত কেহ কেহ এই দেখাইয়া থাকেন, শক্তিমানের হাতে সব ব্যবসায় গিয়া ব্যবসায়ের বিপুল উন্নতি এখন হইয়াছে। দেশ বিদেশে ইয়োরোপের বাণিজ্য ছড়াইয়া পড়িয়াছে, দেশ বিদেশের ধন ইয়োরোপেই সব পুঞ্জীভূত হইতেছে।

ঠিক! দেশ বিদেশে যার ধন তার না থাকিয়া সব এক ইয়োরোপে গিয়া জমিতেছে, ইহা যদি পৃথিবীর পক্ষে মঙ্গলের অবস্থাই হয়, তবু ইয়োরোপে এই ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসারে এই আর্থিক উন্নতি কারা ভোগ করিতেছে? ধনী মহাজনগণ মাত্র, দরিদ্র জনসাধারণ নয়। বরং ধনী মহাজনগণের প্রভুত্ব উত্তরোত্তর এই ধন বৃদ্ধিতে আরও বাড়িতেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে এই সব নূতন নীতির প্রবর্ত্তনে এই ব্যবসায়িক যুগান্তর ইয়োরোপে আরম্ভ হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের মধ্যেই দরিদ্র জনসাধারণ অর্থাৎ মজুর সম্প্রদায় দুর্গতির চরম সীমায় গিয়া উপস্থিত হইল। প্রত্যহ ১২ ঘণ্টা ১৫ ঘণ্টা পর্য্যন্ত অবিরত কারখানায় খাটিয়া অথবা অনুরূপ মুজুরী নিয়া, স্ত্রী পুরুষ মজুরেরা যাহা উপার্জ্জন করিত, তাহাতে পুরাপেট অন্ন তাহাদের জুটিত না, দারুণ শীতে দেহ রক্ষার বস্ত্র তারা পাইত না, ব্যারাকের আলোকবিহীন অতি ছোট ছোট ঘরে কোনও মতে এক একটা পরিবার বাস করিত। বাস করিত না পশুপালের মত রুদ্ধ খোয়ারে থাকিত! দারুণ দারিদ্র্য, অশেষ ক্লেশ, শিশুদের প্রতিপালনও জনক জননীরা করিতে পারিত না। মরিয়া বাঁচিয়া কোনও মতে যারা বড় হইয়া উঠিত, তাদেরও নিয়তি একমাত্র এই কুলীর জীবন। সুখ কিছু নাই, সুখের কিছু আশাও নাই, অবসর সময় স্ত্রী পুরুষ সকলে মদ খাইয়া দুঃখ ভুলিয়া থাকিতে চাহিত। আর যত দুর্নীতি এই অবস্থায় মানব চরিত্রে ঘটিতে পারে, তাও বাকী

বড় থাকিত না :—দুঃখের দুর্দ্দশার আর অবনতির চরমে দরিদ্র মজুরের জীবন তখন গিয়া নামিয়াছিল।

এই সময়ে অর্থনীতি বা বৃত্তি শাস্ত্র যাহারা আলোচনা করিতেন, তাঁহারা দরিদ্রের এই দুঃখ যে না বুঝিতেন তা নয়। কিন্তু তাহাদের মত এই ছিল যে, ব্যবসায়ক্ষেত্রে সকল সম্বন্ধ স্বাভাবিক নিয়মে—মজুরী সম্বন্ধে demand ও sup,.lyএর নিয়মে যেমন—এইরূপ সব স্বাভাবিক নিয়মেই স্থির হওয়া সঙ্গত। গবর্ণমেণ্ট এই সব দুঃখ প্রতিকারের চেষ্টায় ব্যবসায়ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিলে ব্যবসায়ের স্বাভাবিক গতি ও পরিণতি ব্যাহত হইবে। মানবের স্বাধীনতা যেমন স্বাভাবিক, ব্যবসায় ক্ষেত্রে এই সব দুঃখও তেমনই স্বাভাবিক নিয়মেরই অবশ্যম্ভাবী ফল। আপাততঃ যে সব কারণে, যে সব নীতির ক্রিয়ায় দরিদ্র জনসাধারণের জীবনে এই সব দুঃখ দেখা দিয়াছে,—তাহা বেশীদিন থাকিবে না, এই সব স্বাভাবিক নীতির ক্রিয়াতেই যথাসময়ে ইহার প্রতিকার যতদূর হইতে পারে তা হইবে। গবর্ণমেণ্ট ইহার মধ্যে হস্তক্ষেপ করিলে, কৃত্রিম আইনে স্বাভাবিক নীতির ক্রিয়াকে বাধা দিতে চেষ্টা করিলে, ফল মোটের উপর মন্দ বই ভাল হইবে না। ব্যবসায় ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নীতি সমূহের ক্রিয়াই অবাধে চলিতে থাকুক, পরিণামে তাহাতেই মঙ্গল বেশী হইবে। Let well alone ফরাসী ভাষার কথায় laissez faire অর্থাৎ অবাধে আপনা হইতেই যাহা হইবে তাহাই ভাল,—খুব জোরে এই নীতির প্রচার তাঁহারা করিতেন। নীতির নামই হইল, doctrine of principle of laissez faire ইহারা যে সব যুক্তি দেখাইয়া laissez faire নীতির সমর্থন করিতেন,—তার আলোচনার মধ্যে যাইবার আবশ্যক আমাদের নাই। কারণ ইহা চলিতে পারে না। লোকের দুঃখ ইহাতে বাড়ে বই কমে না. এই মতই এখন সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে এবং এ নীতি ভুল বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। বলা বাহুল্য—রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের বাহিরে জীবনের আর সকল ক্ষেত্রে মানব সম্পূর্ণ স্বাধীন। স্বাধীন বিচারবুদ্ধিতে আপনার ভাল মন্দ বুঝিয়া স্বাধীন ভাবে সকল বিষয়ে চলিবার অধিকার তার আছে।—এই যে নীতিসূত্র তখন গৃহীত হইয়াছিল, doctrine of laissez faire ব্যবসায় ক্ষেত্রে তাহারই বিশিষ্ট রূপ।—গবর্ণমেণ্টও বহুদিন পর্য্যন্ত এই মতের অনুবর্ত্তন করিয়া চলিয়াছেন, প্রতিকারের কোনও চেষ্টা করেন নাই।

মহাজন মালিকরা সবই একেবারে স্বার্থান্ধ ও নির্দ্দয় ছিলেন, মজুরদের ভালর দিকে একেবারেই কেহ চাহিতেন না একথা বলিলে অন্যায় বলা হয়—মানব চরিত্রের উপরে বড় একটা কলঙ্ক আরোপ করা হয়। কোনও দেশের কোনও সম্প্রদায় সকলেই অতি লোভী ও নিষ্ঠুর, সুযোগ বুঝিয়া দুর্ব্বলকে পিষিয়া কড়ায় গণ্ডায় কেবলই পাওনা আদায় করে, কাহাকেও ছাড়িয়া কিছু দেয় না। এরূপ বড় দেখা যায় না। এমন মালিকও ছিলেন, যাহারা অধীন মজুরদের প্রতি সস্নেহ ব্যবহার করিতেন, তাহাদের দুঃখে সহানুভূতি দেখাইতেন, তাহারা একটু ভাল ভাবে থাকিয়া ক্রমে ভাল কাজ শিখিয়া, বেশী মজুরী পাইতে পারে তার জন্যও চেষ্টা করিতেন। কারণ মজুর ভাল হইলে ভাল কাজ করিতে পারিলে উৎপাদন বেশী হইবে, কারবারে লাভ বেশী আসিবে, এই লাভের দরুণ মজুরীর হারও কিছু বাড়ান যাইতে পারে। কেহ কেহ মজুরদের মোট লাভের একটা অংশও ভাগ করিয়া দিতেন। কিন্তু বলা বাহুল্য এরূপ সহৃদয় উন্নতচেতা মালিক বড় অধিক ছিল না। আর সাধারণ ভাবে মজুর সম্প্রদায়ই এত হীন অবস্থায় গিয়া পড়িয়াছিল, সামাজিক ভাবে পরস্পরের সঙ্গে তাদের এমনই একটা সংস্রব ও সম্বন্ধ ছিল, যে স্থান বা কারখানা বিশেষের দুই চারি দল মজুরের অপেক্ষাকৃত একটু উন্নত অবস্থা অনেক সময় স্থায়ী হইত না, আর প্রভাব অন্যান্য মজুর দলের উপরে বড় কিছু দেখা যাইত না। আর যাহাই এই সব সহৃদয় মালিকরা করুন, করুণা প্রণোদিত হইয়াই করিতেন,ব্যবসায়ের নীতিপদ্ধতিতে এমন কিছু ব্যবস্থা ছিল না যাহাতে স্বাধীন ভাবে কেহ কোনও রূপ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া আপনাদের বলেই সুখেস্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে। আগে তবু সহৃদয় মালিকদের অনুকম্পায় কোথাও কোথাও মজুরদের অবস্থা কিছু উন্নত দেখা যাইত,অপেক্ষাকৃত একটু সুখেও তারা থাকিত। মালিকে মজুরে সাক্ষাৎ ভাবে এইরূপ মনিব চাকরের সম্বন্ধ ক্রমেই এখন লোপ পাইয়া আসিতেছে। বড় বড় ব্যবসায় সব যৌথ বা joint stock corporation এর আকার ধারণ করিতেছে। এই সব corporationএর বড় বেশী ব্যাপকতা বহু শাখা দেশময় ছড়ান, লক্ষ লক্ষ লোক

কাজ করে,ইহারা সব বেতনভোগী কর্মচারীদের অধীন—মালিকের সঙ্গে সবারই ইহাদের দেখা হয় না—মজুরদেরত কথাই নাই। মনিবের তবু চাকরের উপর মমতা একটা থাকে,—কিন্তু a corp ration has no conscience, আধুনিক পাশ্চাত্য ব্যাবসায়ের এক নূতন পরিণতি। পরবর্ত্তী প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব। যাহাহউক, বড় দুর্গতিতেই সাধারণতঃ তারা ছিল, বড় দুঃখই পাইত। আর ইহাও তারা বুঝিত, নাগপাশে বাঁধা এই মুজুরীর জীবন হইতে তাহাদের অব্যাহতি কিছুতেই নাই!

পূর্ব্বে গৃহস্থশিল্পী আর তাদের এপ্রিণ্টিস্ ইহাদের আর্থিক অবস্থায় ও সামাজিক পদে পার্থক্য কিছুই একরকম ছিল না। এপ্রিণ্টিসরা জানিত, যে নিয়মের শাসনে তারা আজ এপ্রিণ্টিস্ আছে, কাল সেই নিয়মের শাসনেই মনিবের সঙ্গে সমান গৃহস্থ তারা হইবে, সমান অবস্থায় সমান পদমর্য্যাদা ভোগ করিবে। তখন মুজুরী যারা করিত, তাদের সঙ্গেও গৃহস্থ শিল্পীদের সঙ্গে বড় বেশী একটা পার্থক্য ছিল না। কারণ, ইহাদের পক্ষেও গৃহস্থশিল্পী হইয়া কোনও কোনও গিল্ডের মধ্যে স্থান গ্রহণ করিবার সুযোগ অনেক সময়ে ঘটিত। তার পর গৃহস্থরাও সব এত বড় বড় লোক ছিল না যে তাহাদের কাছে ইহারা একেবারে হীন ও অবজ্ঞাত হইয়া থাকিবে। আমাদের দেশেও আমরা দেখিতে পাই, কামার, কুমার মালাকার প্রভৃতি শিল্পীগৃহস্থ আর কৃষাণ ইহাদের মধ্যে অবস্থাগত কি পদগত বড় বেশী একটা পার্থক্য নাই।

কিন্তু এখন এই Inndustrial Revolution এর ফলে মালিকে আর মুজুরে বড় বেশী একটা আর্থিক ও সামাজিক বৈষম্য ঘটিয়া উঠিয়াছে; মহাজন মালিকরা সব এখন খুবই বড়লোক, প্রাসাদতুল্য বাটীতে অশেষ ঐশ্বর্য্য ভোগে জীবনযাপন করেন,—আর মুজুরেরা অতি দীন, অতি হীন, ইহাদের একরূপ দাসের ন্যায় যার পর নাই দুঃখে কালপাত করে। ইহারাই দেহপাত করিয়া খাটে, ইহাদের শ্রমজাত ধনে মালিকদের এই ঐশ্বর্য্য, এই সুখ, এই পদগৌরব,—আর তারা উদর পুরিয়া দুটি অন্ন পায় না, শীতে আচ্ছাদন পায় না, যে সব গৃহে বাসকরে তাহাকে গৃহ নামই দেওয়া যায় না। শিশু পুত্রকন্যাগণ, তাদের ক্ষুধায় অন্ন দিতে পারে না, রোগে ঔষধ দিতে পারে না, মাবাপ হইয়া সন্তানের মত তাদের পালন করিতে পারে না, শিক্ষা কিছু দিতে পারে না; উৎপাত করিলে, নিষ্ঠুর শত্রুর মত কেবল তাদের তাড়নাই করিতে হয়।

একদিকে সেই ঐশ্বর্য্য, সেই বিলাসভোগের কত আড়ম্বর, আবার তার পাশে পাশেই এত দুঃখ, এত দারিদ্র্য, এত হীনতা, এত মর্ম্ম-পীড়া! একি যেমন তেমন বৈষম্য! অন্যায় সামাজিক ব্যবস্থার যেমন তেমন পীড়ন? -তারা অবিরত পরিশ্রম করিয়াও এত দুঃখে আছে, আর তাদেরই শ্রমের ফলে মালিকরা ও মহাজনরা এত সুখ ভোগ করিতেছে। এই দারুণ বৈষম্যের পীড়ন যে কত বড় একটা অন্যায় পীড়ন, তাহাও তারা ক্রমে অনুভব করিয়া বড় চঞ্চল ও অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। তারা শুনিত সর্ব্বত্র সকল বিষয়ে সমান অধিকার তাদের আছে, রাষ্ট্রীয় মহাসভার প্রতিনিধিনির্ব্বাচনে বড়র সঙ্গে সমান ভোটও তারা দেয়,—অথচ তারা এত হীন, এত দীন আর তাদেরই শ্রমজাত ধনে মহাজনরা তাদের কত উপরে, কত সুখে আছে। ইহাতে এই অসন্তোষ, এ চাঞ্চল্য তাহাদের না হইবে কেন?

ক্রমে অনেক সহৃদয় ও সুশিক্ষিত ব্যক্তির দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। শ্রমজীবীদের দুর্গতির অবস্থা বর্ণনা করিয়া তাঁহারা পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই দুঃখের প্রতিকার যাহাতে হয় তার জন্যও আন্দোলন করিতে লাগিলেন। গবর্ণমেণ্ট প্রধান ভাবে মহাজন সম্প্রদায়ের আয়ত্ত হইলেও এই আন্দোলন তাঁহারা একেবারে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। প্রধান রাজপুরুষগণও বুঝিলেন, laissez faire নীতি চলিতে পারে না। ব্যবসায় বাণিজ্যের রীতিপদ্ধতির মধ্যে তাঁহাদের হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক। কারখানার মুজুরদের বড় বেশী সময় কাজ করিতে হয়, কারখানার কলসমূহ এমন ভাবে রাখা হয় ও চালান হয়, যাহাতে অবিরত দুর্ঘটনা ঘটে, অনেক কুলি মারা যায়, অনেকে বিকলাঙ্গ ও কর্ম্মে অক্ষম হইয়া অশেষ ক্লেশে পড়ে। স্ত্রীলোকেরা সারাদিন কলে কাজ করে, সন্তান পালন করিতে পারে না। বালকবালিকাও তেমনই সারাদিন কলে কাজ করে, তাদের শিক্ষার ব্যবস্থাও কিছু নাই। আর সকলেরই বেতন বড় অল্প। প্রথমে ইংলণ্ডে, তারপর অন্যান্য দেশেও এই সব দুরবস্থার প্রতিকার

কল্পে আইন হইতে লাগিল। Factory Laws নামে এই সব আইন পরিচিত। আইনে বেতনের হার বাড়ান হইল, কাজের সময় কমান হইল, স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাদের কাজের সময় এমন ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইল যাহাতে তাহাদের স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট না হয়; অন্য কাজের অবসর কিছু পায়; অতিরিক্ত কাজ কেহ কিছু স্বেচ্ছায় যদি করে, অতিরিক্ত মুজুরী তার জন্য পাইবে। কারখানা কলগুলি এমন ভাবে সুরক্ষিত অবস্থায় রাখিতে হইবে, যাহাতে দুর্ঘটনা কম ঘটে। ব্যারাকের ঘরগুলি ভাল করিতে হইবে। কুলি পরিবারের ছেলেপিলেদের শিক্ষার ব্যবস্থাও মালিকদের করিতে হইবে। ইত্যাদি।

কিন্তু কেবল আইনে যে সব দুঃখ লোকের সারে না, একথা বলাই বাহুল্য। যাহাই হউক, একটি কথা আমাদের এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে। যে সব সাম্য ও স্বাধীনতার নীতি অনুসরণের ফলে দরিদ্র জনসাধারণের এই অসহনীয় দুর্গতির অবস্থা ঘটিয়াছিল, তার প্রতিকারের উপায় করিতে হইল ঠিক সেই সব নীতির বিরোধী আইন করিয়া। এদিকে শ্রমজীবীরাও বুঝিতেছিল, এত অল্প বেতনে যে তারা মুজুরী করিতে বাধ্য হয়, এত খাটিতে হয়, এত দুঃখ পায়, তার কারণ চুক্তির সময় তেমন জোর দাবী তারা করিতে পারে না। জনে জনে গিয়া তারা মুজুরী নেয়,—কেহ এত অল্প বেতনে এত সময় খাটিতে না চাহিলে মালিকের কিছুই তাহাতে আসে যায় না। কারণ অনায়াসে অন্য লোক তাঁরা পান, মুজুরীর জন্য লোক চাহিলে লোকের অভাব হয় না। কিন্তু যদি তারা দল বাঁধিয়া এমন একটা ব্যবস্থা করিয়া নিতে পারে, ন্যায়মত যে দাবী তারা করিবে মালিকদের তাই দিতে হইবে, অন্য কোনও স্থান হইতে সস্তায় মুজুর তাঁহারা আনিতে পারিবেন না, কেহ আসিলেও কাজ করিতে তারা দিবে না, তবে সুবিধা হইতে পারে। এই ভাবে দল তারা বাঁধিতে আরম্ভ করিল। ধরুন ম্যাঞ্চেষ্টারের কোনও কাপড়ের কলে কুলীরা হপ্তায় পাঁচশিলিং করিয়া পায়, কিন্তু তাতে চলে না। এখন তারা জোট করিল, হপ্তায় সাত শিলিং-এর কমে তারা কাজ করিবে না। মালিকরা তা দিবেন না। কুলিরা ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ ছাড়িয়া দিল। বেশ ঠিক। ইহার কমে তাদের পোষায় না, কেন কাজ করিবে? মালিক অন্য কোথা হইতে হপ্তায় পাঁচশিলিং বেতনেই লোক আনিয়া কাজ চালাইতে পারেন। কিন্তু যদি তা করেন, তবে ইহাদের আর গতি কিছু থাকে না, না খাইয়া ইহারা মরে। বাহিরের লোক কেবল কেন, ঐ স্থানেরও অনেক লোক হয়ত ঐ পাঁচশিলিং বেতনেই কাজ করিতে প্রস্তুত। তাতেও কাজ কতক চলিতে পারে। যদি তা পারে, ক্রমে আরও লোক গিয়া জোটে, ধর্ম্মঘট বিফল হয়। যারা শক্ত হইয়া থাকে, তারাই শেষে পাথারে পড়ে। সুতরাং ধর্ম্মঘট সফল করিতে হইলে, ইহা নিতান্ত প্রয়োজন যে বহিরাগত বা স্থানীয় কোনও মুজুর গিয়া সেই কলে কাজ না করিতে পারে। অনেক সময় জবরদস্তী করিয়াও ইহাদের বাধা দিয়া রাখিতে হয়। ইহাতে ইহাদের স্বাধীনতায় আবার বাধা পড়ে। তারা যদি স্বেচ্ছায় অল্পবেতনে কাজ করিতে চায়, স্বেচ্ছায় তার চুক্তি কাহারও সঙ্গে করিয়া নেয়, অপরের তাহাতে জোর করিয়া বাধা দিবার কি অধিকার আছে? এই যুক্তি তুলিয়া কেহ কেহ এই চেষ্টার নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু না দিলেও ত চলে না। ধর্ম্মঘট যদি করিতে হয়, তবে তার সার্থকতা একটা চাই। ইহা ছাড়া সার্থকতাও ত হয় না। যারা কাজ বন্ধ করে, তারাই শেষে মরে। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা, তার কাছে এসব যুক্তির দোহাই চলে না। মুজুররা সর্ব্বত্রই দল বাঁধিতে আরম্ভ করিল, সহজে তাহাদের দাবী গ্রাহ্য না করিলে ধর্ম্মঘটও করিতে থাকিল।

কিন্তু এই সব ধর্ম্মঘটের দোষও অনেক আছে। অনেকস্থলে দাঙ্গাহাঙ্গামা ও শান্তিভঙ্গ ঘটে। সাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যবসায়ে ধর্ম্মঘট ঘটিলে, সর্ব্বসাধারণকেই অতি ক্লেশ অনেক সময় পাইতে হয়। তারপর মালিকরা যদি চাপিয়া বেশীদিন থাকিতে পারে, মুজুররাও বড় দুঃখ পায়। যে বেতন তারা পায়, তাতে কোনও মতে দিন গুজরান তাদের হয়। এই অবস্থায় দুই এক সপ্তাহও তাদের বসিয়া থাকিতে হইলে, একেবারেই তাদের সংসার অচল হইয়া পড়ে। এদিকে ধর্ম্মঘট যে ভাবেই হউক, মিটিয়া গেলে ধর্ম্মঘটে যে লোকসান তাহাদের হয়, বেশী মুজুরী যাহা দিতে হয়, তাহা মালিকরা উৎপাদিত দ্রব্যের দাম বাড়াইয়া পোষাইয়া নেন। ক্ষতি গিয়া পড়ে, সর্ব্বসাধারণের উপরে, যারা এই দ্রব্য ব্যবহার করে।

কিন্তু এ সব অসুবিধা সত্ত্বেও দল বাঁধিয়া উচ্চতর বেতন এবং অন্যান্য সুবিধা আদায় করিতে না পারিলে, মুজুরের পক্ষে তাহা পাওয়ার সুবিধা আর বড় কিছু হয় না। গবর্ণমেণ্টের কর্তৃত্ব প্রধানতঃ মহাজনদেরই হাতে, তাঁহারা যেখানে যতটুকুই প্রতিকারের চেষ্টা করুন, তেমন বড় একটা সুবিধা তাদের হয় না। অন্ততঃ নিজেদের জোরে দাবী করিতে পারিলে যত সুবিধা আদায় করিয়া নিতে পারে, গবর্ণমেণ্টের আইনে কিছু আর ততদূর হইতে পারে না। সুতরাং দল বাঁধা আর দলের জোর বাড়ানর দিকেই তারা মনোযোগী হইল। সর্ব্বত্র সকল শ্রেণীর মুজুরই এখন দল বাঁধিয়াছে, দাবীও তাদের বাড়িতেছে। ধর্ম্মঘট যাহাতে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে, তার জন্য নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া বড় বড় ফণ্ডও তারা করিয়াছে। অধুনা অতি ব্যাপক এবং বহুদিন স্থায়ী বড় বড় ধর্ম্মঘটের কথা আমরা শুনিতে পাই।

কতক গবর্ণমেণ্টের আইনে এবং কতক ধর্ম্মঘটের বলে মুজুরদের দুর্গতি অনেক কমিতেছে বটে, কিন্তু তারা যা চায়, যত চায়, তা এখনও পাইতেছে না। তা পাইলে অনেক স্থলে আবার মহাজন ও মালিকদেরও বড় ক্ষতি হইতে পারে। স্বার্থরক্ষার জন্য তারাও দল বাঁধিতেছেন। মুজুরে আর মহাজনে—Labourএ ও capitalএ পাশ্চাত্য জগৎ ভরিয়া ভীষণ এক সামাজিক সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। আবার মহাজনদের এ সব দল যে কেবল মুজুরদের বিরুদ্ধে স্বার্থ রক্ষার জন্য হইতেছে, তা নয়। ব্যবসায় ক্ষেত্রে যে প্রাধান্য তাঁহারা লাভ করিয়াছেন, সেই প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকে, আরও বাড়ে, নূতন প্রতিযোগীর আবির্ভাবে কোনওরূপ অসুবিধা তাঁহাদের না হয়, তার জন্যও তাঁহারা বিশেষ সচেষ্ট হইয়াছেন, কত কৌশল অবলম্বন করিতেছেন। ব্যবসায়গুলিও ক্রমে এত বড় হইয়া উঠিয়াছে, ব্যবসায়ীদের হাতে আর্থিক শক্তি এত বেশী গিয়া জমিতেছে যে, তারবলে সকলের সকল স্বাধীনতা, সকল উন্নতির প্রয়াস দমন করিয়া, তাঁহারাই সর্ব্বত্র একমাত্র প্রভু হইয়া উঠিতেছেন।

মুজুরদের সঙ্গে মহাজনদের বিরোধ, ব্যবসায় ক্ষেত্রে সকল দিকে মহাজনদের অপ্রতিবাধ্য প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস, ইহাতে সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে এমন বিষম এক সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে, তার ফলে এমন ভীষণ সমাজবিপ্লবের সূচনা দেখা যাইতেছে, যাহাতে সকলেই এখন সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। অথচ ইহার কি প্রতিকার যে হইতে পারে, কিসে এই সমস্যার সমাধান হইবে, তাহা কেহই বুঝিতে পারিতেছেন না।

এই সঙ্কটটা কিরূপ, ব্যবসায় বাণিজ্যের অবস্থা কি আকার এখন ধারণ করিয়াছে, তাহাতে কেবল শ্রমজীবীদের নয় সর্ব্বসাধারণেরই যে কি এক দারুণ ক্লেশকর অবস্থা আসিয়া পড়িয়াছে, আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধন, স্বাধীন কোনও বৃত্তি গ্রহণ, সাধারণ লোকের পক্ষে যে কিরূপ কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, আর তার পরিণাম যে কি হইতে পারে, এ সব কথাও ক্রমে একটু ভাল করিয়া আমাদের আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা বুঝিতে পারিব, পাশ্চাত্য সভ্যতা, পাশ্চাত্য সমাজ, তার সাম্য ও স্বাধীনতার নীতির অনুসরণে মঙ্গলে আসিয়া উপনীত হয় নাই। সমাজ-জীবনের পক্ষে এই সব নীতি সুনীতি, মঙ্গলের নীতি নহে। আরও বুঝিতে পারিব, হিন্দুর সমাজজীবনের নীতিতে এই সব কঠিন সমস্যার সমাধান কিছু আছে কিনা। (ক্রমশঃ)

"নিষ্কণ্টক"

(কর্সিকা দ্বীপের একটি গল্প।)

অত্যুচ্চ সিন্ধো পাহাড়ের একটা শীলাখণ্ডের উপর বালক ফার্ণাডো ঈগল পাখীটা কখন বাসা ছাড়িয়া উড়িয়া যাইবে সেই অপেক্ষায় বসিয়াছিল। পাখীটা উড়িয়া গেলেই ফার্ণাডো তাহার একটা ছানা লইয়া স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করিবে। কিন্তু ঈগল পাখীটার বাসা ছাড়িয়া যাইবার কোনও উদ্যোগ দেখা যাইতেছিল না। তবুও সে বসিয়াই

আছে। হঠাৎ অদূরে নিম্নে নারীকণ্ঠ শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল। এই দুর্গম নিবিড় অরণ্য মধ্যে স্ত্রীলোকের কণ্ঠধ্বনি কোথা হইতে আসিতেছে! ফার্ণাডোর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সে নীচের দিকে উন্মুখ হইয়া চাহিয়া দেখিল, এক অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতীর সম্মুখে এক প্রকাণ্ড বলিষ্ঠকায় পুরুষ দাঁড়াইয়া নাতিকোমলস্বরে বলিতেছিল, "এমিলা, আজও আসিয়াছি। বল আমার বাসনা পূর্ণ করিবে তো? এমিলা, তুমি আমার হইবে তো?"

অতি দৃপ্ত কণ্ঠে যুবতী বলিয়া উঠিল, "কখনো না।"

"এমিলা, এখনো ভাল চাও তো আমার প্রস্তাবে সম্মত হও। আমার অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হও। তোমাকে পার্থিব সকল সুখের ভাগী করিয়া রাখিব। তুমি আমার ঐশ্বর্য্যের বহর দেখিয়া আসিয়াছ। মনে ভাবিয়া দেখ সে কি সুখ। এমিলা, তোমাকে আমি আমার রাণীপদে অধিষ্ঠিতা করিয়া রাখিব; বল, এমিলা, আমার হইবে।"

আবার সেই উত্তর, "কখনো না।"

"এমিলা, তুমি মনে ভাবিয়াছ; আমার হাত হইতে তুমি নিষ্কৃতি পাইবে? এ কর্সিকা দ্বীপে এমন কে আছে যে, গ্যাডোর হাত হইতে তোমাকে রক্ষা করিবে?"

গ্যাডোর নাম শুনিয়া ফার্ণাডো কাঁপিয়া উঠিল। এই তবে দস্যুদলপতি দুর্জ্জয় গ্যাডো।

অনুনাসিক ধীর গর্ব্বিত কণ্ঠে যুবতী উত্তর করিল, "যিনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, যিনি দুর্ব্বলের বল, তিনি।"

"তবে তাই হউক" বলিয়া গ্যাডো খাপ হইতে তরবারি উন্মুক্ত করিল। যুবতী চোক বুজিয়া জানু পাতিয়া ঊর্দ্ধমুখ হইয়া যুক্তকরে বসিয়া পড়িল। দস্যুপতি ভাবিল, বুঝি এমিলা আত্মসমর্পণ করিয়াছে, সে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি এমিলা?"

যুবতী ধীর অবিকৃত স্বরে কহিল, "তোমার কার্য্য সমাধা কর।"

দস্যুপতি তাহার উন্মুক্ত তরবারি কোষবদ্ধ করিয়া বলিল, "শোন এমিলা, দস্যুর হৃদয়েও কোমলতার অভাব হয় না। আমি হত্যা করিবার জন্য তোমাকে এখানে আনি নাই। আজ দস্যুপতি গ্যাডো তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষী দাস। তোমার ঐ অপার্থিব রূপরাশি আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। আমি তিন দিন পরে আবার আসিব, তখন তোমার সম্মতি চাই। জানিও ধৈর্য্যের সীমা আছে; আমাকে হিংস্র করিয়া নিজের অমঙ্গল ডাকিয়া আনিও না।"

যুবতী বলিয়াছিল, "তিন দিন কেন, অনন্তকালের অপেক্ষায় থাকিলেও আমার ঐ একই উত্তর।"

"আচ্ছা তবুও দেখিব" বলিয়া সজোরে যুবতীকে পর্ব্বত গাত্রনির্ম্মিত গহ্বরে ঠেলিয়া দিয়া অর্গল বন্ধ করিয়া দিয়া এবং তাহার উপর কতকগুলি গাছ পালা রাখিয়া গ্যাডো ক্ষিপ্রগতিতে নামিয়া গেল।

দস্যু নিবিড় অরণ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলে ফার্ণাডো উঠিয়া দাঁড়াইল। সে প্রায় হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল, ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না কি করিবে। একবার ভাবিল, বাড়ী যাইয়া তাহার মাকে সমস্ত ব্যাপারটা বলে। তারপর ভাবিল, তাহার মা একা কি করিতে পারিবেন। অর্গাণ্ডো তাহার বড় ভাই, সেও তো বাড়ীতে নাই। আবার ভাবিল পুলিশে খবর দিবে। কিন্তু পুলিশ ষ্টেসনও সেখান হইতে প্রায় আট ক্রোশ দূরে। সম্মুখে অন্ধকার রাত্রি, সে কি করিয়া এই দীর্ঘ পথ চলিবে? তারপর ভাবিল, যদি পুলিশ আসিতে আসিতে যুবতীর অন্য কোন বিপদ ঘটে। ফার্ণাডো কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিল না, সে মনে মনে ভগবানকে অনুযোগ করিতেছিল—তিনি কেন তা'কে আর একটু "বড়" করেন নাই। ফার্ণাডো বড়ই অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। কিন্তু উপায় কি? নীচের দিকে চাহিয়া দেখিল, ক্ষেত্র সমূহের উপর আঁধার ঘিরিয়া আসিতেছে। সূর্য্যদেব তখন অস্তপারে দাঁড়াইয়া আসন্ন বিরহবিধুরা প্রকৃতিপ্রিয়াকে 'কল্যই ফিরিব' বলিয়া সান্ত্বনা দিতেছিলেন। ফার্ণাডো তাহার সকল দ্বিধা দূরে ঠেলিয়া বলিয়া উঠিল,—"না, আমি নিজেই দেখিব।" ফার্ণাডো যেখানে বসিয়াছিল সেখান হইতে গহ্বরের ব্যবধান প্রায় দেড় শত ফিট্ হইবে। অতি সাবধানে নামিয়া সে গহ্বরের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। একটু এদিক ওদিক চাহিয়া সে তাড়াতাড়ি গাছপালাগুলি সরাইয়া ফেলিল। ফার্ণাডো দেখিল, দু'খানা পাথর দ্বার গুহার দ্বার বন্ধ এবং তাহার উপর একটা কাঠের অর্গল পাহাড়ের গায়ে দু'টা গর্ত্তের মধ্যে নিবদ্ধ রহিয়াছে। অর্গলটাকে খুলিয়া ফেলিয়া সে একখানা পাথর ধরিয়া টান দিল, কিন্তু তাহাকে নাড়াইতে পারিল না। তারপর সে অর্গলটা লইয়া তাহা দ্বারা অনায়াসে সে পাথর দু'খানাকে

সরাইয়া ফেলিল। কার্ণাডো দেখিল, যুবতী ভূলুণ্ঠিতা হইয়া কাঁদিতেছে। পাথর সরাইবার শব্দ শুনিয়া যুবতী ঈষৎ চমকিয়া উঠিল, এবং কার্ণাডোকে সামনে দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি?" কার্ণাডোর মুখে শব্দ নাই, সে এমিলার প্রতি অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়াই রহিল। যুবতী উঠিয়া বসিল এবং আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি বালক?"

কার্ণাডোর চমক ভাঙ্গিল, সে বলিল,—

"আমি কার্ণাডো।"

"কে কার্ণাডো?"

"আমি পেল গ্যানেটোর ছেলে কার্ণাডো"

"কে সে গ্যানেটো, শয়তান গ্যাডোর অনুচর বুঝি?"

বালক দৃপ্তস্বরে বলিয়া উঠিল, "কখনো না। আমার বাবা ভদ্রলোক ছিলেন, এখন তিনি স্বর্গে আছেন।"

বালকের সতেজ সবল উত্তর শুনিয়া এমিলার বিস্ময় আরো বাড়িয়া উঠিল। সৌৎসুক্যে নম্রস্বরে সে জিজ্ঞাসা করিল, "বালক, তুমি এখানে কি ক'রে এলে? তুমি জানো যে, এটা দস্যুদলপতি গ্যাডোর গুপ্ত আড্ডা, তুমি এখানে কি করে এলে?"

"জানি। আমি ঐ উপর থেকে তার সঙ্গে তোমার সব কথা শুনেছি। গ্যাডোর হাতে তুমি কি করে বন্দী হ'লে? আমি দেখেছি সে তোমাকে বড়ই যন্ত্রণা দিচ্ছিল। কেন, তুমি তার কি করেছ? তুমি আমাদের—"

"বালক!"

"আমি বালক নই, জান আমার বয়স পনের বছর?"

এত দুঃখেও এমিলার হাসি আসিল।

"আচ্ছা বেশ। কার্ণাডো, সে সব তুমি কিছু বুঝবে না। আমি তার কিছু ক্ষতি করি নাই, তবুও সে আমাকে আজ সাতদিন যাবৎ বড়ই যন্ত্রণা দিচ্ছে, আমাকে আটকে রেখেছে। আমার পালাবারও উপায় নাই।"

"চল, তুমি আমাদের বাড়ী চল। তোমাকে দেখ্‌লে মা খুব সন্তুষ্ট হবেন; জান, আমার মা খুব ভাল মানুষ। ঠিক বাবার মত।"

"তোমাদের বাড়ী কতদূর?"

"বেশী দূর নয়, আর ক্রোশটাক্ হ'বে।"

"তোমার আর কে আছে?"

"সে সব কথা পরে জিজ্ঞাসা কর্‌লো। চল এখন, নইলে আবার কেউ এসে পড়বে। আর তা' ছাড়া দেখ অন্ধকারও হ'য়ে এলো, এ জঙ্গল ঠেলে বে'র হওয়াও মুস্কিল হ'বে।"

এমিলা একবার যুক্ত করে কম্পিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ভগবান্, তুমি আছ। চল কার্ণাডো, আমি তোমাদের বাড়ী যাব।"

অনাহারে বন্ধুর পথ চলিতে এমিলার বড়ই কষ্ট হইতেছিল। পাহাড়ের নীচে আসিয়া কতকদূর যাইয়া সে বসিয়া পড়িল।

"কার্ণাডো, আর আমি চল্‌তে পারছিনে। আমার হাত পা' ভেঙ্গে পড়ছে। পিপাসায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। আর পারি না।"

"কেন ঐ গুহার মধ্যে তো দেখ্‌লাম দুধ, রুটি সবই ছিল। তা' তুমি খাও নাই কেন? ও, বুঝেছি, ও সব গ্যাডোর দেওয়া ব'লে তুমি খাও নাই। তা' বেশ, তুমি একটু এখানে বসো; আমি চট্ করে ঐ নদী থেকে জল নিয়ে আস্‌ছি।"

উৎসাহোন্মত্ত কার্ণাডো আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিল। বালক বলিল, "তুমি না জিজ্ঞেস্ করছিলে আমার আর কে আছে?"

"হা, বল।"

"আমার মা আছেন, আমার দাদা আছেন, তাঁর নাম অর্লাণ্ডো, সে এক্সাসিরোতে এক বড় আপিসে চাকুরী করে, আর আমি। আমি যখন খুব ছোট্টটি ছিলাম তখন আমার বাবা স্বর্গে চলে গেলেন। আমাদের বাড়ীটা খুব ছোট্ট। মাত্র তিন খানা ঘর। একখানাতে আমি আর আমার মা থাকি, অন্য একখানা ঘরে থাকেন আমার দাদা যখন তিনি সহর থেকে ছুটী 'করতে' আসেন, আর একখানা ঘর বসবার ঘর। বারান্দায় আমরা খাওয়া দাওয়া করি। আমি একখানা ছোট্ট বাগান—এই আমাদের বাড়ীর রাস্তা। ঐ দেখ, মা বাতি হাতে করে রাস্তার দিকে আস্‌ছেন। মা হয়ত খুব ভাবছেন।"

এমিলা এতক্ষণ নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবিতেছিল। কোথাকার কে সে, আবার কাহার গলগ্রহ হইতে

চলিয়াছে। তাহার জন্ত আবার এই নিরীহ পরিবারেরও না জানি কত লাঞ্ছনা পাইতে হয়। তাহার একবার মনে হইতেছিল, কার্ণাডোর অজ্ঞাতে পালাইয়া অন্ধকারে মিশিয়া যায়। কার্ণাডো ছুটিয়া গিয়া মাতার হাত ধরিয়া বলিল, "মা, তুমি হয়ত আমার জন্ত খুব ভাবছিলে? এই দেখ আমি এসেছি, আমার কিছু হয় নাই। আর দেখ মা আমার সঙ্গে কে এসেছে।"

এমিলা সম্মুখীন হইয়া মিসেস্ গ্যানেটোকে অভিবাদন করিল। গ্যানেটো-পত্নী প্রত্যভিবাদন করিয়া বিস্মিত নেত্রে এমিলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কার্ণাডো তাহার মাকে বলিল, "মা, চল, তাড়াতাড়ি ঘরে চল, কয় দিন হ'লো ইনি কিছু খান নি! শীগ্‌গীর করে এঁকে কিছু খেতে দেও।" গ্যানেটো-পত্নী অগ্রসর হইয়া এমিলার হাত ধরিয়া বলিলেন,—"এস মা, এস।"

আহারান্তে এমিলা বসিবার ঘরে বসিয়া তাহার অদৃষ্টের কথাই ভাবিতেছিল। আর ভাবিতেছিল, তাহার বৃদ্ধ পিতার কথা। তিনি তাঁহাকে হারাইয়া বাঁচিয়া আছেন কি? তাহার নেত্র ভরিয়া অশ্রুরাশি উছলিয়া উঠিল। বহুক্ষণ ভাবিয়া সে অধীর হইয়া পড়িল। তাহার অবসন্ন দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। অসহায় শিশুর মত একটা সোফার উপর সে শুইয়া পড়িল।

কার্ণাডোর মুখে সমস্ত বিবরণ শুনিয়া গ্যানেটো-পত্নী বলিয়া উঠিলেন,—

"কার্ণাডো, তুমি করেছ কি? দস্যু গ্যাডোর গুপ্ত আড্ডায় গিয়ে এ যুবতীকে তুমি নিয়ে এসেছ? কার্ণাডো, তুমি কি ভয়ানক কাজ করেছ তুমি তা বুঝতে পারছ না। যদি গ্যাডো ঘুণাক্ষরেও একথা জান্‌তে পারে তবে কি আর কারো রক্ষা আছে? হায়, আমি কি করব!"

"মা, ভেবে দেখ ত একটা অসহায় মেয়ের উপর দুর্ব্বৃত্ত গ্যাডো অত্যাচার করছিল, তার অত্যাচারের হাত হ'তে আমি তাকে বাঁচিয়েছি! এতে কি কিছু খারাপ কাজ আমার হয়েছে?"

"নিশ্চয়ই না কার্ণাডো, তুমি অতি মহৎ কাজ করেছ। কিন্তু এর পরিণাম বড়ই ভয়ঙ্কর হ'তে পারে, সেই কথা ভেবেই আমি অস্থির হচ্ছি। আচ্ছা দেখি অর্লাণ্ডো বাড়ী আসুক, সে কি বলে, তুমি শোও গিয়ে, আমি তার অপেক্ষায় জেগে থাকব।"

"দাদা কি আজই আসবেন?"

"হাঁ, তা'দের নেপোলিয়ানের জন্মোৎসব উপলক্ষে দু'দিন ছুটি আছে।"

"তার এমিলা কোথায় শোবে?"

"আমাদের ঘরে ঐ ভিন্ন খাটের উপর তার শোবার ব্যবস্থা করেছি। যাও, তুমি তাকে নিয়ে শোও গিয়ে। আচ্ছা, চল, আমিও যাচ্ছি।"

মাতা পুত্র আসিয়া দেখিল, এমিলা সোফার উপর পড়িয়া নিদ্রা যাইতেছে। তাহার অসামান্ত রূপরাশি যেন উছলিয়া পড়িতেছিল। এমিলার নির্ম্মল মুখখানা গ্যানেটো-পত্নীর হৃদয়কে বড় সহজেই আকৃষ্ট করিয়া ফেলিল। কার্ণাডো বলিতেছিল,—

"মা, দেখ কি সুন্দর!"

"হাঁ, বাবা, এ যেন এ পৃথিবীর বলে মনে হয় না।"

মাতা পুত্রের আলাপে এমিলার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, চকিতা সে সোফার উপর উঠিয়া বসিল। মিসেস্ গ্যানেটো তাহাকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন, "শোবে এস।"

রাত্রি প্রায় একটার সময় অর্লাণ্ডো বাড়ী আসিল।

"অর্, তোমার খাবার কি দেব?"

"এক কাপ কফি দাও মা।"

অর্লাণ্ডো কফি পান করিতেছিল, মিসেস্ গ্যানেটো বলিলেন,—

"অর্, আজকার একটা ব্যাপারে আমার বড় ভয় হচ্ছে। না জানি অদৃষ্টে কি আছে।"

"কি মা?"

গ্যানেটো-পত্নী পুত্র সমক্ষে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। অর্লাণ্ডো ক্ষণেক চুপ থাকিয়া বলিল—

"যা' হয়েছে হয়েছে, তার আর এখন প্রতিকার কি হ'বে? হাঁ, এক কাজ কর, কাল নেপোলিয়ানের জন্ম উপলক্ষে ঝিটাকে এক সপ্তাহের ছুটি দেও, সে সেদিন ছুটিও চাচ্ছিল। তারপর দেখি ভেবে চিন্তে, যা' হয় করা যাবে। মোট কথা কেউ যেন কোন প্রকারে টের না পায় যে ও এখানে আছে। তাকে খুব আড়ালে রাখতে হ'বে।

কার্ণাডোকে আমি সাবধান করে দেব যেন কোন কথা বের না হয়।"

(২)

পরদিন প্রাতে পরিবারস্থ সকলেই চায়ের টেবিলে বসিয়াছে। মিসেস্ গ্যানেটো বলিলেন,—

"এমিলা, যদি অপরাধ না লও, তবে গোটা কতক কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি ?"

"অবশ্য, বলুন।"

"তুমি এমন বিপন্না কি করে হ'লে ?"

"মিসেস্ গ্যানেটো, আমি বড় অভাগী। এক বৃদ্ধ পিতা, ফিলি বার্টো ছাড়া আর আমার কেহই নাই। আমি যখন নিতান্ত শিশু, তখন আমার স্নেহময়ী জননী স্বর্গারোহণ করেন। তারপর আমি আমার পিতৃদেবের ক্রোড়েই পালিত হইয়াছি। বাবা এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন, রোজগার করিতে অক্ষম, আমি তাঁহাকে কায়ক্লেশে ভরণ পোষণ করিতেছিলাম।—আমার বিপদের কথা জানিতে চাহিতেছিলেন না ? আমার কর্ম্মস্থল হইতে আমাদের বাড়ী প্রায় দুই মাইল। আপিস হইতে বাসায় ফিরিতে প্রায়ই দেরী হইত ; ঘটনার দিনও তাহাই হইয়াছিল। আমাদের বাড়ী যাইবার একটা সোজা রাস্তা ছিল, সেটা একটা জঙ্গলের ধার দিয়ে। সন্ধ্যা তখন ৬।০টা, আমি অতি দ্রুত ফিরিতেছিলাম। হঠাৎ পিছনে যেন কাহার পায়ের শব্দ পাইলাম। ফিরিয়া চাহিলাম, কিন্তু কাহাকেও দেখিলাম না। আমার একটু ভয় করিতেছিল ; আরও একটু তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিলাম। পশ্চাতে আবার ঐ পদ শব্দ শুনিলাম। এবার ফিরিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা বলিতে, মিসেস্ গ্যানেটো, এখনো আমার দেহ কণ্টকিত হইতেছে ! আমি দেখিলাম, আমার সম্মুখে এক প্রকাণ্ডকায় বলিষ্ঠ পুরুষ, এক অদ্ভুত সাজ সজ্জায় সজ্জিত ; আমি ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িলাম। সে আমার একখানা হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "চিৎকার করো না,—তা হ'লে তোমার রক্ষা নাই।" আমি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলাম, 'কে তুমি অসহায়া নারীর পথ আগ্‌লাইয়া তাহার অমর্য্যাদা করিতেছ ?" কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই সে আমার মুখ চাপিয়া ধরিল ; তারপর আর কিছুই আমি জানিতে পারি নাই। আমার সংজ্ঞা লোপ হইয়া গিয়াছিল। যখন জ্ঞান হইল, তখন দেখি আমি একটা দিব্য সজ্জিত কক্ষে শুইয়া আছি। দস্যুপতি গ্যাডোর ঐ কক্ষ। চারদিন যাবৎ সে আমাকে অনেক প্রলোভন দেখাইয়া আমার পাণি প্রার্থনা করিল ; কিন্তু আমি তাহার বাসনা চরিতার্থ না করায় ঐ পাহাড়ের গুহায় আনিয়া আমাকে বন্ধ করিয়া রাখিল। গ্যাডো ভাবিয়াছিল, বুঝি যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া আমি তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইব। প্রথম দু'দিন বড়ই ভীতিবিহ্বল হইয়া নির্জ্জন পাহাড়ের গুহায় দিন কাটাইয়াছিলাম। ঐরূপ নির্জ্জন কারাবাস বড়ই দুঃসহ বোধ করিতেছিলাম ; কিন্তু সর্ব্বমঙ্গলময় পরমেশ্বরের চরণে আত্মোৎসর্গ করিয়া ভগবান্‌কে আকুল কণ্ঠে ডাকিয়াছিলাম, তাই বুঝি তিনি তাঁহার দূতস্বরূপ কার্ণাডোকে পাঠাইয়া আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন। মিসেস্ গ্যানেটো, আপনাদের কাছে যে আমি কি বলিয়া আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব তাহার ভাষা পাইতেছি না,—ভাষা আমার মূক হইয়া গিয়াছে ; মিসেস্ গ্যানেটো, আপনাদের দয়ার প্রতিদান দিতে পারি আমার এমন সাধ্য নাই।"

বলিতে বলিতে এমিলার চোক্ দুটি ছল ছল করিয়া উঠিল। তাহার হৃদয়ের দমিত উচ্ছ্বাস যেন তাহার কণ্ঠরোধ করিতেছিল। পরিবারস্থ সকলের চোখেই করুণার অশ্রুকণা দেখা যাইতেছিল ! গ্যানেটো-পত্নী বলিলেন, "থাক্ থাক্, আর কোন কথা বলিবার দরকার নাই। তারপর কি হয়েছে আমি সব শুনেছি। এমিলা, এসব কথা বলতে গিয়ে তোমার বড়ই কষ্ট হয়েছে ; আমাকে ক্ষমা করো।"

"মিসেস্ গ্যানেটো আর আমাকে লজ্জা দিবেন না। হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা যে না জানাতে পারে সে ত অকৃতজ্ঞ। কিন্তু আমি কি করে"——

"এমিলা, মানুষ মানুষের জন্য হয়েছে। এমন কি আমরা তোমার জন্য করেছি যার জন্য তুমি আমাদের কাছে কৃতজ্ঞ হচ্ছ ? তুমি গ্যাডোর হাত থেকে যে রক্ষা পেয়েছ এই আমাদের পরম তৃপ্তি।"

চায়ের টেবিল ছাড়িয়া অর্লাণ্ডো বসিবার ঘরে পায়চারি করিতেছিল। এমিলার রূপলাবণ্য দেখিয়া অর্লাণ্ডো তাহার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে যেন একটা অজানা হর্ষ, একটা অজানা অভাব, একটা অজানা বেদনা অনুভব করিতেছিল।

তাহার হৃদয়ের সুপ্ত তন্ত্রীগুলিতে যেন কি একটা মোহন মূর্চ্ছনা বাজিতেছিল। সে ভাবিতেছিল, কি উপায়ে ইহাকে রক্ষা করা যায়। যদি এ রত্ন ঘরে আসিয়াছে তবে কণ্ঠে দোলাইয়া তাহার গুণের সম্মান করিতে পারা যায় না কি? এমিলা ফার্ণাডোর পশ্চাতে আসিয়া বসিবার ঘরে বসিল। ফার্ণাডো তাহার বন্দুক লইয়া পাখী শিকার করিতে চলিয়া গেল। অর্লাণ্ডো তাহার চিন্তা স্রোতে বাধা পাইয়া যেন একটু চমকিয়া উঠিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে বলিল,—

"মিস্ বার্টো, তোমার কাহিনী শুনিয়া আমার বড়ই দুঃখ হইতেছে। যদি তোমার অনুমতি পাই তবে একবার তোমার বাড়ীর এবং তোমার বৃদ্ধ পিতার সংবাদ লইতে আমি চেষ্টা করিতাম।"

"বড় বাধিত হইলাম, মিঃ গ্যানেটো। এ অভাগীর জন্য তোমাদের যে আরো কত কষ্ট পেতে হবে ভগবান জানেন। পোটোভেক্কিয়ো সহরের উপকণ্ঠে আমাদের বাড়ী। মার্কী জঙ্গলের পার্শ্ববর্ত্তী রাস্তা ধরিয়া গেলে আমাদের বাড়ী অতি সহজেই পৌঁছা যায়। এক্সাসিয়ো হইতে যাইতে কিন্তু তোমার বড়ই কষ্ট—"

"ওঃ, কিছুই না। আমি অবশ্যই তোমাদের বাড়ীর খবর লইব। যতদিন না তোমাকে সেখানে পৌঁছাইবার সুবিধা হয়, আমার একান্ত অনুরোধ, তুমি এখানে থাক। দুর্বৃত্ত গ্যাডো এখানে তোমার সন্ধান পাইবে না ইহা নিশ্চিত।"

পরদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে এমিলা বসিবার ঘরে বসিয়াছিল; অর্লাণ্ডো বলিতেছিল,—

"মিস্ বার্টো, আজ রাত্রে আমি আমার কর্ম্মস্থলে ফিরে যাব। যত সত্বর হয় আমি তোমার বাবাকে খবর পাঠাব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

"কি আর বলব মিঃ গ্যানেটো। আমার বলবার আর কিছু নাই।"

"কিছু দরকারও নাই।"

অর্লাণ্ডোর মুখে যেন কি একটা উদ্বেগের ছায়া আসিয়া পড়িতেছিল। সে আর আপনাকে সংযত রাখিতে পারিতেছিল না; তাহার হৃদয়ের আবেগ যেন জোর করিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছিল, সে ভূমিকা না করিয়া এমিলার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিয়া ফেলিল,—

"এমিলা, আমি তোমায় ভালবাসিয়াছি।"

এমিলা চমকিয়া উঠিল। বিস্মিত দৃষ্টিতে সে অর্লাণ্ডোর দিকে তাকাইয়া রহিল; মুখে কিছু বলিতে পারিতেছিল না। অর্লাণ্ডো আবেগভরে এমিলার হাত দু'খানা ধরিয়া ফেলিল, তাহার ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতেছিল, চোখে একটা বড়ই করুণ ভাব দেখা গেল, সে আবার বলিল,—

"এমিলা, আমায় ক্ষমা কর, বড় হঠাৎ আমার হৃদয়ের গুপ্ত কথা বলিয়া তোমাকে ভীত করিয়াছি। এমিলা, আমি না বলিয়া থাকিতে পারিতেছিলাম না। এমিলা, বল, আমি তোমাকে পাইব।"

এমিলা ব্যস্ত ভাবে বলিয়া উঠিল, "না না; কি করে তা' হ'তে পারে?"

"কেন না?"

"মিঃ গ্যানেটো, তুমি আমাকে কতক্ষণ দেখিয়াছ? তুমি ত আমাকে ভাল করিয়া জানও না।"

"দরকারও নাই। এমিলা, হৃদয়ে হৃদয়ে পরিচয় এক মুহূর্ত্তেই হইয়া যায়! আমি যে মুহূর্ত্তে তোমাকে দেখিয়াছি, সেই মুহূর্ত্তেই তোমাকে ভালবাসিয়াছি। এমিলা, আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া আমার জীবনকে ব্যর্থ করিও না। আমি জানি আমার মধ্যে এমন কিছু নাই যাহার দাবীতে আমি তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষা করিতে পারি; কিন্তু তবুও আমার ধ্রুব বিশ্বাস আমি তোমাকে সুখে রাখিতে পারিব। এমিলা, এমিলা, বল, একটিবার বল, তুমি আমাকে গ্রহণ করিবে!"

এমিলার ললাটে স্বেদবিন্দু দেখা দিল। সে কেবল একটা শূন্যদৃষ্টিতে অর্লাণ্ডোর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার বাক্যস্ফুরণ হইতেছিল না। তাহার পাণ্ডুর মুখখানায় যেন আরো সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহার ওষ্ঠদ্বয়ে একটা উদ্বেগের রেখা প্রকটিত হইতেছিল। সে কেবল অপলক দৃষ্টিতে অর্লাণ্ডোর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; একটি কথাও বাহির হইল না। অর্লাণ্ডো বলিতেছিল,—

"এমিলা, প্রিয়ে আমার, আমি তোমাকে বড়ই ভীত করিয়াছি; আজ আর আমি কিছু বলিব না। সপ্তাহ পরে আমি আবার ফিরিয়া আসিব, আশা করি তখন তোমার সম্মতি পাইব। আমায় ক্ষমা করো।"

অর্লাণ্ডো ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। এমিলা একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া সোফার উপর ফেলিয়া পড়িল।

(৩)

আজ গ্যাড়োর গুপ্ত গুহায় আসিবার দিন। ফার্ণাডো আজ বড়ই অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। সে যে গুহার দ্বার বন্ধ করিয়া আসে নাই? অর্ণাণ্ডোও বাড়ী নাই; কাহার পরামর্শ সে লইবে? ভাবিল, একবার এমিলাকে জিজ্ঞাসা করে। তারপর ভাবিল, মিছামিছি তাহাকে ব্যস্ত করিয়া কি হইবে। আর কাল বিলম্ব না করিয়া সে পাহাড় অভিমুখে চলিল। যেখানে ঐদিন সে বসিয়াছিল সেখানে গিয়া উঠিয়া দেখিল, পাথর চুথণ্ড নীচে পড়িয়া আছে, গাছ পালাগুলি এদিক ওদিক ছড়ান রহিয়াছে। সাহসে ভর করিয়া দ্রুত নামিয়া গিয়া তাড়াতাড়ি গুহার দ্বার পূর্ব্ব মত বন্ধ করিয়া উপরে উঠিয়া দস্যুর আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। দেখিবে, গ্যাড়ো কি করে।

সূর্য্যাস্তের বড় বেশী বিলম্ব ছিল না। ফার্ণাডো ভাবিতেছিল, আজ আর গ্যাড়ো আসিল না। সহসা অরণ্যাভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়া গ্যাড়ো গুহার সম্মুখে দেখা দিল। ক্ষিপ্র হস্তে গুহার আবরণাদি সরাইয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল। এমিলা কোথায় গেল। গুহার মধ্যে এমিলাকে না দেখিয়া গ্যাড়ো ক্ষিপ্তের মত বাহির হইয়া আসিল। কপালে হাত দিয়া কি ভাবিল। তারপর ইতস্ততঃ কি খুঁজিয়া আবার জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। আবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরিয়া আসিল। উন্মত্ত গ্যাড়ো, দ্বারের পাথর চুথণ্ডকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দ্রুতপদে নামিয়া গেল। ফার্ণাডো গ্যাড়োর অবস্থা দেখিয়া হাসিতেছিল, আবার তাহার ভয়ও করিতেছিল, যদি দস্যু উপরে আসে। হঠাৎ কে তাহার পৃষ্ঠ স্পর্শ করিল। ফার্ণাডো চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—

"কে তুমি?"

আগন্তুক কহিল "তুমি কে বালক, এখানে কি করিতেছ?"

ফার্ণাডো দেখিল, আগন্তুক ভদ্র বেশী। ভাবিল এ ভদ্র বেশী লোকটিও কি তবে দস্যু? নচেৎ এখানে কেন? প্রত্যুত্তরে কহিল,—

"আমার নাম ফার্ণাডো' ঈগল পাখীর ছানা ধরিতে আসিয়াছি।"

নীচের দিকে কি দেখিতেছিলে?"

"ঐ লোকটাকে।"

"ও কে তুমি জান?"

"কি জানি?"

"শোন বালক, যাহাকে দেখিলে সে দস্যুদলপতি গ্যাড়ো। তুমি কি সাহসে উহার গুপ্ত গুহার উপরে বসিয়াছিলে; যদি ও টের পাইত তোমার কি অবস্থা হইত জান? তুমি কি প্রায়ই ঈগলের ছানা ধরিতে এসে থাক?"

"না, এই সবে দু'দিন। তুমি কে? তুমি কেন এখানে দাঁড়াইয়াছিলে? তুমিও বুঝি ওর দলের লোক?"

"না ফার্ণাডো। আমি আজ ছয়দিন যাবৎ উহারই সন্ধানে ফিরিতেছি। ঐ দস্যু আমার যথা সর্ব্বস্ব চুরি করিয়াছে। আমার এমিলাকে হরণ করিয়া কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছে। সেই সন্ধানে আমি উহার পশ্চাতে ফিরিতেছি।"

"এমিলা তোমার কে?"

"এমিলা আমার কে? ফার্ণাডো, এমিলা আমার সব। হায় বালক, আমি কেমন করিয়া বুঝাব এমিলা আমার কে?" আগন্তুকের নেত্রকোণে অশ্রুকণা দেখা দিল।

ফার্ণাডো বলিল, "ও, বুঝেছি। তা, গ্যাড়ো তোমার এমিলাকে চুরি করিল কেন?"

"আর কেন, তাহার পাপ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য।"

"এমিলার সন্ধান তুমি পাইলে?"

"না। ভাবিয়াছিলাম এই গুহার মধ্যে সে আছে। কিন্তু এখন দেখিলাম এখানে সে নাই। আমার মনে হয় এই গুহার মধ্যেই গ্যাড়ো তাহাকে আটকাইয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু আমি বুঝিলাম না, গ্যাড়ো এমন উন্মত্তের মত কেন গুহা হইতে বাহির হইয়া আসিল। দেখলে ঐ পাথর চুথণ্ডকে কেমন করিয়া ছুড়িয়া ফেলিল। আমার মনে হয়, কেহ এমিলাকে গুহার দ্বার খুলিয়া বাহির করিয়া দিয়াছে। হায় এমিলা! কত দুঃখ না জানি তোমার অদৃষ্টে আছে। তোমার দুঃখের কি আর শেষ নাই।"

"অস্থির হ'য়ো না। তোমার নামটি আমি জানতে পারি কি?"

"করেন।"

"বাড়ী কোথায় তোমার?"

"পোর্টভেক্লিয়ো সহরে। কেন ফার্ণাডো?"

আচ্ছা, আমার সঙ্গে এসো ; কিন্তু পথে আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করো না।"

"আচ্ছা তাই, চলো।"

রুবেন মন্ত্রমুগ্ধের মত কার্ণাডোর অনুগামী হইল। ফটকের কাছে আসিয়া কার্ণাডো বলিল,—"তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি আসছি।" কার্ণাডো বাড়ীতে ঢুকিয়া দেখিল, বসিবার ঘরে এমিলা একা আনতমুখে বসিয়া আছে। বোধ হয়, সে কাঁদিতেছিল ; ঘরের ক্ষীণ আলোকে কার্ণাডো তাহা দেখিতে পাইল না। সে এমিলার কাছে গিয়া নিম্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—

"এমিলা, রুবেন কে চেন ?"

রুবেনের নাম শুনিয়া এমিলা চমকিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কেন কার্ণাডো ? চিনি বৈ কি।"

পাশের ঘরের পর্দ্দাটা সরাইয়া কার্ণাডো কহিল, "তুমি এ ঘরে বসো।"

কোন কথা না বলিয়া এমিলা উঠিয়া গেল। কার্ণাডো বলিল, "বসিবার ঘরে যে আসিবে তা'কে দেখিও ত চেন কি না।"

কার্ণাডোর পশ্চাতে রুবেন আসিয়া ঘরে ঢুকিল। পর্দ্দার আড়াল হইতে রুবেনকে দেখিবা মাত্র এমিলা ছুটিয়া আসিয়া তাহার বুকের উপর পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "রুবেন।"

আদকণ্ঠে রুবেন ডাকিল, "এমিলা।"

(৪)

পরদিন সন্ধ্যার কিছু পর রুবেন ও এমিলা যখন গ্যানেটো পরিবারের কাছে বিদায় নিতেছিল, এমিলা কার্ণাডোকে বুকের কাছে টানিয়া নিয়া সাশ্রু নয়নে তাহার ললাট চুম্বন করিল। পোর্টভেক্কিয়োতে ফিরিয়া যাওয়া সম্বন্ধে একটা বিপদের সম্ভাবনা ছিল। গ্যাডো সেখানে এমিলার সন্ধান নিশ্চয়ই করিবে। অতঃপর পরামর্শ করিয়া ঠিক করিল, অন্যত্র যাইয়া বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকিবে। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের একখানা সুন্দর দ্বিতল বাড়ী ঠিক করা হইল। গ্যানেটোর বাড়ী হইতে দুই ক্রোশ দূরে এই গ্রাম।

এমিলা গ্যানেটো পরিবার ছাড়িয়া যাইবার তিন দিন পর কার্ণাডো এমিলার বাড়ীর কাছাকাছি শীকারে বাহির হইয়াছিল। রুবেন ও এমিলার কাছ থেকে যখন সে বিদায় নিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। ফটক পার হইয়া যখন কার্ণাডো কিয়দ্দূর রাস্তায় আসিয়াছে, তখন দেখিল, কে যেন জঙ্গলের অন্তরালে সরিয়া গেল। কার্ণাডোর কেমন একটা খট্‌কা লাগিল, সেও ফিরিয়া চুপি চুপি এমিলার ফটকের কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়াইল। সে দিন রবিবার। কার্ণাডো দেখিয়া আসিয়াছিল রুবেন ও এমিলা সান্ধ্য গির্জ্জার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, যদি তাহাদেরই কোন অনিষ্ট সাধন মানসে এ লোকটা লুকাইয়া থাকে এই ভাবিয়া কার্ণাডো এমিলার ফটকের কিয়দ্দূরে লুকাইয়া রহিল। ক্ষণেক পরেই এমিলা বাহির হইয়া আসিল, তাহার পশ্চাতে বাতি হস্তে রুবেন নির্গত হইল। লোকটা পা টিপিয়া টিপিয়া রুবেনের পশ্চাতে যাইতে লাগিল। তাহার হাতে এক প্রকাণ্ড ছোরা। কার্ণাডোর ধমনীর ভিতর রক্তপ্রবাহ চঞ্চল হইয়া উঠিল। পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া রুবেন যেমনি ফিরিয়া তাকাইয়াছে অমনি লোকটা তাহার বজ্রমুষ্টিতে ধৃত ছুরি রুবেনের বক্ষ লক্ষ্য করিয়া উত্তোলন করিল, কিন্তু রুবেনের বক্ষে ছুরি বসাইবার পূর্ব্বেই বন্দুকের গুলিতে গ্যাডোর মৃতদেহ ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। রুবেন বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল,—"কার্ণাডো, তুমি!"

(৫)

অর্লাণ্ডো বাড়ী আসিয়া সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া বজ্রাহতের মত বসিয়া পড়িল। এ কয় দিন সে কত আশাতেই না বুক বাঁধিয়াছে। তাহার সমস্ত আশাই কি পণ্ড হইয়া যাইবে ? অর্লাণ্ডো ভাবিতেছিল, কে এ রুবেন! এমিলা কি একবারও তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিবে না ? তাহার মত এমিলাকে কে অমন ভালবাসিতে পারে ? প্রেমিক মাত্রেরই এই রীতি, সে মনে করে, তাহার মত তাহার প্রেমিকাকে আর কেউ অত বেশী ভালবাসিতে পারে না। অর্লাণ্ডো তখন বুঝিতে পারিল, কেন এমিলা তাহার প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই, ঐ রুবেনের জন্যই ত বুঝি তাহাকে ফিরাইয়া দিয়াছে। কৈ, না,—এমিলা ত বলে নাই সে তাহাকে ভালবাসে না। সে ত স্পষ্ট করিয়া কিছুই বলে নাই। হইতে পারে রুবেন তাহার পূর্ব্ব পরিচিত, তাহাকে একদিন হয় ত এমিলা ভালবাসিয়াও ছিল, কিন্তু তাই বলিয়া অর্লাণ্ডোর

অবশ প্রাণভরা ভালবাসা এমিলা কি ফিরাইয়া দিবে? অত নিঠুর, অত অকৃতজ্ঞ কি এমিলা হইতে পারে! হায় প্রণয়ান্ধ অর্লাণ্ডো!

নিশ্চিন্ত এমিলা বাটীর প্রাঙ্গনে বেড়াইতেছিল। অর্লাণ্ডোকে ফটক পার হইতে দেখিয়া সস্মিত মুখে অগ্রসর হইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিল। মুগ্ধ অর্লাণ্ডো তাহার সমস্ত অবয়বে একটা স্পন্দন অনুভব করিতেছিল। উভয়ে ঘরের মধ্যে গিয়া বসিলে, হাসি মুখে এমিলা কহিল, "ফার্ণাডোর কাছে শুনলুম তুমি এসেছো।"

"ফার্ণাডো এখানে আজ এসেছিল?"

"হাঁ, এইমাত্র সে রুবেনের সঙ্গে বাইরে গেল।"

এমিলার মুখে রুবেনের নামটা অবাধ উচ্চারণে অর্লাণ্ডো বড় প্রীত হইল না। সে বলিতেছিল—

"মিস্ বার্টো, আমি আজ বড়ই দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি। সে দিন বাড়ী ফিরতে তোমার দেরী হওয়ায় তোমার বাবা নিজেই তোমাকে খুঁজিতে বে'র হন। অন্ধকার রাত্রিতে একটা হুঁচুট খেয়ে বৃদ্ধ—"

"হাঁ, আমি রুবেনের নিকট সব শুনিয়াছি।"

এমিলার চোখে অশ্রুরাশি উছলিয়া উঠিতেছিল। চোখের জল মুছিয়া বলিল—

"মিঃ গ্যানেটো, আপনার এই শ্রমের জন্য অশেষ ধন্যবাদ!" কতক্ষণ অবনত মুখে মৌন থাকিয়া এমিলার মুখের দিকে চাহিয়া অর্লাণ্ডো আবেগপূর্ণ কণ্ঠে ডাকিল, "এমিলা!" চকিত এমিলা নির্ব্বাক হইয়া অর্লাণ্ডোর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অর্লাণ্ডো বলিতেছিল—

"আমার প্রার্থনা কি মঞ্জুর হইল?"

"কিসের প্রার্থনা মিঃ গ্যানেটো?"

"মিঃ গ্যানেটো নয়, বল অর্লাণ্ডো। এমিলা, আমার অনুরোধ কি তুমি ভুলে গেলে?"

অর্লাণ্ডো এমিলার হাত দুখানা ধরিয়া ফেলিয়া আর্দ্র-স্বরে বলিল—"এমিলা, আর ত পারি না—"

"মিঃ গ্যানেটো, আমাকে ক্ষমা কর। আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারি এমন সাধ্য আমার নাই। বৎসরাধিক হইল আমি রুবেনের কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ।"

"রুবেন! কে সে এমিলা? তার তুলনায় আমি কি এতই হেয়?"

"তা কেন হবে? তবে, মিঃ গ্যানেটো আমি নিরুপায়।"

"তবে পুরস্কার স্বরূপ আজ তোমার অবজ্ঞাপূর্ণ প্রত্যাখ্যানই কি আমাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইবে?"

"আমি ত অবজ্ঞা কখনো দেখাই নাই। তবে—তবে—হয়ত আমি অকৃতজ্ঞ। কিন্তু একজনকে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া অন্য আর একজনকে কেমন করিয়া বরণ করিব?"

"এই তবে তোমার শেষ উত্তর?"

এমিলা একটা কাতর দৃষ্টিতে অর্লাণ্ডোর দিকে তাকাইয়া রহিল, মুখে তাহার একটিও শব্দ নাই। অর্লাণ্ডো "আচ্ছা বেশ" বলিয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রুবেন কর্ত্তৃক এমিলাকে লইয়া যাওয়ার সংবাদ শোনা অবধি অর্লাণ্ডোর যে একটা কেমন ভাব হইয়াছিল সেটা ফার্ণাডো লক্ষ্য করিয়াছিল। সন্দিহান ফার্ণাডো তাহার গতি বিধির উপরও একটা সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছিল। ভগ্ন-মনোরথ অর্লাণ্ডো এমিলার বাড়ী হইতে আসিয়া মনে মনে কত কি ভাবিতেছিল। তাহার মনের মধ্যে শয়তানরাজ অবিরত উঁকি ঝুঁকি মারিতেছিল; এক একটা অদম্য প্ররোচনায় তাহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছিল। অর্লাণ্ডো ভাবিল, গ্যাডোর নিষ্ফল চেষ্টায় তাহাকে কৃতকার্য্য হইতে হইবে।

যে দিন পার্থ ছাড়িয়া এমিলা ও রুবেনের পোর্টভেজিয়ো যাইবার কথা ছিল, সেদিন সকাল হইতেই অর্লাণ্ডোকে বাড়ীতে দেখা গেল না। অর্লাণ্ডো কোথায় গেল এই ভাবিয়া ফার্ণাডো বড়ই অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। এমিলার প্রতি তাহার একটা গাঢ় ভালবাসা জন্মিয়া গিয়াছিল; তাহার কোন বিপদ আশঙ্কা করিয়া ফার্ণাডো বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। সে ভাবিতেছিল, অর্লাণ্ডো এমিলার কোন নূতন বিপদ ঘটাইবে না ত? গ্যানেটো-কুলে কলঙ্ক মাখাইবে না ত? সে ভাবিতেছিল, যাহাদিগকে নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া উদ্ধার করিয়াছি, যাহাকে দস্যু উত্তোলিত ছুরিকাঘাত হইতে রক্ষা করিয়াছি, তাহার বিপদ ঘটাইবে কিনা শেষে আমারই ভাই! আমি প্রাণ থাকিতে ইহা হইতে দিব না; দেখি কি করিতে পারি।

গ্রামের সংকীর্ণ পথ ধরিয়া এমিলা ও রুবেনের চক্রযানখানা মন্থর গতিতে যাইতেছিল। রাস্তার দু'ধারে জঙ্গল, চক্রযান অতি কষ্টে পথ অতিক্রম করিতেছিল। হঠাৎ পার্শ্বস্থ জঙ্গল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চলন্ত-যান হইতে রুবেনকে কে পিছন হইতে সজোরে টানিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল। এমিলা সভয়ে ফিরিয়া দেখিল, আক্রমণকারী আর কেহই নহে, অর্লাণ্ডো। সে আর্ত্তস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল। ভূপতিত রুবেনের উপর অর্লাণ্ডো তাহার সুতীক্ষ্ণ ছোরা মারিল, চতুর রুবেন অনায়াসে অর্লাণ্ডোর হাত খানা ধরিয়া ফেলিলেন। রুবেন তাড়া তাড়ি উঠিতে যাইতেছিল। অর্লাণ্ডো হাত ছাড়াইয়া আবার দ্বিগুণ জোরে ছোরা উত্তোলন করিল, এবার আর রুবেন তাহার হস্ত ধরিতে পারিল না; সে তখনো অর্দ্ধশায়িত,—সহসা বন্দুকের শব্দে অরণ্য কম্পিত হইয়া উঠিল, আহত অর্লাণ্ডোর দেহ ছিন্ন বৃক্ষের মত ভূতলে পড়িয়া গেল। এমিলা চিৎকার করিয়া উঠিল, "একি! 'কার্ণাডো তুমি!" রোরুদ্যমান কার্ণাডো মৃত অর্লাণ্ডোর বুকের উপর লুটাইয়া পড়িয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "অর্লাণ্ডো, ভাই, যাও, ভাই, আজ তুমি পাপমুক্ত; —রুবেন, এমিলা আজ তোমরা নিষ্কণ্টক।"

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

অশ্রুমঞ্জু

[৫]

জীবনে যে সব চেয়ে প্রিয়, বেদনাটা যদি ঠিক তাহার নিকট হইতেই লাভ করা যায়, তাহা হইলে সেই বেদনার তীব্রতা যে কতখানি তাহা বুঝাইয়া দিবার অবকাশ যে বেদনা পায় তাহার মোটেই থাকে না। শুধু নীরব অভিমানে বেদনা বহন করিয়া যাইবার জন্যই সে একেবারে উন্মুখ হইয়া উঠে! আর যে বেদনা দেয়, সে দংশনকারী বিষধরের মতই, একটা তীব্রজ্বালায় শুধু অস্থির ও উগ্র হইয়াই উঠে এবং বারম্বার আঘাত করিয়া সেই জ্বালাটাকে শান্ত করিতে চাহে, কিন্তু তাহাতে জ্বালার নিবৃত্তি তো হয়ই না, শুধু বাড়িয়াই চলে।

বাহিরের বসিবার ঘর হইতে শৈলেশ যখন শয়নগৃহের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। শৈলেশ চৌকাঠ পার না হইয়াই মুখ বাড়াইয়া ঘরের ভিতরটা একবার দেখিয়া লইল।

স্তিমিত প্রদীপালোকে, ঘরের কতকটা অংশ দেখা যাইতেছিল। খাটানো মশারিটার ছায়া যে দিকে পড়িয়াছে, সেই অন্ধকার জায়গাটিতে, অন্যদিনের মতই আজও একটা পাটী বিছানো ছিল, কিন্তু সেই ভূশয্যার উপর প্রতিদিন যাহাকে পড়িয়া থাকিতে দেখা যাইত, শৈলেশ বারম্বার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়াও আজ আর তাহাকে সেখানটিতে দেখিতে পাইল না।

তখন সে বাহিরের বারান্দার রেলিং-এর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

ঠিক একখানি মণিমুক্তা-হীরক বিন্দুখচিত গাঢ় নীল চন্দ্রাতপের মতই, মাথার উপরকার নির্মেঘ নীলাকাশ অনন্ত নক্ষত্ররাজি খচিত হইয়া শোভা পাইতেছে।

ধনীর ক্ষুদ্র চঞ্চল দুলালীর মতই অশান্ত ধরণী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। চূর্ণ কুন্তলের মতই তাহার কাননকুন্তল একটু দুলাইয়া, একটু কাঁপাইয়া, শীতল বায়ুপ্রবাহ এই উচ্ছৃঙ্খল দুলালীর সর্ব্বাঙ্গের উপর দিয়া মৃদু সঞ্চারিত হইতেছিল।

কোনও দিকেই শৈলেশের দৃষ্টি ছিল না। আজ যে অবস্থাটাকে সে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইতে চলিয়াছে, শুধু তাহারই আলোচনা এতক্ষণ ধরিয়া তাহার মনের মধ্যে চলিতেছে। সতীশের কথাগুলি তখনও তাহার কাণের কাছে বাজিতেছিল।

নিজের খেয়ালবশে চলিতে যাইয়া এই যে তীব্র দুঃখ মানুষের অন্তরে দেওয়া, ইহার শেষফল যে কোনও কালেই ভাল হইতে দেখা যায় নাই, এ তথ্যটা সতীশ আজ তাহাকে বারবারই জানাইয়া দিয়াছে!

তর্কের মুখে শৈলেশ সতীশকে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে যতই চেষ্টা করিয়াছে, ততই ঐ কথাটার সত্যমূর্ত্তিটি তাহার অন্তরের কাছে অত্যন্ত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

কারণ তর্কের ফাঁকিতে মানুষ নিজের অন্তরটাকে কোনও দিনই তো ভুলাইতে পারে নাই। যেটা আসল কথা, যেটা ঠিক্ সত্য কথা, সেটাকে ধরিতে মানুষের এই বিচিত্র মনটার কোনও দিনই এতটুকুও বিলম্ব হয় না। সে তাহাকে মুখে উড়াইয়া দিতে চাহিলেও, অন্তরে অন্তরে ঠিকই চিনিয়া লয়, বরণ করিয়া লয়।

কিন্তু এত বুঝিয়াও মানুষ কি জিদ ছাড়িতে চায়, না পারে। জিদটা ছাড়ার মধ্যেই যে মানুষের সবল প্রকৃতির পরিচয়টা লুকাইয়া রহিয়াছে তাহা কোনও মতেই সে স্বীকার করিতে চাহে না।

সাধারণ মানুষ ঠিক ঐখানটাতেই চিরদিনই দুর্ব্বল রহিয়া গিয়াছে।

সতীশের সঙ্গে তর্কে শৈলেশ যতই নিজের অন্যায়টা বুঝিতে পারিতেছিল, ততই সে উগ্র হইয়া উঠিয়া নিজের দুর্ব্বলতটাকে দুইহাতে ঢাকিয়া চাপিয়া রাখিতেছিল। যখন সে ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া আসিল, তখন সে নিঃসন্দেহেই বুঝিতে পারিল যে সতীশের সঙ্গে এ তর্কযুদ্ধে পরাজয়ের কলঙ্ক তো সে সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া আসিলই, বেশীর ভাগে তাহার বুকের ভিতরটাও একেবারেই ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু শুধু সাধারণ মানুষ কোনও দিনই ঠিক এইখান হইতে ফিরিতে চাহিলেও তাহা পারে নাই। যে পারিয়াছে, সে অনেকখানি ভুলভ্রান্তির হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে। যে পারে নাই, সে ডুবিয়াছে এবং তাহার যুক্তি শেষটা শুধু এই দুইটা কথার মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যায় যে, যদি নামিয়াছি, পাতাল কতদূর একবার দেখিব।

শৈলেশও ঠিক্ এই যুক্তিরই আশ্রয় গ্রহণ করিল।

কিন্তু তাহাতেই কি তাহার চিত্তের শান্তি ফিরিয়া আসিল? সে আঘাত করিবার জন্যই উগ্র হইয়া উঠিয়াছে,— কিন্তু আঘাতের জ্বালাটা যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া, আঘাত-কারীকেও ভাগ করিয়া লইতে হয়, এটা সে সব চেয়ে বেশী করিয়া আজই অনুভব করিল।

বাহিরের শীতল নৈশ বায়ু তাহার উত্তপ্ত ললাটের উপর স্পর্শ দিয়া যখন তাহার দারুণ দাহটাকে মোটেই অপহরণ করিয়া লইতে পারিল না, তখন সে সকল দ্বিধা ও সঙ্কোচের বাধা কাটাইয়া হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

ঘরের আলোটা নিস্তেজ করিয়া দিয়া প্রতিমা ছোট জানালাটার কাছেই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

শৈলেশের পায়ের শব্দ শুনিয়া সে ফিরিয়া চাহিল না।

কিন্তু শৈলেশ যখন তাহার গুছানো সাজানো ট্রাঙ্কটা টানিয়া নামাইয়া অনর্থক সমস্ত জিনিষপত্রগুলি ওলট্ পালট্ করিতে বসিয়া গেল, তখন প্রতিমার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, ঐ নিষ্ঠুর লোকটার বুকের ভিতরটায় কোথায় এখনও একটু 'কাঁচা' রহিয়াছে, এবং সেই জন্যই আজ সে অন্যদিনের মতই সোজাসুজি যাইয়া শয্যাগ্রহণ করিতে পারিল না। শুধু কাজের অছিলায় জাগিয়া থাকিয়া কিছু সময় কাটাইয়া দিতে চাহিতেছে।

কিন্তু এই ব্যাপারটার মধ্যে কোথায়ও প্রতিমার স্থান আছে কি না বিবাহের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত এই দুর্ব্বোধ্য লোকটার সমস্ত ব্যবহারগুলি আগাগোড়া মিলাইয়া লইয়াও প্রতিমা তাহা ধরিতে পারিল না।

সুতরাং সে জানালার অস্পষ্ট আলোকের মধ্যে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, মাঝে একবার শুধু চকিত দৃষ্টিতে সমস্ত ব্যাপারটা দেখিয়া লইল।

হঠাৎ একটু অস্ফুটকণ্ঠে শৈলেশ বলিয়া উঠিল, 'আমার ছবিখানা কি হয়ে গেল?"

ঘরের মধ্যের উপস্থিত দ্বিতীয় প্রাণীটিকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতেই হইবে এটা সুস্পষ্টই যখন বুঝা গেল, তখনও প্রতিমা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াই রহিল।

ছবি খুঁজিয়া না পাইয়া হয়তো নিজের মনেই শৈলেশ ওকথাটা বলিয়া থাকিবে, তাই প্রথমটাই নিজেকে ধরা দিবার ইচ্ছা প্রতিমার ছিল না।

কিন্তু ছবি কোথায় গেল, সে খবরটা প্রতিমার কিছু জানা ছিল বলিয়াই, সে অনেকখানি আড়ষ্ট হইয়া পড়িল। গুছানো ট্রাঙ্কটার নীচ হইতে অপহৃত ছবির খোঁজ যে ঠিক্ এই মুহূর্ত্তেই পড়িয়া যাইবে, প্রতিমা তাহা স্বপ্নেও মনে করিতে পারে নাই। 'এখনি যে এ বিষয়ে একটা উত্তর প্রত্যুত্তর চলিতে পারে, সে জন্য সে প্রস্তুত ছিল না।

তাই শৈলেশের মুখে ছবির সম্বন্ধে প্রশ্ন শুনিয়া সে অনেক-খানি দমিয়া গেল।

ট্রাঙ্কের জামা কাপড়গুলি আর একবার পাঁতি পাঁতি করিয়া খুঁজিয়া দেখিয়া শৈলেশ কহিল, "বাঃ, আমার ছবি?" এবং ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সে যে জানালার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল, প্রতিমা ঘাড় ফিরাইতেই তাহা দেখিয়া ফেলিল।

আজ পূর্ব্ব হইতেই প্রতিমা শৈলেশের সঙ্গে কিছু বোঝা-পড়া করিয়া লইবে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু যে লোক ঘরে আসিয়া কোনও দিনই কিছু ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে না, তাহার কাছে কেমন করিয়া লজ্জাহীনার মত প্রথমটাই তাহার দাবীর আরজি নিয়া উপস্থিত হইবে তাহা বুঝিতেই পারিতেছিল না।

কিন্তু ছবির কথার উত্তর যখন তাহার কাছে আজ বিশেষ করিয়াই চাওয়া হইতেছে, তখন সে আর একটুও দ্বিধা বা সঙ্কোচ না রাখিয়া একেবারে ঘরের মধ্যে ট্রাঙ্কের পাশেই আসিয়া দাঁড়াইল।

শৈলেশ চক্ষু তুলিয়া চাহিতেই কহিল, "কিছু বললে আমাকে?"

শৈলেশ বিস্মিত দৃষ্টিতে প্রতিমার মুখের দিকে মুহূর্ত্তের জন্য চাহিয়া রহিল; তারপরই কি ভাবিয়া বিশৃঙ্খল জামা কাপড়গুলির দিকে চক্ষু নামাইয়া সহসা ধীরে কহিল, "হাঁ, আমার ছবিখানার কথা জিজ্ঞেস করছিলাম।"

"কোন ছবিখানা?"—ছবিখানার নিন্দা প্রতিমার কাছে দেওয়া যে শৈলেশের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব তাহা প্রতিমা বেশ জানিত।

তবু আজ সে যেহেতু নিজের দাবী ও অধিকারের হিসাবটা শৈলেশকে জানাইয়া দিবার অসম্ভব কল্পনা কতবারই মনের মধ্যে আনিয়াছিল, তাই এ মুহূর্ত্তে কোনও দিক দিয়াই শৈলেশকে ক্ষমা করিবার প্রবৃত্তি তাহার ছিল না।

প্রতিমার কথা শুনিয়া শৈলেশের অজ্ঞাতে কখন যে তাহার বুকের বোঝাটা অনেকখানি নামিয়া গিয়াছে তাহা সে যেমন বুঝিতে পারিল না, তেমনি এই কথাটাও বার-বার মনে করিয়া সে নিশ্চিন্ত হইয়া উঠিতে পারিল না, যে, যাহাকে আঘাত করিবার জন্য সে এতই আয়োজন করিয়া তুলিয়াছে, এমন করিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে, তাহার সঙ্গে এমন সহজ সরল ভঙ্গিতে কথা আরম্ভ হইয়া গেল কেমন করিয়া?

মেঘাবৃত অন্ধকার রাত্রিতে কালো আকাশের গায়ে বিদ্যুতের নিকষরেখার মতই হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, যে, এই মেয়েটি কোনও দিনই তো তাহার কাছে এতটুকু দুর্ব্বলতা প্রকাশ করে নাই, চোখের জলে তাহার মিনতি জানায় নাই, নিজের অধিকার কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া পাইবার জন্য কোনও সময়েই চেষ্টা করে নাই, অথচ বাড়ীর প্রত্যেকের নিকট হইতেই সে বিপুল স্নেহ অর্জ্জন করিয়াছে, সমস্ত সংসারটার কাজকর্ম্ম তাহাকে বাদ দিয়া একটি দিনও যে চলিতে পারে না তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে যে দুর্ভেদ্য সহস্রযোজনের ব্যবধান স্বেচ্ছায় গড়িয়া সে তুলিয়াছে, তাহা শুধু এই ক্ষুদ্র শয়নগৃহটির চারটি দেওয়ালের মধ্যেই আবদ্ধ রহিয়াছে, এই অদ্ভুত প্রকৃতির মেয়েটি সে খবরটা বাহিরে কাহারও কাছেই তো লইয়া যায় নাই।

তবু এই মেয়েটির কাছেই যে সে কি পাইতে পারিত না পারিত তাহার সংবাদটাও তো শৈলেশ এই সুদীর্ঘ চারিটি বৎসরের মধ্যে একদিনও লইতে চাহে নাই।

যাহাকে আঘাত করা যায়, সে কতখানি বেদনা পাইল, আঘাতকারীর সে খবরটা জানিবার জন্যও একটা প্রবল স্পৃহা থাকে। এবং এই স্পৃহাটার মধ্যে একটা যে জ্বালা আছে তাহা আঘাতকারী তৃপ্তির হিসাবেই গ্রহণ করিতে চাহে।

কিন্তু যে আঘাত পায় সে যখন, তাহার বেদনা-বিকৃত মুখের করুণ ছায়াটিও রাখিয়া চলিয়া যায়, তখন ঐ তৃপ্তিটা তীব্র জ্বালার আকারেই দেখা দেয়।—উহার মধ্যে আর আনন্দ বা তৃপ্তি কিছুই থাকে না।

কিন্তু আঘাত পাইয়াও যে মুখ বিকৃত করে না এবং বেদনাবোধের শক্তি তাহার যে প্রচুরই আছে, সে খবরটা একেবারেই জানিতে দিতে চাহে না, এমন অদ্ভুত-প্রকৃতির জীবের উপর আঘাতকারীর করুণা তো হয়ই না, বরং তাহার বেদনাবোধের পরিচয় পাইবার জন্য নিষ্ফল আক্রোশে ক্রমাগতই সে তাহাকে আঘাত করিতে থাকে।

এবং প্রবল পক্ষের এই আঘাত দেওয়ার শেষ ঠিক তখনই হইয়া যায়, যখন দুর্বল তাহার অধিকার বুঝিয়া পাইবার জন্য দুর্বার শক্তিতে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, অথবা একেবারেই নিষ্পিষ্ট হইয়া ধুলায় মিশাইয়া নিজের অস্তিত্বের চিহ্নটুকুও লোপ করিয়া দেয়।

শৈলেশ চিরদিনই প্রতিমাকে উপেক্ষাদ্বারা আঘাত করিয়া আসিতেছে, প্রতিমা অবিকৃতমুখে নীরবে তাহা সহ্যই করিয়াছে। কোনও দিনই নিজের অধিকার চাহে নাই, দাবী জানায় নাই; তাহার ন্যায্য প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করিয়া বুঝিয়া পাইবার জন্য বিদ্রোহ করে নাই।

শুধু তাহার শান্ত দুইটি চক্ষুর দৃষ্টি উৎসারিত করিয়া একবার হয়তো স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়াছে এবং মুহূর্ত্ত পরেই দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়াছে।

কিন্তু সে দৃষ্টি বিশ্লেষণ করিয়া মর্ম্ম শৈলেশ এতটুকু কাকুতি খুঁজিয়া পায় নাই, মিনতির চিহ্ন দেখে নাই, কাতরতার লেশ অনুভব করে নাই।

শৈলেশ মনে করিয়াছে, এ প্রাণহীন পাষাণ প্রতিমা, ইহাকে লইয়া দিন কাটিতে পারে না, সংসার রচনা চলিলেও, অন্তরের দারুণ ক্ষুধার তৃপ্তি ইহার কাছে মিলিতে পারে না।

সুতরাং প্রতিমা শৈলেশের কাছে অপরাধই রহিয়া গেল। এবং তাহার আঘাতের চরমসীমার জন্য ক্রমাগত অগ্রসর হইয়াই চলিল।

এমনটাই ঘটিয়া থাকে। দুনিয়ার ইতিহাসে, জাতির সংঘর্ষে ইহার পরিচয় মিলে। ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বন্দ্বেও ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

শৈলেশ যখন কোনও কথা না বলিয়া নতমুখে জামা কাপড়গুলি অনর্থক নাড়িতেই থাকিল, তখন প্রতিমা ধীরে ধীরে কহিল, "একখানা ছবি আমি বের করে নিয়েছি। বোধ হয় ভুলে বাক্সে রেখেছিলে, সেখানা নিশ্চয়ই খুঁজচ না।" শেষের কথাগুলি প্রতিমা অত্যন্ত মৃদুস্বরেই কহিল, কারণ কথা বলিতে যাইয়া যদি গলার স্বরটা হঠাৎ ধরিয়া আইসে, তাহা হইলে আজ যেমন লজ্জারও পরিসীমা থাকিবে না, তেমনই সে এই কাঙ্গালপনার জন্য নিজেকেও কোনও মতেই ক্ষমা করিতে পারিবে না।

কিন্তু কথাগুলি অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলিলেও উহার মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ হুল ছিল, যাহা শৈলেশকে বিঁধিল। সে ভিতরে উগ্র হইয়া উঠিল ও শান্তকণ্ঠে কহিল, "সেইখানাই খুঁজচি। কেন বাক্স থেকে বের করে নিলে?"

প্রতিমার মনে হইল, আজ স্বামীর কণ্ঠস্বরের মধ্যে যতটুকু কোমলতা সে পাইল এমনটা তো আর কোনও দিনই পায় নাই। সে যে ঐ ছবিখানাই কেন আজ বাহির করিয়া নিয়াছে তাহার ঠিক্ কারণটা শৈলেশের পায়ের উপর বারবার মাথা খুঁড়িয়া জানাইয়া দিতে ইচ্ছা হইতেছিল। কিন্তু তাহা বলিতে যাওয়া যে কতখানি অশোভন হইবে তাহাও যেমন সে জানিত, তেমনই সে ভিতরে ভিতরে ইহাও বুঝিয়াছিল যে, ঐ কোমলতাটুকু, শিকারের প্রতি শিকারীর ক্ষণিক অনুকম্পার মতই অর্থহীন ও ক্ষণস্থায়ী।

কিন্তু তবু হঠাৎ প্রতিমার মুখ দিয়া যখন বাহির হইয়া গেল, "ওখানা বাক্সে যাবার তো কোনও দরকার দেখি না"—তখন সত্যই সে একেবারে এতটুকু হইয়া গেল।

শৈলেশ উগ্র হইয়া উঠিয়া বিরক্তিপূর্ণ স্বরে কহিল, "তোমার নিজের দরকার অদরকার নিয়েই তো দুনিয়ার সব ব্যাপারের মীমাংসা হবে না।"

প্রতিমার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। তবু কোনও মতে কহিল, "তা জানি, কিন্তু"—

কথা শেষ করিবার পূর্ব্বেই শৈলেশ কহিল, "এর মাঝে আর কিন্তু নেই, আমার ছবি দাও"—কিন্তু কথাটা এমনি রূঢ় শুনাইল যে, শৈলেশও বলিয়া ফেলিয়াই একেবারে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

একটা কান্নার উচ্ছ্বাস প্রতিমার বুকের মধ্যে গুমরিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু আজও সে কোনও মতেই কাঁদিয়া কাঙ্গালপনা দেখাইতে রাজী নহে, তাই কম্পিত অধরপুট সযত্নে দাঁতে চাপিয়া একটুখানি চুপ করিয়া রহিল। তার পর ধীরে ধীরে কহিল, "ছবি আমি দিচ্ছি, যেটুকুতে আমার দরকার থাকতে পারে, সেটুকু তুমি দাবীও করতে পার না এবং তা পাবেও না।"

প্রতিমার কথা শুনিয়া শৈলেশ বিস্মিতদৃষ্টিতে মুখের দিকে চাহিতেই তাহার নিবিড় কালো চক্ষু দুইটার উপর দৃষ্টি পড়িল। দুইটি চক্ষুর দৃষ্টিই হঠাৎ দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই আশ্রয়হীনের চকিত অসহায় দৃষ্টির সমস্ত

বেদনাটুকুই প্রতিমার অশ্রুসিক্ত দুই চক্ষের মধ্যে ফুটিয়া উঠিল।

—"এর আর অর্থ কি? অপদার্থ মেয়েমানুষ গুলির মান অপমান তোমাদের হাতে দেওয়া রয়েছে বলেই যে তোমরা মান দিতে পার আর নাই পার, সময়ে অসময়ে অপমান করবে সেটাতো ঠিক্ নয়। তোমরা মান না হয় নাই দিলে, কিন্তু অপমানের হাতথেকেও কি রক্ষা করবে না?"

তিন দিন হইতে কত কথাইতো প্রতিমার বুকের মধ্যে জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছিল, আজ একটু আঘাত পাইতেই সেগুলি বাধামুক্ত জলরাশির মতই বাহির হইয়া আসিতে চাহিল।

কিন্তু পোড়া চখের জলও যেমন বাধা মানিতে চাহিল না, তেমনি গলার স্বরটাকে সে নিজেই এমনি বিশ্রী শুনিতে লাগিল, যে, তাহার এক মুহূর্ত্তও বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, এটা কান্নারই পূর্ব্বসূচনা মাত্র।

হায়রে মেয়ে মানুষের জাত, এমনি অসহায় করিয়াই ভগবান এ জাতকে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, ইহারা নিজের দাবী জানাইতেও যেমনি অক্ষম, তেমনি পাওনাটা বুঝিয়া লইতেও অপারগ।

এরা নিজের কথা কাহাকেও তো বুঝাইতে চাহেই না, যেটুকু চাহে, সেটুকু বুঝাইতে যাইয়া কথার চাইতে চোখের জলই দেখায় বেশী।

প্রতিমা মনে মনে কহিল, সুখ দুঃখের হিসাব তো আজ আর কত্তে বসিনি, শুধু অপমানের হাত থেকে নিজকে বাঁচাব, তার জন্যও এত কাকুতি মিনতি জানাতে হবে। এ অধম মেয়েমানুষ জাতটার আর দাঁড়াইবার জায়গা নেই বলেই তো তোমরা এতখানি আঘাত করতে সাহস কর। শুধু এই কথাটাই জেনে রেখেচ, যে এরা নীরবে সবই সহ্য করবে। কিন্তু এদেরও সে রক্তমাংসের শরীর, এদেরও যে সুখ দুঃখ বোধ আছে, বেদনা বোধ আছে, মান অপমান জ্ঞান থাক্‌তে পারে, শুধু সেই খবরটাই রাখলে না?—

কিন্তু ঘরে ঢুকিবার পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও প্রতিমা একবার মনে করে নাই যে ঠিক এতখানি চঞ্চলতা সে আজ প্রকাশ করিয়া ফেলিবে। তাই কথাগুলি বলিয়া ফেলিয়া নিজের হাতে নিজের গলা টিপিয়া ধরিতে ইচ্ছা হইতেছিল।

কিন্তু তার চেয়েও একটা বড় বিদ্রোহ মানুষের রক্তমাংসের শরীরটা মধ্যে মধ্যে জানাইয়া বসে। এই বিদ্রোহটাকে অস্বীকার করাও যেমন চলে না তেমনি ইচ্ছা মতই একেবারেই একে দমন করিয়া দেওয়াও যায় না।

একটা ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া এই ভাবে একটা তর্কের সূচনা করিয়া দিয়াই একেবারে নীরবে দুইটি প্রাণীর পক্ষে সময় কাটানো একান্তই অসম্ভব।

বিশেষ শৈলেশ এই কথাটা মনে করিয়া ক্রমাগতই বিস্মিত হইয়া উঠিতেছিল যে এই অত্যন্ত শান্তপ্রকৃতির মেয়েটি হঠাৎ আজ এত কথা শিখিল কোথা হইতে। আর এত দিনই বা সে এর পরিচয় পায়নি কেন? যে এমন করিয়া কথা বলিতে জানে, সে যে তাহার অন্তর-মধু দিয়া তাহাকে প্লাবিত করিয়া দিতে পারিত না, তাহাই বা সে কেমন করিয়া বুঝিল। অথচ ঠিক এই মেয়েটির সঙ্গেই সে আজ প্রায় পাঁচটা সুদীর্ঘ বৎসর এই রুদ্ধ ঘরটার চারিখানি দেওয়ালের মধ্যেই কাটাইয়া দিয়াছে।

কিন্তু মানুষের এই মনটা কি বিচিত্র করিয়াই ভগবান্ সৃষ্টি করিয়াছেন। শৈলেশ যদি ঠিক এই মুহূর্ত্তটিতেই এক বার বলিয়া ফেলিতে পারিত, "ওগো, তোমাকে আমিই মান দেব এবং সকল অপমান হাত থেকে রক্ষা করব,"—সব গোলই মিটিয়া যাইত।

কিন্তু শৈলেশ তাহা বলিতে ত পারিলই না, ঠিক সাধারণ মানুষের মতই—এবং অত্যন্ত রুক্ষকণ্ঠেই বলিয়া উঠিল, "ছবিখানি নির্দ্দোষ, তার মধ্যে যে, অপমানটা কোথায় লুকিয়ে রয়েচে, তা বুঝবার মত সূক্ষ্মবুদ্ধি অন্ততঃ আমার তো নেই।"

এত বড় মিথ্যা কথাটা মুখ দিয়া বাহির করিয়া ফেলিয়াই শৈলেশের ইচ্ছা হইতেছিল, জিহ্বাটা দাঁতে কাটিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিয়া দেয় এবং বারংবার চীৎকার করিয়া প্রতিমাকে জানাইয়া দেয় যে, ওকথাটা সে একেবারেই মিথ্যা বলিয়াছে।

কিন্তু শৈলেশের মন পূর্ব্ব হইতেই একটা বিশ্রী তিক্ততায় ভরিয়া ছিল, তাই সে যখন নিজকে শান্তি দিতে পারিল না, তখন হঠাৎ উগ্র হইয়া উঠিয়া প্রতিমাকেই আঘাত করিল এবং উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই অত্যন্ত রূঢ়কণ্ঠে "বেশ অপমান হয়ে থাকে দিয়োনা ছবি,"—বলিয়াই শৈলেশ জামা

কাপড়গুলি অত্যন্ত বিশৃঙ্খলভাবে ট্রাঙ্কের মধ্যে ভরিয়া ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

প্রতিমা বিপদ গণিয়া কম্পিতপদে দেরাজের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল, দ্রুত হস্তে একখানা ছবি টানিয়া বাহির করিয়া শৈলেশের সম্মুখের টেবিলটার উপর রাখিতে গেল। কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল এবং ঠিক এই মুহূর্ত্তটিতে চক্ষের সম্মুখ হইতে আলোটা যেন হঠাৎ নিভিয়া গেল।

যখন দুইহাত বাড়াইয়া সে টেবিলটা ধরিবার চেষ্টা করিতেছিল ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তেই শৈলেশের দৃষ্টি ছবিখানার উপর পড়িল।

বিবাহের পরদিনই সতীশ এই ছবিখানি তুলিয়াছিল। ছুরি দিয়া কাটিয়া কাটিয়া প্রতিমা তাহার বধূজীবনের প্রথম দিনকার ছবিটি চিহ্নহীন করিয়া তুলিয়া ফেলিয়াছে। শুধু শৈলেশের সঙ্গিহীন অক্ষত ছবিটাই এই দারুণ অপমানের বোঝাটা বহন করিয়া কার্ডবোর্ডের একটা পাশে যেন ম্লান মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

রুষ্ট শৈলেশ ছবি তুলিয়া লইয়াই দুই হাতে টানিয়া ছিঁড়িল এবং হাত বাড়াইয়া জানালার ফাঁক দিয়া নীচে পথের ধূলার মধ্যে ফেলিয়া দিল।

পর মুহূর্ত্তে কোনও দিকেই না চাহিয়া সে যখন ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, তখন প্রতিমা কোনও মতে তাহার মূর্চ্ছাতুর দেহটাকে পতন হইতে রক্ষা করিবার জন্য দুই হাতে টেবিলটা চাপিয়া ধরিল এবং নীচু হইয়া ধীরে ধীরে টেবিলটার উপরেই মাথাটা রাখিল।

তাহার অশ্রুপূর্ণ দুইটা চোখ ভয়ানক জ্বালা করিতেছিল এবং কণ্ঠনালীটা কেহ যেন কঠিন হস্তে চাপিয়া ধরিয়া নিশ্বাস রোধ করিয়া দিতেছিল।

তখন সে ধীরে ধীরে দুই চক্ষু মুদ্রিত করিল।

[৬]

ঠিক্ সেই সময়েই পার্শ্বের ঘরে ইজি চেয়ারের উপর হাত পা মেলিয়া দিয়া সতীশ শুইয়াছিল এবং পা ঝুলাইয়া দিয়া চেয়ারের হাতলের উপর বসিয়া উৎপল স্বামীর সহিত মৃদু স্বরে কথা বলিতেছিল। উৎপলের কোমল নত দৃষ্টির সহিত সতীশের উন্মুখ দৃষ্টি মিলিয়াছে, এবং উৎপলের ডান হাত খানা টানিয়া টানিয়া সতীশ মাঝে মাঝে এমনি অবস্থা করিয়া তুলিতেছিল যে, আর একটু টানিলেই ঠিক সতীশের গায়ের উপর পড়িয়া যাওয়া ছাড়া উৎপলের উপায়ান্তর ছিল না।

কক্ষের উজ্জ্বল আলোক একখানি পরম সুন্দর মুখের হাসিটুকুর মতই শাণিত হইয়া রহিয়াছে।

শুভ্র শয্যাখানির উপর ক্ষুদ্র শিশুটি সমস্ত দিনের দস্যুতার পর অকাতরে ঘুমাইতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে তাহার ক্ষুদ্র রক্তাধরপুট হাসিকান্নার চুণিপান্নায় খচিত হইয়া উঠিতেছিল।

সতীশ তাহার স্নেহতরল দৃষ্টি মধ্যে মধ্যে শিশুটির মুখের উপর বুলাইয়া লইয়া আবার উৎপলের মুখের দিকে চাহিতেছিল। উৎপল কিন্তু অনন্যদৃষ্টি হইয়া স্বামীর মুখের দিকেই চাহিয়া রহিয়াছে।

সতীশ কহিল, "ওগো, দেখ্চ?—হাসি কান্নার কি বিচিত্র খেলাই ঐটুকু শিশুর বুকের মধ্যে চলেছে!"

উৎপল ছেলের দিকে না ফিরিয়াই কহিল, "ও আমি রোজই দেখি আর ভাবি যে, তোমার চোখ্ দিয়ে দেখলেই আমার দেখবার আর কিছু বাকী থাক্‌বে না।"

"তাই বুঝি ওর দিকে মোটেই চা'চ্চ না—" বলিয়াই সতীশ উৎপলের হাতখানা একটু জোর করিয়াই টিপিয়া দিল।

"ওকে দেখ্‌বার লোক তো তুমিই এসেচ, তোমাকে দেখ্‌বার লোক ত এতদিন ছিল না, তাই আমি সেই শূন্য স্থানটা পূরণ করে নিচ্ছি!"—

"আর তোমাকে দেখ্‌বার লোকটি যে একেবারেই উহ্য রয়ে গেল, তার কি?"—

"দরকার তো নেই কিছু! যে দিন ও এসেচে ঠিক্ সেদিনই তো আমাকে দেখ্‌বার দরকার শেষ হয়ে গেছে!" উৎপলের মুখে একটা হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিতেছিল, সতীশ তাহার দুটা হাতই ধরিয়া ফেলিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "তাই নাকি?"—

একটু শক্ত হইয়া বসিবার চেষ্টা করিয়া উৎপল কহিল, "অমন করে টেনো না, পড়ে যাব যে!—আচ্ছা, তুমিই বলনা, দরকার শেষ হয়ে যায় নি কি?"—

শেষের কথাগুলি বলিবার পূর্ব্বেই প্রথম কথার উত্তরে ইতিমধ্যে সতীশ বলিল, "জলে তো আর পড়্‌বে না,"—

তার পর ধীরে ধীরে কহিল, "শেষ তো হয়নি, বরং বেড়ে গেছে। ও আস্বাদ আগে মনে হ'ত কোথায় যেন কি একটু বাকী রয়ে গেছে, সেটুকু না পেলে এ উচ্ছ্বাস এমনি ফেনিল, উদ্দাম রয়ে যাবে, ঠিক ভাদ্রের ভরা নদীটার মতই শান্ত সুন্দর হবে না, পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে না।"

উৎপল দুই কাণ ভরিয়া স্বামীর কথা শুনিতেছিল। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব তখন তাহার কাছে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

লক্ষ্যভেদের পূর্ব্বে অর্জ্জুনের স্থির দৃষ্টির সম্মুখে যেমন শুধু পাখীর দুইটি চোখই বর্ত্তমান ছিল এবং আর সবই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তেমনি এই মুহূর্ত্তটিতে উৎপলের কাছে শুধু স্বামীর প্রেমোজ্জ্বল দুইটি চক্ষুর স্নেহস্পর্শী দৃষ্টিই একটি অভ্রান্ত সত্যের মতই ধ্রুব হইয়া উঠিয়াছিল।

সতীশ কহিল, "হিসাবটা যতক্ষণ দেনা পাওনা নিয়েই জড়ানো থাকে, ততক্ষণ তো আসল যা' নিয়ে হিসাব তা'কে ছাড়িয়ে হিসাবের অঙ্কগুলি, খাতাপত্র গুলিই বড় হয়ে ওঠে। দেনা পাওনা মিটে গেলেই না মাণিকরতন কোথায় রয়েচে তারই খোঁজ পড়ে। তখন যারা দেনা পাওনার হিসেব নিয়েই এতকাল ব্যস্ত ছিল, তাদের চাওয়ার বা পাওয়ার কিছুই আর বাকী থাকে না। তাদের সবই যে সার্থক হয়ে গেছে, পূর্ণ হয়ে গেছে। নদীর জল বেড়ে ঠিক্ যেন কানায় কানায়, কূলে কূলে পরিপূর্ণ হয়ে একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে, অবস্থাটা ঠিক তেমনি কতকটা দাঁড়ায়।

উৎপল সবটা শুনিয়া পরম গাম্ভীর্য্যমুখে কহিল, "তা' হ'লে নদীর জলে এখন ভাটার টান ধরে যাবে বোধ হয়। আর হিসেব নিকেশ ক'রে রতনমাণিক যখন মিলেচে, তখন সিন্দুকটাকে ঘরের এক পাশে ফেলে রাখলেও বোধ হয় ক্ষতি নেই।" পর মুহূর্ত্তেই মুখ নীচু করিয়া স্বামীর মুখের কাছে লইয়া গেল।

সতীশ উৎপলের হাত ছাড়িয়া দিয়া দুই হাতে তাহার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া কহিল, "এখন বুঝি আর পড়ে যাবার ভয় নেই? ওরে, ছেলের মা হয়েচিস তবুও তোর বাক্সীপণা গেল না।"—

কিন্তু এই নারীটি যে একেবারেই গালিনিন্দার ভয় রাখে না এবং তাহার 'বাক্সীপণা' যে এতটুকুও কমিয়া যায় নাই, তাহা একমুহূর্ত্তেই প্রমাণিত করিয়া দিয়া কহিল, "তব কি জলে তো আর পড়ব না," বলিয়াই আর একটা কথা যাহা সে সতীশের কাছে ইতিপূর্ব্বে সহস্রবার শুনিয়াছে, তাহাই আবার শুনিবার জন্য কহিল, "আচ্ছা, তোমার কাছে আমি বেশী, না ছেলে বেশী।"—

কপোলটা দুটি আঙ্গুলে একটু টিপিয়া দিয়া সতীশ কহিল, "কতবারই তো এ খবরটা তোমাকে বলেচি যে, ছেলে বেশী, জানই তো "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা,"—শাস্ত্রের বচন রয়েচে; এর উপর তো আর কথাটি বলবার উপায় নেই।"

উৎপল রাগিয়া কহিল, "যে হেতু ছেলের মা পেতে তোমাদের একটা মাসও বিলম্ব করতে হয় না তবে নিষ্ঠুরের জাত। তোমরা দস্যুর মত লুণ্ঠন করতেই শিখেচ সম্রাটের মত দিতে শেখনি।'

কিন্তু ও জাতটা যে সম্রাটের মত দিতে জানে না, এ কথাটা উৎপল অন্তরে এতটুকু তো বিশ্বাস করিতই না, বেশীর ভাগে এ টুকুও জানিত যে, যাকে বলা গেল, সেও তাহার একবর্ণও বিশ্বাস করিল না এবং প্রতিমার মনের আসল কথাটি সে ঠিকই জানিয়া রাখিয়াছে।

তাই কথাটি বলিয়াই উৎপল স্বামীর মুখের দিকে চকিত-দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া লইল।

কবিদের বর্ণিত "অপাঙ্গদৃষ্টি" বলিয়া যদি একটা কিছু থাকে, সতীশের মনে হইল, ঠিক এই মুহূর্ত্তটিতেই বিংশ শতাব্দীর রেল ষ্টীমার এরোপ্লেনের ভিড়িকের মধ্যে, সেই অত্যাশ্চর্য্য জিনিষটির সন্ধান সে উৎপলের কালোচোখের চকিত দৃষ্টির মধ্যেই পাইয়াছে।

কিন্তু কালিদাসের শকুন্তলা, মেঘদূত ঠিক তখনই হাতের কাছেই ছিল না, তাই কবির বর্ণনার সঙ্গে একেবারে 'হুবহু' মিলাইয়া লইবার কোনও কল্পনা মাথায় আসিবার পূর্ব্বেই সে কহিল, "তবু রাজসূয় যজ্ঞিটা এই নিষ্ঠুরের জাতটাই করে থাকে এবং দরকার হলে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে কৌপীন্ পরে ঘর ছাড়তেও এরাই পেরেচে। তবে, ছেলের মা পাওয়া যে কত বড় ভাগ্যি, সে খবরটা এই গরীব স্বামী বেচারীরাই সঠিক্ জানে; তোমাদের তা' আর কেমন করে বোঝাব বল।"

উৎপল স্বামীর কথা শুনিতে শুনিতে মনে মনে কহিল, "ওগো, আমরা কি তা' বুঝতে চাই, না বুঝতে পারি? এ মেয়েমানুষ জাতটাকে তোমরা পায়ের কাছে একটু

স্থান দিলেই যে এরা কৃতার্থ হয়ে যায়। যখনি আদর করে বুকে টেনে নিয়ে বল যে আমরাই তোমাদের সর্ব্বস্ব, তখনও কি স্বস্তি পাই? শুধু এই ভয়েই বুকটা কাঁপতে থাকে যে বিধাতা পুরুষটি কোথায় আড়ালে বসে একটু হেসে না ওঠেন এবং আমাদের অদৃষ্টের এই সব চেয়ে বড় লেখাটাকে একমুহূর্ত্তে মুছে ফেলে দিয়ে সব একেবারে মিথ্যা না করে দেন! এ যে কত বড় ভয়, কতখানি অস্বস্তি যে আমরা নিশিদিন বুকের ভিতরে পুষে রাখি, তা' এই জাতটাই তো বেশ করে জানে। তোমরা সম্রাটের মত দিতে জান বলেই তো আমাদের সব চেয়ে বড় ভয় যে যা' দিয়েছিলে তা' সব আবার ঠিক সম্রাটের মতই কেড়ে নিয়ে একেবারে রিক্ত, দীন, কাঙ্গাল না করে দাও। এই পোড়া মেয়ে মানুষগুলোর ভিতরে ভিতরে যে কতখানি কাঙ্গালপণা, তা' যদি তোমরা ঘুণাক্ষরেও জানতে।"

সতীশ তাহার কথা শেষ করিবার পূর্ব্বেই হঠাৎ উৎপলের খোপাটা ধরিয়া টান দিয়া কহিল, "ওগো, শুনচ?"

হঠাৎ ধাক্কা পাইয়া তন্দ্রা ভাঙ্গিলে মানুষ যেমন করিয়া চম্‌কাইয়া উঠে এবং পর মুহূর্ত্তেই একটু হাসিয়া নিজেকে সচেতন করিয়া তুলিতে চাহে, ঠিক তেমনি ভাবে মৃদু হাসিয়া উৎপল কহিল, "শুনচি গো, শুনচি।"

সতীশ "ছাই শুনচ,—কথা গিলচ,"—বলিয়াই আর একবার উৎপলের প্রকাণ্ড খোপাটা ধরিয়া এমনিভাবে টানিয়া দিল যে খোপা তো খুলিয়া গেলই, মাথার কাপড়টাও একেবারেই সরিয়া গেল।

কাপড়টা একটু টানিয়া ঠিক করিয়া দিয়া উৎপল গম্ভীর মুখে কহিল, "তা' তুমি আবার ছেলের মা পেতে চাও নাকি?" এবং পরক্ষণেই হাসিয়া ফেলিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিল।

উৎপলের মুখের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সতীশ দুই হাতে তাহাকে সবলে আকর্ষণ করিয়া কহিল, "আমি তো পেয়েই বসে আছি, এবং তাকেই না হলে যে আমার দিন চলে না, সে খবরটা আমিও যেমন জানি, সেও তো ঠিক তেমনি জানে।"

সতীশের মুখের কাছে মুখ নিয়া কণ্ঠলগ্ন উৎপল একসঙ্গেই মুখ চোখ দুবাইয়া অস্ফুটস্বরে কহিল, "না, সে তো তা জানে না।"

সতীশ তেমনি অস্ফুটস্বরে কহিল,—"জানে।"—

"জানে না,"—

তখন উৎপলের ক্ষুদ্র ললাটের উপর ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়া সতীশ আবার কহিল, "আমি বলচি, জানে।"

হঠাৎ উৎপলের চক্ষুর দুইটা পাতা জলে ভিজিয়া উঠিল, সে রুদ্ধস্বরে কহিল, "সত্যি জানে!"

তারপরই স্বামীর বুকের মধ্যে মুখ লুকাইল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই কেহ বাহিরের বারান্দার উপর দিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

উৎপল স্বামীর কণ্ঠ ছাড়িয়া দিয়া চেয়ারের হাতলের উপর আবার ঠিক হইয়া বসিয়া কহিল, "দাদার পায়ের শব্দ শুনলাম না? কোথায় গেলেন?" বলিয়াই তাহার মুখের হাসি একেবারেই নিভিয়া গেল।

সে যখন স্বামীসৌভাগ্যে নিজেকে পরম ভাগ্যবতী মনে করিতেছিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই তাহার পাশের ঘরেই এমন একজন ছিল, যে দুনিয়ায় সুখের মুখ একটি দিনের জন্যও চোখে দেখে নাই এবং শুধু একটি লোকের উপেক্ষা অনাদরেই যাহার সমস্ত জীবনটা একেবারেই ব্যর্থ নিষ্ফল হইয়া যাইতে বসিয়াছে।

এযে কত বড় ব্যর্থতা, এ যে কতখানি দুঃখ, তাহা মনে করিতেও উৎপল শিহরিয়া উঠিল। এবং ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সতীশের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার মনে হইল, ঐ দেবতার ক্ষাতটা যে নারীর অদৃষ্টেই পাষাণমূর্ত্তিতেই দেখা দেন, হবে, সে কত বড় অভাগী!

অন্য কাহাকেও হৃতসর্ব্বস্ব হইতে দেখিলে মানুষ যেমন নিশিদিন নিজের যথাসর্ব্বস্ব আগলাইয়া বসিয়া থাকিতে চাহে, একবারও চোখের আড়াল করিতে চাহে না এবং অন্তরের সমস্ত স্নেহ, প্রেম প্রবলভাবে তাহারই অভিমুখী করিয়া দিয়াও একবিন্দু স্বস্তি পায় না, ঠিক তেমনি প্রতিমার এত বড় দুর্ভাগ্য তাহার সমস্ত চিত্ত দিয়া অনুভব করিয়া উৎপলের ইচ্ছা হইতেছিল নিজের যথাসর্ব্বস্ব ঐ স্বামীটিকে কৃপণের সম্পদের মতই বুকের মধ্যে টানিয়া আনিয়া লুকাইয়া রাখে।

তখন তাহার দুই চোখের দৃষ্টি প্রতিমার জন্য বেদনায় এবং স্বামীর জন্য উদ্বেলিত প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল!

সতীশ সে দৃষ্টি চিনিত। তাই সে দুইবাহুর বেষ্টনীর

মধ্যে উৎপলাকে টানিয়া লইয়া তাহার কপোল ও ললাট চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন করিয়া দিল।

উৎপলা ধরা দিয়া কিছুক্ষণ দুইচক্ষু মুদ্রিত করিয়া স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হইয়া রহিল। তারপর নিজেকে স্বামীর দৃঢ় আলিঙ্গন-মুক্ত করিয়া লইতে লইতে গাঢ়স্বরে কহিল "ঠিক যে মুহূর্তে আমারই পাশের ঘরে একজন নিশ্চয়ই চোখের জলে ভাসছে, তখন নিজের এতটা সৌভাগ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকলে, যিনি সকলেরই সুখ ও দুঃখকে প্রত্যক্ষ করছেন তিনি হয়তো রুষ্ট হয়ে উঠ্‌বেন। ছাড়, আমি বৌদিদিকে দেখে আসি।"

উৎপল চেয়ারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দুই হাতে হাতলের উপর ভর দিয়া নীচু হইয়া একবার স্বামীর মুখের উপর তাহার নিবিড় ম্লান দৃষ্টি মুহূর্তের জন্য বুলাইয়া লইল, তারপরই সন্তর্পণে মাথার মণিটি রাখিয়া ভুজঙ্গিনী যেমন ধীরে ধীরে চলিয়া যায়, তেমনি নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।

পাড়াগাঁয়ের চিঠি

ভাই নক,

তোমার চিঠিখানা পড়িয়া আমি না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। আগাগোড়া যে একটা লজ্জা, সঙ্কোচ বা কুণ্ঠার ভাব প্রত্যেকটি কথার ভিতর ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার কোনই কারণ খুঁজিয়া পাইলাম না। তুমি মনে কর, আমি তোমার পত্র পড়িয়া বিরক্ত হই। বাস্তবিক এ ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা, তুমি যেমন আজ পল্লীমায়ের কোলছাড়া হইয়া, অনুক্ষণ স্থির অনিমেষ চক্ষে মায়েরই দিকে তাকাইয়া আছ মায়ের বাণী শুনিবার জন্যে, তেমনি আমিও এই নিঝুমপল্লীতে মায়ের কোলে বসিয়া, চাহিয়া আছি—তোমাদের ঐ সুদূর সহরের পানে, আমার পল্লী-জননীর সম্বন্ধে তোমরা দশজন শিক্ষিত, উন্নত সন্তান কি ভাব, তাহাই জানিবার জন্য। সুতরাং এই ভাব-বিনিময়ে উভয়েরই সমান স্বার্থ। বিরক্তির ত কোনও কারণ নাই।

তুমি যে লিখিয়াছ পাড়াগাঁয়ে কোন কাজ করিবার থাকিলে, তাহা এই দরিদ্র, নীচ এবং অনুন্নত জাতিদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করা। বাস্তবিক কথাটি খুবই সত্য, সবাই তাহা বোঝে। কিন্তু কাজে লাগিবার আগে একটা ধারা বা পথ চিনিয়া লইতে হইবে। তাই, সেই সম্বন্ধেই আজ আলোচনা করা দরকার। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে, আমি একটা ছড়ার কথা পাড়িব। অবশ্য সেটা যে একেবারে, "রামা-য়ণের মধ্যে ভূতের ক্যাচকেচি" হইবে তাহা নয়। আজিকার এ প্রশ্নের সঙ্গেও তাহার বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। ছড়াটি খুবই পুরাণো এবং পরিচিত—

"লেখাপড়া করে যে,
গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে।"

সেই কচিকাল হইতে কতবার কতস্বরে, এখানে ওখানে মাঠে পথে, পড়ার ঘরে, শিশুর মুখে, মায়ের মুখে নানারকমে এই ছড়াটি আমরা শুনিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এতদিন তো ভাবি নাই ভাই, এই কথা কয়টির মধ্যে কত বড় একটা প্রশ্নের সমাধান হইয়া আছে। "পাড়াগেঁয়ে কবিত্ব" বলিয়া ইহাকে উপহাসই কর আর অবহেলাই কর, আমি কিন্তু আজ ইহার রচয়িতার উদ্দেশ্যে সহস্র কোটি প্রণাম জানাইয়াও ক্ষান্ত হইতে পারিতেছি না। কেননা, বড় বড় কবিগণের ভূরি ভূরি বসের মধ্যে যে কথাটা স্পষ্ট করিয়া ফুটিতে পারে নাই, এই ক্ষুদ্র ছড়াটির ভিতর তাহার সাক্ষাৎ মিলিয়াছে। ইহারি ভিতরে রহিয়া গিয়াছে—বাঙালীর "শিক্ষার লক্ষ্য বা আদর্শ"।

বাঙালী শিশু লেখাপড়া করে তাহার একমাত্র লক্ষ্যই—"গাড়ি ঘোড়া চড়া।" সেই কচিকাল হইতে এই আশা টুকুই তাহাকে "ভূতে পাওয়ার" মত পাইয়া বসে, তাহার কোমল অন্তরের পরতে পরতে দাগ বসাইয়া দেয়। তাই, সেই দিকেই সে চালিত করে তাহার সকল শিক্ষা, দীক্ষা, সাধনা—সকল উদ্যম, সকল মনোযোগ। ছেলেবেলায় "ধ" আর "ক"

এর প্রভেদটুকু ধরিতে না পারিয়া যখন দিনের পরদিন এই মহা সমস্যার সমাধানে মাথা ঘামাইয়া, অবশেষে "উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে" চাপাইয়া দিয়াছি, আর সঙ্গে সঙ্গে গুরুমহাশয়ের বেত্র তাড়নায় নাকের জল চোকের জলে পথ দেখি নাই, তখন এই সকল কষ্ট তাড়নার ভিতরেও আবার আমাকে পড়ার ঘরে টানিয়া লইয়া যাইত কে?—ঐ গাড়ি ঘোড়া চড়িবার আশা,—বিদেশে গিয়া চাকরি করিবার কল্পনা। তখন ভুলিয়া গিয়াছি পল্লীমায়ের কাতরবাণী, ভুলিয়া গিয়াছি এই শান্ত ছোট্ট গ্রামখানির প্রত্যেকটি প্রাণী প্রত্যেকটি পল্লীপথ, প্রত্যেকটি কুটীর প্রত্যেকটি গাছপালা, ঝোপছায়ার সঙ্গে কি দুশ্ছেদ্য আমার বন্ধন। চাকুরি-জীবনের কাল্পনিক আরাম এমনই করিয়া দিনে দিনে বাঙালীছাত্রের সকলটুকু হৃদয় জুড়িয়া বসিয়াছে। তারপর একদিন সে দেশের নাড়ীর সকল সম্বন্ধ, সকল মমতা ত্যাগ করিয়া স্বাধীন পক্ষে সহরের পানে ছুটিয়া গিয়াছে। পরিত্যক্তা অভাগী বাস্তুভিটা বহুদিন পর্য্যন্ত পরিত্যক্তার উদাসীনতার মত কাঁদিয়া কাটিয়া, শত বাগানের ঝোপ জঙ্গল বুকে করিয়া, ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর নিশ্চিন্ত আশ্রয় হইয়াছে।

কিন্তু আজ আজ সহরের পরিত্যক্তা মাতৃভূমির ক্রন্দনের পানে তাকাইয়া আমাদের প্রাণে প্রাণে এক মর্ম্ম-বেদনার শিহরণ জাগিয়া উঠিতেছে। আজ কেন আমরা কয়েকটি দীনসন্তান দরিদ্র রোগজীর্ণ পল্লীমায়ের দুঃখ কালিমা মুছিয়া ফেলিবার জন্য আতঙ্ক হইয়া উঠিয়াছি? এ প্রশ্নের উত্তর নাই। কেননা, প্রাণের প্রেরণা স্বাভাবিক। তবে আজ যে কারণেই হউক, যখন একবার এ দেশব্যাপী দারিদ্র্যের সন্ধান পাইয়াছি, তখন তাহার একটা "গতি" না করিয়া তো আর ছুটিয়া পালানো যায় না। আজ আমার এই ছোট্ট গ্রামগুলির দিকে তাকাইলে অসহায়, নিরুপায়, অন্ধ কৃষকদের ভীষণ দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ ভিন্ন আর তো কিছু চোখে পড়ে না। যেখানেই যাই, যেদিকেই চাই, দেখিতে পাই কেবল সর্ব্বগ্রাসী অভাব, খাদ্যের অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব, জ্ঞানের অভাব, প্রাণের অভাব। "হাওয়া" খাইয়া ত প্রাণ বাঁচেনা। আধপেটা খাইয়া অপরিমিত পরিশ্রম করিয়া জীবনীশক্তি ক্ষয় হইয়া যায়; রোগ নিবারণের ক্ষমতা থাকে না কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা দেশ উজাড় করিয়া লয়;—আর হতভাগ্য কৃষককুল বসে বসিয়া অদৃষ্টের দোষ দেয়। ঘরে আলো নাই, তাই তাহারা পথ পায় না; প্রাণে বল নাই, তাই চুপ করিয়া থাকে, সু-আদর্শ নাই, তাই অকর্ম্মে, কুকর্ম্মে সর্ব্বস্ব খোয়ায়, মারামারি কাটাকাটি করিয়া আদালতের অর্থ যোগায়। এই ভীষণ রোগের একমাত্র ঔষধ যে শিক্ষা, এ কথাটা নূতন করিয়া তোমাকে বলিতে হইবে না। সব চাইতে এখন দরকার মনের বল। শিক্ষায় আসিবে সে বল। হাতে ভিক্ষা দিলে চলিবে না, অন্তরে দীক্ষা দিতে হইবে। গ্রাম জুড়িয়া যখন আগুন লাগিয়াছে তখন ফুঁ দিয়া নিবাইবার চেষ্টা করে যে—সে আনাড়ি মূর্খ। সুতরাং একটু আধটু উপদেশ না দিয়া দেশের ঘরে ঘরে শিক্ষা বিস্তার করিতে হইবে, আর তার মূল্য যে কতখানি সে কথা নিয়া, ঘাটাঘাটি করিতে চাই না। আমার আজিকার বক্তব্য, সেই শিক্ষা কিরূপ ধরণের হওয়া উচিত। কৃষকবালকদিগের শিক্ষার আদর্শটা কি হইবে।

শিক্ষার আদর্শ যে এ যাবত আমাদের কি ধরণের চলিয়া আসিতেছে, তাহার আভাস তো পূর্ব্বেই দিয়াছি। আমরা পড়ি—গাড়ি ঘোড়া চাপিবার জন্য। কিন্তু ভাই, সবাই যদি গাড়ি ঘোড়ায় চড়ে, তবে পায়ে চলিবে কে। আমাদের আদর্শটা যদি ঐ নিরক্ষর কৃষক দলের সম্মুখে তুলিয়া ধরি, তাহা হইলে উহারাও এ বিদ্যাসর্ব্বস্ব বাবু হইবে, লেখা পড়া শিখিয়া, দাদা বড় পিতা মাতার কপালে সজোরে পদাঘাত করিয়া, সহরে গিয়া কেরাণীগিরি আরম্ভ করিবে, তাহার উপায় কি করিবে? একটি যদি ঐ রকম করে, তবে শিক্ষার নামে যে জুজুর ভয় আসিবে তাহা ভাবিবে কে? ক্রমে যদি দুইটি চারটি পাঁচটি গ্রামে আরম্ভ করে, তাহা হইলে এখন একবেলা খাইয়া তখন করিতে হইবে নিছক উপবাস। তাই আজ এই নব যুগের পুনর্গঠনের মূলে পল্লীগ্রামের সাধারণ লোকের শিক্ষার আদর্শটিকে অন্যদিকে চালিত করিতে হইবে। চাকরীর লোভ দূর করিয়া লোককে স্বাধীন ভাবে করিয়া খাইবার উপায় শিখাইতে হইবে। গতর খাটাইয়া নানাবিধ দেশে ধনাগমের রাস্তা খুলিতে হইবে। এখন চাই অর্থ। অর্থকে তোমরা যতই অনর্থের মূল বলনা কেন, আমার মতে ঐটিই আসল। অর্থ না হইলে সবই ব্যর্থ।

দেশে অর্থাগমের কথা উঠিলেই, তোমরা সমস্ত দোষ গভর্ণমেণ্টের ঘাড়ে চাপাইয়া নিশ্চিন্ত থাক। ঐ একটা হাঁক দাও ছাড় গভর্ণমেণ্ট কেন কৃষি বিভাগের খোলেনা,

টেক্‌নিকাল স্কুল, কমার্‌সিয়াল স্কুল বসাবনা, এ দেয় না, ও দেয় না -ইত্যাদি।" কিন্তু ভাই, দেশের উন্নতি করে গভর্ণমেণ্টের সহায়তা বা আনুকূল্য যে এখানে খুবই অল্প তা'ও স্বীকারই করি, আর তার জন্য আন্দোলন করা যে দরকার তাহাও মানি। কিন্তু সবাই মিলিয়া আন্দোলন করিলে চলিবে না, এ কাজ করিতেছেন সকবের নেতারা। কত মহাত্মা সমস্ত জীবন চীৎকার করিয়া গিয়াছেন, স্বার্থ ত্যাগের মহামন্ত্রে দীক্ষা লইয়া দেশের জন্য যুদ্ধ করিতেছেন। সমস্ত দেশের সমবেত জনসঙ্ঘ তাঁহাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া চীৎকার করুক, ইহাই তাঁহারা চান। কিন্তু আমরা মহাত্মারা কি করি? বৎসরের ৩।৪ মাস (কেহ বা বারমাসই পাড়াগাঁয়ের তণ্ডুল ধ্বংস করি। আটটা দিনের দৌরাত্মের চোটে বাড়ীর কুকুরটাকে পর্য্যন্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলি, তাস খেলি, "কচ্ছপ বাবো" হাঁকি, নাক ডাকি আর ঘুমাই। দুনিয়ায় এই টুকুই কি আমাদের কাজ? আমাদের হাতের মধ্যে যে কয়টা কাজ আছে, তাহাতো আমরা অনায়াসেই করিতে পারি, অনায়াসে না পারিলেও স্বল্পায়াসে বেশই পারি। গ্রামের মধ্যে দুই একটা ছোটো খাটো রকমের শিল্পাগার আমরা ইচ্ছা করিলেই বসাইতে পারি। গ্রামে গ্রামে না হউক দুই তিন গ্রাম অন্তর এক একটি কম্মকারের আড্ডা, সূত্রধরের কারখানা, কুম্ভকারের কর্ম্মশালা যাহা আমাদের দেশের মধ্যেই পাওয়া যায় বসান খুব বেশী কষ্ট কর নয়। দশ বারো ঘর কম্মকারের বসতি আছে এমন একটা গ্রামে যাও। দেখিবে, দু' এক ঘরের হয়তো খাবারই জোটে না; অথচ তাহারা কাজ কর্ম্মে নেহাৎ অপটু নয়। তোমাদের গ্রামে যে ছাড়া ভিটেটা পড়িয়া আছে, নিজেরা কুড়াল ধরিয়া পরিষ্কার কর। একখানা খড়ো ঘর তুলিয়া একজন কর্ম্মকার লইয়া আইস। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম ঘুরিলে অল্প দিনেই ১৫।১৬টি লোক জুটিবে। তাহারা পালা করিয়া কম্মকারকে "যোগাল" দিতে থাকুক। গ্রামের ব্যাঙ্ক হইতে শ'দুই টাকা কম্মকারকে কর্জ দিবার ব্যবস্থা কর। লোক কিনিয়া কাজ সুরু করুক। এক বৎসর পরে আসিয়া দেখিও কম্মকার টাকা পরিশোধ করিয়া বেশ দু'পয়সা জমাইতে পারিয়াছে। দুই বৎসর পরে আসিও, দেখিবে যাহারা গাঙ্গর যোগান দিত তাহারাও দূরে দূরে গিয়া এক একটা গ্রামে কারখানা খুলিয়াছে। বেশি পয়সা খরচ নাই, অথচ কতগুলি মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াইতে শিখিল।

আমার গ্রামেরই স্কুলের জন্য একখানা চেয়ার তৈরি করিব বলিয়া এই ৮।১০ গ্রাম ভোঁ ভোঁ করিয়া ঘুরিতেছি, একজন মিস্ত্রী পাইলাম না। একটু দূরে যাও, দেখিবে কোন কোন গ্রামে মিস্ত্রীদের ভাত জোটে না, কেন না তাহারা এক জায়গায় অনেকগুলি জড়ো হইয়া আছে। কুম্ভকারদেরও ঐ অবস্থা। হাটে বাজারে গিয়া দেখিও – হাড়ি পাতিল কি আক্রা। কেন? এ সব জিনিষ তো আর বিলাত থেকে আসে না। আর দেশে অন্য সব জিনিষের অভাব হইলেও মাটির অভাব এখনও হয় নাই। তবে এ মূল্য বৃদ্ধির কারণ?—কারণ কাজের লোকের অভাব। লোক যোগাও লোক যোগাও। তাহারাও বাঁচিবে আমরাও বাঁচিব।

এখন একবার সাধারণ দরিদ্র গৃহস্থের মেয়েদের কথা ভাবা দরকার। দেশের কথা কিছু আলোচনা করিতে গেলেই তোমরা মেয়েদের একেবারে বাদ দিয়াই আসিতেছ। ওসব গোঁড়ামিতে আর এখন চলিবে না—দিনে দিনে সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার হইবে। দেশের জাগরণের পক্ষে স্ত্রীশিক্ষারও যে কতখানি দরকার সে কথাটা আর একদিন বলিব। আজকার কথা আজ বলি। গ্রামের মধ্যে দুই একদিন ঘুরিলেই দেখিতে পাইবে নানা বয়সের বিধবায় প্রত্যেক গৃহস্থ ভারাক্রান্ত। সে অভাগীদের নিদারুণ অবস্থাটা দেখিলে চোখের জল রাখিতে পারিবে না। অর্থের অভাবে সোনার প্রতিমার মত মেয়েগুলি বুড়ার হাতে ধরিয়া দেয়। দুইদিন যাইতে না যাইতেই তারা হাতের শাখা, সিথির সিন্দুর খোয়াইয়া বাপ ভাইয়ের ঘরে ফিরিয়া আসে তারপর উঠিতে বসিতে প্রতি মুহূর্ত্তে লাথি ঝাটা খাইতে খাইতেই তাহাদের প্রাণ যায়, যেন তাহারা নিজেদের বৈধব্যের জন্য নিজেরাই দায়ী। এই অভাগীদের ক্লেশ লাঘবের জন্য আমাদের হাতে কি কিছুই নাই? পল্লীগ্রামে ভদ্র গৃহস্থের বাড়ীতে খোঁজ নিয়া দেখিও দুই একজন ভদ্র মহিলা ডালা কুলা, চালন সাজি ধামা, মাদুর চাটাই ইত্যাদি তৈরি করিতে বেশ পটু। এইরূপ একজনকে ধরিয়া গ্রামের বিধবা মেয়েদের ডাকিয়া ঐ সব শিল্প কাজ শিখাইবার ব্যবস্থা করিতে আমাদের বেশী বেগ পাইতে হয় না। তাহাদে

হাতগড়া জিনিষ একটা সহরে নিয়া বিক্রয়ও করা যাইতে পারে। সেই আয়ে অনেক মেয়ে তাহাদের বাপ ভাইদের কথঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পারে, আর কষ্টের চাপে নিজেদের অদৃষ্টের কথাও ভাবিবার অবসর পায় না।

এখন তুমি হয়তো বলিবে, সাধারণ লোক তাহাদের পিতৃপুরুষ আচরিত কৃষিকাজ ছাড়িয়া কামার, স্যাকরা হইতে যাইবে কেন? হাল লাঙ্গল ফেলিয়া হাতুড়ি, বাটাল ধরিবে কেন? কেন যে ধরিবে, সেই কথাইতো তাহাদের বুঝাইয়া দিতে হইবে। কৃষক পাড়ায় যাও। দেখিবে, অনেক গৃহস্থ আছে তারা চারটি ভাই, ভিটায় ঘর আছে একখানা, মাঠে জমি আছে পাঁচ বিঘা, গোয়ালে গরু আছে দুইটা মরা, ঘরের কোণে লাঙ্গল আছে একখানা ভাঙা। তিন ভাইয়ের স্ত্রী পুত্র আছে, বুড়া মা বাপ আছে, বিধবা বোন আছে, ছোট ভাইটের বয়স অল্প। পাঁচ বিঘা জমি চাষ করিতে একজন লোকের বেশী কিছুতেই দরকার হয় না, কিন্তু ইহারা লোক খাটে ৫ জন। সাত পাঁচ দুই মাসের শস্য। বাহিরের একটি পয়সা আয় নাই। অথচ মহাজনের বাড়ী আছে, টাকা আনে খায়। শোধ দেবার নামটিও নাই। এক বৎসর অজন্মা হইল, কি ফসল কম হইল, খাবার নাই। বেগতিক দেখিয়া মহাজন টাকা দিলেন না।

হাহাকার উঠিল। অভাবের তাড়নায় ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ বাধিল। একজনের মাথা ফাটিল, সে গেল হাসপাতালে, আর একজন গেল জেলে। মহাজন সুদে বাড়াতে জমিটুকু কাড়িয়া লইলেন। জমিদার খাজনার দাবাতে নালিশ দিয়া মালক্রোক করিয়া হাঁড়ী পাতিল, কলস থালা বেচিলেন। দুশ্চিন্তায়, অনাহারে অনাচারে অবলা কয়টি রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িল। তারপর নির্ম্মম বিধাতা একটি একটি করিয়া সকলকেই ইহসংসারের শোক, তাপ, দারিদ্র্য, অভাব থেকে মুক্ত করিলেন। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যে বাড়ীতে চারিটি "বাঘের মত" ভাই দেখিয়াছ, আজ সে বাড়ীতে ইঁদুরও নাই। কিন্তু ভাই, যদি এই হতভাগ্য গৃহস্থের প্রতি পাঁচবৎসর পূর্ব্বে তোমাদের নজর পড়িত, আর তোমরা বলিয়া কহিয়া বড় ভাই এবং বৃদ্ধ পিতার উপরে চাষবাসের ভার চাপাইয়া বাকী তিনটি ভাইয়ের একটিকে কামার আর একটিকে ছুতার হইবার সুযোগ করিয়া দিয়া সকলের ছোট ভাইটিকে তোমার গ্রামের স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া লইতে, তাহা হইলে এই পাঁচ বৎসরে ঠিক অনুরূপ ফল ফলিত না কি? কালে সংসারের শ্রী ফিরিয়া যাইত। দুই ভাই শিল্প শিখিয়া অর্থের সংস্থান করিত। ছোট ভাইটি বাবুদের আদর্শে সহরে গিয়া সেখান থেকে বহিয়া আনিত—শুধু শিক্ষা নয়, স্বাস্থ্য, নীতি, আচার, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, উন্নতি এবং নানাপ্রকারের উচ্চ আদর্শ,—যাহার বলে সংসারের নব সভ্যতার দিব্য আলোকে পড়িয়া, একটা অভিনব আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়া তুলিত।

এই নূতন আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতেই, আমাদের সহরের অভিজ্ঞতা চাই। তাই শিল্প এবং কারবার শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকের শিক্ষারও প্রয়োজন আছে। প্রত্যেক গ্রামের অন্ততঃ ২০।২৫ জন মানুষ সহরের মাটিতে মানুষ হউক, সহরে না গেলে সেই উহারা এত বড় বিস্তৃত বিরাট কর্ম্মক্ষেত্রের সন্ধান পাইবে না, সমগ্র জগতের সঙ্গে আত্মপরিচয়ের প্রবল আকাঙ্ক্ষায় নাচিয়া উঠিবে না, দেশের দাসত্ববিদ্রোহের মূলোৎপাটনে বদ্ধপরিকর হইবে না। আমরা যে বেদনায় প্রেরণায় আর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছি, তাহার করুণ অনুভূতির চালনায় প্রাণের দুইধারা হৃদয়ের ব্যথা জাগিয়া উঠুক। আমরা যে জগৎ ছাড়া নই সমগ্র মানব জাতির সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে সংশ্লিষ্ট,—এই উচ্চজ্ঞান তাহাদের অন্তর স্পর্শ করুক। কেন যে আমরা আজ দলে দলে দেশের জনসাধারণের মুক্তির পথ আবিষ্কার করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছি সে জ্ঞান তাহাদের নাই।

বাহিরের সবপ্রকার মমতা, অজ্ঞতার আবর্জ্জনা এখনও তাহাদের প্রাণের গুয়ারটি পাক করিয়া রাখিয়াছে। বেদনার ঝঙ্কারে তাহা বাজিয়া উঠে নাই। তাই আজ দিন আসিয়াছে কর্ম্মের জন্য, কর্ম্মবীরের জন্য, আলস্যের জন্য নয়, অলসের জন্য নয়। দেশের বুকে যে আবর্জ্জনা স্তূপীকৃত হইয়া আছে আগুন জ্বালিয়া তাহার নাশ করিতে হইবে। দিব্য আলোকে প্রত্যেকটি হৃদয়ের সমস্ত কালিমা দূরীকৃত করিতে হইবে। ঘরে ঘরে, পল্লীতে পল্লীতে নূতন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, নবজাগরণের বিরাট স্পন্দন অন্তরে অন্তরে জাগাইয়া তুলিতে হইবে।

কিন্তু একদিনের কাজ তো ইহা নয়। বহুযুগের তপস্যার ফলে আমরা জাগিয়াছি। যাহারা এখনও ঘুমে আছে এই বিরাট তপস্যার মন্ত্রে তাহাদিগকে দীক্ষা দিতে হইবে।

কর্ম্মের যুগে আমরা জন্মিয়াছি, কর্ম্মের মধ্যে আমাদের প্রতিষ্ঠা হউক, আমাদের জীবন কর্ম্মময় হউক। কেবলমাত্র কথার দিন চলিয়া গিয়াছে, আসিয়াছে বাস্তবতার অনুভূতি। কর্ম্মারম্ভ কর। নিজের অন্তর-নিহিত বিরাট শক্তিকে প্রবুদ্ধ কর। বিশ্বের সব শক্তি আমার, কিন্তু আমার নিজের ভিতরকার শক্তি যতক্ষণ না জাগে ততক্ষণ। শক্তির সঙ্গে শক্তির যোগ হয় না। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"পৃথিবীতে শক্তিই শক্তিকে পায়।"

সেই বিরাট মহাশক্তির উপাসক আমরা, শাক্ত আমরা বাঙ্গালী শিশু, নবযুগের নূতন জাব, নবীনের জীবন্ত ভাব আশ্রয় করিয়া, জীবনে জীবনে নবীন উদ্দীপনার শিহরণ জাগাইয়া আজ এই নববর্ষের নূতন আলোকে চক্ষু মেলিলাম। ভর্কর্কাটের নীচতা, পাণ্ডিত্যের পঙ্গুতা যেন আমাদিগের অঙ্গস্পর্শ না করে। আমরা কর্ম্মনাব—আমরা সেবক আমরা সাধক—আমরা ছোট নই—আমরা বড়। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি আজ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছে, আর আমরা এই জীর্ণ বস্ত্রের উপরে, এবং দারিদ্র্যের কোণে জাগিয়াছি। তাহাতেই তো বুঝিতে পার, —আমরা ছোট নই। বিশ্ব বিধাতা আমাদের সহায়, তিনিও আজ হাতে হাতে দারিদ্র্যের নিগড় তুলিয়া দিয়াছেন, স্কন্ধের উপর অস্বাস্থ্যের বোঝা চাপাইয়া দিয়াছেন। এই স্তূপাকার অজ্ঞান, রোগ দারিদ্র্যের মধ্যে দাঁড়াইয়া আমরা তাঁহাকে প্রণিপাত করি।

আর কিছু বলিবার নাই। তোমরা এস, অগ্রসর হও। আজিকার দিনে পিছনে থাকিও না, ভয় করিও না, দমিয়া যাইও না। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমি তোমাদের প্রাণপণে সাহায্য করিব। এই পাঠশালার গুরু-গিরি করিবার আমি চলিলাম। ইহাই আমার স্বর্গ। দারিদ্র্যকে আমি বরণ করিয়া লইয়াছি। তোমরা কাজ কর, "মাষ্টার মশায়ের"র কথা ভাবিও না। আমি একদল প্রাণ এখানে সৃষ্টি করিতেছি। তাহারা তোমাদের পিছনে চলিল। একজন দুইজনে এ কাজ হয় না, তোমরা একত্র হও, মানুষ হও। তোমাদের দিয়াই তো আমার সকল আশা। আমার সে আশা পূর্ণ হউক! দেবতার আহ্বান আসিয়াছে, এস কর্ম্মেষণার ভিতরে এস কর্ম্মপ্রবাহের ভিতরে। সার্থক হউক আমাদের শিক্ষা, সার্থক হউক আমাদের পরিশ্রম সার্থক হউক আমাদের যোগ, ত্যাগ, অভ্যাস, সাধনা।

হাত তোমাদের
মাষ্টার মশায়
শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

প্রতিশ্রুতা

তরুণ রাজকুমার। তার কাজ ছিল শিকার সন্ধানে ঘোরা। একদিন সারা বনানি ঘুরে কোথাও শিকার মিলল না তার। যদিও বা মিলেছিল, সমস্ত লক্ষ্য আজ তার ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল।

ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত রাজকুমার এক পল্লীর ছায়া-বীথিতে এসে বিশ্রাম ক'রছে। জলতেষ্টায় তার বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে, নড়বার ক্ষমতা নেই। কষ্টে যদিও একটু এগিয়ে ঐ দূরের কুটীর থেকে একটু জল চাইতে পারে, তা সে পারবে না। সে কারুর কাছে কখনও চোখ তুলে কিছু চায়নি। এ ত আর শিকার ক'রবার ছেলে নয়, এ যে রাজপুত্র। না চাইতেই সে সব পেয়েছে।

এক তরুণী ধীরে ধীরে এসে তার পাশে দাঁড়াল। যাচ্ছিল সে মহুয়া গাছের তলায় ফুল কুড়ুতে বুঝি মালা গাঁথবে। সে রাজপুত্রকে দেখে ফিরেও চাইত না, শুধু তার কাতর কণ্ঠের 'উ,' তার কাছে টেনে আনল।

বলতে তার বাধা ঠেকছিল। তবু সে সঙ্কোচের বাঁধ ভেঙ্গে জিজ্ঞাসা করল—'কি হয়েছে গো'? রাজকুমার চক্ষু মুদ্রিত করেই কাতরকণ্ঠে বলল—'একটু জল'।

কুটীর থেকে মৃৎপাত্রে স্বচ্ছ ঝরণা-ধরা জল এনে অবশ মূর্চ্ছিতপ্রায় রাজপুত্রের মুখে একটু একটু করে ঢেলে দিল সে। রাজকুমার কৃতজ্ঞতার এক ফোঁটাও কথা বলল না। কেন সে বলবে, এ যে তার দাবী করার জিনিষ।—স্নেহ,

মমতা, ভালবাসা যেন সকলের কাছ থেকে তার পাওনা—এই তার ধারণা।

আর সে তরুণীও তার দুটো মিষ্টি কথা শোনবার প্রত্যাশা না করে আঁচল দুলিয়ে চলে গেল। রাজকুমার চোখ চাইতেই তাকে শুধু দিয়ে গেল একটুকরা হাসি।

আঁচল-ভরা ফুল কুড়িয়ে ফিরে এসে দেখে রাজপুত্র অঘোর নিদ্রামগ্ন। সূর্য্যের কিরণটা পাতার চন্দ্রাতপ ভেদ করে রাজকুমারের মুখের উপর পড়েছে। বিন্দু বিন্দু ঘাম গোলাপ-রাঙা সারা মুখ খানিতে বিছিয়ে গেছে। তরুণীর কেমন একটু দয়া হল। দয়া ঠিক নয় মনে হল 'আহা, বেচারী'। আস্তে আস্তে তার মাথাটি নিজের কোলের উপর তুলে নিল সে। নারীর হৃদয় তাই বুঝি তার এই অযাচিত করুণা। আঁচল খানি দিয়ে মুখের ঘাম ধীরে ধীরে মুছিয়ে দিল। আর রেশমের মত নরম চিকণ চুলগুলি নিয়ে আনমনে সে খেলা করতে লাগল। এখন তার সমস্ত সঙ্কোচ কেটে গেছে,—এসে তার আশ্রিত প্রজা, সে যে রাণী।

তন্দ্রার ঘোরে রাজকুমারের মনে হচ্ছিল বেশ যেন একটু আরাম। চোখ চাইতে রাজকুমারের কেমন একটু সঙ্কোচ হচ্ছিল। যখন চোখ মেলল কেমন একটু তন্ময় হয়ে গিয়েছিল। মনে হ'ল বাবে, আকাশের বক্ষে এ কোন ভাস্কর খোদিত তরুণী মূর্ত্তি, বেশ ত।

চোখ চাইতেই মেয়েটি একটু হেসে ফেলে চোখ নিচু করল।

রাজকুমার হঠাৎ তাকে দুটি হাত দিয়ে জড়িয়ে বুকের উপর টেনে নিল। মেয়েটি হেসে তার বাহুপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে উঠে দাঁড়িয়ে বল্ল—"দুষ্টু।"

আস্তে আস্তে হাসতে হাসতে ফিরে ফিরে তাকাতে তাকাতে সে চলে গেল। রাজকুমারের কতবার ইচ্ছা হয়েছে যে ডেকে বলে—যেও না।

বাড়ী এসে রাজকুমারের ত সে সব কথা মনেই নেই। একদিন দুপুর রাত্রে অসহ্য গরমে কুমার ছটফট করছে, দর দর ঘাম পড়ছে, সারা গাটি ঘামে ভিজে গিয়েছে।

হঠাৎ তারি কথা—সেই তরুণীর কথা তার মনে হল, সেই আঁচল দিয়ে তার ঘাম মুছিয়ে দেবার কথা। তখনই সে যেন কিসের একটা মস্ত অভাব অনুভব করতে লাগল। আঁচলে তার কি ছিল? কুমারের ছটফটানি দ্বিগুণ বাড়িয়ে তুলল। 'উঃ আঃ'—শব্দে ভৃত্যের নিদ্রাভঙ্গ হয়ে দেখে কুমার অসহ্য গরমে ছটফট করছে। তাড়াতাড়ি পাখাটা নিয়ে ব্যজন করতে লাগল।

কুমার বিরক্ত স্বরে বল্ল "যা তোর বাতাস করতে হবে না।"

রাজকুমারের একি হল—প্রতিদিন সে সেই আঁচলের অভাব অনুভব করতে লাগল। যখন সে পরিশ্রম করে এসে একটু বিশ্রামের চেষ্টা করে, তার পরিশ্রমের অবসাদ ত দূরই হয় না, বরং দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয়।

একদিন কুমার তেমনি দুপুর রোদে সেই বনের দিকে চলল।

সেই জায়গাটিতে এসে সে সেই রকম করে শুয়ে রইল। এত আর অবসাদের মূর্চ্ছা নয়; প্রাণের ছটফটানি। শুয়ে থাকতে পারবে কেন। উঠে আনমনে এক পা এক পা করে এগিয়ে যেতে লাগল কোন দিকে, সে কি তা জানে।

এত অসাবধান, কাটায় বেশ করে কাপড়টা জড়িয়ে গেছে। কত চেষ্টা করছে। এক দিকটা খুলছে ত অন্য দিকটা বেধে যাচ্ছে।

আস্তে আস্তে সেই তরুণী তার পিছনে এসে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। এক বোঝা ঘাস তার মাথায়, আর এক হাতে একটা ভেড়ার বাচ্ছুরের কাণটা ধরে। বারংবার ব্যর্থ চেষ্টায় রাজকুমারের কান্না আসছিল। হঠাৎ পিছনে হাসির শব্দে চেয়ে দেখে—তার মুখখানিতে অপ্রস্তুতের রাঙা ছবি ফুটে উঠল।

তরুণী বাচ্ছুরটার কাণটা তাকে ধরতে বল্ল। "ধরত।"—এ যেন রাজ্ঞীর আদেশ।

মুহূর্ত্ত মধ্যে কেমন করে সে তাকে মুক্ত করে দিল।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে তবুও এত কি তাদের গল্প। রাজকুমারই বেশী কথা কইছে,—সেই সেই দিনকার, সব পুরাণ কথা—কেমন করে সে দারুণ তৃষ্ণার সময় তাকে জল দিয়েছে, আর কেমন করে সে তার আঁচল দিয়ে—।

তরুণী খুক খুক করে হেসে উঠল। রাজকুমার বড় অপ্রস্তুতে পড়ে গেল, বুঝি মনে হল সব সে বুঝতে পেরেছে।

এবার তরুণীর কথা—"তোমাদের বাড়ী বুঝি ভিন গাঁয়ে? গাঁয়ের নাম কি? তোমার কে কে আছে"

ইত্যাদি। শেষকালে তার গল্প থেমে গেল—"তুমি যদি রোজ এখানে আস ত বেশ ভাল হয়।" বলে ফেলেই তার কেমন একটু বিশেষ লজ্জা হল।

রাজকুমার প্রথমে 'হাঁ', 'না' করে দু একটা উত্তর দিচ্ছিল, তারপর তার সঙ্কোচের বাঁধ কেমন করে ভেঙ্গে গেল, বুঝি তরুণীর সেই আপন করা চোক দুটির পানে চেয়ে।

সে আরম্ভ করল, এই দেশের সে রাজপুত্র, তাদের মস্ত বাড়ী, কত লোক। আর শেষ হচ্ছে- তাকে তার বড ভাল লাগে। তারপর কেমন একটু অভিমানের স্বরে বলতে আরম্ভ করল—রাত্রে যখন বড গরম হয়, তার আঁচল দিয়ে ঘাম মুছিয়ে দেবার কথা মনে হয়। বুঝি তরুণী ইচ্ছা করলেই ঘাম নিবারণ করতে পারে, কেন সে করে না? বলতে বলতে রাজকুমারের মুখ রাঙা হয়ে উঠল।

কখন অজ্ঞাতে কুমার তরুণীর হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে নিয়েছে। গল্প করতে করতে কোমল পেলব আঙ্গুলগুলি নিয়ে খেলা করেছে, আর তাই শুনতে শুনতে বিভোরা তরুণী তার দেহ খানিকে এমন এলিয়ে দিয়েছে যে, তাদের উভয়ের নিশ্বাস উভয়ের কপোল স্পর্শ করছিল। সূর্যের আলোতে তারা তা টের পায়নি। যখন তাদের চারিদিক সন্ধ্যার বেড়া জালে ঘিরে ফেল্ল, তখন তাদের চেতন হয়েছে। কিন্তু কি লজ্জা। উভয়েরই মনে হচ্ছে, কি ভুলটা হয়ে গেছে—উঃ কি ধরাটা পড়েছে সে।

তরুণী কুমারের হাতখানি ধরে বলে দিল যেন সে আসে। আর বলে দিল এবার এলে একগাছি মহুয়া ফুলের মালা। মনে থাকে যেন।

রাজকুমার আসে। তরুণীর কোলের ওপর মাথা রেখে মহুয়া ফুলের মত নিটোল মুখ খানির দিকে চেয়ে কত কথা মনে করে। বুঝি মনে হয়, তার মুখ খানি কি চিরদিন বুকে রাখতে পারে না। আবেগে তার সারা হৃদয় ছাপিয়ে ওঠে, যেন তাকে না পেলে সে মরে যাবে। দু'হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে তার বুকের জমাট কথাগুলি ওষ্ঠে প্রকাশ করে। তরুণী নয়ন কোণে হেসে শুধু বলে "দুষ্টু।"

রাজকুমার ফিরে যাবার সময় প্রত্যহই তার প্রতিশ্রুত মালা চায়, বুঝি মনে করে মালা গাছটি পেলে সারা রাত বুকে ধরে একটু ঘুমবার চেষ্টা করবে। কিন্তু তরুণী 'কাল দেব' বলে প্রতিদিনই সে কথা ঠেলে রাখে। বুঝি মনে করে, এ মালা গাছটির লোভেই রাজকুমার আসে; না, তরুণী জানে, তাদের দেশের নিয়ম মালা কারও গলায় দিতে নেই, হাতে দিতে আছে। শুধু যাকে বিয়ে করবে তারই গলায় পরিয়ে দিতে হয়। তরুণী ত তার গাঁথা মালা কুমারের হাতে দিতে পারবে না, তার যে মন চায় তার গলায় দিতে।

কুমার আর আসে না। দিন যায়, মাসের পর মাস যায়। আসেনি সে আজ পাঁচ মাস।

আজ রাজা শুদ্ধ কত আনন্দ—রাজকুমারের বিয়ে। কত রকম আনন্দের আয়োজন—সত রকম আছে, ভাল মন্দ।

বিয়ে হয়ে গেল।

সন্ধ্যাবেলা রাজকুমার সভামণ্ডপে বসে আমোদের প্রত্যেক খুটিনাটিটি উপভোগ করছে।

'কাজরী' নৃত্য হবে। একবার এগিয়ে একবার পেছিয়ে ঘুরে ফিরে নৃত্য নর্তকীর দল কুমারের কাছে এগিয়ে এল। সম্মুখে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে গান হচ্ছিল।

দলের মাঝখান থেকে এক তরুণী একগাছি শুকনো মালা হাতে করে ধীরে ধীরে রাজকুমারের পাশে এসে দাঁড়াল। কম্পমান হাত খানি বাড়িয়ে গলায় পরিয়ে দিল সে মালা। তখনও গান চলছে 'বঁধু নয়ন জলে গাঁথা মালা পরিও গলে।'

শ্রীনরেন গাঙ্গুলী।

উচিত-বক্তা

নিজেরে উচিত বক্তা মনে করে যারা,
সব হতে তারা গর্ব্বী মোহান্ধ ভীষণ।
বিশ্বাস-সিদ্ধান্ত নিজ, ভাবে সদা তারা
একান্ত অভ্রান্ত বেদবাক্যের মতন॥

শ্রীকালিদাস রায়।

ঈষ্টলীন

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

কয়েক বৎসর চলিয়া গিয়াছে। লেডী ইজাবেলের সেই কন্যা ইজাবেল লুসী এখন পাঁচবৎসরের হইয়াছে। আরও দুইটি পুত্র সন্তান ইজাবেলের হইয়াছে, নাম যথাক্রমে উইলিয়াম ও আর্কিবাল্ড উইলিয়ামের আকৃতিতে যেন মাতার ছবিখানিই ফুটিয়া উঠিয়াছে,—কিন্তু আর্কিবাল্ডকে দেখিলে মনে হয়, পিতার মতই দীর্ঘায়ত বলিষ্ঠ এবং পুরুষোচিত মহিমাময় রূপের অধিকারী সে হইবে। এই শিশুটি এখন মাত্র এক বৎসরের হইয়াছে। কয়েকমাস পূর্ব্বে লেডী ইজাবেল কঠিন রোগে বড় পীড়িত হইয়া পড়েন,—সুচিকিৎসার গুণে আসল রোগের বিকার এখন দূর হইয়াছে বটে, কিন্তু যারপরনাই একটা দুর্ব্বলতা এখনও রহিয়া গিয়াছে, কোনও ঔষধেই সেটা যাইতেছে না। বড়ই কাতর তাঁহাকে দেখায়, মুখে যেন রক্তের লেশ নাই, শুকাইয়া একেবারে এতটুকু হইয়া গিয়াছে। শুকান সেই মুখখানিতে সুমিষ্ট চক্ষু দু'টি এখন অনেক বড় দেখায়, আর চারিধার ঘোর কালিমায় ঢাকিয়া গিয়াছে। হাত দুখানি অতি শীর্ণ আর সর্ব্বদাই কিছু উষ্ণ। এখন বেশ গরম পড়িয়াছে। কিন্তু সর্ব্বদা একটা শাল জড়াইয়া তাঁহাকে বসিয়া থাকিতে হয়। আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া যায়, এক ভাবে চুপ করিয়াই বসিয়াই আছেন—কখনও স্থির দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকেন, কখনও বা ছেলেপিলেরা খেলা করিতেছে তাই দেখেন,—উঠিয়া একটু ঘোরা ফেরা করিতে যেন ইচ্ছাই একেবারে হয় না। দিনে একবার মাত্র পালকী গাড়ীতেই বাহিরে একটু বেড়াইতে যান। ইহা ছাড়া আর কোনও রকম কোনও কাজে কখনও একটু নড়া চড়া করেন না।—দেহ নিরতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে যেমন একটা গাছাড়া অবসন্ন ভাব লোকের দেখা যায়, ঠিক তেমনই একটা ভাবই তাঁহার হইয়াছে।

এই ব্যারামের সময় বার্বারা হেয়ার সম্বন্ধীয় সেই পুরাতন বেদনার স্মৃতি আবার নূতন করিয়া লেডী ইজাবেলের মন ভরিয়া উঠিয়াছিল। গত কয় বৎসর এরূপ কোনও সন্দেহের কারণ তিনি কিছু দেখিতে পান নাই। বেদনাটাও একেবারে লুপ্ত না হউক, সুপ্ত অবস্থায় ছিল। কিন্তু ইজাবেলের শরীরের অবস্থা এখন এমনই হইয়াছিল, যাহাতে মনটা স্বভাবতঃই বড় খারাপ থাকে, নূতন কি পুরাতন যে কোনও অশান্তিই বড় প্রবল হইয়া উঠে।

কার্লাইল প্রকৃতপক্ষেই তাহাকে ভালবাসেন কিনা, অথবা বার্বারাকেই ভালবাসিয়া কেবল তাঁহার রূপ ও কুলগৌরবে প্রলুব্ধ হইয়া বিবাহ করিয়াছিলেন, এই একটা অশান্তিকর চিন্তা সর্ব্বদাই ইজাবেলের মনে উঠিত। বিবাহের প্রথম বৎসর স্বামীর আদরসোহাগে যেরূপ উদ্বেল একটা আবেগ ছিল, এখন অবশ্য তাহা নাই, অনেকটা সংযত ও শান্ত হইয়া আসিয়াছে। সকল স্বামীরই এরূপ হইয়া থাকে। তাঁহার প্রেম যে কিছুমাত্র হ্রাস পাইয়াছে, ইহাতে এরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই। প্রেম যত গভীরই হউক, তার প্রথম আবেগের ফেনিল উদ্বেলতা স্বভাবতঃই শেষে নরম হইয়া আইসে।—কিন্তু লেডী ইজাবেল স্বামীর সেই আবেগের এই স্বাভাবিক পরিণতিটা বুঝিতেন না; বরং ঈর্ষ্যাবশতঃ মনে করিতেন, বার্বারার প্রতি পুরাতন প্রেমের জাগ্রত স্মৃতি হইতেই তাঁহার প্রতি স্বামীর এই উদাসীনতা জন্মিয়াছে। প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হইত, আগের মতই সেই উদ্বেল আবেগে অবিরত তিনি তাঁহাকে সোহাগ করেন,—যখন গৃহে আসেন, চেয়ারের উপর ঝুকিয়া থাকেন, গাম্নিতে গাম্নিতে মুখখানি তুলিলেই তেমনই আগ্রহে চুম্বন করেন। পাঠক-পাঠিকাবর্গ জানেন, বিবাহের সময় এই ইজাবেল কার্লাইলকে

ঠিক প্রেমিকার মত ভাল বাসিতে পারেন নাই। বিবাহের পর কার্লাইলের অসাধারণ স্নেহে ও আদর যত্নে তাঁহার প্রতি গভীর একটা সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতায় ইজাবেলের হৃদয় পূর্ণ হইয়াছিল এবং প্রেমিকার মতই স্বামীকে ভালবাসিতে তিনি অতি আগ্রহে চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু বৃথা চেষ্টা! প্রেম চেষ্টায় জন্মে না, প্রেম কোন যুক্তি মাগে না, নিয়ম কানুনও মানে না,—কখন কার প্রতি যে কার প্রেমের আকর্ষণ হইবে কেহই বলিতে পারে না, যার হয় সেও আগে বুঝিতে পারে না। ভালবাসিব না মনে করিলেও ভালবাসিয়া লোকে ফেলে। যারপরনাই গভীর ও আন্তরিক একটা শ্রদ্ধা, বড় একটা নির্ভরতা স্বামীর প্রতি ইজাবেলের জন্মিয়াছিল। তাই ইজাবেল হয়ত মনে করিতেন, স্বামীকে তিনি এখন ভালবাসিতে পারিয়াছেন। অন্যের সঙ্গে যখন স্বামীকে তুলনা করিতেন, স্পষ্ট বুঝিতেন তিনি কত ভাল, কত বড়, সাধারণ সব লোক হইতে দেহসৌভাগ্যে ও চরিত্রমহিমায় কত উচুতে তিনি আছেন। এমন লোকের স্ত্রী তিনি, প্রাণটা তাঁহার গৌরবে কত উচু হইয়া উঠিত। মনে হইত, কোনও রাজকন্যাও কার্লাইলের মনোনীতা স্ত্রী হইতে পারিলে আপনাকে ভাগ্যবতী বলিয়া অনুভব করিতে পারেন। কিন্তু ইঁহার মনের এক কোণেও বার্বারার জন্য একটু স্থান যদি থাকে।—না, না, তা হইতেই পারে না! ইজাবেল সে স্থান আর কাহাকেও এতটুকু ছাড়িয়া দিতে পারেন না!

যাহা হউক, যখন দেখা গেল, কোনও ঔষধেই ইজাবেলের এই দুর্ব্বলতা দূর হইতেছে না, তখন ডাক্তার মার্টিন উপদেশ দিলেন, বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহাকে ফরাসী দেশের উপকূলে কোনও সহরে পাঠান হউক। তাহাই শেষে স্থির হইল।

আজ রাত্রিতেই ইজাবেল চলিয়া যাইবেন। তিনি বসিয়া আছেন, ছেলে মেয়ে তিনটি কাছেই খেলা করিতেছে। ইহাদের ছাড়িয়া যাইতে প্রাণটা বড় কাঁদিতেছিল। চাহিয়া চাহিয়া ইজাবেল কহিলেন "এস, আমার কাছে এস।"

ইজাবেল লুসী ও উইলিয়ম ছুটিয়া মার কাছে আসিল, শিশু আর্কিবাল্ড মেঝের উপর বসিয়াছিল, হাত পা ছুড়িতে লাগিল,—দুটি বাহু বাড়াইয়া ইজাবেল পুত্রকন্যা দুটিকে জড়াইয়া ধরিলেন,—কহিলেন, "তোমরা আমার সঙ্গে যাইবে!—জাহাজে চড়িয়া সেই সাগর পারে?"

বালিকা ইজাবেলও মাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "যাব মা যাব, জাহাজে চড়িয়া সাগর পারে যাব, আর্চিও যাবে?"

"হাঁ, আর্কি টার্কি সবাই? আর জয়েস যাবে, উইলসন যাবে আর—"

কর্ণীবিবি ঐ ঘরেই একটি জানালার কাছে বসিয়া সেলাই করিতেছিলেন,—সহসা তীব্র দৃষ্টিতে ফিরিয়া ইজাবেলের এই আনন্দের স্ফূর্ত্তিতে বাধা দিলেন। মুখে স্পষ্ট কিছু না বলিলেও স্বাস্থ্যলাভের জন্য ইজাবেলের এই স্থানান্তরগমনের প্রস্তাব মনে মনে তিনি একেবারেই পছন্দ করেন নাই।—হাওয়া বদলাইতে লোকে দূরে যাইতে চায় কেন? তিনি ত এরূপ প্রয়োজন কখনও বোধ করেন নাই। ডাক্তারদের মাথায় আজকাল নূতন নূতন কত খেয়ালই ঢুকিতেছে! কথায় কথায় হাওয়া বদলাইতে তারা বলে। ইহার পর কাহারও একটু আঙ্গুল কাটিয়া গেলেও হাওয়া বদলাইবার ব্যবস্থা করিবে। কি আর এমন হইয়াছে?—লেডী ইজাবেল, একটু গা ঝাড়া দিয়া উঠিলে বাড়ীতে থাকিয়াই বেশ ভাল হইতে পারেন।

যাহা হউক, মুখ ফিরাইয়া তীব্র স্বরে তিনি কহিলেন, "না, ছেলে পিলেরা আবার কোথায় যাইবে? তাদের ত ডাক্তার হাওয়া বদলাইতে সাগরপারে যাইতে বলেন নাই!"

ইজাবেল উত্তর করিলেন, "না, ওরা আমার সঙ্গে যাইবে। ডাক্তার নাই বলুন, তাই বলিয়া যাইবে না কেন?"

"কেন যাইবে না? যাইবে না, খরচ অনেক বাড়িবে তাই।—তা সত্যি বলিতে কি, লেডী ইজাবেল, আজ এ খরচ কাল ও খরচ—এত খরচে জানিবেন আপনার স্বামী একেবারে নাশ পাইবে। একগাড়ী বোঝাই করা ছেলে পিলে আর তাদের ধাই দাসী, সব না গেলেও শুধু জয়েস্ আর পিটারকে লইয়া আপনি একা যে যাইবেন, তার খরচই বড় কম পড়িবে না, মেম সাহেব!"

ইজাবেল যেন এতটুকু হইয়া গেলেন।—কোনও উত্তর মুখে আসিল না।

কর্ণী বিবি বলিতে লাগিলেন, "কেবল তা কেন? আপনি যাইতেছেন শরীর শোধরাইবে বলিয়া। 'ছেলেপিলের ঝঞ্ঝাট থাকিলে তাও ত হইবে না। লোকে বিদেশে যায় আমোদ আহ্লাদের জন্য! আর রোগী যায় স্বাস্থ্যের জন্য। তাদের সব ঝঞ্ঝাট যদি সাথে করিয়া নিয়া যায় কিছুই এর ঘটে না।"

ইজাবেল ইহারও কোনও উত্তর না করিয়া উঠিলেন,—আর্কিবাল্ডের কাছে গিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কষ্টে তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন,—তার মুখখানি নিজের মুখের উপরে চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, "আহা খোকামণি! আমার খোকামণি! মা ফেলিয়া চলিয়া যাইবে খোকামণির কি তা ভাল লাগিবে।"

বলিতে বলিতে সানুনয় করুণ দৃষ্টিতে কর্ণী বিবির দিকে চাহিয়া কহিলেন "দেখুন, আমি এদের ছাড়িয়া যাইতে পারিব না। একা গেলে শরীরও ভাল হইবে না, কেবল প্রাণ কাঁদিবে।"

'একা! বলেন কি লেডী ইজাবেল? আপনার স্বামী কি কেউ নয়?'

"তিনি ত কেবল আমাকে নিয়া রাখিয়া আসিবেন। সঙ্গে ত আর থাকিতে পারিবেন না।"

"হাঁ—সে তার কাজকর্ম্ম সব গোল্লায় দিয়া আপনার সঙ্গে গিয়া থাকিবে এটা কি আপনি চান? এই যে সব এত বড় খরচের ভার তার কাঁধে পড়িতেছে, এতে আরও বেশী তার কাজে লাগিয়া থাকা দরকার হইবে। ছেলেপিলেদের জার্সিজে বোন খাওয়াইয়া সাঁগরপারে নিয়া যাইবার, একবার হিসাব করিয়া দেখিলে ভাল হয় কত গিয়া খরচের জায় তাতে নাবে; যাক আমি আমার যা মত তাই মাত্র বলিলাম আপনি আর্কিবাল্ডের স্ত্রী, ঘরের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী, আপনার যা খুশী হয় করিবেন।"

হায়! যা খুসী হয় করিবেন—কখনও কি তা তিনি পারেন? একেবারে তাঁহার মুখ বন্ধ হইয়া গেল। ছেলেপিলেদের জড়াইয়া ধরিয়া তাদের মাথার উপরে বেদনাক্লিষ্ট মুখ খানি রাখিয়া তিনি বসিয়া রহিলেন। বুক ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। জয়েস নিকটে ছিল। কতক সে শুনিল, বাকী সব বুঝিয়া নিল। কিন্তু সে কি করিবে?

সন্ধ্যা বেলায় কার্লাইল কন্যা ইজাবেলকে কাঁধে লইয়া একবার 'নার্সারী' গৃহে * প্রবেশ করিলেন। জয়েস সেখানে ছিল, দেখিল এই সুযোগ, কহিল,—"সাহেব, লেডী সাহেবা ছেলে পিলেদের সবাইকে সঙ্গে নিয়া যাইতে চান।"

"তাই নাকি?"

"ওরা না গেলে, তাঁর মনও বোধ হয় ভাল থাকিবে না।"

"তা হ'লে কেন তারা যাইবে না?"

স্ত্রীর কাছে গিয়া কার্লাইল কহিলেন, "ইজাবেল, তুমি ওদের সব সঙ্গে নিয়া যাইতে চাও?"

বিষণ্ণ বিবর্ণ মুখ খানি আনন্দের উচ্ছ্বাসে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ইজাবেল কহিলেন, "ইচ্ছা ত খুবই করে তারা আমার সঙ্গে যায়। যদি সুবিধা হয়"

"কেন সুবিধা হইবে না? অবশ্য হইবে। তাদেরও ত বেশ একটা হাওয়া বদলান হইবে। তুমি এত কুণ্ঠিত কেন হইতেছ?"

"খরচ বড় বেশী পড়িবে—"

মধুর হাসি ভরা চোখে ইজাবেলের মুখপানে চাহিয়া কার্লাইল কহিলেন, "খরচ কি পড়ে না পড়ে তোমার তার জন্য এত ভাবনা কেন? সে যা হয় আমি দেখিব। খরচ খরচ করিয়া তুমি মাথা ঘামাইও না। যদি তার দরকার কখনও হয়, আমিই বলিব।"

সানন্দ হাসিতে উজ্জ্বল চক্ষুদুটি তুলিয়া ইজাবেল কহিলেন, "খরচ যে এতে মোটের উপর খুব বাড়িবে, তাও নয়। ওরা সঙ্গে থাকিলে খুব শীঘ্রই আমি সারিয়া আবার ফিরিয়া আসিব।"

"আর তার জন্যে দরকার হইলে ওদের তুমি পৃথিবীর শেষ সীমা পর্য্যন্ত সঙ্গে নিয়া যাইতে পার। তোমার যা ভাল লাগে, তোমার যাতে আরাম হয়, তা ছাড়া অন্য সব কথা কেন অত ভাব?"

বুকভরা আনন্দে স্বামীর হাত দুটি ইজাবেল চাপিয়া ধরিলেন। আহা, কি অপরিসীম স্নেহ স্বামীর তাঁহার প্রতি!

* ধনীর গৃহে শিশুরা একেবারে ধাত্রীর বা নার্সের হাতে প্রতিপালিত হয়। বাড়ীর নির্দ্দিষ্ট এক অংশে শিশুদের লইয়া তারা থাকে,—এই অংশের নাম নার্সারী।—ইহার অনুরূপ কোনও নাম বাঙ্গালায় নাই, কারণ এরূপ ব্যবস্থাও এদেশে নাই।

তাঁহার একটু সুখের জন্য কি আকুল আগ্রহ ইহার! সকল ঈর্ষা, সকল সন্দেহ, সকল দুশ্চিন্তা, সব তাঁহার মন হইতে তখনকার মত দূর হইয়া গেল। তাঁহার আদরে প্রথম বিবাহিত জীবনের সেই অধীর আবেগ যে এখন আর নাই, ব্যবহারে অনেকটা ধীর ও সংযত ভাব দেখা যায় যাহাকে ইজাবেল উদাসীনতা মনে করিয়া ক্ষুণ্ণ হইতেন—সে সব কথাও তখন ভুলিয়া গেলেন। বলিয়া ফেলিলেন, "আর্কিবাল্ড! সত্যই আমি বিশ্বাস করি, সেই আগের মতই তুমি আমায় ভালবাস।"

কথাটার তাৎপর্য্য কার্লাইল ঠিক বুঝিলেন না। যাহা হউক, আগ্রহে ইজাবেলকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া সেই আগের মতই উচ্ছ্বসিত আবেগে তাঁহার মুখে চুম্বন করিয়া তিনি কহিলেন, "ইজাবেল! তার চাইতে অনেক—অনেক বেশী ভালবাসি এখন তোমায়,—অনেক বড় যে তুমি এখন আমার হইয়াছ।"

কর্ণীবিবি শুনিয়া একেবারে আগুন হইয়া উঠিলেন, ভ্রাতাকে বুঝাইলেন, ছেলেপিলেদের সঙ্গে পাঠাইলে ইজাবেলের আরোগ্যলাভের কোনও সম্ভাবনাই থাকিবে না। একদিকে স্ত্রীর আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে স্ত্রীর মঙ্গল—একটার দিকে চাহিলে আর একটা হয় না, বিষম একটা দ্বিধার সঙ্কোচে কার্লাইল পড়িলেন। কি করিলে ভাল হয় নিজে বুঝিতে পারিবেন না, ইজাবেলও বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু অবশেষে স্থির করিলেন, ডাক্তারের মত জিজ্ঞাসা করিবেন। কর্ণীবিবি আগেই গিয়া ডাক্তারকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া আসিলেন, ছেলে পিলেদের সঙ্গে নিয়া গেলে ইজাবেলের একটুও স্বস্তি হইবে না, ব্যারাম সারিবে না। ডাক্তারও আসিয়া স্পষ্ট বলিলেন, ছেলে পিলেদের যাওয়া হইতে পারে না। অগত্যা লেডী ইজাবেলকে এই আশাভঙ্গের বেদনা সহিতে হইল।

ইজাবেল কহিলেন,—"জয়েস, আমি উইলসনকে সঙ্গে নিব, তুমি বাড়ীতে থাক।"

"কেন লেডী সাহেবা! আমি কি করিয়াছি?"

"যা করা উচিত তাই করিয়াছ, অন্যায় কখনও কিছু কর নাই। কিন্তু ছেলে পিলেদের নিয়া তোমাকে বাড়ী থাকিতে হইবে। সঙ্গে যখন নিতে পারিলাম না, তখন এক তোমার কাছেই তাদের রাখিয়া যাইতে পারি। তোমার হাতেই তাদের ভার আমি দিয়া যাইব, মিস্ কার্লাইলের হাতে নয়। কিন্তু উইলসন থাকিলে ত তা পারি না।"

"তা লেডী সাহেবা যা ভাল মনে করেন, তাই করিবেন। আমার ত ইচ্ছা করে, আপনার সঙ্গে থাকি, আবার ওদেরও দেখি শুনি, তা দুই-ই ত হইবার যো নাই।"

ইজাবেল কহিলেন,—"ব্যারাম সারিবে, শরীর ভাল হইবে, তার জন্য আমাকে পাঠাইতেছেন। কিন্তু কে জানে, হয়ত না সারিতেও পারে। যদি আমি না ফিরি জয়েস্, বল, আমার বাছাদের সঙ্গেই তুমি থাকিবে।"

জয়েসের সমস্ত দেহের রক্ত যেন শির শির করিয়া আসিল, বুক ভাঙ্গিয়া রোদনের উচ্ছ্বাস উঠিল, অতি আয়াসে আত্মসম্বরণ করিয়া সে কহিল, "লেডী সাহেবা, ভয় কি! আবার আপনি যেমন ছিলেন তেমনই সুস্থ হইয়া ফিরিয়া আসিবেন, সেই ভরসাই সর্ব্বদা মনে রাখিবেন।—ও সব কুকথা কিছু ভাবিয়া মনটা খারাপ করিবেন না।"

"না, না তা করিব না। ভরসা ত করি, আবার সুস্থ হইয়া ফিরিয়াই আসিব। তবু কিছুই ত বলা যায় না, শরীর আমার মোটেই ভাল নয়। তা বল জয়েস্, আজ এই অঙ্গীকার আমার কাছে কর, যদি ভালমন্দ আমার কিছু হয়, ওদের কাছে তুমি থাকিবে।"

"থাকিব লেডী সাহেবা, এঁরা যতদিন রাখেন ছাড়িয়া আমি কোথাও যাইব না।"

"আর ওদের খুব ভালবাসিও, স্নেহ করিও, ঐ আর—আর—আর দেখিও, কোনও কঠোর ব্যবহার কেহ না করে—(কর্ণীবিবির কথাই ইজাবেলের তখন মনে হইতেছিল) আর যদি চলিয়াই যাই, আমার কথা ওদের কাছে বলিও।"

"বলিব। যা বলিলেন সব করিব, লেডী সাহেবা, সব করিব।"

জয়েস দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ইজাবেল উঠিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কার্লাইল ইজাবেলকে লইয়া গেলেন,—সঙ্গে পিটার ও উইলসন্ গেল। ফরাসী দেশের উত্তর উপকূলে, অর্থাৎ ইংলণ্ডের ঠিক অপর পারে সমুদ্রতীরে একটি সহরে ইজাবেল থাকিবেন এইরূপ স্থির হইয়াছিল যথাসময়ে তাঁহারা সেখানে গিয়া পৌঁছিলেন। সমুদ্রের পারেই পোতাশ্রয়

নিকটে ভাল একটি বাসা পাওয়া গেল। সেই থানে ইজাবেলকে রাখিয়া তিনদিনের পরে কার্লাইল বিদায় হইলেন।

সকালে আটটায় জাহাজ ছাড়িবে—তাড়াতাড়ি ব্রেক ফাষ্ট সারিয়া ইজাবেলের কাছে গিয়া কার্লাইল কহিলেন আসি তবে এখন ইজাবেল! খুব সাবধানে থাকিবে। শরীর যাতে ভাল থাকে, সর্ব্বদা তার দিকে দৃষ্টি রাখিবে।"

"এস আর্কিবাল্ড! খোকাখুকীদের আমার ভালবাসা দিও! আর—আর——"

"আর কি? বল সময় যে আর মোটেই নাই।"

"আর—দেখিও—বার্বারার সঙ্গে যেন আবার ভালবাসাবাসি করিও না।"

কতকটা হাসিতামাসার ভাবেই ইজাবেল কথাটা বলিয়া ফেলিলেন। কার্লাইলও সেই ভাবে সেটা গ্রহণ করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। যদি কার্লাইল ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারিতেন, কেবল হাসিতামাসার ভাবেই ইজাবেল কথাটা বলেন নাই, এইরূপ বাস্তবিক একটা সন্দেহও তাঁহার মনে ছিল, কিই না যেন তিনি ভাবিতেন। গাধায় চড়িয়া সারাটা দেশ ঘুরিয়া কেহ আসিত বলিলেও বুঝি অতটা বিস্মিত তিনি হইতেন না।

আরও কতক্ষণ পরে শয্যাত্যাগ করিয়া ইজাবেল উঠিলেন। ব্রেক ফাষ্ট প্রস্তুত হইল, টেবিলে গিয়া বসিলেন। কিন্তু আহারে রুচি ছিল না, মনটাও ভাল লাগিতেছিল না। আরও কয়েক সপ্তাহ এখানে থাকিতে হইবে,—কি করিয়া সময় তিনি কাটাইবেন? ইতিমধ্যে দুইদিন সমুদ্রে স্নান করিয়াছেন, কিন্তু শরীর তাহাতে অসুস্থই বোধ করিয়াছেন। তাহাও আর চলিবে না। আকাশ পরিষ্কার ছিল, বড় সুন্দর রৌদ্র উঠিয়াছিল,—ইজাবেলের মনে হইল, বন্দরের জেটির উপরে গিয়া একটু বসিলে মন্দ হয় না। কাল বৈকালে স্বামীর বাহু ভর করিয়া সেখানে তিনি গিয়াছিলেন। আজ তিনি নাই, কিন্তু দূরও ত বেশী নয়—নিজেই বেশ হাঁটিয়া যাইতে পারিবেন বই কি।

ধীরে ধীরে ইজাবেল গিয়া সেই জেটীতে উঠিলেন। শেষপ্রান্তে গিয়া একখানি আসনের উপরে বসিলেন। পিটার সঙ্গে গিয়াছিল—তাহাকে বলিয়া দিলেন, ঘণ্টা খানেক পরে যেন আসিয়া তাঁহাকে সে নিয়া যায়।

বৈকালের মত অত ভিড় জেটীতে না থাকিলেও মধ্যে মধ্যে লোক বেড়াইতে আসিতেছিল। ইজাবেলের দৃষ্টিও তাহাদের দিকে আকৃষ্ট হইতেছিল। প্রথমে একজন বুড়ো লোক খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিল বাতে ফুলা পায়ে তার মোটা নরম কাপড়ের জুতা পরা। তারপর আসিল তিনটি যুবতী কুমারী সঙ্গে তাহাদের শিক্ষয়িত্রী। তারপর আসিল, দুইটি সহুরে ফোকর, গায়ে শিকারীর কোট, হাতে 'আইগ্লাস' (ey glass)! আইগ্লাস তুলিয়া অতি নির্লজ্জ দৃষ্টিতে তারা ইজাবেলের দিকে কতক্ষণ চাহিয়া রহিল। কিন্তু সম্ভ্রান্ত মহিলার যোগ্য একটা গাম্ভীর্য্য তাঁহাতে দেখিয়া শেষে একটু যেন অপ্রতিভ হইয়াই সরিয়া গেল। কিছুকাল পরে সুদীর্ঘ-ঋজুদেহ সুদর্শন একটি ভদ্রলোক জেটীর উপরে আসিয়া উঠিলেন। ইজাবেল চাহিয়া দেখিলেন, সহসা সমস্ত দেহের শোণিত তাঁর চঞ্চল উচ্ছ্বাসে নৃত্য করিয়া উঠিল,—চিত্তের সেই নিরানন্দ অবসাদ মুহূর্ত্তে দূর হইয়া গেল। কে এ? কাপ্তেন লেভিসন যে!

লেভিসন কতদূর অগ্রসর হইলেন। ইজাবেলের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল, মুগ্ধদৃষ্টিতে কতক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া আপনমনে কহিলেন, "বাঃ! খাসা মেয়েটি ত! একা ওখানে বসিয়া আছে—কে ও? আঁ তাইত! এ যে ইজাবেল!"

টুপীটি তুলিয়া কাছে আসিয়া লেভিসন হাত বাড়াইয়া দিলেন, মুখে সেই মধুর মোহন হাসি ফুটিয়া উঠিল; কহিলেন, "বোধ হয় আমার ভুল হয় নাই—আপনিই ত লেডী ইজাবেল ভেন্? মাপ করিবেন, বলা উচিত ছিল, লেডী ইজাবেল কার্লাইল। সেই যে শেষ দেখা হইয়াছিল, অনেক দিন তারপর চলিয়া গিয়াছে, হঠাৎ আজ আবার আপনাকে এখানে দেখিলাম। আনন্দের আতিশয্যে বর্ত্তমানের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, মনে হইয়াছিল ঠিক আপনি সেই লেডী ইজাবেলই আছেন।"

লেভিসন আগ্রহে ইজাবেলের হাত চাপিয়া ধরিয়া করমর্দ্দন করিলেন। ইজাবেল কেমন যেন থতমত খাইয়া গেলেন। মুখখানি উজ্জ্বল একটা রক্তিমায় দীপ্ত হইয়া আবার পাংশু হইয়া গেল,—উঠিয়া প্রত্যভিবাদন করিয়া কোনও মতে দুই একটি কথা বলিয়া তিনি তখনই আবার বসিয়া পড়িলেন। লেভিসন চাহিয়া দেখিলেন, ইজাবেল এখনও কি সুন্দর!

সেই শেষ সাক্ষাতের পর এমন একখানি সুন্দর মুখ কই, আর ত তাঁহার চক্ষে পড়ে নাই ! পাশেই বসিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কেন আসিয়াছেন আপনি ?"

ইজাবেল উত্তর করিলেন, "বড় ব্যারাম হইয়াছিল আমার, ডাক্তাররা সমুদ্রতীরে আসিতে বলিলেন। কার্লাইল সাহেবও আসিয়াছিলেন, আজ এই সকালে তিনি ফিরিয়া গেলেন।"

"ব্যারাম হইয়াছিল ? তাইত ! আপনি যে সত্যই বড় রোগা হইয়া গিয়াছেন—একেবারে যেন মরার মত আপনাকে দেখাইতেছে ! মুখখানি অই শুকাইয়া যে একি হইয়া গিয়াছে !"

সত্যই ইজাবেলকে তখন যারপরনাই ক্লিষ্ট দেখাইতেছিল। বহুদিনের পর সহসা লেভিসনকে দেখিয়া মন ভরিয়া যে একটা চাঞ্চল্যের উচ্ছ্বাস উঠিয়াছিল, তার প্রতিক্রিয়ার ফলে মুখখানি একেবারে পাংশু হইয়া গিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া এইরূপ যে একটা চিত্তচাঞ্চল্য তাঁহার জন্মিয়াছিল, তার জন্য মনে মনে বড় তাক্ত বিরক্ত বোধ করিতেছিলেন। নিজের প্রতি নিজেরই কেমন একটা রাগও হইতেছিল। কাপ্তেন লেভিসনের প্রতি পুরাতন সেই আকর্ষণের মত একটা ভাব এখনও যে তাঁহার চিত্তে আছে, সেই মুহূর্তের পূর্ব্বে তাহা একেবারেই তিনি বুঝিতে পারেন নাই !

যাহা হউক, লেভিসনের কথার উত্তরে ইজাবেল কহিলেন, "বোধ হয় বেশী সকালে আমি বাহির হইয়া পড়িয়াছি। এখনই ফিরিয়া যাই। আমার চাকরও আসিতেছে, পথে দেখা হইবে। সুপ্রভাত (Good morning) ! আসি তবে কাপ্তেন লেভিসন।"

বলিয়াই ইজাবেল উঠিলেন। লেভিসন কহিলেন, "না, না, একা আপনি এ অবস্থায় যাইতে পারেন না—চলুন, আপনাকে আমিই বাড়ীতে পৌঁছিয়া দিব।" বলিয়াই ইজাবেলের হাতখানি নিজের বাহুর মধ্যে জড়াইয়া নিলেন, যেমন সাধারণতঃ সকলেই করিয়া থাকে। তিনিও পূর্ব্বে ইজাবেলের হাত অনেকবার এমন বাহুতে জড়াইয়া নিয়াছেন। ইজাবেলের ইহা ভাল লাগিল না। মনে হইতেছিল, ইহার সঙ্গে এরূপ ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার তাঁহার পক্ষে ঠিক ভাল কাজ হইতেছে না। কিন্তু তাঁহার পিতৃপরিবারের সঙ্গে ইহার একরূপ কুটুম্ব সম্বন্ধও আছে,—কি বলিয়া এই সাহায্য তিনি প্রত্যাখ্যানই বা করেন ?

কথায় কথায় লেভিসন বলিলেন, তিনি অনেকদিন প্যারী-সহরে আছেন।

"লম্বা ছুটী নিয়াছেন বুঝি ?"

"না, সেনানীর কাজই ছাড়িয়া দিয়াছি। কমিশন (নিয়োগপত্র)* বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছি। তা সত্য বলিতে কি লেডী ইজাবেল, আপনার কাছে সবই খুলিয়া বলিতে পারি—বড় বেশী অভাবে পড়িয়া গিয়াছি। আমার সেই বুড়া ঠাকুরদাদা (পিতার জ্যেষ্ঠতাত) একেবারে আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। আবার একটা বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছে। †

"হাঁ, শুনিয়াছি সার পিটার আবার বিবাহ করিয়াছেন।"

"তেয়াত্তর বৎসর বয়স এই—বুড়োবলদ কোথাকার অবশ্য আমার ভবিষ্যতের আশা এখন অনেকটা অনিশ্চিত হইয়া গিয়াছে, পাওনাদাররা সব আসিয়া হুরমুড় করিয়া ঘাড়ে পড়িয়াছে। সার পিটারের উত্তরাধিকারী যতদিন ছিলাম, সবাই খোসমেজাজে ধার আমাকে দিয়াছে, যখন যা চাহিয়াছি। কিন্তু সার পিটারের বিবাহের সংবাদ কাগজে যেই বাহির হইল, আমার দর যেন একেবারে শতকরা শ'য়ে নামিয়া গেল ? নূতন ধার ত আর মিলিলই না, আগের সব ধার শোধের তাগিদে তাগিদে একেবারে পাগল হইয়া উঠিলাম। কাজেই কমিশন বিক্রয় করিয়া কিছু টাকা হাতে করিয়া সরিয়া পড়িলাম।"

"পাওনাদারদের একেবারে কিছু না দিয়া ?"

"কি করি আর ? ঠাকুর্দ্দা আমার দেনাও শুধিবেন না,

---

* পূর্ব্বে লেপ্টেনাণ্ট কাপ্তেন প্রভৃতি সেনানীপদের 'কমিশন' বা নিয়োগপত্র রাজসরকারে অনেক টাকা দিয়া কিনিয়া নিতে হইত। সম্পন্ন ঘরের যুবকগণই নিত। কাহারও ভাল না লাগিলে বা টাকার দরকার হইলে অন্যের কাছে নিয়োগপত্র বিক্রয় করাও যাইত। যে কিনিত সেই ক্রেতার পদ লাভ করিত।

† লেভিসনই নিঃসন্তান এই জ্যেষ্ঠপিতামহের উত্তরাধিকারী ছিলেন। স্ত্রীর গর্ভে পুত্র হইলে লেভিসনের আর সে আশা থাকিবে না। অনেক নিঃসন্তান জমিদার উত্তরাধিকারীর প্রতি বিরাগ বশতঃ বৃদ্ধকালে আবার বিবাহ করেন। কারণ যদি সন্তান একটি হয়, বিরাগভাজন আত্মীয় উত্তরাধিকারে বঞ্চিত হইবে।

আমার গরুকের বরাদ্দও কিছু বাড়াইয়া দিবেন না।”

“তাহা হইলে, আপনার ভবিষ্যতের ভরসা এখন কি?”

“ভবিষ্যতের ভরসা! ঐ যে ছেঁড়া ন্যাকড়া পরা ছোড়া সমুদ্রের জলে ঢিল ছুড়িতেছে, ওর ভবিষ্যতের ভরসা যা, আমার এখন ঠিক তাই।”

“কে জানে, এখনও হয়ত সার পিটারের উত্তরাধিকারী আপনি হইতে পারেন।”

“পারি আবার নাও পারি। এই সব বুড়ো বলদগুলো যখন যুবতী বিবাহ করে—”

ইজাবেল কথায় বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কি সার পিটারের সঙ্গে ঝগরাটগড়া কিছু করিয়াছেন?”

“ঝগড়া করাই আমার উচিত ছিল, যদি কিছু ফল তাহাতে হইত। তা ত হইবে না, বরং আমার মাসিক খরচাটাই বন্ধ করিয়া দিতে পারেন।—তা দেখুন, স্বার্থের হিসাবটা আজকাল আমাদের সবারই করিতে হয়। নইলে চলে না!”

“আপনি কি বেশীদিন এখানে থাকিবেন?”

“ঠিক বলিতে পারি না। যদি ভাল লাগে, থাকিতেও পারি। প্যারীতে কেবলই লোকের আমোদপ্রমোদের হুল্লোড়, আগুনের মত সব ঘর, আর তাতে রাত জাগা - হয়রান হইয়া পড়িয়াছি। শরীরটা একটু তাজা করিয়া নিবার জন্ম এখানে এই সমুদ্রের পারে আসিয়াছি।”

বাসাবাড়ীর সম্মুখে তাঁহারা আসিয়া পৌছিলেন। ইজাবেল ডাকিলেন না, কিন্তু তবু লেভিসন সঙ্গে একেবারে ভিতরে গিয়া উঠিলেন, বসিয়া কতক্ষণ গল্পগুজব করিলেন। শেষে উঠিয়া বিদায় নিবার সময়ে কহিলেন, “বৈকালে আপনি কি করিবেন?”

“বোধ হয় শুইয়াই থাকিব। সারাদিন বসিয়া থাকিতে পারি না, শরীরটাও ত আজ ভাল নাই।”

লেভিসন কহিলেন, “এর পর যখন বাহিরে যাইবেন, আপনার খবরদারি করিতে আমিই সঙ্গে যাইব। ইহাতে আপত্তি অবশ্য কিছুই করিবেন না। আমি যে দৈবাৎ এখানে আসিয়া পড়িয়াছি, সেটা ভালই হইয়াছে। কেবল একজন চাকরের সঙ্গে বাহিরে বেড়াইতে যাওয়া আপনার উচিত নয়। কার্লাইল সাহেব যখন আসিবেন, আমি যে আপনার খবরদারি করিতেছি, এ জন্ম অবশ্য ধন্যবাদ আমাকে দিবেন।”

কি বলিয়া ইজাবেল ইহাতে আপত্তি করিতে পারেন? একজন পরিচিত ভদ্রলোক যেরূপ সঙ্গভাবে কোনও ভদ্রমহিলার সহায়তা করিয়া থাকেন, লেভিসন ঠিক সেই ভাবেই লেডী ইজাবেলের সহায়তা করিতে চাহিতেছেন। আপত্তি করিবার কারণ কি থাকিতে পারে? লেভিসনের সান্নিধ্য হইতে ইজাবেল দূরে থাকিতে চান, কেন? আত্ম-রক্ষার জন্ম কি? ধিক! কথাটা মনে করিতেও ইজাবেল আপনার কাছে আপনি লজ্জায় যেন মরিয়া গেলেন। যদি চিত্তের সেই পুরাতন আকর্ষণ সত্যই না দূর হইয়া থাকে, একেবারে নির্ম্মূল করিয়া তাহা ফেলিতে হইবে। দৃঢ়ভাবে মনে করিতে হইবে, সেরূপ কোনও ভাব তাঁহার মনে নাই। লেভিসনের সংসর্গ হইতে দূরে থাকিতে চাওয়ার অর্থ এইটি স্বীকার করা যে, তাঁহার প্রভাব হইতে ইজাবেলের আত্মরক্ষার প্রয়োজন আছে। ছি—ছি—ছি! ঘৃণায় লজ্জায় ইজাবেলের মুখখানি একেবারে আগুনের মত হইয়া উঠিল। না, না! ছি! কেন? কি হইয়াছে? কেন তাকে এড়াইয়া চলিবেন? সে যদি বেশী ঘনিষ্ঠতা কিছু করিতে আসে, কোনও প্রশ্রয় তাকে অবশ্য দিবেন না, সাধারণ একজন চেনা লোকের সঙ্গে ভদ্রতার খাতিরে যেটুকু আলাপ আপ্যায়ন করিতে হয়, তাই মাত্র করিবেন। এড়াইয়া তাকে চলিবেন কেন? ছি!”

কিন্তু ইজাবেল ভুল বুঝিলেন,—এ অবস্থায় এ পথ ঠিক পথ নয়।

অল্প দিনের মধ্যেই ইজাবেলের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখা গেল। এমন সুস্থ ও সবল তিনি হইয়া উঠিলেন যে, সমুদ্রের বেলাভূমিতে প্রায়ই সকালে একা তিনি বেড়াইতে যাইতেন, প্রাণ ভরিয়া নির্ম্মল বায়ু সেবন করিতেন, আর লহরে লহরে তরঙ্গগুলি যে মোহন নৃত্যলীলায় উদ্বেল হইয়া উঠিত আর নামিত, নয়ন ভরিয়া তাই দেখিতেন। স্থানীয় অধিবাসী বা প্রবাসী কাহারও সঙ্গে অধিক তিনি ঘাড়িয় পরিচয় করেন নাই,—লেভিসন ছাড়া এই মুহূর্ত্তে লেভিসন কাহাকেও দেখা যাইত না, প্রায়ই লেভিনও তার সঙ্গে দেখ গিয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিতেন, কখনও বা-

নিয়া যাইতেন। আবার বাহুর আশ্রয়কিসের এই আতঙ্ক বাসায় পৌছিয়া দিতেন। লেভিসনেরাবেল ক নও বিশ্বাস ইজাবেল বড় কুণ্ঠিত হইতেন। মনে র কল্পনাও ইজাবেলের

করিতেন, কাজটা তাঁহার পক্ষে বড় অন্যায় হইতেছে। একদিন ইজাবেল একটু হাসি ঠাট্টার ভাবেই কহিলেন, তিনি এখন বেশ সুস্থ ও সবল হইয়াছেন, কাপ্তেনের বাহু ধরিয়া চলাফেরা না করিয়াও পারেন,—এরূপ খবরদারিও তাঁহার পক্ষে এখন অনাবশ্যক। লেভিসন কিছু বিস্মিত-ভাবে কহিলেন, "কেন, কি হইয়াছে লেডী ইজাবেল? আপনার স্বামী এখানে নাই,—আমি বন্ধু, এই যে একটু সাহায্য আপনার করিতে পারি, কেন তা করিব না?"

ইজাবেল ইহার কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না,—আপত্তির কোনও কারণও দেখাইতে পারিলেন না। অগত্যা সেদিনও লেভিসনের বাহু গ্রহণ করিয়া বাসায় ফিরিলেন।

বৈকালে প্রত্যহই লেভিসন আসিতেন, ইজাবেলকে লইয়া বন্দরের জেটির উপরে বেড়াইতে যাইতেন। সেখানে লোকের ভিড় হইতে একটু দূরে গিয়া তাঁহারা বসিতেন। নারীচিত্তের প্রীতিকর মধুর আলাপে লেভিসনের অসাধারণ শক্তি ছিল। সন্ধ্যার মৃদু আলোকে জনসমাগম হইতে দূরে সমুদ্রতীরে বসিয়া নিত্য ইজাবেলকে সেইরূপ আলাপেই তিনি আপ্যায়িত করিতেন। সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইতেন; ইজাবেল তাঁহাকে ডাকিতেন না, তিনিও অনাহুত অবস্থায় এ সময়ে কখনও ভিতরে প্রবেশ করিতেন না, যদিও সকাল বেলার দিকে প্রায়ই বসিয়া কতক্ষণ গল্প গুজব করিতেন।

এখন ইহার উপায় কি? একমাত্র উপায় ছিল, ইজাবেল যদি মোটেই বাহির না হইয়া দিবারাত্র গৃহেই বসিয়া থাকিতেন। কিন্তু গৃহে বসিয়া থাকিলে ত তাঁহার স্বাস্থ্যলাভ ঘটিবে না,—এখানে আসাই বৃথা হইবে। ইজাবেল ভাবিতেন, এখন যত শীঘ্র তিনি স্বাস্থ্যলাভ করিয়া গৃহে স্বামী ও পুত্রকন্যাদের কাছে ফিরিতে পারেন, ততই ভাল।

আজই বাড়ী সপ্তাহকাল কার্লাইল চলিয়া গিয়াছেন,—হাতখানি নিজের বাহুতাঁহার আসিবার কথা। এই দুই সাধারণতঃ সকলেই লক্ষিত আশ্চর্য্য পরিবর্তন ইজাবেলের চাত্ত অনেকবার এমনজের মানসিক অবস্থার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ বেলের ইহা ভাল লাগিল হইত না,—তবে এটা তিনি বেশ এরূপ বলিষ্ঠ আত্মীয় যখন প্রথম যৌবনের সেই নবীনতা, সেই ভাল কাজ হইতেছে আবার তিনি ফিরিয়া পাইয়াছেন!

আকাশের নীলিমা, কেএ ও তরু লতার হরিৎ শোভা, ফুলের সৌরভ, সবই যেন নবীন হইয়া নবীনতার একটা মধুর স্পর্শ অবিরত তাহাকে দিতেছে। সব আগেও যেমন ছিল, এখনও তেমনই আছে, কিন্তু চিত্ত যে একটা নবীন মাধুরীতে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই ফলে সমস্ত প্রকৃতি তাহার কাছে এখন নবীন সুন্দর ও মধুর বোধ হইতেছে, সেটিও তিনি বেশ বুঝিতেন। কিন্তু কেন যে এইরূপ হইল, সে রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখিবেন, নিজের অন্তরে তাহার সত্য স্বীকার করিবেন, এ ভরসা কখনও তাঁহার হইত না।

তাঁহার এই পরিবর্তনে, সেই অস্বস্তিকর অলস অবসাদের পরিবর্তে মনের এই নবীন স্ফুর্ত্তিতে মুখের সেই শীর্ণতা, পাণ্ডুরতা সব দূর হইয়া স্বাস্থ্যের পুষ্টিতে তাহা ভরিয়া সমুজ্জ্বল কান্তিতে কি সুন্দরই এখন তাহা হইয়া উঠিয়াছে!

আজ কার্লাইলের আসিয়া পৌঁছিবার কথা। লেভিসনের সঙ্গে ইজাবেল জাহাজঘাটে গিয়া দাঁড়াইলেন। নামিয়াই ইজাবেলকে দেখিয়া সানন্দবিস্ময়ে তাঁহার দুটি হাত চাপিয়া ধরিয়া কার্লাইল কহিলেন, "বাঃ! তুমি যে প্রায় সারিয়া উঠিয়াছ ইজাবেল!"

বলিতে বলিতে লেভিসনের দিকে তিনি ফিরিলেন। কে এ লোকটি? চেনা চেনা লাগিতেছে, অথচ ঠিক চিনিতে পারিতেছেন না।

ইজাবেল কহিলেন, "কাপ্তেন লেভিসন। তোমাকে ত লিখিয়াছিলাম, ইনি এখানে আছেন। কেন, ভুলিয়া গিয়াছ?"

হাঁ, কার্লাইল ভুলিয়াই তা গিয়াছিলেন। লেভিসন বলিয়া উঠিলেন, "আমি যে এখানে আসিয়াছিলাম, ইহাতে বড় সুখীই হইয়াছি। বেড়াইবার সময় লেডী ইজাবেলের সঙ্গে থাকিতে পারিয়াছি। গোড়ায় এত অসুস্থ আর দুর্ব্বল তিনি ছিলেন যে, একা বেড়ান তাঁর পক্ষে দুঃসাহসের কাজ হইত।"

কার্লাইল আনন্দিত হইয়া কহিলেন, "ধন্যবাদ! এজন্য আপনার কাছে বড় ঋণী রহিলাম আমি জানিবেন।"

ইজাবেল স্বামীর বাহুগ্রহণ করিলেন, লেভিসন অপর পাশে চলিলেন। যাইতে যাইতে একটু মৃদুস্বরে কেবল

ইলের প্রতিযোগে কহিলেন, "কি জানেন, প্রথম লেডী ইজাবেলকে দেখিয়া আমি একেবারে চমকিয়া গিয়াছিলাম। মনে হইয়াছিল, বেশীদিন আর বাঁচিবেনই না। তাই মনে করিয়াছিলাম যতটুকু সাহায্য এ অবস্থায় আমি করিতে পারি, তা করা আমার একান্ত উচিত।"

কার্লাইল কহিলেন, "আপনার সতর্ক তত্ত্বাবধানে ইজাবেলের অনেক উপকার হইয়াছে। বাহিরের চেহারায় যে উন্নতি দেখিতেছি, তাতে ত আমি একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছি। ইজাবেলের চিঠিতে বুঝিয়াছিলাম, কিছু ভাল তাকে দেখিব। কিন্তু এযে তার চেয়ে অনেক বেশী; একেবারে যেন সব ব্যারাম সারিয়া গিয়াছে! শুনিতেছ ইজাবেল? আমার মনে হয় কি জান? অলৌকিক কোনও দৈবপ্রভাবেই তোমার মুখে আবার ঐ উজ্জ্বল রক্তিমা আনিয়া দিয়াছে। নহিলে মাত্র পনের দিনে এতটা উন্নতি কখনও হইত না। যাহা হউক, রোগীর পক্ষে এই যায়গার আবহাওয়ার তুলনা নাই বলিতে হইবে।"

স্বামীর কথা শুনিতে শুনিতে ইজাবেলের মুখের সেই উজ্জ্বল রক্তিমা আরও ঘন—একেবারে ঘোর রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি জানিতেন—যতই চেষ্টা করুন, এই সত্য নিজের অন্তরে আর তিনি অস্বীকার করিতে পারিতেছেন না—তিনি জানিতেন, তাহার চিত্তে ও মুখে যে একটা নবীনতার সঞ্চার হইয়াছে, তার কারণ এখানকার এই সামুদ্রিক সমীরসেবন নয়! স্বামীর বাহু তিনি শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিলেন,—আর মোহনবেশে এই যে দারুণ শত্রু তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতেছে তাকে দূরে ঠেলিয়া রাখিবার মত শক্তি তাঁহার হয়, এই এক আকুল প্রার্থনা সমস্ত প্রাণ ভরিয়া উঠিল।

পরদিন রবিবার, ডিনারে কার্লাইল লেভিসনকে নিমন্ত্রণ করিলেন। এ বাড়ীতে প্রথম এই তাঁহার আহারের নিমন্ত্রণ হইল। আহারাদির পর ইজাবেল উঠিয়া গেলেন,—লেভিসন নিজের বর্ত্তমান দুর্গতির কথা সব তখন কার্লাইলকে খুলিয়া বলিলেন। জ্যেষ্ঠপিতামহ সার পিটার লেভিসন নিতান্ত বিরূপ তাঁহার প্রতি হইয়াছেন; তাঁহার সাহায্য ব্যতীত ঋণমুক্ত হইয়া তিনি দেশে আর ফিরিতে পারেন না। পত্র লিখিয়াও কোনও উত্তর পাওয়া যাইতেছে না। তাঁহার নবপরিণীতা পত্নী লেডী লেভিসন আরও বিরূপ তাঁহার প্রতি। তিনি লাইন দুই একটু পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন, সার পিটারের শরীর ভাল নয়, এ সব কথা কিছু লিখিয়া তাঁহাকে যেন ত্যক্ত করা না হয়। এখন এ অবস্থায় উপায় কি?

কার্লাইল শুনিয়া কহিলেন, "আপনার পক্ষে কেহ গিয়া সার পিটারের সঙ্গে দেখা করিলে পারে।"

"কে যাইবে? আমার উকিলদের সঙ্গেও ঝগড়া হইয়াছে। তারা কিছুই আমার জন্যে করিবে না। ঠাকুর্দ্দার বিবাহের পর হইতে কি দুর্ব্যবহার তারা আমার সঙ্গে করিতেছে! যদি কখনও এই সম্পত্তি আমার হাতে আসে, তখন তাদের দেখিয়া নিব।"

কার্লাইল কহিলেন, "তাহা হইলে আমিই কি সার পিটারের সঙ্গে একবার দেখা করিব?"

"আপনি!"

"হাঁ, যদি আপনি ইচ্ছা করেন ত করিতে পারি। তবে আপনার বন্ধুভাবেই করিব, উকিল ভাবে নয়। যদি আমার দ্বারা কোনও কাজ আপনার হয়, বড় সুখী হইব। আমার স্ত্রীর জন্য এখানে আপনি যথেষ্ট করিয়াছেন, কিছু প্রতিদান তার হইবে। তবে কি জানেন, দু তিন হপ্তা দেরী হইতে পারে। হাতে আজকাল আমাদের কাজ বড় বেশী। একটু অবসর থাকিলে আমার স্ত্রীকে ফেলিয়া এখন যাইতাম না।"

ইজাবেল তখন পাশের একটি ঘরে খোলা জানালার সম্মুখে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিলেন। নিজের চিত্তের অবস্থা আর তিনি নিজের কাছে গোপন করিয়া রাখিতে পারেন না। স্পষ্ট তিনি এখন বুঝিয়াছিলেন, লেভিসনের প্রতি তাঁহার প্রাণের সেই পুরাতন আকর্ষণ আবার বড় প্রবলভাবেই জাগিয়া উঠিয়াছে। যেমন গ্লানিতে তাঁহার মন ভরিয়া যাইতেছিল, তেমনই একটা আতঙ্কও তাঁহার হইতেছিল। আহা, সর্ব্বস্ব দিয়াও যদি আজ এ আকর্ষণ তিনি দূর করিয়া ফেলিতে পারিতেন? বাকী জীবনের অর্দ্ধেক তিনি ছাড়িয়া দিতে আজ প্রস্তুত, যদি তার বিনিময়ে এই মুহূর্ত্তে লেভিসন দূরে কোথাও চলিয়া যায়, আর কখনও তার সঙ্গে দেখা তাঁহার না হয়!

আতঙ্কের কথা বলিলাম কিন্তু কিসের এই আতঙ্ক! এই আকর্ষণের টানে স্বামীর প্রতি ইজাবেল কখনও বিশ্বাসঘাতিনী হ'বেন,—ছিঃ এমন একটা দূর কল্পনাও ইজাবেলের

মনে কখনও আসে নাই। তবে ক্রমাগত লেভিসনের সঙ্গে যদি দেখা শুনা হয় আর মেলামেশা ঘটে, কে জানে এই আকর্ষণ হয়ত আরও বড়িয়া যাইবে। জীবনের সুখশান্তি সব তাহার দূর হইবে, নিয়ত কেবল একটা আত্মগ্লানির বিষে তাঁহাকে দগ্ধ হইতে হইবে! আর স্বামীর সঙ্গে, আহা, অমন প্রেমময় স্নেহময় যে স্বামী তাঁর সঙ্গে একটা লুকোচুরির ভাব, বিশ্রী একটা প্রতারণার ভাব লইয়া সারাজীবনটা তাঁহাকে চলিতে হইবে! শেষ এই চিন্তাটাই মরার অধিক যাতনা তাঁহাকে দিতে লাগিল!

লেভিসন চলিয়া গেলে স্বামীর কাছে গিয়া তিনি কহিলেন, "আর্কিবাল্ড, আর যে কয়দিন এখানে আমার থাকিতে হয়, তুমি আমার সঙ্গে থাক না?"

"বল কি ইজাবেল? তা কি পারি? সেসন আদালত বসিয়াছে, একেবারে যে ফুরসুত নেই।"

"না, তোমাকে থাকিতেই হইবে।"

"কোনও মতে সম্ভব হইলে থাকিতাম। কিন্তু তা যে হয় না।"

"কালই ত আবার তুমি আমায় ফেলিয়া চলিয়া যাইবে?"

"উপায় যে আর নাই।"

"তবে আমাকেও সঙ্গে লইয়া যাও।"

"পাগল দেখ! তাও কি হয়? কত ভাল যে তুমি হইতেছ এখানে। ভাল হওয়ার জন্য এই বাড়ী ভাড়া নিয়াছি। অন্ততঃ সে পর্য্যন্ত থাকিতেই হইবে।"

ক্লেশব্যঞ্জক একটা রক্তাভা ইজাবেলের মুখ ভরিয়া উঠিয়াই, আবার তাহা পাংশুবর্ণ ধারণ করিল, কহিলেন, "না, না! তোমাকে ছাড়িয়া আমি আর এখানে থাকিতে পারি না।"

"সে কি! কেন বল ত?"

কি বলিবেন তিনি? ধিক্! তাও কি বলা যায়? আমতা আমতা করিয়া কেবল এইমাত্র উত্তর করিলেন, "তুমি না থাকিলে—কিছুই ভাল লাগে না আমার।"

কিন্তু এ কথা কি কার্লাইল কাণে শুনিলেন? পরদিনই তিনি চলিয়া গেলেন। আরও লেভিসনকে বলিয়া গেলেন, বিশেষ যত্নে যেন ইজাবেলের তত্ত্বাবধান তিনি করেন। লেভিসনের মনে কোনওরূপ দুষ্ট অভিসন্ধি থাকিতে পারে, এমন একটা ক্ষীণ সন্দেহও যে তাঁহার মত লোকের মনে কখনও আসিতে পারে না। স্ত্রীর প্রতি তাঁহার বিশ্বাস এতই গভীর ছিল যে নির্জ্জন একটা দ্বীপেও লেভিসনের কাছে একা তাঁহাকে রাখিয়া নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইয়া তিনি থাকিতে পারিতেন। (ক্রমশঃ)

নববর্ষের-প্রার্থনা

চুকে গেছে যাহা—চলে যাক দূরে
তার লাগি বৃথা ভাবনা।
হারাধন মোর—হারায়েছি জানি
তারে ফিরে আর চাবনা।

নববর্ষের অরুণ প্রভাতে
আজি এ তরুণ ভুবনে
ভরে নিতে দাও সুধারসে হৃদি
মঙ্গল শুভ লগনে।

আলস মোহের তন্দ্রা হইতে
এবার হবে গো জাগিতে
সম্মুখ-পথে যাত্রার তরে
পাথেয় অমৃত মাগিতে।

ধূলিমলা যাহা রয়েছে জড়ায়ে
মনের গোপন ভবনে
সযতনে তাহা—ফেলিব মুছিয়া
নবীন-জীবন স্মরণে।

শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী।

পুরাণ কাহিনী

পদ্মপুরাণ—ভূমিখণ্ড

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বিংশ অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীহরি সোমশর্ম্মাকে বংশতারক পুত্রবর প্রদান করিয়াছিলেন।

একবিংশ অধ্যায়ে সুব্রতের তপস্যার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়ে সুব্রতের পূর্ব্বজন্মচরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। পুরাকালে বিদিশানগরে ঋতধ্বজ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম বলী এবং বলীর পুত্রের নাম রুক্মাঙ্গদ ছিল। রুক্মাঙ্গদের পুত্রের নাম ছিল ধর্ম্মাঙ্গদ ধর্ম্মাঙ্গদ স্বীয় পুণ্যবলে সশরীরে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়াছিলেন। যুগসহস্র বৈকুণ্ঠধামে থাকিবার পর তিনি সোমশর্ম্মার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া সুব্রত নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে হিরণ্য-কশিপুর বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

পুরাকালে ব্রহ্মার বরে হিরণ্যকশিপু অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপু দেবলোক ও পরলোক আক্রমণ করিয়া তাহাদিগের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। তাহার পর দেবগণ ক্ষীরসমুদ্রে যোগনিদ্রাগত নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন। নারায়ণ নৃসিংহরূপ ধারণ করিয়া হিরণ্যকশিপুকে সংহার করিলেন। তাহার পর ভগবান্ বরাহরূপে হিরণ্যাক্ষকে বধ করেন। এইরূপে অসুরপ্রধানগণ বিনষ্ট হইলে দেবগণ নষ্টরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অসুরমাতা দিতি শোকসন্তপ্তা হইয়া নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন। ভগবৎপ্রসাদে দিতি মহাবলসম্পন্ন বল নামক এক পুত্র লাভ করিলেন। ইন্দ্র বলের মহাবলদর্শনে ভীত হইলেন। বল সাগরোপকণ্ঠে উপাসনা করিবার সময় ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিলেন।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ে দিতি কশ্যপের নিকট তাঁহার পুত্রবধ বিষয় নিবেদন করিলেন। এবং কশ্যপ ক্রুদ্ধ হইয়া অগ্নিকুণ্ডে জটা ক্ষেপন করিয়া বৃত্রাসুরের সৃষ্টি করিলেন।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে রম্ভাসক্ত বৃত্রাসুর মধুপান করিলেন। ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বজ্র দ্বারা হনন করিলেন।

ষড়্বিংশ অধ্যায়

দেবগণের বিনাশসাধন করিবার জন্য দিতি পুনরায় গর্ভধারণ করিলেন। গর্ভধারণ পূর্ব্বক দিতি তপস্যা করিবার জন্য কশ্যপের সহিত সুমেরুপর্ব্বতে গমন করিলেন।

সপ্তবিংশ অধ্যায়ে ব্রহ্মা পৃথুকে ভূরাজ্যে, ও অপরাপরকে বিবিধ রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করিলেন।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

পূর্ব্বে অত্রিবংশে অঙ্গ নামে অত্রিতুল্য এক প্রজাপতি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার বেণ নামে এক পুত্র হইয়াছিল। তিনি কামে লোভে মহামোহে বেদোক্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা পাপাচরণ করিতেন। বেণ ব্রাহ্মণগণকে বলিতেন, তোমরা আর অধ্যয়ন, হোম দান, যজ্ঞ, কিছুই করিও না। আমিই ইজ্যা আমিই যষ্টা এবং আমিই যজ্ঞ। একমাত্র আমাতেই যজ্ঞ করিতে হইবে। আমিই ব্রহ্মা, আমিই বিষ্ণু আমিই মহেশ্বর, আমিই ইন্দ্র, আমিই বায়ু, আমিই সূর্য্য।

মুনিগণ বেণের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তেজস্বী বেণকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া তাঁহার বাম উরু মন্থন করিয়াছিলেন। তাহাতে এক বীভৎসকায় পুরুষ উৎপন্ন হইল। ক্রমশঃ তাহার বংশ হইতে নিষাদ, কিরাত, ভিল্ল, নাহলক, ভ্রমর, পুলিন্দ ও অন্যান্য ম্লেচ্ছজাতি উৎপন্ন হইল। তাহার পর বিপ্রগণ বেণের পাণি মন্থন করিলে পৃথুরাজ জন্মগ্রহণ করিলেন। পৃথুরাজ সর্ব্বগুণ সম্পন্ন এবং লোকমান্য ছিলেন; পৃথিবী অন্ন সমূহ গ্রাস করিয়া নিশ্চল হইয়া আছেন এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি পৃথিবীর পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। পৃথিবী রাজার শরণাপন্ন হইলেন।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

পৃথিবীর প্রার্থনায় পৃথু তাঁহাকে দোহন করিলেন।

ত্রিংশ অধ্যায়।

মহাত্মা পৃথু জন্মিবামাত্র বেণ বিমল ও ধর্ম্মভাব বিশিষ্ট হইলেন। মহাবীর্য্য প্রসঙ্গে যে পাপিগণের শুদ্ধিলাভ হয় তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

একত্রিংশ অধ্যায়।

অত্রিপুত্র অঙ্গ ইন্দ্রসদৃশ পুত্রলাভ করিবার কামনা করিয়া মেরুপর্ব্বতে তপস্যার্থ গমন করিলেন।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

মেরুপর্ব্বতে গঙ্গাতীরে অঙ্গ বাসুদেবকে স্তব করিতে লাগিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

মৃত্যুকন্যা সুনীথা সুশঙ্খকে তাড়না করায় সুশঙ্খ সুনীথাকে অভিশাপ দেন। সুনীথা পিতৃ আজ্ঞায় বনে গমন করিয়া তপস্বিনী হইলেন।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

সুনীথার সখীগণ সুনীথাকে পুরুষপ্রমোহিনী বিদ্যা প্রদান করিলেন।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

রম্ভা সুনীথাকে মহাত্মা অঙ্গের সহিত পরিণীত হইবার পরামর্শ দিলেন।

ষটত্রিংশ অধ্যায়।

রম্ভা মহাত্মা অঙ্গকে ও সুনীথার সহিত পরিনীত হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। অঙ্গ সুনীথাকে বিবাহ করিলেন। অঙ্গ সুনীথার পুত্রই বেণ রাজা। বেণ সমগ্র ক্ষিতি মণ্ডলে প্রজাপাল হইলেন।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

পাপপুরুষ বেণরাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, তুমি মহামূঢ় এবং বৃথা রাজ্য করিতেছ। আমিই দেবশ্রেষ্ঠ জিনরূপী, আমাকে সত্যধর্ম্মের বিগ্রহ জানিবে। যজন, যাজন, বেদাধ্যয়ন, সন্ধ্যা, তপস্যা, দান, স্বধা, স্বাহা, হব্যকব্যাদি, যজ্ঞাদি ক্রিয়া, পিতৃতর্পণ বা বৈশ্বদেব সমস্তই মিথ্যা। ক্ষেপণকের পূজাই শ্রেষ্ঠ এবং অর্হতের ধর্ম্মই উত্তম, জৈনপদ্ধতির ধর্ম্মাচারই শ্রেষ্ঠ। যে ধর্ম্মে মহাযজ্ঞে নিতান্ত নির্দ্দোষ প্রাণীদিগের হিংসা বিহিত; যথায় বেদপণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক বহু পশু বধ নির্দ্দিষ্ট—সে আবার কি ধর্ম্ম ? দয়া বিনা যে ধর্ম্ম সে ধর্ম্ম নিস্ফল। হে নৃপবর ! স্বাহাকার স্বধাকার তপস্যা এবং সত্য দয়া বিনা চাপল্য মাত্র. উহাতে ধর্ম্ম কিছুই নাই। এসকল বেদ বেদ নহে, কেন না উহাতে দয়ার কথা নাই। দয়াদান-পরায়ণ হইয়া নিত্য জীব রক্ষা করিবে। এইরূপ অনুষ্ঠাতা চণ্ডালই হউক, আর শূদ্রই হউক, তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায়। হে মহামতে ! দয়াহীন বেদে এবং বিপ্রে সুক্রিয়া নাই। শান্তচিত্তে জীবে দয়া করিবে। চরাচরশ্রেষ্ঠ জিনদেবকে হৃদয়ে আরাধনা করিবে। শুদ্ধমনে একমাত্র জিনের পূজা করিবে। সেখানে জিন, সেই খানেই তীর্থ। পাপপুরুষ এইরূপে বেণ রাজার নিকট বেদনিন্দা করিতে লাগিলেন।

এই সপ্তত্রিংশ অধ্যায় পাঠ করিলে পদ্মপুরাণ কোন সময়ে লিখিত হইয়াছিল তাহার একটী প্রমাণ পাওয়া যায়। সকলেই জানেন জৈনধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাবীর বুদ্ধের সময় জীবিত ছিলেন এবং তিনি বুদ্ধের পূর্ব্বেই দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। মহাবীরের ধর্ম্মমতে বুদ্ধের ধর্ম্মমতের সহিত অনেক স্থলে মিল আছে, উভয়েই অহিংসা পরমধর্ম্ম বলেন। সুতরাং উভয়েই বেদোক্ত পশুযজ্ঞের বিরোধী। জৈনগণ অহিংসা সম্বন্ধে বৌদ্ধগণের অনেক উপরে গিয়াছেন। জৈনগণ কোনক্রমে পশু নাশ করিবেন না। বরং মনুষ্য রক্তে যাহাতে পশুগণ পরিপুষ্ট হইতে পারে তাহাও করিয়া থাকেন। ইহাদেরই খটমল মিলান প্রবাদ আছে। অপরে পশুবধ করিয়া সেই পশুর মাংস রন্ধনান্তে যদি কোন ব্যক্তি কোন বৌদ্ধ ভিক্ষুর হাঁড়িতে ঐ রাধা মাংস ভিক্ষা দেন ; বৌদ্ধভিক্ষু তাহা খাইতে কোন দ্বিধা করিবেন না। কিন্তু জৈনগণ মাংসের নামেই পলাইয়া যাইবেন। এই অহিংসা পরম ধর্ম্মের স্রোত এক সময়ে ভারতবর্ষকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। সেই স্রোতের পথে যখন ভাঁটা আসিল, তখন আবার বেদোক্ত ধর্ম্ম জাগিয়া উঠিল, আবার পশুযজ্ঞ চলিতে লাগিল। আমার ধ্রুব বিশ্বাস যে সেই বেদোক্ত ধর্ম্মের নব-প্রেরণার মুখেই এই পদ্মপুরাণ রচিত হইয়াছিল। কারণ বুদ্ধের বা মহাবীরের সময় বা তাহার পর কয়েক শতাব্দী যতদিন

বৌদ্ধধর্ম্মের জয়গীতি ভারতবর্ষে গীত হইতেছিল ততদিন কেহই পদ্মপুরাণের সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ের মত লিখিতে সাহস করিতেন না। কারণ তখন ভারতের রাজচক্রবর্ত্তী বৌদ্ধধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন। অতএব আমার মতে পদ্মপুরাণ খৃষ্ট জন্মিবার পর দ্বিতীয় শতাব্দীর পর রচিত হইয়াছে। এবিষয়ে পার্জিটার সাহেব ঐরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন(১)। কিন্তু ভিন্সেণ্ট স্মিথ সাহেব অর্থশাস্ত্রে পুরাণের উল্লেখ দেখিয়া পুরাণগুলি খৃষ্ট জন্মিবার চারিশত বৎসরের পূর্ব্বের বলিয়াছেন (২)। অর্থশাস্ত্রে যে পুরাণের উল্লেখ আছে। তাহা পদ্মপুরাণ কখনই হইতে পারে না। কারণ, তখন বৌদ্ধধর্ম্মোক্ত প্রধান উপদেশের বিরুদ্ধে কেহ কথা বলিবেন এমন হইতে পারে না। অতএব ভিন্সেণ্ট স্মিথ সাহেবের ঐ মত পদ্মপুরাণ সম্বন্ধে চলিতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্.এ. বিএল্

মোহ ও মুক্তি

মুক্তি যারা চাহে তারা থাকে দূরে দূরে,
ভয় পাছে মোহ আসি' বসে হৃদি জুড়ে'।
আমি চাহি মোহ মোর জুড়িয়া হৃদয়;
মুক্তি আছে মোহ মাঝে, তা'রে কিবা ভয়?
জানি স্থির একদিন এ মোহ ছুটিয়া,
তা'রি হৃদি হ'তে মুক্তি উঠিবে ফুটিয়া।

শ্রীব্রহ্মানন্দ সেন গুপ্ত।

চুক্তির দাবী

পরদিন রাত্রি প্রভাতে যথাসময়ে উঠিয়া যথারীতি কেশ-বেশাদি-বিন্যাস করিয়া, যথানিয়তভাবে কৌমুদী প্রাতঃসেবা চা টোষ্ট ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে গেল।

"কৌমু!"

"কি দিদি?"

হাসিমুখে কৌমুদী ভগ্নীর দিকে ফিরিল।

"বেশ্ বেশ! লক্ষ্মী বোন্‌টি আমার! হাঁ, এই ত ঠিক চাই। কেবল বাইরেটা নয়, মনটাও এমনি ঝেড়েঝুড়ে সাফ ক'রে নিবি, এমনি হাসিটুকু সেখানে ফুটিয়ে তুলবি—"

"থাক্ দিদি! আর ও সব কথা তুলোই না কিছু। গেল কটা মাস জীবন থেকে একেবারে মুছে ফেল্‌তেই হবে,—কোনও কথা আর তার ইঙ্গিতেও মনে ক'রে দিওনা।"

এতটা তামসী প্রত্যাশা করিতে পারে নাই, বিস্মিত-ভাবেই ভগ্নীর মুখের দিকে চাহিল। কৌমুদী তখন চায়ে গরমজল ঢালিয়া পাত্রের উপরে ঢাকনি তুলিয়া দিল। তারপর সেঁকা রুটিগুলিতে মাখন মাখাইতে আরম্ভ করিল,—তামসী একটু কাল নীরব থাকিয়া কহিল, "পারবি ত ঠিক? আর একেবারে সব মুছে ফেলা—তাহ'লে পরিচয়টাও কি লোপ ক'রে দিতে চাস্ কৌমু?"

"না, তা কেন দেব? তুমিই ত বারণ ক'রেছ দিদি? সেটা হ'ল আলাদা কথা। তা যদি করি, তবে যেটা

---

(১) Pergite 's Dynasties of the kali Age.

(২) Vincent A Smith, Early History of India

মুছে ফেলতে হবে, সেইটিই যে উজ্জ্বল কাল রঙে গভীর অন্তরে জাগিয়ে রাখা হবে।”

“হুঁ— তা বেশ, কিন্তু—”

“কিন্তু আবার কি দিদি? ওসব কিন্তু অকিন্তু—সব ভুলে যাও দিদি। এ নাটকে একেবারে যবনিকা ফেলে দেও।”

“কিন্তু মনটা আমার যেন কেমন ক’চ্চে কোমু? তোর এই ভাবটা কেমন অস্বাভাবিক ব’লে ঠেকছে।”

“তুমিই না কাল উপদেশ দিলে দিদি? আর কেন, ছেড়ে দেও - ছেড়ে দেও! তুমিও ভুলে যাও—মা বাবা সবাইকে ব’লে দেও—যা হ’য়ে গেছে, তা যেন হয় নি, এই ভাবেই সবাই চলেন। তার কোনও উল্লেখ, কোনও ইঙ্গিত, তার দরুণ কোনও একটা কিছু ভাব, কি ব্যবহারের কোনও পরিবর্তন—ব’লো দিদি, কিছুই কিন্তু আমি বরদাস্ত ক’ত্তে পারব না। যা ব’লেছ দিদি, ঠিক যেন তাই হয়। যা হ’য়েছে, তা যেন একেবারেই হয়নি, ঠিক এমনি আমি বুঝ্‌তে চাই, দেখ্‌তে চাই। তার অন্যথা যদি কিছু হয়, তবে—তবে—”

“ ‘তবে’টা তোর মনেই থাক কোম, খুলে ব’লবার কিছু দরকার দেখ্‌ছি না। অন্যথা আমাদের পক্ষে কিছু হবে না। তুই কিছু না করিস্, তাই দেখিস্। চাটা যে ক’ড়ে গেল।”

বলিয়াই তামসী ঢাকনীটা তুলিয়া চামচ দিয়া চা ভিজান জলে একটা নাড়া দিল, - তারপর ক্ষিপ্রহস্তে পেয়ালার চা ঢালিতে আরম্ভ করিল। কৌমুদী আর কোনও কথা না বলিয়া রেকাবে খাবারগুলি সাজাইয়া ফেলিল।

অপরাহ্ণে—বেলা তখন প্রায় তিনটা, তামসী কৌমুদীর পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিল।

কনুই দুটি দ্বারা টেবিলের উপরে ভর করিয়া মাথাটি হাতের উপরে রাখিয়া কৌমুদী বসিয়া আছে, চক্ষুদুটি মুদ্রিত, টেবিলের উপরে একখানি সুদৃশ্য ও সুমুদ্রিত নিমন্ত্রণের কার্ড!

“কোমু!”

“এই যে দিদি! এস!” কৌমুদী চমকিয়া ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল,—কহিল, ব’সে প’ড়তে প’ড়তে বড্ড ঘুম পাচ্ছিল—

তামসী চাহিয়া দেখিল টেবিলের উপরে খোলা বই একখানিও নাই, বই-ই মোটে টেবিলের উপরেই নাই,—সব তাকের উপরে তোলা। যাহা হউক, সে কথার কোনও উল্লেখ না করিয়া সে টেবিলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া কার্ডের দিকে চাহিয়া কহিল, “ও কার্ড কিসের?”

“চাটার্জ্জিরা পাঠিয়েছেন।”

“চাটার্জ্জিরা? কই দেখি, ও -Evenig Party (সান্ধ্য সম্মিলন) তাঁর বাড়ীতে? নিমন্ত্রণ ক’রেছেন কি তোকেই শুধু?”

“না না, তাও কি হয়? বাবাকে মাকেই ক’রেছেন,—আমাকেও আলাদা একখানা কার্ড পাঠিয়েছেন। তোমাদের নেমন্তন্ন অবিশ্যি গেছে—জামাই বাবুর কাছে।”

“হুঁ—তা ভাবছিলি কি ব’সে? যাবি ত?”

“যাব না! বল কি দিদি? বড় চমৎকার সুযোগ যে একটা পেলাম, লোকসমাজে বেরিয়ে সবাইকে দেখাবার—না, ছি! আবার ঐ কথা! দূর হ’ক্, ঠোঁট কামড়াইয়া, একটু ভ্রূকুটি করিয়া কৌমুদী মাটিতে জুতার গোড়ালি দ্বারা ছোট্ট একটি আঘাত করিল। করিয়া কহিল, “যাব না? কেন যাব না? শরীর বেশ আছে, পড়ার চাপও এমন কিছু নেই—কেন যাব না? বাবা যাবেন, মা যাবেন, তোমরা যাবে, আমি কেন যাব না? হাঁ দিদি, বাবাকে বল না, দোকানে কাউকে পাঠিয়ে দিন, আমার ব্লাউজটা যদি পাওয়া যায়, নতুন সেই বেনারসী শাড়ীখানা পরে যাব? খাসা শাড়ীখানা, সাড়াইশ টাকা দাম, বাড়ীতে সেদিন দেখাতে এনেছিল, মা অমনিই রেখে দিলেন। তুমি দেখনি? আচ্ছা দাঁড়াও, এনে দেখাচ্ছি।”

ছুটিয়া কৌমুদী গৃহান্তরে গেল।

তামসী কিছু বিস্মিত, কিছু উদ্বিগ্নও হইল। কৌমুদীর এ কি হইল? বরাবরই ধীরতা ও চিন্তার গাম্ভীর্য্য তার কম, ভাবের আবেগেই সে চলে বেশী। কিন্তু আজ এই ভাবটা তার পক্ষেও বড় অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইতেছে। আন্তরিক একটা গভীর বেদনা সে পাইয়াছে। ছয় সাত দিন এই বেদনা তাকে একেবারে অভিভূত করিয়াই রাখিয়াছিল। তার গোটা দুই মুখের কথায় রাতারাতি এমনই কি একটা প্রতিক্রিয়া তার হইতে পারে, যাহাতে এতটা স্ফূর্তি বাস্তবিক তার প্রাণে আসিতে পারে? কথাগুলি খুবই যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রাণ যখন এত বড় দুঃখে আকুল হইয়া উঠে, কোনও যুক্তি কি কাহারও মন মানে? মানিলেও

রক্তিপ্রবাহে ম্লান একটা শান্ত সংযত ভাব মাত্র লোকে তার মে ধারণ করিতে পারে। হাজার সুযুক্তির সাহায্যেও এত বড় একটা ব্যথা এই সময়ের মধ্যে তুলিয়া ফেলিয়া চিত্ত কাহারও এমন উল্লাসে নাচিয়া উঠিতে পারে না। আর সত্যই কি কোনও আন্তরিক উল্লাসের লক্ষণ কৌমুদীর মুখে ও ভাবে দেখা যাইতেছে? না, তা ত নয়! বাহিরে অস্বাভাবিক আনন্দের একটা কৃত্রিম উত্তেজনা সে সৃষ্টি করিয়াছে। সে ত কেবল মনের দুঃখটা চাপিয়া ঢাকিয়া রাখিবার জন্য—কতকটা ভিতরকার ব্যথার উপরে বাহিরে জ্বালাকর একটা প্রলাপের মতই এই উত্তেজনা তার। ইহাতে এব্যথা দূর হইবে না, অন্তরে গিয়া আরও বেশী বাজিবে,—আরও কড়া প্রলেপের মত উদ্দাম উত্তেজনার সৃষ্টি সে করিবে! জোর করিয়া ইহাই হয় ত, সে সত্য বলিয়া মনে করিবে, আর তার বশে—কে জানে—সহসা হয়ত এমন কিছু একটা করিয়া ফেলিবে, জীবনে আর যার প্রতিকার সম্ভব হইবে না! না, এই ভাবের অতগুলি কথা কাল তাকে বলিয়া এইরূপ একটা বিপরীত খেয়াল তার মনে তুলিয়া দিয়া সে বুঝি ভাল কাজ করে নাই। ধীরে ধীরে সময়ে আপনিই এ দুঃখ নরম হইয়া পড়িত, এই মোহ কাটিত; তখন সুপাত্র কাহারও প্রতি মন আকৃষ্ট হইত, তাহাকে বিবাহ করিত, সব গোল মিটিয়া যাইত। কিন্তু এখন—এটা ত ঠিক ভাল হইতেছে না! কৌমুদীর মত ভাবপ্রবণ মেয়ে জোর করিয়াও যদি এই বিপরীতভাবটা মনে খেলাইয়া তুলিতে পারে, অথবা প্রতিশোধের খেয়ালে যদি উত্তেজিত হইয়া উঠে, তবে তার বশে যাই করুক, ভাল তা না হইতেও পারে। এ অবস্থায় বুঝিয়া হিসাব করিয়া সে ত একেবারেই চলিতে পারিবে না।

"এই যে দিদি মাকে খুজে পাচ্ছিলাম না, এই যে কাপড় বের করে এনেছি। কেমন, খাসা কাপড় খানি, নয়? আর ল্যাভেণ্ডার রঙটাও আমাকে বেশ মানায়। ব্লাউজও একটা তৈরী কর্ত্তে দিয়েছেন বাবা, এরই একখানা পিস্ (piece বা blouse piece, কিনে আনিয়ে, যে লোকটা কাপড় দেখাতে এনেছিল তার কাছে আবার তা ছিল না। খাসা মানাবে, এই শাড়ী আর এরই ব্লাউজ পরেই আমি কাল পার্টিতে যাব। বাবাকে বল না দিদি, এক্ষুণি লোক পাঠিয়ে দিন, কালই বিকেলে সাড়ে চারটে পাঁচটা নাগাত জামাটা তৈরী করে যাতে তারা দিয়ে যায়।"

"আচ্ছা, বলব।"

"বলবনা, যাও, এক্ষুনি যাও, এক্ষুণি লোক পাঠাতে বল। নইলে হয়ত হবে না, দর্জ্জি ফিরে যাবে, বলাই হবে না তাকে।"

"তুই নিজে কেন গিয়ে বল্‌না।"

"না আমার কেমন লজ্জা কচ্ছে। তুমি যাও না দিদি, বল না গিয়ে—দেরী ক'রো না, দোহাই তোমার!—হয়ত শেষে হবেই না। এই পোষাকে যদি না যেতে পারি, মোটে যাবই না আমি—তা কিন্তু ব'লে রাখছি।"

"আচ্ছা, যাই তবে। পাগল যেন" তামসী চলিয়া গেল। কৌমুদী কাপড়খানি পাশেই একখানা চেয়ারের উপরে ফেলিয়া একেবারে মুখ ঢাকিয়া শুইয়া পড়িল। অবশ্য কাঁদিল না,—শরীরটা বড় ক্লান্ত ও অবসন্ন বোধ হইতেছিল; ভাবিতেছিল একটু ঘুমাইতে পারিলে মন্দ হয় না কিন্তু ঘুম আসিল না। একটু পরে তামসীর পদ শব্দ পাইয়া ঘুমের একটা ভাণ সে করিল। দেখিয়া তামসী আপন মনে কহিল, "ওমা, এরই মধ্যে ঘুমিয়ে প'ল! অবাক্ করলে বাচ্'ক! তা ঘুমুক ঘুমুতে পাল্লে ত ভালই!"

কৌমুদীকে আর না ডাকিয়া তামসী ফিরিয়া গেল।

সন্ধ্যার পর তামসীর স্বামী যতীন্দ্র বাবু আসিলেন। বাহিরে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মিষ্টার জে, কে মিটার, বার-এট্-ল নামে পরিচিত হইলেও আত্মীয় বান্ধব সমাজে যতীন্দ্র বাবু, বা যতীন মিত্তির নাম স্বেচ্ছায় তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। এই নামের পরিবর্ত্তন যে মতের ও ভাবের পরিবর্ত্তনেরই বড় একটা লক্ষণ, পূর্ব্বেই তামসীর কথার আভাস হইতে পাঠকবর্গ অবশ্য তার পরিচয় কিছু পাইয়াছেন।

তামসী কহিল, "আমি আজও যাব না, আরও কদিন থাক্‌ব। তোমার চলবে ত?"

যতীন্দ্র উত্তর করিলেন, "থাক্‌তেই যদি হয়, যে ক'রে হয় চালিয়ে নিতেই হবে। থাকাটা কি নেহাত দরকারই বোধ হচ্ছে?"

"হাঁ, কটা দিন থাকাই দরকার। দেখি ত—তারপর—"

"কৌমুদী আছে কেমন?"

"আছে ত—ভালই—তবে-"

"তবে আবার কি?"

"কিছু বেশী ভাল, আমার ভাল লাগ্‌ছে না সেটা।"

"কি রকম ?"

"ওই যে সেই আসছে। দেখ, বুঝতে পারবে।"

মৃদুস্বরে তামসী এই শেষ কথাটা বলিল। বলিতে বলিতে কৌমুদী যেন ঝড়ের মত ঘরে আসিয়া ঢুকিল। কয়দিনেই মুখখানি অনেকটা শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, কেমন একটা পাণ্ডুর আভা ধারণ করিয়াছে, চক্ষের চারিধারেও একটা কালিমার ছায়া দেখা দিয়াছে। কিন্তু সেই শীর্ণ পাণ্ডুর মুখ ও কালিমাবেষ্টিত চক্ষু দুটি কেমন একটা অস্বাভাবিক হাসির দীপ্তিতে এখন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

"এই যে জামাই বাবু, চুপি চুপি দিদির সঙ্গে ব'সে গল্প ক'চ্ছেন! আমরা বুঝি কেউ নই! চা খাবেন ? আনব ?"

"না থাক এখন, কেবলই চা আর ভাল লাগে না। তুমি ব'স।"

"দিদিকে কিন্তু আজই নিয়ে যেতে পারবেন না। কাল আমরা এক সঙ্গে চ্যাটার্জ্জিদের পার্টিতে যাব। ভাল কথা, আপনাদের নেমন্তন্ন হ'য়েছে ত ? নইলে—"

"হাঁ, হ'য়েছে, হ'য়েছে ভয় নেই। তা যাবেন তোমার দিদি তোমাকে নিয়ে।"

"আমাকে নিয়ে যাবেন কি ? এক সঙ্গে দুজনে যাব। বরং ব'লতে পারি আমিই দিদিকে নিয়ে যাব। না তাতে বুঝি অপমান হবে আপনার ?"

"কিছু না, কিছু না! বেশ তাই সই, তুমিই তোমার দিদিকে নিয়ে যাবে। তোমাদের বাড়ীতেই ত তিনি আছেন এখন। তা ছেড়ে দেবে তাকে কবে ? আমার কুটীরখানি যে একেবারে আঁধার হ'য়ে আছে।"

"আঁধার স'রে এসেছে বলুন, দিদি যে তামসী—হি-হি-হি!"

যতীন্দ্রও হাসিয়া কহিলেন, "ওগো, তোমাদের যেটা আঁধার তাই যে আমার আলো। তার ত আলোই তোমরা নিয়ে রেখেছ।"

"ছি ছি ছি! এই যা বল্লেন জামাই বাবু! তা এ আলো—হাঁ, কি বল দিদি, তোমার কালো-আলো নিয়ে ঘরে তোমার কালাচাঁদকে আলো দিতে যাবে ?"

তামসীও একটু হাসিয়া কহিল, "আমি সেখানে কালোর আলোই কোমু, কালোতে আলো নাই, আলোতেই বরং কালো। তবে নেহাৎ ঘর সংসার চলে না, তাই এই কালো দাগটা আলোর মধ্যে বরদাস্ত ক'রে যাচ্ছেন।"

"বটে! আমি ত রাতদিন ভয়েই সারা তোমার আলোটাকে আঁধার করে একটা কালো ভূত বৃত্রাসুরের মত দিন দিন বেড়েই উঠছি, কবে" কৌমুদী বলিয়া উঠিল, "তা কে কার কালোতে আলো কি আলোতে কালো, সেটা ঘরে ঘরে মীমাংসা করে নেবেন। আমি এটা বেশ বুঝতে পারি কালো কি আলো বাহিরে যিনিই যা হ'ন ঘরে দুজনের চোকে দুজনেই আপনারা নিভাজ আলো। তা সে যাক'গে, এ আলো আপনার আজ ত আছেই এখানে, কালও থাকবে। তারপর পরশু কি তরশু -তা যেদিন হয় নিয়ে যাবেন। তা আপনি বসুন, আমি চা নিয়ে আসছি। হাঁ চা খাবেন না কি! ভারী ভটচাজ হয়েছেন। এরপর দেখছি সন্ধ্যে বেলা এসে গঙ্গাজল চাইবেন, আর আহ্নিক করে বলবেন একটু দুধ কলা আর গুড় নিয়ে এস।"

কৌমুদী ছুটিয়া বাহিরে গেল। যতীন্দ্র স্ত্রীর মুখ পানে চাহিয়া একটু উদ্বিগ্ন ভাবেই কহিলেন, "না, লক্ষণ খুব ভাল নয়।—সাবধান।"

অমনি একটি নিশ্বাস পড়িল।

(ক্রমশঃ)

অনুসন্ধান

(১)

সারা-দিনরাত খুঁজে 'সারা'-হ'য়ে,—
কোথাও হ'লো না সন্ধান যার,
যুগ-যুগান্তর, পুরাণ-দর্শন,—
কহিল না কোনো বারতা তার।

(২)

কর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে ধর্ম্ম-আরাধনা
দেখালো'না কোনো গোপন পথ;
দূর-দূরান্তর অমরা হইতে—
আসিল না কোনো পুষ্পক রথ।

(৩)

আকাশ পাতাল খুঁজে ফিরে দেখে,—
বসিল পথিক একদা আসি।
তারি সাথে ছিল,—কে-যেন তখন
"কোথা গিয়েছিলে ?"—বলিল হাসি!

শ্রীনরেশচন্দ্র ঘটক, এম্ এ

আমাদের দশা

অন্নসমস্যা এখন আমাদের প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রাণধারণ করিতে হইলেই ত অন্নের প্রয়োজন। ইহা ত প্রথমেই চাই। কিন্তু এই অন্ন যোগাড় করিবার চিন্তাতেই আমরা দিশেহারা হইয়া যাই। আমরা চাহি, অল্পপরিশ্রমে নির্ঝঞ্ঝাটে কোনমতে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া তাহাদ্বারা পরিজনবর্গের যথাসাধ্য ভরণপোষণ করি। ইহাতে একমাত্র কেরাণিগিরির পেশাই আমাদের লক্ষ্যের বিষয়ীভূত হয়। ইহা ব্যতীত অন্য কোনদিকে লক্ষ্য করিতে হইলেই ত আমাদিগকে একটু নড়িয়া বসিতে হয়। একটু কায়িক পরিশ্রম, একটু মানসিক উদ্যমের যে দরকার হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহা ত আমাদের নাই, সে পথ হইতে নিরস্ত হইয়া আমরা অসাড় জড়বৎ হইয়া পড়িয়াছি। আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিয়া অক্ষম ভিক্ষুকের মত দীনহীনভাবে আমরা সংসারে কালযাপন করিতেছি। নিয়ত জড়তায় আচ্ছন্ন থাকিয়া এখন একমাত্র জড়তাই আমাদের প্রাণস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। এ সংসারে মানবজীবন দুর্লভ জীবন। জীবনের রস বিধাতার বিধানানুযায়ী পূর্ণরূপে আস্বাদন করিতে পারিলেই এই জীবনের সার্থকতা। জীবনের এই মূলমন্ত্র বিস্মৃত হইয়া আমরা কিরূপ হীনদশায় উপনীত হইয়াছি। বিধাতার নিয়মভঙ্গের ফলজনিত পাপের ফলে আজ আমাদের দেহের উপর অধিকার নাই, মনের উপরও অধিকার নাই, অথচ আমরা দেহী, মানব—জগতের শ্রেষ্ঠ জীব! হায় দুরবস্থা, সকল সম্মান, সকল স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া আজ আমরা পদদলিত মলিন, শাপভ্রষ্ট। আমরা পৌরুষ বিসর্জ্জন দিয়াছি, পৌরুষের কর্ম্মে আমাদের অধিকার ছাড়িয়াছি। একমাত্র কেরাণিগিরি আমাদের সকল সত্ত্বাকে পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। স্বাধীন জীবিকার প্রচেষ্টা আমাদের নাই। সে গৌরব আমাদের লুপ্ত হইয়াছে। পরিশ্রমের মর্য্যাদা (Dignity of Labour) আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু এই মর্য্যাদাজ্ঞান হারাইয়া আমাদের জীবনও যে ব্যর্থ হইয়া যায়। এই মর্য্যাদাজ্ঞানই যে আমাদের জীবনে স্বাতন্ত্র্যের গঠনে একমাত্র সহায়; সকল বাধা সকল হীনতা ঘুচাইয়া জীবনকে মুক্তি ও পূর্ণতা প্রদান করিবার একমাত্র উপায়। হীনতা ও অক্ষমতায় জীবন কখনও পূর্ণ ও সার্থক হইতে পারে না।

আমরা বর্ত্তমানে অন্নসমস্যায় মগ্ন। প্রাণধারণ করিবার জন্য যে উদ্যম যে পরিশ্রমের প্রয়োজন তাহা আমাদিগকে গৌরবের সহিত করিতে হইবে। তাহার জন্য পরমুখাপেক্ষী হইবনা, পদদলিত হইয়া সঙ্কীর্ণতাকে আশ্রয় করিয়া আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিব না। অল্পসংখ্যক কেরাণিগিরির পদ হয়ত খালি আছে, তাহার জন্য বহুসংখ্যক প্রার্থী অনন্যচিত্ত হইয়া পরস্পরের সহিত হীন সংঘর্ষে নিযুক্ত হইয়া ক্ষুদ্রতা ও অক্ষমতার পরিচয় দিয়া থাকে। কেরাণিগিরিই যেন একমাত্র লক্ষ্য, ইহা আয়ত্ত না হইলেই যেন গত্যন্তর নাই। এই দারুণ অসহায়ভাব ও আনুসঙ্গিক হীনতা আমাদের জাতীয় জীবনের কি নিরাশাময় দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছে! কি গভীর পরিতাপের বিষয়! কেবল যে জীবিকা অর্জ্জনের জন্য আমরা কেরাণিগিরির শরণাপন্ন হই তাহা নহে, জীবনের সকল ব্যাপারেই আমরা নিজের উদ্যম ও মনুষ্যত্ব না খাটাইয়া পরের প্রদর্শিত পথে নিজের স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া দীনহীনভাবে চলিয়া যাইতে পারিলেই যথেষ্ট মনে করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ পরের লিখিত নোটবহি মুখস্থ করিয়া কোনমতে, পাশ করিয়া যাইতে পারিলেই বাঁচে, নিজের পর্য্যবেক্ষণশীলতা বা স্বাধীন বিচার শক্তির কোন প্রয়োজন নাই, সেখানেও কেরাণীগিরি! কোথায় বা নাই? আমাদের দুর্ব্বলতার সঙ্গে সঙ্গে ইহা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

মূল কেরাণিগিরির ব্যাপারটা অবশ্যই গর্হিত নহে। কারণ কর্ত্তা অনুষ্ঠানকে নির্ম্মিত করেন বটে, কিন্তু তাহার নির্দ্দিষ্ট পথে কর্ম্ম করিবার জন্য কেরাণির দরকার, তাহা না হইলে বড় অনুষ্ঠান কিছুই টিকিতে পারে না। বিশেষ, বর্ত্তমান জগতের সুবিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রের প্রতিবিভাগেই বহুতর কেরাণির দরকার। কিন্তু আমাদের যেখানে দোষ ঘটিতেছে তাহা হইতেছে এই যে, আমরা এই কেরাণিগিরিকেই একমাত্র সারসম্বল মনে করিয়া যথেষ্ট অসুবিধা ও অসম্মান ভোগ করিতেছি। দলে দলে লোক কেরাণিগিরির জন্য আবেদন

করে কিন্তু নির্দ্দিষ্ট অল্পসংখ্যক লোকব্যতীত সকলেই ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসে। কিন্তু তবুও ঐ দিকেই জনতা। ইহা কি একটা ব্যাধি নহে? বস্তুতঃ আমাদের জাতীয় সমাজদেহে একটা ভীষণ সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ লাগিয়াছে। ইহার আশু চিকিৎসার দরকার; উপযুক্ত চিকিৎসক এ জন্য চাই। নিরস্ত হইয়া এখন বসিয়া থাকিবার সময় নহে। কেহ কি ইহার চিকিৎসার জন্য আগুয়ান হইবেন? না এখানে 'The patient must minister to himself'—রোগীই নিজের চিকিৎসা নিজে করিবে—অথবা কালের বিধানে ঘটনাচক্রের নিস্পেষণে এই রোগের উপযুক্ত প্রতিবিধান আপনা হইতেই ঘটিবে! কিন্তু বাঙ্গালা মায়ের সন্তান হইয়া আমরা কি একবার ভাবিয়া দেখি, মায়ের ঘরে স্বভাবতঃ আমাদের কি কি সুবিধা সঞ্চিত রহিয়াছে? শস্য-শ্যামলা বঙ্গমাতা যে প্রকৃতিদত্ত অন্নসম্ভারে পূর্ণ! ক্ষেত্রে অগণিত শস্য বিনা আয়াসে উৎপন্ন হয়। নদীজলাশয়ে প্রচুর মৎস্য রহিয়াছে। গাভী প্রচুর সুমিষ্ট দুগ্ধ দেয়। এই সব সুবিধার মাঝে আমরা বাস করি, কিন্তু আমাদের দেশের জনসাধারণ, বিশেষতঃ শিক্ষিতগণ কি সেদিকে একটুও লক্ষ্য করেন? লক্ষ্য করিলে যে আমাদের সকল দৈন্য, হীনতা, দুর্ব্বলতা মুহূর্ত্তে ঘুচিয়া যায়!

দেশে যে প্রচুর মাঠ, বন, বিল রহিয়াছে সে সব সম্পত্তি আয়ত্ত করিতে পারিলে তাহা হইতে যথেষ্ট আয়ের সংস্থান হইতে পারে। ইহাতে লাভ ভিন্ন লোকসান হয় না, এবং চেষ্টা ও যত্নে ক্রমে ক্রমে অধিকতর প্রসারতা লাভ করিয়া ইহা বিপুল ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডাররূপে পরিণত হইবে। শিল্পকলার ব্যবসায় বহুব্যয়সাপেক্ষ। তাহাতে সকলের সুবিধা না হইতে পারে, এবং তাহাতে লাভ লোকসানের নিশ্চয়তা নাই; কিন্তু আমাদের বঙ্গমাতার যাহা স্বাভাবিক দান তাহা ত সহজলভ্য ও অনেক নিরাপদ ও ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল। সুতরাং সাধ্যায়ত্ত মূলধনে উপযুক্ত পরিশ্রম করিয়া চিরস্থায়ী আয়ের পথ প্রবর্ত্তন করিতে একমাত্র কৃষিই আমাদের উপযুক্ত অবলম্বন। শিক্ষিতগণ আধুনিক উন্নত প্রণালী অনুসরণ করিয়া কৃষির যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিতে পারেন। কর্ষণযন্ত্র, ভূমির সার, শস্যের আধিব্যাধির প্রতিকার প্রভৃতি বিষয়ের উন্নতি সাধিত করিতে পারিলেই কৃষি অতিশয় লাভপ্রদ হইয়া থাকে। আমাদের শিক্ষিতযুবকগণ এই উন্নত প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিয়া দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতে পারেন এবং দেশের নিরক্ষর চাষীদের প্রকৃত সাহায্যস্থল হইতে পারেন! অন্যথা গরিব চাষীদের ভাত মারিয়া কৃষিকার্য্যে লিপ্ত হইলে দেশের কোনই লাভ হইবে না; কারণ দেশে সাধারণতঃ যে শস্য উৎপাদন হইয়া থাকে, তাহা নিরক্ষর চাষীরাই বৎসর বৎসর বেশ উৎপন্ন করিয়া থাকে। শুধু তাহার জন্য শিক্ষিতলোকদের কোন দরকার নাই! তাহাদের নিকট প্রধানতঃ উন্নত আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিবার আশা করা হইয়া থাকে। তবে মূল কৃষিকার্য্য করিতে হইলে যে সমস্ত বন জঙ্গল নূতন আবাদ হইতে পারে, সেই সমস্ত স্থলে উন্নত প্রণালীর কৃষি প্রবর্ত্তিত করিয়া স্বাধীন জীবিকার পন্থা প্রশস্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমানে শস্য হইতে চাউল, ডাইল, ময়দা, ইক্ষুদণ্ড ও অন্যান্য মিষ্টসার উপাদান হইতে চিনি, মিশ্রি, তুলা হইতে সূতা, তৈলবীজ হইতে তৈল ও পাট হইতে পাটের জিনিষ প্রভৃতি তৈয়ারী হওয়াতে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে আমাদের দেশীয় লোকের বিশেষ কোন হাত নাই। প্রায় সকল বিষয়েই বিদেশীর করুণার উপর আমাদের নির্ভর করিতে হয়। আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র এদিকে সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে; তাইত আমাদের অনন্যোপায় হইয়া কেবল কেরাণিগিরিকেই সম্বল করিতে হয়। অথচ এই কার্য্যে কত প্রচুর লাভ,—তাহা আয়ত্ত করিতে পারিলে যেমন আমাদের দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইত তেমনি শিক্ষিতগণের একটা সম্মানজনক স্বাধীন বৃত্তি লাভ হইত! এখন দেখিতেছি কালের গতিতে ঠেকিয়া, অর্থাৎ কেরাণিগিরীর সুযোগ না পাইয়া বা আইনের ব্যবসায়ের পসার মাটি দেখিয়া অনেক শিক্ষিত যুবক Rice mill (চাউলের কল) খুলিবার চেষ্টায় বঙ্গের সর্ব্বত্র Company Share (অংশ) সংগ্রহের চেষ্টায় আছেন। ইহাতে সফলতা লাভ করিতে পারিলে তাহারা যে বাস্তবিকই উন্নতি করিতে পারিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। Backergunj Rice Mills, Ganges Rice Mills প্রভৃতি নূতন কারবার প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য Share জোটাইবার চেষ্টায় আমাদের অনেক আত্মীয় ও পরিচিত বন্ধু যুবকগণকে Prospectus (বিবরণী) লইয়া ইতস্ততঃ যাতায়াত করিতে দেখি। দেখিয়া মনে হয়, বাস্তবিকই

Industrial Enterpriseএর (শিল্পসাধনার) দিন আসিয়াছে, এবং ইহাতেই আমাদের দেশের ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রাণের পন্থা রহিয়াছে। সম্প্রতি বরিশাল জেলায় নারিকেল তৈল প্রস্তুত করিবার জন্য এক সাহেব কল বসাইয়াছেন। ইহাতে বরিশালের নারিকেলের বাজার সাহেবের একচেটিয়া হইবে, লোকে এরূপ মনে করে। ইহাতে দরিদ্র লোকের নারিকেল খাওয়ার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা হইবে, অথচ কেহ যে এইরূপ ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিবেন তাহার লক্ষণ দেখা যায় না। ওদিকে সাহেবের কারবারে যে বিশেষ লাভ হইবে ও উহা স্থায়ী হইবে তাহাতে সকলেই আস্থা প্রদর্শন করেন, কিন্তু আমাদের বাঙ্গালী কেহ এ ক্ষেত্রে নামিলে লোকে তাহার সম্বন্ধে নিরাশাই পোষণ করিত। ইহার হেতু কি আমাদের জাতীয় চরিত্রের প্রতি বিশ্বাসহীনতা নহে? হায়, কবে আমরা আত্মসম্মান-পরায়ণ হইয়া জঘন্য দাস-বৃত্তি ত্যাগ করিয়া স্বাধীন ও উপযুক্ত বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিব? Industry (ব্যবসায় বিশেষতঃ Agricultural Industry (কৃষিসম্পর্কিত ব্যবসায়) যে আমাদের শিক্ষিতদের প্রধানতঃ অবলম্বনীয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ইহা ভিন্ন ভূমির অধিকারী না হইয়াই স্বভাবজাত পণ্যের ব্যবসায় দ্বারাও লাভবান্ হইতে পারা যায়। এইরূপ ব্যবসায় Mill'এ (কলে) কাঁচামাল সরবরাহের সূত্রে বেশ চালান যাইতে পারে ও তাহাতে বেশ লাভ হয়। এই সমস্ত বিষয় ভাবিবার ও বুঝিয়া দেখিয়া আশু কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ার দিন আসিয়াছে। এ সময়ে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। ঐ যে সম্মুখে জীবন সংগ্রামের (Struggle for existence) ভেরীরব সকলকে ঘোররবে আহ্বান করিতেছে। একবার জড়তা, সঙ্কোচ ও ভ্রান্তি-জনিত লজ্জা ত্যাগ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্বের সহিত স্বাধীন-ভাবে কার্য্যে নিযুক্ত হইলে আমাদের দেশের উন্নতি, নিজের উন্নতি ও জাতীয় জীবনের নব জাগরণ সাধিত হইবে; হায়, কবে আমরা দীনহীন ভিক্ষুকের বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যত্বের গৌরবে বলীয়ান্ হইব? কবে আমাদের দৃষ্টি এ দিকে পড়িবে, কবে শিক্ষিতগণ প্রবুদ্ধ হইবেন,—তাঁহারাই যে দেশের অগ্রণী! দেখা যাউক, কালের বিধানে আমরা কোন্ পথে যাই।

শ্রীলোকেন্দ্রনাথ গুহ বি, এ।

আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে

শুনেছি প্রথম দিনে কোন এক যুগান্তে তোমার
বয়ে গেল কবিতার কলকণ্ঠ মদির ঝঙ্কার।
বিরহীর বক্ষঃভাসি' অবিরল অশ্রুজল হায়।
ধরণী—রাণীর বুকে লুটোপুটি লহরী খেলায়।
আজিকে একেলা বসি গৃহকোণে পড়ে গেল মনে—
মিলন-উৎসুক চির বিরহীর ব্যথা ক্ষণে ক্ষণে।
বক্ষে যার প্রণয়িনী তারো কাছে আজি থাকি থাকি
উৎকণ্ঠা মলিন হ'য়ে আসে দিন বেদনায় ঢাকি—
যার দূর-দূরান্তর-বহুদূর হয় না নির্ণয়—
আছে কিনা কোনখানে হয় সদা এমনি সংশয়।
সে কেমনে নিবারিবে আঁখিবারি বসনে গোপনে
প্রিয় বিরহের ব্যথা, বল সখে! ভুলিবে কেমনে?
বরষার বারিমাঝে স্বর্গ মর্ত্ত হোক একাকার
ঢাকুক না অম্বরার বিন্দুরূপে আশীষ সম্ভার।
সুখের ইঙ্গিত আজি তার মাঝে আসুক বিজলী।
মিলন আবেগ ভরে শিখরিণী উঠুক চঞ্চলি'।
আশায় ভরিয়া যাক জগতের বিরহীর বুক,
দেখুক সুখের মুখ, শিহরিয়া আনন্দে উঠুক।
আমি কিন্তু তার মাঝে কভু বন্ধু হ'বো নাক লয়'
মিলনে অতৃপ্ত চির র'ল মোর বাসনা-প্রচয়।
হউক সে স্বর্গমর্ত্ত একাকার আমি কভু তায়
অমর-আশীষরূপে চাহি নাক' আর এ সংসারে।
করিব সে কমনীয়, মনোরম বীণার ঝঙ্কারে
গান আজি মিলাইয়া সুর লয় তার তালে তালে।
গাব বটে—কিন্তু বল কি গাহিবে অভাগা আবার
বরষা বরষ-স্মৃতি দগ্ধ চির মানস যাহার॥

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ।

[কাজের লোক হইতে সংগৃহীত।]

কেমন করিয়া পুষ্প হইতে এসেন্স বাহির করিতে হয়।

যে কোন সৌরভযুক্ত পুষ্প সংগ্রহ কর। একটা মাটির পাত্রে পুষ্পগুলি দিয়া একটি স্তর সাজাও, এবং তাহার উপর খুব পরিষ্কার এবং সূক্ষ্ম চূর্ণের লবণের স্তর সাজাও, এইরূপে এক তবক ফুল, এক তবক লবণ সাজাইয়া পাত্রের মুখটি উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া ফেলিয়া নিম্নতলের ঘরের একস্থানে ৪০ দিন আন্দাজ রাখিয়া দিতে হইবে। তাহারপর ক্রেপ নামক বস্ত্র দ্বারা চাপ দিয়া নিঙড়াইয়া যে এসেন্স পাওয়া যাইবে, তাহা একটি পরিষ্কার বোতলে পুরিয়া কর্ক উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া ৬ সপ্তাহ কাল রৌদ্রের উত্তাপে ও সন্ধ্যার শিশিরে বিশুদ্ধ করণের জন্য রাখিতে হইবে, এখন ইহা ব্যবহারোপযোগী হইল। এবং এসেন্সের ১ ফোটা মাত্র এক পাইণ্ট পরিমাণ জলকেও মনোরম সৌরভে সুবাসিত করিতে সক্ষম হইবে।

ইন্দ্রলুপ্ত বা টাক নিবারণের ব্যবস্থা।

১। জবাদল, কাল গাভীর মূত্রে পিষিয়া মাথায় দিলে চুল উঠিয়া যাওয়া নিবারিত হয়।

২। ফেলা, কৃষ্ণতিল, কণ্টিকারীর ফল সম পরিমাণ চাউল ধোয়া জলের সহিত বাটিয়া চুলে মর্দ্দন করিলে কেশ রোগ আরোগ্য হয়।

পরীক্ষা দ্বারা এই গুলির কার্য্যকারী গুণ দেখিতে পাবেন।

কিন্তু বর্ত্তমান বিলাসিনী হিন্দু মহিলা গোমূত্রাদি মাথায় দিয়া দেখিবেন, সে আশা দুরাশা, বরং চুল না থাকে, পরচুল পরিবেন, সেও ভাল।

গামছায় রং করা।

হিরাকশের জলে গামছা ভিজাইয়া রাখিয়া একটু চুণ গুলিয়া সেই জলে গামছা ডুবাইলে ৫।৬ ঘণ্টা পরে কাচিয়া লইলেই চাঁপা ফুলের মত রং হইয়া যায়, যে রং হইয়া যায়, সে রং কখনও বিবর্ণ হইবে না।

টাকের জন্য তৈল

ইহা বিক্রয়যোগ্য জিনিস।

প্রস্তুত প্রণালী

ক্রুটন অয়েল	৴॥ আধসের
বাদাম তৈল	৴॥ ,, ,,
ওরিগেনাম	৵০ আধ কাচ্চা
রোজ মেরি	৬০ ফোঁটা।
ল্যাভেণ্ডার তৈল	৪০ ফোঁটা।

একত্র মিশ্রিত করিয়া ছোট শিশিতে পুরিয়া লেবেল দিয়া বিক্রয় করিলে লাভ হইবে। এই সকল দ্রব্য ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়।

দাদের ঔষধ।

সৈন্ধব লবন চূর্ণ	এক পোয়া।
সোডা	আধপোয়া।
ঘৃত	দেড়পোয়া।

একত্র পাক করিয়া একটা মুখ চৌড়া শিশিতে পুরিয়া রাখিবে। প্রতিদিন ২।৩ বার দাদে লাগাইলে এক সপ্তাহের মধ্যে দাদ ভাল হইয়া যাইবে।

ঢাঁড়স বা রামঝিঙ্গে।

ইহাকে অনেক স্থলে রামতরাইও বলিয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশের সকল স্থানেই ইহা জন্মিয়া থাকে এবং লোকে তরকারী করিয়া ও ভাজিয়া খায়।

ইহা খাদ্য দ্রব্য রূপে ব্যবহৃত হইলেও ইহাদ্বারা অনেক পীড়ার চিকিৎসাও হইয়া থাকে। কাঁচা ফল না পাইলেও শুষ্ক ফল দ্বারাও চিকিৎসা কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া থাকে।

ঢাঁড়স্ ফল বর্ষা হইতে শরৎ কালের শেষ পর্য্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণ কাচা অবস্থায় পাওয়া যায়, সেই সময় সংগ্রহ করিয়া শুখাইয়া রাখিতে হয়। এই সমস্ত ঢাঁড়স আন্দাজ [illegible] আউন্স পরিমাণমত লইয়া দেড় পাইণ্ট ফুটন্ত জলে প্রায় ২০ মিনিট কাল ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া উহাকে [illegible] করিয়া

জন্ত সামান্ত পরিমাণ চিনি মিশাইয়া লইতে হয়। ইহাকে ডিককসন বলে।

এই ডিককসন সাধারণ পানীয় জলের ন্যায় সর্ব্বপ্রকার জ্বরে, সর্দ্দিতে, মূত্রস্থালী এবং বৃক্ককের উত্তেজনা অবস্থায়, গনোরিয়া বা প্রমেহ রোগে এবং যেখানে প্রস্রাবের অসরলতার জন্য দারুণ কষ্ট হয়, সেই সকল স্থলে ব্যবহার করিলে বিশেষতঃ উপকার সাধিত হয়, এবং রোগী যন্ত্রণার হাত হইতে পরিত্রাণ পায়। ট্যারসের উপরোক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা ডিককসন প্রস্তুতের সময়—যে তাপ বা বাষ্প উত্থিত হয়, তাহা স্বরভঙ্গ, শুষ্ক কাশী, যক্ষ্মা রোগীর যন্ত্রনা-দায়ক কাশীর পক্ষে মহৎ উপকারী। এই ভাপরা লইবার সুন্দর উপায় এই যে, ফুটন্ত জলপূর্ণ চায়ের কেট্‌লীতে ৩ আউন্স পরিমিত ট্যারস্ ফেলিয়া কেট্‌লির ঢাকনী বন্ধ করিয়া দিয়া কেট্‌লীর নলের মুখের নিকট মুখব্যাদন করিয়া এই তাপ মুখ মধ্যে টানিয়া লইতে হয়। ইহাকেই ইন্‌হেলেশন বলে।

কেমন করিয়া প্রোসেস্ ব্লক প্রস্তুত করিতে হয়।

প্রোসেস্ ব্লক কাহাকে বলে?

পাঠকগণ! সংবাদপত্রে দেখিয়াছেন, নানা প্রকার চিত্র দেওয়া হয়, এ সকল ব্লক্ আগে কাঠে খোদাই করিয়া ব্যবহার হইত; এক্ষণে ইহা দস্তার প্লেটের উপর খোদাই না করিয়া প্রস্তুত হইতেছে। এইটী আজ কাল লাভজনক কাজ, এই সকল ব্লক্ আজকাল ভারি আবশ্যক। কোন উদ্যোগী যুবক শুদ্ধ এই কার্য্য চালাইয়া যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইতে পারেন। ইহার একখানি ব্লক্ প্রস্তুত করিতে সামান্তই খরচ পড়ে; কিন্তু লাভ যথেষ্টই থাকে। বাজারে সচরাচর জিঙ্ক প্রোসেস্ ব্লক্ ছয় হইতে আট আনা স্কোয়ার ইঞ্চি ধরিয়া বিক্রয় হয়।

১। দস্তার ইংরাজী নাম জিঙ্ক্। এই কার্য্যের জন্য কলিকাতায় জিঙ্ক্ শিট্ কিনিতে পাওয়া যায়। ইহা সমতল এবং একখানা পিস্‌বোর্ডের মত মোটা।

এই সমতল প্লেট এক খণ্ড আবশ্যকমত লইয়া অর্থাৎ যেমন চিত্র হইবে, সেই চিত্রের সাইজ্ মত লইয়া তাহাতে পিউমিস পাউডার মাখাইয়া বেশ নরম টুথ্ ব্রস দ্বারা ঝাড়িয়া ফেল। প্লেটখানির রং তাহা হইলে সাদা হইবে। যদি পিউমিস্ পাউডার না পাও তাহা হইলে ৫।৬ আউন্স জলে ১৫।২০ ফোঁটা নাইট্রিক অ্যাসিড্ ঢালিয়া দিয়া তাহাতে ১ মিনিটমাত্র ঐ দস্তার প্লেটখানি ডুবাইয়া লও; পরে শুখাইলেই সাদা হইবে,—যেন ছাই মাখান হইয়াছে, এমনি রং হইবে।

দ্বিতীয় কাজ।

তারপর একখানি এনামেল করা ডিস্ সংগ্রহ কর। ফটোগ্রাফিক্ জিনিস যেখানে বিক্রয় হয়, সেই সকল দোকানে এই প্রকারের কার্য্যের জন্য ডিস্ বা প্লেট পাওয়া যায়। তারপর ১ শিশি পিওর অর্থাৎ খাঁটী নাইট্রিক অ্যাসিড কিনিয়া আনিয়া রাখ। ইহা ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়! কিন্তু সাবধান, নাইট্রিক অ্যাসিড হাতে বা কাপড়েতে লাগিলে তৎক্ষণাৎ পুড়িয়া অতিশয় জ্বালা করিয়া ক্ষত হইয়া যাইবে। যেন হাতে না লাগে বা কোন জিনিসে না পড়িয়া যায়। ঘরের অতি উচ্চ স্থানে, যেখানে ছেলে পুলে না যাইতে পাবে, এমন স্থানে সাবধানে তুলিয়া রাখিবে।

তৃতীয় কাজ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, জিঙ্ক প্লেটখানিকে পিউমিস্ পাউডার মাখাইয়া বা নাইট্রিক এসিডের খুব কম জোর সলিউসনে ডুবাইয়া শুখাইয়া রাখিয়া দাও। এক্ষণে সেই শুষ্ক প্লেটখানি লইয়া আইস। ইহার উপর ছবি খানিকে উঠাইতে হইবে। বেশ কথা।

যদি তুমি নিজে চিত্রকর হও, তাহা হইলে তুমি যাহা অঙ্কিত করিবার ইচ্ছা কর, সেই চিত্রখানি ঐ যে পূর্ব্বকথিত সাদা জমি করা দস্তার প্লেটখানি লইয়াছ, উহার উপরে লিথোগ্রাফের কালী দ্বারা তুলি দিয়া অঙ্কিত কর। মানুষ, ঘোড়া, গরু, হাতের লেখা, যাহা তোমার খুসি। অঙ্কিত করা হইলে উহার উপর খুব সূক্ষ্ম রজন-চূর্ণ এবং আস্‌ফালটাম্ (Asphaltum—ইহা বাজারে ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়) তোমার ঐ অঙ্কিত চিত্রের উপর ছড়াইয়া দাও। ইহার কারণ এই যে, তোমার চিত্রিত অংশগুলি উক্ত জিঙ্ক প্লেটে আটিয়া ধরিয়া যাইবে। চূর্ণ ছড়াইতে অনাবশ্যকীয় স্থানেও লাগিতে পারে এবং লাগেও। সুতরাং একখানি

কোমল টুথব্রস দ্বারা বেশ করিয়া অতিরিক্ত চূর্ণগুলি ঝাড়িয়া ফেলিয়া দাও ; তারপর ঐ প্লেটখানিকে লইয়া তাহার নিম্নে অগ্নির উত্তাপ দিয়া একটু গরম কর ; গরম করিলেই রজন-চূর্ণগুলি, যাহা তোমার অঙ্কিত চিত্রের উপর লাগিয়া আছে। অগ্নির উত্তাপে গলিয়া লেখাগুলি দস্তার প্লেটকে কামড়াইয়া আটিয়া ধরিবে, এই উদ্দেশ্যে গরম করা।

৪র্থ কাজ।

তারপর দ্বিতীয় কাজ শীর্ষক প্রস্তাবে যে এনামেল প্লেট-খানার কথা বলিয়াছি, তাহা লইয়া আইস, তাহাতে ১০০ ভাগ ঠাণ্ডা জল আর সেই জলে ২ ভাগ হইতে ৫ ভাগ ঐ যে পূর্ব্বকথিত (Nitric acid) নাইট্রিক্ অ্যাসিড্ আনিয়া রাখিয়াছ, তাহা মিশাও ; মিশাইয়া তাহার উপর তোমার অঙ্কিত চিত্র বিশিষ্ট জিঙ্ক্ প্লেটখানি উবুড় করিয়া ডুবাইয়া দাও এবং ডিসখানির কিনারা অর্থাৎ যাহাকে আমরা কানা বলি (যেমন থালার কানা) সেই কানা দুইধারে দুটী হাতে করিয়া ধরিয়া ক্রমাগত আন্দোলন করিতে থাক ; জল পড়িবে না—অথচ ডিসের মধ্যে ঢেউ উঠিবে। যখন দেখিবে জিঙ্ক প্লেটের সমস্ত অংশ খাইয়া গিয়া, কেবল তোমার চিত্রের যে যে অংশে কালী ধরিয়াছিল, সেইগুলি বেশ উঁচু হইয়া আছে এবং পার্শ্বগুলি যথেষ্ট নীচু হইয়া গিয়াছে, তখনই জানিবে কাজ ফর্সা। তখন প্লেটখানিকে তুলিয়া লইয়া তার্পিণ তৈল মাখাইয়া ন্যাকড়া দ্বারা ঘসিয়া পরিষ্কার করিবে।

৫ম কাজ।

একখানি কাঠের তক্তা লও,—যে তক্তার উচ্চতা তোমার ঐ জিঙ্ক্ প্লেটখানি সমেৎ ছাপাখানার একটী টাই-পকে খাড়া করিয়া যতটুকু উচ্চ হয় ততটুকু। ইহাকে টাইপ হাইট বলে ; এইরূপ তক্তায় ঐ জিঙ্ক্ প্লেটখানি স্ক্রু দিয়া আঁটিয়া লইলেই ব্লক্ হইয়া গেল ; ইহার নাম জিঙ্ক্ প্রসেস্ ব্লক।

চায়ের গান

কবিরাজ ৺দ্বিজেন্দ্রলালের অমর ভাষা অনুকরণে

আজি গো চা'-রাণী চরণে তোমার এসেছি অর্ঘ করিতে দান,
ভক্তি-অশ্রু-সলিল-সিক্ত যতেক চা'-খোর দীনের গান,
ষ্টোভ কিনি শুধু তোমারি যে লাগি তোমার বিহনে বড়
বেশী রাগি,
কবিতা মূর্ত্তি লভে' মনোভাব তব পাদোদক করিলে পান।
ধূমশিখাময়ী তপ্তসলিলা ! চাহি না অর্থ, চাহি না মান
শীতভি ও রসে হরষ জাগয়ে তুমি যদি কর সরস প্রাণ।

কি আর জানাব কত সে কঠোর ঐ শীতোদক সেবায় ব্রত
হায় মা যাহারা তোমার ভক্ত, ডিস্‌পেপটিক্' তারাই তত ;
তবু সে কষ্ট, তবু সে দৈন্য, অকাতরে সহি' তোমারি জন্য —
তবু যে সকালে শয়ন ত্যজিয়া প্রথমেই করি ও রস পান।
ধূমশিখাময়ী ইত্যাদি.................. (কোরাস্)

শ্রান্তিতে যবে চোখে আসে জল, পেটে জ্বলে ওঠে প্রবল ক্ষুধা
ভুলিতে তখন সব গ্লানি মাগো পান করি তোর স্তন্য-সুধা ;
অম্বল রোগে যে সময় হায়, বুকের ভিতর জ্বলে পুড়ে যায়
বাহিরে যাইয়া উদ্গার করি' জুড়াই মোদের পীড়িত প্রাণ।
ধূমশিখাময়ী ইত্যাদি..................

জীবনের যাহা শ্রেয় আর প্রেয় তোমা হারা হ'লে যাবনা ভুলি
তুমি না থাকিলে মর্ম্মের মূলে শিল্পীর হাতে চলে না তুলি ;
চা'-বাগান থেকে বড় ভালবেসে, এসেছ যদি এ
কবিদের দেশে,
ক্ষুধাটি নাশিয়া 'কাব্যের গাঙে' আবার তবে মা ছুটাও বাণ।
ধূমশিখাময়ী ইত্যাদি..................

শ্রীসন্তোষকুমার সরকার।

বিবিধ প্রসঙ্গ

বর্ত্তমান অসন্তোষ

খালিফাৎ সমস্যার সন্তোষজনক মীমাংসা কিছু হইল না,—পঞ্জাবের ডায়ার-ওডায়ারী কাণ্ডের উচিত বিচার ও প্রতিকার কিছু হইবে, তার ভরসা বড় দেখা যায় না। শাসন সংস্কার যাহা হইল, তাহাতেও ভারতীয় প্রজার হাতে ক্ষমতা কিছুই এমন আসিল না! যুদ্ধের সময় ভারতের মুসলমান প্রজাবর্গ যখন তাদের খলিফার বিরুদ্ধে অসি ধারণ করে, তারা ভরসা পাইয়াছিল বৃটিশসাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য এই যুদ্ধ,—খালিফার ধর্ম্মবিহিত অধিকার কিছুই কাড়িয়া নেওয়া হইবে না। পঞ্জাবের লক্ষ লক্ষ লোক যুদ্ধে গিয়াছে, হাজারে হাজারে অকাতরে প্রাণ দিয়াছে। বস্তুতঃ পশ্চিম এসিয়ায় বৃটিশ পতাকার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে প্রধানতঃ পাঞ্জাবী সেনা। স্বয়ং ওডায়ারও তাঁহার শাসিত পাঞ্জাবের রাজভক্তি ত্যাগ প্রভৃতির কথা তুলিয়া কতই না গৌরব একদিন করিয়াছেন। যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই প্রজা বিদ্রোহ উপস্থিত এই ওজুহাতে কি ভীষণ হত্যাকাণ্ড আর কত কি লাঞ্ছনাই না পাঞ্জাবীর হইয়া গেল। তারই বা সন্তোষজনক প্রতিকারের আশা কি দেখা যাইতেছে! যুদ্ধ যখন বড় সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছিল,—ভারত ভরিয়া সাজ সাজ ধ্বনি উঠিয়াছিল, ভারতসচিব মণ্টেগু ঘোষণা করিলেন, ভারতের শাসন পদ্ধতি সংস্কার হইবে, তাহাতে Responsible গবর্ণমেণ্টের গোড়াপত্তন হইবে। ইতিমধ্যে অপ্রত্যাশিত অভাবনীয় ঘটনাচক্রে যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল। কাকের গলায় বাঁধা গাবের বীচি নামিবার মত সাম্রাজ্যের সঙ্কট দূর হইল। যাহা হউক, শাসন সংস্কারের আইন একটা পাশ হইল, তাহাতে শাসনে প্রজার প্রকৃত অধিকার আমরা পাইলাম এমন কি?

এরূপ অবস্থায় ভারতীয় প্রজাপক্ষের মনে দারুণ একটা ক্ষোভ ও অসন্তোষ যে জন্মিবে, ইহা কিছুই বিচিত্র নয়। যে সব অন্যায় তাঁহাদের উপরে হইয়াছে বলিয়া মনে করেন তার প্রতিকারের জন্যও ভারতীয় প্রজাপক্ষ যে যতদূর পারেন চেষ্টা করিবেন, ইহাও স্বাভাবিক।

প্রতিকার লাভের উপায়

Passive Resistence

কিন্তু তাঁহাদের এই পারার সীমা কতদূর? এইটুকু বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখিতে হইবে এবং তাই বুঝিয়া তার মধ্যেই চেষ্টা যা কিছু সম্ভব করিতে হইবে।

বৎসরাধিক পূর্ব্বে রাউলাটবিল পাশ হইবার পর মহাত্মা গান্ধি ভারতীয় প্রজাকে দৃঢ়ভাবে সত্যাগ্রহনীতি অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। Passive Resistence নীতির চরম একটা শান্তভাব এই সত্যাগ্রহনীতি। অন্যায় আইন কর, হাতে তোমার অবাধ ক্ষমতা আছে করিতে পার; কিন্তু সে আইন আমরা মানিয়া চলিব না। আইন বলিতেছে, এই কাজ কর, নতুবা এই শাস্তি পাইবে। বেশ, কাজটা আমরা অন্যায় মনে করি, করিব না,—শাস্তি দেও, মাথা পাতিয়া নিব।—কথাটি বলিব না, যতই ক্লেশ দুঃখ পাই, শান্তভাবে সহিব, তোমার প্রতি তার জন্য বিদ্বেষও কিছু দেখাইব না। তোমার রাজকীয় বিধানে দুইটি alternative আমাকে দিয়াছে, ভাল, শেষেরটি আমি বাছিয়া নিলাম, কোনও কলহও তোমার সঙ্গে তার জন্য করিতেছি না। সুতরাং তুমি বলিতে পার না, তোমার রাজ-প্রভুত্বের বাদী আমি হইতেছি।

ইহাই গান্ধির Passive Resitence বা সত্যাগ্রহনীতি। এই নীতি অবলম্বন করিয়া ঠিক এই ভাবে চলিতে পারিলে, রাজপক্ষ প্রজাকে বাস্তবিক বলিতে পারেন না, তোমরা রাজদ্রোহ করিলে। অথচ প্রজাপক্ষ ইহার বলে রাজপক্ষকে এমন সঙ্কটে ফেলিতে পারেন যে, সেই অন্যায় আইন শেষে স্বেচ্ছায় রদ না করিয়া তাঁহারা পারেন না!

একটা আদর্শ বা কেবল মতবাদ বা theory র হিসাবে ইহা অতি চমৎকার এবং শাসন প্রভুত্বের অধিকারে বঞ্চিত প্রজার হাতে একটা অমোঘ অস্ত্র বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু আদর্শ বা theory যতই শ্রেষ্ঠ হউক কার্য্যতঃ তাহা অনেক ক্ষেত্রেই চলে না।—যে অবস্থায় এবং যে সব ধর্ম্মে বলিষ্ঠ হইলে, এই নীতির সার্থক প্রয়োগ কোনও দেশের

প্রজা মণ্ডলী করিতে পারে, ভারতের প্রজার সে অবস্থা নয়, সে সব ধর্ম্মও তাহাদের মধ্যে এখনও জন্মে নাই। বস্তুতঃ কোনও দেশের প্রজাই যে এরূপ সত্যাগ্রহনীতি অবলম্বন করিয়া তাহা সার্থক করিতে পারিয়াছে, তার দৃষ্টান্ত, কই পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও দেখা গিয়াছে কি? ইউরোপে মধ্যে মধ্যে সম্প্রদায় বিশেষ, বিশেষ আইনের বিরুদ্ধে Passive Resistence নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু এত বড় তিতিক্ষার আদর্শ তাঁহারা মানিয়া চলেন নাই। আর এই খুব Passive Resistence এর চেষ্টা হইয়াছেও প্রায়শঃ কোন না কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায় বিশেষের পক্ষ হইতে। তাহাদের ধর্ম্মমত দমনের জন্য রাজ সরকার হইতে যে সব আইন হইয়াছে, তার বিরুদ্ধে ধর্ম্মভাবের প্রেরণায় ধর্ম্মোন্মাদনায় লোকে যাহা করিতে পারে, যত ক্লেশ সহিতে পারে আর কিছুতে তা পারে না। আর একরূপ প্রেরণায় বা উন্মাদনায় সম্প্রদায়ভুক্ত সকলে এমনই একটা একতায় বদ্ধ থাকিত যে গুরু বা নায়কের কথায় তারা সকলেই ব্রতের মত এই সব ক্লেশ বরণ করিয়া নিত। তবু অনেক ওঠা পড়া এই সব প্রচেষ্টার মধ্যে দেখা গিয়াছে সব সার্থকও হয় নাই। দেশভক্তির প্রেরণা ভগবদ্ভক্তির প্রেরণার ন্যায় অত প্রবল কখনও হয় না। আর হইলেও, সে প্রেরণা ভারতীয় প্রজার মধ্যে কোথায়? যেটুকু আছে তাই বা কয়-জনের মধ্যে দেখা যায়? কোটি কোটি ভারতবাসীর মধ্যে সংখ্যায় তাঁহারা কয়জন? সাগরজলে বুদ্‌বুদের ন্যায়ই তাঁহারা নগণ্য। তারপর আরও একটা বিবেচনার কথা আছে। প্রজাপক্ষ যেমন তার resistenceএ passive থাকিবে, রাজপক্ষকেও আইনের প্রয়োগে তেমনই passive থাকা দরকার। যেখানে যতটুকু আইন লঙ্ঘিত হইতেছে সেইখানে ধীরভাবে ঠিক আইনের মাপকাঠি ধরিয়া ততটুকু দণ্ডবিধান মাত্র করিয়া ক্ষান্ত হইবেন, -এই নীতি ত্যাগ করিতে প্রজাকে বাধ্য করিবার জন্য অন্যরূপ কোনও বল কি ছল কিছুই প্রয়োগ করিবেন না। রাজপক্ষ এইরূপ তিতিক্ষাপরায়ণ না হইলে প্রজাপক্ষ বা তার কোনও শ্রেণী বা সম্প্রদায় বিশেষ Passive resistence চালাইতেই পারে না। ইয়োরোপে ইহা যতটা সম্ভব, এদেশে তার সহস্রাংশও সম্ভব হইবে কি? এরূপ সুদূর প্রত্যাশাও ভারতীয় প্রজা কেহ করিতে পারেন কি? এই ত চক্ষের উপর দেখিলাম, দেখিতেছি পাঞ্জাবে কিসে কি হইল, আর আয়ারল্যাণ্ডেই বা কিসে কি হইতেছে। স্বদেশীর প্রারম্ভে বরিশাল কন্‌ফারেন্সে একদিনের জন্য একটিবার মাত্র এই passive resistence দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম ছিল, রাজপথে কেহ "বন্দেমাতরম্‌" ধ্বনি উচ্চারণ করিতে পারিবেন না,—প্রতিনিধিগণ স্থির করিলেন, শোভাযাত্রা করিয়া "বন্দেমাতরম্‌" ধ্বনি উচ্চারণ করিতে করিতে সভামণ্ডপে যাইবেন,—সরকারী আদেশ লঙ্ঘনের জন্য যদি পুলিশ দলশুদ্ধ সকলকে গ্রেপ্তার করিয়া নিয়া যায়, কোন প্রতিবাদ তাহাতে করিবেন না। কিন্তু রাস্তায় বাহির হইবা মাত্র তাঁহাদের মাথায় পুলিসের লাঠি পড়িল; বন্দুকধারী পুলিশও দলে দলে ইহাদের পশ্চাতে ছিল,—ভাগ্যে তাদের অস্ত্র তারা ব্যবহার করে নাই। প্রধান নেতা দুই একজনকে গ্রেপ্তারও অবশ্য করা হয়, কিন্তু তাহা লাঠি-মারার পর।

যাক এসব কথা যুক্তি বা দৃষ্টান্তের দ্বারা যে কাহাকেও বুঝাইবার প্রয়োজন আছে, তা মনে হয় না।

সকল অবস্থা ভাবিয়া দেখিলে মোট একটা কথা সকলেই বুঝিতে পারিবেন Passive Resistenceএর আদর্শ যতই উত্তম হউক, প্রজার হাতে যত বড একটা অস্ত্রই তাহা হউক এ নীতি ভারতে এখন চলিতে পারে না। এ অস্ত্র ধরিবার মত বল ভারতবাসীর হাতে এখন নাই। দুই চারিজন লোক একটু বোঝাবুঝি করিতে পারেন কিন্তু তাহাতে লাভ কি? এত বড় একটা দম্ভ করিয়া তার ফল যদি এইটুকু মাত্র হয় তাহাতে কেবল উপহাসাস্পদই হইতে হয়। তাও না হয় হইলাম। কিন্তু কেবল উপহাসাস্পদ হইয়াই বা রেহাই পাই কই? অনেক লোক এমন আছে, যাদের হিসাব কিতাব নাই—এসব গুরু ব্যাপারের দায়িত্ব কিছুই বোঝে না, তালে নাচে, লোককেও তালে নাচায়। এমন সব কাণ্ড তাহাতে ঘটিয়া বসে, যার তাল সামলাইতে শেষে বড় বড় গুরুস্থানীয় নায়কবাও পারেন না। মহাত্মা গান্ধিও ইহা বুঝিয়াছেন বলিয়া পরিতাপও করিয়াছেন।

Non-cooperation বা সহযোগিতা বর্জ্জন।

প্রাধানতঃ খালিফাতের আন্দোলন সম্পর্কে আবার কেহ কেহ বলিতেছেন, গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সকল রকম Co-operation বা কাজকর্ম্মে সহযোগিতা ত্যাগ করিতে

হইয়ে। প্রজা লইয়াই রাজা, প্রজার ধনেই রাজার ধন, প্রজার বলেই রাজার বল। প্রজার সহায়তা ব্যতীত কোন রাজসরকার শাসনকার্য্য চালাইতে পারেন না, রাজস্বরক্ষাও করিতে পারেন না। আমাদের রাজা বিদেশী ইংরেজ, রাজ সরকারের কর্ত্তা ইংরেজ জাতি। প্রধান প্রধান রাজ কর্ম্মচারী, শাসনরক্ষণ প্রভৃতি রাজকার্য্যের গুরুদায়িত্ব যাঁহাদের হাতে, তাঁহারাও ইংরেজ। কিন্তু লক্ষ লক্ষ ভারতীয় প্রজাকে সহায়করূপে নিয়োগ করিয়া তবে এই রাজকার্য্য ইঁহাদের চালাইতে হয়। পুলিশ কনষ্টেবল, সাধারণ সৈনিক, পেয়াদা, কেরাণী প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া সেনাপতি এবং প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ও সচিববর্গ পর্য্যন্ত সকল রাজ কর্ম্মচারী কিছু আর ইংরেজ জাতির মধ্য হইতে ইঁহারা সংগ্রহ করিতে পারেন না। এ খরচেও কুলায় না, তা ছাড়া সকল রকম ইংরেজ পুরুষ আসিয়া ভারতে বসিলেও ভারতীয় রাজসরকারের প্রয়োজনীয় লোকসংখ্যা পূর্ণ হয় কি না। সুতরাং সহজেই এটা বলা যাইবে, ভারতীয় প্রজা যদি রাজ সরকারের সংস্রব ত্যাগ করে তবে গবর্ণমেণ্ট একেবারে অচল হইয়া পড়ে। সুতরাং এই non-co-operation অর্থাৎ সহযোগিতা-বর্জ্জন বা সংস্রবত্যাগ গবর্মেণ্টকে স্বমতে বাধ্য করিবার পক্ষে বড় একটা অস্ত্র,—passive resistance অপেক্ষাও প্রবলতর অস্ত্র। কিন্তু ইহার প্রয়োগ তাহা অপেক্ষাও বহুগুণে কঠিন, একরূপ অসম্ভব বলিলেও হয়। ইহাও এমন একটা theory যাহা বলিতে বেশ, শুনিতে বেশ, যার ক্রিয়া ও ফলাফল কল্পনা করিতেও বেশ, আর বক্তৃতাও যার কথায় বেশ জমে, খাসা বাহবা পাওয়া যায়, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহা একেবারেই চলে না, কোনও দেশেই চলে না, চলে নাই, এ দেশের ত কথাই নাই। Passive resistance যে সব কারণে চলে না, ইহা সেই সব কারণে আরও চলে না,—তা ছাড়া, না চলিবার আরও অনেক কারণ আছে। চালাইতে গেলে অশেষ লাঞ্ছনা সহিয়া অর্থাৎ জলে একেবারে প্রাণান্তিক নাকানি চুবানি খাইয়া 'বাপ' 'বাপ' বলিয়া শেষে রাজসরকারের পায়ে ধরিয়া ছাড়িয়া দিতে হইবে। তবে মতদূর এ চেষ্টা অগ্রসর হইবারই সম্ভাবনা নাই।

ইঁহারা বলেন, নূতন লেজিসেটিভ কাউন্সিলের সদস্য কেহ হইও না, রাজ সরকারের দেওয়া খেতাব ত্যাগ কর; আদালতী কাজ সব ছাড়, তারপর শাসন ও সৈনিক বিভাগে যারা কাজ করিতেছ, তারাও সকলে যার যার কাজ ছাড়িয়া দেও।

প্রথম তিনটি কাজ এমন কঠিন নয়, ইচ্ছা করিলেই বিশেষ কোনওরূপ ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়া সকলে করিতে পারে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত করিয়াছে কয়জনে? করিবার আগ্রহ কি প্রবৃত্তি দেখা যাইতেছে কয়জনের মধ্যে? ন্যাশনালিষ্টদলের বড় বড় পাণ্ডারা ত ইতিমধ্যেই কোমর বাঁধিয়া ভোটের লড়াই আরম্ভ করিয়াছেন। এটা যে বড় একটা effective protest হয়, এটা যাঁহারা বোঝেন, তাঁহাদেরই কয়জনের এমন সাহস আছে কাজে তাহা দেখাইতে পারেন? বুঝিয়া সেই বুঝাটা ধরা দিতেই বা প্রস্তুত কয়জনে? হিসাব করিয়া যদি দেখা যায়, কাউন্সিলের মেম্বরগিরি খেতাব, আদালতী কাজ ছাড়িতে যাঁরা প্রস্তুত, অন্ততঃ ছাড়াটা উচিত বলিয়াও যাঁরা মনে করেন, তাঁদের তুলনায় এই সব সম্মান ও রাজপ্রসাদ কামনা করেন, এইরূপ লোকের সংখ্যাত শিক্ষিত সমাজে অনেক বেশী হইবে না। Moderate অপেক্ষা Nationalistরা দলে বড় কিন্তু মোটে এই দুই দলের সমষ্টিই বা শিক্ষিত সম্প্রদায়-ভুক্ত মোট জনসমষ্টির কাছে কতটুকু? সভবে কি মফঃস্বলে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে যাহারা ব্যাপৃত, তাঁহাদের খুব বেশীর ভাগই ব্যবহারজীবী বা উকিল ব্যারিষ্টার। ইঁহাদের মধ্যেই বা কতজনের এই সব আন্দোলনে আগ্রহ একটা দেখা যায়? রাষ্ট্রীয় সভা সভা হয়, উপস্থিত জনতার মধ্য হইতে স্কুলকলেজের ছাত্র যদি সব বাছিয়া বাহির করিয়া দেখা যায়, সভা যে উজাড় হইয়া যায়! বয়স্ক পুরুষ, সংসারে স্থিত বলিয়া প্রকৃত দায়িত্বগ্রাহী প্রজা যাঁহাদের বলা যায়, তাঁহাদের মধ্যে কয়টি লোক আর সেই সভায় তখন থাকে? সভাগুলি বৈঠকখানার মজলিস ছাড়া সভা বলিয়াই আর মনে হইবে না। বড় বড় নায়ক যাঁহারা, সভাপতি বা বক্তারূপে সভায় উপস্থিত হন,—বাঙ্গলার সকল কর্ম্মের সকল চিন্তার কেন্দ্রস্থল এই কলিকাতায় ত দেখিতে পাই—তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গৃহে ফিরিতে ব্যাকুল, পাছে ডিনারের সময় কয়েক মিনিট পার হইয়া যায়। বৈষয়িক লাভের কোন একটা কাজ

আসিয়া পড়িলে প্রতিশ্রুতি দিয়াও সভায়ই যে তারা আসেন না। এই ত অবস্থা। প্রথম তিন রূপ সংগ্রহ আগে যেটুকু effective protest সম্ভব, তাও ঘটায় আমরা আমরা বড় করি না। উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া, সর্বত্র সভা করিয়া, অগ্নি বক্তৃতার আগুণ ঢালিয়া কড়া কড়া রিজোলিউসন যতই পাশ করা হউক, এই 'বহ্বারম্ভে'র তুলনায় 'ক্রিয়াটা, সত্য এতই 'লঘু' হইবে, যে তা ভাবিলে এত দুঃখে আমাদেরই হাসি পায়, প্রতিপক্ষ ত হাততালি দিয়া উচু গলায় হিহি করিয়া হাসিবেই, আরও বুঝিবে, আমাদের মুখের বড়াই আমাদের সব বড় বড় বক্তৃতা শরতের মেঘডম্বুর অপেক্ষাও অনেক ফাঁকা, তার জন্য তাদের একটুও চমকাইবার দরকার কিছু নাই।

তারপর সব চাকরী ছাড়িবার কথা, এ কল্পনা ত একেবারেই আকাশকুসুম! প্রজারূপে গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করিতেছি, এ সহায়তা ব্যতীত গবর্ণমেণ্ট চলে না, না করিলে প্রজার ধর্ম্ম থাকে না যারা চাকরী করে এ সব বুদ্ধিতে করে না,—করে যার যার পেটের দায়ে। চাকরীর জন্য লালায়িত হইয়া ফেরে, পাইলে ভাগ্য মনে করে! হাঁ, সরকারী চাকরীতে যে যাহা পাইতেছে, আর যত রকম সুবিধা যার আছে, বেশী না হউক; অন্ততঃ তাও যদি দেওয়া যায় তবু বলা যায়, চাকরী ছাড়। নইলে চাকরী ছাড়িয়া তারা খাইবে কি? আর একজন ছাড়িলে, তার স্থানে যে পঞ্চাশ জন ছুটিয়া আসিবে। গবর্ণমেণ্টের একগাছি চুলও খসিবে না,—মরিবে যে চাকরী ছাড়িবে সে! এটা কেবল আমাদের দেশের কথা নয়, সকল দেশেরই এই অবস্থা। গবর্ণমেণ্টকে জব্দ করিব বলিয়া দেশের লোক সব চাকরী ছাড়িয়া দিয়াছে, কই এমনটা কোথাও কখন ঘটিয়াছে বলিয়া ত জানি না।

ধরিলাম, সবাই না হউক, অনেক লোকই চাকরী ছাড়িয়া দিতেছে, আর সেই ছাড়া চাকরী নিতে নূতন লোকও বড় কেহ আসিতেছে না। গবর্ণমেণ্ট যারপর নাই ফ্যাসাদে পড়িয়া গেলেন; কিন্তু এ ফ্যাসাদে গবর্ণমেণ্ট কি করিবেন? একেবারে নতজানু হইয়া প্রজার কৃপাভিক্ষু হইবেন, না হাতে যত ক্ষমতা আছে তার দ্বারা প্রজার এ বিরোধকই দমন করিতে চেষ্টা করিবেন? আগে এই শেষ চেষ্টা না করিয়া কোনও গবর্মেণ্ট প্রজার কাছে নতশির হইয়াছেন, এমন ত কোথাও শুনি নাই। কখনও এমন হয় না।—অন্যদেশের কথা যাই হউক ভারতে প্রজার পক্ষে এইরূপ একটা উদ্যম দেখিলেই শক্ত হাতে তাহা দমন করিতে পারেন, এ ক্ষমতা ভারতীয় রাজ-সরকারের হাতে যথেষ্ট আছে। সেটা কি আবার বিশেষ করিয়া কাহাকেও বুঝাইবার দরকার?

তা ছাড়া অশেষ রকমে আমরা গবর্মেণ্টের উপর নির্ভর করি। এমন সব বিষয়ে করি, যা না হইলে একটি দিন আমরা দেশে টিকিয়া থাকিতে পারি না। গুণ্ডার উপদ্রব ডাকাতী রাহাজানি হইলে, গুরু শান্তিভঙ্গ ঘটিলে, তখনই আমাদের সরকারের দ্বারস্থ হইতে হয়। বড় সহরে তবু কতক রক্ষা, কিন্তু দূর দূর গ্রামে যারা বাস করে রাজপুরুষদের সঙ্গে বিরোধ করিয়া চলা, জলে থাকিয়া কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করিবার মতই তাহাদের হয়। সহরের নায়করা কেহ গ্রামে গিয়া দুইদিন কখনও রহিয়াছেন গ্রামবাসী প্রজারা কি অবস্থায় বাস করে তাহা দেখিয়াছেন? গ্রামে মহামারী উপস্থিত হইলে সরকারী ডাক্তার ছাড়া একটু ঔষধ কেহ পায় না। অন্য বড় কোনও দৈবদুর্বিপাকেও সরকারী সাহায্য ব্যতীত গ্রামবাসীর চলে না। এই যে মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের Profiteering এর ফলে (ইহারা আমাদের দেশেরই লোক) কাপড়, চাউল প্রভৃতি সকল দ্রব্য অগ্নিমূল্য হইয়া উঠিয়াছে, সংসারযাত্রা দরিদ্রের পক্ষে দুঃসহ ভার হইয়া পড়িয়াছে, তার প্রতিকারের জন্যও সর্ব্বত্র সকলে গবর্ণমেণ্টেরই করুণা প্রার্থনা করিতেছেন। বস্তুতঃ ইহার আশু প্রতিকার এক গবর্ণমেণ্টের পক্ষেই সম্ভব হইতে পারে। করিলে গবর্ণমেণ্টই পারেন, নতুবা উপায় আর কিছুই নাই।

এ সব ত গরীবের কথা। রেল ষ্টীমার সব গবর্ণমেণ্টের বা বৃটিশ মহাজনের হাতে, ডাক টেলিগ্রাম গবর্ণমেণ্টের হাতে। এসব বন্ধ হইলে গ্রামবাসী দরিদ্রের যদিও দিনপাত হয়, সহরবাসী ধনীর ত একদিনও চলে না। আর যাক, ট্রাম, তড়িতের আলো পাখা, কলেরজল বন্ধ হইলে সহরবাসী ধনী দরিদ্রের অতিষ্ঠ অবস্থা উপস্থিত হয়। আমাদের দেশে সবই যে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে গবর্মেণ্টের আয়ত্ত। প্রজা যদি চাকরী ছাড়িয়া গবর্ণমেণ্টকে জব্দ করিতে চায়, গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে বৃটিশ মহাজনবর্গ ভারতের প্রজাকে বা জব্দ করিতে না চাহিবেন কেন? তখন কে আগে জব্দ হইবে?

আর দুই পক্ষই যদি সমান জোরে এই কলহ চালাইতে পারে, তবে সেটা কি হইবে? ভীষণ একটা বিপ্লব নয় কি। কতকটা জর্ম্মাণীপ্রমুখ মধ্য-ইয়োরোপেরই বিপ্লবের মত? মধ্য-ইয়োরোপেই সে বিপ্লবের তাল সামলাইতে পারিল না, —আর আমরা পারিব?

ছেলা খেলার কথা ইহা নয়, কবি বা ভাবুকের খেয়াল নয়,--অনেক হিসাব করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে সম্ভাব্যতা অসম্ভাব্যতা ভবিষ্যতের ফলাফল সব বিশেষ বিবেচনা করিয়া তবে আমাদের এই সব কথা বলিতে হইবে, কর্ম্মে রত হইতে হইবে।

খালিফাতের কথা

আরও একটা আমাদের বুঝিবা দেখাত হইবে। এই "non-cooperation"এর চেষ্টা সফল ত হইতেও পারে না, আংশিকভাবে হইলেও তাহাতেই খালিফাতের এই গোল মিটিতে পারে না। এই ব্যাপারটার সঙ্গে সম্বন্ধ কেবল ভারতের মুসলমান ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের নয়, World politics এর একটা বড় কথা। এখন ইহা ভারতীয় প্রজার চাপে বা প্রার্থনায় বৃটিশ রাজশক্তিই যে ইহার একটা সন্তোষজনক মীমাংসা করিয়া ফেলিতে পারে, তা নয়। তাঁহারা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কি হইবে? একত রাজনৈতিক ব্যাপারে এসব অঙ্গীকারের মূল্যই বড় বেশী কিছু নাই। তবু যদি ভারতীয় মুসলমানের সন্তোষ বিধানের জন্য এই অঙ্গীকার পালন করিতে তারা ইচ্ছা ও চেষ্টা করেন — কতদূর সফল তাহাতে হইতে পারেন। ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা যাহাই তাঁহারা হউন, সমগ্র জগতের একাধিপতি ত তাঁহারা নন। বিগত যুদ্ধে তাহাদের প্রবল দুই সহযোগী ছিল, ফ্রান্স ও আমেরিকা। ইহারা ত ভারতীয় মুসলমানের কোনও খাতির কবিবে না। ইহারা যদি বিজিত তুর্কী রাজ্যের উপরে প্রবল লোভ হইয়া থাকে, ভাগ ভাগ করিয়া নিতে চাহিবেই। ইংরেজ মেসোপটেমিয়া দখল করিয়াছেন তাঁহারাই ছাড়িবেন কেন? তবে কেহ বলিতে পারেন, ইংরেজ মেসোপটেমিয়া দিন না, দিয়া কেন ফরাসী মার্কিনকে বলুন না, তোমরা কোনও লোভ করিও না, তুর্কীর খলিফাতা অটুট থাক। কিন্তু—কি আর বলিব? ওসব হয় না, হইবার নয়।

তুর্কীর খালিফাতী অক্ষুণ্ণ থাকিবে কি না, তাহা নির্ভর করিতেছে, একেবারে তুর্কীর উপরে। তুর্কী যদি যোগ্য মিত্র কাহারও সহায়তা লাভ করিয়া নিজের রাজ্য পুনরধিকার করিয়া নিতে পারে, তবেই ভাঙ্গা খালিফাতী আবার জোড়া লাগিবে। নিজের বুদ্ধিবলে ও বাহুবলে যতদিন রাখিতে পারিবে ততদিন অটুটও থাকিবে। নতুবা ভারতে হিন্দু মুসলমান প্রজা বৃটিশ রাজের দ্বারে কাঁদিয়া কি চেঁচাইয়া কি হাজার ভয় দেখাইয়াও তুর্কীরাজ্য ও খলিফার অধিকার বজায় রাখিতে পারিবে না।

আমরা কি করিব? পথ কোথায়?

খালিফাতের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। কিন্তু আমাদের নিজেদের এই যে সব দুঃখ তার উপায় কি? Passive resistance আর non-co-operation প্রজার যে দুইটি বড় effective protest, তা যদি সমীচীন না হয়, কার্য্যতঃ সফল না হয়, তবে আর কি করিতে পারি আমরা? কেবল সভা, বক্তৃতা, আর রিজোলিউসন পাশ। না, তা নয়, কেবল তা নয়। তাও করিতে হইবে, লোকশিক্ষার ও লোকমত গঠনের জন্য তাও প্রয়োজন বটে, কিন্তু কেবল তাতেই কাজ হয় না। তবে কি? কি আর বলিব? স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ইহার এক উত্তর দিয়াছেন—

"আবার তোরা মানুষ হ।"

শাসন-সংস্কার আইন

(৩)

শাসন-বিভাগ।

১ম অংশ—ব্রিটিশ সরকার।

ভারত শাসনে সম্রাটের অধিকার।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশরাজের অধিকারভুক্ত স্থান সকলের শাসন মহামহিম ভারতসম্রাট কর্তৃক ও তাঁহার নামে পরিচালিত হয়। ১৮৫৮ সনের ভারতশাসনসংক্রান্ত আইন পাশ না হইলে কোনও স্থান সম্বন্ধে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী যে সকল অধিকার পরিচালনা করিতে পারিতেন, ভারত শাসনকার্য্যের আনুষঙ্গিক রূপে, সেই সকল অধিকার সম্রাট কর্তৃক ও তাঁহার নামে পরিচালিত হইতে পারিবে।

ভারত সচিব

(১) ১৮৫৮ সনের ভারত-শাসন-সংক্রান্ত আইন পাশ না হইলে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী, তাহার অধ্যক্ষ-পরিষৎ (Court of Directory) অথবা স্বত্বাধিকারি-পরিষৎ (Court of Proprietors) স্বাধীনভাবে, অথবা ভারতীয় ব্যাপারবিষয়ক কমিশনারবর্গের (Commissioners for the Affairs of India) নির্দ্দেশ অনুমতি অথবা অনুমোদন অনুযায়ী, ভারতের শাসন বিষয়ে, রাজস্ব সম্বন্ধে অথবা কোম্পানীর কর্ম্মচারিবর্গের সম্বন্ধে যে সকল অধিকার পরিচালনা করিতেন বা করিতে পারিতেন ও যে সকল কর্ত্তব্য পালন করিতেন বা করিতে বাধ্য ছিলেন, ভারত-সচিব তত্তৎ বিষয় সম্বন্ধে তত্তৎ বা তত্তুল্য অধিকার পরিচালনা করেন এবং করিতে পারেন ও তত্তৎ বা তদনুরূপ কর্ত্তব্য পালন করেন, তবে এতদ্বিষয় সম্বন্ধে তিনি বর্ত্তমান আইনের বিধান মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) বিশেষতঃ ভারতের শাসন ও রাজস্ব সংক্রান্ত এবং ভারতের রাজস্ব হইতে যে সকল বেতন, ভাতা বা বখশীস দেওয়া হয়, অথবা অন্যান্য যে সকল ব্যয় করা হয়, বা উক্ত রাজস্ব যে কোনও প্রকারে দায়াবদ্ধ করা হয় তৎসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য, ব্যাপার ও বিষয় পরিদর্শন পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রিত করার অধিকার ভারত সচিবের থাকিবে। তবে তিনি এতদ্বিষয়ে বর্ত্তমান আইনের বিধান ও তদনুযায়ী প্রণীত। বিশেষবিধি সকল মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) ভারত সচিবের বেতন পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার মঞ্জুরী টাকা হইতে দেওয়া হইবে। তবে তাঁহার আণ্ডার সেক্রেটারি দিগের বেতন এবং তাঁহার বিভাগের অন্য কোনও ব্যয় ভারতের রাজস্ব হইতে অথবা পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার মঞ্জুরী টাকা হইতে দেওয়া হইবে।

ভারতীয় অমাত্য সভা

(১) ভারতসচিবের নির্দ্দেশ অনুযায়ী অন্যূন ৮ জন ও অনধিক ১২ জন সভ্য লইয়া ভারতীয় অমাত্য সভা গঠিত হইবে।

(২) কোনও সভ্যপদ শূন্য হইলে তাহা পূরণ করিবার অধিকার ভারতসচিবের থাকিবে।

(৩) কোনও শূন্যপদ পূরণ করিবার সময় যদি অবশিষ্ট সভ্যগণের অর্দ্ধাংশ, যাঁহারা ভারতবর্ষে অন্যূন দশ বৎসরকাল চাকুরি বা বাস করিয়াছেন এবং সভায় নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে পাঁচ বৎসরের মধ্যে শেষবার—ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন, এইরূপ ব্যক্তি না হন, তাহা হইলে ঐরূপ কোনও ব্যক্তিকে শূন্যপদে নিযুক্ত করিতে হইবে।

(৪) এই আইন পাশ হইবার পর যে সকল সভ্য নিযুক্ত হইবেন তাঁহাদিগের কার্য্যকাল ৫ বৎসর হইবে।

(৫) কোনও সভ্যের কার্য্যকাল অবসান হইলে সরকারী কার্য্যের সুবিধার জন্য বিশিষ্ট কারণে ভারতসচিব তাঁহাকে পুনরায় ৫ বৎসরের জন্য নিযুক্ত করিতে পারেন। এইরূপ নিয়োগ সম্বন্ধে বিশিষ্ট কারণের উল্লেখ করিয়া ভারতসচিব একটি রিপোর্ট পার্লিয়ামেণ্টের উভয় সভায় পেশ করিবেন। উপরোক্ত অবস্থা ব্যতীত অন্য কোনও

অবস্থায় কার্য্যকালের অবসানে কাহাকেও পুনরায় সভ্যপদে নিযুক্ত করা হইবে না।

(৬) উক্ত সভার কোনও সভ্য লিখিতপত্র দ্বারা পদত্যাগ করিতে পারিবেন। সভার কার্য্য-বিবরণীতে এইরূপ পদত্যাগের বিষয় উল্লেখ করা হইবে।

(৭) পার্লিয়ামেণ্টের উভয় সভার আবেদন অনুসারে সম্রাট যে কোনও সভ্যকে বরখাস্ত করিতে পারেন।

(৮) প্রত্যেক সভ্য বার্ষিক ১২০০ শত পাউণ্ড বেতন পাইবেন। কোনও ভারতের অধিবাসী সভ্যপদে নিযুক্ত হইলে উক্ত বেতনের অতিরিক্ত বার্ষিক ৬০০ শত পাউণ্ড হারে ভাতা পাইবেন।

উপরোক্ত বেতন ও ভাতার টাকা ভারতের রাজস্ব অথবা পার্লিয়ামেণ্টের মঞ্জুরী টাকা হইতে দেওয়া হইবে।

(৯) যে কাল পর্য্যন্ত ভারতসরকারের চাকুরীতে নিযুক্ত থাকিলে কোনও সরকারী কর্ম্মচারী কোনও পেন্‌সন অথবা গ্রেচুইটি পাইবার অধিকারী হইতে পারেন, যদি ঐ কাল পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে তিনি উক্ত সভার সভ্যপদে নিযুক্ত হন, তাহা হইলে, তাঁহার উক্ত সভ্যপদের কার্য্যকাল, উক্ত পেন্‌সন বা গ্রেচুইটি পাইবার অধিকার সম্বন্ধে, ভারত সরকারের অধীন ভারতবর্ষের চাকুরীকালের সমতুল্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।

(১০) উক্ত সভার কোনও সভ্য পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার সভ্য হইতে বা তথায় কোনও বিষয়ে ভোট দিতে পারিবেন না।

(১১) অমাত্যসভার কার্য্য :—ভারত সচিবের নির্দ্দেশ অনুসারে ও বর্ত্তমান আইনের নিয়মাধীনে, ভারতের সহিত চিঠি পত্রাদির আদান প্রদান ও ভারতের শাসন সংক্রান্ত যে সকল কার্য্য যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত হয় তাহা নির্ব্বাহ করা অমাত্য সভার কার্য্য।

(১২) সভার ক্ষমতা :—ভারতসচিব ও অমাত্যসভা কর্ত্তৃক, অথবা, ভারতীয় অমাত্যসভা কর্ত্তৃক, যে সকল অধিকার পরিচালিত হইবার বিধান আছে, তাহা উক্ত সভার অধিবেশনে, ভারতসচিবের সাধারণ নির্দ্দেশ অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সভ্য উপস্থিত থাকিলে, উক্ত সভা কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতে পারিবে।

(১৩) কোনও সভ্যের পদ শূন্য থাকিলেও সভার কার্য্য চলিতে পারিবে।

(১৪) সভাপতি :—ভারতসচিব উক্ত সভার সভাপতি থাকিবেন এবং উহার অধিবেশনে তাঁহার ভোট দেওয়ার অধিকার থাকিবে।

সহকারি সভাপতি :—ভারতসচিব উক্ত সভার কোনও সভ্যকে সহকারী সভাপতি নিযুক্ত করিতে এবং এইরূপ নিযুক্ত ব্যক্তিকে পদচ্যুত করিতে পারিবেন।

উক্ত সভার কোনও অধিবেশনে ভারতসচিব উপস্থিত থাকিলে তিনি অথবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে সহকারী সভাপতি অথবা উভয়েই অনুপস্থিত হইলে, উপস্থিত সভ্যগণের নির্ব্বাচিত কোনও সভ্য সভাপতির কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

(১৫) সভার অধিবেশন :—ভারতসচিবের নির্দ্দেশ অনুসারে এই সভার অধিবেশন হইবে, তবে প্রত্যেক মাসে অন্ততঃ একটি অধিবেশন হওয়া চাই।

(১৬) সভার কার্য্যপ্রণালী :—যে সকল বিষয় এই আইনের বিধান অনুসারে অধিকাংশ সভ্যের মতে মীমাংসিত হওয়া প্রয়োজন, তদতিরিক্ত অন্য কোনও বিষয়ে সভ্যগণের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইলে ভারতসচিবের মতানুযায়ী তাহার মীমাংসা হইবে।

কোনও বিষয়ে সমসংখ্যক সভ্যগণ উভয়দিকে মত প্রকাশ করিলে সভাপতি যে কোনওদিকে দ্বিতীয় একটি ভোট দিতে পারিবেন।

ভারতসচিবের অনুপস্থিতিতে সভায় যে কোনও কার্য্য হইবে তদ্বিষয়ে ভারতসচিবের লিখিত অনুমোদন প্রয়োজন হইবে।

সভার কোনও অধিবেশনে, কোনও বিষয়ে মতভেদ উপস্থিত হইলে, ভারতসচিব ইচ্ছা করিলে ঐ বিষয়ে তাঁহার মত ও যুক্তি সভার কার্য্য বিবরিণীতে লিপিবদ্ধ করাইতে পারিবেন, ঐরূপ অপর কোনও সভ্যও তাঁহার নিজ মত বা যুক্তি ঐরূপ কার্য্য বিবরিণীতে লিপিবদ্ধ করাইতে পারিবেন।

(১৭) কমিটি :—ভারতসচিব, কার্য্যনির্ব্বাহের সুবিধার জন্য সভার অধীনে বিভিন্ন কমিটিগঠন করিতে পারিবেন, কোন বিভাগের কার্য্য কোন্ কমিটি দ্বারা নির্ব্বাহ হইবে তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন; এবং ভারতসচিব ও অমাত্যসভার, অথবা ভারতীয়-অমাত্য-সভার অনুষ্ঠেয়

কার্য্য কি প্রণালীতে নির্ব্বাহ হইবে, তাহা সাধারণভাবে নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন। বর্ত্তমান আইনের নিয়মাধীনে, উক্ত প্রকার নির্দ্দেশ অনুসারে যে সকল আদেশ দেওয়া হইবে বা যে সকল কার্য্য নিষ্পন্ন হইবে তাহা ভারতসচিব ও অমাত্য সভার আদেশ ও কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।

আদেশ ও চিঠি পত্রাদি

(১) যে প্রণালীতে কোন আদেশ এবং পত্রাদি ভারতে প্রেরিত হইবে এবং যে প্রণালীতে ভারত সচিবের নিকট হইতে কোনও পত্রাদি ভারত সরকার অথবা কোনও প্রাদেশিক সরকারের নিকট প্রেরিত হইবে, তাহা বর্ত্তমান আইনের নিয়মাধীনে ভারত সচিব ও অমাত্য সভা নির্দ্ধারিত করিবেন।

পত্র ও আদেশ প্রেরণ

(২) কোনও পত্র অথবা সেসকল বিষয় সংক্রান্ত আদেশ বর্ত্তমান আইনে ভারতীয় অমাত্য-সভার অধিকাংশ সভ্যগণের মতানুযায়ী নির্দ্দিষ্ট হইবার বিধান নাই, এইরূপ কোনও আদেশ যদি ভারতসচিব অবিলম্বে প্রেরণ করা আবশ্যক বিবেচনা করেন, তাহা হইলে তিনি তাহা সভার অধিবেশনে উপস্থিত না করিয়া এবং অন্যান্য সভ্যগণের গোচরার্থে সভার দপ্তরে না পাঠাইয়া প্রেরণ করিতে পারিবেন।

এরূপ স্থলে বর্ত্তমান আইনে অনুরূপ বিধান না থাকিলে যে সকল গুরুতর কারণে উক্ত প্রকার পত্র বা আদেশ প্রেরণ করা হইয়াছে, ভারতসচিব তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন এবং সভার প্রত্যেক সভ্যকে তাহা জানাইবেন।

গোপনীয় বিষয়

(৩) যুদ্ধ ঘোষণা, শান্তিস্থাপন, অপরাপর রাজ্য ও রাজন্যগণের সহিত কোন সন্ধি অথবা আলোচনা অথবা তৎ সম্পর্কিত কোনও সম্বন্ধে কোনও আদেশ, যাহা বর্ত্তমান আইনে ভারতীয় অমাত্য সভার অধিকাংশ সভ্যের মতানুযায়ী নির্দ্দিষ্ট হইবার কোনও বিধান নাই, এইরূপ কোনও বিষয় যদি ভারত সচিব গোপনীয় বলিয়া বিবেচনা করেন, তবে তিনি তাহা অমাত্যসভার কোনও অধিবেশনে উপস্থিত না করিয়া এবং অন্যান্য সভ্যগণের গোচরার্থে উহা সভার দপ্তরে না পাঠাইয়া এবং যে সকল কারণে উক্তপ্রকার আদেশ করা হইয়াছে তাহা লিপিবদ্ধ বা অন্য সভ্যদিগকে জ্ঞাপন না করিয়া, ভারতসরকার অথবা কোনও প্রাদেশিক সরকার অথবা ভারতস্থিত কোনও সরকারী কর্ম্মচারীর নিকট প্রেরণ করিতে পারিবেন।

(৪) ভারতের অথবা কোনও অংশের শাসন অথবা উপরোক্ত বিষয় সংক্রান্ত কোনও পত্র ভারতসচিবের নিকট প্রেরণ করিবার সময় যদি প্রধান শাসনকর্ত্তা ও অমাত্যসভা অথবা কোনও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ও অমাত্যসভা বিবেচনা করেন যে, উক্ত পত্রের বিষয় গোপনীয়, তাহা হইলে উহা "গোপনীয়" বলিয়া চিহ্নিত করিয়া পাঠাইবেন। এইরূপ চিহ্নিত কোনও পত্র ভারত সচিবের নির্দ্দেশ ব্যতীত অপর কোনও সভ্যের গোচরে আনা হইবে না।

(৫) ভারতের প্রধান শাসনকর্ত্তা ও অমাত্যসভা অথবা কোন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ও অমাত্যসভা কর্ত্তৃক যুক্তবাক্যে প্রেরিতব্য যাবতীয় পত্রাদি ভারত সচিবের নামে পাঠাইতে হইবে।

(৬) সম্রাটের সৈন্যকর্ত্তৃক ভারতে কোনও যুদ্ধ বিগ্রহ আরম্ভ করিবার আদেশ পাঠাইবার পরবর্ত্তী তিন মাসের মধ্যে উক্ত আদেশ বর্জ্জিত বা স্থগিত না হইয়া থাকিলে, পার্লিয়ামেন্টের উভয় সভার গোচরে উহা আনিতে হইবে। উক্ত তিন মাস শেষ হইবার সময় মহাসভার অধিবেশন স্থগিত থাকিলে, পুনরায় অধিবেশন আরম্ভ হইবার পর এক মাসের মধ্যে উহা জানাইতে হইবে।

ভারতীয় রাজস্ব

রাজস্ব যেভাবে ব্যয় করা যাইবে :—

(১) ভারতের যাবতীয় রাজস্ব সম্রাটের নামে সংগৃহীত হইবে এবং এই আইনের বিধান অনুসারে ভারতের শাসন কার্য্যে ব্যয়িত হইবে।

(২) ভারতের রাজস্বের উপর নিম্নলিখিত দায় সকল থাকিবে —

(ক) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কৃত ঋণ সকল।

(খ) ১৮৫৮ সনের ভারত-শাসন-সংক্রান্ত আইন পাশ না হইলে তৎকালীন যে সকল সন্ধি, সর্ত্ত, চুক্তি, দান বা দায় সম্বন্ধে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের রাজস্ব হইতে ব্যয় করিতে পারিতেন।

(গ) ভারতের শাসনকার্য্যের জন্য যে সকল ব্যয় বা দায়স্বীকার বৈধরূপে করা হইবে।

(খ) এই আইনে যে সকল বিষয়ে অন্যরূপ বিধান আছে তদ্ব্যতীত এই আইনের বিধান অনুযায়ী অন্যান্য ব্যয় সকল।

(৩) "ভারতের রাজস্ব" বলিতে বৃটিশ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ও অন্যান্য প্রকারে সংগৃহীত যাবতীয় রাজকর বুঝাইবে; নিম্নলিখিত আয় সকল এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(ক) ১৮৫৮ সনের ভারত-শাসন সংক্রান্ত আইন পাশ না হইলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের কোন অংশ হইতে কর অথবা অন্য বাবদে যাহা পাইতে পারিতেন।

(খ) বৃটিশ ভারতের কোনও আইন আদালতের বিচার অনুযায়ী যে সকল জরিমানা মুচলেকা প্রভৃতি আদায় হইবে অথবা যে সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

(গ) যে সকল সম্পত্তি উত্তরাধিকারীর অভাবে সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে।

(ঘ) ১৮৫৮ সনের ভারত শাসন সংক্রান্ত আইন অথবা বর্ত্তমান আইন অনুযায়ী সম্রাটের উপর যে সকল সম্পত্তি ন্যস্ত আছে তাহা ও তাহার উপস্বত্ব, অথবা যে সকল অধিকার ন্যস্ত আছে তদ্বাবদ যাবতীয় প্রাপ্তি এবং বর্ত্তমান আইন অনুযায়ী যে সকল সম্পত্তি ভারতসচিব ও অমাত্য-সভার হস্তে আসিবে বা দান করিবার অধিকার থাকিবে, সেই সকল সম্পত্তি, উপস্বত্ব প্রভৃতি ভারতের রাজস্বের সাহায্যার্থে ব্যয়িত হইবে।

২। ব্রিটিশ ভারতে বা অন্যত্র, ভারতের রাজস্ব ব্যয় সম্বন্ধে, বর্ত্তমান আইন ও তৎসংক্রান্ত বিশেষ বিধির নিয়মাধীনে সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব ভারতসচিব ও অমাত্যসভার থাকিবে। উক্ত রাজস্বের, অথবা ১৮৫৮ সনের ভারতশাসন—সংক্রান্ত আইনের বিধান অনুযায়ী যে সকল সম্পত্তি ভারতসচিব ও অমাত্য সভার হস্তে আসিবে, তাহার কোনও অংশ দান বা ব্যয় করিবার ব্যবস্থা, ভারতীয় অমাত্যসভার অধিবেশনে অধিকাংশ সভ্যের মতানুযায়ী নির্দ্দিষ্ট হইবে। তবে উক্ত সভার কোনও অধিবেশনে অধিকাংশ সভ্যের মতানুযায়ী নির্দ্দিষ্ট বিধি নিষেধ অনুযায়ী যে সকল দান বা ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হইবে তাহা উক্ত প্রকার অমাত্য সভার অধিবেশনে অধিকাংশ সভ্যের মতানুযায়ী নির্দ্দিষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইবে।

৩। সম্রাটের অধিকৃত ভারতীয় রাজ্য কোনও বহিঃশত্রু আক্রমণ করিলে উহাকে বাধা দেওয়া বা প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনও উদ্দেশ্যে উক্ত রাজ্যের বহিঃসীমার বাহিরে কোনও সামরিক অভিযানের ব্যয়, পার্লিয়ামেণ্টের উভয় সভার সম্মতি ব্যতিরেকে, ভারতীয় রাজস্ব হইতে দেওয়া যাইতে পারিবে না।

৪। ভারতের আয় ব্যয়ের বিবরণী:—

(১) প্রতি বৎসর মে মাসের প্রথম দিনের পর পার্লিয়ামেণ্টের উভয় সভার অধিবেশন আরম্ভ হইবার ২৮ দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয় সকল ভারতসচিব ও অমাত্য-সভা উক্ত উভয় সভার সমক্ষে উপস্থিত করিবেন:—

(ক) বিগত সরকারী বৎসরের পূর্ব্ব বৎসরে ভারতের রাজস্ব যাহা আদায় হইয়াছে তাহার একটি বিবরণী। উক্ত বিবরণীতে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে আদায়ী রাজস্বের হিসাব উপযুক্ত হেডিং অনুসারে পৃথকভাবে দেখাইতে হইবে। ভারতের শাসনকার্য্যের জন্য দেশে বা বিদেশে যে সকল আয় বা ব্যয় হইয়াছে, উপযুক্ত হেডিং অনুসারে লিখিত তাহার একটি বিবরণী।

(খ) বিগত সরকারী বৎসরের আয় ব্যয়ের শেষ আনুমানিক হিসাব যাহা করা হইয়াছে, তাহা।

(গ) বিগত সরকারী বৎসরের পূর্ব্ব বৎসরের প্রারম্ভে ও শেষে দেশে বা বিদেশে ভারতের রাজস্বের উপর যে সকল কোম্পানীর কাগজ, কর্জ্জ, ঋণ বা অন্যান্য দায় ছিল, তাহার বিবরণ, উক্ত বৎসরে যে সকল নূতন কর্জ্জ, ঋণ বা অন্যান্য দায় গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার বিবরণ, উক্ত বৎসরে যে পরিমাণে ঐ সকল পরিশোধ করা হইয়াছে তাহার বিবরণ, উক্ত কর্জ্জ, ঋণ বা অন্যান্য দায় বাবদে যে হারে সুদ দিতে হয় পৃথকভাবে তাহার বিবরণ ও মোট বার্ষিক সুদের পরিমাণ কি তাহার বিবরণ।

(ঘ) ভারত সচিব ও অমাত্য সভার কার্য্য নির্ব্বাহার্থ তাঁহাদিগের দপ্তরের যাবতীয় ব্যয় ও সেই বাবদ যে সকল বেতন, ভাতা প্রভৃতি দেওয়া হইয়াছে তাহার বিবরণ।

(২) পূর্ব্ব দফার ব্যয়ের হিসাবের তালিকায় প্রত্যেক বৎসর বার্ষিক ৫০ পাউণ্ডের বেশী যদি কাহারও বেতন বা পেন্‌সন বাড়ান হইয়া থাকে, তাহা মন্তব্য সহকারে বিশেষ ভাবে দেখাইতে হইবে।

(৪) পূর্ব্বোক্ত আয়ব্যয়ের বিবরণীর সহিত প্রত্যেক প্রদেশ হইতে সংগৃহীত বিশেষ বিবরণ হইতে চুম্বক সংগ্রহ করিয়া এইরূপ একটি বিবরণী দিতে হইবে, যাহা হইতে উক্ত বৎসরে ভারতের নৈতিক ও আর্থিক উন্নতি এবং অবস্থার বিষয় প্রকৃষ্টরূপে বুঝা যাইতে পারে।

৫। হিসাব পরীক্ষা :—(১) ভারতসচিব ও অমাত্য-সভার রক্ষিত ভারত সংক্রান্ত হিসাব নিকাশ পরীক্ষার জন্য, বিলাতের কোষাধ্যক্ষ-মন্ত্রীর স্বাক্ষরযুক্ত সম্রাটের ফারমান অনুযায়ী একজন অডিটার বা হিসাব-পরীক্ষক নিযুক্ত হইবেন। তিনি উক্ত ফারমানের নির্দ্দেশ অনুসারে সহকারী কর্ম্মচারী নিযুক্ত বা বরখাস্ত করিতে পারিবেন।

(২) এই আইনের মর্ম্মানুসারে ভারতসংক্রান্ত যাবতীয় টাকা জিনিস ও সম্পত্তি যাহা বিলাতে জমা বা খরচ হইয়াছে, তাহার হিসাব উক্ত অডিটার পরীক্ষা করিবেন।

(৩) ভারতসচিব ও অমাত্য সভা তাঁহাদিগের কর্ম্মচারী দ্বারা যাবতীয় হিসাব, তৎ সংক্রান্ত চালান, রসীদ, প্রয়োজনীয় কাগজাদি সহ উক্ত অডিটারের পরীক্ষার জন্য উপস্থিত করাইবেন।

(৪) উক্ত টাকা, জিনিষ ও সম্পত্তি সকলের জমা, খরচ ও হিসাব সম্বন্ধে উক্ত অডিটার ভারতসচিব ও অমাত্য-সভার দপ্তরের যে কোনও কর্ম্মচারীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন। এজন্য তিনি নিজ দস্তখতি পরোয়ানা দ্বারা যে কাহাকেও তলব দিতে পারিবেন।

(৫) উক্ত হিসাব সম্বন্ধে অডিটার ভারতসচিব ও অমাত্য সভার নিকট নিজ মন্তব্য সহকারে একটি রিপোর্ট দিবেন। উক্ত রিপোর্টে যে সকল বিষয়ে ভারতের রাজস্ব-আইন-বিরুদ্ধ কোনও প্রকারে ব্যয় করা হইয়াছে তাহার বিশেষ উল্লেখ থাকিবে।

(৬) যে সকল টাকা, জিনিষ বা সম্পত্তি হিসাব ভুক্ত করা উচিত ছিল কিন্তু করা হয় নাই, অথবা তৎসংক্রান্ত যে সকল খরচ আইন মতে নয়, অথবা যে সকল খরচের জন্য উপযুক্ত ক্ষমতা বা আদেশ লওয়া হয় নাই, এবং হিসাব বহি, ক্ষমতা পত্র বা আদেশ পত্র, রসীদ, অথবা হিসাব সংক্রান্ত কাগজাদিতে যে সকল ত্রুটি, ভুল, বেদাবা দোষ প্রভৃতি থাকা দৃষ্ট হয়—এই সকল বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ অডিটার তাঁহার রিপোর্টে বিশেষভাবে উল্লেখ করিবেন।

(৭) পার্লিয়ামেন্টের উভয় সভায় অডিটার হিসাবসহ তাঁহার রিপোর্ট পেশ করিবেন।

(৮) নিযুক্ত অডিটার যাবৎকাল সৎভাবে কার্য্য করিবেন তাবৎ বহাল থাকিবেন

(৯) অডিটার ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণ ভারতের রাজস্ব অথবা মহাসভার মঞ্জুরী টাকা হইতে পূর্ব্বোক্ত স্বাক্ষরিত সম্রাটের আদেশ পত্রের নির্দ্দেশ অনুযায়ী বেতন পাইবেন।

(১০) ভারত সচিব ও অমাত্য সভার দপ্তরের কর্ম্মচারিগণ বা তাঁহাদিগের ওয়ারিশানগণ যে নিয়মে ও যে হারে পেন্‌সন্ ইত্যাদি পাইবেন, অডিটার ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণ বা তাঁহাদিগের ওয়ারিশানগণও তদনুযায়ী ঐ সকল পাইবেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মজুমদার এম, এ, বিএল

সংগ্রহ বৈচিত্র

অপরাধ পঞ্জিকা

আপনি কি নব প্রকাশিত অপরাধ-পঞ্জিকা দেখিয়াছেন? সম্প্রতি ইউরোপের একজন বিখ্যাত অপরাধ-বিশেষজ্ঞ এই পঞ্জিকা খানি বাহির করিয়াছেন। উক্ত বিশেষজ্ঞ অনেকদিন আলোচনার পর আবিষ্কার করিয়াছেন, বৎসরের বিশেষ ২ সময়ে বিশেষ ২ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান হয়। উক্ত পঞ্জিকায় নানা প্রমাণের সহিত দেখানো হইয়াছে যে, ইউরোপে জানুয়ারী, জুন ও আগষ্ট মাসেই সব চেয়ে বেশী খুনখারাপি হয়। নভেম্বর, ডিসেম্বর ও ফেব্রুয়ারি মাসে হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা সেখানে কমিয়া যায়। বিষ খাওয়াইয়া সেখানে সব-চেয়ে বেশী এবং সব-চেয়ে কম লোক মারা হয়, যথাক্রমে মে এবং সেপ্টেম্বর মাসে। উক্ত পঞ্জিকার মতে, সেপ্টেম্বর মাসে অপরাধের সংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া

যায়। হত্যাকারীরা নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসকে পছন্দ করে না বটে, কিন্তু ঐ দুইমাসের প্রতি চোরদের প্রাণের টান ভারি বেশী! এই দুই মাসেই ইউরোপের লোকেরা চুরির জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া ওঠে।

বীরের মৌনব্রত।

হাঙ্গেরীর বিখ্যাত 'স্বদেশ-প্রেমিক' ফেরেনৃস্ রেনীকে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহের সময়ে অষ্ট্রীয়ানরা গ্রেপ্তার করিয়াছিল। অষ্ট্রীয়ান কর্ত্তৃপক্ষ বন্দীকে জিজ্ঞাসা করেন, "তোমার দলের লোকরা কোথায় লুকাইয়া আছে?"--রেনী সেই প্রশ্নের উত্তরে একটিও কথা কহেন নাই। তখন রেনীর চোখের সামনেই তাঁহার মা, বোন ও প্রিয়তমাকে বধ করা হয়। তবু তিনি আপনার মৌনব্রত ভঙ্গ করেন নাই এবং ইহার পর যতদিন রেনী বাঁচিয়াছিলেন, ততদিন তাঁহার মুখে কেহ কোন কথা শুনিতে পায় নাই।

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হেনরি ক্যাভেণ্ডিস স্ত্রীলোকদের দুচক্ষে দেখিতে পারিতেন না। তাঁহার বাড়ীতে অনেক দাসী ছিল বটে, কিন্তু তাহারা কাজকর্ম্ম করিত—তাঁহার চোখের আড়ালে কর্ত্তার সঙ্গে চোখোচোখি হইলেই তাহাদের চাকরী যাইত। দাসীরা কর্ত্তার লিখিত ফর্দ্দ দেখিয়া প্রতিদিনের কাজকর্ম্ম সারিয়া লইত।

বিচিত্র রঙ্গমঞ্চ।

বায়স্কোপ এখন পৃথিবীর সমস্ত দেশেই দেখানো হয়। আমেরিকা, ফ্রান্স, ইটালী ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে বায়স্কোপের ছবি তুলাইবার জন্য অসংখ্য রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছে। সে সব রঙ্গমঞ্চ এক একটি অদ্ভুত ব্যাপার। সম্প্রতি বিলাতে বায়স্কোপের চিত্র-গ্রহণের জন্য এমন একটি সুবৃহৎ রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণ করা হইতেছে যাহার তুলনার পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যাইবে না। যে ঘরে ছবি তোলানো হইবে, সে ঘরটার আকার হইবে দুইশত ফুট দীর্ঘ এবং দেড়শত ফুট প্রস্থ। বায়স্কোপের অনেক ছবিতেই জলের মধ্যে অভিনয় দেখানো হয়। এই কার্য্য সাধনের জন্য ঐ ঘরের মেঝের তলায় একটি একশো ফুটের পুষ্করিণী খনন করা হইয়াছে। বিলাতের আকাশে প্রায় সূর্য্যকে দেখা যায় না,—চারিদিক সেখানে কুয়াশায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। তাই সেই ঘরের ভিতরে বৈদ্যুতিক আলোকের সাহায্যে কতকগুলি কৃত্রিম সূর্য্য নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটি পাঁচলক্ষ বাতির আলোক প্রদান করিবে এবং যাহার ফলে ঘরের ভিতরটা রাত্রিকালেও দিনের বেলার চেয়ে সমুজ্জল হইয়া থাকিবে। দৃশ্যপটগুলি সেখানে চক্রের সাহায্যে বড় ঘরের মধ্যে টানিয়া আনা হইবে। বড় ঘরের আশেপাশে থাকিবে, কোথাও মস্ত একটা হোটেল, কোথাও স্নানের ঘর, কোথাও সাজঘর,—এক কথায়, অভিনয়ের সময়ে যাহা কিছুর দরকার, সমস্তই যাহাতে হাতের কাছে পাওয়া যায়, তাহারই যথাযোগ্য বন্দোবস্ত করা হইবে।

(কাজের লোক)

পল্লীজীবনের উন্নতি

[ফরিদপুর হিতৈষিণীতে প্রকাশিত ও আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে রাজবাড়া কৃষি সমবায় ও পল্লী-উন্নয়ন সভায় ফরিদপুর ডিষ্ট্রিক্ট এগ্রিকালচারেল অফিসার লেখক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত 'কৃষক শিক্ষা' প্রবন্ধের সারাংশ।]

আজ এই ভীষণ অন্নবিপ্লবের মধ্যে ভগবান যে আমাদিগকে ফেলিয়াছেন ইহার ভিতরও তাঁহার অসীম করুণা আমরা দেখিতে পাইতেছি। এতদিন দেশের শিক্ষিত লোক বড় বড় আন্দোলন আলোচনা লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন; দেশের প্রকৃত অবস্থার কথা ভাবিবার অবকাশ তাঁহাদের ছিল না; আজ তাঁহারা দেশের যাহারা প্রকৃত মেরুদণ্ড, সেই কৃষকের ও দেশের প্রকৃত উন্নতি করিতে হইলে যাহা করিতে হয়, সেই কৃষির কথা, ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এমন কি কৃষিকে শত্রুরা ৯০ জন লোককে জাগাইয়া তুলিতে পারা যাইবে তাহাই প্রধান চিন্তার কারণ হইয়াছে। দেশের গণ্যমান্য লোকগণ আজ এই সমস্যার মীমাংসা করিবার জন্য তাঁহাদের অধিক সময় দিতেছেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার সাধের রসায়নচর্চ্চা ফেলিয়া আমাদের লইয়া নানাস্থানে যাইয়া দেশের লোককে ডাকিতেছেন; সাড়া পাইতেছেন কি না জানি না। আমাদের সৌভাগ্য আজ তিনি আসিয়াছেন। তাঁর এখানে আসিবার উদ্দেশ্য আপনারা সফল করুন।

স্বাস্থ্য ও আহারই আমাদের প্রধান চিন্তার বিষয়

হইয়াছে। বঙ্গের Sanitary Commissioner সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, দেশের লোক পেট ভরিয়া খাইতে পায়না বলিয়াই এত মৃত্যু ঘটিতেছে, ম্যালেরিয়াই বলুন, ইনফ্লুয়েঞ্জাই বলুন, সব অসুখের কারণই পেট ভরিয়া খাইতে না পাওয়া। স্বাস্থ্য না থাকিলে কৃষিকার্য্য করিবে কে? আবার পুরা আহার না পাইলে স্বাস্থ্য থাকিবে কি করিয়া? আপনাদের নূতন করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না যে, এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানে কৃষকের হীন স্বাস্থ্যের জন্য কৃষি একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে; দেশ জনশূন্য ও ফলশূন্য হইয়া রহিয়াছে; জন্মভূমির এই দুর্দ্দশার জন্য আমরাই দায়ী। কৃষকদিগের উপর যখন দেশের উন্নতি প্রধানতঃ নির্ভর করিতেছে, তখন তাহাদিগকে সকল বিষয়ে জাগাইতে হইবে। নিরক্ষর জনসাধারণকে কৃষি শিল্প স্বাস্থ্য বিষয়ে শিক্ষা দিবার প্রকৃষ্ট প্রণালী বাহির করিতে হইবে।

কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী

এ সকল বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য আজকাল অনেক জেলাতে কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী হইতেছে, অনেক জিনিষ তাহাতে থাকে বটে, সংবাদপত্রে সুন্দর বিবরণ প্রকাশিত হয়; কিন্তু প্রকৃত কাজ কি হইতেছে? যে উদ্দেশ্য লইয়া প্রদর্শনী খোলা হয় তাহা মোটেই সফল হইতেছে না—(সহরের উপর জেলার কয়জন কৃষকই বা আসে এবং যাহারা আসে তাহাদের মধ্যে কয়জনকেই বা শিক্ষা দেওয়া হয়?) প্রকৃত কাজ করিতে হইলে প্রত্যেক ইউনিয়নে সেই স্থানের উপযুক্ত, অর্থাৎ সেই স্থানের কৃষক ও শিল্পিরা যে সকল ফসল বা শিল্প কাজ করিতে পারে কেবলমাত্র সেই সকল ফসল ও শিল্পের নমুনা ও উন্নতির উপায় দেখাইতে হইবে। আজকাল প্রদর্শনীতে যে সকল নমুনা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা কৃষকেরা কোন উন্নত প্রণালী বা বিশেষ পরিশ্রমের সহিত উৎপন্ন করে না, যেমন বরাবর করিয়া আসিতেছে সেইরূপ ভাবেই করে। যে কুমড়াটা সবচেয়ে বড় হইয়াছে বা ক্ষেত্রের মধ্যে যে অল্প পরিমাণ পাট লম্বা হইয়াছে, তাহার কিছু নমুনাই প্রদর্শনীতে আনে। এইরূপ নমুনার জন্য পুরস্কার দিলে কোন ফল হইবে না। প্রত্যেক রকম ফসল বুনিবার আগে ভাল করিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করিতে হইবে কি কি কারণে পুরস্কার দেওয়া হইবে; জিনিষের পরিমাণ ও গুণাগুণের উপরই পুরস্কার নির্ভর করিবে।

স্বাস্থ্য প্রদর্শনী

কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীর সঙ্গে স্বাস্থ্যপ্রদর্শনী খুলিতে হইবে। সম্প্রতি কলিকাতা Town Hall এ যে স্বাস্থ্য প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে উহা যাহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে, অস্বাস্থ্যকর স্থান কিরূপ অল্প ব্যয়ে ও চেষ্টায় আবার স্বাস্থ্যকর হইতে পারে। যে সকল রোগের দ্বারা দেশ জনশূন্য হইতেছে কতিপয় সাধারণ নিয়মপালন করিলে ঐ রোগ নিবারিত হইতে পারে। স্বাস্থ্য বিভাগের কমিশনার সাহেব ঐ সকল রোগ সম্বন্ধে সহজ ও সরল ভাষায় অনেক উপদেশ প্রচার করিতেছেন ও গ্রামে গ্রামে ঐ সকল উপদেশ বিতরণ করা হইতেছে। কিন্তু ঐ সকল উপদেশ ছেঁড়া কাগজের মত ফেলিয়া দিলে চলিবে না। কৃষকদিগকে ডাকাইয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে, তাহাদিগকে ঐ সকল উপদেশ অনুসারে কাজ করিতে বলিবার আগে নিজেদের কাজ করিয়া দেখাইতে হইবে।

কৃষিক্ষেত্রঃ—উন্নত কৃষির বিস্তারের জন্য আদর্শ কৃষিক্ষেত্র চাই। কয়েক জেলাতে সরকারী কৃষিক্ষেত্র আছে। উহাতে নানাবিধ পরীক্ষা হইতেছে। জেলার সকল কৃষক উহা দেখিতে পায় না। কৃষিক্ষেত্র বলিলেই যে ৫০০ শত বিঘা জমি লইয়া তারের বেড়া দিয়া ঘরবাড়ী তৈয়ার করিয়া কলকারখানা বসাইয়া চাষ করিতে হইবে, এমন নহে। সকলেই নিজ নিজ গ্রামে কৃষকদিগের শিক্ষার জন্য কৃষিক্ষেত্র করিতে পারেন। আপনাদের সকলেরই চাষের জমি আছে। দুই চারি বিঘা জমি লইয়া যে বীজ ভাল বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে, যে লাঙ্গলে ভাল করিয়া জমি চাষ দেওয়া যায়, কিম্বা জল সেঁচন করিলে ফসল কি রকম বাড়ে তাহা অনায়াসেই দেখাইতে পারেন; ইহাতে আপনারা উপস্থিত যে খরচ করিতেছেন তাহা অপেক্ষা বিশেষ যে অধিক খরচ পড়িবে বলিয়া মনে হয় না। কৃষকদিগকে ডাকাইয়া ঐ বীজের ফলন কিম্বা চাষের রকম বা জল সেচনের উপকারিতা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। আপনারা উপস্থিত অনেকেই কৃষিবিভাগের অনুমোদিত ধান, পাট, আলু, তামাক ইত্যাদির বীজ লইয়া চাষ করিতেছেন কিন্তু কৃষককে দিব ও দেশে উন্নত বীজের প্রচলন করিয়া ফসল বাড়াইব এই উদ্দেশ্য লইয়া সেইরূপ সুবন্দোবস্তের সহিত (Systematically) কাজ হইতেছে না। এই রাজবাড়ী মহকুমায় আলুর চাষ

আগে ছিল না। গত ৩,৪ বৎসর ধরিয়া কৃষিবিভাগ আলুর চাষ প্রচলন করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং এই বিষয়ে কৃষি-বিভাগ যে একটু সফলতা লাভ করিয়াছেন আশা করি তাহা আপনারা স্বীকার করিবেন। আরও সফল হইতে পারিত যদি সকলে কৃষকদিগকে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্য লইয়া আলুর চাষ করিতেন। এই রাজবাড়ীতে আমার বন্ধু জীতেন বাবু বিঘা প্রতি ৮৭ মণ ও বীরেশ্বর বাবু বিঘা প্রতি ৬০ মণ আলু পাইয়াছেন, আবার কোরকদীর রায় বাহাদুর রাধিকামোহন লাহিড়ী জমিতে জল দিয়া আলুর ফসল ২০ গুণ বেশী পাইয়াছেন। কিন্তু কয়জন কৃষককে এই সকল বিষয় দেখান বা বুঝান হইয়াছে? কৃষি বিভাগের পাট ও ধান যাঁহারা করিয়াছেন ও করিতেছেন তাঁহারা লাভবান হইয়াছেন কিন্তু সকলকে লাভবান করিবার সমবেত চেষ্টা তেমন হয় নাই। একটা কথা এখানে বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই ফরিদপুর জেলায় মোটামুটী ৭,৫০,০০০ বিঘা জমিতে গত বৎসর পাটের চাষ হইয়াছিল। তাহার মধ্যে প্রায় ৭৫,০০০ হাজার বিঘাতে কৃষি বিভাগের বোম্বাই পাট ছিল, এই ৭৫০০০ বিঘা হইতে এই জেলার পাটের চাষিগণ কম পক্ষে তিন লক্ষ টাকা বেশী পাইয়াছে। উপস্থিত যে পরিমাণ জমিতে পাট হইতেছে, উহার পরিমাণ না বাড়াইয়া কেবলমাত্র পাটের চাষেই এই জেলার আয় ১,৫০০০০০ টাকা বাড়ান যায়। চাই কেবল চেষ্টা!

কৃষি-সমিতি:—কৃষকদের মধ্যে কৃষির বিস্তারের জন্য কৃষিবিভাগ গ্রামে গ্রামে কৃষিসমিতি খুলিবার জন্য সকলকে আহ্বান করিয়াছেন। যাঁহারা কৃষিকার্য্য করেন বা কৃষিকার্য্যের সহিত সাক্ষাৎভাবে লিপ্ত আছেন তাঁহাদিগকে লইয়াই সমিতি গঠন করিতে হইবে। সমিতির সভ্যগণ নিজেদের জমিতে কৃষি বিভাগের উপদেশ অনুসারে নানারূপ বীজ, সার, লাঙ্গল ইত্যাদি লইয়া পরীক্ষা করিবেন ও পরীক্ষার ফলাফল নিকটবর্ত্তী কৃষকদিগকে দেখাইবেন।

গো-রক্ষণ:—গবাদির স্বাস্থ্য যাহাতে ভাল রাখা যায় সে বিষয়েও কৃষকদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে। দেশের ফসল বাড়াইবার জন্য চাষের জমি বাড়াইতে গিয়া গোচারণ ভূমি কমাইয়া দিলে চলিবে না; বরং উহা বাড়াইতে হইবে। গরুর খাদ্য, গোয়ালঘর প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আদর্শ গোশালা স্থানে স্থানে করিতে হইবে। গো-মড়কের সময় পশু চিকিৎসক দ্বারা টীকা দিবার প্রতি কৃষকদের শ্রদ্ধা বাড়াইতে হইবে।

সমবায় সমিতি:—কৃষকেরা কিরূপ মহাজন-প্রপীড়িত তাহা আপনাদিগকে বলিতে হইবে না। কমসুদে টাকা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে; কিন্তু সমবায়-ঋণদান-সমিতি কেবল যে কম সুদে টাকা দিবার জন্য স্থাপন করা হইয়াছে এ ধারণা তাহাদের মন হইতে তাড়াইতে হইবে। মিতব্যয়িতা, একজন দশজনের জন্য একজোট হইয়া কাজ করিবার, "সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে" এই শিক্ষা দেওয়াই সমিতির উদ্দেশ্য, এই উদ্দেশ্য তাহাদিগকে বুঝাইতে হইলে তাহাদের লইয়া কাজ করিতে হইবে। প্রত্যেক ইউনিয়নে যৌথ ব্যাঙ্ক খুলিতে হইবে। সম্প্রতি রাজবাড়ীতে একটি Co operative St res হইয়াছে। প্রত্যেক ইউনিয়নে আপনারা যাহাতে এইরূপ st res হয় তাহার চেষ্টা করুন। দেশের উৎপন্ন ফসল একজোট হইয়া ক্রয় বিক্রয় করুন, দেশের টাকা দেশের লোকদিগকে দিন। কৃষকেরা এই পাট বুনিয়াছে। কত আশা, কত ভরসা, এই পাটের উপর তাহাদের আছে; কিন্তু পাট যখন উঠিবে তখন দরযদি খুব কমও হয়, পেটের জ্বালায় সেই কম দরেই পাট কিন্তু বিক্রয় করিতে হইবে। সব আশা ভরসা তাহাদের ধুলিসাৎ হইবে। কম দরে বিদেশীকে বা মধ্যস্থ ব্যক্তিকে বিক্রয় না করে, প্রত্যেক ইউনিয়নের লোকেরা যদি এমন একটি কারবার খোলে যে, সেই কারবার পাট কিনিয়া রাখিবে, তখনকার বাজার দর কৃষকদের দিবে ও পরে পাটের দর যখন বাড়িবে তখন সেই পাট বিক্রয় করিবে এতে যে লাভ হইবে ইউনিয়নের কৃষকেরাই পাবে; কম বাজার দরে বিক্রয় করিলে তাহাদের কিছু লোকসান হইবে না; আবার এই কারবারের লাভ থেকে গ্রামের রাস্তা, ঘাট, জল নিকাশের কাজ করা যাইতে পারে।" এই সকল উপায় কৃষকদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে।

যাত্রা ও ছড়া:—জন সাধারণকে শিক্ষা দিবার জন্য যে সকল পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে তাহার মধ্যে যাত্রা, ছড়া প্রভৃতির প্রচলন বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। আপনাদের কো-অপারেটিভের ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বসু সমবায়-সমিতির উদ্দেশ্য কৃষকদের মধ্যে বিস্তার করিবার জন্য "সমবায়" নামে একখানি নাটক লিখিয়াছেন, আবার

বিশেষ আনন্দের কথা এই যে,রাজবাড়ী Dramatic Union সেই নাটকখানির থিয়েটার আপনাদিগকে না দেখাইয়া ছাড়িবেন না এবং আমার এই আশা যে আপনারা আপনাদের ইউনিয়নে ফিরিয়া কৃষকদিগের মধ্যে সমবায়ের শিক্ষা প্রচার করিবার জন্য ঐ নাটকের যাত্রার বন্দোবস্ত করিবেন।

কুটীর শিল্প :—কৃষি ছাড়া অন্যান্য ব্যবসা বা শিল্পের প্রচলন করিতে হইবে। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা অগ্রহায়ণ মাসের কৃষিকথা পত্রিকা পড়িয়াছেন তাঁহারা জানেন মাদারীপুর মহকুমার একজন প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েত কত কম মুলধন লইয়া ঘি মাখন প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেছেন। তাঁহার হিসাব তিনি নিজেই দিয়াছেন। এই কাজের জন্য তাহার অন্য কাজের কোন ক্ষতি হইতেছে না। সকালে ২.৩ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া মাসিক ৩০।৪০৲ টাকা লাভ করিতেছেন। আপনাদের অনেকেই ঐরূপ ব্যবসা করিতে পারেন বা আপনাদের ইউনিয়নে প্রচলন করিতে পারেন। এ জেলায় বেত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় উহা বিশেষ কোন কাজে লাগান হয় না। একটু চেষ্টা ও পরিশ্রম করিলে এই বেত অনেকেরই আহার যোগাইতে পারে, গ্রামে এমন অনেক কুটীর শিল্পের প্রবর্ত্তন করা যাইতে পারে। এ জেলায় ছেঁড়া কাপড় দিয়া গৃহস্থের স্ত্রীলোকেরা সুন্দর কাঁথা প্রস্তুত করিয়া থাকেন, কিন্তু এই কাঁথা যে একদিন অনেকের আয়ের উপায় হইবে তাহা কেহ আশা করেন নাই। কিন্তু সম্প্রতি এই কাথা প্রস্তুত করিয়া রাজবাড়ী ও ফরিদপুরের প্রায় ৫০টী স্ত্রীলোকের মাসিক ১০।১৫৲ টাকা আয় হইতেছে। ইহা করিতে বেশী দিনের চেষ্টা বা পরিশ্রমের আবশ্যক হয় নাই। চরকার প্রচলন করিতে হইবে; চরকায় সুতা কাটিয়া কাপড় প্রস্তুত সম্ভবপর না হইতে পারে, কিন্তু অবসর সময়ে চরকায় সুতা কাটিয়া গামছা তোয়ালে প্রভৃতি অনায়াসে করা যাইতে পারে। অল্পদিনের চেষ্টাতেই ফরিদপুরের ২।৩টী ভদ্রমহিলা এ বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন এবং তাহাদের কাটা সুতা হইতে যে গামছা প্রস্তুত হইয়াছে তাহা আপনারা এই প্রদর্শনীতে দেখিতে পাইবেন। এইরূপ কত প্রকার কাজের দ্বারা গৃহস্থের আয় বাড়ান যাইতে পারে। যিনি এই সকল কল্যাণকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন, নামোল্লেখে তাঁহার আপত্তি থাকাতে তাহা করিলাম না। কিন্তু তিনি আমাদের সকলেরই নমস্য।

নৈশ বিদ্যালয় :—সরকার বাহাদুর কবে কৃষককুলের শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন, সেই আশায় বসিয়া থাকিলে চলিবে না; আপনারা একটু চেষ্টা করিলেই গ্রামের কৃষক ছেলেদের লেখা পড়া শিখাইতে পারেন। বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলীর চেষ্টায় অনেক স্থলেই নৈশ বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে ও যাহাদিগকে আমরা হেয় বলিয়া জ্ঞান করি তাহাদের ছেলেরা বেশ আগ্রহের সহিত শিক্ষা করিতেছে।

আপনারা হয় ত বলিবেন যে, গ্রামোন্নতির এই লম্বা ফর্দ্দ লইয়া আমরা কি করিব? টাকা কোথা হইতে আসিবে? তেমন প্রবল ইচ্ছা বা একটা কাজ করিবই এইরূপ আগ্রহ থাকিলে টাকার অভাব হয় না। অবশ্য আমি আপনাদের Army & Navy Stores এর মত Co-operative stores বা Town Hall Exhibition এর মত Exhibition করিতে বলিতেছি না। প্রবল ইচ্ছা থাকিলে যে টাকার অভাব হয় না এ কথা প্রমাণ করিয়া দিবার মত এই রাজবাড়ীতেই অনেক কাজ আছে। পাংশা ও বেলিয়াকান্দি স্কুলের কথা যাঁহারা জানেন তাঁহারাও ইহা স্বীকার করিবেন। যাঁহারা সাধারণের উপকারের জন্য এই সমুদয় কার্য্য করিয়াছেন তাঁহাদের প্রবল ইচ্ছা প্রত্যেক কাজেই দেখা যাইতেছে। টাকার অভাব তাঁহাদের গতিরোধ করিতে পারে নাই। আপনারা বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলীর নাম শুনিয়াছেন। তাঁহাদের মত আপনারা ইউনিয়ন হিতসাধনমণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করুন। স্বাস্থ্য, নীতি, কৃষিশিল্প প্রভৃতি বিষয়ে লোকদিগকে শিক্ষা দিন।

সরকারী কৃষিবিভাগের পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে কেবলমাত্র এই বলিতে পারি যে, কৃষিবিভাগের সকল শ্রেণীরই কর্ম্মচারী তাঁহাদের কার্য্যে আপনাদের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন; আপনারা আসুন, তাঁহাদিগকে সাহায্য করুন; তাঁহারাও আপনাদিগকে সকল হিতকর কার্য্যে যথাশক্তি সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। সরকারী বেসরকারী ভুলিয়া গিয়া এক সঙ্গে মিলিয়া কাজ করি, দেশের জন্য একটু পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগ করি, এতদিন যে কৃষকদের হেয় বলিয়া কাছে আসিতে দিই নাই আজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তাহাদিগকে সমান আসনে বসাই। আবার দেশের শ্রী ফিরিয়া আসিবে, আবার বাংলা সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা হইবে।

"এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন
আসিবে সে দিন আসিবে।"
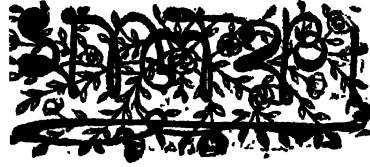
৭ম বর্ষ } শ্রাবণ—১৩২৭ { ৪র্থ সংখ্যা

হিন্দুর সমাজশরীর

(A Comparative Study of Hindu Society as a Social Organisation)

পাশ্চাত্য জগতে মহাজন-প্রভুত্বের বর্ত্তমান পরিণতি।

Present Aspect of Capitalism in the West.

পূর্ব্বে ইয়োরোপের সমাজবিন্যাসে একটা সাম্প্রদায়িক পর্য্যায় ছিল, যাহা কতকটা হিন্দুসমাজের বর্ণপর্য্যায়ের মত। লোকের বৃত্তিও সাধারণতঃ সম্প্রদায়গত ছিল এবং এই বৃত্তিবিভাগও ছিল হিন্দু সমাজের বর্ণ বিভাগের অনুযায়ী বৃত্তিবিভাগের অনুরূপ। এ সব কথা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। সমাজকে যদি একদেশবাসী বহু মানবের একটা কৃত্রিম সমষ্টি মাত্র মনে না করিয়া Organism বলিয়া স্বীকার করা যায় তবে এইরূপ সম্প্রদায় বিভাগ এবং সাম্প্রদায়িক বৃত্তিবিভাগ স্বাভাবিক। এই মূল সত্যের ধর্ম্মে সমাজ-শরীর আশ্রিত ও নিয়ন্ত্রিত হইলেই, তাহা সুস্থ থাকে, মঙ্গলে থাকে। সমাজের কৃত্রিম সমষ্টি নয়, Organism বা জীবিত শরীর-ধর্ম্মী বস্তু, একথা আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যাহারা সমাজ-তত্ত্বের আলোচনা করিতেছেন, তাঁহারা স্বীকার করেন,—কিন্তু সেই Organism এর দেহের প্রকৃতি ও ধর্ম্ম যে কি, একথা তাঁহারা স্পষ্ট বলেন না, বুঝিয়াও যেন বুঝেন না। যাহা হউক, ক্রমে আমরা এই কথাটা বুঝিতে চেষ্টা করিব। আপাততঃ এই আলোচনায় মধ্যে যাইব না। সমাজ একটা কৃত্রিম সমষ্টি, ব্যষ্টির স্বার্থই তার মধ্যে প্রধান; ব্যষ্টির স্বার্থকে রক্ষা করিবার জন্য এই সমষ্টি হইয়াছে; ব্যষ্টি হিসাবে প্রত্যেক মানবের জীবনের সকল ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করিবার সমান অধিকার আছে; অন্য মানবের সমান অধিকারের সীমা কেহ লঙ্ঘন না করে আর সকলের সমান স্বার্থ রক্ষাকল্পে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে কেহ পরাঙ্মুখ না হয়, এইজন্য রাষ্ট্রীয় বিধির যেটুকু বন্ধন নিতান্ত আবশ্যক, তাই মাত্র থাকিবে, তা ছাড়া আর সকল বিষয়ে প্রত্যেক মানব সম্পূর্ণ স্বাধীন,—এই মত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য জগতে প্রচলিত ছিল।

ইয়োরোপের রাষ্ট্রতন্ত্রের সংস্কার এই মতানুযায়ী নীতির অনুসারে হইয়াছে; তার ফল যে কিরূপ দেখা যাইতেছে, তার আলোচনা তৃতীয় প্রবন্ধে করিয়াছি। ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এই নীতি অনুসৃত হইয়াছে, তার ফলে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ও দুর্ব্বল জনসাধারণের যে কি দারুণ দুর্গতি ঘটিয়াছে, এবং কি ভীষণ এক সঙ্কট পাশ্চাত্য সমাজে দেখা দিয়াছে, তারও কতক আলোচনা ইহার পূর্ব্ব প্রবন্ধে করা হইয়াছে। এই সঙ্কটের বিভীষিকা ক্রমে

আজ কাল যে কত বড় হইয়া উঠিয়াছে, কি সব গুরু সমস্যা তাহাতে উপস্থিত হইয়াছে,—এ সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে যথাসাধ্য আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

Freedom of labour, freedom of competition, freedom of contract এবং equal opportunity for all —অর্থাৎ জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে বৃত্তিনির্ব্বাচনে সমান অবাধ অধিকার সকলের আছে, পরস্পরের সঙ্গে অবাধ প্রতিযোগিতা করিয়া সকলেই যথাশক্তি উন্নতি লাভ করিতে পারিবে, কোনওরূপ custom বা পরম্পরাগত রীতির অনুবর্ত্তন না করিয়া ব্যবসায়িক সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে নিজের সুবিধা বুঝিয়া সকলে চুক্তি করিয়া তদনুসারে কাজ কর্ম্ম করিবে,—এই সব নীতির প্রচলন যখন ইয়োরোপে হয়, তার পূর্ব্ব হইতে ব্যবসায়ে বাণিজ্যের বিশেষ একটা প্রসার এবং তার ফলে প্রভূত ধনাগম উন্নত ও শক্তিমান্ ব্যবসায়ীদের হাতে হইতেছিল।

এই যে অবাধ প্রতিযোগিতায় সকলেরই যথাশক্তি উন্নতি লাভের অধিকারের কথা বলিলাম, ইহা অবশ্য পার্থিব ধনে, শক্তিতে উন্নতির অধিকার। আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভে সকলের সমান অধিকার খৃষ্টীয় সমাজে প্রথম হইতেই ছিল। বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মমণ্ডলীর বা চার্চ্চের আপন আপন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য অতি অসঙ্গত একটা চেষ্টা সত্বেও, প্রত্যেক মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত যে কেহ যোগ্যতা থাকিলেই বা ইচ্ছা করিলেই ধর্ম্ম-যাজকতা গ্রহণ করিতে পারিতেন,—এবং রোমান্ ক্যাথলিক সমাজে মঠের সন্ন্যাসী হইয়া তপশ্চর্য্যা করিতেও সকলে পারিতেন। সুতরাং এসম্বন্ধে নূতন কোনও নীতির প্রবর্ত্তনের আবশ্যকতা ছিল না।

তারপর আধ্যাত্মিক উন্নতিতে কোনও প্রতিযোগিতা নাই। এ উন্নতির অধিকারী যে, সে লোককে প্রচুর দেয়, কারও কিছু বলে কি কৌশলে কাড়িয়া নেয় না,—আপন উন্নতির সঙ্গে অপরকে সে তুলিয়া নেয়, কাহাকেও চাপিয়া নীচে ফেলিয়া তাকে উপরে উঠিতে হয় না। ইয়োরোপে এই সময়ে যে সকলের সমান অধিকারের ধুয়া উঠে,—সে অধিকার একেবারে পার্থিবভোগের অধিকার। পার্থিবভোগের প্রধান উপায় পার্থিব শক্তিরও বড় একটা অবলম্বন এই ধন। ধনাগম ব্যবসায়বাণিজ্যে যেমন হয়,—এমন আর কিছুতে নয়। রাজকর্ম্ম অন্য কারণে যতই আকাঙ্ক্ষিত হউক,—ধনাগমের হিসাবে ব্যবসায় বাণিজ্যের তুলনায় তাহা অনেক নিম্নে। আমাদের দেশেও একটি সংস্কৃত প্রবাদ এ সম্বন্ধে আছে,—যথা—

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ, তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজ সেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।"

তবে মানুষ এমন অনেক আছেন, এমন সব সংস্কার বংশপরম্পরায় অনেকে লাভ করেন, যাঁহারা বাণিজ্যবাসিনী এই লক্ষ্মীকে লাভ করিতে তেমন ব্যগ্র হন না, বিশেষ যদি অন্য পথে অন্যবিধ শক্তিতে তাঁহারা বাণিজ্যের লক্ষ্মীশ্বরদের অপেক্ষাও উচ্চতর পদগৌরব ভোগ করেন,—ইঁহাদের উপরেও প্রভুত্ব করিতে পারেন। যেমন নাকি ইয়োরোপীয় ক্ষাত্রসমাজ বা অভিজাত ভূস্বামী সম্প্রদায় ছিলেন। ব্যবসায় বাণিজ্য হীনতর বৃত্তি বলিয়া তাঁহারা অবজ্ঞা করিতেন। ওদিকে পদমর্য্যাদায় তাঁহারা বণিক সম্প্রদায় অপেক্ষা অনেক উন্নত ছিলেন, রাষ্ট্রশাসনের প্রভুত্বও তখন পর্য্যন্ত তাঁহাদের হাতে ছিল।

এদিকে বণিকসম্প্রদায়ের দ্রুত অভ্যুদয় হইতেছিল। বিদেশে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা ও অধিকার বিস্তার ইঁহাদের উদ্যমেই হইত। সে সবের শাসনও প্রধানতঃ ইঁহাদের কর্ত্তৃত্বে চলিত। ফলে দেশের শাসনেও ইঁহাদের প্রভাব বাড়িতে লাগিল। ক্রমে অতি ধনী ও শক্তিমান্ বণিকগণ অভিজাত ভূস্বামী সম্প্রদায়ের অনেকটা সমকক্ষ হইয়া উঠিলেন। বংশমর্য্যাদায় অপেক্ষাকৃত হীন হইলেও ঐশ্বর্য্যে ইঁহারা অনেকেই ভূস্বামীদের অতিক্রম করিয়া উঠিলেন। সম্পদের সঙ্গে বংশমর্য্যাদার বিনিময়ও আরম্ভ হইল,—অর্থাৎ অভিজাত ভূস্বামী কেহ কেহ ঐশ্বর্য্যশালী বণিকদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধেও আবদ্ধ হইতে লাগিলেন।

সম্প্রদায় বিভাগের রীতি ইয়োরোপে কখনও কঠোর বংশানুক্রমিক নীতি অনুসরণ করিয়া চলিত না। যোগ্য যে কোনও ব্যক্তিকে রাজা, লর্ড কাউণ্ট নাইট্ প্রভৃতি উপাধি দিয়া অভিজাত ভূস্বামী অর্থাৎ ক্ষাত্রসমাজে উন্নীত করিয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু এই উন্নয়ন ক্ষাত্রবীর্য্যের পুরস্কার স্বরূপই আগে ঘটিত। অর্থাৎ কেহ শৌর্য্যবীর্য্যে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইলে, তাহাকে রাজা অনেক সময় অভিজাত সমাজের পদবী ও অধিকার প্রদান করিতেন। কিন্তু এখন ঐশ্বর্য্যবান বণিকরাও এই অধিকার লাভ

করিতে আরম্ভ করিলেন। কেবল ঐশ্বর্য্যে কেন, জ্ঞানবিদ্যার অনুশীলনে অসাধারণ প্রতিভা কাহারও দেখা গেলে, রাজারা সময়ে সময়ে তাঁহাদেরও অভিজাত পদবী ও অধিকার দানে পুরস্কৃত করিতেন।

যাহা হউক, মোট কথা হইতেছে এই যে পূর্ব্বে ক্ষাত্রধর্ম্মের উচ্চ অধিকার ব্যতীত নিম্নতর সাম্প্রদায়ভুক্ত কেহ ক্ষাত্র বা অভিজাত সমাজে উন্নীত হইত না, ক্ষাত্র বা অভিজাত সমাজভুক্ত কেহ ক্ষাত্রবৃত্তি ছাড়া অন্য কোনও বৃত্তি অবলম্বন করিত না। এখন ধনী বণিকরা বণিকরূপেই ক্ষাত্র বা অভিজাত সমাজে স্থান পাইতে লাগিলেন। ধনে এবং অন্যান্য অনেক যোগ্যতায়ও তাঁহারা অভিজাত ভূস্বামী সম্প্রদায়ের সমকক্ষ হইয়া উঠিলেন। ধনে বরং অনেকে ভূস্বামীদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠই হইয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় বণিকবৃত্তি ও অন্যান্য উচ্চতর ব্যবসায়ের প্রতি অভিজাত সম্প্রদায়ের অবজ্ঞা ক্রমে কমিয়া আসিবারই কথা। বরং তাঁহাদের ধনবত্তা দেখিয়া এইসব বৃত্তিতে তাঁহাদের সহযোগী হইয়া আপনাদেরও সম্পদ বৃদ্ধির দিকে তাঁহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হইতে পারে। হইলও তাহাই।

অনেক বড় বড় ব্যবসায়ের অংশী তাঁহারা হইতে লাগিলেন। টাকা জমিলেই তাহা তাঁহারা ব্যবসায়ে খাটাইতে আরম্ভ করিলেন। বস্তুতঃ এই সময়ে যে সব বড় বড় ব্যবসায় আরম্ভ হয়, তাহার সহযোগী হওয়া গ্লানিকর বলিয়াও আর বিবেচিত হইতনা। ব্যবসায় যতদিন ছোট থাকে, তার কাজকর্ম্ম সব ব্যবসায়ীকে নিজের হাতে করিতে হয়, পরিমার্জ্জিতরুচি সম্ভ্রান্তবংশীয় লোকেরা তাহা হীন বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু, এখন যে পদ্ধতিতে নূতন নূতন সব যৌথ মূলধনের ব্যবসায় পরিচালিত হইত, তাহার সঙ্গে অন্ততঃ অংশীভাবে সংসৃষ্ট থাকা কোনও দেশের রাজা নিজে পর্য্যন্ত মর্য্যাদাহানিকর বলিয়া মনে করেন না। শুনিয়াছি জর্ম্মাণ কাইসার আমেরিকার অনেক বড় বড় ব্যবসায়ের অংশ ক্রয় করিয়াছিলেন।

এইরূপে ইয়োরোপের ক্ষাত্রসমাজ ও উচ্চতর বৈশ্যসমাজ প্রায় সমান হইয়া উঠিল, রাষ্ট্রশাসন দুইটি সম্মিলিত শক্তির আয়ত্ত হইয়া পড়িল। রাজনীতি বৈশ্যস্বার্থ বা ব্যবসায়-বাণিজ্যের স্বার্থের অনুগামী হইল। এই সময়ে আবার democracy বা গণতন্ত্র শাসনপদ্ধতির প্রবর্ত্তন হইতে থাকে। Democracy—direct or representative, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা প্রতিনিধি মূলক, যাহাই হউক, তাহা যে প্রকৃত-পক্ষে শক্তিমান্ নায়কদেরই শাসন, demos বা প্রাকৃত জনসাধারণ ইহাদেরই প্রভুত্বের অধীন হইয়া চলে, একথা আমাদের তৃতীয় প্রবন্ধেই দেখান হইয়াছে।

শক্তিমান্ নায়কের শাসনই যোগ্য ও শক্তিশালী শাসন, এই শাসনে দেশ রক্ষা করিতে পারে, জাতিকে উন্নত করিয়া তুলিতে পারে। কিন্তু এই শক্তিমানের শক্তি পাশ্চাত্যজগতে এখন সম্মিলিত ক্ষাত্রবৈশ্যশক্তি—আর তাহা যদি কোনওরূপ ব্রহ্মণ্যশক্তির বা আধ্যাত্মিক ধর্ম্মনীতির অনুশাসনে নিয়ন্ত্রিত না হয়, তবে তার অবশ্যম্ভাবী ফল হইবে সর্ব্বত্র ইহাদেরই স্বার্থের প্রতিষ্ঠা। রাষ্ট্র-শাসনের প্রধান লক্ষ্য হইবে, ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার, আর সেই ব্যবসায় বাণিজ্যে শাসকদের ক্রমবর্দ্ধনশীল প্রভুত্বের বিস্তার। ধনলোভ, ধনপ্রসূত শক্তির লোভ, ধন ও শক্তির অধিকারে পার্থিব ভোগের লোভ, সবই অতি বড় লোভ। বড় সুযোগ যদি উপস্থিত হয়, আর ধর্ম্মনীতির ও সমাজনীতির কোনও বাধা যদি না থাকে, তবে এরূপ না হইয়াই পারে না। যে দেশের শক্তিমান্ পুরুষ যাঁহারা তাঁহাদের স্বার্থলিপ্সা সকল সীমা ছাড়াইয়া যাইবে, দেশের সকল ধন, সকল শক্তি, সকল ব্যবসায় বাণিজ্য একেবারে তাঁহাদের হস্তগত হইবে।

হিন্দুসমাজে ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের অনুশাসন সকল সম্প্রদায়ের উপরে যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, সকল সম্প্রদায়কে যেরূপ নীতির বন্ধনে সংযত রাখিতে পারিয়াছিল, ইয়োরোপে চার্চ্চ সেরূপ কখনও পারে নাই। কারণ, পুরুষ পরম্পরাগত সে সব উচ্চ সংস্কারের অধিকার ভারতীয় ব্রাহ্মণের মধ্যে দেখা যাইত, ইউরোপীয় চার্চ্চের যাজক-বর্গের মধ্যে তাহা কিছু সম্ভব হইতনা। যাজকবৃত্তি বংশগত বৃত্তি ছিলনা, যে কোনও সম্প্রদায়ের যে কোনও লোক যাজক হইতে পারিত। ক্যাথলিক যাজকদের বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। প্রটেষ্টাণ্ট যাজকগণ বিবাহ করিতেন বটে, কিন্তু, যাজকের সন্তান বলিয়াই যে কেহ যাজকতা গ্রহণ করিতেন, তা নয়। যাজকবৃত্তি বংশানুগত কখনও হয় নাই। বাল্যাবধি যেরূপ একটা শিক্ষা ও সাধনার প্রণালী অনুসারে

ব্রাহ্মণের জীবন গঠিত ও পরিচালিত হইত, ইউরোপে তার ব্যবস্থা কিছু ছিল না। পার্থিব সম্বন্ধে যে দীনতা ও ত্যাগ ব্রাহ্মণজীবনের আদর্শ ছিল, কার্য্যতঃ ইয়োরোপের যাজকবৃন্দ সে আদর্শ কখনও পালন করেন নাই। বরং পার্থিব ধন, শক্তি ও ভোগের অধিকারের লাভের দিকেই তাঁহাদের অধিক আগ্রহ দেখা যাইত। তবু ক্যাথলিক ধর্ম্মের অক্ষুণ্ণ প্রভুত্ব যতদিন ছিল, সকল দেশের রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতি হইতে স্বতন্ত্র এবং উচ্চতর একটা শক্তিরূপে তার একটা প্রতিষ্ঠা ছিল। যে ভাবেরই হউক, একটা ধর্ম্মনীতির অনুশাসন তার সকলে মানিত।

মধ্যযুগে ইয়োরোপের প্রচণ্ড রণদুর্ম্মদ অভিজাত ভূস্বামীবর্গকে ক্ষাত্রধর্ম্মের উন্নত কতকগুলি নীতির শাসনে রোমীয় চার্চ্চ সংযত ও সুপথে পরিচালিত করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন। ইয়োরোপের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁহারা পরিচিত, তাঁহারা Chivalry ধর্ম্মের কথা জানেন। সত্য পালন, বিশ্বস্ততা, দরিদ্রের রক্ষণ, বিপন্নের উদ্ধারসাধন, নারীর মর্য্যাদা, পরাভূত শত্রুর প্রতি সদয় ব্যবহার, ধর্ম্মরক্ষার্থে যুদ্ধে সর্ব্বস্বপণ এবং এইগুলিই সাধারণতঃ Chivalry ধর্ম্মের নীতি ছিল। বলা বাহুল্য, ভারতীয় ক্ষাত্রধর্ম্মের নীতির সঙ্গে এই Chivalry ধর্ম্মের নীতির বিশেষ সাদৃশ্য আছে। বীরগণের ক্ষাত্র একটা দীক্ষা হইত এবং দীক্ষার সময়ে এরূপ শপথও তাঁহাদের গ্রহণ করিতে হইত যে এই সব ধর্ম্ম তাঁহারা পালন করিবেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে ক্যাথলিক ধর্ম্মের বিদ্রোহে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়। যে সব দেশে এই ধর্ম্ম প্রধানভাবে গৃহীত হয়, চার্চ্চ বা ধর্ম্মশাসন পদ্ধতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ পায়, রাষ্ট্রশাসনের অধীন ও অন্তর্ভুক্ত তাহা হইয়া পড়ে। ক্রমে রাষ্ট্রশাসন যখন democratic হইয়া উঠিল, চার্চ্চও স্বভাবতঃই এই democracyর অধীন হইল। চার্চ্চের একটা প্রভুত্ব, তার কোনও অনুশাসনের জোর যে এ অবস্থায় বিশেষ কিছুই থাকিতে পারে না, একথা বলাই বাহুল্য। প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম এবং তারপর democratic শাসননীতি প্রবর্ত্তনের ফলে ক্যাথলিক দেশসমূহে ক্যাথলিক ধর্ম্মের শাসনও বহুপরিমাণে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে।

আর কিছুতে ন.শতাব্দীতে মানবের ব্যক্তিত্বের অধিকার সম্বন্ধে যে সব নীতি ইয়োরোপে সর্ব্বত্র গৃহীত হয়, তার মধ্যে কোনও ধর্ম্মপদ্ধতির কোনও শাসন বা কোনও প্রভাব আদৌ চলিতেই পারে না। কারণ, ধর্ম্ম অর্থাৎ প্রচলিত যে সব শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম আছে তাহা মানিলে, মানবের নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধির অতীত অর্থাৎ ultra-rational কোনও শক্তির প্রভুত্ব মানিতে হয়। ইউরোপীয় নূতন nationalism তা মানিতেই পারে না।

ষোড়শ শতাব্দীর পর হইতে যে সব নূতন প্রভাব ইয়োরোপে দেখা দেয়, যে একটা বড় যুগান্তর ইয়োরোপে আরম্ভ হয়, সামাজিক অবস্থার যে সব বড় পরিবর্ত্তনের সূচনা হয়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাহার যে পরিণতি ঘটে, তাহাতে ধর্ম্মশাসন ইয়োরোপে একেবারে শিথিল হইয়া পড়ে, প্রায় লুপ্ত হয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। Chivalry ধর্ম্মের যে সব নীতি অভিজাত ভূস্বামিবর্গ জীবনের আদর্শ বলিয়া মানিতেন, অবস্থার পরিবর্ত্তনে তার কিছুই থাকে না। Days of Chivalry are gone এই একটি কথা সর্ব্বদাই আধুনিক ইয়োরোপীয় সাহিত্যে এখন পাওয়া যায়।

কোনওরূপ ধর্ম্মপদ্ধতির অনুগত নীতির শাসন নাই। স্বাধীনভাবে সকলেই যাহা ভাল মনে করে, তাই করিতে পারে। পার্থিব ভাগ্যে উন্নতির জন্য যে যাহা সুবিধা মনে করে, তাহাই করিবে, কাহারও কোনও বাধা তাহাতে নাই, কোনও সম্প্রদায়ের কোনও বিশেষ ধর্ম্ম-পালনে বা বিশেষ বৃত্তির অনুসরণে কোনওরূপ বাধ্যতা কিছু নাই। ইহাই হইল সর্ব্বত্র গৃহীত উত্তম নীতি। এই সময়ে আবার ব্যবসায় বাণিজ্যের অসাধারণ প্রসারে দেশে প্রভূত ধনাগম এবং বণিক ও ব্যবসায়িবর্গের যারপরনাই অভ্যুদয় একটা হয়। ব্রাহ্মণ্য শক্তি একরূপ লোপ পাইয়াছে, ক্ষাত্রসমাজ তার বিশেষত্ব হারাইয়া অভ্যুদয়-শালী উন্নত বৈশ্য সমাজের সঙ্গে মিলিয়া গেল। সম্মিলিত এই ক্ষাত্র-বৈশ্য সমাজ ব্যবসায়বাণিজ্যে কেবল ধনাগম কিসে হইবে, ধনগত শক্তি ও ধনসুলভ ভোগ কিসে বাড়িবে, এই দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িল। ধনবান্ ও শক্তিমান্ বলিয়া ইঁহাদের আরও রাজনীতির লক্ষ্যও হইল, কিসে দেশ বিদেশে রাজ্যাধিকার বাড়িবে, আর সঙ্গে সঙ্গে অধিকৃত দেশের সকল ব্যবসায় বাণিজ্যও ইঁহাদের হস্তগত হইবে। তাও বাড়িতে লাগিল, ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসারও সঙ্গে

সঙ্গে বাড়িয়া উঠিল। প্রভূত ধনবলে ক্রমে,দেশের সকল ব্যবসায় বাণিজ্য ইঁহারা এমনভাবেই দখল করিয়া ফেলিতে লাগিলেন যে জনসাধারণের পক্ষে তাঁহাদের মজুরী ব্যতীত আর গত্যন্তর রহিল না। ইঁহারা কেবল যে বিদেশবাসী জনবর্গকে আপনাদের রাষ্ট্রীয় ও ব্যবসায়িক দাসত্বে পরিণত করিয়াছেন, তা নয়। নিজেদের দেশের অধিবাসীরাও একরূপ ইঁহাদের দাসত্বে পরিণত হইয়াছে। নামতঃ রাষ্ট্রীয় শাসনে তাহাদের অধিকার একটা স্বীকৃত হয় বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা যে কি, পূর্ব্বেই এক প্রবন্ধে তাহা আমরা দেখিয়াছি। ব্যবসায়িক দাসত্ব যে ইহাদিগকে কিরূপ পীড়ন করিতেছে তাহাও গত প্রবন্ধে কতকটা আলোচিত হইয়াছে।

দেশের ধনবান্ ও শক্তিবান্, যাঁহারা, তাঁহারা এইভাবে তাঁহাদের সকল বল, সকল শক্তি ব্যবসায়ের দিকে নিয়োগ করিলেন। ব্যবসায়মুখী তাঁহাদের এই কর্ম্মশক্তি, এই গতি এক লক্ষ্যের দিকেই ক্রমবর্দ্ধনশীল বেগে ছুটিতেছে, অসীম প্রসারে তাহা কি যে এক বিরাট বিশ্বগ্রাসী পরিণতি লাভ করিতেছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত স্তম্ভিত হইতে হয়! দেখিলে সত্যই ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শনে স্তম্ভিত অর্জ্জুনের মতই বলিতে হয়—

"নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রং।
দৃষ্ট্বাহি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো॥

অথবা—

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্জ্বলদ্ভিঃ
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো॥

এই ব্যবসায়িক যুগান্তরের প্রথমভাগে অনেক কারবার ছিল, ব্যক্তিগত মালেকান সত্বের। ধনী মহাজনেরা নিজের টাকায়, বড় কোনও কারবার প্রতিষ্ঠা করিতেন, নিজেরাই দেখিয়া শুনিয়া লোকজন রাখিয়া তাহা চালাইতেন। মহাজন মালিকদের সঙ্গে মজুর, কেরানী ও অন্যান্য লোকজন যারা খাটিত, তাহাদের মনিবভৃত্যের ন্যায় ব্যক্তিগত একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধও অনেক স্থলে দেখা যাইত। ভৃত্য যাহারা, তাহারা তাহাদের দুঃখের কথা, অসুবিধার কথা মনিবকে জানাইতে পারিত। মনিবও সর্ব্বদা ইহাদের স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। মনিব ভৃত্যের ন্যায় এরূপ ব্যক্তিগত একটা সম্বন্ধ যেখানে মালিক মজুরে থাকে, সর্ব্বদা দেখা শুনা হয়, সেখানে একেবারে কঠোর নির্ম্মম নিয়মানুগত যন্ত্রের শাসনের ন্যায় শাসনমাত্র চলিতে পারে না। মজুররাও মনিবকে শ্রদ্ধা করে, মনিবেরও স্নেহ ও সহানুভূতির ভাবও অধীনস্থ মজুরদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাহাদের দুঃখ লাঘব করিবার দিকেও, যেরূপই হউক, একটা যত্ন মনিবের পক্ষ হইতে দেখা যায়। মনিব সহৃদয় হইলে ত কথাই নাই।

কিন্তু এই সব অপেক্ষাকৃত ছোট মালেকান কারবার এখন প্রায় উঠিয়া যাইতেছে। বড় বড় যৌথ কারবার তার স্থান অধিকার করিতেছে। প্রত্যেক রকমের ব্যবসায় এত বড় ও ব্যাপক হইয়া উঠিতেছে যে দুই একজন মহাজন মাত্র নিজেদের মূলধনের উপরে নির্ভর করিয়া তাহা চালাইতে পারেন না। তাই মূলধনের বড় বড় সমবায় হইতেছে। এই সব সমবায় যাঁহারা ঘটান, তাঁহারা আজকাল সাধারণতঃ intrepreneur বা business organisers নামে পরিচিত। সকলে ইহারা নিজেদের মূলধনের উপরেও নির্ভর করেন না। নানারকম ব্যবসায়ের মধ্যে থাকিয়া অসাধারণ ব্যবসায়িক organisation এর বা সংঘটনের শক্তি ইঁহাদের আয়ত্ত হইয়াছে। তার বলে বহু মূলধনের সমবায় ঘটাইয়া বড় বড় joint-stock কারবার ইঁহারা প্রতিষ্ঠা করেন। যাদের টাকা আছে, টাকা লইয়া নিজেরা বড় কিছু করিতে পারে না, তাহারাও এই কারবারের অংশ খরিদ করে। নিশ্চিন্তভাবে ঘরে বসিয়া তার সুদ বা dinidend খায়।

এই সব joint-stock কারবার ইয়োরোপে ও আমেরিকায় আজকাল যে কত বৃহৎ আকার ধারণ করিয়াছে তাহা আমরা সহজে কল্পনাও করিতে পারি না। এক একটি কারবারে কোটি কোটি টাকার মূলধন খাটিতেছে। বেশীর ভাগই তার ধনী মহাজনদের আর intrepreneur বা organiserদের। দেশের সাধারণ লোকও যে যতটা পারে তার অংশ খরিদ করে। অংশ খরিদ যে না করে বা করিতে না পারে, সে তার টাকা ব্যাঙ্কে জমা

রাখে। ব্যাঙ্কের টাকাও নানারকমে এই সব কারবারে খাটে।

কোটি কোটি টাকার মূলধন এক এক কারবারে খাটিতেছে, দেশময় শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইতেছে। লক্ষ লক্ষ লোক তাহাতে চাকরী বা মজুরী করিতেছে। না করিয়া আর করিবেই বা কি? গৃহস্থালী ব্যবসায় আগে হইতেই উঠিয়া যাইতেছিল,- এখন ত একেবারেই তা চলিতে পারে না।

এইরূপ কারবাররূপ সমবায়গুলি রীতিমত আইন কানুনে বাঁধা এক একটী corporationএর মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সব সমবায় বা corporation সমূহের কর্ত্তা বড় বড় intrepreneur বা ব্যবসায়িক নায়কবর্গ। বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রস্থানে থাকিয়া মূলশক্তির নিয়ন্ত্রিত্ব ইহারা করেন। আসল কাজ যাহা, তার পরিচালনার ভার থাকে ইহাদের নিযুক্ত বেতনভোগী বড় বড় কর্ম্মচারীদের হাতে। Corporationএর আইন কানুন যেরূপ হয়, কর্ত্তাদের যখন যেরূপ হুকুম তাঁরা পান, তদনুসারে কাজ কর্ম্ম তাঁহারা চালান। অসংখ্য কেরানী মজুর যাহারা বিভিন্ন শাখার কাজ করে, তাহাদের সঙ্গে আসল মালিকদের কোনও সম্বন্ধই থাকে না। বস্তুতঃ আসল মালিক যে কারা, ইহাদের সুখ দুঃখ সুবিধা অসুবিধার দায়িত্ব যে কাহাদের, তাহা বুঝিয়া উঠাই দায়।

একটি কথা আমাদের এইখানে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়া নিতে হইবে। এইসব বড় বড় joint stock corporationএর মূলধনের মালিক অর্থাৎ capitalist এবং প্রধান পরিচালক অর্থাৎ Intrepreneur বা Organiser সর্ব্বদা একই ব্যক্তি নহেন;—তাঁহাদের function অর্থাৎ কর্ম্মের ভাগ ও দায়িত্ব ঠিক এক নহে। এই Intrepreneur বা ব্যবসায়িক নায়কগণ গবর্ণমেন্টের কতকগুলি বিশেষ বিশেষ আইন অনুসারে রেজেষ্ট্রী করিয়া এক একটি joint-stock কারবার প্রতিষ্ঠা করেন এবং সরকারী আইনেরই নির্দ্দিষ্ট সব বিধি অনুসারে সেগুলি পরিচালনা করেন। নিজেরাও যতদূর পারেন, কারবারের অংশ খরিদ করেন,—বাহিরের লোকও যে যত পারে অংশ খরিদ করে। সুতরাং অংশীদের স্বার্থ এবং intrepreneurদের স্বার্থ পৃথক। এবং অংশীদের স্বার্থ যাহাতে রক্ষিত হয়,—তার জন্য আইন আছে। Intrepreneurগণ যতই অংশের মালিক হউন, intrepreneurরূপে তাঁহাদের যে কর্ত্তৃত্ব ও দায়িত্ব তার সঙ্গে অংশীরূপে তাঁহাদের স্বার্থের কি কর্ত্তৃত্বের কি দায়িত্বের কোনও সম্বন্ধ নাই। এই দুই পক্ষে পরস্পরের যাহা কিছু সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধে পরস্পরের যাহা কিছু দায়িত্ব, তাহা সরকারী আইনেই নির্দ্ধারিত হয়।

অংশী মহাজন বলিতে পারেন, আমরা কি জানি, অমুক কারবারেরর অংশ খরিদ করিয়াছি মাত্র, কারবার আমরা চালাই না, কি হয় না হয় তা আমরা জানি না,—তার দায়িত্বও কিছু আমাদের নাই। আবার Intrepreneur বা পরিচালকগণও বলিতে পারেন,—কারবারের মালিক আমরা নই, পরের টাকা লইয়া কারবার চালাই—যাদের টাকা, তাদের স্বার্থ যাহাতে বজায় থাকে, তাহা আমাদের করিতে হইবে। তার জন্য আইনও আছে, আইনে আমাদের হাত পা বাঁধা। আমরা কি করিব?

কোনও পক্ষের কথাই উড়াইয়া দেওয়া যায় না মালেকান্ দায়িত্ব এই সব কারবারে একেবারে কাহারও উপরেই আরোপ করা যায় না।

প্রকৃত মহাজন যাহারা, যাহাদের টাকায় ব্যবসায় চলে, তাহারা সারাদেশে ছড়ান। আইনে তাহাদের কতক অধিকার নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু সকল একত্র হইয়া কোনও ব্যবসায়ের উপরে কোনওরূপ কর্ত্তৃত্ব করিবার সুযোগ কি সম্ভাবনা ইহাদের হয় না। ব্যবস্থা এমনই থাকে, কাজ কর্ম্ম এমন ভাবেই চালান হয়, যে কারবারের ডাইরেক্টরদের নির্ব্বাচনেও ইহাদের স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব বড় কিছু চলে না। পার্লমেন্টের সভ্যনির্ব্বাচনে তবু সকলের সমান ভোট আছে, এখানে ভোটের সংখ্যা অংশের হিসাবে ধরা হয়। সুতরাং অপেক্ষাকৃত ছোট অংশীদের ভোটের বল একেবারেই নগণ্য। ডিভিডেণ্ডের টাকা পান,ইহাই মাত্র কারবারের সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধ। আর বাৎসরিক অতি জটিল একটা হিসাব বাহির হয়,—কিন্তু তার মধ্যে দন্তস্ফুট করা—সে হিসাব-বিজ্ঞানে অতি দক্ষ ব্যক্তি ব্যতীত আর কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। প্রত্যাশিত ডিভিডেণ্ডের টাকা পাইলে, ইহার জন্য মাথা ঘামাইতেও বড় কেহ চান না।

টাকার মালিক নন, মালিক ভাবে কাজও করেন না তাই এই সব কারবারে মালেকান দায়িত্ব Intrepreneur বা

ব্যবসায়িক নায়কবর্গের উপরেও আরোপ করা যায় না। কিন্তু, দেশের ব্যবসায় সম্পর্কিত মূলধন যাহা কিছু সব এখন ইহাঁদের হাতে গিয়া পড়িয়াছে এবং ব্যবসায় ক্ষেত্রে ইহাঁরা অপ্রতিহতপ্রভাব বা autocratic রাজার মত হইয়া উঠিয়াছেন। যে ব্যবসায়ে যত টাকাই লাগুক, অনায়াসে ইহাঁরা আয়ত্ত করিতে পারেন। creditও ইহাঁদের অসীম; Organising capacity বা সংঘটন শক্তিও ইহাঁদের অসাধারণ। দেশের সকল মূলধন আয়ত্ত করিয়া তার বলে সকল ব্যবসায়ে ইহাঁরা প্রভুত্ব করিতেছেন। তাই আধুনিক এই সব ব্যবসায়ের ধরণ বা ধর্ম্মের নামই হইয়াছে capitalism।

এই সব বড় বড় ব্যবসায়িক corporation সর্ব্বত্র এমন ভাবে আপনাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, দেশের সকল বৃত্তি এমন ভাবেই ইহাদের আশ্রিত ও অধীন হইয়া পড়িয়াছে, জীবনের সকল কর্ম্মক্ষেত্রে মানবে মানবে ব্যবসায়িক সম্বন্ধই এমন ভাবে প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যে সমগ্র সমাজ এক ব্যবসায়িক সমাজে পরিণত হইয়াছে, বলিলেই হয়। ব্যবসায়িক নায়কগণ এই সমাজের কর্ত্তা, আর সকলে কোনও না কোনও ভাবে ইঁহাদের অধীন বৃত্তিভোগী। ব্যবসায়িক প্রভু আর তাঁহাদের ব্যবসায়িক ভৃত্য, জনসমাজ প্রধানতঃ এই দুই শ্রেণী বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। নানারকম ব্যবসায়ে ছোট বড় স্বাধীন-বৃত্তিক গৃহস্থজীবনের যে বৈচিত্র্য, কোথাও আর বড় তাহা দেখা যায় না। এক গ্রাম অঞ্চলে কৃষিকর্ম্মে এইরূপ স্বাধীন গৃহস্থ কোথাও কোথাও কিছু দেখা যায়। তবে ইহাও অনেক পরিমাণে বড় বড় নায়কদের পরিচালিত plantation বা বিস্তৃত কৃষি ব্যবসায়ের অধীন হইয়া পড়িয়াছে।

অন্যান্য সকল ব্যবসায় বড় বড় নগরের বড় বড় কারবারে গিয়া কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। অসংখ্য লোক, কেহ কেরাণী, কেহ কুলী, কেহ কেহ ওভারসিয়ার, কেহ এইরূপ কোনও না কোনও কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া সেই সব স্থানে গিয়া জমায়েত হইয়াছে। আফিসে কি কারখানায় বাঁধা এক নিয়মে, সেই একই কড়া রুটিনে দিনের পর দিন সকলে কাজ করে,—অবসর সময়ে ব্যারাকে আসিয়া কোনও মতে আহারাদি ও বিশ্রাম করে। এই সব স্থানে সেই সব বড় বড় ব্যারাকের ঘর ব্যতীত, গৃহস্থের ন্যায় নিজ নিজ বাড়ীতে বাস করা কাহারও পক্ষে সম্ভব আর হয় না।—এরূপ বাড়ী কোথায়? নগরগুলি যে একেবারে কারবারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে,—জমির দাম, বাড়ী ভাড়া আগুন। অল্প আয় যাহাদের, তাহাদের সাধ্য কি পৃথক পৃথক বাড়ীতে থাকে? নগরের পর নগরে যেখানে যাও, মানবজীবনের, মানব সমাজের এই একই চিত্র চক্ষে পড়িবে!

রাত্রিপ্রভাতে কলের বাসীতে ফুঁ পড়িল। ব্যারাক-বাসীরা ধড়ফড়িয়া সব উঠিল,—কোনও মতে কাপড় চোপড় পরিয়া, যার যা জুটিল, কিছু মুখে দিয়া, সব কারখানায় গিয়া কাজ আরম্ভ করিল। মধ্যে একবার আহার বিরামের জন্য একটু একটু ছুটি আছে,—বাকী প্রায় সমস্তটা দিন, বড় বড় কলে ঠিক কলেরই অংশের মত হাজার হাজার মজুর কাজ করিবে, একটু চক্ষু ফিরাইবার কি একটা কথা কাহারও সঙ্গে বলিবার মুহূর্ত্ত অবকাশ নাই। কারণ, একজনের কাজ একটু এদিক ওদিক হইলে সকলের সব কাজ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। বায়োস্কোপের ছবিতে এইসব বড় বড় কারখানায় মজুররা কেমন যে যন্ত্রের মত কাজ করে, তাহা অনেকে দেখিয়াছেন। ইয়োরোপে, আমেরিকায় কি জাপানে যাঁহারা যান, তাঁহারা দেখিয়া আসিয়া গদগদ প্রশংসাই এই কর্ম্মশৃঙ্খলার বর্ণনা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ দেখিতে ইহা বেশ সুন্দরই লাগে। মনে হয়, আহা, কি চমৎকার শিক্ষা ইহাদের! কি শৃঙ্খলার ব্যবস্থা ইহাদের কাজের! আমরা ছবিতে একদিন বা কলে গিয়া দেখিয়া আসি, চক্ষে বেশ লাগে। কিন্তু মনে করিয়া দেখুন, পুতুল নয়, যন্ত্র নয়, ইহারা সব মানুষ। একদিন নয়, দুই দিন নয়, সারাটি জীবন, দিনের পর দিন প্রত্যহ ৮।৯ ঘণ্টা করিয়া ইহাদের এইভাবে কাজ করিতে হয়। সমস্ত জীবন ইহাদের অবিরাম গতি একটা যন্ত্রের মত চলে। জীবনের সুখ কি, শান্তি কি, কিছুই ইহারা জানে না। বলিবেন, জীবিকার জন্য খাটিতে হয়, বেশ ত, বাঁধা নিয়মে শৃঙ্খলামত খাটে। ইহা ত উন্নতির লক্ষণ। কিন্তু শৃঙ্খলাই ত জীবনের চরম লক্ষ্য নয়। শৃঙ্খলায় সুখ সুবিধা লোকের বেশী হয়, তাই শৃঙ্খলা প্রার্থনীয়। কিন্তু এখানে কি সুখ সুবিধা তাহাদের হইতেছে? সারাটি জীবন ত কেবল

ঐ শৃঙ্খলার দাস হইয়াই তাদের থাকিতে হয়। এ দাসত্ব-ভার সে বহন করে, কারণ ইহা ব্যতীত যৎসামান্য অন্নবস্ত্রের সংস্থানও তার হইতে পারে না। সুখ সুবিধা এই শৃঙ্খলা হইতে যাহা কিছু, তাহা ভোগ করিতেছে, কারবারের প্রভু যারা তারাই। ইহারা ত এই দাসত্ব, করিয়া, প্রাণহীন একটা যন্ত্রের মতই জীবনটা কাটাইয়া দেয়। মানব জীবনের সর্ব্বোপরি কাম্য যে স্বস্তি, শান্তি,—ইচ্ছামত কাজ করিবার যে আনন্দ যে আরাম, তাহার ত কিছুই ইহারা জানে না।

ইহাদের সঙ্গে স্বাধীন কোনও গৃহস্থ—এই যেমন আমাদের দেশের কামার কুমার কি ছুতারের তুলনা করিয়া দেখুন। কি আরামে, কি আনন্দে তাহারা তাহাদের কাজ কর্ম্ম করে। হাসিতেছে, গল্প করিতেছে, গান করিতেছে, তামাক খাইতেছে, ক্লান্তি বোধ হইলে উঠিয়া হয়ত একটু ঘুরিয়াও আসিতেছে—আবার নিজেদের কাজও বেশ করিতেছে। এইভাবে ইহারা যাহা উপার্জ্জন করে, তার চেয়ে কলের কুলিদের উপার্জ্জন বেশী নয়। কেবল পাউণ্ড শিলিং এ এই উপার্জ্জনের হিসাব করিলে হইবে না। Nominal বা money wages কুলিদের যাহাই হউক, real wages অর্থাৎ উপার্জ্জিত পয়সায় অন্ন বস্ত্র কি মিলে, তার হিসাব যদি আমরা নিই বুঝিতে পারিব ইহাদের তুলনায় স্বাধীন গৃহস্থ ব্যবসায়ীরা অনেক ভাল অবস্থায় আছে।

কেবল কারখানার কুলি বলিয়া নয়, এই সব ব্যবসায়ের সঙ্গে যাহারাই যে ভাবে কাজ করে, সকলেরই অবস্থা এইরূপ। কাহারও একটু স্বস্তি নাই, শান্তি নাই, আনন্দ নাই, আরাম নাই! একটানা অবিরামগতি, এক একটা যন্ত্রের মত সকলের জীবন চলিয়া যাইতেছে!

কর্ম্মক্ষেত্রে কাজের অবস্থা এই, উপার্জ্জন যাহা হয়, তাহাতে স্বচ্ছন্দভাবে কাহারও চলে'না। আর গৃহস্থালী হইতেছে ব্যারাকের সেই সব গৃহে! কোথাও অসংখ্য অবিবাহিত নর-নারী, যার যার মনে থাকে, যা খুসী তাই করে। আর কোথাও নানারকমের হাজার হাজার পরিবার, প্রকাণ্ড একটা বাড়ীতে ভাগ ভাগ করা ছোট ছোট খণ্ডে বাস করে, বা বাঁধা খোঁয়াড়ে কোনও মতে জীবন কাটায়। ছেলেপিলেগুলি যে ইহার মধ্যে কি ভাবে মানুষ হয় তাহা আর না বলিলেও চলে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রত্যেক ব্যবসায় এক একটা corporationএর মত হইয়াছে। corporation প্রাণহীন একটা বৃহৎ যন্ত্রের মত, তার কতকগুলি নিয়মের শাসনেই চলে। করুণা, প্রীতি, স্নেহ, সহানুভূতি প্রভৃতি বৃত্তির স্থান তার মধ্যে নাই। বস্তুতঃ এই সব corporationএর পরিচালক যাঁহারা, তাঁহারা এতদূরে, এত উপরে থাকেন, যে ব্যক্তিগত স্নেহপ্রীতির কি সহানুভূতির কোনও আদান-প্রদান ইঁহাদের আর ইঁহাদের কর্ম্মে নিযুক্ত লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবীদের মধ্যে একেবারেই সম্ভব হয় না। উপরে থাকিয়া কতকগুলি বাঁধা নিয়মে এই যন্ত্র তাঁহারা চালান,—আর সেই যন্ত্রের সঙ্গে, যন্ত্রের অংশ স্বরূপ এই সব লোকেরা চলে। যন্ত্রের প্রাণ নাই, স্নেহমমতার সাড়া তার মধ্যে কিছু পাওয়া যায় না। 'A corporation has no conscience' এই কথাটা বড় সত্য। প্রাণহীন প্রকাণ্ড এক একটি যন্ত্রের ন্যায় একটি ব্যবসায়িক corporationএর মধ্যে কতকটা ভৌতিক নীতির মতই নির্ম্মম কঠোর নিয়মের শাসনে লক্ষ লক্ষ লোক যেন প্রকাণ্ড একটা ঘানিতে ঘুরিতেছে! সমগ্র সমাজই হইয়াছে এইরূপ কতকগুলি corporationএর সমষ্টিরূপ অতি বৃহৎ একটা যন্ত্র মাত্র!

এই যন্ত্রে যাদের জীবন বাঁধা পড়িয়াছে, যন্ত্রের ঘানিতে অবিরত তারা ঘুরিতেছে, একটু স্বস্তির শ্বাস ফেলিবার অবকাশ পাইতেছে না, আর দেশের বেশীর ভাগ লোকের দশাই তাই। হায়, ইহাই নাকি আবার progress বা সভ্যতার ক্রমোন্নতির অবস্থা, এই তথাকথিত উন্নতির প্রসঙ্গে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি প্রথিতনামা উড্রো উইলসন সাহেব তাঁহার New Freedom নামক পুস্তকের একস্থানে বলিয়াছেন—

"I have my private belief that the we have been doing most of our progressiveness in the way of those things that in my boyhood days we called treadmills,—a tread mill being a moving platform, with cleats on it, on which the poor devil of a mule was forced to walk for ever without getting anywhere. Elephants and even other animals have been known to turn treadmills, making a great deal of noise and

causing certain wheels to go round and I dare say grinding out some sort of produce for somebody, but without achieving much progress. Lately, in an effort to persuade the elephant to move, really his friends tried dynamite. It moved—in separate and scattered parts, but it moved.

বিধাতার নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে এই একটি প্রার্থনা করি, ভারতকে এই progressiveness হইতে তিনি রক্ষা করুন। কিন্তু তা বুঝিবা আর বিধাতারও সাধ্য নয়। যাহা হউক, বড় দশজনের—Industrial kings বা millionareদের উন্নতি যাহাই ইহাতে হউক, দেশের জনসাধারণের ইহা উন্নতি নয়, বড় দারুণ দুর্গতি! কিন্তু কার কাছে ইহার প্রতিকার তাহারা চাহিবে; গবমেণ্ট? গভর্ণমেণ্ট কি প্রতিকারই বা করিতে পারেন? এই যে নূতন ব্যবসায়িক নীতি ও পদ্ধতি যার অবশ্যম্ভাবী ফলে, সমগ্র সমাজ এইরূপ কতকগুলি যন্ত্ররূপ ব্যবসায়িক Corporation এর সমষ্টিতে পরিণত হইয়াছে,—সেই নীতি ও পদ্ধতি একেবারে বদলাইয়া না ফেলিতে পারিলে, কি প্রতিকার গভর্ণমেণ্ট ইহার করিতে পারেন? তা বদলাইয়া ফেলিতেইবা পারে কে? সেই গভর্ণমেণ্টই বা কে? অধুনা এই সব শক্তিমান্ যন্ত্র-নায়কগণই ত গভর্ণমেণ্ট?

কেবল তাই নয়, বর্ত্তমান capitalism এর ফলে আরও অনেকদিকে অনেক ভাবে এই ব্যবসায়িক corporation গুলির প্রভুত্ব এমনই ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে যে কোনও দিকে ইহাদের বাহিরে কেহ একটু স্বাধীনভাবে নড়িবার চড়িবার অবসর ত পায়ই না, দেশের সকল শ্রেণীর সকল লোক ইহাদের পেষণে অতি দুঃসহ এক দুর্গতির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। নিষ্কৃতির কোনও উপায় দেখিতে পাইতেছে না।

এই সব প্রভুত্ব কিরূপ আকার ধরিয়াছে, কিরূপ পেষণ সর্ব্বসাধারণকে করিতেছে এবং গভর্ণমেণ্টইবা কি ভাবে ইহাদের করায়ত্ত হইয়া পড়িয়াছে, পড়িয়া এই পেষণেরই সহায়তা করিতেছে—তার আলোচনা কিছু দীর্ঘ হইবে। সুতরাং আজ ক্ষান্ত থাকিলাম।

"প্রতীক্ষমানা"

(Scott এর Datur Hora Quieti অবলম্বনে)

স্বচ্ছ হ্রদে সূর্য্য ঠাকুর কচ্ছে নমস্কার,
বন্যপাখীর সঙ্গমেলা সাঙ্গ আজি তরে,
সন্ধ্যা রঙীন গিরির গলে পরিয়ে দে'ছে হার—
গৃহের স্বামী তবুও কেন আস্‌ছেনাকো ঘরে!

দিনের বেলায় কাজের যোগে গৃহের সীমা ছেড়ে,
অনেক দূরে স্বজন ত্যে'জে ব্যস্ত থাকে যারা,
অস্ত-রবির রঙীন নেশায় সকল বোঝা ঝে'ড়ে
সবাই যে গো আপন গেহে আসছে ফিরে তারা।

আকাশছোঁয়া প্রাসাদ'পরি কার দুলালী বালা
প্রিয়জনের আগমনের আকুল প্রতীক্ষায়
দৃষ্টি দিয়ে' সৃষ্টি করি' স্বর্ণ ময়ূখমালা
জ্বালিয়ে দেছে রঙীন হাসি গিরের সারা গায়।

কৃষাণবালা আকুল-দিঠি কপাল ছুঁয়ে হাতে
অস্তরবির রশ্মি-মলিন আড়াল ক'রে তায়
পথের পানে চাইছে শুধু ব্যাকুল দৃষ্টিপাতে
শ্রান্তি শেষে শান্তি মুখে ঐ সে দেখা যায়।

সারাটা দিন দুভাগ হ'য়ে দীঘির জলে ভাসি'
সন্ধ্যা শেষে হংসমিথুন মিলন মাগি' ডাকে
আকুল চোখে বন্য হরিণ বধূর পাশাপাশি
খুঁজছে তাদের রাতবসতি ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে

বনের পাখী পুলক আঁখি, সকল কণ্ঠ ভরি'
প্রিয়জনের মিলন-মুখর গাইছে মধু গান—
একটি দিনের দূর'প্রবাসী গৃহের কথা স্মরি'
আস্‌ছে ফিরে—গৃহের স্বামী কচ্ছে তবু ভান।

শ্রীনলিনীভূষণ দাশ গুপ্ত।

চতুর্থ অঙ্ক

—o—

প্রথম দৃশ্য

—o—

পল্লীগ্রাম

ধর্ম্মদাসদের ভবন—কক্ষ

ধর্ম্মদাস :—ছায়া, তুমি যে মা বাবাকে এত সন্তুষ্ট করতে পারবে তা আমি ভাবতে পারি নাই। তোমাকে অবশ্য শীঘ্র আমার কার্য্যস্থলেই যেতে হবে, মা ঠাকরুণও সঙ্গে যাবেন; কিন্তু যতদিন এখানে রয়েছি, সংসারের সঙ্গে তোমার একটা সুখের মিল দেখে বড় সুখেই আছি। বাড়ীর ছেলে মেয়েরা কেমন তোমার বশীভূত হয়ে পড়েছে। দাস দাসীরা তোমার ব্যবহারে বিশেষ সন্তুষ্ট। গ্রামের লোকেও তোমার সুখ্যাতি করছেন। তুমি পল্লীগ্রামে এসে যে এমন সুন্দর চলতে পারবে তা ভাবি নাই। শুনেছি তুমি খুব গান গাইতে ভালবাস, এতে লজ্জার কিছুই নেই, মা একটা হারমোনিয়ম কিনে দেবেন বলেছেন।

ছায়া :—না, হারমোনিয়মে দরকার নেই। গান গাওয়ার চেয়ে অনেক দরকারী ও প্রিয় কাজ আছে। গান গাইতে একটু যে লজ্জা না লাগে তাও নয়। তোমার কথাই গানের মত মিষ্টি লাগে।

ধর্ম্মদাস :—তুমি অনেকদূর ইংরাজী পড়েছ, বাঙ্গলা বা ইংরাজী নভেল স্বচ্ছন্দে লাইব্রেরী থেকে আনিয়ে নিতে পার। আমাদের গ্রামে লাইব্রেরী আছে। চাই কি, দরকার হলে কলকাতা থেকে অর্ডার দিয়েও আনাতে পার।

ছায়া :—ভাল লাগে না। তুমি যে তুলসী দাসের রামায়ণ পড়, খুব ভাল লাগে। সব জায়গা বুঝতে পারিনে তাতে জিনিষটা মধুরতর লাগে। গানের কথা বাদ দিলে সুরে যেমন যথেষ্ট কথা থাকে, এত যেন তাই।

ধর্ম্মদাস :—তুমি যেন লজ্জা করে পড়া বা গান বন্ধ করো না। আমরা তোমাকে নীলাকাশ ভুলাইয়া খাঁচার পাখিটী করতে নারাজ। তুমি শুনেছি খুব কবিতাপ্রিয়, কই এখানে ত একখানা বইএর পাতাও উল্টোও না।

ছায়া :—এখন আর ভাল লাগে না। পণ্ডিত মশায়ের মত সারাদিন বই নিয়ে বৌমানুষের শোভা পাবে কেন? চক্ষের সম্মুখের এত কার্য্য উপেক্ষা করে, এত সৌন্দর্য্য তাচ্ছিল্য করে, একটা কল্পনালোক সৃজন করার যে দরকারই হয় না।

ধর্ম্মদাস :—শুনেছিলাম তুমি ভারী তার্কিক ও মুখর ছিলে, এখানে এসে ময়না যে একেবারে বুলি ভুলে গেল। তুমি স্ত্রীলোকের right নিয়ে খুব তর্ক করতে শুনতে পাই, এখন যে সব স্বইচ্ছায় surrender—ত্যাগ ক'রছো।

ছায়া :—ও সব কথা শুনলে এখন লজ্জা পায়। মুক্তা যখন সাগরের জলে পড়ে থাকে, সে সাগরের জলের কল্লোলকেই বড় করে নেয়, যখন উপরে আসে তখন দেখে তার সে সবের সঙ্গে সম্বন্ধ নেই। তার স্থান রূপের অঙ্গে লীন হয়ে থাকা। নীরবতাতেই তার সুখ।

ধর্ম্মদাস :—তুমি সত্যি তুলসী দাসের রামায়ণ শুনবে?—বিরক্ত হবে না?

ছায়া :—সেই কথাগুলি আমার বড় ভাল লাগে যাতে নামমাহাত্ম্য আছে।

ধর্ম্মদাস :—রামভক্তহিত নবতনুধারী

> সহি সঙ্কট কিয় সাধু সুখারী।
> নাম স প্রেম জপত অনায়াসা
> ভক্ত হোহিঁ মুদ মঙ্গলবাসা।
> রাম এক তাপস তিয়া তারী
> নাম কোটী খল কুমতি সুধারী।
> ভঞ্জো রাম আপ ভব চাপু
> ভব ভয় ভঞ্জন নাম প্রতাপু।

শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ব্বে এমন করে কেউ নাম মাহাত্ম্য প্রচার করে নাই।

ছায়া:—স্বাতী ও দুখানি বইএর নাম করতো। তখন আমি হাসতাম, এখন আকাঙ্ক্ষা হয় শোনবার।

ধর্ম্মদাস :—স্বাতীর বিবাহ যে আমি যেখানে থাকি

সেই মহকুমাতেই হয়েছে, তাদের বাড়ী অনেকবার গিয়েছি। তুমি গেলে দেখা হবে।

ছায়া :—আমি গিয়ে দেখা করতে যেতে পার? বড় দেখ্‌তে ইচ্ছে হয়।

ধর্ম্মদাস :—নিশ্চয়ই, খুব কাছেই। ছায়া, আমরা বৈষ্ণব। মাছ খাইনে। তুমি মাছ খেতে পার এবং বাবা তার ব্যবস্থা করে দেবেন বলেছেন।

ছায়া :—কি বলো তোমরা কেউ খাবে না, আমি একাই বাংলা। আমি মাছ কোনদিনই ভালবাসিনে। যাক ও কথা। বাবার চিঠি পেয়েছ?

ধর্ম্মদাস :—কেন তুমি পত্র লিখ না?

ছায়া :—তোমার কাছেই সংবাদ পাই, চিঠি লেখার ত দরকার হয় না।

দ্বিতীয় দৃশ্য

—০—

কলিকাতার বাড়ী

সত্যহরি :—গিন্নি, মেয়েদের বিবাহ ত হল। ঋণ বড়ই বেড়ে গেল। এই বাড়ী করতে পূর্ব্বেই অনেকগুলি টাকা ধার করতে হয়েছিল। তিন বৎসর বন্যায় প্রজারা খাজনা ঠিক দিতে পারে নাই, ধার করে মহল রাখতে হয়েছে। মণীশের মোকর্দ্দমায় ও এ বিবাহেও ধার নিতান্ত কম হয়নি। বিভাস একা, আয়ও তেমন বেশী নয় কোন রকমে সংসার চলে। শুনছি যেখানে হাজার ৬০ ধার করা হয়েছিল তার সুদে সওয়ায় একলাখ টাকা হওয়ায় নালিশ করেছে। ধার শোধ দিতেই কলকাতার বাড়ী ও জমিদারী বিকিয়ে যাবে। এই বাড়ী তৈয়ারীর সুরকীর দেনাই ২০০০৲ টাকা আছে। সম্বলের মধ্যে ত দেখছি পল্লীগ্রামের বাস্ত আর সামান্য জমি জায়গা। গ্রামের লোকের যে সহানুভূতি, তা চণ্ডীমণ্ডপ পোড়ানতেই বোঝা গিয়েছে, সেখানে টিঁকৃতে পারা যাবে না। সেখানে কিছু দাদনও আছে তা নালিশ না হলে আদায় হবে না।

গিরিবালা :—এখন ত খরচ কমলো, ভগবান করেন বিভাস এখন কিছু কিছু করে ধার শোধ দিতে পারবে। আর পল্লীগ্রামের বাস ত উঠোনো হবে না। আমি মাঝে মাঝে গিয়ে থাকবো। জমি জায়গা সব কি পরে খাবে?

(বিভাসের প্রবেশ)

এসো বাবা, আমরা ভাবছি, বীরভূম কেমন জায়গা সেখানে গিয়ে অসুখ বিসুখ হ'ল নাকি?

বিভাস :—না সে জায়গা ভাল, তবে হিম লেগে এই পা-টায় একটু দরদ লেগেছিল, অনেকটা সেরে গিয়েছে।

সত্যহরি :—বিভাস, এবার ধারের একটা বন্দোবস্ত করতে হবে। ক্ষিতীশ বললেন, পাওনাদাররা নালিশ করেছে; একটা কিস্তিবন্দী না হয় করা হক।

বিভাস :—দেখি না, হয় জমিদরীটাই ছেড়ে দেওয়া যাক। ওতে কোন লাভ নাই, আর তা না হলে সামলাতে পারা যাবে না। ভগবানের ইচ্ছায় আমাদের আর বড় খরচ নেই, মাসে মাসে কিছু টাকা মহাজনকে দিতে পারা যাবে। মা, মণীশ যে জায়গাটীতে আছে, অনেকটা আমাদের গাঁয়ের মতন। এবার একবার গ্রামে গিয়ে বাড়ীগুলো সারাবার ব্যবস্থা করে আসবো। চাষটা পুনরায় করাবো, মণীশেরও তাই ইচ্ছে।

সত্যহরি :—বিভাস, কবরেজ মশায় আজ এখানে আসবেন, একবার পা-টা না হয় দেখাও। বোধ হয় পা-টার জন্য তোমার একটু অশান্তি হচ্ছে। চলতে যেন কষ্ট হচ্ছে।

বিভাস :—হাঁ পা টা দেখাবো। এক একবার যেন অসাড় মনে হয়, সেই জন্যই ভয় হয়, একবার দেখানো দরকার।

তৃতীয় দৃশ্য

—০—

বিলাসপুর

স্বাতী ও ছায়া

স্বাতী :—আপনাকে যে এখানে দেখতে পাবো সে আশা করি নেই। ভাগ্যিস্ ধর্ম্মদাসবাবু এখানে বদলী হয়ে এসেছেন নইলে কি আমাদের বাড়ী পায়ের ধুলো পড়তো।

ছায়া :—কি বলো বোন, তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যই আমি এখানে এসেছি, কিছু দিন থেকে আবার মায়

সঙ্গে দেখে যাব। তোমার সঙ্গে দেখা করবার সুবিধা বহুদিন খুজছিলাম। তখন বুঝতাম না, এখন বুঝেছি স্ত্রীলোকের লজ্জাবতীলতা হয়ে থেকেই সুখ। শ্যামা পাখীর শিষ নির্জ্জন অন্ধকার নইলে জমে না। স্ত্রীলোকের হৃদয়ও তেমন চোখের আড়ালে ভাবের মধ্যে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। কাছে কেউ নেই ত, চেঁচিয়ে কথা কইছি।

স্বাতী :—না কেউ নেই, স্বচ্ছন্দে কথা কইতে পারেন।

ছায়া :—দেখ বোন আমরা স্কুলে কালেজে যে শিক্ষা লাভ করি, তা আমাদের জীবনে কোন কাজে আসে না, বরং ভুলতে অনেকটুকু চেষ্টা করতে হয়। আমাদের শিক্ষা যেন লক্ষ্মীকে কাঠ কাটতে শেখানো। যে শিক্ষা আমাদিগকে সমাজের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে চলতে শেখায় না, সে শিক্ষা না হওয়াই ভালো। শিক্ষা আমাদিকে যে উচ্চস্থানে তুলে দেয় সেটা মন্দির নয়, সেওড়া গাছ। অপরে আমাদিগকে ভক্তি না ক'রে ভীতির চক্ষে দেখে। অবশ্য আমরা যে শিক্ষা সাধারণতঃ পাই তার কথাই বলছি। আমি বোন দেখছি আমার শিক্ষা আমাকে অযোগ্য করেই তুলেছে। তার চেয়ে যদি রাঁধতে বাড়তে শিখতাম, ঈশ্বরকে ভক্তি করতে শিখতাম অনেক কাজে লাগতো। তোমার মত আমিও এখানে এসে সব শিখছি। আমাদের জীবন শান্তি, সুখ দেবার জন্য, কেবল গন্ধ আলো হাসি হলে চলবে না। আনন্দ, অমৃতের সন্ধান দিতে হবে।

স্বাতী :—আমি ও তাই ভাই, আমরা কি নিয়ে ছিলাম? জীবনের যে দেবতা, তার জন্যএকেবারেই আপনাকে উপযুক্ত করে তুলি নাই। আমাদের ফাঁকা লিখাপড়ার দরকার কি? স্বামীর বুকটাই যে আমাদের একটা বৃহৎ জগৎ। তাঁর হাসিতেই বিশ্বনাথের হাসি ফুটে উঠে। কমলের মত সেই রবির ছবিটী বুকে নিয়ে জীবন কাটানই যে আমাদের সার্থকতা।

ছায়া :—স্বাতী, আমিও তুলসীদাসের রামায়ণ ও শ্রীচৈতন্যভাগবৎ পড়ছি। যে আনন্দ পেয়েছি তা কি বলবো। যেন স্বর্গে রয়েছি মনে হয়। এ সব ছেড়ে আমরা নাটক নভেল নিয়েছিলাম। স্বাতী, তোমার নামটী খাসা, তোমার স্নেহের জল পড়েই আমার হৃদয়ে এ মুক্তা ফল্‌লো।

স্বাতী :—রাগ করবেন না দিদি, আপনার সে ব্যাকা চোরা পাঁচালো কথা কোথায়? আপনি যেন একমাত্রে শাপমুক্ত দেবকন্যা হয়ে পড়েছেন, কথাতেও যেন একটা অপূর্ব্ব কমনীয়তা এসেছে।

চতুর্থ দৃশ্য

—o—

কলিকাতার বাড়ী

বিভাস :—বাবা, ব্যারামটা পক্ষাঘাতেই দাড়াতে পারে, কবিরাজ মশায় বললেন। তার চিহ্নও দেখা যাচ্ছে, পা একেবারে সম্পূর্ণ অসাড় মনে হয়, আবার যন্ত্রণাও হয়। আমার এখন আবার যে রকম অবস্থা দাড়ালো তাতে যে আর ওকালতি করতে পারবো, তার আশা নাই। মেঘ চারিদিকেই ঘনীভূত হলো। ঋণ প্রভৃতি পরিশোধ করবার ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

সত্যহরি :—তুমি একটু সারলেই ব্যবস্থা করা যাবে।

বিভাস :—আমি যে সারবো এমন আশা ত হয় না, ক্রমে ক্রমে খারাপ দিকেই যাচ্ছে।

গিরিবালা :—বালাই, বাবা ভাল হবে বৈকি।

বিভাস :—মা আমার দেহ যেন দিন দিন অবশ হয়ে আসচে। ভাগ্যিস বিবাহ করি নাই, তা হলে একটা বিধব রেখে যেতাম। এ বাড়ীটা পর্য্যন্ত বন্ধক আছে, এখানে যে শান্তিতে মরতে পাবো তারও ভরসা নাই।

গিরিবালা। ওসব কথা ব'লতে নেই, অসুখ হয়েছে ভাল হবে। দিনকতক গ্রামেই না হয় যাওয়া যাবে।

বিভাস। মা, অসুখের সময় মানুষ যেন ছেলেমানুষ হয়ে যায়। তুমি যে সেই গ্রামে আমাদের দুভাইকে পোড়ের ভাত রেঁধে খাওয়াতে—যেন অমৃত খেতাম, কয়দিন কেবল তাই খেতে ইচ্ছে ক'রছে।

গিরিবালা। তুমি ভাল হয়ে গ্রামে যাবে। শরীর ধরতে গেলে ব্যারাম হয়ই, অত ভাবতে আছে। বাবা এখানকার চাকর চাকরাণীর রকম দেখে অবাক, বাইরে রটিয়েছে এবাড়ীতে বসন্ত হয়েছে, কেউ আসে নাই, একাই সমস্ত কাজ ক'রলাম। দেখতে এখানে প্রতিদিন চা খেতে তোমার কত সঙ্গী জুটতো, এখন একজনেরও দেখা নাই।

বিভাস। সহরের লোক নানা কাজে থাকে, আর চারিদিকে বসন্ত হচ্ছে, সে সংবাদ পেলে ভয়েই আসতে পারে না। বিশেষতঃ পল্লীগ্রামের মত সহানুভূতি এখানে কোথায় পাবে মা।

(কবিরাজের প্রবেশ)

বিভাসকে দেখিয়া

কবিরাজ। অবস্থার ত পরিবর্ত্তন হয়নি। পীড়াটা একটু জটিল, কিছুদিন কষ্ট দেবে।

বিভাস। এটা কি পক্ষাঘাতে দাঁড়াবে ?

কবিরাজ। বলা যায় না, তবে দাঁড়াতেও পারে।

সত্যহরি। তার প্রতিষেধক কিছু নাই।

কবিরাজ। সেই মতই ঔষধাদি দেওয়া হচ্ছে, তবে ক্রুর ব্যাধি, কিছু বলা যায় না।

[প্রস্থান।

সত্যহরি। গিন্নি, আর চুপ করে থাকা যায় না, এ বিরাট জনপূর্ণ কলিকাতা আমাদের পক্ষে জনশূন্য, বন্ধুবান্ধব-বর্জ্জিত। ছায়া সেখানে ইনফ্লুয়েঞ্জায় পড়েছে। এই বাড়ীতে সমস্ত রাত্রি রোগীকে নিয়ে দুটী প্রাণীতে জাগছি। গাড়ী ঘোড়া মটরের উদাসীন অকরুণ শব্দ মনকে আরও কাতর ক'রে তুলেছে। এ দুঃখ ভাগ করে নেবার একটা লোক নেই। লজ্জার কথা বিভাসের উপযুক্ত চিকিৎসা, পথ্য ও শুশ্রূষা ক'রবার মত অর্থও নাই। এই বিবাহেই ত সঞ্চিত অর্থ শূন্য হয়ে গিয়েছে। গ্রামে হাজার দুই টাকা দাদন আছে, তাদিকে সংবাদ দেওয়া যাক, যদি টাকাটা পাওয়া যায়—বিশেষ সাহায্য হবে, কি বল ?

গিরিবালা। গ্রামে ভালমন্দ লোক আছে। চিরদিন আমাদিকে ভালবাসে, এ দুঃসময়ের কথা লিখলে নিশ্চয়ই প্রাপ্য টাকা দেবে, বিশেষ একজন চাকরাণীর জন্য লিখে দাও। মোক্ষদা বিভাসের ব্যারাম শুনলেই আসবে, সে ছেলেবেলায় কোলে ক'রে মানুষ করেছে।

বিভাস। মা আমি বড় যন্ত্রণা পাচ্ছি। বোধ হয় বাঁচব না। তোমাদিকে বড় অকুল পাথারে ভাসিয়ে গেলাম। আমার ৮ হাজার টাকা জীবন-বীমা আছে, সেইটে নিয়ে ধার শোধ দিয়ে মা তোমরা দেশে যেও, এখানে থেক না। আমার আর বেশী বিলম্ব নাই। জীবনীশক্তি যেন কমে আসছে।

গিরিবালা। ষাট্, ষাট্, বাবা তুমি আমার বেঁচে থাক, অন্ধের যষ্টি, অঞ্চলের নিধি আমার। আমাদের সর্ব্বস্ব যাক, তুমি বাঁচ। (গোল)

পঞ্চম দৃশ্য

—০—

কলিকাতা—গোয়েন্দা আফিস

সুপারিনটেণ্ডেণ্ট কাঞ্জিলাল।—দেখ শিরীশ, তোমার প্রকৃত নাম কি জানাও। তুমি সিরাজগঞ্জে বিভূতি ব'লে পরিচয় দিয়া একজনকে ভীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক ৫০০ শত টাকা লইয়াছিলে। বহু লোকের নিকট আপনাকে গোয়েন্দা পুলিশ বলিয়া মিথ্যা পরিচয় দিয়া বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছ, এক্ষণে রামভজন তেওয়ারীর নিকট একসহস্র টাকার নোট লইয়াছ ?

শিরীশ। আমি কখনও বিভূতি বা গোয়েন্দা ব'লে পরিচয় দিই নাই। আমার সঙ্গে ইন্‌স্পেক্টার রায়ের মনোমালিন্য আছে তাই পথ থেকে ধরে এনেছেন।

ইঃ রায়। আমি এ লোকটার সন্ধানে বহুদিন ফিরছি এবার একেবারে বামাল সহিত ধরা পড়ে গিয়েছে। যেমন টাকাটা হাতে করেছে আর আমি ওদের দুইজনকে মটরে তুলে নিয়ে রওনা। মটর ডাকাত, মটর ডাকাত শব্দে চারিদিক গরম করে তুলেছিল। ইহার বিরুদ্ধে অসংখ্য প্রমাণ আছে, আমি তা সমস্তই হাজির ক'রবো।

সুঃ কাঞ্জিলাল। শিরীষ, তুমি ত একেবারেই ডুবেছ, সঙ্গে সঙ্গে ডুবিয়েছ বহু নিরীহ লোককে। তুমি মনীশ রায় নামক একটী ছেলেকে ইঃ ঘোষের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ব'লে ধরিয়েছিলে, তুমিই তার ঘরে 'যুগান্তর' ও জালচিঠি রাখতে দিয়েছিলে ?

শিরীশ। আমি সরলভাবে স্বীকার করছি, আমি দিয়েছিলাম। চিঠির কথা সে জানতো না, আমি তার হাতের লেখা দেখে নকল ক'রে দিয়েছিলাম।

ইঃ রায়। নকল বলোনা, জাল করেছিলাম বল।

সুঃ কাঞ্জিলাল :—আমি শুনেছি, সে ছেলেটী নির্দ্দোষ তুমি তাকে এমন ভাবে জড়িত করেছ যে তার উদ্ধারের উপায় নেই। তোমার ক্ষমতা অসাধারণ, তোমার প্রতি

বহুদিন আমরা দৃষ্টি রেখেছি কিন্তু তুমি আমাদিগকেও প্রতারিত করেছ। এক্ষণে তোমার কাল পূর্ণ হয়েছে, তোমাকে আমরা আইনের হস্তে অর্পণ করে দায়িত্ব হতে উদ্ধার হবো। গোয়েন্দা পুলিশের উপর তুমি যে অকারণ কলঙ্ক এনেছ আশা করি তোমার বিচারে তাহা স্খলিত হবে।

শিরীষ :—আমায় এবার রক্ষা করুন, আমি এখন সাবধান হয়ে চলবো।

ষষ্ঠ দৃশ্য

—০—

গ্রাম

কমল :—গোস্বামীমশায় আজকে একটা বড় দুঃসংবাদ — বিভাসবাবু বাঁচেন কি না। জমিদারী ও কলকাতার বাড়ী নিলেমে বিকিয়েছে। বিলাসের ও প্রাচুর্য্যের কোলে প্রতিপালিত হয়ে এই ভাগ্যবিপর্য্যয় সহ্য করা কঠিন হবে। গ্রামে যে টাকা দাদন আছে সেটা এসময়ে দিলে তাঁদিকে সাহায্য করা হবে লিখেছেন, একজন চাকরাণী মোক্ষদাকে পাঠাতে লিখেছেন।

নিতাই :—খবরটা সত্যই বুকে বিঁধলো যে। আহা! বিভাস যদি না বাঁচে, তা হলে চারিদিক যে অন্ধকার! চল আজই টাকা কটা তুলে কাল পাঠিয়ে দেওয়া যাক্।

কমল :—এখন কি গ্রামের লোকে টাকা দিতে পারবে। এবার ফসল নাই, ওরা যে টাকা দিতে পারে এমন মনে হয় না।

নিতাই :—একটা উপায় ঠাউরেছি। চল মণ্ডলদিকে দিয়ে সবাই চৌধুরীদের বাড়ী হ্যাণ্ডনোট লিখে টাকা নিইগে, পরে চৈত্র মাসে আদায় করে শোধ দেওয়া যাবে! গাঁয়ের লোকের জন্য এটা করা আর অধিক কি?

কমল :—এ বড় ভাল বুদ্ধি করেছে। দুই দিক রক্ষে হবে। আমি মোড়ল দিকে ডাকিয়েছি, ওই আসছে।

(তিনুঘোষ প্রভৃতির প্রবেশ)

তিনু :—প্রভু এ সময় টাকা না থাকলে ধার করেও দেব। টাকার জন্যে তেনাদের বিদেশে কষ্ট হবে একি কথা। চৌধুরীবাড়ী ধার করে টাকা নিয়ে আমরা নিজেই যাই। তেনাদিকে বাড়ী নিয়ে আসিগে। গাঁয়ের লোক দেখলে তেনাদের ভরসা হবে।

নিতাই :—তুমি ঠিক বলেছ তিনু, ক'জনের যাওয়াই উচিত, আমিও যাব।

কমল :—তবে আমরা তিন জনেই যাই। ময়রাদের মোক্ষদাকেও নিয়ে যেতে লিখেছেন। ওই যে আসছে।

(মোক্ষদার প্রবেশ)

কি গো মোক্ষদা দিদি, কলকাতা যাবি? সেখানে বিভাস বাবুর অসুখ।

মোক্ষদা :—দেখুন দেখি, বিভাসকে আমি কোলে করে মানুষ করেছি। শুনে অবধি মন হুহু করছে।

(বড়মার প্রবেশ)

বড়মা :—কমল, বিভাসের বড় অসুখ বাঁচে কি না। তোমরা যাবে শুনলাম, গিয়ে তাদিকে নির্ব্বান্ধব পুরী হতে নিয়ে এসো এখানে, এনে মা মঙ্গলার নির্ম্মাল্য স্নানজল দিলেই আরাম হয়ে যাবে।

নিতাই :—গেলে কি আর না নিয়ে আস্‌বো।

বড় মা :—যাই, গোবিন্দমোহিনী, বিমলকে নিয়ে বাগ্দীবৌকে ডেকে ওদের ঘর বাড়ী পরিষ্কার করিয়া রাখি। বাড়ীতে জঙ্গল লেগে গেছে ঘরের ছেলে ঘরে আসুক। সব ঠিক করে রাখিগে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ।

ক্ষ্যাপার খেয়াল

মাগো, এবার ম'লে সাহেব হব ;
জাত বিচার থাক্‌বে না আর—
যার তার সঙ্গে খানা খাব।
হ্যাট কোট-নেকটাই এটে চলবো মাগো গর্ব্বে হেটে,
বর্ম্মা থেকে সিগার এনে
চক্ষু মুদে কেবল ফুকব।

শাস্ত্রে 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম'
হিংসা, হিংস্রতা সকল কর্ম্ম—
নিরাকার ব্রহ্ম ভজ্‌তে (ওগো)
রবিবারে গির্জ্জায় যাব।

নিরাকারের উপলব্ধি
হয় মাগো প্রায়ই কম্‌তি,
তাই জানু পেতে সাকারেতে
জোড়হস্তে প্রেম মাগ্‌ব।

'জর্ডনে'র এক ফোঁটা জল
পেলে হবে জীবন সফল,
স্বর্গ আর রাজার প্রসাদ
প্রাসাদ ক'রে নিতে পার্‌ব।

অসভ্য হয় এসিয়া-বাসী—
ইংলণ্ড তার গয়া-কাশী—
'টেম্‌স' নদীর জল খাইয়ে
সভ্যখাতায় নাম লিখ্‌ব।

করি যদি খাম্‌-খেয়ালী
ন্যায় উল্‌টিয়ে অন্যায়ে চলি'
সত্য বল্‌লে কালা-আদ্‌মি
'নেটিভ' 'নিগার' গালি দিব।

শ্রীতারপদ দত্ত

খাটরার বাসুদেব

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ভাঙ্গা থানার অধীন খাটরা একখানি প্রসিদ্ধ গ্রাম। গ্রামখানি ক্ষুদ্র হইয়াও যে সকল কারণে প্রসিদ্ধতা লাভ করিয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীশ্রীবাসুদেব বিগ্রহ অন্যতম। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ গরুড়-বাহন কমলা-বাণী-পরিশোভিত কৃষ্ণপ্রস্তরময় শ্রীবিগ্রহে শিল্পী যে শিল্পচাতুর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই, বিশেষতঃ ভক্তের মনপ্রাণারাম মধুর মূর্ত্তিখানির ভিতর যে প্রত্যক্ষ জীবন্ত ভাবটী নিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহাই বা কে অস্বীকার করিবে? দূরদেশান্তর হইতে বহুলোক এই বিগ্রহখানি দর্শন করিতে আসেন এবং অনেকে ভক্তির সহিত পূজাও দিয়া থাকেন। খাটরার বাসুদেব প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া এদেশবাসীর হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস আছে। এবং ঐ প্রত্যক্ষতা সম্বন্ধে অনেক গল্পও লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়।

এই বিগ্রহখানির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তদীয় সেবক ও এদেশবাসী অনেক প্রাচীন লোকের মুখে যে প্রবাদবাণী শুনা যায়, তাহা বড়ই বিস্ময়জনক। শ্রীবাসুদেবই জানেন ঐ প্রবাদবাণীর মূলে কতটুকু সত্য নিহিত আছে। সে সম্বন্ধে আমি কোনরূপ বিচার করিতে চাহিনা। তবে এস্থলে এইমাত্র বলিতে বাধ্য হইলাম যে শ্রীশ্রীবাসুদেব বিগ্রহখানি যে সময়ের প্রতিষ্ঠিত সেই সমসাময়িক বা তৎপরবর্ত্তী কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থে উপরোক্ত বিগ্রহসম্বন্ধে কোন কথা আমি খুজিয়া পাইলাম না। যে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সহিত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলাসংসৃষ্ট রহিয়াছে, সেই বিবরণটী যে তদীয় মধুরচরিতামৃতে বা তৎসম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থে উল্লেখ নাই, ইহাও আশ্চর্য্যের বিষয় বটে। সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক্ বিগ্রহপ্রতিষ্ঠার বিবরণীর মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আমি এই প্রবন্ধ লিখিবার লোভ সম্বরণ

করিতে পারিলাম না। ঐতিহাসিকগণের বিশেষতঃ গৌরাঙ্গভক্তগণের হস্তে ইহার সত্যতা অনুসন্ধান বা সত্যতা প্রমাণের ভার অর্পণ করিয়া আমি প্রবাদ-কাহিনী লিখিতে বসিলাম।

আজ প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপ-পূর্ণশশধর শচীর দুলাল শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব যখন হরিনামের পীযূষধারায় নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে পাপতাপক্লিষ্ট জীবের হৃদয়ে শান্তি প্রদান করিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানও তদীয় শ্রীচরণরেণু স্পর্শে পবিত্রীকৃত হইয়াছিল। যখন তিনি পূর্ব্ববঙ্গে শুভাগমন করেন তখন তদীয় মাতুল শ্রীশ্রীবিষ্ণুদাস ঠাকুরও তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। বিষ্ণুদাস গৌরাঙ্গদেবের মাতুল হইলেও বাল্যসখা এবং উভয়ের মধ্যে পরম সৌহৃদ্য ছিল। গৌরাঙ্গদেব গৃহে থাকিবেন না, সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন ইহা বিষ্ণুদাস পূর্ব্বেই বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গৌরাঙ্গদেব কোন দুর্গম জঙ্গলে বা পর্ব্বতগুহায় অবস্থান করেন তাহারও নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং ভাগিনেয়কে আর দেখিতে পাইবেন না। যাঁহাকে না দেখিলে তিলার্দ্ধকাল যুগসম বোধ হয়, তাঁহার মুখখানা না দেখিয়া কিরূপে জীবনধারণ করিব, বিষ্ণুদাস ঠাকুর এই চিন্তায় ম্রিয়মান হইয়া পড়িলেন এবং গৌরাঙ্গদেব যখন যেখানে গমন করেন ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। গৌরাঙ্গদেব মাতুলের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে গৃহে ফিরিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিষ্ণুদাস কিছুতেই নিবৃত্ত হইলেন না। বরং বলিলেন, নিমাই! আমি আর গৃহে ফিরিব না। তোমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছি। আমিও সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তোমার অনুবর্ত্তী হইব। নিমাই মাতুলের বাক্যের কোন প্রতিবাদ করিলেন না।

একদিবস শ্রীগৌরাঙ্গদেব সঙ্গোপাঙ্গসহ এক ভগবদ্‌ভক্ত গৃহস্থের আলয়ে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। ভাগ্যবান্ গৃহস্থও যথোচিত অতিথি সেবা করিয়া কৃতার্থ হইলেন। এদিকে অন্তের অলক্ষ্যে লীলাময়ের এক বিচিত্র লীলার সূত্র হইল। বিষ্ণুদাস ঠাকুর ভোজনান্তর মুখশুদ্ধি করিবার সময় গৃহস্থের প্রদত্ত হরিতকী হইতে কিয়দংশ ভবিষ্যতের জন্য বস্ত্রান্তরে লুকাইয়া রাখিলেন। পরদিবস দ্বিপ্রহরে অন্যকোন স্থানে ভোজনান্তর যখন মুখশুদ্ধির প্রয়োজন হইল, তখন বিষ্ণুদাস পূর্ব্বদিনের সঞ্চিত সেই হরিতকী বস্ত্রান্তর হইতে বাহির করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের হস্তে প্রদান করিলেন। গৌরাঙ্গদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, মাতুল! হরিতকী কোথায় পাইলে? বিষ্ণুদাস বলিলেন,—গতকল্য আমরা যে গৃহস্থের আলয়ে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলাম সেই গৃহস্থের প্রদত্ত হরিতকী হইতে কিয়দংশ ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দিয়াছিলাম।

গৌরাঙ্গদেব বলিলেন,—মাতুল! তুমি সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য ব্যস্ত হইয়াছ। কিন্তু তুমি তো সন্ন্যাস গ্রহণের অধিকারী নহ।

তোমার সন্ন্যাস হইতে পারে না। এখনও তোমার হৃদয়ে সঞ্চয়বুদ্ধি বর্ত্তমান রহিয়াছে। তুমি কি প্রকারে মর্কট বৈরাগ্য লইয়া ত্যাগীর ধর্ম্মপালন করিবে? কেবল শিখাসূত্র পরিত্যাগ করিয়া ডোর-কৌপীন ধারণ করিলে কিংবা জটাজুটমণ্ডিত মস্তক বিভূতিভূষিত কলেবর হইলেও সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। লোক দেখান কপটাচারী সন্ন্যাসী সাজিয়া নরকের পথ পরিষ্কার করিও না। আবার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিয়াও তোমার কোন লাভ নাই। যাও, গৃহে যাও, সৎগৃহী হইয়া ভগবৎ সাধনায় মন প্রাণ সমর্পণ কর। শ্রীশ্রীদয়াল ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তোমায় দয়া করিবেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বাক্যে বিষ্ণুদাস ঠাকুরের মোহ ভাঙ্গিল। নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। এবং হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! বলিয়া ভূমিতলে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন। শ্রাবণের ধারার ন্যায় নয়নজলে গণ্ড ভাসাইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থল সিক্ত করিতে লাগিল।

কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গদেব ধূলি ধূসরিত বিষ্ণুদাসকে তুলিয়া লইলেন এবং উত্তরীয় বস্ত্রাঞ্চলে নয়নজল মুছাইয়া গাঢ়ালিঙ্গন পূর্ব্বক বলিলেন, মাতুল! অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন কলিকলুষিত মানবের একমাত্র গতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র! যিনি গোলক বিহার ছাড়িয়া বসুদেবের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও যশোদার অঞ্চলের নিধি হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে বিরাজিত, সেই কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ গরুড়বাহন বাসুদেব রূপে তোমার গৃহে নিত্য বিরাজ করিবেন। যাও মাতুল! আড়িয়ল খাঁ নদের তীরে মুকডোবা নামক গ্রামে গিয়া আশার বুক

বাঁধিয়া বাস কর। প্রেমভক্তি সরোবরে নিত্য স্নাত হইয়া শ্রীকৃষ্ণে মনপ্রাণ সমর্পণ কর।

আমি উপযুক্ত সময় আবার তোমার সহিত একদিন মিলিব।

বিক্রমপুরের কোন এক সমৃদ্ধশালী ভূম্যধিকারীর * গৃহের নিকট এক নিষ্ঠাবান্ ভগবদ্‌ভক্ত দরিদ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ব্রাহ্মণ প্রত্যহ ব্রহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিয়া উক্ত ভূম্যধিকারীর বাটীর সংলগ্ন দীঘির জলে স্নান তর্পণাদি সমাপন পূর্ব্বক, দীঘির কোন নির্দ্দিষ্ট প্রশস্ত সোপানের উপর উপবিষ্ট হইয়া ভগবদারাধনায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিতেন। ব্রাহ্মণ ভগবৎ প্রেমসাগরে মনপ্রাণ ডুবাইয়া গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইতেন।

আজ শত যত্ন চেষ্টাতেও ব্রাহ্মণের মনপ্রাণ আর সেই প্রেমসাগরে ডুবিতেছে না। কোথা হইতে এক অনিন্দ্যসুন্দর নবনীরদকান্তি চঞ্চল বালক আসিয়া তাঁহার ধ্যান ধারণার বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে। ব্রাহ্মণ যখনই নয়ন মুদ্রিত করেন তখনই দেখেন বালক তাঁহার আরাধ্যদেবের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। ব্রাহ্মণের আর ধ্যান হয় না। অমনি চক্ষু উন্মিলন করিয়া দেখেন, সেই মনচোরা চঞ্চল বালক সম্মুখে নৃত্য করিতে করিতে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ অন্তরে বাহিরে শুধু ঐ মুনিজন-মনোমোহন মধুর মূর্ত্তিখানি দেখিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য বালক অদৃশ্য হইলে ব্রাহ্মণ ব্যাকুল হইয়া কাতর প্রাণে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন :—

"নয়ন মুদি বা চাহিয়া থাকি,
অথবা যেদিকে ফিরাই আঁখি,
ভিতরে বাহিরে যেন হে দেখি ;
তব রূপ মনোহর ॥"

এই বালক কে ? সংসারের সকল ভালবাসা কুড়াইয়া এক করিয়া জগদারাধ্যদেবের শ্রীচরণে অঞ্জলি দিব বলিয়া জীবনের সায়ংকালে দাঁড়াইয়াছিলাম। আমার সারা জীবনের কুড়ান ধন এ বালক কাড়িয়া লইল কেন ? আবার আমি এ বালকের মোহনমূর্ত্তির মায়ায় বিজড়িত হইয়া আপনাকে ভুলিয়া যাইতেছি কেন ? এ বালক কে ? বালক-গতপ্রাণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মনচোরা বালককে ঠিক [illegible]নিতে না পারিয়া সন্দেহ-দোলায় দুলিতে লাগিলেন।

যে লীলাময়ের বিচিত্র লীলায় ব্রাহ্মণ মনচোরা বালককে চিনিয়াও চিনিতে পারিতেছিলেন না, সেই লীলাময়ের কৃপাবায়ুহিল্লোলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের হৃদয়াকাশ হইতে সন্দেহ-মেঘ বিদূরিত হইল। ব্রাহ্মণ দেখিলেন এ বালক আর কেহই নহে, যে বালক একদিন ব্রজের দুলাল যশোদার অঞ্চলের নিধি সাজিয়া যমুনাপুলিনে বংশীরবে ব্রজগোপিকা-গণকে পাগল করিয়াছিল, আজ আবার সেই বালক তাঁহার হৃদয়ে উঁকিঝুঁকি দিয়া তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। কৃপাময়ের অপার করুণা স্মরণ করিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রেমাশ্রু-পাতে সিক্ত হইয়া সেই অরূপের মধুর রূপরাশি হৃদ্‌কমলে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

হঠাৎ ব্রাহ্মণ শুনিতে পাইলেন, কে যেন বলিতেছে, "ব্রাহ্মণ! আমি কে চিনিতে পারিলে কি ? ঐ দিঘীর জলে আবার আমাকে নিরীক্ষণ কর এবং মুকডোবা গ্রামে যাইয়া আমার পরমভক্ত বিষ্ণুদাস ঠাকুরকে বল, আমাকে লইয়া গিয়া তাঁহার গৃহে প্রতিষ্ঠা করুক। আমি তাঁহার আলয়ে অবস্থান করিব।" ব্রাহ্মণের ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি নয়ন উন্মিলন করিয়া দেখেন দিঘীর মধ্যস্থলে সচ্ছসলিলরাশি ভেদ করিয়া শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ গরুড়বাহন কমলারাণী পরিশোভিত যোগীজন মনোমোহন শ্রীশ্রীবাসুদেব বিগ্রহ মধ্যাহ্নকালীন নীলকমল সদৃশ বিরাজ করিতেছেন। ব্রাহ্মণ দেবজনবাঞ্ছিত মোহন মূর্ত্তিখানি নয়ন ভরিয়া দেখিয়া জন্মজীবন সার্থক করিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই মূর্ত্তি কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

মধ্যাহ্নকাল। বিষ্ণুদাস ঠাকুর পূতসলিল আড়িয়লখাঁ নদে স্নানান্তর সিক্তবস্ত্রে ভগবদ্‌গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে গৃহাভিমুখে ফিরিতেছেন, এমন সময় লোলচর্ম্ম পলিতকেশ এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দ্রুতপদবিক্ষেপে আসিয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন। বিষ্ণুদাস ঠাকুর "নারায়ণ!" "নারায়ণ!" বলিয়া পশ্চাৎদিকে সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং মহা অপরাধীর ন্যায় বিনম্রবচনে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্!

* কেহ বলেন এই ভূম্যধিকারী ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বারভূঞার অন্যতম ভূঞা চাঁদ রায়, কেদার রায়। ইতিহাস হিসাবে ইহা সম্ভবপর হইতে পারে কি ? আবার কেহ বা বলেন এই ভূম্যধিকারী চাঁদ রায় কেদার রায়ের পূর্ব্বপুরুষীয় কোন ব্যক্তি। মোটের উপর ঐ ভূম্যধিকারী কে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। বর্ত্তমানে ইহার প্রমাণ কিছুই নাই।

আপনি বয়োঃজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণসন্তান হইয়া কেন এ অকিঞ্চনের পদতলে পড়িয়া আমাকে অপরাধী করিতেছেন? বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন, মহাত্মন্! আপনি পরম ভাগবত। ভগবৎ কৃপায় আপনাকে জানিতে পারিয়াছি। আপনার স্থায় মহাপুরুষের মুখেই ঈদৃশবাক্য শোভা পায়। জানিনা আমি কোন পুণ্যফলে আপনার শ্রীচরণ স্পর্শ করিতে সমর্থ হইলাম। আজ আমার জন্মজীবন সার্থক হইল। ব্রাহ্মণ এই বলিয়া আত্মপরিচয়সহ পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনা বিষ্ণুদাস ঠাকুরের নিকট বর্ণনা করিলেন।

পাঠক মহোদয়! বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন এই বৃদ্ধই বিক্রমপুরের সেই ব্রাহ্মণ।

বিষ্ণুদাস ভূপতিত ব্রাহ্মণকে সাদরে তুলিয়া লইলেন এবং তাঁহার চরণধূলি গ্রহণপূর্ব্বক গাঢ়ালিঙ্গন করিলেন। প্রেমাশ্রুপাতে উভয় উভয়কে সিক্ত করিয়া স্বর্গীয় সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

বিষ্ণুদাস ঠাকুর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সঙ্গে যথাসময় বিক্রমপুরের সেই দিঘীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কোথাও বাসুদেব বিগ্রহ না দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। এমন সময় শুনিতে পাইলেন কে যেন অলক্ষ্যে থাকিয়া বলিতেছে,—"বিষ্ণুদাস! রোদন করিও না। দিঘির জলে নামিয়া ডুব দাও, আমাকে পাইবে।" আনন্দে বিষ্ণুদাসের হৃদয় নাচিয়া উঠিল। জয় বাসুদেব! জয় বাসুদেব! বলিয়া তিনি দিঘির জলে ঝম্পপ্রদান পূর্ব্বক ডুব দিলেন। লীলাময়ের অপূর্ব্বলীলা কে বুঝিতে পারে? বিষ্ণুদাস জলে ডুব দিবামাত্র বুঝিতে পারিলেন, বাসুদেব বিগ্রহ তাঁহার মস্তকোপরি ন্যস্ত। শ্রীবিগ্রহসহ বিষ্ণুদাস তীরে উঠিলেন এবং ভাবে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভগবানের এই বিচিত্রলীলা দেখিতে ক্রমে লোকসমাগম আরম্ভ হইল। দিঘির মালিক ভূম্যধিকারী মহাশয়ও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বহু সমাদরে বিষ্ণুদাস ঠাকুরকে বিগ্রহসহ নিজালয়ে লইয়া গেলেন এবং বিগ্রহ স্থাপনপূর্ব্বক তথায় বাস করিবার জন্য তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিষ্ণুদাস ঠাকুর কিছুতেই সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। ভূম্যধিকারী মহাশয় যখন দেখিলেন, দরিদ্র ব্রাহ্মণ সামান্য অনুরোধ বাক্যে স্বীকৃত হইলেন না তখন প্রচুর অর্থের প্রলোভনে তাঁহাকে বশীভূত করিতে যত্নবান্ হইলেন। কিন্তু যখন সে চেষ্টাও বিফল হইল, তখন নানা কৌশল বিস্তার করিয়া বিষ্ণুদাসকে নিজালয়ে আবদ্ধ রাখিলেন। বিষ্ণুদাস বিপদবারণ নারায়ণকে স্মরণ করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

নিশি অবসান প্রায়। বিনিদ্রিত ভূম্যধিকারী এমন সময় স্বপ্ন দেখিলেন, যেন স্বয়ং বাসুদেব রোষকষায়িত লোচনে তাঁহাকে বলিতেছেন, "আমাকে রাখিলে তোমার মঙ্গল হইবে না; তুমি এখনই বিষ্ণুদাসের হস্তে আমাকে প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে বিদায় দাও।" ভয়বিহ্বল ভূম্যধিকারী শয্যা ত্যাগ করিয়া বিষ্ণুদাসের চরণতলে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। এবং বাসুদেব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সমস্ত ব্যয় ও নিত্যসেবার জন্য দেবোত্তর ভূমি প্রদানপূর্ব্বক বহু সমাদরে তাঁহাকে গৃহে পৌছিয়া দিলেন।

বিষ্ণুদাস গৃহে আসিয়া শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করিলেন বটে, কিন্তু এ শুভ অনুষ্ঠানেও যেন শান্তি অনুভব করিতে পারিতেছেন না। হৃদয় যেন কিসের অভাবে শূন্য শূন্য বোধ হইতে লাগিল। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ভবিষ্যৎবাণী "তোমার গৃহে বাসুদেব নিত্য বিরাজ করিবেন।" ইহা সফল হইল বটে, কিন্তু এ শুভ অনুষ্ঠানে শ্রীগৌরাঙ্গদেব কোথায়? হা ভগবন্! বাসুদেব! আমি তাঁহারই আদেশে এস্থানে আশায় বুক বাঁধিয়া অবস্থান করিতেছি। কাঙ্গালের সর্ব্বস্বনিধি! দয়াল ঠাকুর! যদি দয়া করিয়া নিজগুণে এ কাঙ্গালের ভাঙ্গা গৃহে আসিয়াছ, তবে এ অধম পতিতকে আর কাঁদাও কেন? ঠাকুর! তোমার শ্রীগৌরাঙ্গকে মিলাইয়া দাও। দীনহীনের মনোবাসনা পূর্ণ কর।

সারানিশি কাঁদিতে কাঁদিতে নিশি অবসানে বিষ্ণুদাস নিদ্রার কোলে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। আগামী কল্য শুভমুহূর্ত্তে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা। সমস্ত আয়োজন। অরুণ দেব এখনও পূর্ব্বাকাশে প্রকাশিত হন নাই। হঠাৎ নিদ্রিত বিষ্ণুদাসের কর্ণে "মাতুল! মাতুল!" ধ্বনি প্রবেশ করিল। সে অমৃতসিঞ্চনে বিষ্ণুদাস আনন্দে রোমাঞ্চিত হইলেন। বাপরে! বাছারে! অন্ধের নয়ন-মণি! কাঙ্গালের ধন গৌরাঙ্গ আমার! কোলে আয়রে! বলিতে বলিতে বিষ্ণুদাস ঠাকুর পাগলের ন্যায় ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, কষিতকাঞ্চনবরণ আনন্দের খনি শ্রীগৌরাঙ্গদেব

সাঙ্গোপাঙ্গোসহ তারকা পরিবেষ্টিত পূর্ণশশধরসম অঙ্গনে দণ্ডায়মান। কৃষ্ণায় নমঃ, যাদবায় নমঃ, মাধবায় নমঃ, হরয়ে নমঃ, বাসুদেবায় নমঃ ধ্বনিতে প্রেমভক্তির বন্যা ছুটিল। আজ মুকডোবা গ্রাম মহাতীর্থে পরিণত হইল। এ প্রেমভক্তির তরঙ্গে ঝাপ দিয়া কত পাপী তাপীর জ্বালা মিটিল। শ্রীবিগ্রহ মহামহোৎসবে প্রতিষ্ঠিত হইল।

বিষ্ণুদাস ঠাকুরের পরলোক গমনের পর তদীয় বংশধরগণ দীর্ঘকাল মুকডোবা গ্রামে থাকিয়া বাসুদেব বিগ্রহের সেবা করিয়া আসিতেছিলেন। কালক্রমে লীলাময়ের আর এক বিচিত্রলীলার অভিনয় আরম্ভ হইল। যখন বিশালভাণ্ডোদর আড়িয়ল খাঁ নদের করালকবলে মুকডোবা গ্রামখানির কতকাংশ কবলিত, তখন বাসুদেববাটীও গ্রাসোন্মুখ দেখিয়া তদীয় সেবকগণ শ্রীমূর্ত্তিসহ গ্রাম পরিত্যাগ করিলেন। সেবকগণের মধ্যে যাঁহারা বার আনা অংশের মালিক তাঁহাদের বসতবাটী বাসুদেব মন্দিরের পূর্ব্বে আড়িয়ল খাঁ নদের গর্ভে বিলীন হওয়ায় তাঁহারা বাসুদেব বিগ্রহ রাখিয়া পূর্ব্বেই খাটরায় আসিলেন। সমাগত ব্রাহ্মণগণকে খাটরার সরকার বাবুগণ সাদরে আশ্রয় প্রদান করিলেন। কিছুদিন পরে চারি আনা অংশের মালিক সেবকগণ বিগ্রহসহ আবদুলাবাদের চৌধুরী জমিদারগণের জমিদারীভুক্ত হাটবাড়িয়া নামক গ্রামে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। এই চারি আনা অংশের সেবক ব্রাহ্মণগণ আবদুলাবাদের জমিদারগণের গুরুবংশীয়। সুতরাং তাঁহারা যে জমিদারগণের নানাপ্রকার সাহায্য পাইবেন ইহাতে আর বিচিত্র কি ?

বাসুদেব বিগ্রহ পুনরায় কোথায় স্থাপিত হইবে ইহা লইয়া বার আনা ও চারি আনা অংশের সেবকগণের মধ্যে ক্রমে বিবাদের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। ক্রমে তাহা শাখা প্রশাখায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া প্রকাণ্ড বিষবৃক্ষে পরিণত হইল। এক পক্ষের সাহায্যকারী খাটরার সরকার বাবুগণ ও অন্যপক্ষের সাহায্যকারী আবদুলাবাদের চৌধুরী জমিদারগণ। উভয় ভূম্যধিকারীর মধ্যে কাহারও লাঠিয়াল, অর্থ, ও লোকজনের অভাব ছিল না। সুতরাং প্রজ্বলিত বহ্নিতে ঘৃতাহুতি দিবার বিন্দুমাত্রও অভাব হইল না। সেবকগণ কিছুকাল ঠাকুরের সেবা ভুলিয়া কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইলেন। এদিকে বাসুদেব ঠাকুরও চারি আনা অংশের সেবকগণের চতুরতায় আবদুলাবাদের চৌধুরী বাড়ী লুকাইয়া থাকিয়া রহস্য দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে শ্রাদ্ধ আদালত পর্য্যন্ত গড়াইল। যাহা হউক অনেক ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার পর সেবকগণের ঘটে পুনরায় সুবুদ্ধি আসিল। কোন ন্যায়পরায়ণ বিচারকের বুদ্ধিকৌশলে বিবাদবিসম্বাদ মিটিয়া গেল।

উভয়দলের সেবকগণ আবার মিলিত হইয়া খাটরায় আসিলেন এবং সরকার বাবুগণের সাহায্যে তথায় বাসুদেব বিগ্রহ স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার সেবায় মনোনিবেশ করিলেন।

খাটরার যেস্থানে বর্ত্তমানে বাসুদেব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত, ঐস্থানে পূর্ব্বে নীলের কুঠি ছিল বলিয়া ঐস্থান কুঠিবাড়ী বা কোঠাবাড়ী নামে খ্যাত। এখনও নীলকুঠির ইষ্টকময় চিহ্নসমূহ অতীতের স্মৃতি বহন করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে খাটরায় যে বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ বাসুদেবের সেবায় নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বিষ্ণুদাস ঠাকুরের বংশধর। নানাকারণে ঐ বংশের কেহ কেহ অন্যত্র যাইয়াও বাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

বিষ্ণুদাস ঠাকুরের বংশধরগণের মধ্যে অনেক সংস্কৃতশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া এদেশে সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তারের সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহাদের জ্ঞানগর্ভময় পাণ্ডিত্যের অনেক কাহিনী এখনও সুধীসমাজে শুনিতে পাওয়া যায়।

পুত্রবৎ ভরণপোষণ করিয়া শিষ্যগণকে বিদ্যাপ্রদান করা ইহাদের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ছিল। এখন আর সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। বিষ্ণুদাস ঠাকুরের বংশধরগণ শুধু পাণ্ডিত্যের জন্য নহে, ইহারা স্বধর্ম্মপরায়ণ নিষ্ঠাবান্ সাধু ব্রাহ্মণ বলিয়া চিরদিন এদেশবাসীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছেন।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র গুপ্ত।

বিধির নবসৃষ্টি

তোমায় ভাল নাহি বেসে
বিদ্রোহ সই মনের দেশে
কোনো কাজে মন না বসে পাইনে কোথাও শান্তি
ভালবাসার জ্বালা কত
বিদায় কালে হৃদয় ক্ষত
প্রেমটা শুধু সত্য ভাবি—বাকী সবই ভ্রান্তি

নইলে তোমা চলে বা কই
না দেখ্‌লেও পাগল যে হই
থাক্‌লে কাছে নিতি বিবাদ সই না তব দৃষ্টি
জ্বলি পুড়ি বুক্‌টি জুড়াই
ছুঁড়ে ফেলি আবার কুড়াই
গরল সুধায় তৃপ্তি ক্ষুধায় বিধির নব সৃষ্টি।

শ্রীকালিদাস রায় বি, এ।

ডাক্তার (গল্প)*

শরতের একটা দিনে দূরবর্ত্তী গ্রাম থেকে সহরে ফিরে আসবার পথে ঠাণ্ডা লেগে আমি পীড়িত হয়ে পড়লাম। বর্ষাতের জোর তাই সহরে এসে জ্বরটা হ'ল। ডাক্তার ডেকে পাঠালাম। আধঘণ্টার ভিতরেই তিনি এসে হাজির হ'লেন—একহারা পাতলা চেহারা, কালো কালো চুল, খুব ঢেঙাও নন খুব বেঁটেও নন। তিনি এসেই মামুলী ধরণের ঔষধপত্রের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন—একটা মাষ্টার্ড প্ল্যাষ্টার (mustard plaster) লাগাতে বল্লেন। খুব কায়দা ক'রে—একটু শুক্‌নো কাশি কেশে আর অন্য দিকে তাকিয়ে—পাঁচ রুবলের নোটটা আস্তিনের ভিতর গুঁজে দিলেন। তার পর বাড়ী যাবার জন্য উঠে, একটু থমকিয়ে দাঁড়ালেন, কি মনে করে আবার তখনই বসে পড়ে গল্প করতে সুরু করে দিলেন। জ্বরটাতে আমাকে কিছু কাবু করে ফেলেছিল—রাত্রিটা বিনিদ্রভাবেই কেটে যাবে তারই [illegible] হচ্ছিল, এমন সময় দু'এক ঘণ্টা খোস গল্পের সম্ভা[illegible] একটু আরাম বোধ করতে লাগলাম। চা দিয়ে গেল; [illegible] ক্তারটী সঙ্কোচের বাধ' কাটিয়ে মাঝে মাঝে কথা[illegible] জোর দিয়ে আর মিষ্টি মিষ্টি রসান দিয়ে আসর বেশ [illegible] ল্লেন।

[illegible] অনেক তাজ্জব ঘটনাই ঘটে থাকে—এই দেখুন না, কারু সঙ্গে অনেক দিন ধরে বন্ধুভাবে বাস করেও আপনি তাকে প্রাণের কথাগুলি খুলে বলতে পারলেন না; আবার এধারে কারু সঙ্গে আলাপ হবারও তর্‌ সয় না, অমনি আপনি আপনার মনের অর্গল খুলে দিয়ে আপনার যত কিছু গুপ্ত কথা উচ্ছ্বসিতভাবে বলে ফেল্লেন; তিনিও হয়তো তাই করলেন। জানি না কি করে আমি ডাক্তারের এত অন্তরঙ্গ হ'য়ে পড়লাম!—যাই হোক্‌, তিনি একটা চমৎকার গল্প বল্লেন; সেটা তাঁরই কথায় আপনাদিগকে শুনিয়ে দিই।

খুব ধীর কাঁপা সুরে (বেরজভের খাঁটী নস্য ক্রমাগত ব্যবহার কল্লে যা হয়) তিনি বলতে লাগলেন—"আপনি এখানকার জজসাহেব পাবেল লুকিচকে জানেন না?...ওঃ জানেন না বুঝি তাঁকে?...যাক্‌ একই কথা। (একবার গলা ঝেড়ে নিলেন আর চোখটা একটু মুছে নিলেন)। "আচ্ছা,—বেশ ঠিক ঠিক বলতে হ'লে ঘটনাটা লেণ্টের (Lent) সময়ই ঘটেছিল—তখন বরফ গলার সময়। আমি তাঁরই ঘরে—এই জজ সাহেবের, বুঝেছেন?—তাঁরই ঘরে বসে প্রেফারেন্স (Preference) তাস খেলছিলাম। আমাদের জজটা বড্ড ভাল মানুষ—প্রেফারেন্স খেলায় ভারি ঝোঁক তাঁর! হঠাৎ (হঠাৎ কথাটা ডাক্তারের বড় পছন্দ সই ছিল—যখন তখন তিনি কথাটার ব্যবহার

* [illegible] District Doctorএর অনুবাদ।

করুতেন) তারা বল্লে কি আমাকে, "ডাক্তার বাবু, আপনাকে একটা লোক খুঁজছে। আমি বল্লাম—"কি চায়?"

"আপনার জন্যে একটা চিঠি নিয়ে এসেছে—রোগীর কাছ থেকে।"

'আচ্ছা দাও'।

রোগীর কাছে থেকেই বটে—বেশ,…বুঝছেন?—এই হোলো আমাদের জীবিকা।…জিনিষটা হচ্ছে এই। একজন বিধবা ভদ্র মহিলা লিখচেন, "আমার মেয়েটী মারা যায় বুঝি। ভগবানের দোহাই, আপনাকে আসতে হবে। আপনার জন্যে ঘোড়া পাঠিয়ে দিয়েছি।" বেশ, ভাল কথা। কিন্তু তাঁর বাড়ী হ'ল সহর থেকে বিশ মাইল দূরে, তাতে দুপুর রাত্রি, আর রাস্তার অবস্থা এমন যে—। আর তিনি গরীবও বটেন, এতে দু' রুবলের বেশী আশা করা যায় না—তাও গভীর সন্দেহের বিষয়; হয়তো রুবলের বদলে এক থলে যই কিম্বা খানিকটা কাপড় গছিয়ে দেবেন। যা হোক্—কর্ত্তব্য!—বুঝছেন, কর্ত্তব্যটা সকল জিনিবের আগে—একটা প্রাণীর জীবন যাচ্ছে হয় তো!—ক্যালোপিনকে আমার হাতের তাস দিয়ে বাড়ী এলাম। চেয়ে দেখি—একটা রদ্দি ট্র্যাপ (গাড়ী) সিঁড়ির গোড়ায়—আর মোটা, খুব মোটা, আর ঘন লোমবিশিষ্ট দুটা চাষী ঘোড়া। সম্মান দেখাবার উদ্দেশ্যে টুপিটি সরিয়ে নিয়ে কোচম্যান বসে আছে।—বেশ…স্বগত ভাবলাম, বন্ধু, গতিক তেমন সুবিধে না, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এরা টাকায় গড়াগড়ি দেয় না'—আপনি হাঁসছেন? তা আপনাকে বলতে কি, আমার মতন গরীব লোককে সব দিক্‌ই ভেবে দেখতে হয়…কোচম্যানটা যদি রাজপুত্তুরের মত কোচবক্সে বসে থাকে, আর টুপীটা ছোঁবার নামও না করে, চাই কি, যদি দাড়ীর আড়ালে ঘৃণাব্যঞ্জক দু' একটা ছবিই নিক্ষেপও করে, আর চাবুকটা দিয়ে সপাসপ একবার শব্দ করে দেয়—তো আপনি বাজি রাখতে পারেন, দুরুবল আপনার বাঁধা। কিন্তু এর সে-চেহারাই নয়। যাক্, ভাবলাম এর আর চারা নেই; কর্ত্তব্যটা হচ্ছে সকলের আগে। নেহাত দরকারী কতকগুলো জড়িপট্টা ওষুধ পত্র বেঁধে নিয়ে পড়লাম বেরিয়ে। বিশ্বাস হবে কি? কোনও রকমে সেখানে গিয়ে পঁহুছই—রাস্তাটা তো একেবারে জাহান্নমী, বরফ, নদী, স্রোত আর ভাঙ্গা বাঁধের জলে সব একাকার। যাক্, পৌছান তো গেল—। একটা ছাওয়ান কুটীর, জানালায় একটী আলো জ্বলছিল—আমার প্রতীক্ষায়। একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক এসে বল্লে—'বাঁচান তাকে, বুঝি বা সে মরে'। আমি বলিলাম, 'ভাববেন না, ভাববেন না—রোগী কোথায়?' 'এই এধারে আসুন'। দেখলাম একটী তক্‌তকে পরিষ্কার ছোট্ট ঘর, কোণে আলো জ্বল্‌ছে, বিছানায় কুড়ি বছরের একটী মেয়ে,—ঘোরে পড়ে আছে, গায়ে যেন খৈ ফুটছে, নিশ্বাস ভারি—জ্বর আর কি! আর সেখানে বসে দুটী মেয়ে, ওরই বোন, চোখে জল। তা'রা বল্লে, 'কাল ভাল ছিল, ক্ষিদেও ছিল খুব, আজ সকালে বল্লে, মাথা ধরেছে, তারপর হঠাৎ বিকেলে, এই তো দেখ্‌চেন।" আমি বল্লাম, 'না না, আপনারা এত ব্যস্ত হবেন না'। জানেন তো আপনি ডাক্তারের কর্ত্তব্য—কি করবো বিছানায় গিয়ে তার একটু রক্ত মোক্ষণ করলাম, মাষ্টার্ড প্লাষ্টারের ব্যবস্থা করে একটা ওষুধ দিলাম। একবার মুখপানে তাকালাম,—বুঝলেন, একবারটী তাকালাম—আপনার গা ছুঁয়ে বল্‌ছি—এমন মুখ আর আমি দেখিনি—এই এক কথায় বল্‌তে গেলে, নিখুঁত সুন্দরী। ভারি দয়া হোল—এই সুঠাম আকৃতি, এমন চোখ—যাক্, ভগবানের কৃপায় একটু যেন তাকে ভাল বলে বোধ হল, মনে হ'ল একটু জ্ঞানও হ'ল বুঝি, একবার চেয়ে দেখ্‌লে, একটু ক্ষীণ হাসি হাসলে, মুখের উপর একবারে হাত বোলালে—তার বোনেরা তার দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করলে—'আছ কেমন?' 'ভাল আছি' বলেই সে পাশ ফিরলে। চেয়ে দেখলাম, ঘুমিয়ে পড়েছে। বোনদুটীকে বল্‌লাম, 'রোগিনীকে এখন আর বিরক্ত করবেন না—চলুন ঘর থেকে বেরিয়ে যাই।' আমরা চুপি চুপি পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলাম, ভিতরে দাই রইল, যদি বা কিছু দরকার টরকার হয়। বস্‌বার ঘরে টেবিলের উপর সামোভার ছিল, আর এক বোতল মদ……আমাদের ব্যবসায় এ ব্যতিরেকে চলেই না। আমাকে ওরা চা দিয়ে বল্লে যে রাত্রিটা সেখানে আমাকে থাকতে হবে। আমি রাজী হ'লাম, আর উক্ত রাত্রে যাবই বা কোথা? বৃদ্ধটি গুমরে গুমরে কাঁদছিলেন। আমি বল্লাম, ও কি! 'আপনি অমন কচ্ছেন কেন? ও বাঁচবেই, আপনি ভাববেন না, যান আপনি একটু বিশ্রাম

করুন গিয়ে—ছটো বাজে। 'যদি ভাল মন্দ কিছু হয় তো আমাকে জাগাবেন তো?' 'হাঁ, হাঁ, যান'। তিনি তো গেলেন, মেয়েরাও গেল, বৈঠকখানায় আমার বিছানা ক'রে দিয়ে গেল। ভাল, আমি তো শুলাম, কিন্তু ক শর্য্য! এত ক্লান্তি সত্বেও চক্ষে পাতায় এক হল না। মগজ থেকে আর রোগিনীকে সরাতেই পারি না—শেষে আর পারলাম না, উঠলাম। নিজে নিজেই বলে উঠলাম, নাঃ একবার গিয়ে দেখতে হ'চ্ছে, রোগিনী কেমন আছে।—পাশের ঘরেই তো! বুঝেছেন, আমি উঠলাম ধী-রে ধী-রে, আমার বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগল। চেয়ে দেখি ভিতরে দাই মাগী হাঁ করে ঘুমুচ্ছে, আর মাগীর নাকের ডাকে পাড়া যেন মাত! রোগিনীর মুখ দরজার দিকে ছিল—হাতগুলি ছড়ান, আহা বেচারী! কাছে গেলাম, হঠাৎ চোখ মেলে এক দৃষ্টিতে সে আমার দিকে চেয়ে রইল! বলে উঠল, 'কে? কে?' আমি তো বড়ই গোলে পড়লাম। আমি বল্লাম, 'ভয় খাবেন না, আমি,—আমি ডাক্তার, দেখ্তে এসেছি, কেমন আছেন?' 'আপনি ডাক্তার'—'হাঁ ডাক্তার, আপনার মা সহর থেকে আমাকে ডাকিয়ে পাঠিয়েছেন, আপনাকে ওষুধ দিয়েছি, এখন একটু আপনি ঘুমুন দেখি, ভগবানের কৃপায় দু এক দিনে আপনি উঠে হেঁটে বেড়াতে পারবেন'। 'ডাক্তার বাবু, আমাকে মরতে দেবেন না......দোহাই আপনার।' 'এ আপনি কি বক্ছেন?—ভগবান আপনাকে বাঁচাবেন।' ভাবলাম নিশ্চয়ই আবার জ্বর—হ'য়েছে—নাড়ী টিপলাম, হাঁ তাই তো জ্বরই তো বটে!

"আমার দিকে একবার চেয়ে, আমার হাত তার হাতে নিয়ে সে বললে—'কেন মরতে চাইনা, সে কথা আপনাকে আজ বলবো! এখন আমরা একলা আছি। আপনি কাউকেও...না, একজনকেও না...শুনুন।' আমি একটু ঝুঁকলাম; ঠোঁট দুটো সে আমার কাণের কাছে আনলে—তার চুল আমার গণ্ড স্পর্শ করতে লাগল—সত্যি বলছি! আমার মাথা ঘুরতে লাগল—তারপর খুব চুপি চুপি কি বল্লে কিছুই বুঝতে পাল্লাম না...হায়, হায়, ও প্রলাপ বক্ছে! সে কিন্তু ফিস্ ফিস্ করে বলে যেতেই লাগল, যেন রুষ ভাষার কথাই নয়। তার পর বালিশে একবার মাথাটা কেঁপে উঠল—আমার দিকে তর্জ্জনী উদ্যত করে বল্লে—মনে রাখবেন, ডাক্তারবাবু, কারু কাছেই নয়...। আমি তাকে ঠাণ্ডা ক'রে কিছু পান করতে দিয়ে, দাইটাকে উঠিয়ে দিলাম, তার পর চ'লে এলাম।"

এই সময় ডাক্তার খুব জোরে একবার নস্য নিয়ে খানিকক্ষণ ভোঁ হ'য়ে বসে রইলেন। ফের তিনি বল্তে লাগিলেন।

"যাক্, নিরাশার সহিত দেখলাম যে রোগী একটুকুও ভাল হয়নি। ভেবে ভেবে ঠিক করলাম যে এখানে আমাকে থাকতেই হবে—তা অন্যান্য রোগী পড়ে থাকলেও আর আপনি তো জানেন রোগী ছেড়ে কোথাও থাকাও ভাল নয়, তাতে পশার একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু একতো রোগিণীর অবস্থা ভয়ের, দ্বিতীয়তঃ সত্যি কথা বলতে গেলে তার দিকে আমার একটা টান হয়েছিল। আর সমস্ত পরিবারটাকেও আমার বড্ড ভাল লেগেছিল। যদিচ তাদের আর্থিক অবস্থাটা মোটেই ভাল নয়, তথাচ তারা বেশ ভদ্র সভ্য ভব্য পরিবার;—মেয়েদের পিতা একজন গ্রন্থকার ছিলেন। দরিদ্র অবস্থাতেই মারা গিয়েছিলেন বটে কিন্তু মেয়েদিগকে সুশিক্ষিত করে যেতে পেরেছিলেন, আর বিস্তর কেতাবও রেখে গিয়েছিলেন। রোগীনীর তত্বাবধান খুব ভাল করে করবার জন্যই হোক্ আর যে কোন কারণেই হোক, আমি যেন তাঁদেরই একজন এই রকম ব্যবহার তাঁরা করতে লাগলেন। এ ধারে রাস্তা ঘাটের আরও দুর্গতি হয়েছে...খবরাখবর একরকম তো বন্ধ ..এমনকি অতি কষ্টে সহর থেকে ওষুধ আনান হতে লাগল।

পীড়িতার কিন্তু সারবার নামই নেই। (ডাক্তার একটু থামলেন)। জানি না আপনাকে কি করে বোঝাবো! (আর একবার তিনি নস্য নিলেন, একটু কেসে, এক ঢোক চা পান করলেন)। যাক্, গৌরচন্দ্রিকা না করে বলেই ফেলি। আমার রোগিণী...কি করেই বা বলি... যাক্...কথাটা এই...সে আমার প্রেমে পড়েছিল, অথবা, না...ঠিক সে আমার প্রেমে পড়েনি, তবে, তবে...বাস্তবিক কি করে বলা যায় (ডাক্তার নীচের দিকে চাইলেন, মুখ খানা রাঙা হয়ে উঠল, তার পর দ্রুত বলতে লাগলেন) —'না প্রেমে পড়া...ঠিক তা নয়। নিজেকে বেশী বড় করে দেখা লোকের শোভা পায় না। সে মেয়েটী শিক্ষিতা

চতুরা, অনেক বই-পড়া, আর আমি, আমি তো প্ল্যাটিনটা ভুলেই মেরে দিয়েছি! আর চেহারার কথা যদি বলেন (ডাক্তার একটু স্মিতহাস্তে নিজের শরীরের উপর চোখ বুলিয়ে নিলেন)...তা, আমার বিশেষ গর্ব্ব করবার মত কিছুই নেই। কিন্তু ভগবান আমাকে নিরেট বোকা করে গড়েন নি...শাদাকে আমি কালো বলি না..দু' একটা জিনিষ জানিও। স্পষ্টই আমি দেখ্তে পেলাম সে আলেকজান্ড্রা আন্দ্রীভ্না (রোগিণীর ওই নাম) ঠিক যে আমার প্রেমে পড়েছিল তা নয়,—তবে আমাকে একটু বিশেষ সম্মানের চোখে দেখেছিল। হ'তে পারে সে এই অনুভূতিটাকে বেশ বুঝে উঠ্তে পারেনি, হয়তো একটু ভুল করেছিল—যাক্ এই হ'ল কথা, এখন আপনি যা বোঝেন। ডাক্তার এমনভাবে এই ছিন্নসম্বন্ধ কথাগুলি বল্লেন যে স্পষ্টতঃ অনুমান হ'ল যেন তিনি বড় মুস্কিলেই পড়েছেন। তিনি বল্লেন "আমি যেন প্রলাপ ব'কে যাচ্ছি, নয়?...এ রকম ক'রে বলাতে আপনি ঘটনাটা বুঝ্তে পাল্লেন না—আচ্ছা, আচ্ছা, আমি সব গুছিয়ে পরের পর বলে যাচ্ছি—শুনুন।"

এক পেয়ালা চা খেয়ে তিনি ধীরে ধীরে আবার বল্তে লাগলেন।

"বেশ তারপর—তারপর রোগিণীর অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে চল্ল। আপনি তো আর ডাক্তার নন, মশায়, আপনি ভেবে উঠ্তেই পারেন না, তাঁর মনে কি হয়, যখন তিনি প্রথম প্রথম বুঝ্তে পারেন যে রোগ কোন রকমেই বাগ মানছে না। তখন তার নিজের উপর, তার জ্ঞানের উপর আস্থাটা কি রকম হয়। তখন হঠাৎ আপনি ডাক্তার এমন ভয় খেয়ে যান যে বলা যায় না। আপনার মনে হয় যেন যা সব জানতেন স-অ-ব ভুলে গেছেন, আপনার উপর রোগীর কোন বিশ্বাসই নেই, আর অন্য লোকেও ধরে ফেলে যে আপনি বড় অস্থিরচিত্ত হয়ে পড়েছেন। আর তারা যেন অনিচ্ছার সহিত রোগের সিম্‌টম্ বলছে...আর সন্দিগ্ধভাবে আপনার দিকে তাকিয়ে ফুস্ ফাস করছে...ওঃ! সে কি ভয়ঙ্কর অবস্থা। তখন আপনি ভাবেন...রোগের নিশ্চয়ই প্রতীকার আছে... তাহা যদি বের করতে পারি। কেমন ঠিক নয় কি? তখন আপনি বের করবার চেষ্টা করতে থাকেন—আচ্ছা এটা—উহুঁ, নাঃ, ওটা নয়। আপনি ওষুধটাকে সময়ই দেন না তার কাজ কর্ত্তে...একবার এটা ধরেন একবার ওটা ধরেন। কখনও টক্ করে প্রেসক্রপ্‌শনের বইটা বের করে ফেলেন ভাবেন নিশ্চয়ই এটাতে আছে। কখনও বা আবার একটা হঠাৎ বের করেন, করে ভাবেন... যাক্‌গে, যা থাকে কপালে, এইটাতেই হয়তো কাজ হবে। কিন্তু এ ধারে একটা লোক মারা যাচ্ছে, হয়তো আর একজন ডাক্তারে তাকে বাঁচাতে পারেন; তখন বলেন 'আমি নিজের ঘাড়ে এতটা ঝুঁকি নেব না—পরামর্শের জন্য আর একজন ডাক্তার চাই। সে সময় কেমন বেকুবের মত আপনাকে দেখায়! সময়ে আবার সবই সয়ে যায়, তখন আর কিছু গায়ে লাগে না। লোকটা মারা গেল—কিন্তু আপনার তাতে দোষ কি? আপনি তো নিয়মমত তার চিকিৎসা করেছেন। কিন্তু অসহ্য যাতনা আপনি ভোগ করতে থাকেন যখন দেখেন যে আপনার উপর আপনার ইলেমের উপর ওদের অন্ধবিশ্বাস রয়েছে; আর আপনি বেশ বুঝ্ছেন যে আপনি ওদের কোনও কাজেই লাগছেন না! আমারও উপর সমস্ত পরিবারটার এইরূপই অন্ধবিশ্বাস ছিল, তারা ভাবতেই সুরু করেছিল যে তাদের মেয়ের কোন বিপদই নেই। এধারে আমিও ওদের উপরে উপরে খুব আশ্বাস দিচ্ছি যে রোগটা কিছুই নয়, কিন্তু ভিতরে ভিতরে...আমার পেটে হাত পা সেঁধিয়ে যাচ্ছে। আবার বিপদের উপর বিপদ রাস্তার এমন অবস্থা যে সেই যে ক'দিন ধরে কোচম্যান গিয়েছে সহর থেকে ওষুধ আনতে, তার আর দেখাই নেই। আমি আর রোগিণীর ঘর ছেড়ে যেতেই পারি না...তার কাছছাড়া হতেই পারি না...তাকে অনেক মজার গল্প শোনাতে লাগলাম, বুঝেছেন, আর তার সঙ্গে তাস খেল্তে লাগলাম। পাশে থেকে রাত জাগাতে লাগ্‌লাম। বৃদ্ধা যতই ছলছল চোখে আমাকে ধন্যবাদ দিতে লাগলেন, আমি ততই মনে মনে বলি, "ওগো আমি এ কৃতজ্ঞতার পাত্র নই। আপনার কাছে আমি প্রাণ খুলে স্বীকার করছি, আর এখন তা লুকুলেই কি হবে—আমিই রোগিণীর প্রেমে পড়েছিলাম। আর সেও আমাকে ভালবেসেছিল, সময় সময় আমি ছাড়া কাউকেই সে ঘরে আসতে দিত না। আমার সঙ্গে গল্প করতে ভাল বাসত,—কোথায় আমি

পড়েছি, আমার কে কে আছে, আমি কেমন থাকি, কাকে কাকে দেখতে যাই। আমি বুঝছি এত কথা কওয়া তার ভাল নয়, কিন্তু, কিন্তু জানেন, তাকে আমি প্রাণ ধরে বারণ করতে পারতাম না। কখন কখন হাতে মাথা রেখে নিজেকে সম্বোধন করে বলে উঠ্‌তাম, "তুমি এ কি করছ, বদমায়েস?" আর সে? সে তখন আস্তে আস্তে আমার হাতটা ধরে অনে-এ-কক্ষণ ধরে আমার পানে চেয়ে চেয়ে শেষটা ফিরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌ত "আপনি বড্ড ভাল।" বড় বড় চোখ, অবসন্ন হাত, জ্বরে তেতে রয়েচে। 'হাঁ, সত্যি আপনি বড্ড ভাল! আমাদের প্রতিবেশীদের মত নন—না, তাদের মত নন আপনি। কেন আগে আপনাকে দেখিনি? আমি বলি—, আন্দ্রীভ্‌না, উতলা হোয়োনা ঠাণ্ডা হও। আমি জানিনা কেমন করে···যাক্ তুমি ঠাণ্ডা হও, তুমি শীগ্‌গির ভাল হয়ে উঠ্‌বে।"

একটু ভ্রুকুঞ্চিত করে আমার দিকে ঝুঁকে ডাক্তার ব'লতে লাগলেন—"আপনাকে ব'লে রাখার দরকার যে তাদের পড়শীদের সঙ্গে তারা খুব কমই মিশত—কেননা তারা এদের সমতুলও নয় আর এরা গরীব ব'লে ধনী নিম্নশ্রেণীর লোকদের সঙ্গে আলাপ ক'রতে সঙ্কোচ বোধ করত। আগেই আপনাকে বলেছি এরা খুব শিক্ষিত আর সভ্য ভব্য। রোগিনী তো আমার হাত ছাড়া আর কারও হাতে ওষুধ খেত না। আমার সাহায্যে বিছানায় উঠে বসে; আমার দিকে চেয়ে থাকত...দেখে প্রাণ ফেটে যেত। এ ধারে তার অবস্থা খারাপ, খারাপ, খারাপই হয়ে চলেছে—ও ম'রে যাবে, নিশ্চয়ই ম'রে যাবে! দেখুন আমার এমন মনে হ'ত যেন আমি ওর আগেই কবরে যাই! এধারে ওর মা বোন আমার চোখের দিকে চেয়ে আছে—আর আমার উপর তাদের বিশ্বাস ক্রমেই শিথিল হ'য়ে আসছে। কাতর স্বরে তারা ব'লে, "কেমন দেখছেন ডাক্তার বাবু, কেমন দেখছেন ওকে। ভালো, ভালো, ভালো।" ভালই বটে! আমি নিজেই ব'সে পড়েছি।

"একদিন রাত্রে—বুঝেছেন—একদিন রাত্রে একলাটি আমি রোগিনীর পাশে ব'সে আছি। দাইটাও ব'সে ব'সে বিকটভাবে নাক ডেকেই চলেছে—তার আর দোষই বা দেব কি, সেও ক্লান্ত হ'য়ে পড়ছিল। সেদিন আন্দ্রিভ্‌নার অসুখ বেশী। দুপুর রাত পর্য্যন্ত বিছানায় ছটফট ছটফট ক'রতে লাগল। তারপর মনে হ'ল যেন ঘুমিয়ে পড়েছে—অন্ততঃ তার নড়নচড়ন ছিল না। ঘরের কোণে ভার্জ্জিনের প্রতিমূর্ত্তির কাছে আলো জ্বলছিল, আমিও ঢুলছিলাম। এমন সময় হঠাৎ আমার মনে হ'ল কে যেন আমাকে স্পর্শ ক'রলে···ফিরে দেখি—হা ভগবান্, আন্দ্রীভ্‌নার দুটী চোখের দৃষ্টি আমাতে নিবদ্ধ, ঠোঁট দুটী ঈষৎ ভিন্ন—গাল দুটা পুড়ে যাচ্ছে। 'কি হয়েছে, কি হয়েছে?' 'হাঁ ডাক্তার বাবু, আমি কি ম'রে যাব?' 'ঈশ্বর কৃপা ক'রবেন।' 'না না, ডাক্তার বাবু আপনি ব'লবেন না যে আমি বেঁচে··· উঠব···না, বলবেন না—আপনি যদি জানতেন · শুনুন একবার! ভগবানের দোহাই আমার প্রকৃত অবস্থা গোপন ক'রবেন না, ডাক্তার বাবু।' উঃ কি জোরেই তার নিশ্বাস পড়ছিল। 'যদি আমি নিশ্চয় করে জানতে পারি যে আমি মরবই, তাহ'লে আমি আপনাকে স—ব—ব বলব,—স—ব—ব।' আন্দ্রীভ্‌না, আন্দ্রীভ্‌না, আমি অনুরোধ করছি—শুনুন, আমি মোটেই ঘুমুইনি ..আমি এই এতক্ষণ আপনার দিকেই চেয়েছিলাম···ঈশ্বর জানেন···'আপনাতে আমার গভীর বিশ্বাস, আপনি ভাল লোক—এই জগতে আপনার যত পবিত্র সামগ্রী আছে তার দিব্য—আমাকে সত্য কথাটা বলুন—ভাঁড়াবেন না। আপনি যদি একবার জানতেন আমার সত্যকার অবস্থাটা অবগত হওয়া আমার কত দরকার···ডাক্তার বাবু বলুন, বলুন, আমার অবস্থা কি সঙ্কটের?' 'কেমন ক'রে ব'লব আন্দ্রীভনা কেমন করে বলব।' 'ভগবানের শপথ আমি অনুনয় করছি, বলুন।' তখন আর থাকতে না পেরে বল্লাম, আন্দ্রীভ্‌না, আমি লুকাব না, তোমার অবস্থা সঙ্কটের—তবে ভগবান কৃপাময়। 'আমি ম'রব, আমি ম'রব' মনে হল যেন এ সংবাদে সে প্রীতই হয়েছে, তার বদনমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠল; আমার ভয় হ'ল। 'আপনি ভয় খাবেন না ডাক্তার বাবু, মরণে আমার ভয় নাই।' তারপর হঠাৎ সে বিছানায় উঠে ব'সে কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে ব'লতে লাগল, 'এখন —হাঁ, এখন আমি ব'লতে পারি, আপনাদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি—আপনি বড় ভাল, বড় দয়ালু —আমি আপনাকে ভালবাসি।' বিস্ফারিত চক্ষে আমি তার দিকে চেয়ে রইলাম—যেন আমি সর্পাবিষ্ট, কি ভয়ঙ্কর অবস্থা আমার তা বুঝতে পারছেন। 'বলি, শুনছেন ডাক্তার বাবু, আমি আপনাকে ভালবাসি।' কি করে

আমি তোমার যোগ্য হলাম, অ্যাস্ত্রীভ্না? 'না, না—আপনি,—আপনি আমাকে বুঝছেন না।' তারপর হঠাৎ দুটী বাহু প্রসারিত ক'রে আমার মাথাটা দু হাতে সস্নেহে ধরে একটা চুম্বন করলে। আমার কথা বিশ্বাস করুন, আমি চীৎকার করে উঠলাম, আর নীচে হাঁটু গেড়ে বিছানাতে বালিশের উপর মাথা রাখ্লাম। সে কথা কইলে না। আমার মাথার চুলের ভিতর তা'র কম্প্র করপল্লব ঈষৎ সঞ্চালিত হ'চ্ছিল···একি? ও সে কাঁদে! আমি সান্ত্বনা দিতে গেলাম,···বাস্তবিক কি যে বল্‌ব কিছু ঠিকানাই পাই না। 'তুমি দাইটাকে জাগিয়েই দেবে দেখ্‌ছি। একি অ্যাস্ত্রীভ্না, বিশ্বাস কর আমাকে··· ধীর হও।' 'কি হয়েছে তাতে? আপনি কিছু ভাববেন না—জাগুক ওরা, আসুক ওরা, আমার কিছু এসে যায় না। আপনি তো দেখ্‌তেই পাচ্ছেন—আমি মরছি! আপনি ভয় খাচ্চেন কেন? কিসের ভয় আপনার মাথাটা তুলুন একবার···তবে বুঝি আমাকে আপনি ভালবাসেন না?—ওঃ! আমারই ভুল...তা'হলে আমায় মাপ করবেন।"

'অ্যাস্ত্রীভ্না, অ্যাস্ত্রীভ্না, একি বলছো তুমি? এই তোমার গা ছুঁয়ে বল্‌চি··তোমায় ভালবাসি।' আমার দিকে সোজা চেয়ে তার বাহুযুগল বিস্তার করে বল্লে— 'তা' যদি হয়, তা' হলে আমায় আলিঙ্গন করুন।'

আপনাকে সত্য বল্‌চি জানি না পাগল হ'তে হ'তে আমি সেরাত্রে কি ক'রে বেঁচে গেছি। আমি বেশ বুঝছি সে রোগিণী এই রকম ক'রে আত্মহত্যা কচ্চে···বুঝ্‌ছি সে সেই মরু, বুঝলাম যে সে যদি নিজেকে মৃত্যুর কবলিত না জানতো তা হ'লে সে আমার কথাই ভাব্‌ত না। আর যাই বলুন আপনি, প্রেম কি বস্তু তা না জেনে মোটে কুড়ি বছর বয়সে মরাই কঠিন, এই ভাবনাই ওকে যাতনা দিচ্ছি'ল। এই জন্তেই নিরাশায় আমাকে গ্রেপ্তার করেছিল —আমাকে ভালবেসেছিল, বুঝেছেন আপনি? তখন ও সে আমাকে তার দৃঢ় বাহুবন্ধনে বেঁধে রেখে—কিছুতেই ছাড়ে নাই। 'অ্যাস্ত্রীভ্না নিজের ও আমার উপর দয়া কর অ্যাস্ত্রীভ্না।' 'কেন কি হয়েছে? আপনি জানেন আমি নিশ্চিত মরছি।' এই কথাই সে বার বার কহিল— 'আমি যদি জানতাম আমি আবার বেঁচে উঠব—আবার সংসারের একজন হ'ব—তাহলে আমি লজ্জিত হতাম— কিন্তু সে কথা এখন কেন?'

'কিন্তু, কে বলেছে তুমি মরবে?' 'না, না, আপনি ছেড়ে দিন, আমাকে প্রবঞ্চনা করবেন না। আপনি মিথ্যা কথা বলতে পারেন না—মুখ দেখুন আপনার আয়নাতে।' 'তুমি বেঁচে উঠ্‌বে, অ্যাস্ত্রীভ্না, আমি তোমাকে—আরাম করবো—আমি তোমার মায়ের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করবো— আমরা দুটীতে এক হ'ব।' 'না, না, আপনি কথা দিয়েছেন, আমি মরবো—আপনি প্রতিজ্ঞা করেছেন—আপনি বলেচেন।' বড়ই সঙ্কটে আমি পড়লাম। তারপর আমার নাম জিজ্ঞাসা করলে। নামের প্রথম অংশটা শুনে শিউরে উঠ্‌ল (আমার নাম ট্রাইফন ইভানোভিচ)। তারপর ফরাসী ভাষায় বিড় বিড় করে কি বলে উঠল— নিশ্চয়ই অপ্রীতিকর কিছু—তারপর হেসে উঠল, তাও অপ্রীতি-ব্যঞ্জক। এই রকম করে সমস্ত রাতটা কাটালাম তার সঙ্গে। প্রত্যুষ হতে না হতে আমি সেখান থেকে পালিয়ে গেলাম—মনে হ'ল বুঝি পাগল হয়ে গেছি। আবার যখন তার ঘরে গেলাম, দেখি, কি সর্ব্বনাশ! তাকে আর চেনাই যায় না—যাদের এইমাত্র কবর হবে তাদের চেহারাও যে এর চেয়ে ভাল! আমি শপথ করে বল্‌ছি— আমার কথা বিশ্বাস করুন—আমি এখন বুঝে উঠ্‌তে পারিনি—সত্য বলছি, বুঝে উঠ্‌তে পারি না—কি করে সে দৃশ্য আমার সহ্য হ'ল। তিন দিন তিন রাত এই অবস্থাতেই রোগীণী কাটালে—কি সে সব রাত্রি—কত কথাই না সে আমাকে বলেছিল। আর শেষ রাত্রে—একবার ভেবে দেখুন সেই ভীষণ রাত্রে আমি তার পাশে বসে নিরন্তর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছি—'হে ভগবান তুমি ওকে লও, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও লও, প্রভো।' হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে তার মা ঘরের ভিতর এসে পড়লেন। আমি পূর্ব্ব রাত্রেই মাকে বলিয়াছিলাম যে আর আশা নেই—আপনি পুরোহিতকে সংবাদ দেন। যখন রোগিণী মাকে দেখ্‌লে তখন বল্লে—'ভালই হ'য়েছে মা, তুমি এসেছো! আমরা পরস্পরকে ভালবেসেছি, মা আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেককে কথা দিয়েছি।' ভীত হয়ে মা বল্লেন, 'ডাক্তারবাবু, ওকি বকছে। আমার মুখ পাংশু হয়ে গেল। আমি বল্লাম—'ও ভুল বকছে। জ্বরে অমন

করছে।' কিন্তু সে বল্লে,—'চুপ, চুপ, এই একটু আগেই আপনি অন্ত ধরণের কথা কচ্ছিলেন। আমার আঙটীও আপনি নিয়েছেন। এখন তবে ছলনা করছেন কেন?' তাকে আমি বুঝিয়ে বলব—তিনি স্নেহময়ী—তিনি নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন—আর আমিও মরণের পথে—আমার মিথ্যা কথা বলবার কোন আবশ্যক নেই। আপনার হাত দিন—আমি জোর করে উঠে—সে ঘর থেকে দৌড়ে পালালেম। বৃদ্ধা অবশ্য আন্দাজ করে নিলেন ব্যাপারটা কি।

আমি আর আপনাকে বিরক্ত করব না—বিশেষতঃ সে করুণ কাহিনী মনে হলে বাস্তবিকই ব্যথা পাই। রোগিণী তার পর দিনই ইহধাম ত্যাগ কল্লে। ভগবান তার আত্মার শান্তি বিধান করুন! মরবার আগে সে সকলকে বলেছিল যে যেন আমি একেলাই তার কাছে থাকি। এই শেষের কথাগুলি বল্‌তে বল্‌তে ডাক্তার দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লেন।

তার শেষ কথা—'আমাকে মাপ করুন···বোধ হয় আপনার কাছে আমি অপরাধিনী···আমার অসুখে...কিন্তু বিশ্বাস করবেন আমাকে...আপনাকে ছাড়া আর আমি কাউকেই ভালবাসিনি...আমাকে ভুলে যাবেন না···আমার আঙটীটা রেখে দেবেন।'

এই বলে ডাক্তার অন্ত দিকে মুখ ফেরালেন। তার পরে বল্লেন—'অন্ত কোন বিষয় নিয়ে গল্প করা যাক্। আপনি বাজি রেখে প্রেফারেন্স খেলুন না কেন? আমার মত লোকের বেশী ভাবপ্রবণ হওয়া ভাল দেখায় না। গিন্নীর ভর্ৎসনা আর ছেলেদের কান্নাকাটী থেকে কি ক'রে উদ্ধার পাব—এই এক ধাক্কা সদাই কর্ত্তে হয়। হ্যাঁ, ভাল কথা—সেই ঘটনার পর—বুঝেছেন—আমার কানুনসঙ্গত বিবাহ করবার অবকাশ ঘটেছিল···ওঃ...সাত হাজার টাকা পণ আর এক সওদাগরের মেয়ে আমার ভাগ্যে লেখা ছিল। নাম তার আকুলিনা, ট্রাইফন্ নামে আর বাধেনি—ঠিক খাপ্ খেয়েছিল। দেখুন বলতে কি, বড় বদমেজাজী আমার এই গিন্নীটী...তবে সৌভাগ্য এই যে সমস্ত দিনই তিনি ঘুমিয়ে থাকেন...যাক্। খেলবেন নাকি প্রেফারেন্স্?

আমরা অল্প বাজি রেখে খেলতে লাগলাম। ট্রাইফন ইভানোভিচ আড়াই রুবল জিতে নিয়ে অনেক রাত করে বাড়ী ফিরলেন—জিতে খুব সুখী হয়েছিলেন তিনি!

শ্রীকালীপদ মিত্র, এম-এ, বি-এল

মাতৃভাষা

ভক্ত সন্তানের মত মহাজন-পথ ধরি,
আনি' অর্ঘ্য-উপচার সোনার থালায় ভ'রি
গরীয়সী মাতৃভাষা! পূজিতে চরণ তোর—
মধুর স্বপন জাগে সতত মানসে মোর।

স্বপন সফল করি' পূরাব মনের আশা;
তাই যবে পূজা-গেহে পশি মাগো মাতৃ-ভাষা!
ভকতি--পূরিত--চিতে তিতিয়া নয়ন-জলে,
ভরি মোর সাজিখানি গন্ধহীন ফুল-দলে—

দেখি মা মিলেছে হেথা রথী-মহারথী কত,
পুণ্য--পূত--শুদ্ধ দেহে ল'য়ে তোর পূজা-ব্রত;
সোণার থালায় ভরি নানা অর্ঘ্য-উপচার,
চন্দন কুঙ্কুম ধূপ সুরভি কুসুম হার।

করিয়া আকুল মাগো সবার পরাণ-মন,
বরষি' শ্রবণে মধু সুকণ্ঠ-গায়ক-গণ—
বীণার নিক্বণে তুলি মোহন-মধুর তান,
রচিয়া কোমল ছন্দে করে তোর স্তুতি গান।

কম কণ্ঠে সম স্বরে করি কেহ শঙ্খনাদ,
ঘোষিছে মায়ের বাণী পুরা'য়ে মনের সাধ।
আনন্দে আকুল হ'য়ে তিতিয়া নয়ন-জলে,
সাধুবাদ করে কেহ পূজারী-গায়ক-দলে।

নবীন সাধক কত ভীষণ জনতা ঠেলি
পশিছে দেউলে মাগো আমারে পেছনে ফেলি,
আমি মা পূজারী তোর পতিত-কাঙ্গাল-দীন,
ক্ষীণ-কণ্ঠ, হীন-বল অর্ঘ্য-উপচার-হীন।

গরীয়সী মাতৃভাষা মা আমার মা আমার!
তোমার পূজায় আসি' কি দিব মা উপহার?

নিঃসম্বল আমি মাগো নাহি মোর স্বর্ণ থালা,
নাহি অর্ঘ্য-উপচার সুরভি কুসুম মালা।

ছিন্ন-তার ভগ্ন বীণা কণ্ঠে মোর নাহি তান,
কেমনে গাহিব মাগো তোমারি বন্দনা-গান?
আছে শুধু সাজি ভরা গন্ধহীন ফুল-দল,
হৃদয়ে আছে মা ভক্তি আঁখি পরে অশ্রু-জল;
বরষি' আশিষ-ধারা ভগ্ন প্রাণে দিয়ে আশা,
নয়ন-জলের পূজা নেও মাগো মাতৃভাষা!

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহ রায়।

সঙ্গীতে বঙ্গ সাহিত্য

[চট্টগ্রাম সারোয়াতলী সাহিত্য-সম্মিলনে গত ৫ই বৈশাখ তারিখে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত]

(১).

সঙ্গীতের কমনীয় কলেবরে বঙ্গ সাহিত্যের কোমল করস্পর্শ ক্রমেই যে এখন স্ফুট হইতে স্ফুটতর ভাবে দেখা দিতেছে, সে কথা আর একেবারেই অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। সৃষ্টি যদি অনাদি হয়—তবে সঙ্গীতও অনাদি। ইহা বিশ্বজননী, বিশ্বব্যাপিনী, এবং বিশ্ব মুগ্ধকারিণী। জন্ম এবং মৃত্যু সঙ্গীতের বিকাশ এবং পরিনতি। জানিনা কোন শুভ মুহূর্ত্তে সরোজবাসিনী ভগবতী বীণাপাণীর পরাগ-পরিলিপ্ত, কোমল-করবিলম্বিত, স্বর্ণবীণায় সপ্ত-তন্ত্রী, সপ্ত-স্বরে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল। চন্দ্রে, সূর্য্যে, ভূলোকে, গোলকে সেই স্বর-লহরী বিকম্পিত হইয়া অপ্রকাশ বিশ্বকে প্রকাশিত করিয়া তাহার হৃদয়পদ্মে "জননী সঙ্গীত"রূপে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বিশ্বের প্রাণময়ী শক্তি, বিশ্বের সঙ্গীত!—যে দিন বিশ্বের কণ্ঠের সঙ্গীত স্তব্ধ হইয়া যাইবে, সেই দিন বিশ্বের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, এই পরিদৃশ্যমান্ সৌর জগতের চিহ্নমাত্র খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

এই অনন্ত সঙ্গীত-সমুদ্রে আমরা কীটাণুকীট। সঙ্গীতে আমাদের জন্ম, সঙ্গীতে আমাদের অভিব্যক্তি এবং সঙ্গীতে আমাদের নির্ব্বাণ, অনাদি কাল হইতে অবিরাম গতিতে সঙ্গীত-তরঙ্গ সমস্তদিক হইতে আমাদের শরীরে আঘাত করিতেছে। কত রকমে যে এই সঙ্গীত শ্রবণ এবং অনুভব করা যায়, তাহা ব্যক্ত করিবার শক্তি আমার নাই। কেহ কাণ পাতিয়া সঙ্গীত শুনেন, কেহ অবাক হইয়া শুনেন, কেহ সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলির দ্বার রুদ্ধ করিয়া শুনেন, কেহ নির্ব্বিকল্প সমাধির ভূমানন্দের স্রোতে আত্মনিমজ্জিত হইয়া সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া থাকেন।

কবি রবীন্দ্রনাথ এই চরমানন্দ-প্রসবিনী সঙ্গীতামৃত পান করিবার জন্য কি ব্যাকুলতাই প্রকাশ করিয়াছেন,—

"তুমি কেমন করে গান করহে গুণি,
আমি অবাক হ'য়ে শুনি, সদা শুনি!
সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে,
সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে,
পাষাণ টুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে,
বহিয়ে যায় সুরে সুরধনী॥

(২)

দেবভূমি ভারতবর্ষের আর্য্য-ঋষিগণ সর্ব্ব প্রথম এই বিশ্ব-ব্যাপিনী সঙ্গীতের স্বরূপ "দর্শন" করিয়াছিলেন। সঙ্গীতকে "দর্শন" করা কথাটি অনেকের কাণে নূতন ঠেকিতে পারে; কিন্তু কথাটি নূতন নহে, নিতান্তই প্রাচীন। সঙ্গীত রাগ ও রাগিণীর সমষ্টি মাত্র। প্রত্যেক রাগ ও রাগিণীর "রূপ" আছে। অ, আ, ই, ঈ, প্রভৃতি অক্ষরের "রূপ" আছে বলিয়া যেমন শাস্ত্রকারগণ তাহাদের নাম দিয়াছেন "বর্ণমালা" তেমনি প্রত্যেক রাগ ও রাগিণী তাহার বিশিষ্ট "বর্ণ" দ্বারা আপনার "রূপ"কে সাধকের দৃষ্টিগোচর করে বলিয়া তাহারা মূর্ত্তিমান এবং মূর্ত্তিমতী। সুতরাং অতীন্দ্রিয় বস্তু দর্শন-ক্ষম ভারতের ঋষিমণ্ডলী সঙ্গীতকে "দর্শন" করিয়াছিলেন, এ কথা বলিতে সাহসী হইতেছি। এই ঋষিগণ সুর-সমুদ্র মন্থন করিয়া যথাশক্তি রাগ ও রাগিণীগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের 'নাম-করন' করিয়াছেন।

সঙ্গীতের সহিত আমাদের চিত্ত-বৃত্তির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। এক-একটি রাগ বা রাগিণী এক একটি মনোভাবের বিশেষ পরিচায়ক। সেই ভাবটিকে আশ্রয় করিয়া রাগিণীর 'নামকরণ' করা হইয়াছে, সেই ভাবটির কথিত রাগিণীর যদি সুরের সাহায্যে আপনার প্রাণ স্বরূপ ভাবকে প্রকাশ করিতে না পারে, তবে সেটি সঙ্গীত-পদ-বাচ্য হইতে পারে না। গান সম্পূর্ণ "কোলাহলে" পরিণত হয়। মানব-হৃদয় সঙ্গীতে চির-পরিপূর্ণ। একটি মানব-কণ্ঠ হইতে কি ভাবে অসংখ্য রাগ ও রাগিণী নিঃসৃত হইয়া থাকে; ইহা চিন্তা করিতেও মন বিস্ময়ে ডুবিয়া যায়। শ্রীভগবান্ মানুষকে কি অসীম শক্তির অধিকারী করিয়া জগতে পাঠাইয়াছেন। সঙ্গীতশাস্ত্র কঠিন,—কিন্তু ইহাতে সিদ্ধি লাভ করিলে সাধকের চরম আনন্দ বা মুক্তি!

প্রাচীন সঙ্গীত ও বর্ত্তমান সঙ্গীতের মধ্যে বহু সহস্র বৎসরের এক্রুটি-ব্যবধানে আসিয়া একটিকে অপরটি হইতে এতদূরে সরাইয়া আনিয়াছে যে, আমরা এখন যে সঙ্গীত আলোচনা করিয়া থাকি, তাহা মৌলিক কি না, অথবা প্রকৃত সঙ্গীত কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয়। এই বিস্তার্ণ বিষয়ের সম্পূর্ণ আলোচনা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে অসম্ভব, তাই কেবলমাত্র বর্ত্তমান যুগের সঙ্গীতের অনুশীলন ও সমৃদ্ধির বিষয়ে সামান্য আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

(৩)

এ প্রদেশে সঙ্গীতের অনুশীলন বড় বেশীদিনব্যাপী বলিয়া বোধ হয় না। পশ্চিমের মত বাঙ্গালীরা 'ভাবছাড়া' সুরের আলাপ করিয়া কিছুতেই তৃপ্ত হইতে ইচ্ছা করে না। ভাষা ভিন্ন ভাবের প্রকাশ অসম্ভব। ভাষার মধ্য দিয়া প্রাণের কথাগুলি যখন রাগিণীর মধুর স্নেহরসে সিক্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করে, তখন আমরা সেই সঙ্গীতে আত্মহারা হইয়া পড়ি। আনন্দ আমাদের সমস্ত শরীরে বিকশিত হইতে আরম্ভ করে। অন্যথা রাগ ও রাগিণীর বিষম আতিশয্য সঙ্গীতকে সমস্ত রাগ হইতে বঞ্চিত করিয়া সঙ্গীতের প্রতি কেবল বিতৃষ্ণাই সৃষ্টি করিয়া থাকে।

অধুনা ভাষা সম্পদে সঙ্গীতের যে শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে, তাহা বঙ্গ-সাহিত্যের এক অমূল্য দান। বঙ্গ-সাহিত্য যদি নানারূপ ভাবকুসুমে সঙ্গীতের কমনীয় কণ্ঠে মালা পরাইয়া না দিত, তবে সঙ্গীত নিরাভরণ গ্রাম্য বধূর মত তুলসীমঞ্চে প্রদীপ জ্বালিয়া ও সান্ধ্য আরতির কাঁসর বাজাইয়া,—সারাজীবনটী অতিবাহিত করিতে বাধ্য হইত। সঙ্গীতের আর সে'দিন নাই। অনেক পরিবর্ত্তনের বাতাস লাগাতে বর্ত্তমান বাংলা সঙ্গীত পত্রে পুষ্পে সুসজ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণের কণ্ঠে সঙ্গীত বহু বৎসর পর্য্যন্ত এক সুরে এবং এক তালে নৃত্য করিয়া আসিয়াছিল। তাহার ঝঙ্কার জমাট বাঁধিয়া সমস্ত বাঙ্গালার গগনকে এখনও আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ইহার অমৃত সরস্বতীর মত অন্তঃসলিলা। তারপর সাধক কবি রামপ্রসাদের কণ্ঠে বীণার একটি তার সজোরে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। বাংলার জলে স্থলে সেই রাগিণীর তান ও মূর্চ্ছনা বায়ুর সহিত পরিচালিত হইয়া বাঙ্গালার নর-নারীর প্রাণে এক নবীন ভাব লহরীকে জাগ্রত করিয়াছিল। বহু বৎসর পর্য্যন্ত সঙ্গীত সেই তরঙ্গ-ভঙ্গে নৃত্য করিয়া সাধকের হৃদয় প্রেম ও ভক্তির উৎসকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছিল। তৎপরবর্ত্তী ভক্ত কবি দেওয়ান রঘুনাথ রায় ও রসিক চন্দ্র একই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সঙ্গীত-সাগরে আপনাদিগকে নিমজ্জিত করেন। দেওয়ানজি মহাশয় ইমনকল্যাণ রাগিণীতে গগন বিদীর্ণ করিয়া তান ধরিলেন,—

কেমনে হব পার ভব জলধি ?
তোমারি করুণা বিনা তারিণী এবার।

দেওয়ানজি মহাশয়ের এই গগন-বিহারী ইমনকল্যাণ রাগিণীর তান মহাব্যোমে বিলীন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্যতম সাধক কবি মেঘমন্দ্রে গর্জ্জন করিয়া মুলতান রাগিনীতে বিশ্ব-জননীকে সম্মুখসমরে আহ্বান করিলেন। সাধকের সেই সঙ্গীত-ঝঙ্কারে ত্রিলোক বিকম্পিত হইয়া উঠিল। বঙ্গবাসী নিস্তব্ধ হইয়া সেই সঙ্গীত শ্রবণ করিলেন—

আয় মা সাধন সমরে,—
দেখি মা হারে কি পুত্র হারে।
আরোহণ ক'রেছি পুণ্য মহারথে,
ভজন পূজন দুটি অশ্ব জুড়ে তাতে,
দিয়ে জ্ঞান-ধনুকে টান, ভক্তি-ব্রহ্ম বাণ,
ব'সে আছি আমি ধ'রে।

কি সুধামাখা সঙ্গীত; কি চমৎকার আত্মবিশ্বাস! সঙ্গীতের ভিতর দিয়া সাধন-পথে আত্মাভিমান করাই তৎকালীন কবিগণের লক্ষ্য ছিল। ভাষার বিজলি-চমকে সঙ্গীতের বপুকে আলোকিত করিবার দিকে তাঁহাদের বড় দৃষ্টি ছিল না। তখন সাহিত্য ছিল সংস্কৃত, সঙ্গীত ছিল পরমার্থ-সিদ্ধির সোপান। "ন কিঞ্চিৎ সঙ্গীতাৎ পরা",—এই সূত্রকে অবলম্বন করিয়া সঙ্গীত সাধকগণ আপন আপন চিন্তাকে ভগবন্মুখী করিয়াই তৃপ্তিলাভ করিতেন।

(৪)

এইরূপ শ্রেণীর পূর্ব্বোক্ত সঙ্গীত-বিশারদ মহাত্মাগণের তিরোধানের পর বাংলার সঙ্গীত-রাজ্যে এক অন্ধকার যুগ আসিয়া উপস্থিত হইল। বঙ্গ-সাহিত্যের "মালঞ্চে" সেই অন্ধকার যুগে তখনও ভাল করিয়া ফুল ফুটিতে আরম্ভ করে নাই। সঙ্গীতের চর্চ্চা তখনও পাঁচালী এবং "কবি" গানেই নিবদ্ধ ছিল। কেহ কেহ পুরাতন গানগুলির "চর্ব্বিত চর্ব্বণ" করিয়া সঙ্গীতের আকাঙ্ক্ষা নিবারণ করিতেন। এই অবস্থার মধ্যে নিধুবাবু হঠাৎ "টপ্পা" গানের বন্যায় সমস্ত বাংলা দেশকে প্লাবিত করিয়া ফেলিলেন। তিনি গান ধরিলেন "তোমারি তুলনা তুমি প্রাণ এ মহিমণ্ডলে!"

এই নূতন "টপ্পার" ঝঙ্কার বাঙ্গালীর কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হইতে লাগিল। টপ্পা তৃতীয় শ্রেণীর সঙ্গীত। ইহাতে ধ্রুপদের মত কিম্বা খেয়ালের মত 'সঞ্চারী' ও 'আভোগ' থাকেনা। 'আস্থায়ী' ও 'অন্তরাতেই' টপ্পার অন্ত হইয়া থাকে। ইহাতে রাগিনীর মূর্ত্তি বিকাশ একরকম দুঃসাধ্য ব্যাপার। তথাপি নিধুবাবুর নিকট সঙ্গীত-সাহিত্য ঋণী। তিনিই বাংলার নীরব কণ্ঠে সুরের 'চৈতন্য' সম্পাদন করিয়াছেন! টপ্পার এই নূতন 'জল হাওয়ায়' সঙ্গীতের ক্ষীণ কলেবর সতেজ হইয়া উঠিল। তখন বাংলার সাহিত্য-ভাণ্ডার ক্রমশঃই পূর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়াছে বটে,—কিন্তু তৎকালের সাহিত্যিকগণ তখনও সঙ্গীতকে তাঁহাদের ভাণ্ডার হইতে বিশেষ কিছুই দান করিবার ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সঙ্গীত টপ্পার সুরেই নাচিয়া নাচিয়া বহিয়া চলিতেছিল। টপ্পার আদর্শ অত্যন্ত লঘু বলিয়া তৎকালের সঙ্গীতও 'হালকা' হইয়া উঠিল। সঙ্গীত ক্রমশঃই অন্তঃসারবিহীন হইয়া পড়িতেছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া যেন আপনা হইতেই সাহিত্যিকগণের দ্বারে আত্মোদ্ধারের আবেদন লইয়া "সঙ্গীত স্বয়ং" গিয়া উপস্থিত হইল।

সঙ্গীত যেন ব্যাকুল কণ্ঠে নিবেদন করিল, "ওগো সাহিত্যিকগণ! আমাকে উদ্ধার কর। ঐ শোন সারা দেশময় মানুষগুলি আমাকে নিয়ে কেমন ক'রে চেঁচামিচি আরম্ভ ক'রে দিয়েছে—"

যমুনা পুলিনে বসে কাঁদে রাধা বিনোদিনী,
বিনে সেই রাখাল শশী বাঁকা শ্যাম গুণমণি!

সঙ্গীত যেন সেই সুরে সুর মিলাইয়া আকুল প্রার্থনা করিতেছে,—"আমাকেও এই হতভাগিনী বিরহ-তাপদগ্ধা রাধা বিনোদিনীকে যমুনা পুলিন হইতে আর কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাও। আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না।" হায়! কত বৎসর এই বিধুরা গোপবালা চোখের জলে যমুনার বালুকা-সৈকত সিক্ত করিয়াছে। 'রাখাল শশী'ও দেখা দিল না, 'বাঁকা শ্যাম গুণমণির' সহিতও মিলন হইল না। সঙ্গীত কাঁদিয়া বলিল,—"তোমরা যেমন ক'রে পার অভাগিনী রাধিকাকে যমুনা পুলিন হইতে সরিয়ে নিয়ে যাও, সেও বাঁচুক আর আমিও সিন্ধু খাম্বাজের মিশ্রণ হ'তে মুক্তি লাভ ক'রে বেঁচে যাই।"

সঙ্গীতের এই করুণ আর্ত্তনাদ কতকাল পর * বর্ত্তমান যুগের ঋষিকল্প সাধক রবীন্দ্রনাথের হৃদয় আঘাত করিল। শ্রীরাধার দুঃখে তাঁহার হৃদয় দয়ায় বিগলিত হইয়া পড়িল। তিনি বৃন্দাবনের যমুনা-পুলিন হইতে শ্রীমতীকে উদ্ধার করিয়া আপনার হৃদয়-যমুনা-তটে তাহার জন্য কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। সাহিত্যের নবোদিত বালার্ক কিরণে সেই কুটীর আলোকিত হইয়া উঠিল,—রাধিকার চিত্তগগন কি এক নবোদিত চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

টপ্পার "যমুনাপুলিন" "রাখাল শশী" প্রভৃতির অস্পষ্ট মূর্ত্তি শ্রীমতীর "আনন্দ-বাজার" হইতে আপন আপন "জড় বিপণি" উঠাইয়া লইল। রাধা-ভাবপ্রণোদিত কবি রবীন্দ্রনাথ, বাসন্তী রজনীর অবসান-জাগ্রত কোকিল-কণ্ঠে গান ধরিলেন,—

"ওই বুঝি বাঁশি বাজে, বন-মাঝে কি মন-মাঝে!
বসন্ত বায় বহিছে কোথায়,—কোথায় ফুটেছে ফুল?
বলগো সজনী, এসুখ রজনী কোনখানে উদিয়াছে,
বন মাঝে কি মন মাঝে!"

শ্রীরাধার দুঃখ-নিশার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সঙ্গীতেরও যেন দুঃখ-রজনীর অবসান হইয়া গেল। ভাবুক সাহিত্যিকের নিপুণ করস্পর্শে সঙ্গীত জড়রাজ্যের কর্দ্দমমুক্ত হইয়া এক নিঃশ্বাসে আনন্দভূমি চিন্ময় রাজ্যের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। চতুর্দ্দিকে জয়োল্লাস পড়িয়া গেল।

ইতঃপূর্ব্বেও দুই একজন বঙ্গভাষার সেবক 'সখি শ্যাম না এল; সখি শ্যাম ঐ এল' প্রভৃতি সঙ্গীতের দ্বারা বিরহ-ভাব প্রকাশ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথ সেই আদর্শকে চোখের সম্মুখে রাখিয়া প্রেমাস্পদকে বিরহিণীর হৃদয় মধ্যে যে স্থান দান করিয়াছেন, সে যেন নিতান্তই এক নব সৃষ্টি। মিলনের অভাবই বিরহ এবং মিলনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা বিরহকে অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক করে। মিলনেই যন্ত্রণার সম্যক সমাধান। বাংলার অন্যতম সাহিত্যিক, সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র ঘটক * মহাশয় মিলনের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া শ্রীমতীর বিরহ যন্ত্রণার যে চরম ঔষধি কল্পনা করিয়াছেন, তাহা এইস্থলে উল্লেখ করা গেল। কবিতাটী বৈষ্ণব পদাবলী ছন্দে ব্রজবুলিতে লিখিত; সাহিত্যের অণুপ্রাণনা ইহার প্রত্যেক অক্ষরকে অমৃতগন্ধী করিয়া তুলিয়াছে। কবি রাধিকার মুখে বলিতেছেন,—

"কব্ তুঁহু আওবি কালা?—
তুঝ পথ চাহয়ি লোচন লোরেরে—
লোচন কালিম ভেল।
শ্যাম, তুয়া লাগি রে জীবন বাঁধি বাঁধি,—
জীবন শুখয়ি গেল!
(হাম্; নীল যমুনা নীরে ডারিব রে পরাণি,
পাসরিব বি-রহ জ্বালা!
তব্ তুঁহু আওবি কালা!!"

[ভারতবর্ষ, ফাল্গুন ১৩২৬, ৩২৭ পৃষ্ঠা]

শ্রীরাধিকার হৃদয়ে মিলনের যে অপূর্ব্ব পন্থা উদিত হইল, তাহা কবি প্রাণস্পর্শী সঙ্গীতে ব্যক্ত করিয়াছেন। সমস্ত কামনার অবসানে বিরহী যখন আত্মবিসর্জ্জন করে, তখন প্রেমিকের সহিত, বাঞ্ছিতের সহিত, তাহার মিলন হইয়া থাকে। "সাহিত্য" সঙ্গীতের ভিতর দিয়া সেই আদর্শটী আমাদের নিকট উপস্থিত করিতেছে। বঙ্গসাহিত্যের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে "সঙ্গীতের" কাননে কত কুসুম এখন ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রেম, ত্যাগ পরার্থপরতা প্রভৃতি উচ্চ অঙ্গের ভাবগুলি, সঙ্গীত-স্রোতকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত দেশকে প্লাবিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি,—সঙ্গীতের দ্বারা ভাবের কতদূর অভিব্যক্তি হয়। সঙ্গীত প্রাণকে জাগ্রত করে,—সমস্ত জাগ্রত মহাশক্তির মধ্যে সঙ্গীতের জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

জননী কখন 'গৌরী' কখন বা 'মূলতান', কখন 'জয় জয়ন্তী' কখন বা 'অহং,' কখন 'কল্যাণ' কখনবা 'শ্রী', অথবা কখন 'ভৈরবী' রাগিণী আশ্রয় করিয়া, মানবের

* প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদিগের পদাবলী ও মাইকেলের ব্রজাঙ্গনা সঙ্গীত-সাহিত্যে যে কত উচ্চ তাহা বলা বাহুল্য। আমি স্থানাভাব বশতঃ বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই বিষয়ের আলোচনা করায় বিরত হইলাম। রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহ' ও রাধিকা-বিষয়ক বাংলা কবিতাগুলিরও প্রবন্ধে আলোচনা করিতে পারিলাম না। লেখক—

* ইনি চট্টগ্রামের সবডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার এস, সী ঘটক এম্ এ। ইঁহার সুললিত ব্রজবুলী রচনা ১৩২৬ সালের পৌষ ফাল্গুণ ও চৈত্রের সংখ্যায় ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রত্যেকটী কবিতা তান-লয়শুদ্ধ সুরে কীর্ত্তন করা যায়। লেখক—

সুপ্ত অন্তঃকরণকে জাগ্রত করিয়া, মানবীয় আকাঙ্ক্ষা-অভিব্যক্তির ধারাবদ্ধ পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন।

(৫)

বাংলা সাহিত্য এই সঙ্গীতের ধারাকে অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালীর প্রাচীন চিন্তামন্দিরগুলির সংস্কার সাধন করিয়াছে। তাই এখন আমরা সাহিত্যের আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া সঙ্গীতের সুরধনী-সলিলে অবগাহনপূর্ব্বক 'ইমন কল্যাণে' গাহিয়া থাকি :—

"তোমারি রাগিনী জীবন-কুঞ্জে-বাজে যেন সদা বাজে গো!
তোমারি আসন হৃদয়-পদ্মে রাজে যেন সদা রাজে গো॥"

[রবীন্দ্রনাথ]

আজ এই অপূর্ব্ব সঙ্গীতে দেশময় কি এক অমৃতের প্রবাহ চলিতেছে। নবজাগ্রত নরনারীর হৃদয়ে এই অমৃতময়ী সঙ্গীতের স্পন্দন এবং ঝঙ্কার চিরকাল অবিরাম গতিতে নৃত্য করিবে। সঙ্গীতে সাহিত্যের,—এবং সাহিত্যে সঙ্গীতের কত বড় দান! বঙ্গের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ঋষিবর বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব্বপ্রথম বঙ্গ সাহিত্যে নবজীবন আনিলেন; তারপর সাধক মহাত্মা রবীন্দ্রনাথ কৃতাঞ্জলিপুটে নতজানু হইয়া ঊর্দ্ধমুখে জননীর বন্দনা করিলেন,—

"অয়ি ভুবনমনমোহিনি!
অয়ি নির্ম্মল-সূর্য্য-করোজ্জল-ধরণী;—জনক জননী জননি!"

"পূণ্য-পীযুষ-স্তন্যপান"-প্রমত্ত বঙ্গদেশ তখন মাতোয়ারা হইয়া এক নবীন বৈষ্ণবীশক্তির সাধনায় আত্মনিয়োগ করিল। শঙ্খনিনাদে চতুর্দ্দিক ধ্বনিত হইয়া উঠিল। কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল সেই একই মহামন্ত্রে উগ্রতপস্যা আরম্ভ করিয়া দিলেন। ভৈরবগর্জ্জনে সমস্ত বাঙ্গালী শক্তিকে প্রবুদ্ধ করিয়া 'সন্দিপনী' রাগিনীতে তিনি গাহিলেন,—

"বঙ্গ আমার, জননি আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ!
সপ্তকোটি-মিলিত কণ্ঠে গাহে যখন আমার দেশ!"

তাই আজ "সঙ্গীতের জাগরনে কত গৌরব! আর তাই আমাদের মনে হইতেছে,—

"তব গৌরবে সকল গর্ব্ব লাজে যেন,—
সদা লাজে গো!"

শ্রীসুখেন্দুবিকাশ রায়।

চাষার দাবী

বোশেখ মাসে সূর্য্য যখন ধরার বুকে আগুন ঢালে,
আষাঢ়েতে আকাশ যখন আঁধার করে মেঘের জালে,
ভয় করিনে সেই দিনেও রৌদ্র-বৃষ্টি মাথায় ক'রে
ঘুরে বেড়াই মাঠের মাঝে তোমার ওগো তোমার তরে।
তবু আমার নামটি নাহি—তবু আমি মূর্খ চাষা
"স'রে দাঁড়া ছুঁসনে" ছাড়া আমার তরে নাইকো ভাষা।

তোমার যখন ঘুম ভাঙে না শুয়ে থাক শয্যামাঝে,
আমি তখন জেগে উঠে ছুটে চলি মাঠের কাজে।
অনাহারে অর্দ্ধাহারে মোটা সুতার গামছা প'রে।
ক্ষুধার অন্ন তৃষার বারি জোগার করি তোমার তরে।
তবু আমার নামটি নাহি তবু আমি মূর্খ চাষা!
"স'রে দাঁড়া ছুঁসনে" ছাড়া আমার তরে নাইকো ভাষা!

তোমার গায়ে রেশমী জামা শান্তিপুরের ধোয়া ধুতি
তোমার পায়ের জরির জুতো নয়শো যুগের পুরাণপুঁথি
মিশ্রিমাখা দুধের বাটী পাঁচ বেনুনের অন্নথালা
জান তো সে আমারি যে নগ্ন দেহের শোণিত ঢালা?
তবু আমার নাম করো না তবু আমি মূর্খ চাষা
"স'রে দাঁড়া ছুঁসনে" ছাড়া আমার তরে নাই কি ভাষা?

আমার গাছের ফলের ঝুড়ি গন্ধে ভরা পুষ্প সাজি,
আমার ক্ষেতের সবুজ ফসল শান্ত দূর্ব্বা শষ্পরাজি,
এক কথাতে এই জগতে আমার বলতে যাহা আছে
সকলি তো দান করেছি অকাতরে তোমার কাছে;
তবু আমার নাম হলো না তবু আমি মূর্খ চাষা
"স'রে দাঁড়া ছুঁসনে ছাড়া তোমার মুখে নাইকো ভাষা।

এত সাধের বুধী গাইয়ের মিষ্টমধুর দুধের হাড়ি
চাট্টিটি পয়সার বিনিময়ে দিয়ে এ'সে তোমার বাড়ী,
বেগুণ পোড়া আলুভাতে পেয়েই আমি তুষ্ট থাকি,
তবু তুমি কথায় কথায় আমার প্রতি রুষ্টআঁখি ?
আমার কষ্ট-উপার্জ্জিত টাকার থলি বাক্সে আনি'
সুদের সুদে তস্য সুদে আমারি খাও হাড় ক'খানি।
তবু তুমি জ্ঞানবন্ত, আমি একটা মূর্খ চাষা
"স'রে দাঁড়া ছু'স্‌নে" ছাড়া কর্‌তে নারি কোনই আশা।

তোমরা যেগো ইমান ছাড় শিখ্‌লে দুটি ম্লেচ্ছ বুলি
আমরা শত বিপদেও বিশ্বেশ্বরে যাইনা ভুলি'।

লক্ষপতি হলেও তোমার "দেহি দেহি" সাধ না মিটে,
রাজার রাজা এই আমার দাদার কেলে পুরাণ ভিটে।
ভেবে দেখ এই ভাবেতে অত্যাচারে অবিচারে—
হিংসা দ্বেষ ঘেন্না আদি কঠিন পাপের গুরু ভারে,
মনুষ্যত্বের সোপান থেকে ক্রমেই তুমি যাচ্ছ নামি,'
ধীরে ধীরে সে পথ ধরে রোজকে রোজই উঠ্‌ছি আমি।
যায় না তবু জ্ঞানের বড়াই কওনা দুটো মিষ্টিভাষা—
তোমার মত মানুষ হ'তে চাই না আমি—অজ্ঞ চাষা।

শ্রীঅক্রুরচন্দ্র ধর।

ভাই

"কাকাবাবু, তোমার ক্লাসের সুবোধ বলে গেল, তুমি পরীক্ষা পাশ করতে পারনি; গেজেটে তোমার নাম নেই।" সুরেশ বাবুর সাত বছরের মেয়ে প্রভা কথা কয়টী হেমচন্দ্রকে বলিয়া, তাহার মাকে এই খবরটা জানাইবার জন্য সেইখান হইতে উধাও হইয়া ছুটিয়া গেল।

সুরেশ বাবু মাসিক ৪০্ টাকা বেতনে কোন্ এক সওদাগরী অফিসে কাজ করিতেন। ঘুম হইতে উঠিয়া সকালে একবার অফিসে যাইতেন এবং তখন অফিসের দৈনিক কাজগুলি শেষ করিয়া ৯টা। ১০টায় বাড়ী ফিরিয়া কোন রকমে ভাত চারিটী পেটে পুরিয়া আবার উর্দ্ধশ্বাসে অফিসে ছুটিতেন। এই বেলা তাঁহার কাজ ছিল ঘুস্ যোগাড় করা। কি রকম ফিকির করিয়া যে তিনি ঘুস্ যোগাড় করিতেন, তাহা অফিসের আর এক নম্বর ঘুস্‌খোর শতীশ বাবু ওরফে ম্যানেজার বাবু ছাড়া আর কোন লোক না জানিলেও, তিনি এবং ম্যানেজার বাবু একজোট হইয়া যে অনেক দরিদ্রের ঘাড় ভাঙ্গিতেন, তাহা অফিসের সকলেই জানিত। সে যাহা হউক, এই রকম করিয়া সুরেশ বাবু সারাটা দিন অফিসে কাটাইয়া দিতেন, দিনের বেলা খাওয়ার সময়টা ছাড়া কিঞ্চিৎ তাঁহাকে বাড়ীতে পাওয়া যাইত। আর, বাড়ীতে তাঁহাকে বিশেষ দরকারও হইতনা। তাঁহার ছোট ভাই হেমচন্দ্রই বাড়ীর হাটবাজার ইত্যাদি ছোট বড় সমস্ত কাজ করিয়া লইত; এবং এই কাজ করিয়া যে সময়টুকু থাকিত তাহাতে হেমচন্দ্র সুরেশ বাবুর দুই ছেলেকে পড়াইত এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিজের পড়াটও পড়িয়া লইত।

এইরূপ প্রতিকূল অবস্থায় থাকিয়া হেমচন্দ্র কোন রকমে —অতি কষ্টে বছর বছর একটা করিয়া ক্লাশ পার হইতেছিল। এবার সে ম্যাট্রিকুলেশান্ দিয়াছিল। সে জানিত, সে পরীক্ষা পাশ করিতে পারিবেনা, তবু এতদিন অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু আজ অদৃষ্টদেব প্রেরিত 'ফেলের' খবর শুনিয়া সে দুঃখে এবং লজ্জায় একেবারে মুষ্‌ড়িয়া পড়িল। এতদিন সে দাদা এবং বৌদির কত গালাগাল নীরবে সহ্য করিয়া আসিতেছিল, কেবল এই আশায় সহ্য করিতেছিল যে, যদি পরীক্ষাটা পাশ করিতে পারে, তবে কোন রকমে ১০।১৫ টাকার একটা চাকুরী যোগাড় করিয়া বেতনের টাকা কয়টী,—যে দাদা বৌদির চারিটা ভাত খাইয়া সে পরীক্ষা দিয়াছিল,—তাহাদের হাতে দিয়া তাহাদিগকে একটু সুখী করিবে।

কিন্তু আজ তাহার সকল আশা ভরসা একেবারে নির্ম্মূল হইয়া গেল। আজ তাহার মনে পড়িল, দাদার নিকট পরীক্ষার 'ফিসের' টাকা চাহিতে গেলে দাদা বলিয়াছিলেন,—"দেখ্‌তে পাচ্ছ, সারাদিন খেটে আমি যা' রোজগার কচ্ছি তাতে আমার সংসারের খরচ চল্‌ছে না। তুমি কোথায় এমন সময় আমায় সাহায্য করবে,—তা' নয় পরীক্ষার টাকা চাইতে এসেছ। যাও, আমায় বিরক্ত কোরো না। আমি তোমায় এখন কিছু দিতে পারব না।" তাহার আরও মনে পড়িল,—তখন বৌদি বলিয়াছিলেন,—"চারটী খেতে পাচ্ছ, এইত যথেষ্ট, আবার পরীক্ষার টাকা কি বাপু? যাও, ওসব বাজে আব্‌দারে কাজ নেই। আমার ছেলে দুটোকে ভাল করে পড়াও,—তা'হলে রোজ চারটী খেতে পাবে।" তারপর মনে পড়িল, ভিক্ষা করিয়া সে টাকা সংগ্রহ করিয়াছিল। কিন্তু ভগবান্ তাহার এত কষ্টের মধ্যেও তাহাকে মুখ তুলিয়া চাহিলেন না।

এতদিন সে সকলই সহ্য করিয়াছিল, কিন্তু আজ তাহার কষ্ট যে একেবারে অসহনীয় হইয়া পড়িয়াছে। সে আজ কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিলনা। সুরেশ বাবু অফিস হইতে বাড়ী ঢুকিতেই খোকা বলিয়া ফেলিল,—"বাবা, কাকা বাবু পরীক্ষা ফেল্ করেছে, আমাদের সন্দেশ দিলে না।" সুরেশ বাবু অদূরে উপবিষ্ট হেমচন্দ্রের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বলিল,—"আমি আগেই জানতাম ও' গাধাটার কিছু হবে না. যাক্ ভাগ্যিস্ আমি টাকা ক'টা দিয়েছিলাম না।" তখনই বৌদি বলিলেন, "আমি তা জেনেই তো তোমায় বারণ করেছিলাম।"

এই রকম করিয়া সেইদিন কাটিয়া গেল, তারপর দিন সুরেশ বাবু দুপুরে অফিসে যাইবার সময় হেমচন্দ্র একেবারে সরাসর তাঁহার কাছে গিয়া বলিয়া ফেলিল,—"দাদা, আমি আবার পড়ব, এবার কিন্তু আমি আর বাড়ীর কিছু কাজ করতে পারবনা। ও'সব কাজ করতে গেলে আমার পড়ার সময় হবে না।"

তাহার কথার উত্তরে সুরেশ বাবু বলিলেন,—"না পার, তোমার পথ তুমি দেখ, আমি তোমার আর ভার সইতে পারব না।" এই অল্প কয়টী কথা বলিয়াই সুরেশ বাবু আফিসে চলিয়া গেলেন।

হেমচন্দ্র অনেক সহ্য করিয়াছে। আজ আর পারিল না। আজ সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িল। সঙ্গে লইল, তাহার মা মরিবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে তাহাকে যে একটা সিন্দুর মাখা টাকা দিয়া গিয়াছিলেন,—যাহা সে এতদিন স্বর্গের একটি ফুল মনে করিয়া সযত্নে রাখিয়া দিয়াছিল, সেই টাকাটী। আর কিছুই না।

ভাগ্যলক্ষ্মী তাহার প্রতি সুপ্রসন্না হইলেন। সারাদিন ঘুরিয়া অবশেষে সে জনৈক সওদাগরের অফিসে ২০৲ টাকার একটা চাকুরী পাইল। এবং অফিসের নিকটস্থ কোন এক 'মেসে' আশ্রয় লইল। ইহার পর হইতে তাহার দিনগুলি বেশ ভালই চলিতেছিল।

অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে। একদিন সে আফিসে বসিয়া কাজ করিতেছে, এমন সময় একটা টেলিগ্রাফ্ "পিয়ন" তাহার নামের একখানা টেলিগ্রাফ তাহার সম্মুখে ধরিয়া বলিল,—"বাবু বক্‌শিশ।" হেমচন্দ্র উহা খুলিল। পড়িয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তখন তাহার মনে পড়িল বাড়ী হইতে চলিয়া আসিবার কিছুদিন পরেই তাহার স্বর্গীয়া মার দেওয়া টাকাটী দিয়া সে তাহার স্বর্গীয়া মার নামে একখানা বিলাতের 'লটারির' টিকিট কিনিয়াছিল। আজ সে দেখিতে পাইল, সেই 'লটারির' প্রথম পুরস্কার ৫০,০০০ টাকা সে পাইয়াছে। ইহাই টেলিগ্রাফে লেখা আছে। এমন সময় আফিসের দারওয়ান আসিয়া বলিল,—"বাইরে একজন ভদ্রলোক আপনাকে ডাকছেন।"

হেমচন্দ্র টেলিগ্রাফখানি পকেটে পুরিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, তাহার দাদা,—সুরেশবাবু দাঁড়াইয়া আছেন।

সে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। সুরেশ বাবু তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন,—"বড় অন্যায় করেছিলাম, আমি ভাই, আজ তা বুঝ্‌তে পার্‌ছি, তুই চলে আস্‌বার পর থেকেই একটার পর একটা বিপদ আমায় আক্রমণ করেছিল। জানিস্. আমি ঘুস্ খেতাম্। তা'তে ধরা পড়ে আমার চাকুরী গেল। তার উপর আবার অফিসের টাকা খরচ করে প্রভার বিয়ে দিয়েছিলাম। তা'তে আমার জেলের হুকুম হয়েছিল। জমা টাকা সব খরচ করে মোকদ্দমা করে জেলের হুকুম রদ্ করেছি। কিন্তু ভাই, এখন আমি পথের ভিখারী, তাই তোর সাহায্য ভিক্ষা করতে এসেছি। আমার আশ্রয় দিবি কি ভাই?"

হেমচন্দ্রের একসঙ্গে অনেকগুলি গত কথা মনে পড়িল। সে নিজের চোখের জল মুছিয়া দাদাকে বলিল,—"দাদা, তোমার কোন চিন্তা নেই। তোমাদের সেবা করতে পারি এমন শক্তি ভগবান আমায় আজ দিয়েছেন। এই নাও দেখ।" এই বলিয়া টেলিগ্রামখানি সুরেশবাবুর হাতে দিল।

শ্রীসুখেন্দুবিকাশ সেন গুপ্ত।

জন্মান্তর-স্মৃতি

জন্মান্তের কথা মোর আজি যেন পড়িতেছে মনে
বিস্মৃত-গীতের সুর জাগে শান্ত চিত্ত-তপোবনে
মধুর প্রণব হেন! কোন্ এক অখ্যাত পল্লীর
নিভৃত কুটীর-কোণে স্নেহমাখা অঙ্কে জননীর
হয়েছিল জন্ম মম, পিতা মোর কৃষক সুজন
হৃদয়ের রক্ত দিয়ে কমলার রত্ন সিংহাসন
রচিতেন শস্য ক্ষেতে, স্বাভাবিক সরল জীবন
স্নিগ্ধ তরুছায়া ঘেরা শৈলজার স্রোতের মতন
বয়ে যেত অনাবিল!

মোদের সে পল্লীসীমানায়
অনুন্নত গিরিশ্রেণী লীলারত তরঙ্গের প্রায়
ছিল ব্যাপি' বহু দূর; সুকুমার শৈশব কৈশোর
ক্রীড়াসঙ্গীদের সনে কি আনন্দে হইয়া বিভোর
যাপিয়াছি সেথা সুখে গোচারণে হাস্য আলাপনে
প্রকৃতির নগ্ন শিশু সম! উন্মুক্ত স্বাধীন প্রাণ
চিন্তাহীন ক্লান্তিহীন!

হ'ত যবে দিবা-অবসান
ঘুঘুর করুণ কণ্ঠে ধ্বনিতগো অচল শেখর
উদাসীর হৃদি প্রায়, ফিরিতাম ধীরে সবে ঘর
তাড়ায়ে গোধনবৃন্দ পল্লীপথে উড়ায়ে গোধূলি
বাজায়ে মধুরে বেণু, হেরিতাম গৃহকর্ম্ম ভুলি'
মা আছেন পথ চেয়ে!

চুম্বি' পল্লি-সীমান্ত প্রদেশ
বয়ে যেত স্রোতস্বিনী করি চিত্তে স্বপন আবেশ
পুলকে দু'কূল প্লাবি'—উভতটে বিস্তৃত প্রান্তরে
সাজায়ে শ্যামল সাজে! প্রতিদিন প্রফুল্ল অন্তরে
সাথীদের সাথে মিলি' সুপ্রশান্ত তটিনী-হৃদয়ে
মাতিতাম সন্তরণে—কলহাস্যে আনন্দে নির্ভয়ে
ছুটিতাম বহুদূর, অন্বেষিয়া বরুণ রাজার
সুগোপন রাজধানী!

স্নেহময়ী মায়ের আমার
পুরাইতে মনোসাধ একদিন মধু শুভক্ষণে
মঙ্গল-উৎসব মাঝে নিয়ে এনু আপন সদনে
অজানা কিশোরী এক—অফুটন্ত কুসুম কলিকা
অপূর্ব্ব মাধুরী ভরা! প্রজাপতি গাঁথিয়া মালিকা
দিলা বুঝি উপহার! অকস্মাৎ বসন্তের পিক্
গাহিল জীবনকুঞ্জে, সুধাময় হয়ে দশদিক্
দেখা দিল আঁখি পাশে, মুঞ্জরিল শুষ্ক অরণ্যানী
নব ঘন সমাগমে!

মোর ক্ষুদ্র হৃদয়ের রাণী
একে একে জননীর দৈনন্দিন-গৃহকর্ম্মভার
নিল নিজ শিরে তুলি, দিল তাঁরে হর্ষে উপহার
নন্দনের পারিজাত দেবশিশু দিব্য সুকুমার
অবসর-সঙ্গী যিবা! মা আমার ভুলিলা সংসার
স্নেহ নিধি অঙ্কে লভি'!

দিনু আমি জনকে বিশ্রাম
কৃষিকাজ করে লয়ে—কি আনন্দে নিত্য অবিরাম
অনলস-পরিশ্রমে পূর্ণস্বাস্থ্য করিতাম ভোগ
স্মিতাননা প্রিয়া সনে! মনে হ'ত দুঃখ-দৈন্য-রোগ
কেবলই কথার কথা! প্রতিদিন কর্ম্মক্লান্ত দেহে
যবে আসিতাম ফিরি স্বর্গাধিক মোর সেই গেহে
বৃদ্ধ পিতামাতা মোর করিতেন স্নেহে সম্ভাষণ
ব্রীড়ানম্র প্রেয়ামুখ হেরিতাম উজ্জ্বল কেমন

ক্ষুদ্র শিশু মধু হাসি' কণ্ঠ মোর করিত বেষ্টন
ভাবিতাম কত সুখী—তুচ্ছ শত রাজসিংহাসন
মোর এ সুখের পাশে!
আজি হায়, মোর কিছু নাই!—
দগ্ধ মরুভূমি মাঝে লয়ে শুধু ধূ ধূ শূন্যতাই
জীর্ণ-দেহে'ভগ্ন-প্রাণে পড়ে আছি নিঃসঙ্গ একাকী
বিশ্ব-আবর্জ্জনা প্রায়! মুছাবারে অশ্রুসিক্ত আঁখি
একটী সান্ত্বনাবাণী কহিবারে সুতীব্র ব্যথায়
জুড়াতে আশ্রয় দিয়ে এ বিশাল বিপুল ধরায়
নাহি কেহ আজি মোর! হর্ষোৎফুল্ল দিব্য জন্মান্তরে
সরে গেছে বহু দূরে! বজ্রাহত শুষ্ক তরুবর
পুষ্পিত দিনের স্মৃতি সারা বক্ষে ধরি নিরন্তর
লুণ্ঠিত ধূলায় যেন!

তবু মোর সকল অন্তর
দিনান্তে গগনপ্রান্তে হেরে যবে সান্ধ্যতারকায়
কেঁদে উঠে অকস্মাৎ। মনে হয় সুদূরে কোথায়
জন্মান্তের প্রিয়া মোর জ্বালি' দীপ তুলসীতলায়
কৃতাঞ্জলিপুটে নমি' বসে আছে মোর প্রতীক্ষায়
অটল বিশ্বাস ভরে! ব্রতখিন্ন প্রসন্ন আননে
কি অতুল শান্তি তৃপ্তি উদ্ভাসি' উঠিছে ক্ষণে ক্ষণে
পুণ্যে প্রেমে শুচিতায়! এ ব্যথিত তৃষিত পরাণ
না জানি সে সতীতীর্থে পাবে কবে শাশ্বত সন্ধান!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

আকবর ও জৈনধর্ম্ম

সম্রাট আকবরের বিভিন্ন ধর্ম্মানুরাগের কথা চিরপ্রসিদ্ধ। ভারতের মোগল ও পাঠানগণের মধ্যে আকবর এত লোকপ্রিয় হইতে পারিয়াছিলেন, তাহার কারণ, বিভিন্ন ধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ; তিনি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে বিভিন্ন ধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্মগ্রহণের, সত্যাসত্য অনুসন্ধানের চেষ্টা করিতেন। অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় জৈনধর্ম্মেও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ও সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। জৈনধর্ম্ম প্রচারকগণের মধ্যে হীরবিজয় সূরি নামক এক বিদ্বান্ জৈনধর্ম্মাচার্য্য অন্যতম; ইনি সম্রাট আকবরের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, ইঁহার সময়েই জৈনধর্ম্মের বিশেষ অভ্যুদয় হয়। দেব-বিমলগণি রচিত হীর-সৌভাগ্য নামক কাব্যে ইঁহার জীবনচরিত বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে, এই কাব্যে সম্রাট আকবরের সংক্ষিপ্ত জীবনী তাঁহার রাজ্যব্যবস্থা, ধর্ম্মানুরাগ প্রভৃতি সম্বন্ধেও অনেক কথা জানিতে পারা যায়। জৈনধর্ম্মাচার্য্যগণকে সম্রাট কিরূপ কৃপাদৃষ্টিতে দেখিতেন, তাঁহাদের প্রার্থনা রক্ষা করিবার জন্য তিনি কিরূপ সচেষ্ট থাকিতেন, আচার্য্যগণকে তিনি কিরূপ আদর অভ্যর্থনা করিতেন, হীর সৌভাগ্য পাঠ করিলে এ সকল বিষয়ে অনেক নূতন কথা জানিতে পারা যায়। জগদ্গুরু নামক সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ পাঠ করিলেও সম্রাট আকবর ও জৈনধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ অবগত হওয়া যায়। সকল ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের বিদ্বান্, পণ্ডিত ও আচার্য্যগণের সহিত বাক্যালাপ করিয়া, সম্রাট ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন, তত্ত্বজ্ঞান ও সত্যানুসন্ধানের জন্য তিনি দরিদ্রের কুটীরে যাইতেও লজ্জিত হইতেন না; এই জন্যই তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মাচার্য্যগণকে নিজের সভায় সাদরে ও সসম্মানে আহ্বান করিতেন। আকবর যে একজন উদার ধর্ম্মতত্ত্বান্বেষী ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহ।

সম্রাট আকবরের সভায় বিভিন্ন ধর্ম্মাচার্য্যগণের মধ্যে, জৈনধর্ম্মের প্রধান আচার্য্য হীরবিজয় সূরি অন্যতম ছিলেন, বিজয়সেন সূরি ও ভানুচন্দ্র উপাধ্যায় নামক আরও দুইজন জৈন পণ্ডিত আকবরের সভায় ছিলেন। পালনপুর নামক গ্রামে হীরবিজয়ের জন্ম হয়, তের বৎসর বয়সেই তিনি পিতৃমাতৃহীন হইয়া ভগ্নীর আশ্রয়ে গিয়া বাস করিতে

লাগিলেন। এই স্থানেই বিজয়দান সূরি নামক জৈন-ধর্ম্মাচার্য্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, ইঁহার ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণে হীরবিজয়ের মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। তের বৎসর বয়সেই বিজয়দান সূরির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ইনি ধর্ম্মচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিলেন (১৫৩৯ খৃ অব্দ)। কিছুদিন পরে গুরুবিজয় দান হীরবিজয়কে দেবগিরী নিবাসী ধর্ম্মসাগর উপাধ্যায়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র পড়িবার জন্য পাঠাইয়া দেন; তখন হইতে তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া গুজরাটে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৫৫১ খ্রীঃ অব্দে হীর বিজয়বাচক উপাধিতে ভূষিত হন এবং ১৫৫৩ খৃঃ অব্দে সূরি (প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য) উপাধি প্রাপ্ত হন। অল্পদিনের মধ্যে তাঁর বিজয়ের ধর্ম্মপ্রাণতার কথা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। সম্রাট আকবরও তাঁহার এই অলৌকিক প্রতিভার কথা শুনিলেন ধর্ম্মতত্ত্বপিপাসু সম্রাট অবিলম্বে মোদী ও কামাল নামক দুই জন সেনানায়ককে তাঁহার ফরমান (অনুজ্ঞাপত্র) সহ আহমদাবাদের শাসনকর্ত্তা শাহাবুদ্দীন আহম্মদ খাঁর নিকট প্রেরণ করিলেন। ফরমানে তিনি শাহাবুদ্দীনকেই লিখিয়াছিলেন যে, "অবিলম্বে মহাত্মা হীরবিজয় সূরিকে সসম্মানে ফতেপুর সীকরীতে পাঠাইবে।" হীরসৌভাগ্যের একাদশ সর্গে এই ফরমান সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে;—

"মদীয়ান্নগঃ সাহিবংখান অস্তেহি তৈষী পিতেবাঙ্গিনাং গুর্জরেষু।
দদাতাং সুবাং তস্য নিঃশেষবাচ্যং দধানং স্ফুরন্মানমেতন্মদীয়ম্‌॥"

সম্রাটের ফরমান পাইয়া শাহাবুদ্দীন আহমদাবাদের প্রধান প্রধান জৈনগণকে আহ্বান করিয়া সম্রাটের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করেন, বিজয় সূরি সে সময় গ্রামান্তরে গিয়াছিলেন। কয়েকজন প্রধান জৈন একত্রিত হইয়া হীরবিজয়ের নিকট গমন করেন এবং শাহী ফরমানের কথা তাঁহাকে বলেন। হীরবিজয় ভাবিলেন, সম্রাটের আশ্রয় এবং অনুগ্রহে জৈন ধর্ম্মের বিশেষ উন্নতি হইতে পারে, তিনি সানন্দে সম্রাটের নিকট যাইতে স্বীকৃত হইলেন। আহমদাবাদে প্রত্যাবর্ত্তনান্তর শাহাবুদ্দীনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, মোদী ও কামালের সহিত হীরবিজয় পদব্রজে সীকরী অভিমুখে প্রস্থান করেন। পট্টন, সিদ্ধপুর, সিরোহী, মেড়তা প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া তিনি সাঙ্গনেরে উপস্থিত হন এবং তাঁহার শিষ্য বিমলহর্ষকে নিজের আগমনবার্ত্তা সম্রাটের নিকট জ্ঞাপন করিবার জন্য সীকরীতে প্রেরণ করেন। হীর বিজয়ের আগমনবার্ত্তা পাইয়া সম্রাট মানসিংহ প্রভৃতি হিন্দু কর্ম্মচারিগণকে আজ্ঞা দেন যে, সমারোহ ও সম্মানের সহিত হীরবিজয়কে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আইস; আকবরের আজ্ঞামত কর্ম্মচারিগণ ও জৈনধর্ম্মাবলম্বীগণ রথ, অশ্ব, হস্তি লইয়া মহাসমারোহে সাঙ্গনেরে উপস্থিত হন; এই বিরাট মিছিলের সহিত আচার্য্য সূরি ফতেপুর সীকরীতে আগমন করেন এবং এক রাত্রের জন্য জগমল কছবাহের বিশাল ভবনে বিশ্রাম করেন। পরদিন হীরবিজয় সম্রাট সভায় উপস্থিত হন, কিন্তু সম্রাট সে সময় বিশেষ রাজকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় শেখ আবুল ফজলের উপর হীরবিজয়ের সেবার ভার অর্পণ করেন। আবুল ফজল সভক্তি সম্মানে তাঁহাকে আপন ভবনে লইয়া যান।

অতঃপর আবুল ফজল হীরবিজয়ের সহিত ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হন। হীর সৌভাগ্যের অনুসারে আবুল ফজল আচার্য্য সূরিকে এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন; তিনি বলিলেন,—"আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণে লিখিত আছে যে, মৃত্যুর পর মুসলমানগণের দেহ মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখা হয়, অতঃপর প্রলয়ান্তে এই প্রোথিত শরীরের আত্মা সকল স্ব-স্ব কবর হইতে বহির্গত হইয়া খোদানামক ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইবে। খোদা অপক্ষপাতভাবে সকলের পাপ পুণ্যের বিচার করিয়া, বিচারপ্রার্থীগণের পাপ ও পুণ্যের প্রতিফল ঠিক সেই ভাবে দিবেন, যেমন পৃথিবী তাহার গর্ভে রোপিত বীজের ফল দান করেন। পুণ্যাত্মাগণ স্বর্গে যান, তথায় তাঁহারা ভোগ সুখে বাস করিতে থাকেন, আর পাপাত্মাগণ নরকের অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে থাকে। হে মহাত্মা! আমাদের কোরাণে যে এই সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, ইহা সত্য বা আকাশ-কুসুমের মতই ভিত্তিহীন, তাহাই আমি আপনার নিকট জানিতে ইচ্ছা করি।"*

* পৈগম্বরৈর্নঃ সময়েষু সূরে পুরাতনৈর্ব্যাহৃতমেতদস্তি।
নিক্ষিপ্যতেস্মাসইব ক্ষমায়াং যমাতিথির্যো যবনস্য বংশ্যঃ॥
পুনঃপ্রলয়ে শ্রীপরমেশ্বরস্য স্থানীং স্থিতস্যাধিপতেরিবোর্ব্যাঃ।
উত্থায় পৃথ্ব্যাঃ পরিবর্ত্তকালে গন্তা সামগ্রোঽপি জন পুরস্তাত্‌।
আদর্শিকায়ামিব পুণ্যপাপে সংক্রাম্য সংশুদ্ধ নিজ পলজৌ।
বিধাস্যতে সাধু স তত্র তস্যস্যায়ং নিরস্য স্বপরানুরোধম্‌॥
* * * * *
কুরানবাক্যং কিমিদং যথার্থ মহাত্মানাং বাক্যমিবাস্তি সূরে।
ইব প্রসূনে গগণস্য তস্মিন্ন্ ভাভ্যাদেতি ব্যভিচারিভাবঃ॥
হীর-সৌভাগ্য ১৩ সর্গ।

এই প্রশ্ন শুনিয়া হীরবিজয় কতকগুলি শ্লোকে আবুল ফজলের এই মতের খণ্ডন করেন এবং বলেন যে, এই বিশ্বসংসার কেহ সৃষ্টিও করে নাই, কেহ নাশও করিবে না। প্রাণীগণের মধ্যে যে বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ প্রাণীগণের প্রাক্তন কর্ম্ম! আমার মতে সৃষ্টি কর্ত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করা সম্পূর্ণ ভুল।:—

"কর্ত্তা চ হর্ত্তা নিজ কর্ম্ম জন্ম বৈচিত্র্য বিশ্বস্য ন কশ্চিদস্তি।
বন্ধ্যাত্মজন্মেব তদস্তি ভাবোঽসন্নেব চিত্তে প্রতিভাসতে তৎ॥"

হীর-বিজয়ের এই উত্তরে আবুল ফজল অত্যন্ত আনন্দিত হন, তিনি বলিলেন,—

"ইদং গদিত্বা বিরতে মুনিন্দ্রে শেখঃ পুনর্বাচমিমামুবাচ।
বিজ্ঞায়তে তদ বহুগর্হ্যবাচি বীচীব তথ্যেতরতা তদুক্তৌ॥"

অর্থাৎ আবুল কহিলেন, এরূপ অবস্থায় ইহাই বলিতে হইবে যে, আমাদের ধর্ম্মপুস্তকে কতকগুলি অমূলক কথা লিখিত হইয়াছে। এই স্থানে ইহা বলিয়া রাখা উচিত যে, হীরবিজয় সৃষ্টি ও স্রষ্টা সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, উহাই জৈনগণের ধর্ম্মমত। রাজকার্য্য শেষ হইলে আকবর হীরবিজয়কে আহ্বান করেন, তিনি উপস্থিত হইলে, সম্রাট তাঁহাকে কিরূপে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, তাহা জগদ্গুরু কাব্যের এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে:—

"চঙ্গা হো গুরুজীতিবাক্যচতুরো হস্তে নিজং তৎকরং;
কৃত্বা সূরি বরান্নিনায় সদনান্তর্বস্ত্রেরুদ্ধাঙ্গনে।
তাবচ্ছ্রীগুরবস্ত পাদকমলং নারোপয়ন্তস্তদা;
বস্ত্রানামুপরীতি ভূমিপতিনা পৃষ্টাঃ কিমেতদ্ গুরো॥"

হীরবিজয়ের হস্তধারণপূর্ব্বক সম্রাট কহিলেন,— "গুরুজী, কুশলে আছেন?" সূরি সম্রাটকে আপনার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল জ্ঞাপন করিলেন। সম্রাট তাঁহাকে পালঙ্কে উপবেশন করিতে বলিলেন, ইহার উত্তরে সূরি জানাইলেন যে, জৈন ধর্ম্মাচার্য্যগণের বস্ত্রাসনে শয়ন বা উপবেশন এবং যান বা অশ্বারোহণে গমনাগমন নিষিদ্ধ। তিনি ভূমিতেই উপবেশন করিলেন; অনন্তর সূরি ও সম্রাটের মধ্যে ধর্ম্ম-চর্চ্চা আরম্ভ হইল; ঈশ্বর ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে বহুক্ষণ আলোচনা হয়। হীর-বিজয়ের ধর্ম্ম ও তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া আকবর অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অনেকগুলি পুস্তক তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলেন। আবুল ফজলের অনুরোধে হীরবিজয় এই পুস্তকগুলি গ্রহণ করেন এবং কিছুদিন পরে আগরার পুস্তকালয়ে দান করিয়া দেন। সীকরীতে কিছুদিন সম্রাটের নিকট থাকিয়া, সূরি আগরায় গমন করেন। ১৫৮২ খ্রীষ্ট অব্দের মধ্যভাগে তিনি আগরায় উপস্থিত হন, প্রায় পাঁচ মাস কাল তথায় অবস্থান করিয়া, তিনি পুনরায় সীকরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই বার হীর বিজয় সম্রাটকে ধর্ম্মোপদেশ দান করেন। আকবর তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া রথ, অশ্ব, অর্থ জায়গীর প্রভৃতি দান করিতে ইচ্ছা করেন, হীরবিজয় বিনীত ভাবে সম্রাটকে জানাইলেন যে, এ সকলের পরিবর্ত্তে আপনি আমার দুইটি প্রার্থনা রক্ষা করুন, প্রথম পালিত জীব-জন্তুগণকে মুক্তি দিন এবং দ্বিতীয়, আমাদের প্রধান পর্ব্ব পর্য্যষণার সময়, সাম্রাজ্যময় আট দিন পর্য্যন্ত কেহ যেন জীবহিংসা না করে, এই আজ্ঞা প্রচার করিয়া দিন;—

"প্রারভ্য মেচকনভোদশমীং শমীশ,
যাবন্নভস্য বহুলেতরষষ্ঠিকান্তাত্।
তাবচ্চরন্তু সুখমঙ্গিগনাস্ত্রিলোকী,—
জীবাতুনেব ভবতাং বচসেত্যুদিত্বা॥
হীরসৌভাগ্য, ১৪শ সর্গ।

সম্রাট সানন্দে হীরবিজয়ের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। আটদিনের পরিবর্ত্তে তিনি বারদিন পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যময় জীবহিংসা নিবারণের ফরমান জারি করিলেন, কিছুদিন পরে সম্রাট নওরোজেও পশুবধ নিবারণের আজ্ঞা প্রচার করেন,—

"শ্রীমৎপর্য্যুষণাদিনা রবিমিতাঃ সর্বেঽরবের্বাসরাঃ।
সোফীয়ানদিনা অপীদদিবসাঃ সংক্রান্তিঘস্রাঃ পুনঃ॥
মাসঃ স্বীয়জনের্দিনাশ্চ মিহিরস্যাপ্যেঽপি ভূমীন্দুনা।
হিন্দুম্লেচ্ছমহীবৃতেনবিহিতাঃ কারুণ্যপন্যাপণাঃ॥
তেননবরোজদিবসাস্তনুজজনুরজবমাসদিবসাশ্চ।
বিহিতা অমারিসহিতাঃ সলতান্তরবো বনেনেব॥
হী-সৌ ১৪শ সর্গ।

রবিবার এবং সম্রাটের জন্মমাসেও জীবহিংসানিবারণের আজ্ঞা প্রচারিত হয়। হিন্দু বিশেষতঃ জৈনগণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বৎসরের আরও কতকগুলি নির্দ্দিষ্টদিবসে

পশুবধনিবারিত হয়। প্রসিদ্ধ ইতিহাসকার বদাউনীও একথার উল্লেখ করিয়াছেন; বিজয়প্রশস্তি নামক মহাকাব্যেও এ কথার উল্লেখ আছে।

সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসলেখক সার জন ম্যালকম, সম্রাট আকবরের উপরোক্ত ফরমানখানির উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, উজ্জয়নীর এক জৈনমন্দিরে এই ফরমান খানি অদ্যাপি সযত্নে রক্ষিত আছে; উক্তমন্দিরের আচার্য্য ঐ ফরমানখানি দেখাইয়া ইংরাজ সরকারের নিকট প্রার্থনা করেন যে, তাঁহারাও বারদিনের জন্য ভারতে জীবহিংসা নিবারণের আজ্ঞাপ্রচার করিয়া দিন।" মালকম সাহেব এই ফরমানের যে ইংরাজি অনুবাদ করিয়াছেন নিম্নে তাহা যথাযথ উদ্ধৃত করিলাম।"

"In the name of God, God is Great."

"Firman of the Emperor Jalalodeen Mahomed Akbar Shah, Padsha, Ghazee."

"Be it known to the Moottasuddies of Malwa, that as the whole of our desires consist in the performance of good actions, and our virtuous intentions are constantly directed to one object, that of delighting and gaining the hearts of our subjects, etc."

"We, on hearing mention made of persons of any religion or faith, whatever, who pass their lives in sanctity, employ their time in spiritual devotion, and are alone intent on the contemplation of the Deity, shut your eyes on the external forms of their worships, and considering only the intention of their hearts, we feel a powerful inclination to admit them to our association, from a wish to do what may be acceptable to the Deity. On this account, having heard of the extraordinary holiness and of the severe penances performed by Hirbuji Soor and his disciples, who reside in Guzerat, and are lately come from thence, we have ordered them to the presence, and they have been ennobled by having permission to kiss the abode of honour."

"After having received their dismissal and leave to proceed to their own country,—they made the following request :—that if the King, protector of the poor, would issue orders that during the twelve days of the month Bhadon, called Putchoossur (which are held by the Jains to be particularly holy), no cattle should be slaughtered in the cities where their tribe reside, they would thereby be exalted in the eyes of the world, the lives of a member of living animals would be spared, and the actions of His Majesty would be acceptable to God; and as the persons who made this request came from a distance, and their wishes were not at variance with the ordinances of our religion, but on the contrary were similar in effect with those good works prescribed by the venerable and holy Mussalman, we consented, and gave orders that, during those twelve days called Putchoossur, no animal should be slaughtered.

"The Present Sunnud is to endure for ever, and all are enjoined to obey it, and use their endeavours that no one is molested in the performance of his religious ceremonies. Dated 7th Jumad-ul-Sani, 992, Hijirah."*

উপরোক্ত ফরমানখানি যে সম্রাট হীরবিজয় সূরিকে দিয়াছিলেন, আকবর প্রদত্ত অন্য একখানি ফরমানে সে কথা স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে জয়চন্দ্রসূরির প্রার্থনানুযায়ী সম্রাট তাঁহাকেও একখানি আজ্ঞাপত্র বা ফরমান প্রদান করেন, এই ফরমানখানি আজও কাশীর জৈনমুনি ইন্দুবিজয় সূরির নিকট রহিয়াছে। ফরমানখানি ফারসী ভাষায়

* See the Memoirs of Central India. Vol. II. by Sir John Malcolm.

লিখিত, উপরে সম্রাটের অঙ্গুরির শিলমোহর খোদিত আছে।

নিম্নে এই ফরমানখানির সংক্ষিপ্ত মর্ম্মানুবাদ দেওয়া হইল।

"সুবা মুলতান ও হিন্দুস্থানের বিভিন্নস্থানের শাসনকর্ত্তাগণ, জমীদারগণ, করোড়ী এবং মুৎসুদ্দীগণকে (কর্ম্মচারি) জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার আন্তরিক ইচ্ছা, যাহাতে সমস্ত মানুষ ও জীবজন্তু সুখ ও শান্তিতে জীবন যাপনের সঙ্গে সঙ্গে ভগবতারাধনায় দিনাতিবাহিত করে। ইতিপূর্ব্বে জয়চন্দ্র সুরি নামক জৈনধর্ম্মাচার্য্য আমার অন্তরঙ্গ ও সভাসদ ছিলেন। তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া আমি তাঁহাকে যৎসামান্য উপহার দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, তিনি প্রার্থনা করেন যে, "পূর্ব্বে আচার্য্য হীরবিজয় সুরি সম্রাটের অসীম অনুগ্রহলাভে গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন, এবং তিনি সম্রাটের নিকট হইতে বৎসরে ১২ দিন রাজ্যময় পশুবধ নিবারণের অনুজ্ঞাপত্র পাইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে সম্রাটের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, আরও সাতদিন পশুবধ নিবারণের আজ্ঞাপত্র প্রদান করা হউক।" তাঁহার এই প্রার্থনায়, আমি আমার সমগ্র প্রজাগণকে জানাইতেছি, যে, আমার আজ্ঞায় আষাঢ় মাসের শুক্লানবমী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত কেহ যেন পশুবধ বা জীবহিংসা না করে। ঈশ্বর যখন মানুষের জন্য নানাপ্রকার রসনাতৃপ্তিকর পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন কোন জীবকে অনর্থক কষ্ট দেওয়া বা নিজের উদরে পশুগণের কবর নির্ম্মাণ করা নিতান্ত অন্যায়। বর্ত্তমানে জিনসিংহ ওরফে মানসিংহ প্রার্থনা করেন যে, পূর্ব্বের অনুজ্ঞাপত্রখানি হারাইয়া গিয়াছে, অতএব পূর্ব্ব ফরমানের অনুসারে আমি আর একখানি নবীন ফরমান তাঁহাকে (মানসিংহকে) দান করিলাম এবং সমগ্র প্রজাবর্গকে আদেশ করিতেছি যে, তাঁহারা যেন এই আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করেন। তারিখ ৩১ খোরদাদ, ইলাহী সন ৪৯।" দৌলত খাঁর নির্দ্দেশানুসারে খাজা লালচন্দ এই ফরমান লিখিয়াছিলেন।

উপরোক্ত ফরমান হইতে স্পষ্ট জানিতে পারা যায় যে হীরবিজয় সম্রাটের নিকট হইতে বারদিন জীবহিংসা নিবারণের আজ্ঞাসূচক ফরমান পাইয়াছিলেন। তাঁহার পর জয়চন্দ্র সুরিও বৎসরে এক সপ্তাহ পশুবধ নিবারণের ফরমান প্রাপ্ত হন। এই ফরমান হইতে জৈনধর্ম্মের প্রতি সম্রাট আকবরের প্রগাঢ় অনুরাগ ও সহানুভূতির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

সম্রাট হীরবিজয়কে "জগৎগুরু" উপাধিতে ভূষিত করেন। কিছুদিন পরে শান্তিচন্দ্র নামক শিষ্যকে আকবরের সভায় নিযুক্ত করিয়া, ১৫৮৪ খৃঃ অব্দে হীরবিজয় প্রয়াগে প্রস্থান করেন; কিছুদিন প্রয়াগে থাকিয়া তিনি আগরায় ফিরিয়া আসেন এবং এখান হইতে গুজরাটে প্রস্থান করেন। পথে চারমাস সিরোহীতে থাকিয়া ১৫৮৭ খৃঃ অব্দে হীরবিজয় পাটনে উপস্থিত হন। ইতিমধ্যে শান্তিচন্দ্র রসকোশ নামে আকবরের প্রশংসাসূচক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে তিনি সম্রাটের সৎকার্য্য এবং ধর্ম্মপ্রাণতার কথা বিশদভাবে বর্ণন করেন। শান্তিচন্দ্রের মুখে সমগ্র কাব্যখানি শ্রবণ করিয়া সম্রাট অত্যন্ত আনন্দিত হন। কিছুদিন পরে শান্তিচন্দ্র হীরবিজয়ের দর্শনেচ্ছায় যখন সীকরী হইতে পাটনে যাইবার উদ্যোগ করিলেন, তখন আকবর তাঁহার জীবহিংসা নিবারণের আজ্ঞাসূচক ফরমানের একখানি প্রতিলিপি তাঁহাকে প্রদান করেন। এই নূতন আজ্ঞাপত্রে পশুবধ নিবারণের দিনসংখ্যা আরও বাড়াইয়া দেওয়া হয়, এবং জিজিয়া নামক কর বন্ধ করিবার আজ্ঞাও প্রদান করেন। * শান্তিচন্দ্রের পর ভানুচন্দ্র নামক জৈনধর্ম্মাচার্য্য আকবরের সভায় নিযুক্ত হন। ভানুচন্দ্রের সিদ্ধিচন্দ্র নামক এক শিষ্য, বাণভট্ট কৃত কাদম্বরীর এক টীকা রচনা করেন। এই টীকার শেষে ভানুচন্দ্র এবং আকবর সম্বন্ধে দু'একটি নূতন কথা জানিতে পারা যায়। সিদ্ধিচন্দ্রের শতাবধানে সন্তুষ্ট হইয়া, আকবর তাঁহাকে "খুশফহেম" উপাধি দান করেন। ভানুচন্দ্র আকবরকে সূর্য্যসহস্র নাম পাঠ করাইয়াছিলেন এবং শত্রুঞ্জয় তীর্থের যাত্রিগণের নিকট হইতে যে কর লওয়া হইত, সম্রাটকে অনুরোধ করিয়া তাহাও উঠাইয়া দেন। হীর বিজয়ের পরামর্শেই ভানুচন্দ্র এই সকল কার্য্য করিয়াছিলেন। †

---

* জয়বত্যাং ধৃরিসংস্থিতিমাদধে, নৃপতিরেব তমুগ্রকরং ত্যজন।—কৃপারসকোশ।

† ইতি শ্রীপাদশাহ শ্রীঅকব্বরজলালুদীনসূর্য্য সহস্রনামধ্যাপক শ্রীশত্রুঞ্জয় তীর্থকরমোচনাদ্যনেক সুকৃতবিধায়ক মহোপাধ্যায় শ্রীভানুচন্দ্র গণিতচ্ছিষ্যাষ্টোত্তরশতাবধান সাধকপ্রমুদিতপাদশাহ শ্রীঅকব্বরপ্রদত্ত-খুশফহমপদাভিধান মহোপাধ্যায় শ্রীসিদ্ধিচন্দ্রগণিবিরচিতায়াং কাদম্বরী টীকায়ামুত্তর খণ্ডটিকা সমাপ্তা।

ইহার পর ধর্ম্মাচার্য্য বিজয় সেন সূরিকে সম্রাট আহ্বান করেন, এবং বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আলোচনা করেন। সে সময় সীকরীতে এক বিরাট ধর্ম্মসম্মিলন হইয়াছিল বলিলেও চলে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের অসংখ্য আচার্য্য এবং বিদ্বান সে সময় তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন; এই অসংখ্য ধর্ম্মাচার্য্যগণের সহিত বিজয় সেন সূরির ধর্ম্ম ও শাস্ত্র বিবাদ উপস্থিত হয়। বিজয় সেন স্বীয় গভীর ধর্ম্ম ও শাস্ত্রজ্ঞানের প্রভাবে ৩৬৩ জন প্রতিবাদি ধর্ম্মাচার্য্যকে পরাস্ত করেন। তাঁহার বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ হইয়া আকবর তাঁহাকে স্বামী এবং ভানুচন্দ্রকে উপাধ্যায়ের উপাধিতে ভূষিত করেন। মহাসমারোহের সহিত আচার্য্যদ্বয়কে উপাধি দান করা হয়, এই উপাধি দান উপলক্ষে আবুল ফজল অসংখ্য অশ্ব এবং ছয় শত মুদ্রা দান করেন। ‡

১৫৮৭ খৃঃ অব্দে হীরবিজয় চার মাস পাটনে ছিলেন এবং ১৫৮৮ খৃঃ অব্দে সৌবর্ণিক (স্বর্ণ বণিক) তেজপাল প্রদত্ত "সুপার্শ্ব" ও "অনন্ত"দেবের মূর্ত্তিদ্বয় প্রতিষ্ঠা করেন। তেজপালের অনুরোধে শত্রুঞ্জয় তীর্থে ১৫৯০ খৃঃ অব্দে হীরবিজয় আদীশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর কতকগুলি প্রসিদ্ধ তীর্থপর্য্যটন করিয়া, ১৫৯২ খৃঃ অব্দে বৃদ্ধাবস্থায় হীরবিজয় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

হীরবিজয় প্রতিষ্ঠিত আদিশ্বর মন্দিরে সংস্কৃত পদ্যে লিখিত এক বৃহৎ শিলালিপি আছে। তাহা হইতেও হীরবিজয়ের ধর্ম্মপ্রাণতার কথা এবং জৈন ধর্ম্মের প্রতি সম্রাট আকবরের প্রগাঢ় অনুরাগের কথা স্পষ্ট জানিতে পারা যায়। যথা:—

"দত্তং সাহস ধীর হীর বিজয় শ্রীসূরিরাজাং পুরা,
যচ্ছ্রীশাহি অকব্বরেণ ধরণীশক্রেন তৎপ্রীতয়ে।
তচ্চঃক্রেখিলমপ্যবালমতিনা যৎসাজ্জগৎসাক্ষিকং,
তৎপত্রং ফুরমান সংজ্ঞমনঘং সর্ব্বাদিশোব্যানশে॥"

বিজয়সেন সম্বন্ধে লিপিতে এই লিখিত আছে:—

"যে চ শ্রীমদকব্বরেণ বিনয়াদাকারিতাঃ সাদর,
শ্রীমল্লাভপুরং পুরন্দরপুরং বক্তুং সুপর্বোৎকরৈঃ,
ভূয়ো ভিত্র্ভিভিভু্ধৈঃ পরিবৃতা বেগাদলং চক্রিরে,
সামোদং সরসং সরোরুহবনং লীলামরালা ইব॥"

মুসলমান হইয়াও আকবর সমস্ত ধর্ম্ম এবং সম্প্রদায়কে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, তাই তিনি ভারতে প্রিয় আদর্শ-সম্রাট হইতে পারিয়াছিলেন। উপরোক্ত প্রমাণাদি হইতে বেশ জানিতে পারা যায় যে, অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায়, জৈন ধর্ম্মেও তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি ছিল। বারান্তরে আকবর ও বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়।

‡ শেখো রূপকষট্‌শতীং ব্যতিকরে তত্রাশ্বদানাদিভিঃ।

বর্ষা-বন্দনা

বর্ষ পরে হে বরষা এসেছ আবার,—
লুপ্ত করি চন্দ্র সূর্য্য ঢালি অন্ধকার।
দেবতা মৃগয়া ডঙ্কা বাজিছে অম্বরে,
ঝরে তাই বৃষ্টি-শর আজি ধরা পরে।
সুরঞ্জিত ইন্দ্রধনু ওই দেখা যায়,
ক্ষণে পুনঃ মেশে গিয়ে গগণের গায়।
আজি যত আকাশের অপ্সরা নারী,
মুহু মুহু বিজলীর হানে পিচকারী।
তৃণাঙ্কিত ধরণীর হরিৎ অঞ্চল,
লুণ্ঠিত প্রান্তরে আজি ধারা সমুজ্জ্বল।

সহসা কুঞ্জের শিরে হয়েছে প্রকাশ,
প্রস্ফুটিত কদম্বের আনন্দ উচ্ছ্বাস।
স্ফীতা তটিনী ওই আবেগ চঞ্চল,
অদম্য উৎসাহ বেগে ছুটিছে পাগল।
উদ্বেলিত আজি তার শিরায় শিরায়,—
যৌবনের বিদ্যুৎ কম্পন, উপেক্ষায়—
ভেঙ্গে দিতে চায় দৃঢ় তটের বন্ধন,
বিপন্ন তটের তাই ধ্বনিছে ক্রন্দন।
বার বার মত্ত বায়ু করি হাহাকার,—
আঘাত করিয়া যায় দুয়ারে আমার।

সূক্ষ্ম জল রেণু কণা করিয়া সিঞ্চন,
গৃহতলে পদচিহ্ন করিছে অঙ্কন।
আমি আজ সঙ্গিহীন সুদূর প্রবাসে,—
বসে আছি নিরানন্দ বিজন আবাসে।
জীবন্ত বরষা আজি হৃদয়ে আমার,
নাহি শুধু রামধনু নীপের বাহার।
পুঞ্জ পুঞ্জ বিষাদের ঘন মেঘরাশি,
হৃদয় আকাশখানি ফেলিয়াছে গ্রাসি।
অতীতের সুখস্মৃতি বিদ্যুতের প্রায়,
মাঝে মাঝে দীপ্ত তেজে চমকিছে তায়।
অশনি গর্জ্জন সম আর্ত্তনাদ করি,
মৌন যত মর্ম্ম ব্যথা উঠিছে গুমরি।'
নয়নের প্রান্তে আসি বক্ষের রুধির,
বৃষ্টিসম অবিশ্রান্ত ঢালিতেছে নীর।"
কি দিয়ে বন্দিব তোমা প্রবৃট্‌ সুন্দর
লহ হৃদি রক্তপদ্ম ব্যথা জর জর।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

চুক্তির দাবী

(৭)

চাটার্জ্জিদের সান্ধ্যসম্মিলন আরম্ভ হইয়াছে। সম্মুখস্থ সুবিন্যস্ত প্রাঙ্গন সহ সমস্ত বাড়ীখানি উজ্জ্বল তাড়িতালোকে ফুট্‌ ফুট্‌ করিতেছে, গৃহগুলির মধ্যে শন্‌ শন্‌ পাখা ঘুরিতেছে, নিমন্ত্রিত স্ত্রীপুরুষ কেহ কেহ সমবেত হইয়াছেন, কেহ আসিতেছেন, কেহ বা আসিবেন। মিসেস্‌ চ্যাটার্জি এবং তাঁহার দুহিতৃদ্বয় মিস্‌ মীনা ও মিস্‌ লীনা চ্যাটার্জি ঘুরিয়া সকলকে অভ্যর্থনা করিতেছেন। ডাক্তার রায়ও নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন।—আজ আর আগের মত ফুর্ত্তি তাঁহার নাই, বারান্দার একধারে জনদুই মধ্যবয়স্ক ডাক্তারের সঙ্গে বসিয়া চুরুট খাইতেছেন আর চিকিৎসাতত্ত্বের নূতন কি আবিষ্কার সম্বন্ধে ধীর গম্ভীরভাবে আলোচনা করিতেছেন। একটি যুবতী এদিক দিয়া যাইতে ডাক্তার রায়কে দেখিয়া যেন একটু থমকিয়া দাঁড়াইলেন। ডাক্তার রায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া ইঁহাকে অভিবাদন করিলেন,—যুবতী ঈষৎ শিরঃ সঞ্চালনে মাত্র এই অভিবাদন স্বীকার করিয়া সপ্‌ করিয়া ঘুরিয়া অন্যদিকে চলিয়া গেলেন। হল্‌ ঘরের ওদিকে গিয়া চ্যাটার্জ্জিদুহিতা মীনার সঙ্গে তাঁহার দেখা হইল। মীনাকে ডাকিয়া একটু দূরে নিয়া গিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি মীনা, ঐ রায়টাকেও তোমরা আজ এই পার্টিতে নিমন্ত্রণ করেছ !"

"রায়টা ! কার কথা বল্‌ছ আশা ? ডাক্তার এন রায়ের ? ছি ! এতটা অবজ্ঞা ক'রে ভদ্রলোকের কথা বলতে হয় ?"

আশা অর্থাৎ মিসেস্‌ আশা লাহিড়ী (ব্যারিষ্টার এস্‌ লাহিড়ীর পত্নী) উত্তর করিলেন, "ভদ্রলোক হ'লে ব'লতাম না। তোমরা তাকেও নিমন্ত্রণ করেছ জান্‌লে—"

"কি, আস্‌তে না ? কেন, তাঁর অপরাধ ?" "অপরাধ ! কি ব'লছ মীনা ! ঘোষেদের সঙ্গে তাঁর এই ব্যবহারটা—"

"কেন, এতবড় একটা অন্যায় কেন তোমরা তাতে দেখ্‌ছ ? কৌমুদীর সঙ্গে কোনও engagement (বিবাহের চুক্তি) ত তাঁ'র হ'য়েছিল না—"

"তা নাই হ'ক্‌, তবু—"

মীনা একটু বিদ্রূপের হাসিতে চক্ষু টানিয়া কহিল, "তবে কি ব'লতে চাও ? টোপ ফেলেছিল, তিনি গিল্‌তে গিল্‌তে এড়িয়ে এলেন, এই ত !"

"ছিঃ ! কি ব'লছ মীনা ? ঘোষেদের সম্বন্ধে সে কথা কেউ ব'লতে পারে না। নিজেই উনি কৌমুদীকে ভালবেসে সর্ব্বদা সেখানে যেতেন। সবাইকে বুঝ্‌তেও দিয়েছিলেন তাকেই বিবাহ ক'র্‌বেন।"

"সবাই যদি ভুল বোঝে, সেটা কি ওঁর কিছু দোষ ? সবাই আদর করে ডাক্‌ত, কত লোকের বাড়ীতেই উনি তখন যেতেন। তবে, ঘোষেরা নাকি যে কারণেই হ'ক্‌

কিছু বেশী আদর দেখাত,—তাই একটু বেশী না হয় সেখানে যেতেন।"

আর একটী যুবতী মিস্ প্রভা সরকার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বলিয়া ফেলিল, "তা আদর ত তোমাদের বাড়ীতেও খুব হ'ত,—অত আসা যাওয়ার কথা ত শুনিনি।"

মীনার মুখখানি আগুণ হইয়া উঠিল,—"আদর সবার বাড়ীতেই হ'ত। আমাদের এখানে এমন বেশী কিছু হয়নি।"

প্রভা উত্তর করিল,—"আজ ত বেশ হ'য়েছে,—এটা আর কোথাও হ'ত না। তবে এখন এ আদর too late' মীনা।"

প্রভার দিকে একটী রুক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মীনা কহিল, "তুমি আজ আমাদের বাড়ীতে অতিথি,—নইলে এ অপমান সহ্য ক'র্‌তাম না মিস্ সরকার।"

বলিয়াই গম্ গম্ করিয়া দূরে সরিয়া গেল।

আশা কহিল, "তুই ভারি দুষ্টু প্রভা! কি ক'রে অমন বিশ্রী কথাটা বল্লি?"

"তা সত্যি কথাও ব'লতে হয় বই কি। কৌমুদীকে সে দিন কি যাচ্ছেতা ক'রেই ঠাট্টা ক'রছিল ওরা দুই বোনে! মিসেস্ গাঙ্গুলী, মিসেস্ চৌধুরী, অরুণা মিত্তির, সুণী দত্ত—সবাই,—সবারই বিশ্রী একটা হিংসে হ'য়েছিল কিনা কৌমুদীর উপরে? আর ব'লতে কি, রায় যে এই কুকাণ্ডটা ক'রেছে, এতে ওরা যেন খুসীই হয়েছে সবাই। তাই আজ আদর করে ওকে নেমন্তন্ন করেছে! আরও দুষ্টুমী মতলব দেখ, কৌমুদীকেও আলাদা করে নেমন্তন্ন করেছে! যদি আসে—হঠাৎ রায়ের সঙ্গে এখানে দেখা হবে—"

'না, না, কৌমুদী আসবে না। ছি! যদি আসে, আর দেখা হয়—সেটা বড় যে বিশ্রী একটা কাণ্ড হবে প্রভা।"

প্রভা কহিল, "সেই বিশ্রী কাণ্ডটাই যাতে ঘটে আর কৌমুদীর যাতে এতগুলি লোকের মধ্যে একটা লজ্জা আর অপমান হয়, তাই না তাকে এত করে নেমন্তন্ন ক'রেছে মীনা। রায় যে ওকে ফেলে কৌমুদীর কাছে গে' ধন্না দিচ্ছিল সে রাগ কি ওর এখন গেছে?"

পাউডারপ্রলিপ্তা বিশীর্ণমুখী বিচিত্রকৌমবাসাবৃতা উজ্জ্বল স্বর্ণালঙ্কারভূষিতা অপরা এক মহিলা—মিস ভামিনী ভড় ইহাদের নিভৃত আলাপে আকৃষ্ট হইয়া তখন কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। শেষ কথাগুলি শুনিয়া ঈষৎ চড়া নাকি সুরে কহিলেন, "এ তোমরা বড় অন্যায় সব কথা ব'লছ প্রভা। কে না জানে ঘোষেরা একেবারে ডক্টর রায়ের ঘাড়ে চেপে বসেছিল। রায় যে তাদের ঝেড়ে ফেলে দিতে পেরেছেন এটা তাঁর খুব বাহাদুরী বটে! মীনার দোষ কি? সে সবাইকে নেমন্তন্ন ক'রেছে, ঘোষেদেরও ক'রেছে। ডক্টর রায়কেই বা ক'রবে না কেন? কৌমুদীর যদি বুদ্ধি থাকে, আসাই তার উচিত হবে না। তবু যদি নির্লজ্জের মত আসে, এ লজ্জা এ অপমান তার উপযুক্ত শাস্তি হবে।"

প্রভা উত্তর করিল, "মিস ভড়ও দেখ্‌ছি, রায়ের একজন মস্ত advocate।"

"তাঁর প্রতিভার যোগ্যতার প্রশংসা আমি করি,—কে না করে? বাঙ্গালী জাতির গৌরব তিনি। কৌমুদীরা তাঁকে পেয়ে বসেছিল—তিনি কখনও ধরা দেন নি ত। এখন স্বেচ্ছায় যদি বেছে অন্য কাউকে বিবাহ করে থাকেন, কি বলে কে তাঁকে দোষ দিতে পারে?"

আশা ইহার উত্তরে কহিল, "তা সকলেই ত সমান এক চোকে সব দেখে না। অনেকে মনে করে, দোষ খুবই হয়েছে। তারা সেটা ব'ল্‌ছে, ব'ল্‌বেও। আপনারা যদি মনে করেন খুব বাহাদুরী সে করেছে, বেশ ত, মাথায় ক'রে নাচ্‌ছেন নাচুন। কেউ ত টেনে তাকে ফেলে দিতে আস্‌ছে না।"

প্রভা একটু হাসিয়া চক্ষু টানিয়া কহিল, "তা এত মাথায় ক'রে নেচেই বা এখন লাভ হবে কি?"

মিস্ ভড় অতি কুটিল ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন, "লাভ লোকসানের কথা ত কিছু হচ্ছে না। গুণীর আদর সবাই-কেই কর্ত্তে হয়।—অন্যায় করে কারও নিন্দে যদি কেউ তাঁর করে, তার প্রতিবাদেও দুকথা ব'ল্‌তে হয়।"

"তা হয় বই কি! তবে এক্ষেত্রে এই প্রতিবাদের উত্তেজনাটা কারও কারও বড় বেশী দেখা যাচ্ছে। ডক্টর রায় ত এমন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ও সবার নন, কারও সঙ্গে তেমন অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের পরিচয়ও কিছু পাই নাই। তাই ভাবছিলাম্ এখন এই উত্তেজনার অর্থ কি?—"

আশা কহিল, "ওঁর কাছে ভাই শুনেছিলাম, হিন্দু মতে কেউ বিয়ে দিলে ডক্টর রায় আরও একটি কেন, দশটি স্ত্রীও গ্রহণ কত্তে পারেন।"

মিস্ ভড়ের ভ্রূকুটিকুটিল রঞ্জিত মুখখানিও যেন রাগে কাল হইয়া উঠিল,—কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "মিসেস্ লাহিড়ী! মিস্ সরকার! তোমাদের এই কুৎসিৎ ইঙ্গিত কাকে লক্ষ্য ক'রে উচ্চারিত হ'ল!"

"কাউকে না। এমনি কথার কথা একটা মনে এল, ব'লে ফেল্লুম। আমাদের এ সমাজের কোনও মেয়ে এতটা হীন হ'তে পারে, তা আমি মনে করি না।"

"তেমন বেশী ক্ষিদে পেলে এঁটো পাতের পচা ভাতও লোকে কুড়িয়ে খায়, পোলাও কারী হ'লে ত কথাই নাই। ঐ যে কৌমুদী এসেছে, চল্ দেখিগে।

প্রভা আশার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেল। মিস্ ভড়ের ক্রোধবিকৃত-মুখনিবিষ্ট চক্ষু দুটি হইতে যেন দুটি বজ্রাগ্নি শিখা নির্গত হইল, শীর্ণ করদ্বয়ও কঠোর মুষ্টিবদ্ধ হইয়া উঠিল। কিন্তু আশা ও প্রভা তখন দূরে সরিয়া গিয়াছে! মনে মনে তাদের মুণ্ডপাত করিয়া ভড়দুহিতা মীনার সন্ধানে গেলেন।

(৮)

বড় কোনও ইংরেজ রাজপুরুষের সম্বর্দ্ধনার জন্য কোনও রাজা এক উদ্যানসম্মিলনের আয়োজন করিয়াছিলেন, সার রামদাস (অর্থাৎ আর ডি) এবং লেডী ঘোষের নিমন্ত্রণ সেখানে ছিল। তা ফেলিয়া কিছু আর চ্যাটার্জ্জিদের সান্ধ্যসম্মিলনে যাওয়া যায় না। তাঁরা সেখানেই গেলেন, তামসী কৌমুদীকে লইয়া চ্যাটার্জ্জিদের গৃহে যাইবে, এই বন্দোবস্ত হইল।

কৌমুদী স্বভাবতঃই অতি সুন্দরী, বর্ণ উজ্জ্বল ও মার্জ্জিত গৌর, মুখশ্রী অতি সুকান্ত, দেহের গঠন যারপর নাই সুঠাম, আর সুকৃষ্ণ চক্ষু দুটির দৃষ্টি অতি মোহন ও মধুর। তার সেই ব্লাউস্ প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল। নূতন সেই সাড়ী ও ব্লাউসের উপরে কয়েকখানি বহুমূল্য জহরতের অলঙ্কারও সে পরিল। কাণে দুটি হীরকের দুল, হীরক ও মুক্তায় খচিত একটি কেশবন্ধের নীচে কুঞ্চিত ও তরঙ্গায়িত চূর্ণকুন্তল নিটোল শুভ্র ললাটের উপর আসিয়া পড়িয়াছে,—মুক্তবেণী ঘনকৃষ্ণ কেশদাম পশ্চাতে সমস্ত পিঠখানি ঢাকিয়া কটির নিম্নে সাড়ীর কুঁচিগুলির উপরে এলাইয়া দুলিতেছে,—হাসিমুখে কৌমুদী যখন চ্যাটার্জ্জিদের উজ্জ্বল আলোকোদ্ভাসিত সুসজ্জিত হলঘরে গিয়া উঠিল, উপস্থিত সকলেই বিস্ময়বিস্ফারিত মুগ্ধদৃষ্টিতে তার দিকে চাহিলেন। পরীদেশ হইতে স্বয়ং পরীরাণী যেন অকস্মাৎ তাহাদের মধ্যে অবতীর্ণ হইলেন, এমনই একটা সানন্দচমক তাহাদের লাগিয়াছিল।

সকলের এমন বাঞ্ছিত ও লোভনীয় ডাক্তার নরেন রায় কৌমুদীর বড়সীতে টোপ গিলিল, এজন্য এ সমাজের বহু কন্যা ও কন্যাজননীরা তাকে বড় একটা ঈর্ষ্যার চক্ষে দেখিতেন। পুরুষরাও কেহ কেহ বলিতেন, সার রামদাস একজন ভাগ্যবান্ পুরুষ বটেন। সহসা এই পাত্ররত্ন সাধারণ অসংস্কৃত হিন্দুসমাজভুক্ত একজন ধনী মহাজনের কন্যাকে বিবাহ করিয়া ফেলিল। যেমন বিস্ময় সকলের হইয়াছিল, তেমনই বড় একটা কৌতূহল জন্মিয়াছিল, সার রামদাসের পরিবার এই নিরাশার বেদনাটা কি ভাবে বহন করিলেন, সেই কথাটা জানিবার জন্য। আঘাতটা যে বড় গভীর ভাবেই তাঁহাদের লাগিয়াছিল, ইহাতে অবশ্য সন্দেহ মাত্র কাহারও ছিল না। কৌমুদী এতটুকু মুখখানি করিয়া ঘরে লুকাইয়া আছে, শীঘ্র আর লোকসমাজে মাথা তুলিয়া বাহির হইতে পারিবে না,—বড় অহঙ্কার তার হইয়াছিল, ধরা যেন সরার মত দেখিত,—লেডী ঘোষ ত চোক তুলিয়াই আর কাহারও দিকে চাহিতেন না,—খুব জব্দ এখন তারা হইয়াছে! অত দর্প কাহারও সহে না! ইত্যাদি কত কথাই না মহিলাসমাজে আলোচিত এ কয়দিন হইয়াছে। সকলেই মনে করিয়াছিলেন, আজ এই সান্ধ্যসম্মিলনে ভদ্রতার খাতিরে সার রামদাস ও লেডী ঘোষ একবার হয় ত দেখা দিয়া যাইতে পারেন,—তামসীও মিসেস্ 'মিটার'রূপে একবার আসিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবেন। কিন্তু সত্যই কৌমুদী যে আজ আসিবে, বা আসিতে পারে, এতটা কেহই ভাবিতে পারেন নাই। সেই কৌমুদী যখন সত্যই আসিল, আর তার সেই উজ্জ্বল বেশ ভূষায় সমুজ্জ্বল রূপের জ্যোতিতে আলোকোদ্ভাসিত গৃহখানিকেও যেন আঁধার করিয়া মোহন হাস্যদীপ্ত মুখে সকলের সম্মুখে গিয়া

দাঁড়াইল, সুকান্ত কুন্দদন্তপাতি ঈষৎ বিকশিত করিয়া পরিচিত সকলকে অভিবাদন বা প্রত্যভিবাদন করিল, তখন উপস্থিত মহিলাবৃন্দ ও যুবকবর্গ যে কতদূর বিস্মিত ও চমকিত হইলেন, তাহা বলা যায় না। প্রবীণ বয়স্ক দুইচারিজন ভদ্রলোক সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া একটু মাথা নাড়িলেন। রূপমুগ্ধ যুবক কাহারও কাহারও মনে একথাও উঠিল, রায়ের সঙ্গে মিস্ ঘোষের serious কিছুই একটা হয় নাই,—হৃদয় তার এখনও মুক্ত, অধিকার করার আশা পোষণ করা যাইতেও পারে। প্রতিদ্বন্দ্বিনী কুমারী অথবা জননীরা কেহ ঈর্ষ্যার বিরাগে বক্রমুখে চক্ষু ফিরাইলেন, কেহ ভ্রূকুটি করিয়া কুটিল বক্র দৃষ্টিতে চাহিলেন, কেহ বা চক্ষু নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া টানিয়া তুলিলেন। জনান্তিকে কেহ কেহ এইরূপ মন্তব্যও করিলেন,—"সব লোক দেখান ছল। ভারী বজ্জাত মেয়েটা! ঢং ক'রে এসেছে।—সবাই আমরা বোকা কিনা, এতেই ভাব্‌ব—না কিছুই হয় নি।"

মুখখানি ওদিকে শুকিয়ে আমচুর হয়ে গেছে, চোক ব'সে গেছে,—কালিও অবশ্য পড়েছে, তা পাউডার রুজে কি আর সব ঢাকে?"

"হি, হি, হি! সেজে এসেছে দেখ না, যেন থিয়েটারের নাচুনাউলী।"

"ঠিক ব'লেছ ভাই।—একটা নাচের মজলিস্ এখানে বসালেও হ'ত।—মাগো! ছোকরাগুলো সব চেয়ে আছে দেখনা!—মেয়েটারও লজ্জা নেই। ও ঠিক এসেছে নতুন কোনও শিকার খুঁজতে।"

"ঐ যে সুন্দর ছেলেটি—দেখছেন একেবারে হা ক'রে ওর দিকে চেয়ে আছে—চোকে পলক পড়ে না,—ও কে মিসেস্ দত্ত? জানেন?"

"কই! এই যে! না, চেনা চেনা লাগ্‌ছে বটে—কে! হাঁ, আপনি জানেন, মিসেস্ সরকার?" মিসেস্ সরকার কেবল সেই মুহূর্ত্তে ইঁহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, —চাহিয়া দেখিয়া কহিলেন, "কে?—ঐ যুবকটি! ওহো, ও যে আমাদের কুমার বীরেন্দ্র মোহন, রাজা নরেন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুরের ছেলে। আমাদের বড় একজন মক্কেল তিনি। ছেলেটি বেশ,—এই ত আমেরিকা থেকে এল।"

বলিয়াই মিসেস্ সরকার উঠিয়া কথিত যুবকটির কাছে গিয়া সস্নেহ হাসিমুখে তাকে সম্ভাষণ করিলেন। যুবক উঠিয়া সশ্রদ্ধ বিনয়ে তাঁহাকে অভিবাদন করিল। মিসেস্ সরকার হাত ধরিয়া তাকে বসাইলেন,—নিজেও কাছে বসিয়া তার সঙ্গে কথা বার্ত্তা আরম্ভ করিলেন।

ওদিকে সকলের আগে আশা ও প্রভা গিয়া সস্নেহ প্রীতিতে কৌমুদীকে সম্ভাষণ করিল। দুইজনেরই আপনা হইতে মনে হইয়াছিল, কোনও মতে যদি সম্ভব হয়, ডাক্তার রায়ের সঙ্গে কৌমুদীর এখানে সাক্ষাৎ যাহাতে না হয়, তাহা করিতে হইবে। ইহাদেরও একথাটা মনে হইয়াছিল, বড় জোর করিয়া দুঃখটা চাপিয়া দিয়া হাসিমুখে কৌমুদী আজ আসিয়াছে, লোককে দেখাইবার জন্য যেন কিছুই তার হয় নাই। ডাক্তার রায়ও যে আজ এই সমাজে কোনও সামাজিক উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিবে, ইহা কৌমুদী বোধ হয় মনেও করিতে পারে নাই। যদি হঠাৎ দেখা হয়, হয়ত সামলাইতে পারিবে না, একটা কেলেঙ্কারী করিয়া ফেলিবে, শত্রুর মুখ হাসাইবে।—

আশা কহিল, "এস ভাই, বাইরে ওদিকে একটু বেড়াইগে। ঘরে যে গরম!"

তামসীও কহিল, "তাই যা কোমু, বাইরে একটু বেড়াগে ওদের সঙ্গে। আমি একটু ঘুরে টুরে দেখি, কে কে এসেছেন।"

"বাঃ! আমি বুঝি দেখ্‌ব না, কারও সঙ্গে আলাপ ক'রব না?—তোমরা ভাই অনেকক্ষণ এসেছ আশা, আমি যে সবে এই এলাম। কারও সঙ্গে দেখা এখনও হ'ল না—"

বলিতে বলিতে মীনা ছুটিয়া আসিল,—"বা! এই যে! কখন এলে কৌমুদী?—এত দেরী হ'ল যে? ইস্! কি হ'য়েছিল তোমার? মুখখানি যে একেবারে শুকিয়ে চিম্‌সে হ'য়ে গেছে! অসুখ টসুখ হ'য়েছিল নাকি কিছু? আজ কদ্দিন একেবারেই তোমাকে দেখ্‌তে পাইনি কোথাও।—কে ব'লছিল ভাল, কৌমুদী মোটেই বেরোয় না, কি যেন তার হয়েছে।"

কৌমুদী হাসিয়া কহিল, "কি হবে? বেরোইনি—দরকারও কিছু এমন হয় নি,—কলেজ ত ছুটিই—তা তোমরা ভাল আছ ত সব? লীনা কই?"

"তাকে ত দেখ্‌লাম, ডক্টর রায়ের সঙ্গে ওদিকে বেড়াচ্ছিল—"

কৌমুদীর দেহটা অলক্ষ্যে একবার কাঁপিয়া উঠিল,—

প্রবল একটা লজ্জার ও বেদনার উচ্ছ্বাস বুক ভরিয়া উঠিতে উঠিতে মুহূর্ত্তে চাপিয়া দিল,—একটিবার মাত্র দন্তে অধর চাপিয়াই অবনত মুখখানি তুলিয়া হাসিয়া কহিল, "ডাক্তার রায় এসেছেন? কই, কোথায় তিনি?"

তামসী তখন একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "হাঁ মীনা, তাঁর বিয়ে হ'ল, তোমরা নেমন্তন্ন পেয়েছিলে? আমরা ত কই পেলাম না?"

কৌমুদীও কহিল, "হাঁ, আমাদের বড় একটা অভিযোগ আছে। আমরা বন্ধু, কত যেতেন আস্তেন আমাদের ওখানে, হঠাৎ লুকিয়ে গিয়ে বিয়ে ক'ল্লেন, কিছু জানালেন না,—আর দেখাটি পর্য্যন্ত নেই।"

তামসী কহিল, "আমরা ত অবাক্ হ'য়ে গিয়াছিলাম। তবু যাহ'ক, এখানে আজ এসেছেন, কথাটা শুনিয়ে দেবার একটা সুযোগ হ'ল?"

আশা, প্রভা, মীনা তিনজনেই বিস্ময়ে একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। না, না, ইহাও কি লোক দেখান একটা ছল হইতে পারে? তবে কি সত্যই ভালবাসার কি বিবাহের কোনও কথা ইহাদের মধ্যে হয় নাই? মীনা আমতা আমতা করিয়া কহিল, "তিনি—এই ত কতক্ষণ হ'ল দেখ্‌ছিলাম—ও বারান্দায় লীনার সঙ্গে কি কথা ব'লছিলেন। তা খুঁজে দেখি,—বল ত ডেকে এখানে আন্‌তে পারি। ব'সনা, এত ব্যস্ত কি? তিনি ত পালিয়ে যাচ্ছেন না এখনই?"

তামসী ও কৌমুদী নীরবে আশা ও প্রভার হাত ধরিল —পাশাপাশি দুইখানি কৌচে গিয়া চারিজনে বসিল।—মীনা বাহিরে গেল।

"ভাল আছ প্রভা?"

"এই যে—বাঃ! বীরেনদা যে! কখন এলেন? কোথায় লুকিয়ে ছিলেন এতক্ষণ?"

"লুকিয়ে কেন থাক্‌ব? এই ঘরেই ত ব'সে আছি। তোমাকে খুঁজছিলাম—বাইরে কার কার সঙ্গে কথা ব'লছ দেখ্‌লাম, তাই আর গিয়ে বিরক্ত ক'ল্লাম না।"

"এখানেও ত কথা ব'লছি আমরা!—এই চারজনে! তা, বিরক্ত ক'ত্তে যে এলেন?" বীরেন্দ্রের বিমুগ্ধ আকুল দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া প্রভা একটু হাসিয়া কৌমুদীর দিকে চাহিল।

"হাঁ, আপনার পরিচয় করিয়ে দিই এঁদের সঙ্গে। তা কি নাম ব'লব? মিষ্টার সিংহ, না কুমার বীরেন্দ্রমোহন সিংহ।"

"কিছুই না, সোজা শ্রীবীরেন্দ্রমোহন সিংহ।"

বলিয়াই বীরেন্দ্র উপবিষ্টা মহিলাত্রয়ের দিকে চাহিল। প্রভা যথারীতি পরস্পর পরিচয় করাইয়া দিল। অভিবাদনাদি বিনিময়ের পর, তামসীর অনুরোধে বীরেন্দ্র পাশেই একখানি চৌকিতে ব'সিল।—যুবকটি যারপরনাই অমায়িক ও সদালাপী। দেখিতে দেখিতে ইঁহাদের আলাপ বেশ জমিয়া উঠিল।

কিছুকাল পরেই মীনার সঙ্গে ডাক্তার রায় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ইঁহাদের সম্মুখীন হইলেন। মীনা কহিল, "এই যে কৌমুদী, ডাক্তার রায়কে ধ'রে এনেছি, খুঁজছিলে না এঁকে?"

ডাক্তার রায় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন! এখানে এইভাবে সহসা কৌমুদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে, এটা তিনি মনেই করিতে পারেন নাই। একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন, কিন্তু এড়াইবার আর পথ নাই। যে ভাবেই হউক, এই সাক্ষাৎকারটাকে বন্ধুজনের সাক্ষাৎকারের ন্যায় স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু তবু মুখে কোনও বাক্‌স্ফুরণ হইলনা।—বিশুষ্ক বিবর্ণমুখে তামসী ও কৌমুদীর দিকে একবার চাহিলেন, কিন্তু তখনই মুখখানি আরও নত হইয়া পড়িল। তামসী এই ভাব-বিপর্য্যয় লক্ষ্য করিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "এই যে—বাঃ! ভাল আছেন ত মিষ্টার রায়?—আমরা আপনাকে খুঁজছিলাম। আর যে দেখাটি নেই! বিয়ে হ'ল, আমরা বন্ধু, খবরটি পর্য্যন্ত পেলাম না,—কেন বলুন ত?

ডাক্তার রায় একেবারে এতটুকু হইয়া গেলেন, আমতা আমতা করিয়া আরম্ভ করিলেন,—"খবর—তা—কি জানেন—"

কৌমুদী খুব শক্ত হইয়া ইতিমধ্যে তার মনটা স্থির করিয়া নিয়াছিল,—হাসিয়া কহিল, "জানব আবার কি? কিছুই যে জানালেন না। হঠাৎ কাগজে খবরটা দেখে আমরা ত অবাক্।—তা মিসেস্ রায় কি এখানে এসেছেন? তাঁকে নেমন্তন্ন করনি মীনা?"

মীনা উত্তর করিল "না, সেটা করা হয় নি। ওঁর

'বিয়েটা—বাস্তবিক একটা সত্য ব'লে এখনও আমরা ঠিক গ্রহণ করে নিতে বোধ হয় পারিনি। তা—মিসেস্ রায় কি আমাদের এখানে আস্‌তেন ?—তিনি যে—"

কৌমুদী কহিল, "হাঁ, এখনও ঘোমটা খুলে ও'র সাম্‌নে বোধ হয় আস্‌তে পারেন না। কি ব'লেন মিষ্টার রায় ?—সত্যি না ?"

রায় কোনওমতে উত্তর করিলেন, "তিনি তাঁর বাপের বাড়ীতেই আছেন।"

তামসী বিস্ময়প্রকাশে কহিল, "বাপের বাড়ী! সে কি! কেন—আপনার কি বাড়ীঘর নেই? বিয়ে ক'রে স্ত্রীকে বাপের বাড়ী ফেলে রেখেছেন ?"

কৌমুদী কহিল, "তা যেখানেই তিনি থাকুন, আমাদের বাড়ীতে কিন্তু একদিন নিয়ে আস্‌তে হবে। আমরা নেমন্তন্ন ক'রে পাঠাব!—কি বলেন ?"

মুখে একটু কাষ্ঠহাসি দেখাইয়া রায় কহিলেন,—"তা দেখ্‌ব, যদি তিনি যান—"

"যান কি? যেতেই হবে যে। আজই গিয়ে তাঁকে ব'লবেন!—আরও ব'লবেন, বিয়েতে নেমন্তন্ন করেন নি তাতে আমরা বড় রাগ ক'রেছি। তিনি এলে তবে আপনার এই অপরাধ ক্ষমা করা হবে। জান্‌লেন ?"

তামসী কহিল, "আপনি এত কুণ্ঠিত কেন হ'চ্ছেন ডাক্তার রায়? হঠাৎ গিয়ে সেকেলে হিন্দুসমাজে বিয়ে ক'ল্লেন, তাই ?"

"তাতে আর লজ্জা কিসের? আজকাল সুবিধের খাতিরে কত এমন হচ্ছে,—দোষ যা হ'য়েছে, কাউকে না জানিয়ে না ডেকে গোপনে একলাটি গিয়ে বিয়ে ক'ল্লেন, তাই। তবে দেশে থেকে আপনার আত্মীয়স্বজনরা বোধ হয় সব এসেছিলেন ?—"

"না, কেউ আসেন নি।"

'তাও না! তবে কি?—আমরা ত ভাব্‌ছিলাম, তাঁরা পছন্দ ক'র্‌বেন না ব'লেই বুঝি, আমাদের এদিককার কাউকে বলেন নি!—তা বসুন না, দাঁড়িয়ে কেন রইলেন ?'

"ধন্যবাদ! মাপ ক'র্‌বেন আমাকে? অনেকক্ষণ এসেছি,—একটা engagement আছে—কঠিন রোগী আরও দুজন ডাক্তার আস্‌বেন—(ঘড়ি খুলিয়া)—ওঃ! সময় যে হ'য়ে এল! আসি তবে—Good evening। মাপ ক'র্‌বেন মিস্ চ্যাটার্জ্জি, Good evening! Good evening —মিস্ ঘোষ! বাঃ! মিষ্টার সিন্‌হা যে! এতক্ষণ দেখিনি—ভাল ত? সময় নেই আজ,—আসি তবে, Good evening।"

"Good evening."

আশা ও প্রভার দিকে চাহিয়া আনত শিরে হাত তুলিয়া ডাক্তার রায় দ্রুত বাহির হইয়া গেলেন।

কৌমুদী আজ তার এই কঠিন ভূমিকায় অতি উত্তম অভিনয়ই করিল। যারা দেখিল, শুনিল, বা দূর হইতে লক্ষ্য করিল, তাদের সত্যই মনে হইল, রায়ের সঙ্গে বাস্তবিক কোনও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বুঝি ঘোষেদের হইয়াছিল না। রায় হয়ত কৌমুদীর লোভে ঘনাঘনি খুব করিত,—কিন্তু তাহারা কোনওরূপ আগ্রহ এদিকে দেখায় নাই। হয়ত সম্বন্ধটা তারা বাঞ্ছনীয়ই মোটে মনে করে নাই,—লোকে ভুল বুঝিয়া এত কথা বলিয়াছে। কোনও আশা না দেখিয়া রায় বোধ হয় শেষে টাকার লোভে সেই ধনী মহাজনের কন্যাকে গিয়া বিবাহ করিয়াছে! লোকে কি বলিবে, বিদ্রূপ করিবে, তাই আগে কাহাকেও বলে নাই,—সম্বন্ধ স্থির করিয়াই তাড়াতাড়ি বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছে। হইয়া গেলে, শেষে যে যাই বলুক, কি আর হইতে পারে? কিন্তু রায় অমন বেকুব বনিয়া গেল কেন? আজ এখানে আসিয়া কেমন দূরে দূরেই রহিয়াছে, তেমন হাসিখুসী ভাবে কাহারও সঙ্গে মিশে নাই। তবে এই বিবাহের জন্য এ সমাজে একটু কুণ্ঠা বোধ করিতে পারে বই কি? মিস্ ঘোষেদের কাছে আরও ত বোধ করিবার কথা। বন্ধুত্ব তাদের পরিবারের সঙ্গেই বেশী ছিল কিনা।

যাহা হউক, নূতন একটা বিস্ময়কর ঘটনার মত এই কথা লইয়া কয়েকদিন অনেক আলোচনা, এই রহস্যের তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক জল্পনা কল্পনা কয়েকদিন ধরিয়া হইল। অনেক অনুমান, অনেক মন্তব্য অনেকে করিলেন। গোপনে অনেক সন্ধানও অনেকে নিতে লাগিলেন, আসলে ব্যাপারটা কি। কৌমুদী বড় একটা দুঃখ পায় নাই, তার উঁচু মুখ নিচু হয় নাই, ইহাতে মনে মনে ক্ষুণ্ণও অনেকে হইলেন,—ভাবিতে লাগিলেন, আবার কোন্

শিকার সে ধরিবে। কুমার বীরেন্দ্রমোহনের কথাটাও কারও মনে যে না হইল তা নয়। রায়ের চাইতেও এটা বড় একটা শিকার!

কৌমুদী কি তবে এই শিকারটা ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতিল? বাবাঃ! এ মেয়ে ত সাধারণ নয়!

(ক্রমশঃ)

মরণ সুন্দর

মরণ মরণ রে বিজয় তুহার!
সুন্দর কান্ত চির মানস-হারি!
অন্ধকার ঘন নিবিড় নীরন্ধ্র,
নিতম্ব-চুম্বিত বেণী বিবন্ধ
সঘন অমানিশিপুঞ্জিত তমসম
অঙ্গবরণ তব চিত্ত ভরিছে মম
অমর মরণ রে বিশ্ব-বিহারি!
কৃষ্ণ—তার দু'টি অপলক আঁখে
ধূমকষায়িত অশ্রুনিষেকে
ধৌত করিছে নিতি, মোহবন্ধ হরি
লক্ষ-হৃদয়-গল লাক্ষা চরণ ভরি
মরণ সুমোহন দুখ অপহারি!
ক্রন্দন গুঞ্জন মঞ্জীর কত তব
বেদন-সুছন্দে সঙ্গীত উদ্ভব
তপ্তশ্বাসে তব অঙ্গ পরশ পাই
তরল মুকুতা হার তোমারে পরাতে চাই
মরণ রে সুন্দর মুরতি ধারি!

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

স্বাস্থ্যের কথা

(বঙ্গের স্বাস্থ্য কমিশনারের বিজ্ঞাপন অবলম্বনে)

[১৩২৬ ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যা 'পরিচারিকা' হইতে উদ্ধৃত]

বঙ্গের শিশুমৃত্যু

১৯১৮ সালে বঙ্গদেশে এক বৎসরের নিম্নবয়স্ক ৩,৩০,০০০এর অধিক শিশু প্রাণত্যাগ করিয়াছে। অর্থাৎ বঙ্গদেশে গড়পড়তা প্রত্যহ ১০০০ শিশু মরে! এই ১০০০ শিশুর মধ্যে ৭৫০ জনের নিবার্য্য ব্যাধিতে মৃত্যু হইয়া থাকে।

বঙ্গদেশের মধ্যে বীরভূম ও বর্দ্ধমান এই দুই জিলায় এক বৎসর বয়স্ক হাজার শিশুর মধ্যে তিন শতের উপর মরিয়া [illegible]। নদীয়া ও মুর্শিদাবাদে হাজার করা ২৭৫ হইতে [illegible]ড়া ও জলপাইগুড়ি জিলায় ২৫০ হইতে ২৭৫, [illegible], খুলনা, বাখরগঞ্জ, দিনাজপুর, রাজসাহী, পাবনা, রংপুর ও দার্জ্জিলিং জিলায় ২২৫ হইতে ২৫০, মালদহ, ময়মনসিং, ঢাকা, ফরিদপুর, নোয়াখালি—জিলায় ২০০ হইতে ২২৫, যশোহর, ২৪ পরগণা, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, বগুড়া এই কয় জিলায় হাজারের মধ্যে প্রায় কিছু কম ২০০ জন শিশু মরিতেছে।

এত শিশু এই দেশে নিবার্য্য ব্যাধিতে অকালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। ইহাদিগকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য কি প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত নয়?

আপনারা কি ইহা জ্ঞাত নহেন যে, আমাদের মূর্খতার জন্য বঙ্গদেশে শত শত শিশু জীবন বিসর্জ্জন করিতেছে?

হায়, বঙ্গজননী প্রত্যেক বৎসর নিবার্য্য ব্যাধিতে ১০ লক্ষের অধিক সন্তান হারাইতেছেন।

আপনারা স্মরণ রাখিবেন যে ঐ ১০ লক্ষের মধ্যে ৫ লক্ষের বয়স ১০এর নীচে।

মনে রাখিবেন যে প্রত্যেক দিন এই দুর্ভাগা দেশের ৬ শতের অধিক শিশু নিবার্য্য ব্যাধিতে মরিতেছে।

আপনারা ইহা স্মরণ রাখিবেন যে, যদি কলিকাতার শিশু-মৃত্যুর হার নিউজিলণ্ডের তুল্য হইত, তাহা হইলে ১৯১৯ সালে কলিকাতা সহরে ৫৯২৮ জনের স্থলে ৮২৫ জন মাত্র শিশু মরিত।

এই শিশুর মৃত্যুর মূলীভূত কারণ নিবারণ জন্য সকলের চেষ্টিত হওয়া উচিত।

বঙ্গদেশের শিশুমৃত্যু সংখ্যা অতি ভীষণ' অথচ তাহার প্রতিকারকল্পে লোকসাধারণের মধ্যে যেমন সাড়া পড়া উচিত ছিল, তাহা হইতেছে না। ইহা লক্ষ্য করিয়া স্বাস্থ্য কমিশনর ডাক্তার বেণ্টলি দুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন :—শিশু-মৃত্যু প্রসঙ্গ পাশ্চাত্য দেশে যেরূপভাবে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, ভারতবর্ষে তেমন করে নাই। ১৯১২ সালের হিসাব মতে বঙ্গের নানা জিলায় শতকরা ১৯১৬ হইতে ১৩০৭ পর্য্যন্ত শিশু মারা যাইতেছে। যশোহরে শিশুমৃত্যু অপেক্ষাকৃত অল্প কিন্তু খুলনা ও বরিশালে এ মৃত্যু ভয়াবহ।

বিশেষ বিশেষ থানার শিশুমৃত্যু কি ভীষণ নিম্নের তিনটি সংখ্যা উহা প্রকাশ করিবে।—

ঢাকার কেরাণীগঞ্জে	শতকরা	৬৩'০
রাজসাহীর নাটোরে	"	৬৪'৪
বর্দ্ধমানের গলসীতে	"	৬৯'০

জন শিশু প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে! যে স্থলে একশত শিশুর মধ্যে ৬০।৭০ জন শিশু মরে সেই স্থলে হতভাগ্য শিশুরা মরিবার জন্যই যেন জন্মিয়া থাকে। শিশুদের শতকরা ২৭ হইতে ৩৩ জন প্রসূত হইবার পরে ২৪ ঘণ্টা মধ্যেই ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া থাকে।

এইত শিশু মৃত্যুর ভীষণ সংখ্যা। ইহার প্রতীকার করিতে হইলে সর্ব্বত্র (১) শিশু মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করা দরকার; (২) ইহার প্রতিকার জন্য লোকসাধারণের মনে আন্তরিক আগ্রহ জাগাইয়া তুলিতে হইবে; (৩) ইংলণ্ডে শিশুমঙ্গলের নিমিত্ত যেরূপ ব্যবস্থা আছে ভারতবর্ষে সকল স্থলে অবিলম্বে মিউনিসিপাল এলাকায় সেইরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও কার্য্য আরম্ভ হওয়া উচিত।

বিদ্যালয় সমূহে ও ইহার প্রতীকারকল্পে স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষাদান করা উচিত।

বালকদিগের স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিলে সুফল ফলিতে পারে। নোংরামি যাহাদের অস্থি-মজ্জাগত চিরন্তন অভ্যাস হইয়া গিয়াছে তাহাদিগকে স্বাস্থ্যনীতি শুনাইলে উহা অরণ্যে রোদনবৎ ব্যর্থ হয়। অসতর্ক অজ্ঞ মাতাপিতা ও সঙ্গীদের দৃষ্টান্ত হইতে শিশুরা যে সকল নোংরা অভ্যাস শিখিয়া থাকে বিদ্যালয়ে বিশেষ সতর্কভাবে স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষাদান করিলে সেইগুলি কিয়ৎ পরিমাণে দূর হইতে পারে।

বালকদিগকে স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষাদানের জন্য কয় রকমের আয়োজন করা যায় :—

১। পুস্তক পড়ান।

২। তাহাদের সহিত আলোচনা ও তাহাদের নিকট বক্তৃতা করা।

৩। স্বাস্থ্যতত্ত্বমূলক নানাচিত্র, ছায়াবাজী, অভিনয় প্রদর্শন।

বালকগণ যে ঘরে শিক্ষকদের নিকট অধ্যয়ন করে সেই ঘরে প্রত্যেক বালকের শরীরের দৈর্ঘ্য ও ওজনের তালিকা টাঙ্গাইয়া রাখিলে বালকগণ স্বাস্থ্যশিক্ষা বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে পারে।

বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শ্রেণীতে একজন স্বাস্থ্য-স্বেচ্ছাসেবক অল্প দিনের জন্য নির্ব্বাচিত হওয়া শ্রেয়। ধরুন, এক সপ্তাহের জন্য কোন বালক ক্লাসের স্বাস্থ্য-ভলান্টিয়ার নিযুক্ত হইবে। ঐ বালক ক্লাসের পরিচ্ছন্নতা, এবং বালকগণের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দাখিল করিবে উহা ক্লাসে টাঙ্গাইয়া রাখা হইবে।

স্বাস্থ্য-স্বেচ্ছাসেবক ছাত্র তাহার রিপোর্টে কি কি বিষয় লিপিবদ্ধ করিবে ?

তাহাকে লিখিতে হইবে সপ্তাহের কোন্ বারে বেলা এগারটার সময়ে—

১। ক্লাস ঘরের তাপ কত ?

২। ক্লাসের বাহিরের তাপ কত ?

৩। বৃষ্টি হইয়াছে কিনা ?

৪। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন কিনা ?

৫। আকাশের অবস্থা কি রূপ ?

কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া, আমাশয়, টাইফয়েড জ্বর, চুলকানি, পাণিবসন্ত প্রভৃতি ব্যাধির জন্য কোন ছাত্র বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত আছে কি না? সেই ছাত্র বা ছাত্রদের নাম ঠিকানা পরিচয় ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। পর্য্যায়-ক্রমে এ কার্য্য করিতে হইলে কর্ত্তব্য হিসাবে তাহারা এ কার্য্যে সাময়িক সাবধান হইবে নিশ্চয় ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা হিসাবে একটা প্রতিদ্বন্দ্বীতার ভাব তাহাদের মধ্যে স্বতঃই জাগ্রত হইবে;—পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য ইহাদিগকে বৎসর শেষে প্রতিদ্বন্দ্বীতার পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করিলে আরও সুফল হইবার কথা।

দুগ্ধ সরবরাহের উন্নতি, শিশুরক্ষণের আর একটি প্রধান উপায়

গো-দুগ্ধ মানুষের বিশেষতঃ শিশুদের প্রধান খাদ্য। গোয়ালাদিগকে সমবায় সূত্রে আবদ্ধ করিতে না পারিলে অপর কোন উপায়ে দুগ্ধ সরবরাহের উন্নতি হইতে পারিবে না। দুগ্ধ সরবরাহের উন্নতি করিতে হইলে গো পালনের ব্যয়, ঘাসের মূল্য প্রভৃতি আলোচনা করা দরকার। মোট কথা গোয়ালাদের মনে অসন্তোষের উদ্রেক না করিয়া এই বিষয়ে ক্রমশঃ উন্নতি বিধান করিতে হইবে।

দুগ্ধের উৎকর্ষতা সাধনের উপায় দুইটী।

(১) আদালতের সাহায্যে আইন প্রণয়ন করা।

(২) গোয়ালাদিগকে স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষাদান করিয়া তাহাদের সহানুভূতি লাভ করা। তাহাদিগকে ইহা বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, দুগ্ধ খাঁটি হইলে ক্রেতাদের এবং তাহাদের উভয় পক্ষেরই লাভ।

গোয়ালাদের শিক্ষাদান

গোয়ালারা নিরক্ষর, তাহাদিগকে গোপালন ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিখাইবার জন্য মৌখিক উপদেশ এবং চিত্র প্রদর্শন এই দুই উপায় অবলম্বিত হইতে পারে।

উত্তম দুগ্ধ পাইতে হইলে কি কি করা চাই

১। গোশালা যথাসম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে।

২। দুগ্ধ-দোহন সময়ে গরুকে কিছু খাইতে দিও না।

৩। দোহনের পূর্ব্বে গরুর অঙ্গের ধূলা ও ময়লা ঝাড়িয়া-পুঁছিয়া ফেলিও।

৪। দোহনের পূর্ব্বে গরুর পালান ভিজা পরিষ্কার কাপড় দিয়া মুছিয়া লইও।

৫। পরিষ্কার কাপড় পরিয়া পরিষ্কৃত শুষ্ক হাতে গরুর দুগ্ধ দোহন করিও।

৬। দুগ্ধের বা দুগ্ধ পাত্রের মধ্যে আঙ্গুল ডুবাইও না।

৭। উত্তম সদ্যঃ ধৌত পরিষ্কৃত পাত্রে দুগ্ধ দোহন করিও। এই নিমিত্ত ধাতুপাত্র ব্যবহার করা প্রশস্ত।

৮। দোহনের পূর্ব্বে দোহন পাত্র গরম জলে ধুইতে হয়।

৯। দোহন পাত্রের মুখে শাদা পরিষ্কৃত বস্ত্র খণ্ড বাঁধিয়া রাখিও।

১০। টানা হেঁচড়া করিয়া দুগ্ধ দোহন করিও না। দোহন করা দুগ্ধ গোয়ালঘরে অনেকক্ষণ রাখিও না।

১১। সুস্থ বলিষ্ঠ গোরুরই দুগ্ধ দোহন করিবে।

১২। দুগ্ধ কিংবা দুগ্ধপাত্রে যেন মাছি বসিতে কিংবা কোন পশু পক্ষীতে মুখ দিতে না পারে।

১৩। গরুর শয়নের জন্য পরিষ্কৃত শুষ্ক নূতন খড় দিবে।

১৪। গোয়ালঘর যথাসম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিও।

১৫। গোয়ালঘর হইতে প্রত্যহ গোবর সরাইতে হইবে।

১৬। যে ব্যক্তি অল্প দিন হইল অসুস্থ ছিল, এমন ব্যক্তিকে দুগ্ধ কিংবা গরু ছুঁইতে দিও না।

দুগ্ধের শুদ্ধতা পরীক্ষা

আকৃতি, রসায়ন, বীজাণু এবং স্বাস্থ্যনীতি এই চারি প্রকারের মান দ্বারা দুগ্ধের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করা হয়।

দৈহিক পরীক্ষায় দুগ্ধের আপেক্ষিক গুরুত্ব, তাপ, স্বাদ, বর্ণ প্রভৃতি দেখা হইয়া থাকে। রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা দুগ্ধের মাখন, কঠিন দ্রব্যের পরিমাণ প্রভৃতি দেখা হয়। উহার দ্বারা জল মিশান হইয়াছে কি না তাহা বুঝা যাইতে পারে।

দুগ্ধের বিশুদ্ধতা অসংশয়ে বুঝিতে হইলে উহার মধ্যে কতকগুলি বীজাণু আছে, তাহা পরীক্ষা করা দরকার।

ম্যালেরিয়া

বঙ্গদেশে প্রত্যেক বৎসর ৪ লক্ষের অধিক লোকে ম্যালেরিয়া জ্বরে প্রাণত্যাগ করে। কুইনাইনই ম্যালেরিয়া জ্বরের একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র, ম্যালেরিয়া দমনের এমন অব্যর্থ

ঔষধ আর নাই, এই সহজ কথা আজিও লোকের মনে মুদ্রিত করিয়া দিতে কেহ সমর্থ হন না।

ম্যালেরিয়া জ্বরের মত ভয়ানক ব্যাধি কুইনাইন খাইলেই সারিবে কেহ বিশ্বাস করিতে চায় না। ব্যবস্থা অতি সহজ বলিয়াই বোধ হয় লোকের প্রত্যয় হয় না।

নামন নামক এক সিরিয়াবাসীর কুষ্ঠরোগ হয়, তাহাকে বলা হইয়াছিল যে জর্ডন নদীতে ৭ বার স্নান করিলেই তাহার রোগ আরোগ্য হইবে, সে উহা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছিল! কুষ্ঠরোগ ঐরূপ অনায়াসে সারিতে পারে সে তাহা বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারে নাই।

সার রোণাল্ড রস ম্যালেরিয়া রোগ চিকিৎসার অন্যতম বিশেষজ্ঞ বলিয়া পরিচিত, তিনি বলেন, কুইনাইনের আরক ম্যালেরিয়ার একমাত্র ঔষধ। তিনি বলেন, ৮০ গ্রেণ কুইনাইন, আসিড সলফিউরিক ডিলে দ্রব করিয়া জলসহ ৮ মাত্রা ঔষধ তৈয়ার করিয়া রোগী প্রত্যহ জ্বরবিরামে সেবন করিলে ম্যালেরিয়া জ্বর আরোগ্য হয়। পৃথিবীর গ্রীষ্মমণ্ডলে প্রায় সর্ব্বত্রই ম্যালেরিয়া চিকিৎসায় এই ঔষধ ব্যবহৃত হইতেছে। ১৮২০ সালে সিঙ্কোনা বৃক্ষের ত্বক হইতে প্রথমে কুইনাইন তৈয়ার হয়। তদবধি জ্বরের চিকিৎসায় কুইনাইনই সর্ব্বোত্তম ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

নানাপ্রকার কুইনাইনের মধ্যে সল্‌ফেট্‌ অব কুইনাইনের মূল্য অল্প। এই নিমিত্ত কুইনাইন সল্‌ফেটই ব্যবহৃত হয়। প্রত্যহ প্রাতে আহারের পূর্ব্বে একমাত্রা ঔষধ সেব্য অথবা ৭০গ্রেণ হিসাবে (?) সপ্তাহে দুইমাত্রা ঔষধ ব্যবহার করিলেও একই ফল পাওয়া যাইবে। যাহাদের উদরাময় বা অপর কোন প্রকার পেটের অসুখ আছে তাহাদের সলফেটের পরিবর্ত্তে ক্লোরাইড কুইনাইন সেবন করা বিধেয়।

ম্যালেরিয়া রোগের ব্যাপ্তি

বর্দ্ধমান, হুগলি, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ এই চারি জিলায় শতকরা ৫০এর অধিক; বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, যশোহর এই চারি জিলায় শতকরা ৪০ হইতে ৫০ ব্যক্তি; মেদিনীপুর, পাবনা, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি এই ৪ জিলায় শতকরা ৩০ হইতে ৪০ ব্যক্তি; খুলনা, ২৪শ পরগণা, রাজসাহী, বগুড়া, রংপুর, হাওড়া, দারজিলিং এই কয় জিলায় শতকরা ২০ হইতে ৩০ ব্যক্তি; ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম এই কয় জিলায় শতকরা ১০ হইতে ২০ ব্যক্তি; ত্রিপুরা, বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালি এই তিন জিলায় শতকরা প্রায় ১০ ব্যক্তি ম্যালেরিয়া রোগে ভুগিতেছে।

টাইফয়েড জ্বর

টাইফয়েড একপ্রকার ছোঁয়াচে অবিরাম ক্লেশদায়ক জ্বর। টাইফোসাস নামক একপ্রকার বিশেষ বীজাণু হইতে এই রোগ জন্মে।

এই ব্যাধিতে যত লোক আক্রান্ত হয় উহাদের ১২ কি ১৫ জন মধ্যে ১ জনের মৃত্যু হয়।

এই রোগ-বীজাণু দেহে প্রবেশ করিয়া ৭ হইতে ১৪ দিন মধ্যে পূর্ণভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হয়।

টাইফোসাস নামক রোগ-বীজাণু এক ব্যক্তির দেহ হইতে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করিলে তাহার ঐরোগ উৎপন্ন হয়।

সাধারণতঃ টাইফড়ে রোগীর মলমূত্র ও থুথুর সহিত রোগ-বীজাণু নির্গত হইয়া থাকে। এই সকলের উপরে যে মাছি বসিয়া থাকে সেই মাছি খাদ্যদ্রব্যের উপর পতিত হইলে ঐ খাদ্যদ্রব্য যে ভক্ষণ করিবে সে রোগ-বীজাণু উদরস্থ করিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অথবা রোগীর প্রস্রাব যদি কোনরূপে জলাশয়ে পতিত হয় উহার দ্বারা পানীয় জল দূষিত হয় এবং জলসহ রোগ-বীজাণু অপরের উদরস্থ হইয়া তাহাকে রোগাক্রান্ত করিয়া থাকে।

টাইফয়েড জ্বর সাধারণতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ব্যাধি।

মলমূত্র বা থুথু শুকাইয়া গেলেও টাইফয়েড রোগের বীজাণু বিনষ্ট হয় না। তখন উহা বায়ুর সহিত সূক্ষ্মাকারে ব্যাপ্ত হইতে পারে।

এই রোগের সংক্রামকতা নিবারণের উপায়,—পানীয় জল সিদ্ধ করিয়া পান করা। দ্বিতীয়তঃ খাদ্যদ্রব্যাদি এমনভাবে ঢাকিয়া রাখা উচিত যে উহার উপরে যেন কদাচ মাছি বসিতে না পারে।

যাঁহারা টাইফয়েড রোগীর সেবা করিবেন তাঁহাদের

সর্ব্বদা পরিচ্ছন্ন থাকিতে হইবে। তাঁহারা সাবান, গরমজল এবং কার্ব্বলিক লোসন দ্বারা হাত না ধুইয়া বাহিরের কোন জিনিস স্পর্শ করিবেন না।

রোগী রোগ-ভোগ কালে যে সকল জিনিষ ব্যবহার করে, সেই সমস্ত পোড়াইয়া ফেলিতে হয়।

রোগমুক্তির পরে চিকিৎসকের ব্যবস্থা লইয়া রোগীর দেহ সাবান প্রভৃতি দ্বারা ধোয়াইয়া শোধন করিতে হয়।

যে ঘরে টাইফয়েড রোগীর মৃত্যু হয় সেই ঘর ঔষধ মিশ্রিত জল দ্বারা শোধন না করিয়া কাহারও তথায় প্রবেশ করা উচিত নহে।

বক্রকীট ব্যাধি

বঙ্গদেশের লোক সংখ্যা প্রায় ৫ কোটী ৬৫ লক্ষ। কিন্তু এদেশের প্রায় ৪ কোটি লোক বক্রকীট ব্যাধিতে ভুগিতেছে। প্রত্যেক ৫ ব্যক্তির মধ্যে ৪ জনই এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। অথচ অধিকাংশ লোকই জানে না যে তাহারা ঐ রোগে ভুগিতেছে। তাহারা ইহাকে জড়িত জীর্ণ ব্যাধি বলিয়া ভ্রম করেন।

প্রশ্ন। বক্রকীট কিরূপ?

উত্তর। বক্রকীট শাদা ছোট পোকা, লম্বায় এক ইঞ্চিরও ছোট পোকা, ইহারা মানুষের উদরে অন্ত্রমধ্যে বাস করে।

প্রশ্ন।—ইহাদিগকে বক্রকীট বলে কেন?

উত্তর।—ইহাদের বড়শীর মত বাঁকা দাঁত আছে, উহার দ্বারা অন্ত্রের প্রাচীর কামড়াইয়া রোগীর রক্ত পান করে।

প্রশ্ন।—ইহারা কি রোগীর কোন অনিষ্ট করে?

উত্তর।—হাঁ, ইহাদের আক্রমণে রোগীর বক্রকীট ব্যাধি জন্মে, ইহারা রোগীর রক্ত শোষণ ও দূষিত করিয়া থাকে। যাহাদের এই রোগ হয় তাহারা উদরাময় রোগে ভুগিয়া থাকে, তাহাদের রক্ত তরল হয়, তাহারা দুর্ব্বল, জড়বুদ্ধি এবং কর্ম্মবিমুখ হইয়া পড়ে। শিশুরা এই রোগে আক্রান্ত হইলে তাহাদের দেহ বাড়ে না, বুদ্ধি জড়তাপ্রাপ্ত হয়, লেখাপড়ায় উন্নতিলাভ করিতে পারে না।

প্রশ্ন।—বঙ্গদেশে কত লোক এই রোগে ভুগিতেছে?

উত্তর।—এই রোগ বাঙ্গলাদেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। এই ব্যাধি বহু লোকের দুঃখ, দৈন্য, দৌর্ব্বল্যের হেতু।

অনেক পরিবারে সকলে এই রোগে আক্রান্ত হয়, অনেক বিদ্যালয়ে সকল ছাত্রই এই রোগে ভুগিতেছে।

প্রশ্ন।—কেবল দরিদ্র ও অজ্ঞ ব্যক্তিরা এই রোগে ক্লেশ পায়?

উত্তর।—না, শিক্ষিত ও ধনীরাও এই ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয়। দরিদ্রের ৫জন মধ্যে ৪জনে এবং ভদ্রলোকদের ৫জন মধ্যে ৩জনে এই রোগে ক্লেশ পাইতেছে।

প্রশ্ন।—কিরূপে লোকের দেহে বক্রকীট প্রবেশ করে?

উত্তর। যে স্থলে মল ত্যাগ করা হয়, সেই জমির উপর দিয়া খোলা পায় হাটিলে এই কীট দেহে প্রবেশ করে। কেহ কেহ কলুষিত খাদ্য ও পানীয়সহ এই কীট উদরস্থ করিয়া থাকে। প্রধানতঃ মলদূষিত ক্ষেত্র হইতেই এই কীট লোকের দেহে প্রবেশ করে। মলত্যাগের পরে জমি হইতে মলচিহ্ন লুপ্ত হইবার পরেও তথায় অসংখ্য বক্রকীট বিচরণ করিয়া থাকে। মল নাই দেখিয়া যাহারা এইরূপ জমির উপর দিয়া হাঁটিয়া থাকে কখন কখন তাহাদের পায় এক প্রকার চুলকানি থাকে! এই চুলকানি আর কিছুই নহে, চর্ম্মের ছিদ্র পথে সূক্ষ্মকার বক্রকীটের প্রবেশ নিমিত্ত এই চুলকানি জন্মিয়া থাকে।

প্রশ্ন।—সূক্ষ্ম বক্রকীট কোথা হইতে মলের মধ্যে এবং পানীয় জলে গমন করে?

উত্তর।—পূর্ণাকার বক্রকীট মানবদেহে অন্ত্রমধ্যে বাস করে, উহারা তথায় ডিম্ব প্রসব করে কিন্তু অন্ত্রমধ্যে ডিম হইতে কীটশাবক প্রসূত হইতে পারে না; ঐ ডিম্বগুলি মলের সহিত যখন সিক্ত ভূমিতে পতিত হয় তখন সেইগুলি হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কীট উৎপন্ন হয়। প্রথম অবস্থায় ঐ কীটশাবকগুলি এমন সূক্ষ্ম থাকে যে সাধারণ দৃষ্টিতে সেইগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না। উক্ত দূষিত ভূমিতে কোন ব্যক্তি বিচরণ করিলে কীট তাহার পা, হাত প্রভৃতির চর্ম্ম-ছিদ্র-পথে দেহে প্রবেশ করে।

সেই সকল সূক্ষ্ম কীট নানা প্রকার শাকসব্জি ও ফলের উপর বিচরণ করে। ঐ সকল ফল যাহারা কাঁচা ভক্ষণ করে তাহারা উক্ত শাকসব্জি ও ফলের সহিত ঐ কীট গলাধঃকরণ করিয়া থাকে।

ঐ সকল কীট ভূদূষিত মির সমীপবর্ত্তী কূপ বা পুষ্করিণীর

জলের সহিত মিশ্রিত হয় এবং ঐ জল যাহারা পান করে তাহাদের উদরে প্রবেশ করে।

প্রশ্ন। বক্রকীট উদরে প্রবেশ করিয়া নূতন কীটের জন্মদান করে? না প্রত্যেকটি কীট বাহির হইতে দেহে প্রবেশ করিয়া থাকে? বক্রকীট সংখ্যা কি জমির উপর বাড়িতে থাকে?

উত্তর। না, মনুষ্যের উদর হইতে প্রসূত প্রত্যেক ডিম্ব হইতে কীট জন্মলাভ করে। যদি ঐ কীট কোনরূপে মানব দেহে প্রবেশ করিতে না পায় তাহা হইলে কালক্রমে মরিয়া যায়। এই কীট কয়েকমাস পর্য্যন্ত জমির উপর জীবিত থাকে, কিন্তু মানব দেহে প্রবেশ করিয়া এই কীট বহু বৎসর জীবিত থাকে।

প্রশ্ন। লোকে কি করিয়া বুঝিবে যে তাহার বক্রকীট ব্যাধি জন্মিয়াছে?

উত্তর। যাহারা এই রোগ হয় তাহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ, রক্ত পাতলা, এবং উচ্চে আরোহণ কালে শ্বাস ক্লেশ হয়। এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তি কার্য্য করিতে বা খেলিতে চায় না। লোকে তাহাকে অলস বলিয়া মনে করে। শিশুদের এই রোগ হইলে তাহারা বাড়ে না, তাহারা লেখাপড়া শিখিতে পারে না। পরিণত বয়স্কদের এই রোগ হইলে তাহারা কার্য্যে অসমর্থ হইয়া পরের গলগ্রহ হইয়া উঠে। মাথাধরা, অস্থিরতা, বুকজ্বালা, পেটে বেদনা, বদহজম, হৃদ্‌স্পন্দন প্রভৃতি এই রোগের লক্ষণ।

প্রশ্ন। বক্র কীট ব্যাধি কিরূপে নির্ণীত হয়?

উত্তর। মল পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসকগণ উহা স্থির করেন।

প্রশ্ন। এই রোগ হইলে রোগী কি আরোগ্য লাভ করিতে পারে?

উত্তর। হাঁ, উপযুক্ত চিকিৎসকের চিকিৎসাধীন হইলে তিনি উদর হইতে সকল কীট বাহির করিয়া দিয়া রোগীকে রোগমুক্ত করিয়া দিতে পারেন?

প্রশ্ন। বক্রকীট ব্যাধি কি নিবারিত হইতে পারে?

উত্তর। হাঁ। মল-দূষিত জমির উপর দিয়া জুতা পরিয়া চলিতে হয়। পায়খানা ব্যতীত যেখানে সেখানে কাহাকেও মল ত্যাগ করিতে দিতে নাই। যদি কেহ উহা করে তাহা হইলে উহার দ্বারা অপরের অনিষ্টের সম্ভাবনা হয়।

কলেরা

বঙ্গের নগর ও পল্লী সমূহে প্রত্যেক বৎসর ৮০ হাজারের অধিক লোক বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। ১৯১৯ সালে এই রোগে ১২১,২৬২ লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে বিসূচিকা নিবার্য্য ব্যাধি।

মুর্শিদাবাদ, নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম জিলায় হাজার করা ২·৫ ব্যক্তির অধিক; ২৪ পরগণা, হাওড়া, বর্দ্ধমান, জলপাইগুড়ি, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর এই কয় জিলায় হাজার করা ২ হইতে ২·৫ ব্যক্তি; খুলনা, মেদিনীপুর, বীরভূম, ত্রিপুরা এই কয় জিলায় হাজার করা ১·৫ হইতে ২ ব্যক্তি; বাখরগঞ্জ যশোহর, নদীয়া, হুগলি, ঢাকা, পাবনা, বগুড়া, মালদহ, রংপুর এই কয় জিলায় হাজার করা ১ হইতে ১·৫ ব্যক্তি; দিনাজপুর ও রাজসাহী জিলায় হাজার করা ·৫ হইতে ১ ব্যক্তি; দারজিলিং ও বাঁকুড়া জিলায় হাজার করা ·৫ ব্যক্তি কলেরায় প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ব্যাধি পৃথিবীর সর্ব্বদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এই ব্যাধি ভারতবর্ষে যত লোকের প্রাণক্ষয় করিয়াছে ইয়ুরোপের মহাসমরেও তত লোকের প্রাণনাশ হয় নাই।

এই ভীষণ ব্যাধির হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার উপায় কি? উপায় এই:—

১। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগীর সংশ্রব হইতে দূরে থাকা।

২। সকল বিষয়ে নিয়মনিষ্ঠ হইয়া শরীর সুস্থ ও বলিষ্ঠ রাখিতে হইবে। পুষ্টিকর খাদ্য খাইবে, যাহাতে দেহ অবসন্ন হয় এমন কোন কার্য্য করিও না, ঠাণ্ডা লাগাইও না, মদ্যপান করিও না। এই সকল নিয়ম যাহারা মানিয়া চলিবে তাহারা ব্যাধি দ্বারা কোন কারণে আক্রান্ত হইলেও রোগ মারাত্মক হইতে পারিবে না।

৩। এই রোগে যে ব্যক্তি অতি সাধারণভাবেও আক্রান্ত হইয়াছে সেও অপরের আতঙ্কস্থল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

৪। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা এখন এমন ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে যে ইহার ছোঁয়াছানা এড়ান একরূপ অসম্ভব। তবে।—

(ক) যাহারা পুষ্টিকর খাদ্য আহার করে।

(খ) অবাধ বায়ু প্রবাহিত খোলা ঘরে বাস করে।

(গ) জনতা এড়াইয়া চলে, রুদ্ধ গৃহে বহুক্ষণ থাকে না।

(ঘ) যথোপযুক্ত পোষাক পরিধান করে।

(ঙ) পটাসিয়ম পার ম্যাঙ্গেনেটের আরক দিয়া নাক ও মুখ ধৌত করে।

(চ) কোন রোগীর সেবা করিতে হইলে যাহারা নাক মুখ বস্ত্রাবৃত করিয়া লয়, তাহাদের এই রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প।

৫। এই রোগের সংস্রব এড়াইবার জন্য যে সে ঔষধ কিনিয়া অকারণে অর্থের অপব্যয় করিও না।

৬। যে স্থলে রুদ্ধগৃহে বহু লোকের বৈঠক হয় সেই স্থলে যাইও না। রুদ্ধ গৃহেই ইনফ্লুয়েঞ্জা সহজে সংক্রামিত হইয়া থাকে।

৭। যাহাদের অতি মৃদু ভাবেও ইনফ্লুয়েঞ্জার সূচনা হইয়াছে তাহাদের ১০ দিনের মধ্যে সভায় সম্মিলনে যাওয়া উচিত নয়।

৮। কার্য্যস্থলে বসিয়া যদি কোন ব্যক্তি ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে তাহার তৎক্ষণাৎ—

(ক) বাড়ী যাইয়া শয্যায় শয়ন করা এবং তাহার গরম কাপড়ে সর্ব্ব দেহ আবৃত রাখা সঙ্গত।

(খ) তাহার তখনই চিকিৎসক ডাকিয়া ব্যবস্থা লওয়া কর্ত্তব্য।

(গ) ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগী সম্ভব হইলে একাকী একঘরে বাস করিবে। অন্যথা তাহার শয্যার চারিদিকে পর্দ্দা টাঙ্গাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

(ঘ) এই রোগী যখন কাসিবে, বা হাঁচি দিবে তখন রুমালে তাহার মুখ ঢাকিয়া লইবে। সেই রুমাল তখনই আবার গরম জলে সিদ্ধ করিয়া ধুইয়া দিতে হইবে। অন্যথা উহা পোড়াইয়া ফেলিবে।

(ঙ) পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের আরক দিয়া এই রোগীর নাক মুখ ধুইতে হইবে।

(চ) ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগীকে রোগমুক্ত হইয়াও বহুদিন সতর্ক থাকিতে হইবে।

(ছ) রোগমুক্তির পরে এই রোগী অগত্যা সপ্তাহকাল যেন কোন জনপূর্ণ স্থলে গমন করে না।

ছারপোকা

কলিকাতা এবং মফঃস্বলে অনেকেই এই গরমের দিনে ছারপোকার কামড়ে রাত্রিকালে অনিদ্রায় নিশাযাপন করেন।

ছারপোকা একান্ত নিরীহ প্রাণী নহে। ইহা কেবল রক্ত শোষণ করে না। স্বাস্থ্য কমিশনার মহাশয়ের রচিত যে বিজ্ঞাপন পত্র সংপ্রতি স্বাস্থ্য প্রদর্শনীতে বিতরিত হইতেছে উহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, ছারপোকা কালাজ্বর, বেরিবেরি এবং অপর বহু রোগের বীজ বহন করে। ছারপোকার দেহে যক্ষ্মা রোগের বীজাণুও পাওয়া গিয়াছে। ছারপোকা সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়, তবে কোন কোন স্থলে ইহাদের বাহুল্য লক্ষিত হয়। যে ঘরে ছারপোকার উৎপাত হয় সেই ঘরের মেজের ও প্রাচীরের ফাঁকে, ফাটালে ছোট বড় গর্ত্তে ইহারা বাস করে। বিছানা, পরিধেয় বস্ত্র, বসিবার আসন সকল স্থলেই ইহারা বিচরণ করে। যে গর্ত্ত, বা ফাটালে ইহারা বাস করে সেই স্থলে ইহারা ডিম্ব পাড়িয়া থাকে।

ছারপোকা দূর করিতে হইলে বিছানা গরমজলে সিদ্ধ করিতে হইবে। তক্তপোষের ফাঁকে, সন্ধিস্থলে কেরোসিন বা পেট্রোল ঢালিয়া দিতে হয়। ফাটাল বা গর্ত্তের মধ্যে কেরোসিন বা বাইক্লোরাইড অব মার্করি দিবে। ছারপোকা হইলে ঘর বন্ধ করিয়া ৩ কি ৪ ঘণ্টা কাল গন্ধক পোড়াইলে ছারপোকা নষ্ট হইবে। ইহার মধ্যে এই একটি আপত্তির বিষয় আছে যে জলীয় বাস্প সহযোগে ঘরে সলফিউরস আসিড উৎপন্ন হইলে উহাতে ধাতু পাত্র এবং বস্ত্রাদির অনিষ্ট হইতে পারে।

নিম্নলিখিত চারি উপায়ের যে কোন উপায়ে ঘরের এবং তক্তোপোষের ছারপোকা মারা যাইতে পারে।

(১) সমান পরিমাণে তারপিন ও কেরোসিন মিশাইয়া উহা তক্তোপোষে এবং ঘরের গর্ত্তে বা ফাটালে মাখাইয়া দেও।

(২) করসিভ সব্লিমেট ২ আউন্স
　　মিউরিক এসড ২ আউন্স
　　জল　　৪ আউন্স

মিশাইয়া উহার সহিত তামাকের ডিককসন ১ পাইণ্ট মিশাইয়া উহা তুলির দ্বারা মাখাইয়া দিলে ছারপোকা

মরিবে। এই আরক ভয়ানক বিষাক্ত। সতর্কভাবে ব্যবহার করিও।

(৩)	কর্পূর	২ আউন্স
	টার্পেণ্টাইন স্পিরিট	৪ আউন্স
	কারোসিভ সব্লিমেট	১ আউন্স
	এলকোহল মদ্য	১ পাইণ্ট
(৪)	মারকুরি অয়েণ্টমেণ্ট	১ আউন্স
	সাবান গোলা	১ আউন্স
	তারপিন তৈল	১ পাইণ্ট

(৫) বেঞ্জাইন ও পেট্রোল ব্যবহারেও ছারপোকা মরে।

মানুষের সহস্র শত্রু। জীবন প্রতি পদে বিপন্ন। সাবধান না হইলে কাহারও পরিত্রাণ নাই। বঙ্গের চিত্র সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ—অথচ আমরা সর্ব্বাপেক্ষা নিশ্চেষ্ট। আমাদের অবস্থা ব্যবস্থা, শিক্ষা দীক্ষা, দারিদ্র্য, সর্ব্বোপরি স্বাস্থ্যে ঔদাসীন্য পলে পলে আমাদিগকে মরণের দ্বারে লইয়া চলিয়াছে! তথাপি কি ঘুম ভাঙ্গিবে না। যে দেশে জন্ম হইতে মৃত্যু সংখ্যা অধিক,—জীবিতও আধিব্যধিতে জরাগ্রস্থ—সে দেশের ভবিষ্যৎ কি ভয়াবহ—তাহা কল্পনা করা যায় না। ডাক্তার ভিজিট লইয়াই তুষ্ট কিন্তু কয় দিন এ মৃত্যুর ব্যবসা চলিবে—অর্থ যোগাইবার লোক শেষ হইয়া আসিল যে! কার জন্য অর্থ? ঘরেও যে টান পড়িতেছে! উকিল মোকদ্দমায় ব্যস্ত—ভূতে কি জমীজমা ভাগ করিবে! আচ্ছা কেন এ দেশের লোক জাগে না! এরা কি কেহ বুঝে না। বুঝে ভাবে না। ভাবে সেই যুধিষ্ঠিরের উক্তি—আমি অমর! প্রাণ তাই কাঁদে না—স্বার্থপরতায় অন্যে মরুক চাল সস্তা হইবে আহার চলিবে অরণ্যে বসিয়া—এই স্বার্থপরতায় আত্মজ্ঞানহীন, আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টাতেই দেশটার সকল গুণই ঢাকিয়া ফেলিয়াছে সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া সবই অরণ্যেরোদনে পরিণত হইতেছে! কেন? শিক্ষিত অভিমানী যাঁরা তাঁরাও কি জীবনের এই প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্যকে উপেক্ষা করিবেন? শিয়রে শমন—সাবধান হইবার সময় আসিয়াছে! একেবার স্থির হইয়া ভাবুন ত দেশের বংশধরের—আপনার নিজের কি মহাবিপদ উপস্থিত,—জীবন মরণের কি বিষম সমস্যা।

যক্ষ্মারোগীর প্রতি

বঙ্গের স্বাস্থ্য কমিশনারের বিজ্ঞাপন

তোমার যক্ষ্মারোগ হইয়াছে বলিয়া ভয়ে বিহ্বল হইও না। তোমার যে যক্ষ্মারোগ হইয়াছে ইহা যে তুমি জানিতে পারিয়াছ তোমার এই বোধই তোমার আরোগ্যলাভের প্রধান হেতু হইবে।

এই রোগ প্রথমাবস্থায় ধরা পড়িলেই ইহা নিবারিত হইতে পারে।

এক সময়ে লোকে মনে করিত যক্ষ্মা যার হয় তার আর রক্ষা নাই, এখন ঐ ধারণা ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইহা দেখা গিয়াছে যে প্রথমাবস্থায় যে সকল রোগীর চিকিৎসা হইয়াছে তাহাদের অনেকেই আরোগ্যলাভ করিয়াছে।

তোমার যদি কাসি হইয়া থাকে, উহার কারণ অনুসন্ধান কর। পেটেণ্ট ঔষধ ব্যবহার করিও না। উহা ব্যবহার করিয়া রোগী একটু উপকার বোধ করিতে পারে, বস্তুতঃ উহাতে কোন উপকার হয় না, রোগ ক্রমশঃ বাড়িতেই থাকে।

রোগ নির্ণয়ে যাহার সুখ্যাতি আছে এমন কোন বিজ্ঞ চিকিৎসকের উপদেশ লইয়া সত্বর তাঁহার চিকিৎসাধীন হইলে রোগমুক্তির সম্ভাবনা হয়। প্রারম্ভে রোগ নির্ণয় করা যে-সে চিকিৎসকের কর্ম্ম নহে।

যক্ষ্মারোগী সতর্ক না হইলে তাহার রোগ অন্যে সংক্রামিত হইতে পারে। তাহার মলমুত্র থুথু প্রভৃতি শোধন করিয়া নষ্ট করিতে হয়।

প্রধানতঃ থুথু হইতে এইরোগ ছড়াইয়া পড়ে। থুথু গিলিও না, বা শুকাইয়া যাইতে দিও না, যেখান দিয়া লোক যাতায়াত করে এমন পথে থুথু ফেলিও না, ঘরের দেওয়াল, মেজে, কিংবা অশোধিত পাত্রে থুথু ফেলিতে নাই। যক্ষ্মারোগীর আরোগ্যলাভের জন্য চাই—

বিশুদ্ধ বায়ু, সূর্য্য কিরণ ও পুষ্টিকর খাদ্য

দিনে রাত্রে শীতে গ্রীষ্মে সর্ব্বদা রোগীর বিশুদ্ধ বায়ু অত্যাবশ্যক। সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের বিনা উপদেশে যক্ষ্মারোগী ব্যায়াম বা শারীরিক শ্রমসাধ্য কোন কার্য্য করিবে না। যে রোগীর ওজন কমিতেছে বা যে অল্প জ্বর বোধ

করে, যাহার থুথুর সহিত রক্ত পড়ে কিংবা নাড়ী দ্রুত চলে তাহার কোনরূপ কার্য্য করা উচিত নয়।

যক্ষ্মা সম্বন্ধে জনসাধারণের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়

যক্ষ্মারোগ এক প্রকার জীবাণু হইতে জন্মে। যক্ষ্মারোগ এক ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিতে সঞ্চারিত হয়, কিন্তু নিবার্য্য।

অধিকাংশ স্থলে এই রোগ রোগীর ফুস্‌ফুস যন্ত্র আক্রমণ করিয়া থাকে। এই রোগ অনেক রোগীর পরিপাক যন্ত্রও আক্রমণ করে।

যক্ষ্মারোগীর দেহ হইতে রোগ বীজাণু থুথু, কাসি, কফ, মল, মূত্র ও পুঁজ প্রভৃতির সহ নির্গত হইয়া থাকে। যক্ষ্মারোগীর থুথু শুকাইয়া বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া বায়ু দূষিত করে। সেই বায়ু শ্বাসের সহিত যে গ্রহণ করিবে তাহারই এই রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। যক্ষ্মারোগী যখন কাসিতে থাকে তখন তাহার নিকটে দুই হাতের মধ্যে থাকিও না, কারণ কাসির সময়ে তাঁহার মুখ হইতে সূক্ষ্মাকারে থুথু নির্গত হয়, ঐ থুথুর সহিত রোগ বীজাণু থাকিতে পারে। যখন যক্ষ্মারোগী জোরে কথা কহে তখনও ঐরূপে থুথু বাহির হইয়া থাকে। যক্ষ্মারোগীর সাধারণ শ্বাসের সহিত রোগ-বীজাণু নির্গত হয় না।

যক্ষ্মারোগীর মলমূত্র থুথু প্রভৃতি শোধন না করিয়া যদি মলপাত্রে পায়খানায়, নদীতে কিংবা ভূগর্ভে নিক্ষেপ বা প্রোথিত করা হয় তাহা হইলে উহা হইতে বিপদ ঘটিতে পারে। উহা পানীয় জলের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে। সাধারণতঃ দূষিত দুগ্ধ-পানে যক্ষ্মারোগ হয়। যে গরুর যক্ষ্মা রোগ আছে উহার দুগ্ধ পান কিংবা বায়ু হইতে যক্ষ্মারোগীর থুথু চূর্ণ যে দুগ্ধে পড়ে উহা পান করা বিপজ্জনক। এইরূপ সন্দিগ্ধ দুগ্ধ না ফুটাইয়া কখনও পান করিও না।

যক্ষ্মারোগব্যাপ্তি নিবারণের প্রধান উপায় এই যে, যক্ষ্মারোগীর মল মূত্র, থুথু প্রভৃতি পরিত্যক্ত হইবামাত্র নষ্ট করিয়া ফেলিতে হয়। অগ্নি অথবা সংশোধক ঔষধ দ্বারা ঐ সকল নাশ করিবে।

এই নিমিত্ত কার্ব্বলিক আসিড মিশ্রিত জল অর্থাৎ ৵৫ সের জলে ১৭ তোলা কার্ব্বলিক এ্যাসিড মিশাইয়া সেই জল ব্যবহার করিতে হয়।

সুস্থ অসুস্থ কোন ব্যক্তির রাজপথে থুথু ফেলিতে নাই। যে স্থলে সঞ্চিত হইয়া দূরীকৃত এবং বিনষ্ট হইতে পারিবে না এমন স্থলে থুথু ফেলিও না।

যক্ষ্মারোগীর থুথু বহন করিয়া মাছি আসিয়া তোমার হাতে, মুখে, পোষাকে, খাদ্যদ্রব্যে, শিশুদের দুগ্ধ পাত্রে পড়িয়া থাকে। এই উপায়ে রোগবীজাণু উদর ও ফুস্‌ফুস্‌ মধ্যে প্রবেশ করে।

আত্মরক্ষা, পরিবার, বন্ধুবর্গ এবং জনসাধারণের নিরাপদের নিমিত্ত যক্ষ্মারোগীর যেখানে সেখানে থুথু ফেলা কর্ত্তব্য নহে।

যক্ষ্মারোগীরা যাহাতে তাহাদের মল মূত্র থুথু প্রভৃতি শোধন পূর্ব্বক বিনষ্ট করে তজ্জন্য সুস্থ ব্যক্তিদিগের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

দৃষ্টান্ত প্রদর্শন জন্য সুস্থ ব্যক্তিকেও যেখানে সেখানে থুথু ফেলা হইতে বিরত থাকিতে হইবে। সুস্থ ও বলিষ্ঠ ব্যক্তি আপনার অজ্ঞাতসারে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইতে পারে। এইরূপ ব্যক্তি যেখানে সেখানে থুথু ফেলিলে উহা তাহার নিজের এবং লোক সাধারণের পক্ষে বিপজ্জনক।

যক্ষ্মারোগীর সহিত এক শয্যায় বা এক গৃহে শয়ন করিও না। যে ঘরে রোগী ছিল, ঐ ঘরে শয়ন করিতে হইলে ঘর শোধন করিয়া লইও।

যক্ষ্মারোগীর সংস্রবে সুস্থ অসুস্থ সকল ব্যক্তিরই এই রোগ হইতে পারে। তবে যাহারা কৃশ ও রুগ্ন, যাহাদের সর্দ্দি কাশি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া অথবা দৌর্ব্বল্য আছে তাহারা এই রোগে সহজেই আক্রান্ত হইতে পারে। সুস্থ ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিরা এই রোগে তেমন সহজে আক্রান্ত হয় না। যদি তোমার দীর্ঘকাল স্থায়ী কাসি রোগ থাকে তাহা হইলে কোন সুপরিজ্ঞাত সুবিজ্ঞ চিকিৎসককে দিয়া তুমি পরীক্ষিত হইও।

তুমি যদি সতর্ক হও তাহা হইলে যক্ষ্মারোগ তোমাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। রোগাক্রান্ত হইয়া চিকিৎসিত হওয়ার অপেক্ষা সতর্কতা গ্রহণ অল্প ব্যয়সাধ্য।

যক্ষ্মারোগী যদি সময় মত সুচিকিৎসক কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হয় তাহা হইলে সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে পারিবে।

পুরাতন যক্ষ্মারোগ দুরারোগ্য এবং উহা অন্যের পক্ষে বিপজ্জনক।

পুরাতন যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসা স্বাস্থ্যনিবাসে হওয়া কর্ত্তব্য।

এইরূপ রোগীর আরোগ্যের সম্ভাবনা থাকিলে একমাত্র স্বাস্থ্যনিবাসেই আরোগ্য হইয়া থাকে।

এইরূপ পুরাতন যক্ষ্মারোগীর স্বাস্থ্যনিবাসে বাস জনসাধারণের পক্ষেও নিরাপদ ব্যাপার।

যে স্থলে যক্ষ্মারোগীর জন্য স্বাস্থ্যনিবাস আছে সেই অঞ্চলে যক্ষ্মারোগে অন্যত্র অপেক্ষা অল্প সংখ্যক লোকের মৃত্যু হয়।

বঙ্গদেশে যত লোক মরে উহাদের দশমাংশ যক্ষ্মারোগে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে।

প্রত্যেক ১০টি শিশুর ১টি যক্ষ্মারোগে মরিয়া থাকে।

বাস এবং বিদ্যালয় গৃহ বিশুদ্ধ বায়ু পূর্ণ হওয়া আবশ্যক।

যক্ষ্মারোগীদের হিতার্থে দেশের প্রত্যেক অঞ্চলে চিকিৎসালয় থাকা কর্ত্তব্য। রোগের ব্যাপ্তি নিবারণ এবং আরোগ্য লাভের জন্য কি কি নিয়ম মানিতে হয় রোগীরা যেন চিকিৎসকদের নিকট হইতে সেই সকল উপদেশ প্রাপ্ত হয়।

যক্ষ্মারোগীকে পতিত অস্পৃশ্য মনে করিও না।

তুমি যক্ষ্মারোগ ব্যাপ্তির বিরোধী হইবে, কিন্তু কদাচ রোগীকে ঘৃণা করিও না।

যক্ষ্মারোগী যদি সতর্ক হয় তাহা হইলে তাহাকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা যাইতে পারে।

অসতর্ক যক্ষ্মারোগী সমাজের ভীষণ আতঙ্কের স্থল।

(সঞ্জীবনী)

কর্কট-রহস্য

'মর্কটেতে কি জানিবে কর্কটের রস।
ভাগ্য যার ভাল, সেই খেয়ে গায় যশ॥

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত'।

বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর মহাকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নিজ কাব্য-মধ্যে স্থান দিয়া যে কাঁকড়াকে 'অমরত্ব' দান করিয়াছিলেন, আজ আমি সেই কাঁকড়ার গুণ কীর্ত্তন করিব। অলাবু-সুহৃদ্ কর্কটের প্রসঙ্গ যাঁহার ভাল লাগিবে না, কাঙ্গালের কর্কট রাশি ভাবিয়া তিনি আমায় ক্ষমা করিলে কৃতার্থ হইব।

কাঁকড়া সকলেই দেখিয়াছেন, সুতরাং কাঁকড়া যে কি পদার্থ, বোধ হয় তাহা আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। কিন্তু কাঁকড়া সম্বন্ধে অনেক কথা পাঠকের জানিবার আছে। কাঁকড়া অনেক রোগে উপকারী, এবং রোগ উৎপাদনের শক্তিও কাঁকড়ার আছে। সেই সকল কথার আলোচনা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

কাঁকড়া পঁচিশ প্রকার। ইহার মধ্যে কতকগুলি স্থলচর, কতকগুলি জলচর, আবার কতকগুলি বা উভচর। প্রাণিজগতে এপর্য্যন্ত একদল জলকর্কট আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহারা জলে বাস করে বটে, কিন্তু হিম সমুদ্রে থাকিতে ভাল বাসে না। উষ্ণ কটিবন্ধনের দিকেই প্রচুর কাঁকড়া দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদ্র ব্যতীত খাল বিল নদীতেও কাঁকড়ারা দলবদ্ধ হইয়া বাস করে; কখন কখন নদীতীরের সিকতাময় শুষ্ক চরে ইহারা বাসস্থান নির্ম্মাণ করে। স্থল-কর্কট শুষ্কভূমিতে থাকে, ইহাদিগকে জলে ছাড়িয়া দিলে তৎক্ষণাৎ শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মরিয়া যায়। এই জাতীয় কর্কট সমস্ত দিন গর্ত্তের ভিতর লুকাইয়া থাকে, সন্ধ্যা হইলেই বিষয়কর্ম্মে অর্থাৎ আহার অন্বেষণে বহির্গত হয়।

কাঁকড়ার শ্বাসযন্ত্র শরীরের মধ্যস্থলে স্থাপিত, দেখিতে ঠিক ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুটলির মত। এই শ্বাসযন্ত্রটিকে সর্ব্বদাই ইহারা সিক্ত করিয়া রাখে, শ্বাসযন্ত্র শুকাইলে কাঁকড়া বেশীক্ষণ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।

কাঁকড়ার ভ্রমণশক্তি অতি অদ্ভুত, খাদ্যসংগ্রহের জন্য ইহারা প্রত্যহ ৩০।৪০ মাইল পর্য্যন্ত অনায়াসে বেড়াইতে পারে। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে ইহারা শ্বাসযন্ত্রটী ভাল

করিয়া ভিজাইয়া লয়, ইহাতে রৌদ্রের প্রখর তাপে পথ চলিবার সময়, ইহাদের কোনও কষ্ট হয় না।

এক শ্রেণীর কাঁকড়া আছে, তাহাদের একটী মাত্র দাড়া, দাড়াটী শরীরের চতুর্গুণ বৃহৎ! ঐ শ্রেণীর কাঁকড়া যখন পথে ভ্রমণ করে, তখন দাড়াটী সোজা করিয়া রাখে। ইহারা যখন গর্ত্তের মধ্যে থাকে, তখন ঐ দাড়াটী গর্ত্তের দ্বারদেশে অর্গলের মত করিয়া রাখে। এইরূপ অবরুদ্ধ গহ্বরে আর কোন জীব সহসা প্রবেশ করিতে পারে না।

আর এক শ্রেণীর কাঁকড়া আছে, তাহারা কেবল নারিকেলের শস্য খাইয়া জীবনধারণ করে। নারিকেলের লোভে ইহারা বড় বড় গাছে উঠে। দাড়া দিয়া নারিকেলের সুকঠিন বহিরাবরণ ভেদ করিয়া ফলমধ্যস্থিত শস্য বেশ তৃপ্তির সহিত ভোজন করে। ইহাদের দাড়া ঠিক সাঁড়াশির মত। এই দাড়া দিয়া ইহারা প্রথমে নারিকেলের ছোব্ড়া ছাড়ায়, তাহার পর যেস্থানে নারিকেলের তিনটি চোখ আছে, সেইস্থানে সজোরে আঘাত করে। এইরূপে ঐ স্থানে ছিদ্র করিয়া শাঁসটুকু নিঃশেষে ভক্ষণ করে। প্রাণিতত্ত্ববিদ্গণ আদর করিয়া ইহাদের নাম রাখিলেন "ভোজনবিলাসী।" ইহারা শুধু ভোজনবিলাসী নয়, শয্যাবিলাসীও বটে! কেননা ইহারা যে গর্ত্তে বাস করে, নারিকেলের ছোব্ড়া দিয়া তাহারই মধ্যে বিশ্রামের জন্য সুখ-শয্যা রচনা করিয়া থাকে। নারিকেলভোজী কাঁকড়া খাইতে বড় সুস্বাদু। এই জাতীয় কাঁকড়ার গাত্র হইতে প্রায় এক কোয়ার্ট তৈল বাহির হইয়া থাকে। একজন জাহাজের অধ্যক্ষ এই কাঁকড়া স্বদেশে আনিবার জন্য একটী ডবল টিনের পেটিকায় আবদ্ধ করিয়াছিলেন, অধিকন্তু উক্ত পেটিকাটী লৌহনির্ম্মিত তার দিয়া জড়াইয়া বাঁধিয়াছিলেন। কিন্তু রাত্রির মধ্যেই কাঁকড়াগুলি টিনের বাক্সের গাত্রে ছিদ্র করিয়া কারামুক্ত হইয়াছিল। পাঠকমহাশয়! ইহাতেই বুঝুন—ইহাদের দাড়া কতদূর শক্তিশালী!

কাঁকড়া অত্যন্ত কলহপ্রিয়। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বদাই যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিয়া থাকে। যুদ্ধে যিনি জয়ী হন, তিনি পরাজিত শত্রুদের খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষণ করিয়া ফেলেন। ইহারই নাম—"শত্রুর শেষ রাখিতে নাই।" ইহারা চাণক্যের কৌটিল্য-নীতির পরম-ভক্ত।

আর এক শ্রেণীর কাঁকড়া আছে,—ইহাদের সম্মুখভাগ কঠিন আবরণে আবৃত, কিন্তু পশ্চাৎদিক একেবারেই অনাবৃত। ইহাদের একটি লাঙ্গুল আছে। ইহারা অকর্ম্মণ্য জীব—না পারে জলে নামিতে, না পারে মাটীতে দৌড়াইতে; কিন্তু ইহারা অত্যন্ত বুদ্ধিমান্। সমুদ্রতীরে অনেক শম্বুকের খোলা পড়িয়া থাকে, সেই খোলার সাহায্যে পশ্চাৎদিক্ আবৃত করিয়া ইহারা আত্মরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা নিবারণও করিয়া থাকে। মৃত শম্বুক না পাইলে, অনেক সময় ইহারা জীবিত শম্বুককে আক্রমণ করিয়া মারিয়া ফেলে। ইহাতে 'অন্ন বস্ত্র' উভয়ই সংগৃহীত হয়। জীব-জগতে এই জাতীয় কাঁকড়ার নাম তপস্বী কাঁকড়া"; "তপস্বীই" বটে, কিন্তু "ভণ্ড-তপস্বী"! কারণ শম্বুককুলসংহার—ইহাদের জীবনের মহাব্রত!

উড়িষ্যা অঞ্চলের সমুদ্রকূলে পাঁচ ছয় রকম কাঁকড়া দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে একজাতীয় কাঁকড়ার বর্ণ উজ্জ্বল লোহিত যেন—টকটকে জবাফুল। মানব-হস্তের কঠিন স্পর্শে ইহারা মরিয়া যায়, তখন আর দেহের বর্ণ রাঙ্গা থাকে না, কালীর মত কালো হইয়া যায়। তদ্দেশীয় ধীবরগণ—সর্দ্দী কাশি হইলে, এই কাঁকড়া ছেঁচিয়া রস খায়। তাহাদের বিশ্বাস—কাশির এমন চমৎকার ঔষধ জগতে নাই। চাঁদীপুরে কাঁকড়ার রস খাওয়াইয়া এক ধীবরপুত্রকে আমি কঠিন কাশ-রোগ হইতে মুক্ত করিয়াছি। দুর্গন্ধ 'কড্লিভার' খাইতে যাঁহাদের আপত্তি নাই, তাঁহারা একবার লাল কাঁকরার রস খাইয়া দেখুন, আমার বিশ্বাস—যথেষ্ট উপকার পাইবেন। বালেশ্বর হইতে ৩ ক্রোশ দূরে চাঁদীপুরের সমুদ্রতীরে আমি এই শ্রেণী কাঁকড়া অসংখ্য দেখিয়াছি। সামান্য প্রয়াসেই ইহারা মানুষের হাতে ধরা পড়ে।

মালাবার উপকূলে একরকম কাঁকড়া আছে, ইহাদের আকার তেঁতুলে বিছার মত। ইহারা মানুষ কি জীবজন্তু দেখিতে পাইলে ছুটিয়া গিয়া কামড়ায়। এই জাতীয় স্ত্রী কাঁকড়াগুলি সম্ভোগান্তে স্বামীহত্যা করিয়া থাকে। তাহার পর নিজের সঙ্গিনীগণকে ডাকিয়া পরম তৃপ্তিপূর্ব্বক মৃতস্বামীর দেহ ভক্ষণ করে। ইহারা কেবল বংশ-রক্ষার জন্যই স্বামীর জীবিত থাকা প্রয়োজন মনে করে। বলা-বাহুল্য, এইজাতীয় কাঁকড়ার পুরুষগণ স্ত্রীজাতির

অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল হইয়া থাকে। কিন্তু প্রণয়িনীর মন ভুলাইবার জন্য বিধাতা ইহাদিগকে স্ত্রীজাতির চেয়ে রূপবান্ করিয়াছেন। ইহাদের ভাগ্যে প্রাণের বিনিময়ে প্রেমলাভ হইয়া থাকে।

জীবপ্রবাহরক্ষার জন্য স্ত্রীপুরুষের মিলন—ঈশ্বরের অভিপ্রেত। কিন্তু কর্কট-জাতির যৌন সম্মিলন, জনন-প্রক্রিয়াতেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। কর্কট পিতা বা কর্কটী মাতা কেহই অপত্যপালনের ভার গ্রহণ করে না। জননপ্রক্রিয়ায় পিতার এবং প্রসবপ্রক্রিয়ায় মাতার করণীয়ের অবসান হয়। কর্কট শিশু দৈবাধীন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, দৈবাধীন রক্ষা পায়। কর্কটদম্পতির প্রেমের স্থায়িত্ব, ইহাদের জাতীয় প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। অনেক কাঁকড়াই কিছুতেই প্রণয়িনীর মন পায় না। প্রণয় নিবেদন করিতে গেলে ইহাদের মধ্যে প্রায়ই হাতাহাতি হয়। অনেকে আবার প্রেয়সীর অনুরাগ বিরাগ বুঝিতে না পারিয়া, সাধ্য-সাধনা করিতে গিয়া প্রাণ হারায়। প্রেম-চুম্বনের ছলে প্রেয়সী, প্রেমিকের মাংস ভক্ষণ করে।

যে জাতীয় কাঁকড়া বাজারে বিক্রীত হয়, তাহার নাম "বায়লেট"। কাঁকড়ার মধ্যে ইহারাই কুলীন। ইহাদের এক এক জনের ভাগ্যে বহু স্ত্রীলাভ ঘটিয়া থাকে। ইহাদের পুরুষেরা বলবান্, তাহারা স্ত্রীকে ভালও বাসে, স্ত্রীও স্বামীর আনুগত্য স্বীকার করে। ইহাদের মধ্যে ভালবাসায় 'জেলাসি' বুঝিতে' পারা যায়; একে অন্যের স্ত্রীর সহিত প্রেমসম্ভাষণ করিতে সাহস করে না।

বায়লটের বংশ অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। গর্ভবতী কর্কটী প্রসব করিবার জন্য সমুদ্রাভিমুখে বা নদীতীরে গমন করে, প্রসবান্তে আর ফিরিয়া আসে না। অধিকাংশ কাঁকড়াই প্রসবের পর মরিয়া যায়। কর্কটশিশু "মাতৃহত্যা-কারক" বলিয়া অনেক হিন্দু কাঁকড়া খায় না।

এক একটী কর্কটী অসংখ্য ডিম্ব প্রসব করে; ডিম্বগুলি দেখিতে কিম্ভূতকিমাকার, মাথাটি শিরস্ত্রাণের ন্যায়,—সেই মাথায়—একখানি কুঠার;—তাহাদের নিম্নে একজোড়া উজ্জ্বল চক্ষু। এই অল্পবয়সেই ইহারা জলে সাঁতার দিতে থাকে। অল্পদিন পরেই এই সকল ডিম্ব অতি ক্ষুদ্র কাঁকড়ার আকার ধারণ করে। তখন আর জলে থাকেনা, সমুদ্রের তীরে উঠিয়া বেড়াইয়া বেড়ায়। একটু বড় হইলে, পিতৃমাতৃ উদ্দেশে যাত্রা করে। এই সময়ই ইহাদের বিপদ, —পক্ষীর দল ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া কর্কটশিশুগুলিকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। যাহারা পক্ষিকুলের লুব্ধ দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে, তাহারাই ফিরিয়া গিয়া বাপমাকে দেখিতে পায়।

এস্থলে অনেকেই প্রশ্ন করিতে পারেন, যে কর্কট-শিশুরা ত জন্মিয়া পিতামাতাকে দেখিতে পায় না, মা বলিয়া সোহাগ-যত্নেও লালিত হয় না, তবে তাহারা কেমন করিয়া জন্মদাতা ও গর্ভধারিণীকে চিনিতে পারে, তাহাদের বাসস্থানেরই বা কি করিয়া সন্ধান পায়? প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহার উত্তরে বলেন, স্বাভাবিক সংস্কারই কর্কটশিশুর পথপ্রদর্শক, স্বাভাবিক সংস্কারবলেই তাহারা পিতামাতাকে চিনিতে পারে।

কাঁকড়ারা দলবদ্ধ হইয়া যখন সমুদ্রযাত্রায় বহির্গত হয়, তখন একরকম শব্দ করিতে থাকে। সে শব্দ দুই মাইল দূর হইতেও শুনা যায়! এই কর্কট-অভিযান দেখিলে মনে হয় যেন এক বিরাট বীরবাহিনী রণযাত্রায় বহির্গত হইয়াছে। অভিযান প্রায় রাত্রিকালেই হইয়া থাকে। বলবান্ কর্কটগণ পথপ্রদর্শকের কার্য্য করে। ইহাদের পশ্চাতেই মন্থরগামিনী গর্ভবতীর দল। বৃদ্ধ, শিশু ও দুর্ব্বল কর্কটগণ সকলের শেষে স্থান পায়। পথ চলিবার সময়—কর্কটবাহিনী কোন বাধাই গ্রাহ্য করে না। সম্মুখে কোন মানুষ বা শিশু দেখিলে দংষ্ট্রা বিস্তার করিয়া-ভয় দেখায়, কখন কখন সকলে মিলিয়া শত্রুকে আক্রমণও করিয়া থাকে। কর্কট-বাহিনী ঠিক লম্বাভাবে অগ্রসর হয়, বামে বা দক্ষিণে হেলে না। সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া ইহারা প্রথমেই একবার অবগাহন স্নান করিয়া লয়। তাহার পর গর্ভিণীগণ অণ্ড প্রসব করে, পুংজাতীয় কর্কটগণ—স্থানান্তরে গিয়া খোলস ছাড়ে। প্রায় পক্ষকাল পরে, নূতন খোলস জন্মিলে তবে আবার গৃহাভিমুখে যাত্রা করে। এই সময়েই ইহারা মনুষ্যকর্ত্তৃক ধৃত হয়।

এইবার কাঁকড়ার রোগনাশিনী শক্তির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া এই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

যাঁহাদের হৃদপিণ্ড দুর্ব্বল, কাঁকড়া তাঁহাদের পক্ষে বড়ই

উপকারী। যক্ষ্মা রোগে কর্কট একটী সুপথ্য। কিন্তু উদরাময়, শোথ, মেহ, উপদংশ, অজীর্ণ (ডিস্‌পেপসিয়া) উদরী, গুল্ম, যকৃৎ, প্লীহা, অর্শ, কুষ্ঠ, চক্ষুরোগ, প্রদর, বহুমূত্র, মূর্চ্ছা এবং বাতরোগে কাঁকড়া ভক্ষণ একেবারেই নিষিদ্ধ।

শিশুর (১০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত) এবং গর্ভিণীর পক্ষে কাঁকড়া অত্যন্ত অহিতকারী।

মস্তিষ্ক-রোগে, বধিরতায় এবং শুক্রতারল্যে কাঁকড়া ঔষধির কার্য্য করিয়া থাকে।

যে সকল পুরুষের সন্তান হয় না এবং যে সকল রমণী পুনঃ পুনঃ কন্যা প্রসব করেন, কর্কট-ভোজনে তাঁহাদের উপকার হইতে পারে।

কর্কটের অস্থির সূক্ষ্ম চূর্ণ মাখন সহ চাটিয়া খাইলে, রক্তপিত্তজনিত রক্ত-বমন তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়।

কাঁকড়ার দাড়া দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধে ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া চরণতলে প্রলেপ দিলে, ছেলেদের শয্যামূত্র-রোগ ও দাঁত কড়মড়ানি ভাল হয়। নিজ দেহেই ইহা আমি পরীক্ষার সুযোগ পাইয়াছিলাম।

যে দিন কাঁকড়া ভক্ষণ করিবেন, সে দিন মূলা, দুগ্ধ, ডিম্ব এবং কোনও প্রকার দাল খাইবেন না। শাস্ত্রমতে এগুলি কাঁকড়ার পক্ষে সংযোগবিরুদ্ধ।

অলাবুযুক্ত কর্কট যে কেবল মুখপ্রিয় তাহা নহে, উপকারীও বটে। কাঁকড়া পেট গরম করে—অলাবু কাঁকড়ার এই গুরুতর দোষ নষ্ট করিয়া থাকে।

কাঁকড়া ভোজনের পর তরল দধি পান করিবেন।

দুগ্ধদোহনের সময় যে গাভী অস্থিরতা প্রকাশ করে, তাহার গলদেশে কাঁকড়ার কাণকুয়া বাঁধিয়া দিলে গাভী শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিবে।

আয়ুর্ব্বেদে—
শ্রীসতীশচন্দ্র দে, এম্, এ।

স্মৃতি-সৌরভ

অবসান আছে বলে ব্যর্থ কিগো স্বরগ কল্পনা?
ঝরে যদি মন্দারের ফুল তবু সত্য নন্দন-রচনা।
জীবনের শেষ সন্ধ্যাবেলা মরালের কণ্ঠে গীত ফুটে,
সত্য সেই শেষের সঙ্গীত বিশ্বরন্ধ্রে উছলিয়া উঠে।
ভেঙ্গে যায় স্বপন বাসর, গান তার জেগে থাকে কাণে;
সন্ধ্যা ডুবে নিশার আঁধারে, স্বপ্ন-ছবি আঁকা থাকে প্রাণে।
দুজনার দুদণ্ডের দেখা, নিমিষের চোখে চোখে চাওয়া,
সে যে সত্য, তাহে চিরদিন আপনার আপনায় পাওয়া
বৃন্দাবন কবে নিভে গেছে, ব্রজলীলা কবে অবসান!
তবু জাগে এখনও হিয়ায় সেই আলো সেই বাঁশী-গান।

শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায় এম, এ

ঈষ্টলীন

দ্বিতীয় খণ্ড

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আরও ৮।১০ দিন চলিয়া গেল। লেডী ইজাবেল বৈকালে একদিন স্থানীয় সমাধিক্ষেত্রে বেড়াইতে গেলেন। নিরব নির্জ্জন সেই সমাধিক্ষেত্রের মধ্যে একখানি বেঞ্চির উপরে তিনি বসিয়া আছেন—পাশে তাঁহার নিত্য নিত্যসঙ্গী কাপ্তেন লেভিসন। কিছুতেই তাঁহাকে তিনি এড়াইয়া চলিতে পারিতেছেন না। আরও বেশী সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিয়াছেন, একাই তিনি এখন দূরে বেশ হাঁটিয়া যাইতে পারেন। আজ এখানেও একা আসিয়াছিলেন, কিন্তু লেভিসন আসিয়া সঙ্গে

জুটিয়াছেন। এড়াইবার জন্য ইজাবেল অনেক সময় অনেক কৌশলও অবলম্বন করিতেন। অসময়ে বাহির হইয়া পড়িতেন,—লোকজন বেশী যায় না, এখন সব স্থানেও তিনি চলিয়া যাইতেন। কিন্তু যখন যেথানেই যান, দেখিতেন লেভিসন আসিয়া জুটিয়াছে। এক একবার তাঁহার মনে হইত, লেভিসন তাকে তাকে থাকে। বাহির হইলেই সঙ্গে আসিয়া জোটে। এ অবস্থায় একমাত্র উপায় ছিল ইজাবেল স্পষ্ট তাহাকে বলেন, আমার সঙ্গে আসিও না। কিন্তু লেভিসন তাহার কারণ একটা জিজ্ঞাসা করিতে পারে। ইজাবেল কি বলিবেন? লেভিসনের প্রতি তাঁহার চিত্তের গূঢ় ভাব যেরূপ, তাহাতে এরূপ কোনও আলোচনার মধ্যেই তিনি যাইতে পারেন না। তবে যাহাই হউক, আর অল্পদিন মাত্র তিনি এখানে আছেন। শীঘ্রই চলিয়া যাইবেন, হয় ত আর জীবনে ইহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে না। সুতরাং অত বেশী ভাবিবার কারণ কিছুই নাই। আবার ইহাও তিনি অনুভব করিতেছিলেন, লেভিসনের সঙ্গে এত মেলামেসার ফল ভাল হইতেছে না। যতই অন্যরূপ ভাবুন বা তাহাকে এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করুন, লেভিসনকে দেখিলে তাহার মুখখানি কেমন লাল হইয়া যাইত, বুক ভরিয়া একটা চঞ্চল পুলকোচ্ছাস নৃত্য করিয়া উঠিত। এটা দমন করিতে তিনি চেষ্টা করিতেন, কিন্তু হায়, সাগরগামী জাহাজের পাল অনুকূল বায়ুপ্রবাহে যখন ঠেলিয়া উঠে, তাকে কি চাপিয়া ফিরাইয়া আনিতে কেহ পারে? তাহাও যদি সম্ভব হয়, চিত্তের এই বেগ রোধ করিয়া রাখা একেবারেই অসম্ভব।

গ্রীষ্মের প্রশান্ত সন্ধ্যায় স্নিগ্ধ শীতল বায়ুমণ্ডল নীরব, মধ্যে মধ্যে কেবল দুই একটি ঝিল্লীরা এ দিকে ও দিকে উঠিতেছে;—লেডী ইজাবেল কাপ্তেন লেভিসনের সঙ্গে সেই সমাধিক্ষেত্রে বসিয়া আছেন—বিদ্রোহী চিত্ত একটা আনন্দের নেশায় বিভোর হইয়া আসিতেছে। তিনি অন্যের স্ত্রী, জীবন তার অন্য পথে চলিয়া গিয়াছে, ফিরিয়া কোনও নূতন পথে আর তিনি আসিতে পারেন না—এ সব চিন্তাও আছে,—বিবেক এইরূপ অনুভূতিই তাহার চিত্তে জাগাইতেছিল, ন্যায় অন্যায়ের বুদ্ধিতেও এটা বুঝিতেছিলেন। নতুবা এইখানে এই অবস্থায়—অনন্তকালও বুঝি তিনি এইভাবে বিভোর হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিতেন,—একটিবার উঠিতে কি অন্য কোথাও সরিয়া যাইতে চাহিতেন না।'

লেভিসন কি ইজাবেলের মনের কথা কিছু বুঝিতে পারিয়াছিলেন? হাঁ, বোধ হয় পারিয়াছেন। তাই—প্রথমজীবনে—ইজাবেলের বিবাহের পূর্ব্বে যখন ইহাদের দেখা সাক্ষাৎ হইত, তখন ইজাবেলকে তিনি কি চক্ষে দেখিতেন, কথায় কথায় ক্রমে ক্রমে তার স্পষ্ট আভাস দিয়া কহিলেন, "সে সময় চলিয়া গিয়াছে, আর ফিরিবে না। কিন্তু দুইজনেই আমরা বড় ভুল করিয়া ফেলিয়াছি। দুইটি প্রাণী দুইজনে দুইজনকে ভাল বাসিবে, প্রাণে প্রাণে এমনই একটা মিল লইয়া দুটি প্রাণী আমরা এ পৃথিবীতে আসিয়াছিলাম। এক এক সময় আমার মনে হইয়াছে, আপনি আমার মনের কথা—"

লেভিসনের এতদূর দুঃসাহস হইবে, ইজাবেল তাহা মনেও করিতে কখনও পারেন নাই। বিস্ময়ে কিয়ৎকাল হতবুদ্ধি ও স্তব্ধ থাকিয়া তীব্রদৃষ্টিতে ইজাবেল চাহিলেন। কি বলিতে যাইতেছিলেন,—কিন্তু লেভিসন বাধা দিয়া কহিলেন, "মাফ করিবেন লেডী ইজাবেল, যা বলিতেছিলাম, না বলিয়া আর পারি না। কয়েকটি মাত্র কথা আজ আমি বলিব, তার পর জীবনের মত নীরব হইব। কত যে আপনাকে ভালবাসি, তখনই আমি বলিতাম, কিন্তু ভরসা পাইলাম না। ভবিষ্যৎ আমার অনিশ্চিত, দেনায় আমি ডোবা,— বিবাহ করিয়া স্ত্রীকে প্রতিপালন করিতে পারিব না, এই সব চিন্তাতেই মন আমার ভারাক্রান্ত ছিল। লর্ড মণ্টসেভার্ণের কন্যাকে বিবাহ করিবার মত একটা স্থিতি সার পিটার আমাকে হয় ত করিয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁর কাছে কোনও আবেদন না করিয়া, নিজের আশা আকাঙ্ক্ষা সব মনের মধ্যেই চাপিয়া পিষিয়া ফেলিলাম; আপনাকে ছাড়িয়া দিলাম—"

ক্রোধের আবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ইজাবেল কহিলেন, "কাপ্তেন লেভিসন! এ সব কথা আমি কাণেও শুনিতে পারি না।"

কোমল স্পর্শে ইজাবেলের বাহু ধরিয়া লেভিসন কহিলেন,—"আর এক মুহূর্ত্ত মাত্র! এইটুকু দয়া আমাকে করুন। গত কয় বৎসর যাবৎই এই কথা আমি ভাবিতেছি, আপনাকে একটিবার জানাইব কেন আমি আপনাকে

হারাইলাম! হায়, তার বেদনা যে এখনও আমি ভুলিতে পারি-তেছি না। নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার প্রায়শ্চিত্ত সেই অবধি করি-তেছি। আপনাকে কত যে ভালবাসিতাম, আগে তা বুঝি-তেও তেমন পারি নাই,—বুঝিলাম যখন অন্যের পত্নী আপনি হইলেন। ইজাবেল, এখনও যে তোমাকে তেমনই প্রাণভরা আবেগে আমি ভালবাসি!"

"কি সাহসে আপনি আজ এ সব কথা আমাকে বলিতেছেন?"

দৃপ্ত একটা গভীর বিরাগের ভাবেই ইজাবেল এই কথা কয়টি বলিলেন, যেমন নাকি এ অবস্থায় বলাই তাঁহার উচিত। কিন্তু তবু একেবারে অন্তরের অন্তরে এরূপ একটা অনুভূতিও তাঁহার হইতেছিল, অবস্থা অন্যরূপ হইলে, আজ একথা শুনিয়া, আহা, কি তীব্র একটা আনন্দই না তাঁহার হইত!

লেভিসন কহিলেন, "যাহা বলিয়াছি কিছুই ক্ষতি আর তাহাতে কাহারও হইতে পারে না। সে দিন চলিয়া গিয়াছে। তুমি আর একজনের স্ত্রী, একথা তুমি কি আমি কেহই আজ ভুলিতে পারি না। আমাদের মধ্যে যে ব্যবধান আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা অলঙ্ঘনীয়। কিন্তু দোষ সব আমার।—আমার উচিত ছিল, আমার ভালবাসার কথা তখন তোমাকে খুলিয়া বলা,—যদি তা বলিতাম, অগত্যা যে শেষে কার্লাইলের আশ্রয় তোমাকে নিতে হইল—সেটা আর হইত না।"

শেষের এই কথায় ইজাবেলের প্রাণে গিয়া সত্যই তীব্র একটা আঘাত লাগিল,—দারুণ রোষে উত্তেজিত হইয়া তিনি কহিলেন, "অগত্যা কার্লাইলের আশ্রয় নিয়াছি! এ সব কি আপনি বলিতেছেন? কার্লাইল সাহেব আমার স্বামী—আমার অতি শ্রদ্ধেয় প্রিয়তম স্বামী! তার প্রতি আমার চিত্তের অনুরাগ দিনে দিনে কত বাড়িতেছে! তাঁহার মহৎপ্রাণ, মহিমাময় মূর্ত্তি—দেখিয়াছেন ত সব? তাঁর কাছে আপনি কি? ফ্রান্সিস লেভিসন! একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন আপনি!"

লেভিসন নিজের ঠোঁটে একটা কামড় দিলেন;—কহিলেন,—"না, তা হই নাই!"

ইজাবেল আবার কহিলেন, "কোনও অধিকার আপনার নাই, এই সব কথা আমাকে বলিতে পারেন। আপনি ছাড়া আর কোনও ভদ্রলোক আজ অরক্ষিত অবস্থায় এরূপ অপমান আমাকে করিতে পারিত না। কার্লাইল সাহেব এখানে থাকিলে এই দুঃসাহস আপনার আজ হইত না! আসি এখন মহাশয়, নমস্কার!"

দ্রুত পাদক্ষেপে ইজাবেল গৃহাভিমুখে চলিলেন। লেভিসনও পশ্চাতে ছুটিয়া আসিলেন, ইজাবেলের হাত ধরিয়া টানিয়া নিজের বাহুর মধ্যে নিয়া কহিলেন, "আমাকে ক্ষমা করুন লেডী ইজাবেল,—যাহা হইয়া গিয়াছে ভুলিয়া যান। আপনার স্বামী এখানে নাই,—স্নেহশীল বন্ধুর ন্যায়—আপনার মঙ্গলের জন্য উৎকণ্ঠিত ভ্রাতার ন্যায়—আপনার সহায়তা আমি করিতেছিলাম। যা হইয়াছে ভুলিয়া যান,—সেই ভাবেই আমাকে দেখুন, সেই সহায়তাই গ্রহণ করুন।"

টানিয়া হাত ছাড়াইয়া নিয়া ইজাবেল উত্তর করিলেন, "তাই আমি এতদিন করিয়াছি,—কারণ আপনার সঙ্গে যাহ'ক—কুটুম্বিতার সম্বন্ধও আমাদের একটা ছিল। নতুবা অবিরত এইরূপ আমার সঙ্গে ফিরিতে কখনও আপনাকে আমি দিতাম না। এই আত্মীয়তার প্রতিদান আপনি এই শেষে করিলেন? আপনি আমার তত্ত্বাবধান করিতেছেন, তাই আমার স্বামী আপনাকে ধন্যবাদ দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যদি জানিতেন কি দুষ্ট অভিসন্ধি আপনার কপট মনে রহিয়াছে, কি তিনি করিতেন জানেন?"

"ক্ষমা করুন লেডী ইজাবেল! আমার অপরাধ আমি স্বীকার করিয়া মাফ চাহিতেছি। আর কি করিতে পারি জানি না। তবে আর এরূপ অপরাধ আমি করিব না। কি জানেন, মানুষের জীবনে এমন এক এক মুহূর্ত্ত আসে, যখন সামাজিক সকল নীতির বন্ধন ছিন্ন করিয়া, সকল ধীর বিবেচনা অতিক্রম করিয়া আমাদের প্রাণের রুদ্ধ আবেগ বাহির হইয়া পড়ে। এই যে, পথটার উতরাইটা বড় খাড়া; আপনি ক্লান্ত, একা পারিবেন না,—হাত ধরিয়া আপনাকে নামাইয়া দিই।"

"একথা আগে আপনার ভাবা উচিত ছিল। না; আপনার কোনও সহায়তা আমি চাই না।"

লেভিসন প্রসারিত হস্ত আবার গুটাইয়া নিলেন।

কোনও মতে নিজেই ইজাবেল নামিয়া আসিলেন,—ক্রমে বাসার দরজায় আসিয়া তাঁহারা পৌঁছিলেন। সংক্ষেপে "Good evening" মাত্র বলিয়া লেভিসনকে বিদায় করিয়া দিয়া ইজাবেল গৃহে প্রবেশ করিলেন। ত্রস্ত উপরে ছুটিয়া গিয়াই পত্র লিখিতে বসিলেন।

লেভিসনের এই প্রেমনিবেদনে অপমান বোধও হইয়াছিল বটে, কিন্তু অন্তরে একটা আনন্দোচ্ছ্বাস নাচিয়া নাচিয়া উঠিতেছিল। ইজাবেল বেশ বুঝিলেন, লেভিসনের সংসর্গ অবিলম্বে তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হইবে। তার এই সব গর্হিত কথার ছল—সর্ব্বনাশ! আর তিনি শুনিতে পারেন না। এই স্থানই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, সমুদ্রের ব্যবধান উভয়ের মধ্যে আনিয়া ফেলিতে হইবে। ডাকের সময় চলিয়া যায়, অতি তাড়াতাড়ি কয়েকটা ছত্র মাত্র লিখিয়া স্বামীকে তিনি জানাইলেন—'অবিলম্বে চলিয়া আইস, আমি আর এখানে থাকিতে পারি না।' বাকী বাড়ী ভাড়া টাড়া সব চুকাইয়া দিয়া, যাইবার খরচ হয়, এত টাকা তাঁহার হাতে ছিল না। নতুবা কার্লাইলের অপেক্ষা না করিয়া একাই তিনি চলিয়া যাইতেন।

উত্তরে কার্লাইল লিখিলেন, আগামী শনিবারে তিনি আসিবেন। ইজাবেলকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন কি না, সে কথা সাক্ষাৎ আলাপে স্থির হইবে। কিন্তু এখনও শনিবারের কয়েকদিন বাকী আছে! লেভিসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হয়, ইজাবেল তাই গাড়ী করিয়া বাহির হইতেন। লেভিসন একদিন বাড়ীতে আসিলেন,—ইজাবেল উপরে তখন নিজের ঘরে ছিলেন। স্বামিনীর আদেশ নিয়া পিটার আসিয়া তাঁহাকে জানাইল, "লেডী সাহেবা আপনাকে সম্ভাষণ জানাইতেছেন। কিন্তু তিনি কাহারও সঙ্গে এখন সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন না।"

কার্লাইল যথাসময়ে আসিয়া পৌঁছিলেন। অন্ততঃ ছয় সপ্তাহ পূর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত যাহাতে ইজাবেল থাকেন, এজন্ত অনেক পীড়াপীড়ি করিলেন। কিন্তু কিছুতেই ইজাবেলকে রাজি করাইতে পারিলেন না। শেষে যখন বলিলেন, "না, তোমাকে আমি নিয়া যাইব না।" ইজাবেল যারপরনাই অধীর হইয়া প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। কার্লাইল কিছু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "ইজাবেল, বিশেষ কোনও কারণ আছে, যাতে তুমি যাইতে চাও। কি তা আমাকে বলিতে পার? খুব উপকার তোমার এখানে হইতেছে। ভাল লাগেনা এই যা বলিতেছ, সব বাজে কথা। আসল কথা কি বল ত!"

ইজাবেলের একবার মনে হইল, সব খুলিয়াই তিনি স্বামীকে বলিয়া ফেলেন। লেভিসনকে মনে মনে তিনি ভালবাসেন, অথবা লেভিসন তাঁহাকে ঐ সব কথা বলিয়াছে, এতটা খুলিয়া অবশ্য তিনি বলিতে পারেন না। কারণ ইহার ফলে বড় একটা অত্যাহিত কাণ্ডও ঘটিতে পারে। স্বামীর কোনও অনিষ্ট বা অশান্তি কিছু ঘটে, এটা তিনি একেবারেই চান না। তবে এটুকু তিনি বেশ বলিতে পারেন যে, বিবাহের পূর্ব্বে লেভিসনের প্রতি একটা মোহ তাঁহার মনে জন্মিয়াছিল,—এখন তার সান্নিধ্যে এখানে তিনি থাকিতে ইচ্ছা করেন না! আহা, এই কথাটুকুও যদি তিনি আজ স্বামীকে বলিয়া ফেলিতে পারিতেন! স্নেহময় মহাপ্রাণ ধীরবুদ্ধি স্বামী তাঁহার আগ্রহে তাঁহাকে রক্ষা করিতেন, কোনও ভয় ইজাবেলের আর থাকিত না। কিন্তু বলা হইল না। ইজাবেল বলি বলি করিতেছেন—তখনই হয়ত বলিয়া ফেলিতেন,—হঠাৎ কার্লাইলের কি মনে পড়িল, পকেটে হাত দিয়া একখানা চিঠি বাহির করিয়া ইজাবেলের হাতে দিলেন। ননন্দা কর্ণীবিবি এই চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন, মাশুল বাঁচাইবার জন্ত ডাকে না দিয়া ভ্রাতার হাতেই দিয়াছিলেন। মনটা অন্যদিকে গেল, যাহা বলিতে যাইতেছিলেন না বলিয়া চিঠিখানি ইজাবেল খুলিয়া পড়িলেন।

চিঠির ভাষা ও ভঙ্গী লেখিকা শ্রীমতী ননন্দারই মত কঠোর ও নীরস। ছেলেপিলেরা সব ভাল আছে, সংসারিক কাজকর্ম্ম সব নির্ব্বিঘ্নে চলিতেছে, লেডী ইজাবেল বোধ হয় ভালই আছেন। একটা ডাক কাগজের তিন পৃষ্ঠা ভরা যাহা লেখা ছিল, তার মোট চুম্বক এই। উপসংহারে আর একটি কথা এই ছিল,—"আরও অনেক কথা লিখিতাম তবে বার্বারা এই আসিল—দিনটা সে আজ আমাদের এখানেই থাকিবে।"

'বার্বারা' আসিল! দিনটা সে ইষ্টলীনে কাটাইল! আরও ত কত এমন আসে, ইষ্টলীনে দিন ভরিয়া থাকে! মুহূর্ত্তে ইজাবেলের মন কঠোর হইয়া উঠিল,—যা বলি বলি করিতেছিলেন, আর তা বলা হইল না। দৃঢ়ভাবে কহিলেন,

"না, আমি আর থাকিব না—খোকাখুকীদের ছাড়িয়া আমি আর এখানে টিকিতে পারি না। তোমার সঙ্গেই যাইব।"

বলিতে বলিতে ইজাবেল একেবারে চক্ষুর জল ছাড়িয়া দিলেন। হায়, এমনই সব সামান্য ঘটনা হইতে একদিকের উন্মুখচিত্ত অন্যদিকে ঘুরিয়া যায়! কোন্ অচিন্ত্যচক্রী বিধাতার অলক্ষ্য নির্দ্দেশেই যে এরূপ ঘটে, এক একটা জীবনের ভাগ্যই তাহাতে একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়!

অগত্যা কার্লাইল শেষে কহিলেন, "তাইত, এতই যদি অধীর হইয়া থাক তুমি, ভাল, তোমাকে লইয়াই তবে যাইব।"

ইস্কুলছাড়া ছোট মেয়েটির মত আনন্দে ইজাবেল যেন একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। হাসিয়া নাচিয়া তিনি স্বামীর চারিদিকে বার বার পাক দিয়া চুম্বনের পর চুম্বনে তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিলেন,—আকুল গদগদ ভাষায় তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। কার্লাইলও আনন্দে একেবারে আত্মহারা হইয়া গেলেন। আহা, ইজাবেল কতই তাঁহাকে ভালবাসে! তাই না আর তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেছে না।

কহিলেন, "ইজাবেল তোমার মনে আছে, সেই বিবাহের সময় তুমি বলিয়াছিলে, আমাকে ভালবাসিতে পার নাই, কিন্তু ক্রমে শেষে ভালবাসা তোমার হইবে। এই কি তাই, ইজাবেল?"

সমস্ত মুখখানি ইজাবেলের একেবারে লাল হইয়া উঠিল, চক্ষে জল আসিল। ধিক্! এত গভীর বিশ্বাস স্বামীর—আর অভাগী তার প্রাণটা কোথায় কার হীন টানে বাঁধা পড়িয়াছে। কার্লাইল ভাবিলেন, এই উচ্ছ্বাস ইজাবেলের বুক ভরা প্রেমের উচ্ছ্বাস। আবেগে তিনি তাঁহাকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন।

পর দিন ইজাবেলকে লইয়া কার্লাইল দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইজাবেলের অসাক্ষাতে লেভিসন একবার আসিয়া কার্লাইলের সঙ্গে দেখা করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠপিতামহ সার পিটারের সঙ্গে কার্লাইল কোনও আলাপ করিতে পারিয়াছেন কিনা তাই জানিবার জন্য। কার্লাইল বলিয়াছিলেন, তাঁহার অবসর হয় নাই, এবার ফিরিয়া গিয়া যত শীঘ্র সম্ভব আলাপ করিবেন। আজ জাহাজে উঠিতেছেন, ঠিক তখন আবার লেভিসন আসিয়া তাঁহাদের বিদায় সম্ভাষণ করিলেন, প্রতি-সম্ভাষণ জানাইয়া কার্লাইল ইজাবেলকে লইয়া জাহাজে গিয়া উঠিলেন।

জাহাজ ছাড়িয়া দিল—ক্রমে লেভিসন অদৃশ্য হইয়া গেলেন। ইজাবেল স্বামীর নিকটে ডেকের উপরে একখানি আসনে বসিয়াছিলেন। বিপন্মুক্তির প্রবল আনন্দের উচ্ছ্বাসে সমস্ত দেহ তাঁহার কাঁপিয়া উঠিল। কার্লাইল কহিলেন, "তোমার কি ঠাণ্ডা লাগিতেছে ইজাবেল?"

"না না, বেশ আরামে আছি, খুব ভাল লাগিতেছে আমার!"

"তবে কাঁপিতেছিলে কেন?"

"যদি তুমি একা আমাকে ফেলিয়া আসিতে, কি করিতাম। তাই ভাবিয়া শরীরটা কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। আর্কিবাল্ড! কখনও আমাকে আর দূরে কোথাও পাঠাইও না। সর্ব্বদা তোমার কাছে কাছে রাখিও। বল, তাই রাখিবে?"

আকুল দৃষ্টিতে বড় মধুর হাসিয়া কার্লাইল ইজাবেলের দিকে চাহিলেন, কহিলেন, "হাঁ, তাই রাখিব ইজাবেল, কাছে কাছেই তোমাকে রাখিব। তুমি কখনও দূরে থাকিলে তোমার চেয়েও আমার কষ্ট যে অনেক বেশী হয় ইজাবেল!"

আহা! এমন স্বামী—তাঁর ভালবাসায়ও মনে সন্দেহ কখনও হইয়াছিল? মনে মনে ইজাবেল আপনাকে ধিক্কার দিলেন।

(ক্রমশঃ)

বাতি গালা

শীল মোহর করিবার জন্য ব্যবসায়ীগণ গভর্ণমেণ্ট এবং সাধারণ লোকেও ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্ট এবং অনেক সওদাগর আফিসে ইহা বৎসরে হাজার টাকারও অধিক আবশ্যক হয়। ইহা প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিলে অনেক লাভ হইতে পারে। এই জিনিসও বিদেশ হইতে আইসে। আমরাই তাহা ক্রয় করি। কিন্তু গালা ভারতেই জন্মে, সেই গালা বিলাতে যায়, রং চংএ সুরঞ্জিত হইয়া এদেশে বেশী দামে বিক্রয় হয়।

ইহার প্রস্তুত প্রণালী

জিনিস্ টার্পিণ তৈল	৩ আউন্স।
পাতলা চাঁচগালা	৭ ঐ
রজন	১ ঐ
প্রুসিয়ান ব্লু রং	১ ঐ
ক্যালসিড ম্যাগনেসিয়া	১॥০ ড্রাম।

এই সমস্ত দ্রব্য একত্র উত্তাপে দ্রব করিবে। তাহার পর নামাইয়া একটু ঠাণ্ডা হইলে হাতে করিয়া পাকাইয়া লম্বা লম্বা করিবে, বা ছাচে দিয়া চৌকা করিবে। ইহা বিক্রয়ের জন্য করিলে ইহাতে নিজ নামের শীল করিয়া বাজারে টীন ফলিও বা রাঙের পাত দ্বারা মুড়িয়া কাগজের বাক্সের উপর "Scaling wax" বলিয়া লেবেল দিয়া বিক্রয় করিবে। এ সকল শুধু জানিয়া লাভ নাই। প্রস্তুত করিয়া দেশের উপকার কর। সমস্ত অবজ্ঞার চক্ষে দেখিও না। বাতিগালা সম্বন্ধে আরও অনেক কথা ইহার পরে বলিব। আজ সমস্ত বলিবার স্থান নাই।

লেমোনেড পাউডার

ইহার দ্বারা যেখানে সেখানে লেমোনেড প্রস্তুত করা যাইতে পারে। তাই কর না কেন? এই ত গোলের কথা—বাবা, করে কে? হায় হায়!! "শুধু জানিব শুনিব—পেটেতে পুরিব, বাহির কভু ত করিব না। মুখেতে কেবল বচন ঝাড়িব, দেশ উদ্ধারিতে ছাড়িব না।" এতেই তো গোল বাধিয়াছে। যাক্, লেমোনেড পাউডার কেমন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয় বলিতেছি।

এসেন্স অফ্ লেমন	১॥০ আউন্স
টারটারিক অ্যাসিড	৪ আউন্স
চিনি	১ পাউণ্ড

উত্তমরূপে পিশিয়া তাহার পর সোডা বাইকার্ব ৪ আউন্স তাহাতে দিয়া রাখ। কিন্তু সাবধান! যেন ইহাতে জল না লাগে। খাইবার সময় ইহার এক চামচ এক গ্লাস জলে দিবা মাত্র ফুটিতে থাকিবে, এবং অতি সুন্দর লেমোনেড প্রস্তুত হইবে। ইহা এক এক চামচ একটী প্যাকেটে ১০ পয়সায় বিক্রয় করিলেও লাভ হইবে।

"কাজের লোক"

বিশিষ্টদ্রব্যাজীর্ণে বিশিষ্টপাচনদ্রব্য

কোন্ কোন্ দ্রব্য ভোজনে অজীর্ণ হইলে কোন্ কোন্ দ্রব্য ভোজনে প্রশমিত হয়?

কাঁঠাল পরিপাকের নিমিত্ত কদলী ফল, কদলী ফল পরিপাকের নিমিত্ত ঘৃত এবং ঘৃত পরিপাকের নিমিত্ত গোঁড়া লেবুর রস প্রশস্ত। নারিকেল এবং তাল বীজ পরিপাকের নিমিত্ত তণ্ডুল, আম্র পরিপাকের নিমিত্ত দুগ্ধ, পিয়াল বীজ পরিপাকের নিমিত্ত হরীতকী ভক্ষণ করিবে। মৌর, বেল, পিয়াল ফল, ফলসা ফল, খর্জ্জুর এবং কয়েৎ-বেল পরিপাকের নিমিত্ত নিম্ববীজ কৃত পেয় পান করিবে। নিম্ব বীজের পানীয় পান করিলে ঘৃত এবং তক্র ভোজন জন্য অজীর্ণও দূর হয়। শুঁঠ ও নাগর মুথা চূর্ণ করিয়া সেবন করিলে খের্জুর ও পানিফল সেবন জনিত শান্তি হয়। যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ ফল এবং পাকুড় ফল ভক্ষণ জন্য অজীর্ণে শুঁঠ ও নাগর মুথার কাথ বাসি করিয়া পান করিবে। তণ্ডুল ভক্ষণে অজীর্ণ হইলে দুগ্ধ, দুগ্ধ পানে অজীর্ণ হইলে যমানী চূর্ণ এবং পিষ্টক ভক্ষণে অজীর্ণ হইলে পিপুল ও যমানী চূর্ণ মিলিত ৵০ আনা হইতে।০ আনা পর্য্যন্ত শীতল জলসহ সেবন করিবে। ষষ্টিক তণ্ডুলে অজীর্ণ হইলে দধির জল দ্বারা নিবৃত্তি হয়। কর্কটী অর্থাৎ কাঁকুড় ভোজনে অজীর্ণ হইলে গোধুম চূর্ণ বা গোধুমের কাথ সেবন করিবে। গোধুম, মাষ কলায়, ছোলা, কলায়

ও মুগ ভক্ষণে অজীর্ণ হইলে ধুস্তুর ফল ভক্ষণ করিবে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ধুতুরা ফল শোধন করিয়া যথাযোগ্য মাত্রায় ব্যবহার হইয়া থাকে কিন্তু ধুতুরা তীব্র বিষ। সুতরাং অভিজ্ঞতা না থাকিলে কেহ যেন সুচিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত ব্যবহার না করেন। কাঙ্গনিধান্য, শ্যামাধান্য খর্জ্জুরিকা (মিঠাগজা), মৃণাল, কেশুর, চিনি, পানিফল ও মধু ফলে (নারিকেল বিশেষ) অজীর্ণ হইলে নাগর মুথার চূর্ণ বা কাথ সেবনে শীঘ্র পরিপাক হইয়া যায়।

কাঙ্গনি ধান্য, শ্যামা ধান্য, উড়ী ধান্য ও কুলথ কলায়ে অজীর্ণ হইলে দধির জল অর্থাৎ দধি জমিলে তাহা হইতে যে জল পৃথক হইয়া পড়ে, সেই জল সেবনে শীঘ্র শান্তি হয়। বিদল অর্থাৎ ডাল বা তদ্দারা প্রস্তুত খাদ্য জীর্ণ না হইলে কাঞ্জিক দ্বারা শীঘ্র পরিপাক হয়। পিষ্টক শীতল জল দ্বারা এবং কৃশরা (খিচুরী) সৈন্ধব লবণ দ্বারা পরিপাক হয়। জামীর বা পাতি কাগজি লেবুর রস দ্বারা মাষেগুরী (মাষ-পিষ্টক) ও মুদ্গযূষের দ্বারা পায়স পরিপাক হয়। লবণ দ্বারা বেশবার (মাংস বটক) এবং লবঙ্গ দ্বারা ফেনী জীর্ণ হয়। পর্পট অজীর্ণ হইলে সজিনাবীজ চূর্ণ বা কাথ সেবন করিবে। লড্ডুক (লাড়ু), পিষ্টক এবং সট্টক (পানক) প্রভৃতি অজীর্ণ হইলে পিপুলমূল চূর্ণ বা কাথ করিয়া সেবন করিবে। শষ্কুলীতে অজীর্ণ হইলে অন্নমণ্ড ভক্ষণ করিবে।

মৎস্য মাংস বহু পরিমাণে ভোজন করিয়াও যদি কাঞ্জিক পান করা যায় তবে শীঘ্রই পরিপাক হইয়া যায়। অগ্নিপক্ব মৎস্য মাংসসহ ভক্ষণ করিলেও শীঘ্র পরিপাক হয়। কচি আম খাইলে মৎস্য ও আম্র বীজের দ্বারা মাংস পরিপাক হয়। কচ্ছপের মাংস পরিপাক না হইলে যবক্ষার সেবন করিবে। শুক্লবর্ণ ও পাণ্ডুবর্ণ কপোত, নীলকণ্ঠ এবং কপিঞ্জল মাংস ভক্ষণ করিয়া অজীর্ণ হইলে কেশে মূল পেষণ করিয়া শীতল জল সহযোগে সেবন করিবে।

তিল গাছ হইতে যে ক্ষার প্রস্তুত হয় ঐ ক্ষার ভক্ষণে সকল প্রকার মাংসই শীঘ্র পরিপাক হয়। চঞ্চুক শাক, সর্ষপ শাক এবং বেতুয়া শাক খদির কাষ্ঠে কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে শীঘ্র পরিপাক হয়। পালং শাক, করলা, বেগুন, বাঁশের কোঁড়, মূলা, পুঁই, লাউ এবং পটোল এই সকল শ্বেত সর্ষপ এবং কাঁটা নটে দ্বারা পরিপাক হয়। ওল গুড় দ্বারা এবং আলু (চুবড়ি) চেলুনী জল দ্বারা পরিপাক হয়। আলু কোদাধান্য এবং কেশুর শুঁঠ চূর্ণ সেবনে পরিপাক হয়। লবণ সেবনে শরীরে বিকার উপস্থিত হইলে চেলুনা জল সেবন করিবে। মরিচ কিম্বা গোঁড়া লেবু প্রভৃতি অম্ল দ্বারা ঘৃত সেবন জন্য অজীর্ণ বিকার প্রশমিত হয়। তৈল ভক্ষণ জন্য অজীর্ণ বিকার উপস্থিত হইলে কাঁজি ভক্ষণ করিবে।

তক্র সেবন করিলে দুগ্ধ ভক্ষণ জন্য অজীর্ণ দূর হয়। ঈষদুষ্ণ অন্নমণ্ড দ্বারা গব্য দুগ্ধ এবং মহিষ দুগ্ধ জীর্ণ হয়। মহিষ দুগ্ধ শঙ্খচূর্ণ বা ভস্ম এক বা দুই তোলা শীতল জলসহ সেবনে শীঘ্র পরিপাক হয়। ত্রিকটু চূর্ণ সেবনে আম, শুঁঠ চূর্ণ সেবনে গুড়, নাগর মুথা সেবনে চিনি ও আদার রসে ইক্ষু ভোজন জন্য অজীর্ণ দূর হয়।

গেরিমাটি ও শ্বেত চন্দন ঘসিয়া সেবন করিলে ইরা (মদ) জীর্ণ হয়। শীতল দ্রব্য দ্বারা উষ্ণ দ্রব্য ও উষ্ণ দ্রব্য দ্বারা শীতল দ্রব্য পরিপাক হইয়া থাকে। ক্ষার সমূহ অম্ল রস দ্বারা পরিপাক হইয়া থাকে। অধিক জল পান করায় অজীর্ণ হইলে একখণ্ড স্বর্ণ অথবা রৌপ্য আগুনে পোড়াইয়া লাল করিবে ও জলে নিক্ষেপ করিবে। সাতবার এইরূপ করিয়া অল্প অল্প পান করিবে। নাগর মুথা চূর্ণ মধুসহ সেবনেও জলপান জন্য অজীর্ণ দূর হয়।

(এডুকেশন গেজেট)

(৪)

শাসন বিভাগ

২য় অংশ :—গবর্ণর জেনারেল ও অমাত্য সভা

১। বর্ত্তমান আইনের বিধান ও তদনুযায়ী প্রণীত বিশেষ বিধি সকলের নিয়মাধীনে, ভারত-শাসন সংক্রান্ত, দেওয়ানী (civil) ও সামরিক বিভাগের পরিদর্শন, পরিচালনা ও কর্ত্তৃত্বভার গবর্ণর জেনারেল ও অমাত্য সভার উপর ন্যস্ত থাকিবে। তাঁহারা ভারত সচিবের প্রদত্ত যাবতীয় আদেশ মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবেন।

গবর্ণর-জেনারেল

২। সম্রাট বিশিষ্ট নিয়োগপত্র দ্বারা ভারতের গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত করিবেন।

গবর্ণর জেনারেলের কার্য্য নির্ব্বাহক সভা

৩। (১) সম্রাট বিশিষ্ট নিয়োগপত্র দ্বারা গবর্ণর জেনারেলের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অমাত্যদিগকে নিযুক্ত করিবেন।

(২) উক্ত সভার অমাত্যগণের সংখ্যা সম্রাটের অভিপ্রায় অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট হইবে।

(৩) উক্ত অমাত্যগণের মধ্যে অন্ততঃ তিনজন এইরূপ ব্যক্তি থাকা চাই যাঁহারা অন্যূন দশ বৎসর ভারতে কোনও সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এবং অন্ততঃ একজন এইরূপ ব্যক্তি থাকা চাই যিনি অন্যূন পাঁচ বৎসর যাবত ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড কিম্বা আয়র্লণ্ড দেশের প্রচলিত ব্যবস্থানুযায়ী ব্যারিষ্টার হইয়াছেন অথবা কোনও হাইকোর্টে দশ বৎসর যাবত ওকালতি করিয়াছেন।

(৪) ভারতীয় সৈন্যের প্রধান সেনাপতি ব্যতীত সম্রাটের সৈন্য বিভাগের কোনও কার্য্যে নিযুক্ত কোনও কর্ম্মচারী যদি উক্ত সভার অমাত্য পদে মনোনীত হন, তাহা হইলে উক্ত পদে নিযুক্ত থাকা কাল পর্য্যন্ত তিনি কোনও সৈন্যদলের নেতৃত্বে অথবা কোনও যুদ্ধকার্য্যে নিয়োজিত হইতে পারিবেন না।

(৫) গবর্ণর জেনারেলের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অমাত্য পদে নিযুক্ত হইবার যোগ্যতা সম্বন্ধে উপরোক্ত বিধানের অতিরিক্ত ব্যবস্থা প্রয়োজনানুসারে অত্র আইনের অনুযায়ী প্রণীত বিশেষ বিধি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করা হইবে।

৪। ভারতীয় সৈন্যের প্রধান সেনাপতি যদি উক্ত সভার অমাত্যপদে নিযুক্ত হন, তাহা হইলে অত্র আইনের নিয়মাধীনে উক্ত সভার অমাত্যগণের মধ্যে গবর্ণর জেনারেলের নিম্নেই তাহার পদমর্য্যাদা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

৫। উক্ত অমাত্যগণের মধ্যে একজনকে গবর্ণর জেনারেল উক্ত সভার সহকারী সভাপতি নিযুক্ত করিবেন।

৬। সভার অধিবেশন :—(১) গবর্ণর জেনারেল কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট ভারতের যে কোনও স্থানে এই সভার অধিবেশন হইতে পারিবে।

(২) উক্ত সভার কোনও অধিবেশনে গবর্ণর জেনারেল অথবা তৎপরিবর্ত্তে যিনি সভাপতির কার্য্য করিবেন তিনি এবং প্রধান সেনাপতি ব্যতীত অপর একজন অমাত্য উপস্থিত থাকিলেই, উক্ত অধিবেশনে গবর্ণর জেনারেল ও অমাত্য সভার যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারিবে।

৭। গবর্ণর জেনারেল ও অমাত্য সভার কার্য্যাদি :—(১) গবর্ণর জেনারেল ও অমাত্য সভার আদেশ ও কার্য্যাবলী গবর্ণর জেনারেল ও অমাত্য সভার আদেশ ও কার্য্য-স্বরূপে প্রচারিত হইবে এবং উহা ভারত সরকারের কোনও সেক্রেটারী অথবা সভার নির্দ্দেশ অনুযায়ী অন্য কাহারও দ্বারা স্বাক্ষরিত হইবে। এইরূপে স্বাক্ষরিত কোনও আদেশ প্রভৃতি কোনও আদালতে গবর্ণর জেনারেল ও অমাত্য সভার প্রদত্ত আদেশ নহে বলিয়া কেহ আপত্তি উত্থাপিত করিতে পারিবে না।

(২) উক্ত সভার কার্য্য নির্ব্বাহের সুবিধার জন্য গবর্ণর জেনারেল প্রয়োজনীয় নিয়ম ও স্থায়ী আদেশ প্রভৃতি প্রচার করিতে পারিবেন। এইরূপে প্রচারিত নিয়ম প্রভৃতির অনুযায়ী অনুষ্ঠিত যাবতীয় কার্য্য গবর্ণর জেনারেল ও অমাত্য সভার কৃতকার্য্য স্বরূপে পরিগণিত হইবে।

৮। মতভেদ সম্বন্ধে ব্যবস্থা

(১) গবর্ণর জেনারেল কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় আলোচিত কোনও বিষয়ে মতভেদ উপস্থিত হইলে উপস্থিত অধিকাংশ সদস্যের মতানুযায়ী মীমাংসা গবর্ণর জেনারেল ও অমাত্যসভা মানিয়া লইবেন; সমান সংখ্যক সদস্য উভয় দিকে মত প্রকাশ করিলে গবর্ণর জেনারেল অথবা অন্য যিনি সভাপতি থাকিবেন তিনি দ্বিতীয় বা অতিরিক্ত একটি ভোট দিতে পারিবেন।

(২) তবে যখনই এরূপ কোনও প্রস্তাব সভায় আলোচিত হইবে যাহা গবর্ণ জেনারেলের বিবেচনায় ভারতের বা কোনও অংশের সুরক্ষা, শান্তি বা স্বার্থের সহিত বিশেষরূপে সংসৃষ্ট এবং যদি তাঁহার মতে উক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য্য হওয়া অথবা উক্ত প্রস্তাব স্থগিত বা পরিত্যক্ত হওয়া সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়, এবং সেইরূপ স্থলে যদি সভায় উপস্থিত অধিকাংশ সভ্য অন্যরূপ সিদ্ধান্ত করেন, তাহা হইলে তিনি নিজ কর্তৃত্বে উক্ত প্রস্তাব সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ, অথবা স্থগিত কিম্বা রহিত করিতে পারিবেন।

(৩) এইরূপ প্রত্যেক উপলক্ষে বিরুদ্ধমতাবলম্বী সভ্যদিগের মধ্যে যে কোনও দুইজন ইচ্ছা প্রকাশ করিলে উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ, স্থগিত বা রহিত হওয়ার বিষয় ও তদ্বিরুদ্ধে তাঁহাদিগের মত প্রকাশের বিষয়সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট ভারত সচিবের নিকট পাঠাইতে হইবে এবং ঐ সঙ্গে উপস্থিত সভ্যগণের যে সকল মন্তব্য কার্য্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ করা হইবে তাহারও নকল পাঠাইতে হইবে।

(৪) কার্য্য নির্ব্বাহক সভার মতানুযায়ী গবর্ণর জেনারেলের যে সকল কার্য্য করিবার অধিকার আছে তদতিরিক্ত কোনও কার্য্য পূর্ব্বোক্ত ভাবে করিবার কোনও অধিকার গবর্ণর জেনারেলের থাকিবে না।

৯। সভার অধিবেশনে গবর্ণর-জেনারেলের অনুপস্থিতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা :—

যদি শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন অথবা অন্য কোনও কারণে গবর্ণর জেনারেল উক্ত সভার কোনও অধিবেশনে উপস্থিত না হইতে পারেন তাহা হইলে সংকারি-সভাপতি এবং তদভাবে প্রধান সেনাপতি ব্যতীত অন্য উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে যিনি কাল-জ্যেষ্ঠ তিনি সভাপতির কার্য করিবেন এবং সভাপতিরূপে গবর্ণর জেনারেলের যেরূপ তাঁহারও সেইরূপ ক্ষমতা থাকিবে।

তবে, সভার উক্ত অধিবেশন যে স্থানে হয় যদি সেই-স্থানে সেই সময়ে গবর্ণর জেনারেল বাস করিতে থাকেন এবং শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন যদি উক্ত অধিবেশনে পরিগৃহীত প্রস্তাব তিনি স্বাক্ষর করিতে অসমর্থ না হন, তাহা হইলে উক্ত প্রস্তাব তাঁহার দ্বারা স্বাক্ষর করাইয়া লইতে হইবে; কিন্তু যদি তিনি উক্ত কোনও প্রস্তাব স্বাক্ষর করিতে অসম্মত হন তাহা হইলে, সভার অধিকাংশ সভ্যের মতের বিরুদ্ধে তাঁহার কার্য্য করিবার যে ব্যবস্থা পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে তদনুযায়ী কার্য্য হইবে।

১০। সভার অনুপস্থিতিতে গবর্ণর জেনারেলের কার্য্য করিবার ক্ষমতা :—

(১) কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অমাত্যবর্গ সঙ্গে না লইয়া, ভারতের কোনও অংশে গবর্ণর জেনারেলের যাওয়া প্রয়োজন, যদি গবর্ণর জেনারেল ও অমাত্যসভা এইরূপ নির্দ্দেশ করেন, তাহা হইলে, উক্ত সভার অধিবেশনে যে সকল কার্য্য নির্ব্বাহ হইবার ব্যবস্থা, সেই সকল, অথবা তদপর্য্যায়ভুক্ত কোনও কোনও কার্য্য,—একাকী গবর্ণর জেনারেল নিজ বিবেচনানুরূপ করিতে পারিবেন, এইরূপ ক্ষমতা, উক্ত সভা তাঁহাকে দিতে পারিবেন।

(২) কোনও প্রাদেশিক সরকারকে অথবা উক্ত সরকারকে না জানাইয়া তদধীন কোনও কর্ম্মচারীকে গবর্ণর জেনারেল ও অমাত্যসভা যে সকল আদেশ দিতে পারেন এইরূপ কোনও আদেশ, কার্য্য নির্ব্বাহক সভার অধিবেশন স্থান হইতে দূরে অবস্থান কালে, গবর্ণর জেনারেল নিজ কর্তৃত্বে ও দায়িত্বে দিতে পারিবেন; এবং এইরূপ কোনও আদেশ গবর্ণর জেনারেল ও অমাত্যসভার প্রদত্ত আদেশের ন্যায় বলবৎ হইবে; কিন্তু এইরূপ আদেশের নকলও তাহা প্রচার করিবার কারণ অবিলম্বে ভারতসচিব ও উক্ত প্রাদেশিক সরকারের নিকট পাঠাইতে হইবে।

(৩) পূর্ব্বোক্ত দফা অনুযায়ী গবর্ণর জেনারেলের কার্য্য করিবার ক্ষমতা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অন্যরূপ আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত স্থগিত থাকিবে এইমর্ম্মে ভারত-

সচিব ও অমাত্যসভার উক্ত প্রকার আদেশ পাওয়ার তারিখ হইতে গবর্ণর জেনারেলের উক্ত প্রকার ক্ষমতা স্থগিত থাকিবে।

১১। ব্যবস্থাপক সভার সেক্রেটারী :—

(১) গবর্ণর জেনারেল ইচ্ছা করিলে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদিগের মধ্য হইতে কয়েক জনকে উক্ত সভার সেক্রেটারী পদে নিয়োগ করিতে পারিবেন। উক্ত সেক্রেটারীগণের কার্য্যকাল তাঁহার ইচ্ছাধীন থাকিবে এবং তাঁহারা কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অমাত্যদিগকে যে সকল বিষয়ে সহায়তা করিবেন তাহা তিনি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন।

(২) এই সকল সেক্রেটারী ব্যবস্থাপক সভার নির্দ্দেশ অনুযায়ী বেতন লইবেন।

(৩) এইরূপে নিযুক্ত কোনও সেক্রেটারী কোনও সময়ে ছয় মাস পর্য্যন্ত উক্ত সভার সভ্য না থাকিলে পদচ্যুত হইবেন।

সন্ধি বিগ্রহ

১২। গবর্ণর জেনারেল ও অমাত্যসভার যুদ্ধঘোষণা করিবার অধিকার :—

(১) ভারতস্থিত ব্রিটিশ সরকার অথবা তদাশ্রিত কোনও রাজন্য অথবা যে দেশ রক্ষা করিবার জন্য ভারত-সম্রাট কোনও সন্ধিসর্ত্তে আবদ্ধ আছেন এই সম্বন্ধের বিরুদ্ধে কার্য্যত যুদ্ধ আরম্ভ অথবা আরম্ভের উদ্যোগ হওয়ার স্থলে ভিন্ন অন্য কোনও উপলক্ষে, ভারতসচিব ও অমাত্যসভার বিশিষ্ট আদেশ ব্যতীত গবর্ণর জেনারেল ও অমাত্যসভা কোনও যুদ্ধ ঘোষণা, যুদ্ধ আরম্ভ অথবা ভারতীয় কোনও রাজন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হইবার সর্ত্তে কোনও সন্ধিতে যোগদান, কিম্বা এইরূপ কোনও রাজন্যের অধিকৃত দেশ রক্ষা করিবার কোনও চুক্তি, করিতে পারিবেন না।

(২) পূর্ব্বোক্ত ব্যতিরেক স্থলে, কার্য্যত যুদ্ধ আরম্ভ বা আরম্ভের উদ্যোগ না করিলে কোনও ভারতীয় রাজন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা বা যুদ্ধ আরম্ভ অথবা ঐরূপ যুদ্ধ আরম্ভ বা যুদ্ধের উদ্যোগ যিনি করিবেন তাঁহার বিরুদ্ধে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি ভিন্ন অন্য কোনও কারণে ভারতীয় কোনও রাজন্যের অধিকৃত দেশ রক্ষা করিবার কোনও চুক্তি গবর্ণর জেনারেল ও অমাত্যসভা করিতে পারিবেন না।

(৩) যে কোনও স্থলে গবর্ণর জেনারেল ও অমাত্যসভা কোনও প্রকার যুদ্ধ আরম্ভ করেন অথবা কোনও সন্ধি করেন তাহা অবিলম্বে, কারণ সহকারে, ভারতসচিবকে জানাইতে হইবে।

৩য় অংশ—প্রাদেশিক সরকার

১। গবর্ণর জেনারেল ও অমাত্যসভার সহিত প্রাদেশিক সরকারের সম্বন্ধ নির্ণয় :—

(১) বর্ত্তমান আইনের বিধান ও তদনুযায়ী প্রণীত বিশেষ বিধির নিয়মাধীনে, প্রত্যেক প্রাদেশিক সরকার গবর্ণর জেনারেল ও অমাত্যসভার আদেশ মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবেন, ও তাহাদিগকে নিজ সরকার যাবতীয় কার্য্য সম্বন্ধে ও তৎসংক্রান্ত যে সকল বিষয় জানান সঙ্গত বোধ হয় অথবা যে সকল বিষয় সম্বন্ধে কোনও সংবাদ চাওয়া হইবে তত্তৎ সম্বন্ধে, নিয়ত প্রযত্ন সহকারে জানাইবেন। প্রদেশের শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে প্রাদেশিক সরকার গবর্ণর জেনারেল ও অমাত্যসভার পরিদর্শন, পরিচালনা ও কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিবেন।

(২) কোনও প্রদেশে গবর্ণর জেনারেল উপস্থিত থাকা কারণে প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা কোনও প্রকারে ক্ষুণ্ণ হইবে না।

২। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাজকার্য্যের শ্রেণী বিভাগ :—

(১) বর্ত্তমান আইনের নিয়মাধীনে প্রণীত বিশেষ বিধি দ্বারা নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা যাইতে পারিবে :—

(ক) গবর্ণর জেনারেল ও অমাত্যসভা এবং ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অনুষ্ঠেয় কার্য্যের বিষয় হইতে প্রাদেশিক সরকার ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার অনুষ্ঠেয় রাজকার্য্যের বিষয় সকল কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক এই দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা সম্বন্ধে।

(খ) প্রাদেশিক সরকারের উপর প্রাদেশিক বিষয় সংক্রান্ত ক্ষমতা অর্পণ করা; এবং প্রাদেশিক সরকার

সমূহকে বিশিষ্ট রাজস্ব ও অন্যান্য অর্থাদির ভার দেওয়া সম্বন্ধে।

(গ) গবর্ণর জেনারেল ও অমাত্যসভার কর্তৃত্বাধীনে প্রাদেশিক সরকারের সাহায্যে যে সকল কেন্দ্রীয় বিষয়ের কার্য্য যে পরিমাণে নির্ব্বাহ করাইবার সুবিধা হইতে পারে ও তৎসম্বন্ধে যেরূপ আর্থিক ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, তৎসম্বন্ধে।

(ঘ) এই আইনের বিধান অনুযায়ী নিযুক্ত মন্ত্রীগণের সহকারিতায় প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার গবর্ণরের কর্তৃত্বাধীনে নির্ব্বাহের জন্য যে সকল বিষয় সমর্পণ করা যাইতে পারে (যাহা এই আইনে "সমর্পিত বিষয়" বলিয়া আখ্যাত হইল), এবং তাহা নির্ব্বাহের জন্য যে বিশিষ্ট রাজস্ব বা অর্থাদির ভার দেওয়া যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে।

(২) উপরোক্ত উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে, উক্তপ্রকার বিশেষ বিধি প্রণয়ন দ্বারা ব্যবস্থা করা যাইবে, কিন্তু এতদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সাধারণ বিধি সমূহের প্রসার কোনও প্রকারে সঙ্কীর্ণ করা হইল এরূপ বুঝাইবে না :—

(অ) পূর্ব্ববর্ণিত ক্ষমতা অর্পণ, রাজস্ব ও অর্থাদির ভার দেওয়া, এবং বিশিষ্ট রাজকার্য্যের ভার সমর্পণ যে পরিমাণে ও যে অবস্থায় করা বা দেওয়া হইবে তৎসম্বন্ধে।

(আ) গবর্ণর জেনারেল ও অমাত্যসভার খরচের জন্য প্রাদেশিক সরকার যে টাকা দিবেন তাহার পরিমাণ, ও তাহা যে ভাবে ভারার্পিত রাজস্বাদির উপর প্রথম দায় স্বরূপে গণ্য হইতে পারে তাহা নির্দ্দেশ করা সম্বন্ধে।

(ই) কোনও প্রদেশে অর্থসচিব-বিভাগ প্রতিষ্ঠা ও তৎসংক্রান্ত কার্য্যাদির ব্যবস্থা সম্বন্ধে।

(ঈ) প্রদেশস্থিত সরকারী কর্ম্মচারীদিগের উপর প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা পরিচালনা সম্বন্ধে।

(উ) কোনও বিশিষ্ট বিষয় "প্রাদেশিক বিষয়" বা "সমর্পিত বিষয়ের" পর্য্যায়ভুক্ত কিনা এসম্বন্ধে কোনও সন্দেহ উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসা এবং যে সকল বিশিষ্ট বিষয় সমর্পিত বিষয় ও তৎপর্য্যায় বহির্ভূত বিষয় উভয় শ্রেণীর সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট তাহা নির্ব্বাহের ব্যবস্থা সম্বন্ধে।

(ঊ) প্রয়োজন ও সুবিধা বোধে অন্যান্য যে সকল আনুষঙ্গিক ও পরিপূরণিক ব্যবস্থা আবশ্যক হয় তৎসম্বন্ধে।

তবে কোনও বিষয় একবার সমর্পণ করা হইলে উক্ত সমর্পণ স্থগিত বা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে কোনও বিশেষ চিঠি ভারতসচিব ও অমাত্যসভার অনুমতি ব্যতীত প্রণীত হইতে পারিবে না, কিন্তু এতদ্দ্বারা অত্র আইনের বিধান অনুযায়ী, বিশেষ বিধি রহিত বা স্থগিত করিবার সাধারণ ব্যবস্থার প্রসার, কোনওরূপে সঙ্কীর্ণ করা হইল বুঝাইবেনা।

(৩) এই আইনে গবর্ণর জেনারেল ও অমাত্য-সভাকে প্রাদেশিক সরকারের কার্য্যাদির পরিদর্শন, পরিচালনা ও কর্তৃত্বের যে অধিকার দেওয়া হইল, সমর্পিত বিষয় সম্বন্ধে, তাহা কেবলমাত্র বিশেষ বিধি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইবে। তবে যে উদ্দেশ্যে উক্ত অধিকার পরিচালনা করা হইবে তাহা উক্ত প্রকার বিশেষ-বিধিনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত কিনা এবিষয় বিচার করিবার ক্ষমতা একমাত্র গবর্ণর জেনারেল ও অমাত্য-সভার থাকিবে।

(৪) এই আইনে ব্যবহৃত "কেন্দ্রীয় বিষয়" ও "প্রাদেশিক বিষয়" এই দুইটি সংজ্ঞা দ্বারা যে সকল বিষয় বিশেষ বিধি দ্বারা উক্ত দুইটি শ্রেণীভুক্ত করা হইবে তাহাই বুঝাইবে।

"সমর্পিত বিষয়" ব্যতীত অপরাপর প্রাদেশিক বিষয় অত্র আইনে "সংরক্ষিত বিষয়" এই সংজ্ঞাদ্বারা উল্লেখ করা হইবে।

৩। গবর্ণর :—

(১) বঙ্গদেশ, মাদ্রাজ, বোম্বাই এই তিনটি প্রেসি-ডেন্সি প্রদেশের এবং যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ ও আসাম এই কয়েকটি অপর প্রদেশের শাসনকার্য্য সংরক্ষিত বিষয় সম্বন্ধে গবর্ণর ও অমাত্যসভা কর্তৃক পরিচালিত হইবে এবং সমর্পিত বিষয় সম্বন্ধে মন্ত্রীগণের সাহায্যে গবর্ণর কর্তৃক পরিচালিত হইবে।

অত্র আইনে উপরোক্ত প্রদেশ সকল গবর্ণর-শাসিত-প্রদেশ বলিয়া উল্লেখিত হইবে; এবং প্রথমোক্ত প্রেসিডেন্সি প্রদেশ দুইটি বঙ্গ-প্রেসিডেন্সি ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি বলিয়া উল্লিখিত হইবে।

(২) উক্ত প্রেসিডেন্সি প্রদেশের গবর্ণরদিগকে সম্রাট বিশিষ্ট নিয়োগপত্র দ্বারা নিযুক্ত করিবেন; এবং গবর্ণর

জেনারেলের অভিমত জানিয়া, উক্ত অপর প্রদেশের গবর্ণরদিগকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নিযুক্ত করা হইবে।

(৩) ভারতসচিব সঙ্গত বোধ করিলে উক্ত কোনও অপর প্রদেশে অমাত্যসভার নিয়োগ নির্দ্দিষ্ট সালের জন্য রহিত বা স্থগিত রাখিতে পারিবেন; এইরূপ কোনও আদেশ বলবৎ থাকাকাল পর্য্যন্ত সেই প্রদেশের গবর্ণর একাকী গবর্ণর ও অমাত্যসভার যাবতীয় অধিকার পরিচালনা করিবেন।

৪। অমাত্যসভার সদস্য :—

(১) গবর্ণরের অমাত্যসভার সদস্যদিগকে সম্রাট বিশিষ্ট নিয়োগপত্র দ্বারা নিযুক্ত করিবেন। প্রত্যেক সভায় ভারতসচিবের বিবেচনা মত অনধিক চারিজন পর্য্যন্ত সদস্য নিযুক্ত হইবে।

(২) উক্ত সদস্যগণের মধ্যে অন্ততঃ একজন এইরূপ ব্যক্তি আসিবেন যিনি নিয়োগের পূর্ব্বে অন্ততঃ দ্বাদশ বৎসর ভারতে সরকারি কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

(৩) উক্ত সদস্যপদের যোগ্যতা সম্বন্ধে অত্র ধারায় যে বিধান করা হইল তদতিরিক্ত ব্যবস্থা বিশেষ বিধিদ্বারা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারিবে।

(৪) সহকারি সভাপতি :—অমাত্যসভার একজন সদস্যকে গবর্ণর সহকারি সভাপতি নিযুক্ত করিবেন।

৪। গবর্ণর ও অমাত্যসভা এবং মন্ত্রীগণের সাহায্যে গবর্ণর কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কার্য্যাদি

(১) গবর্ণর-শাসিত প্রদেশে শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় আদেশ ও কার্য্যাদি গবর্ণর ও অমাত্যসভার আদেশ ও কার্য্যস্বরূপে প্রচারিত হইবে এবং উহা গবর্ণর প্রণীত নিয়ম অনুযায়ী স্বাক্ষরিত হইবে কিন্তু উক্ত নিয়ম দ্বারা এইরূপ ব্যবস্থা করা হইবে যাহাতে সমর্পিত বিষয় হইতে অপর বিষয় সংক্রান্ত আদেশ ও কার্যাদি পৃথকরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। উক্তরূপে স্বাক্ষরিত কোনও আদেশ প্রভৃতি কোনও আদালতে গবর্ণর ও অমাত্যসভার প্রদত্ত আদেশ নহে বলিয়া কেহ আপত্তি উত্থাপিত করিতে পারিবেন না।

(২) উক্ত সভার এবং মন্ত্রীগণের সাহায্যে অনুষ্ঠিত কার্য্যাদি নির্ব্বাহের সুবিধার জন্য গবর্ণর প্রয়োজনীয় নিয়ম ও আদেশ প্রভৃতি প্রচার করিতে পারিবেন। এইরূপে প্রচারিত নিয়ম প্রভৃতি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত প্রত্যেক কার্য্য ও আদেশ প্রাদেশিক সরকার কৃত কার্য্য ও আদেশ স্বরূপে পরিগণিত হইবে। তবে, বর্ত্তমান ধারার নির্দ্দেশ অনুযায়ী প্রচারিত কোনও নিয়ম অথবা আদেশ যদি অত্র আইন অনুযায়ী প্রণীত কোনও বিশেষ বিধির বিরুদ্ধ হয় তবে সেই বিরুদ্ধ অংশ মাত্র রহিত বলিয়া গণ্য হইবে।

৭। মতভেদ সম্বন্ধে ব্যবস্থা

(১) গবর্ণরের অমাত্যসভায় আলোচিত কোনও বিষয়ে মতভেদ উপস্থিত হইলে উপস্থিত অধিকাংশ সদস্যের মতানুযায়ী মীমাংসা গবর্ণর ও অমাত্যসভা মানিয়া লইবেন; সমান সংখ্যক সদস্য উভয় দিকে মতপ্রকাশ করিলে গবর্ণর অথবা অন্য যিনি সভাপতি থাকিবেন তিনি দ্বিতীয় বা অতিরিক্ত একটি ভোট দিতে পারিবেন।

(২) তবে যখনই এরূপ কোনও প্রস্তাব সভায় আলোচিত হইবে যাহা গবর্ণরের বিবেচনায় তাঁহার প্রদেশের বা কোনও অংশের সুরক্ষা, শান্তি ও স্বার্থের সহিত বিশেষরূপে সংসৃষ্ট এবং যদি তাঁহার মতে উক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য্য হওয়া অথবা উক্ত প্রস্তাব স্থগিত বা পরিত্যক্ত হওয়া সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়, এবং সেইরূপ স্থলে যদি সভায় উপস্থিত অধিকাংশ সদস্য অনুরূপ সিদ্ধান্ত করেন, তাহা হইলে গবর্ণর নিজ কর্ত্তৃত্বে ও দায়িত্বে লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত প্রস্তাব সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে গ্রহণ অথবা স্থগিত কিম্বা রহিত করিতে পারিবেন।

(৩) এইরূপ প্রত্যেক উপলক্ষে গবর্ণর ও সভায় উপস্থিত সদস্যগণ পরস্পরের মতামত যুক্তি সহকারে লিপিবদ্ধ করিয়া পরস্পরকে জানাইবেন (উহা বিশদ ভাবে গোপনীয় কার্য্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইবে); এবং গবর্ণর প্রদত্ত আদেশ গবর্ণর ও উপস্থিত সকল সদস্য স্বাক্ষর করিবেন।

(৪) অমাত্যসভার মতানুযায়ী গবর্ণরের যে সকল কার্য্য করিবার অধিকার আছে তদতিরিক্ত কোনও কার্য্য পূর্ব্বোক্ত ভাবে করিবার অধিকার গবর্ণরের থাকিবে না।

৮। সভার অধিবেশনে গবর্ণরের অনুপস্থিতি সম্বন্ধে :—

যদি শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন অথবা অন্য কোনও কারণে গবর্ণর উক্ত সভার কোনও অধিবেশনে উপস্থিত হইতে না পারেন তাহা হইলে সহকারি সভাপতি এবং তদভাবে উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে যিনি কালজ্যেষ্ঠ তিনি সভাপতির কার্য্য করিবেন এবং সভাপতিরূপে গবর্ণরের যেরূপ তাঁহারও সেইরূপ ক্ষমতা থাকিবে।

তবে, উক্ত সভার উক্ত অধিবেশন যে স্থানে হয় যদি সেই স্থানে সেই সময়ে গবর্ণর বাস করিতে থাকেন এবং শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন যদি উক্ত অধিবেশনের পরিগৃহীত প্রস্তাব তিনি স্বাক্ষর করিতে অসমর্থ না হন তাহা হইলে উক্ত প্রস্তাবাদি তাঁহার দ্বারা স্বাক্ষর করাইয়া লইতে হইবে ; কিন্তু যদি তিনি উক্ত প্রকার কোনও প্রস্তাব স্বাক্ষর করিতে অসম্মত হন, তাহা হইলে, সভার অধিকাংশ সভ্যের মতের বিরুদ্ধে তাঁহার কার্য্য করিবার যে ব্যবস্থা পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তদনুযায়ী কার্য্য হইবে।

৯। মন্ত্রী এবং ব্যবস্থাপক সভার সেক্রেটারী নিয়োগ

(১) গবর্ণর-শাসিত প্রদেশে সমর্পিত বিষয় সংক্রান্ত শাসনকার্য্য নির্ব্বাহার্থে অমাত্যসভার সদস্য ভিন্ন অপর ব্যক্তিদিগকে, সাধারণের গোচরার্থে ঘোষণাপত্র দ্বারা গবর্ণর মন্ত্রী নিযুক্ত করিতে পারিবেন। এই সকল মন্ত্রীগণ তাঁহার ইচ্ছাধীন কাল পর্য্যন্ত ঐ পদে নিযুক্ত থাকিবেন।

প্রাদেশিক অমাত্যসভার সদস্য যে পরিমাণ বেতন পাইবেন উক্ত প্রকারে নিযুক্ত মন্ত্রীকেও সেই পরিমাণ বেতন দেওয়া যাইতে পারিবে, তবে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা ভোট দ্বারা মন্ত্রীর তদপেক্ষা কম বেতন নির্দ্ধারিত করিতে পারিবেন।

(২) এইরূপে নিযুক্ত কোনও মন্ত্রী যদি নিয়োগের সময়ে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচিত সভ্য না হইতে পারেন তাহাহইলে তিনি পদচ্যুত হইবেন।

(৩) সমর্পিত বিষয় সংক্রান্ত কার্য্যে গবর্ণর মন্ত্রীগণের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া চলিবেন, তবে তদ্‌বিরুদ্ধে কার্য্য করার যথেষ্ট কারণ থাকিলে তিনি উক্ত প্রকার পরামর্শের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে পারিবেন।

যদি কোনও সমর্পিত বিষয় সংক্রান্ত কার্য্য চালাইবার মন্ত্রীপদ কোনও সময়ে শূন্য থাকে এবং কোনও সঙ্কট উপস্থিত হয় তাহা হইলে তদ্‌বিষয়ক কার্য্য চালাইবার জন্য সাময়িক যেরূপ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হইতে পারে এতদ্‌বিষয়ে অত্র আইন অনুযায়ী বিশেষ বিধিদ্বারা ব্যবস্থা করা হইবে এবং কিরূপ কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারা ও কিরূপ ভাবে উক্ত কার্য্য চালাইতে হইবে তাহারও ব্যবস্থা উক্ত প্রকার বিশেষ বিধিদ্বারা করা হইবে।

১০। নূতন প্রদেশ গঠন ও অনুন্নত স্থান সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা

(১) কোনও প্রদেশের প্রাদেশিক সরকার এবং ব্যবস্থাপক সভার মত গ্রহণ করিবার পর, ভারত সচিব ও অমাত্যসভার সহযোগে সম্রাটের অনুমতি গ্রহণ করিয়া প্রকাশ্য ঘোষণাপত্র দ্বারা গবর্ণর ও অমাত্যসভা কোনও নূতন গবর্ণর শাসিত প্রদেশ গঠন, কিম্বা কোনও গবর্ণর শাসিত প্রদেশের কোনও অংশ গবর্ণর-জেনারেল কর্ত্তৃক নিযুক্ত ডেপুটি গবর্ণরের অধীনে স্থাপন করিতে পারিবেন, এবং এইরূপ স্থলে গবর্ণর শাসিত প্রদেশ অথবা লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর বা চীফ্ কমিশনারের শাসনাধীন প্রদেশ সম্বন্ধে এই আইনে যে সকল বিধান করা হইল তাহা সম্পূর্ণ অথবা অংশত আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তনাদি করিয়া, উক্ত প্রকার গঠিত নূতন প্রদেশ অথবা প্রদেশের অংশে প্রচলিত করিতে পারিবেন।

(২) গবর্ণর জেনারেল ও অমাত্যসভা ব্রিটিশ ভারতের কোনও অংশ "অনুন্নত স্থান" বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবেন এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকার অনুমতি লইয়া প্রকাশ্য ঘোষণাপত্র দ্বারা এইরূপ স্থানে বর্ত্তমান আইনের বিধান সমূহ উক্ত ঘোষণাপত্রে উল্লিখিতরূপ আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন সহকারে প্রচলিত করিতে পারিবেন। যে স্থান সম্বন্ধে গবর্ণর জেনারেল ও অমাত্যসভা ঘোষণা-পত্রদ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যবস্থা করিবেন সেই স্থান সম্বন্ধে, তাঁহারা উক্ত ঘোষণাপত্রে অথবা পরবর্ত্তী ঘোষণাপত্রে এইরূপ নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন যে ঐ স্থানে বা তাহার অংশে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত কোনও আইন

কোনও পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন সহকারে প্রচলিত থাকিবে অথবা থাকিবে না। গবর্ণর জেনারেল সঙ্গত বোধ করিলে কোনও প্রাদেশিক গবর্ণর ও অমাত্যসভাকে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা প্রণীত কোনও আইন সম্বন্ধে ঐরূপ নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

১১। (১) ১৯১৯ সনের ভারত শাসন সংক্রান্ত আইন পাশ না হইলে, গবর্ণর জেনারেল ও অমাত্যসভা অথবা কোনও প্রাদেশিক সরকার যে সকল আদেশ ও কার্য্য দিতে বা করিতে পারিতেন, উক্ত আইন পাশ হইবার পর উক্ত প্রকার কোনও আদেশ বা কার্য্যের বৈধতা সম্বন্ধে কোনও আদালতে এইরূপ কোনও তর্ক উত্থাপিত করিতে পারিবে না যে উক্ত আইন বা বর্ত্তমান আইনের বিধান বা তদনুযায়ী প্রণীত কোনও বিশেষ বিধির অনুসারে গবর্ণর জেনারেল ও অমাত্যসভা কিম্বা প্রাদেশিক সরকারের উক্ত প্রকার আদেশ দিবার ও কার্য্য করিবার ক্ষমতা লুপ্ত হইয়াছে।

(২) প্রাদেশিক গবর্ণর ও অমাত্যসভা অথবা মন্ত্রীগণের সাহায্যে গবর্ণর কর্ত্তৃক প্রদত্ত বা অনুষ্ঠিত কোনও আদেশ বা কার্য্যের বৈধতা সম্বন্ধে কোনও আদালতে এইরূপ কোনও তর্ক উত্থাপিত হইতে পারিবে না যে উক্ত প্রকার আদেশ বা কার্য্য মন্ত্রী কর্ত্তৃক পরিচালিত কোনও সমর্পিত বিষয় সংক্রান্ত অথবা তৎসংক্রান্ত নহে বলিয়া উহা অবৈধ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মজুমদার এমএ, বিএল।

সংগ্রহ বৈচিত্র

"A slothful man is begger's brother" অলস ব্যক্তি ভিক্ষুকের সহোদর,—অলসের লক্ষ্মীশ্রী হয় না।

১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে ফসফরাস আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

১৫০০ খৃষ্টাব্দে ছেড়া নেকড়া হইতে সর্ব্বপ্রথম কাগজ প্রস্তুত হয়।

কলোঞ্জ নগরে জনৈক (Monk) ক্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তি দ্বারা সর্ব্বপ্রথমে বারুদ প্রস্তুত হইয়াছিল।

২৭৬ সালে সর্ব্বপ্রথম ইংলণ্ডে মদ প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

—২৫ খৃষ্টাব্দে সর্ব্ব প্রথম ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে রেশম আনীত হইয়াছিল।

১৩৮০ খৃষ্টাব্দে প্রথম ফটকিরি আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

২৩০০ গুটিপোকায় ১ পাউণ্ড রেশম উৎপন্ন করে।

গড়ে মানুষের মস্তিষ্ক ৩॥০ পাউণ্ড এবং স্ত্রীলোকের ২ পাউণ্ড ১১ আউন্স।

The best physicians are Dr. Diet, Dr. Quiet and Dr Merryman" খুব ভাল চিকিৎসক হচ্চে, ডাক্তার সুখাদ্য, ডাক্তার শান্ত-প্রকৃতি, ডাক্তার সদানন্দ। ভাল খাদ্য, ভাল স্বভা[illegible] মনে শান্তি [illegible] আবার রোগের ভয় কি? [illegible] জীবন [illegible] যায় না। বুঝেছ?

(কাজের লোক)

প্রেতের ফটো

বর্দ্ধমানে এক আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটিয়াছে। গত ১১ই এপ্রেল তারিখে কুন্দনলাল কাপুর নামক একজন স্থানীয় ক্ষত্রিয় জমিদারের মৃত্যু হয়। তাঁহাদের বংশের প্রথামত পরদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দেহের সৎকার সাধন করা হয় নাই। সৎকারের পূর্ব্বে তাঁহার আত্মীয় লালা আনন্দলাল তাঁহার একখানি ফটোচিত্র তুলেন। ফটো ছাপান হইলে দেখা গেল মৃতের ফটোর পাশে আরও পাঁচটা ফটো উঠিয়াছে! ইহার মধ্যে দুইটি তাঁহার পরলোকগত পত্নীর ও পুত্রের; উহারা বহুদিন পূর্ব্বে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। অপর তিনটি মূর্ত্তি অস্পষ্ট, সুতরাং আত্মীয়েরা চিনিতে পারেন নাই। বর্দ্ধমান রাজ বাটীর উত্তরে লালা আনন্দলালের বাটী। সেখানে এই আশ্চর্য্য প্রেতের ফটো রহিয়াছে। যে কেহ ইচ্ছা করিলে দেখিয়া আসিতে পারেন! বর্দ্ধমান হইতে শেখরচন্দ্র সামন্ত এই কথা লিখিয়াছেন। আমরা বহুদিন পূর্ব্বে এইরূপ এক প্রেতের [illegible]য়াছিলাম। উহা এক বাঙ্গালী রমণীর স্বামী পুনঃ[illegible] বিবাহ করিবার পর যখন সস্ত্রীক ফটো তুলাইয়াছিলেন, তখন রুদ্ধ কক্ষদ্বারের অপর পার্শ্বে দণ্ডায়মান প্রথমা পত্নীর প্রেতমূর্ত্তির প্রতিকৃতি উঠিয়াছিল।

(বসুমতী)

বিবিধ প্রসঙ্গ

ডায়ারী আন্দোলন

বৃটিশ পার্লামেণ্টে ডায়ার ডিবেট্ (Dyer Debate) হইয়া গেল। কিন্তু কি হইল? কি তাহাতে আমরা বুঝিলাম? কি সান্ত্বনাই বা পাইলাম! মণ্টেগু সাহেব বড় গলা করিয়া বড় একটা বক্তৃতা করিলেন। কিন্তু কথায় ত চিঁড়া ভিজে না! কাজে কি হইল? শত শত নিরস্ত্র প্রজার হত্যা,—কে অপরাধী কে নিরপরাধ, কার অপরাধের কি গুরুত্ব, কোনও বিচার না করিয়া প্রজার উপরে সেই লাঞ্ছনা ও অপমান—যা মানুষে সহিতে পারে না—কোনও দেশের রাজপুরুষ যে সাহস করিয়া করিতে পারে, ইহাই আমাদের ধারণা ছিল না। ডায়ার প্রমুখ সেনানীগণ তাহা ত করিলই, পরন্তু আবার বেপরোয়া ভাবে দম্ভে তার বর্ণনা করিয়া বাহাদুরী করিল, যা করিয়াছি বেশ করিয়াছি! এদেশের এই লোকগুলার প্রতি এমন ব্যবহারই করিতে হয়। রাজপুরুষের হাতে দুর্ভাগ্য প্রজার এই যে হত্যা, এই যে অসহনীয় লাঞ্ছনা ও অপমান, এই যে পশুর অধিক শাস্তি হইল,—কেন? কি তার অপরাধ? তার সকল আপত্তি সকল প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া যে রাউলাট আইন পাশ হইল, তার দরুণ অসন্তোষের উত্তেজনায় কেহ কেহ দাঙ্গা হাঙ্গামা করিয়াছিল,—আর তাহাতে কতিপয় শ্বেতাঙ্গ নিহত ও লাঞ্ছিত হয়। এই দাঙ্গা হাঙ্গামা যে রাজবিদ্রোহ নয়, রাজবিদ্রোহের কোনও ষড়যন্ত্র বা অভিসন্ধিও ইহার মূলে ছিল না, সাময়িক উত্তেজনায় এই অত্যাহিত কাণ্ড ঘটে, একথা শাস্তিদাতা ডায়ার প্রমুখ সেনানীদের জবানবন্দীতেই শেষে প্রকাশ হইয়াছে। তদন্তের জন্য যে হাণ্টার কমিটি নিযুক্ত হয়, তাহার নামও গবর্মেণ্ট করেন—পাঞ্জাবী দাঙ্গা বা শান্তিভঙ্গের অনুসন্ধান কমিটি, বিদ্রোহের নয়। এরূপ দাঙ্গা সৈন্য সজ্জার প্রদর্শনে অথবা দুই চারিটা ফাঁকা আওয়াজে বা পাকা গুলিতেই ঠাণ্ডা হইয়া যায়। তার পর পুলিস আছে, আদালত আছে,—অপরাধীদের ধরিয়া যথোচিত দণ্ডের ব্যবস্থাও হইতে পারে। আর তাহাও ত শেষে হইয়াছিল।—দণ্ডও বড় কম হয় নাই, দণ্ডবিধির দাবী তাহাতে চৌষট্টি আনা আদায় করা হইয়াছিল,—করুণা একটি কণাও প্রকাশ পায় নাই। বলিবে, মার্শিয়াল ল'র রকমই এই। কিন্তু জালিয়ান ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড মারশিয়াল ল জারি হইবার আগেই ঘটিয়াছিল। তার পর নিরস্ত্র প্রজা যেখানে হুমকি দিলেই ভয়ে নিরস্ত হয়, সেখানে মার্শিয়াল ল'রই বা এত বাড়াবাড়ি কেন হইল? স্থায়ী বিধি ব্যবস্থা অনুসারে মামুলী ধরণের বিচারে সময় লাগে, বড় দাঙ্গা হাঙ্গামা ও শান্তিভঙ্গ ঘটিলে, তার আশু প্রতিকার দুঃসাধ্য হয়, তাই এরূপ স্থলে কখনও কখনও মারশিয়াল ল' জারি করিয়া, তার সামরিক আদালতে সরাসরি বিচারের আবশ্যক হয়। ভাল প্রমাণ না পাইলেও সন্দেহভাজনকেও দণ্ড দেওয়া হয়,—দণ্ডের মাত্রাও অপেক্ষাকৃত কঠিন হয়। কিন্তু তার জন্য সকল শ্রেণীর লোকের উপরে এরূপ বর্ব্বরোচিত লাঞ্ছনার প্রয়োজন কিছুই হয় না! যেখানে সেখানে গুলি করিয়া লোক মারিতে হয় না, ছাত্রাবাসের উপরে বোমা ফেলিতে হয় না, প্রখর গ্রীষ্মের রৌদ্রে বালকদের প্রত্যহ ষোল সতর মাইল পথ হাটাইতে হয় না, মানুষকে পশুর ন্যায় খাঁচায় পুরিয়া রাখিতে হয় না, চারি-হাতে-পায়ে বিড়াল কুকুরের মত চালাইতে হয় না,—আর, সকলের উপরে পাশব অত্যাচারের চূড়ান্ত—কুলনারীদের ঘোমটা তুলিয়া মুখে থুথু ফেলিতে হয় না, উলঙ্গ করিয়া—নাম করা যায় না এমন লাঞ্ছনা তাদের করিতে হয় না! কংগ্রেসের অনুসন্ধান-কমিটির সম্মুখে পর্দ্দানশীন নারীরা যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহা পড়িলে—হায়, আমরা পশুর অধম হইয়া আছি, তাই সহিতেছি, নতুবা মানুষের রক্ত যার দেহে আছে, মায়ের সন্তান যে, সে সহিতে পারে না! সেকালের বর্ব্বর বিজয়ী যোদ্ধারা শত্রুর দেশে এইরূপ সব অত্যাচার নাকি করিয়াছেন, ইতিহাসে পড়িয়া থাকি। কিন্তু আধুনিক সভ্যতাগর্ব্বিত কোনও জাতির রাজপুরুষগণ প্রজার কুলনারীদের টানিয়া ঘরের বাহির করিয়া এরূপ বীভৎস অত্যাচার করিতে পারে, ইহা মনেও কখনও করিতে পারি নাই? নারীর ইজ্জতের বড় দরদ ভারতের হিন্দু মুসলমান করে। সেই

খানে এত বড় আঘাত প্রজা হইয়া রাজপুরুষের কাছে তারা পাইয়াছে। ইহাও কি সহিবার মত ব্যথা? এ আগুন কি কথায় নিভিবার আগুন? আর সেই কথাই বা কোথায়? কেহ কেহ বলেন, যাহা হইয়াছে ভুলিয়া যাও! লর্ড সিংহও সেদিন পার্লামেণ্টে বলিয়াছেন, উভয় পক্ষই এখন এই আন্দোলন ছাড়িয়া না দিলে, ভারতে ভীষণ জাতিবৈরের সৃষ্টি হইবে।—ইংলিসম্যানও এই আন্দোলনের প্রারম্ভে একবার এই সুর তুলিয়াছিলেন। কিন্তু তাদের ছাড়িবার কি ভুলিবার কি আছে? ভারতবাসী উত্তেজনার বশে যে একটু অত্যাচার তাহাদের উপরে করিয়াছিল, হাজার হাজার গুণ সুদে সে দেনা শোধ হইয়াছে। কিন্তু আমরা কি ভুলিতে পারি? প্রতিকার করিতে পারি না সত্য, কিন্তু ভুলিতে কি পারি? জালিয়ানওয়ালাবাগের লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড—তাও কি ভুলিবার কথা? তাও যদি ভোলা সম্ভব হয়, আমাদের কুলনারী—আমাদের মাতাভগিনীদিগের প্রতি গুজরান-ওয়ালায় বস্‌ওয়েল স্মিথের সেই বীভৎস পাশব অত্যাচার, তা যে আগুনের মত মন ভরিয়া জ্বলিতেছে। যতই অধম আজ তাঁহারা আমাদের মনে করুন, ভারতবাসী আমরা আমাদের মাতৃজাতির এ অপমান ত ভুলিতে পারি না! আর কাহারও কাছে ইহার বিচার না পাই, বিশ্ববিধাতার সমীপে আর্ত্তকণ্ঠে বেদনাময় এ অভিযোগ না জানাইয়া পারি না।—

আর এ ভোলাভুলি, ছাড়াছাড়ির কথাই বা কেন? আমরা ভুলি না ভুলি, ছাড়ি না ছাড়ি, কি আইসে যায় ইঁহাদের তাতে?—কি কেয়ার তাহারা আমাদের করে? হাজার আমরা চেঁচাই, হাজার মাথা খুঁড়িয়া মরি, তারা বেশ জানে, একগাছি কেশও তাহাদের ছিঁড়িতে পারি, এমন একটু ক্ষমতা আমাদের নাই। তাই না এই হত্যাকাণ্ড, এই অত্যাচার, এই লাঞ্ছনা অপমান করিয়াও ডায়ার প্রমুখ সেনানীরা আবার দম্ভে তার বড়াই করিতে পারিয়াছে! তাই না বস্‌ওয়েল স্মিথ, ফ্রাঙ্ক জনসন্ প্রভৃতি অন্যান্য সেনানীদের কথা একেবারেই চাপা পড়িয়াও এক ডায়ারের যে নামমাত্র শাস্তি হইল,—তার জন্য ভারতের শেতাঙ্গসমাজ অ-সমুদ্র-হিমাচল সমগ্র দেশ কম্পিত করিয়া তুলিয়াছে। এই ভারতেই আবার ডায়ারের বীরত্বের স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠা জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে!

এক পাদ্রিদের প্রতিবাদধ্বনি একটা উঠিয়াছে ক্ষমা ও দীনতার অবতার যিশুখৃষ্টের ধর্ম্মের বাহক হই[illegible] এটুকু তাঁহারা না করিয়া পারেন না,—তাই করিয়াছেন ইহার সমর্থন করিলে কোন্ মুখে আর তাঁহারা ভারত-বাসীর নিকট যিশুর ধর্ম্মের কথা লইয়া উপস্থিত হইবেন তাই করিয়াছেন। নতুবা কি করিতেন কে জানে?

ডায়ারী বীরত্বের এই সমর্থন, ডায়ারের পক্ষে এ[illegible] ডঙ্কাবাদন, বেসরকারী ইংরেজ সমাজ এতদি[illegible] করিতেছিল, তাও যা হ'ক একরকম ছিল। তাহা[illegible] ভারতের কালা আদমীকে মানুষের মতই দেখে না, তা [illegible] দেখে না, তাহারই একটা পরিচয় ইহাতে দিয়াছে,—বে[illegible] করিয়াছে, তাঁহাদের সভ্যতার মোহে অন্ধ আমাদে[illegible] চক্ষু খুব শক্ত খোঁচা দিয়াই ফুটাইয়া দিয়াছে,—যদি ফুটিবা[illegible] মত চক্ষু আমাদের এখনও থাকে। কিন্তু সরকার স্বয়ং [illegible] সরকার ত একথা বলিতে পারেন না, কখন বলেনও না,—"ভারতবাসী, তোমাদের আমরা মানুষ বলিয়াই মনে করি না।" সরকারের আইনেও ভারতীয় ও বৃটিশপ্রজার সমা[illegible] অপরাধে সমান দণ্ডের ব্যবস্থাই সব রহিয়াছে। সে[illegible] সরকারইবা কি করিলেন?—সরকারের বড় কর্ত্তা বৃটি[illegible] পার্লামেণ্ট—সেই পার্লামেণ্টে সম্প্রতি ডায়ার ডিবেট হইয়া গেল।—কি দেখিলাম, কি বুঝিলাম তাহাতে?

'মার্শিয়াল ল' জারি করিয়া যে সব সেনানীর হাতে তাহা চালাইবার ভার দেওয়া হয়, সকলেই অনাবশ্যক অশেষ লাঞ্ছনা, অশেষ অত্যাচার হতভাগ্য পাঞ্জাব-বাসীদেরও উপরে করিয়াছেন, আর সকলের কথাই চাপা পড়িয়া রহিল, এক জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডে[illegible] নায়ক ডায়ারের কথা উঠিল। Army Council এই অপরাধে ডায়ারকে এইদণ্ড মাত্র দিলেন যে, ডায়ার সৈনিক-বিভাগে আর কাজ করিতে পারিবেনা। তাহাও ডায়ারের শাপে বর হইল।—বেসরকারী শ্বেতাঙ্গসমাজে সহস্রকণ্ঠে ডায়ারের বীরত্বমহিমার স্তুতিগান হইতেছে।—ডায়ারের জন্য চাঁদা উঠিতেছে,—চাকরীতে যে আয় তাহার হইত, হয় ত বিনাশ্রমে তার বেশী সম্পদ ডায়ার এখন ভোগ

করিবে, আরও স্ব-সমাজে সকলে তাকে মাথায় করিয়া নাচিবে।—যাহা হউক, বেসরকারী শ্বেতাঙ্গসমাজের কোনও অভিমত বা কার্য্যের জন্য সরকার কিছু দায়ী নন। কিন্তু সরকার নিজে কি করিলেন?—Army Councilএর এই দণ্ডের কথা লইয়া পার্লামেণ্টে আন্দোলন হইল। কমন্স সভায় কোনও মতে ভারতসচিব মণ্টেগু সাহেব শাসনকর্তৃত্বের মান রাখিয়াছেন। কিন্তু বড় কড়া গালি তাঁহাকে খাইতে হইয়াছে। তাঁহার পদত্যাগের জন্যও জোর দাবী হইতেছে।—তাহাই শেষে হইবে কিনা কে জানে! তাহা হইলেই ষোলকলা পূর্ণ হয়।

তার পর সেদিন লর্ডসভায় এ সম্বন্ধে আন্দোলন হয়।—তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্মানুবাদ বাঙ্গালী পত্রিকা হইতে শেষে আমরা তুলিয়া দিলাম।—লর্ডসভা মন্তব্য করিয়াছেন,—ডায়ার বেশ করিয়াছেন,—তাঁহার এই দণ্ড অন্যায় হইয়াছে! ইহার পর আর টিকা টিপ্পনী নিষ্প্রয়োজন।

মহাজেরিণ হত্যাকাণ্ড

ডায়ারী আন্দোলনের আগুণ জ্বলিতেছে—তার সঙ্গেই, মহাজেরিণ হত্যার অভিনয়টা হইয়া গেল। যে সংবাদ তার বাহির হইয়াছে, 'নবযুগ' পত্রিকা হইতে তার বিবরণ আমরা নিম্নে তুলিয়া দিলাম। ইহার তদন্তের জন্যও নাকি সরকারী কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে। পুলিশ আছে, আইন আদালত আছে, ইহারও কি বিচার হইতে পারে না? এ ঘটনা ত "মারশিয়াল ল"র আমলে হয় নাই!—কমিশন ইহার কি তদন্ত করিবে? তদন্তের পরেই বা কি হইবে? সামান্য কিছু দণ্ডের বিধানও যদি হয়, শ্বেতাঙ্গসমাজ কি উচ্চকণ্ঠে আবার এই হত্যাকারী সৈনিকদের বীরত্ব-মহিমার তারিফ করিবেন আর তাহাদের জন্য চাঁদার খাতা খুলিবেন? দেখা যাক্, কি হয়।

মহাজেরিনদের উপর ইংরাজ সেনার পৈশাচিক বর্ব্বরতা।

("নবযুগ" হইতে উদ্ধৃত)

"পেশওয়ার খিলাফৎ কমিটি হইতে মহাজেরিনদের বীভৎস হত্যাকাণ্ড লইয়া যে রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে, তাহা লাহোরের ১৭ই জুলাইয়ের এক সভায় মৌলবী জাফর আলি খান কর্ত্তৃক পঠিত হয়। ঐ রিপোর্ট ১৮ই জুলাই-এর "ট্রিবিউন" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে তাহার অনুবাদ দেওয়া গেল। পাঠক একবার ধৈর্য্য ধরিয়া পড়ুন আর দেখুন এ বীভৎস নরহত্যার কথায় মানুষের রক্ত হিম হইয়া জমিয়া যায় কিনা!

গত ৮ই জুলাই বৃহস্পতিবার একদল মহাজেরিন ট্রেণে পেশোয়ার হইতে জমরুদ যাত্রা করে। সেই সময় রাস্তায় এক নির্লজ্জ নির্ম্মম, হৃদয়-বিদারক ঘটনা ঘটে। যে ট্রেণে মহাজেরিনগণ যাইতেছিল, সেই ট্রেণে দুইজন ইংরেজ সৈনিক, একজন সেনানী এবং একজন অপ্রাপ্তভার সেনানীও ছিল। এই নরপশুগণ সেই ট্রেণে স্ত্রীলোকের কামরার সামনে গিয়া মহিলাদের প্রতি নির্লজ্জ দৃষ্টি দিয়া কটমট করিয়া চাহিতে থাকে। ইসলামিয়া কলেজ নামক রেলওয়ে ষ্টেসনে তাহারা টিকিট চেক করিবার ভাণ করিয়া মহিলা কামরায় উঠিয়া পড়ে এবং নানান্ ইতরামি করিয়া মহিলাবর্গকে সন্ত্রস্ত ও অপমানিত করিতে থাকে। পেশোয়ার জেলার টঙ্গিগ্রামের হাবিবুল্লাখান নামক একজন সাহসী বলবান পুরুষ তখন সৈনিকদিগকে তাহাদের এই নির্লজ্জ পশুত্ব হইতে নিবৃত্ত হইতে বলে। সে বলে যে এই কামরায় মহাজেরিনদিগের স্ত্রী কন্যা রহিয়াছেন; অতঃপর সে তাহাদিগকে কামরা হইতে বাহির হইয়া আসিতে বলে। ইহাতে গোলমাল উপস্থিত হয় এবং অস্ত্র না থাকায় দুই দলের মধ্যে ঢিল ছুড়াছুড়ি হইতে থাকে। আর একজন মহাজেরিন বন্ধুর সাহায্যার্থ নামিয়া আসিলে সৈনিকগণ ভয় পাইয়া তাহাদের নিজের কামরায় গিয়া প্রবেশ করে। এই হাঙ্গামায় কোন পক্ষেরই কেহ কোন আঘাত প্রাপ্ত হয় নাই। যাহাতে মহিলাদিগের প্রতি এই রকম আর কোন কিছু অন্যায় পীড়ন না হয়, সেইজন্য মহাজের হাবিবুল্লা খান ঐ মহিলা কামরাতেই গিয়া বসে। ট্রেণ কাচা-গারিতে আসিয়া উপস্থিত হয়, এখানে ঐ বৃটিশ সৈন্যগণ (বোধ হয় তাহাদিগের গোরার প্রতি কালা হিন্দুস্থানীর এই রকম অসম্মান-জনক ব্যবহারে ক্রোধে ও প্রতিহিংসায় অগ্নিশর্ম্মা হইয়া) তাহাদিগের ছাউনিতে গিয়া উপস্থিত হয় এবং একদল সশস্ত্র রাইফেল ধারী ভারতীয় সেনা আনিয়া ট্রেণখানি ঘিরিয়া ফেলে। ইহার পরেই ব্রিটিশ সেনানী কর্ত্তৃক চালিত হইয়া আর একটী সশস্ত্র

রাইফেলধারী সেনাদল আসিয়া উপস্থিত হয় এবং মহাজের হাবিবুল্লা খানের খোঁজ করিতে থাকে। তাহাকে দেখিতে পাওয়া যাইবামাত্র তরবারি এবং বেয়নেটের খোঁচা তাহার দিকে ফিরাইয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ ট্রেণ হইতে অবতরণ করিতে বলা হয়। সে গাড়ীর বাহিরে পা রাখিবামাত্র ঐ ব্রিটিশ সেনানী এবং সৈনিকগণ উপর্য্যুপরি তরবারি ও বেয়নেটের খোঁচা দিয়া এই নিরস্ত্র হতভাগার শরীরে নির্ম্মমভাবে আঘাত করিতে থাকে। সে পুনরায় গাড়ীতে ঢুকিতে চাহিতেছিল, কিন্তু পৃষ্ঠদেশে ভয়ানক তরবারির ঘা খাইয়া ঐখানেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবার সময় সে তাহার সামনের প্লাটফর্ম্ম হইতে একখণ্ড প্রস্তর তুলিয়া তাহার হত্যাকারী এই কসাইএর ভিড়ের উপর নিক্ষেপ করে। এই নিরস্ত্র মুমূর্ষুর আততায়ীকে আক্রমণ করিবার ইহাই শেষ উদ্যম।

এই ব্রিটিশ সেনানী তখন ভারতীয় সৈন্যগণকে এই মুমূর্ষুর প্রতি গুলিবর্ষণ করিতে হুকুম দেয়, কিন্তু একজন শয়তান ব্যতীত অপর কোন ভারতীয় সৈনিক এরূপ পশুত্বের অভিনয় করিতে স্বীকৃত হয় না। তাহারা বলে যে, একজন নিরস্ত্র, মৃত্যুমুখে পতিত হতভাগার প্রতি গুলিবর্ষণ করা বীরের ধর্ম্ম নয়। তাহারা ত আর গোরাদের মত মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দেয় নাই, হৃদয় হারায় নাই! তাহারা যে ভারতবাসী!

ইহা দেখিয়া জিঘাংসাবৃত্তি পরায়ণ ইংরেজ সৈনিকগণ ভারতীয় সৈনিকগণের নিকট হইতে রাইফেল কাড়িয়া লইয়া উপুড় হইয়া পতিত মুমূর্ষু এই হতভাগা হাবিবুল্লার উপর হাসিতে হাসিতে উপর্য্যুপরি গুলি বর্ষণ করিতে থাকে এবং এক মুহূর্ত্তে হাবিবুল্লার প্রাণ-পাখী দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া চলিয়া যায়—সেই মুক্ত দেশে, যেখানে অত্যাচার নাই—জুলুম নাই! যেখানে—সে মহা-সিংহাসনের তলে আর ইংরেজের গুলি যাইতে পারে না! মৃত্যুর সময় তাহার শিয়রে দাঁড়াইয়া তাহার সাতবৎসর বয়স্কা কন্যা কাঁদিতেছিল, আর সে সেই কান্না দেখিয়া অতি-কষ্টে তাহার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে! তাহার প্রাণ-প্রিয়তমা কন্যাকে শিয়রে দাঁড় করাইয়া শুধু হত্যা করিয়াই ইহাদের ক্রোধ মিটে নাই, প্রেত পিশাচের মত সেই মৃতদেহে বেয়নেট ও তরবারির খোঁচা মারিয়া মারিয়া তাহা ঝাঁঝরার মত করিয়া ফেলে। তাহাদের সেনানী নিজে ঐ শহীদের বুকের উপর বসিয়া তাহার গর্দ্দানে নিষ্ঠুরভাবে তরবারি চালাইয়া কচ্‌লাইয়া কচ্‌লাইয়া কাটিয়া দেয়! ইত্যবসরে আর একজন মহাজেরিন আর সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণের আবেগে গাড়ী হইতে ঝাঁপাইয়া পড়ে, কিন্তু তাহাকে তৎক্ষণাৎ বেয়নেট ও তলওয়ারের আঘাতে ভূমিশায়ী করা হয়। এবারেও একজন ব্রিটিশ সৈনিক তাহার বুকে হাঁটু গাড়িয়া বসে এবং তাহার গলায় খঞ্জর বসাইয়া দেয়। সকলের চোখের সাম্‌নে এই জবেহ্-করা ধড়্ নিষ্করুণভাবে তড়্‌পাইতে থাকে! জীবন্ত সঙ্গীদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এইরূপ পৈশাচিকভাবে চোখের সাম্‌নে ছেদিত, কর্ত্তিত ও বি[illegible] হইতেছে দেখিয়া অন্যান্য মহাজেরিনগণ ভয়ে গাড়ীর ভিতর লুকাইয়া থাকে। হাবিবুল্লা খান এবং তাহার সাথী[illegible] ছিন্নবিচ্ছিন্নদেহ প্রখর রৌদ্রে টানিয়া আনিয়া ফেলিয়া রা[illegible] হয় এবং বহুঘণ্টার জন্য সেখানে কাহাকেও যাইতে দেও[illegible] হয় না। যখন খিলাফৎ ও হিজরত কমিটি এই লোমহ[র্ষণ] বর্ব্বরতা ও হত্যাকাণ্ডের খবর পায়, তখন ইহার অনে[ক] মেম্বর তৎক্ষণাৎ মোটরে করিয়া ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থি[ত] হন। কিন্তু তাঁহাদিগকে এই দুর্ব্বৃত্তেরা মৃত ও আ[হত] মহাজেরগণের দেহের নিকট যাইতে দেয় না। আ[হত] হতভাগ্যকে পরে অতি কষ্টে উদ্ধার করিয়া ট্রেনে পেশো[য়া]রে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

ডাক্তারী পরীক্ষায় দেখা যায় যে হাবিবুল্লার শরী[রে] পনরটি গভীর আঘাত, তন্মধ্যে নয়টি তরবারির ও বেয়[নে]টের এবং ছয়টি গুলির। এই নয়টি তরবারির ও বেয়নে[টের] ঘা-এর মধ্যে চারিটি আঘাত ছিল সামনে এবং বাকী পাঁচ[টি] ছিল পিছন দিকে।

খিলাফৎ এবং হিজরত কমিটি এই কসাইকাণ্ডে[র] আরো অনুসন্ধান করিতেছেন। পরে এই ঘটনা সম্ব[ন্ধে] অনেক কথা জানাইতে পারিবেন।

হাবিবুল্লার লাশ পেশোয়ারে পাঠাইবার পূর্ব্বে হাজ[ার] হাজার লোক এই ভীষণ হত্যাকাণ্ডের কথা শুনি[য়া] একেবারে ক্ষেপিয়া উঠে এবং উন্মাদের মত ছুটাছুটি করি[তে] থাকে। সে উত্তেজনার বর্ণনা করা যায় না।

খিলাফৎ এবং হিজরত কমিটি তাহাদের স্বেচ্ছাসেবক[দি]গকে লইয়া অতি কষ্টে লোকদিগকে কথঞ্চিৎ শান্ত করি[য়া]

পারে। যখন লাশ আসিয়া পুলিশ হাঁসপাতালে পঁহুছে, তখন অসংখ্য লোক সেখানে আসিয়া সমবেত হয় এবং হিজরৎ কমিটির আফিস পর্য্যন্ত লাশকে ঘিরিয়া হায় হায় করিতে করিতে লইয়া যায়। সে সময় এই সহস্র সহস্র লোকের বুক-ফাটা আর্ত্তনাদ আর অত্যাচারের জুলুমের বিরুদ্ধে মর্ম্মভেদী কণ্ঠের ব্যাকুল উচ্ছাস সমস্ত আকাশ বাতাসকে কাঁপাইয়া তুলিয়াছিল! মনে হইল, না, হাবিবুল্লা মরে নাই। সে মরিয়াও যে এই তাহার হাজার হাজার দেশবাসীকে কাঁদাইতে, জাগাইতে পারিয়াছে, ইহাই তাহার হতভাগ্য জীবনের সার্থকতা। ইহাই তাহার অত দুঃখ কষ্টের বিনিময়ে প্রাপ্য মঙ্গল,—ইহাই তাহাকে অমর করিবে।

পরদিন সহরে এক পূর্ণ হরতাল করা হয় এবং প্রায় আট হাজার হিন্দু-মুসলমান গলাগলি করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে এই শহীদের গোর দিবার জন্য নাঙ্গাপায়ে নাঙ্গা শিরে গোরস্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। সমস্ত সহর যেন এক গভীর বিষাদে নিমগ্ন করিবার মত মৌন স্তব্ধ হইয়া খাড়া হইয়াছিল এবং আবাল-বৃদ্ধবনিতা গত হতভাগাদের জন্য কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়াছিল! সন্ধ্যায় শাহীবাগের মুক্ত মাঠে এক বিরাট সভার আহ্বান করা হয়। এখানে এই মুক্তমাঠে মৌন সাঁঝের ম্লান বুকে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া, বিগত বীরের প্রতি সম্মান ও শোক প্রদর্শন করা হয় এবং ইংরাজ সেনা যে অমানুষিক কাণ্ড করিয়াছে সেই নৃশংসতার ঘোর প্রতিবাদ করা হয় এবং যাহাতে এই হত্যার বিচার রীতিমত কোর্ট বসাইয়া হয় তাহার জন্য জোর করিয়া বলা হয়। মিলিটারী বিচারের প্রতি তাহাদের বিন্দুমাত্র আস্থা নাই।

মৌলবী আবদুল গফুর, লালা আমীর এবং সর্দ্দার সিং অগ্নিময় বক্তৃতা দিয়া লোককে মাতাইয়া তুলেন। তাহার পর যখন হবিবুল্লার সেই এতিম শিশুকন্যাকে প্লাটফর্ম্মে আনিয়া খাড়া করা হইল তখন উপস্থিত জনমণ্ডলী হাহাকার আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, সে কান্না বোধ হয় খোদার আরশ পর্য্যন্ত গিয়া পঁহুছিয়াছে! মা ভগিনীদিগের আবরু রক্ষার জন্য এমন করিয়া মারিতে মারিতে মরিয়াছে বলিয়া হাবিবুল্লাকে জন্মভূমির "বীর ফরজন্দ" বলিয়া সর্দ্দার সিং অভিহিত করেন এবং জীবন বলিদানের বিনিময়ে আজ আমরা হিন্দুমুসলমান যাহাতে এক হইয়া ভাইএর জন্য ভাইএর বুক বাড়াইয়া দিই এই কথা করুণ উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষায় বুঝাইয়া দিয়া প্রার্থনা করেন! "আমরাও সেই প্রার্থনায় যোগ দিয়া অশ্রুভরা চোখে বলিতেছি, আমিন!"

কোরিয়েল বাগিচার বিচার

("বাঙ্গালী" হইতে উদ্ধৃত)

"কোরিয়েল বাগিচার গুলির মামলা শেষ হইয়াছে। জনসাধারণ যাহা ভাবিয়াছিল তাহাই ঘটিয়াছে। কাছাড়ের ডিপুটি কমিশনার এবং ৫জন ইংরেজ জুরীর বিচারে আসামী রীড বেকসুর খালাস পাইয়াছে। বাদীপক্ষের মোকদ্দমা ছিল এই যে ১৮ই তারিখে যখন বাদীর কন্যা হীরা 'চা পাতি' উঠাইতেছিল তখন আসামী রীড তাহার নিকট কুপ্রস্তাব করে, হীরা তাহাতে সম্মত হয় নাই। রাত্রিকালে রীড হীরার বাড়ীতে যায় এবং হীরাকে তাহার নিকট সমর্পণ করিতে হীরার পিতামাতাকে অনুরোধ করে। তাহারাও এ প্রস্তাবে অসম্মত হয়। এই ঘটনার একসপ্তাহ পরে রাত্রিকালে রীড আবার তাহাদের বাড়ী গিয়া হীরাকে ডাকিতে থাকে এবং নিজের বাংলায় লইয়া যাইতে চায়। ইহাতে ভয় পাইয়া উহারা চীৎকার করিয়া উঠায় আসামী রিভলবার ছুঁড়িতে থাকে এবং হীরার পিতা গঙ্গাধরকে আহত করে। আসামীপক্ষ হইতে ইহার জবাব স্বরূপ যে গল্প বলা হইয়াছে তাহা চিরকালের পদ্ধতি হইতে একটু স্বতন্ত্র। আসাম প্রদেশে ম্যালেরিয়া এবং ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া যাওয়ায় (স্বাস্থ্য বিবরণী দ্রষ্টব্য) আজকাল প্লীহাগুলি আপনা হইতে অকস্মাৎ ফাটিয়া যাওয়ার মত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবার বহু পূর্ব্বেই হতভাগ্যেরা মানবলীলা সংবরণ করিয়া বসে। মৃত্যুহারও ভয়ানক রকমে বাড়িয়া যাওয়ায় দেশ ক্রমে ক্রমে অরণ্যে পরিণত হইতেছে। এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া আসামী পক্ষ বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন—একদা নিশীথকালে (প্রায় দশ ঘটিকার সময়) মিঃ রীড রিভলবার হস্তে লইয়া ভীষণ অরণ্যে মৃগয়া-যাত্রায় বহির্গত হইলেন। মৃগয়া শেষ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন কালে অরণ্যানীর ভিতর পথভ্রষ্ট হইয়া হঠাৎ একটি রাস্তা পাইয়াই উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—

"হিয়ার রোড হায়" (Here road Hai)—এইখানে রাস্তার নিকটেই গদাধর প্রভৃতি কুলিরা বাস করিত। হতভাগ্য নির্ব্বোধ কুলিরা ভাবিল যে সাহেব হীরাকেই আহ্বান করিতেছেন, আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ভয় পাইয়া আত্মরক্ষার্থ সাহেব ভূমি লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িলেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে ধরিত্রীদেবী তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া এত লোকের মধ্যে ঠিক হীরার পিতা গঙ্গাধরের পেটেই সে গুলি ফিরাইয়া দিলেন। বিচারক এবং ইংরেজ জুরীগণ এই কথাই বিশ্বাস করিয়া আসামীকে বেকসুর খালাস দিয়াছেন। দুঃখের বিষয় নির্দ্দোষ সাহেবকে নিরর্থক কষ্ট দেওয়ার জন্য ক্ষতিপূরণ স্বরূপ গঙ্গাধরের ৬৪৲টাকা জরিমানা হয় নাই। ছিঃ! ছিঃ! গঙ্গাধর। তুমি নালিশ করিতে গেলে কেন?—

সাহেব যদি ভূমির পরে গুলিই একটা মারেন বেগে,
তোর তো আস্পর্দ্ধা ভারি, তোর যে সেটা পেটে লাগে।
বরং তোমার উচিত বলা—ওরে কুলি, ওরে "কালা"
"ভূমিতে না মেরে প্রভু! মারুন আমার শিরোভাগে।"

—"জনশক্তি"

ইহা নিত্যকার একটি ঘটনা।—কত ভারতবাসী শ্বেতাঙ্গের গুলিতে, লাথিতে মরিতেছে,—বিচারের অভিনয়ও একটা হইয়া থাকে। কোথাও দোষ গিয়া পড়ে ভারতবাসীর প্লীহার, কোথাও বা দুর্দ্দান্ত ভারতবাসীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য শ্বেতাঙ্গের গুলি চালাইতে হয়।—কোথাও বা খুনের সময় শ্বেতাঙ্গ উন্মাদরোগে আক্রান্ত হয়,—আরও কত কি হয়?—বেকসুর খালাসই অনেক আসামী পায়,—দণ্ড যেখানে হয়, সামান্য জরিমানা,—যাহা ধনী শ্বেতাঙ্গের গায়েও লাগে না। কিন্তু এই কোরিয়াল চা বাগানের গুলিমারায় যে ছুঁতা দেখান হইয়াছে, আর তাহাতে যে আসামী বেকসুর খালাস পাইল, তার তুলনা আর হয় না।—এই আন্দোলনের মুখে এই ঘটনা আর এই বিচার প্রহসন আরও বিসদৃশ হইয়াছে!—এইরূপ কোন কোনও বিচার বিভ্রাটে সরকার বাদী হইয়া পুনর্ব্বিচারের ব্যবস্থা করিয়াছেন।—এ সময়ে এত বড় একটা বিচার বিভ্রাট কি একেবারেই উপেক্ষা করিবেন?

গতি কি?

পাঞ্জাবে যা হইয়াছিল, অতদূর অত্যাচার যে প্রজার উপরে হইতে পারে এটা সত্যই আমরা মনে করি নাই। কয়েক মাস পূর্ব্বেও পাঞ্জাবের লক্ষ লক্ষ সেনা সমরক্ষেত্রে দেহের শোণিত পাত করিতেছিল,—এসিয়ায় বৃটিশ শক্তি প্রধানতঃ পাঞ্জাবীর বাহুবলেই রক্ষিত হইয়াছিল, যুদ্ধের জন্য অর্থদানও পাঞ্জাব কম করে নাই। সেই পাঞ্জাবে সহসা বিদ্রোহের ছুঁতায় নরনারী বালক সকলের উপরে এত বড় একটা বীভৎস অত্যাচার যে রাজপুরুষেরই আদেশে বা ইঙ্গিতে রাজপুরুষদের দ্বারা হইতে পারে, ইহা কেই বা মনে করিতে পারে? গলার বিচি নামিয়া গেলেও মানুষ কি এই ঋণ এত সহজে ভুলিয়া যাইতে পারে?—তাই এতটা হইতে পারে, তাহা বাস্তবিক স্বপ্নেও কখনও ভাবি নাই। কিন্তু যখন হইল, যখন ডায়ার প্রভৃতি সেনানীদের দাম্ভিক উক্তির কথা সব পড়িলাম, বড় বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। তাই ত! এতদূরও হইল! হইতে পারে! তবে ইহাও বুঝিয়াছিলাম প্রতিকার ইহার কিছু হইবে না। তাই যদি হইবে, এমন ঘটনাই কি সম্ভব হইত? ডায়ার উচ্চপদস্থ সেনানায়ক, কৃতকর্ম্মের দায়িত্ব কি ফলাফল বোঝে নাই এমন হইতেই পারে না। এত বড় অত্যাচারের যোগ্য দণ্ড পাইতে হইবে, যদি তারা তা জানিত, এমন সাহসই তাদের হইত না।—সাময়িক উত্তেজনার এরূপ অত্যাহিত কাণ্ড একটা করিয়া ফেলিলেও কয় মাস পরে সরকারী কমিশনের সম্মুখে এরূপ দম্ভ করিয়াও তার বাহাদুরী করিতে পারিত না। তাই হাণ্টার কমিটির মেজরিটি রিপোর্ট পড়িয়াও বিস্মিত হই নাই, একমাত্র ডায়ারের এই লঘুদণ্ডেও বিস্মিত হই নাই। তবে কি বলিতে হইবে গবর্ণমেন্টের ন্যায়বিচার নাই? কিন্তু গবর্ণমেন্ট আমাদের কে? গবর্ণমেন্ট theoryতে বা নামে impersonal অর্থাৎ ব্যক্তির অতীত একটা বস্তু হইলেও ব্যক্তি লইয়াই ত গবর্ণমেন্ট? এই ব্যক্তি একজন দুইজন নয়—সমগ্র ইংরেজ জাতি। সাক্ষাৎ ভাবে ইংরেজ রাজপুরুষদের হস্তে এই গবর্ণমেন্টের সকল দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব ন্যস্ত। দুই চারি জনের ন্যায়বুদ্ধি রাজধর্ম্মানুরাগ যতই প্রখর ও প্রবল হউক, জাতির বেশীর ভাগ লোক যে জুলুম করিবে, তার

বিরুদ্ধে তাঁহারা কি করিতে পারেন? বস্তুতঃ ইহারা ভারতের কালা আদমী আমাদের মানুষের মতই মনে করেন না। কেনই বা করিবেন?

সত্যই ত, মানুষের গুণ আমাদের মধ্যে কি আছে? তাই যদি থাকিবে, এমন একটা কাণ্ডই বা হইবে কেন? ভারতের শ্বেতাঙ্গ সমাজ এমন করিয়া ডায়ারের মহিমা কীর্ত্তন করিতে পারিবে কেন? এই ভারতের বক্ষে তার স্মৃতি চিহ্ন প্রতিষ্ঠাই বা করিতে উদ্‌যোগী হইবে কেন? ডায়ারকে এইটুকু দণ্ড মাত্র দিয়া পার্লামেন্টের কমন্স সভায় মণ্টেগু সাহেবকেই বা এতটা বেগ পাইতে হইবে কেন? লর্ড সভায় ডায়ারের কার্য্য সমর্থিতই বা কেন হইবে?

যদি মানুষ হইতাম, মানুষের মত শক্তিমান্ প্রজাকে রাজপক্ষ যে চক্ষে দেখেন, তা যদি দেখিতেন,—এমনটা হইত না। এই যে সেদিন মহাজেরিন হত্যাকাণ্ডটা হইয়া গেল—(যদি প্রকাশিত সংবাদ সত্য হয়)—,এই যে কোরিয়াল চা বাগানের ব্যাপার লইয়া এমন একটা বিচার প্রহসন হইয়া গেল,—এ সব ত অহরহই ঘটিতেছে,—কেন ঘটিতেছে?—কারণ, ভারত প্রবাসী শ্বেতাঙ্গমাত্রই জানে, ভারতের প্রজা পোকামাকড় মাত্র, তাদের মারিলে খোকড় হয়। একটি দৃষ্টান্তও যদি তারা এমন দেখিত, কালা প্রজাকে হত্যা করিয়া যোগ্য রাজদণ্ডে শাদা প্রজা দণ্ডিত হইল, এ সব ঘটনা কি এত ঘটিত? তাদের দোষ কি? সত্যই যে আমরা পোকামাকড়, কেন তারা মানুষের মত আমাদের মনে করিবে?

এদিকে খুব জোরে non-co-oparationএর আন্দোলন চলিতেছে! হায়, তাই করিবার মত শক্তি যদি ভারতীয় প্রজা আমাদের থাকিবে, তবে কি আর এই সব ঘটনা হয়? হইলেও তা এমন কাঁকাবাজির মত উড়িয়া যায়? না তা হইবার নহে।—আর আগে যে পাপে আমরা আজ মানুষের দেহ ধরিয়াও পশুর অধম হইয়া আছি,—অনেক প্রায়শ্চিত্তে তার ক্ষালন করিতে হইবে। এই যা সব হইতেছে, ইহাই আমাদের প্রায়শ্চিত্ত।—আরও অনেক এমন আঘাত সহিতে হইবে, অনেক এমন আগুণে পুড়িতে হইবে, তবে যদি এই পাপের ক্ষয় কখনও হয়, পাপের ফলে এই হীনতা আমাদের দূর হয়,—মনুষ্যত্ব কি যদি বুঝিতে পারি, তার গৌরব রক্ষার জন্ম সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারি।

আর কেন মা?

এই ত আমাদের দশা! হীনতার পঙ্কে কীটের মত ডুবিয়া আছি,—কীটের মত পদদলিত হইতেছি। তার উপরে আবার চারিদিক হইতে অশেষ দুঃখ আসিয়া আমাদের একেবারে যেন পিষিয়া ফেলিতেছে। আহার্য্য অগ্নিমূল্য, পরিধেয় দুর্লভ, রোগপীড়ার অন্ত নাই, দেশ ভরিয়া দরিদ্রের হাহাকার উঠিয়াছে। আবার সেদিন কাসাই নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া মেদিনীপুর অঞ্চল ভীষণ বন্যায় ডুবিয়া গিয়াছে! শত শত দুঃখী গৃহস্থপরিবার গৃহহীন সর্ব্বস্বহারা হইয়া বাঁধের রাস্তার উপরে আশ্রয় নিয়াছে। কে তাদের অন্ন দিবে? বস্ত্র দিয়া এতগুলি উলঙ্গ নর নারীর লজ্জা নিবারণ কে করিবে? এই বর্ষার জলে রুগ্ন, বৃদ্ধ ও শিশুদের লইয়া কোথায় তারা একটু মাথা বাঁচাইয়া দাঁড়াইবে। তন্ত্রে ভদ্রকালী দেবীর ধ্যানে পড়িয়াছি—

"ক্ষুৎক্ষামা কোটরাক্ষী মসিমলিনমুখী মুক্তকেশী রুদন্তী,
নাহং তৃপ্তা বদন্তী জগদখিলমিদং গ্রাসমেকং করোমি।"
ইত্যাদি।

হায়, মা—মহামায়া! এই ভদ্রকালীর রূপ ধরিয়া সত্যই কি তুমি এই অভিশপ্ত দেশে আবির্ভূতা হইয়াছ? তাই যদি হয় মা, তবে আর কেন? এক গ্রাসেই সব একেবারে গ্রহণ কর না মা? আজ তোমার এই গ্রাসকেই বড় দয়া বলিয়া আমরা গ্রহণ করিব! তোমার বিশ্বগ্রাসী উদর গর্ভে বড় শান্তিতে ঘুমাইব!

লর্ডসভায় ডায়ার তর্ক

(বাঙ্গালী হইতে উদ্ধৃত)

"লণ্ডন সহরের সোমবারের সংবাদে প্রকাশ ঐ দিবস পার্লামেন্টের লর্ড সভায় ডায়ারের সম্বন্ধে বিতর্ক উঠিবার কথা থাকায় লর্ড সভায় শ্বেত অভিজাতবর্গ জোড় জোড় বাঁধিয়া দলে দলে আসিয়া বসিয়াছিলেন। চারিদিক হইতে আসর জমকাইয়া উঠিয়াছিল। তখন মহামতি লর্ড ফিনলে ডায়ারের পক্ষ লইয়া প্রস্তাব তুলিলেন। তিনি প্রস্তাব করিলেন, জেনারেল ডায়ারের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হইয়াছে, এমন অবিচার করিলে এহেন অবিচার নজীর করিয়া রাখিলে ভবিষ্যতে বিদ্রোহের মত কোন কিছু ঘটিলে

তখন শান্তি প্রতিষ্ঠা করা বিপজ্জনক হইয়া পড়িবে। জেনারেল ডায়ার অমৃতসহরের লোকদিগকে সতর্ক না করিয়া গুলি চালাইয়া ঠিক কাজই করিয়াছিলেন, কারণ ভিড়ের লোকদের মতি গতি অত্যন্ত বেয়াড়া ছিল, এবং আশে পাশে চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহ এবং বিপ্লবের অগ্নিশিখা দাউদাউ করিয়া জ্বলিতেছিল। জেনারেল ডায়ার বীরের মত আপনার যোদ্ধার যে কর্ত্তব্য তাহা পালন করিয়াছেন, আর তাহার জন্য তাঁহাকে এমন অপদস্থ হইতে হইল কোন একটা বিচার হইল না! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি পূর্ব্বে এই নীতিরই উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, যখন কোন সেনানী তাহার কর্ত্তব্য পালন করিতেন তখন তাঁহাকে দেশের লোকেরা সমর্থন করিতেন। প্রত্যেক কর্ম্মচারীরই মনে এ বিশ্বাস দৃঢ় থাকিত যে, বিপদে পড়িয়া যতক্ষণ তিনি সাধু ভাবে তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিবেন, ততক্ষণ দেশের লোকদের সমর্থন হইতে তিনি বঞ্চিত হইবেন না। এই যে একটা প্রতীতি ইহা হৃদয়ে লইয়াই ত ইংরেজের কর্ম্মচারীরা কাজ করিয়া আসিতেছেন।

কিন্তু একি? আজ এ কাণ্ড কেন? ইংরেজ কর্ম্মচারীদের হৃদয় হইতে সেই বিশ্বাস যদি টলাইয়া দেওয়া হয় এবং যে যোদ্ধা তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছে, তাঁহাকে অপদস্থ করা হয় তবে কর্ম্মচারী মহলে যে কি একটা অসৎ ভাবের সৃষ্টি হইবে তাহা আর বলিয়া কহা যায় না। মিঃ মণ্টেগুর এই মত যে, জেনারেল ডায়ারের গোটা ভারতবর্ষের ভাবনা ভাবিতে যাইবার কোন দরকার ছিল না, কেবল অমৃতসরকে যাহাতে ঠাণ্ডা করা যায়, তাহা করিলেই তাঁহার কর্ত্তব্য পালিত হইত। এটা নিতান্ত ভুল কথা। অমৃতসরের বিদ্রোহটা—দূর বিস্তৃত বিদ্রোহেরই একটা অংশমাত্র। সুতরাং সমস্তটা জেলার উপর তিনি যে কাজ করিবেন তাহার ফলাফল কেমন হইবে সেটা বিবেচনা করিতে ডায়ার বাধ্য হইয়াছিলেন। হাণ্টারকমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে জানাইয়াছেন ভারতবর্ষে ইংরেজের বিরুদ্ধে যে একটা মতলব আটা ষড়যন্ত্র করা হইয়াছিল এপক্ষে পর্য্যাপ্ত প্রমাণ নাই। কিন্তু যে কোন ব্যক্তি হাণ্টার কমিটির সাক্ষ্যগুলি পড়িয়া দেখিবে, সেই অন্যরূপ সিদ্ধান্ত করিবে। অমৃতসর বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল ছিল। তথাকার অবস্থা বাস্তবিকই অত্যন্ত বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছিল। অমৃতসর শিখসম্প্রদায়ের পবিত্র তীর্থস্থান; অধিকন্তু এই নগরী রেল লাইনের এক সংযোগস্থল। যদি এই রেল লাইন কাটা যাইত তবে, আমরা আফগানদের সহিত উপযুক্ত ভাবে আটিয়া উঠিতে পারিতাম কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। জেনারেল ডায়ার অতি উপযুক্ত ব্যক্তি; তিনি অতীব মহানুভব, যেখানে কঠোর না হইলে নয়, তিনি তথায়ই কঠোরতা অবলম্বন করিয়া থাকেন, অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের প্রতি তাঁহার যেমন বিশ্রদ্ধা, এমন আর কাহারও আছে কি না সন্দেহ। জেনারেল ডায়ার অমৃতসরে অতি সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন। তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদিগকে যত রকমে পারেন সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। অস্ত্রধারণ না করিয়া যাহাতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে—এ চেষ্টায় তাঁহার কিছুমাত্র ত্রুটি হইয়াছিল না।

ইহার উপরও জেনারেল ডায়ারের গুলি করিবার আগে সতর্ক করিয়া দেওয়া উচিত ছিল এটা একটা বাজে কথা। গুলি চালাইবার আগে লোক যে জমিয়াছিল সে ত তাঁহার হুকুম নাকচ করিবার মতলবেই। মিঃ মণ্টেগু যে বলিয়াছেন সতর্ক করিতে ভুলিয়া যাওয়াটা অমার্জ্জনীয় ত্রুটি ইহা নিতান্ত অকেজো কথা। এমন সময়ে ইতঃস্ততঃ করিতে গেলে তাহার ফল ভাল ত হইতই না, বরং অনেক খারাপ হইত। হয়ত বিদ্রোহীদের উহা একটা সুবর্ণ সুযোগ হইয়া উঠিত, তাহাদিগকে আর দমন করা যাইত না। তার পর, গুলি চালাইবার কথা। জেনারেল ডায়ার বেশী কাল গুলি চালাইয়াছিলেন, ইহা ঠিক কথা নহে, তিনি নির্দ্দোষ নিরপরাধ লোকদের সঙ্গে খাতির করিতে গিয়াছিলেন না। গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ করিবার জন্য যাহারা সমবেত হইয়াছিল, তাহাদিগকে দমন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি সমস্ত দেশের কথা ভাবিয়া কাজ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। লর্ড ফিনলে বলেন, জেনারেল ডায়ারের কার্য্যের জন্য চারিদিক হইতে তাঁহার উপর ধন্যবাদের বর্ষণ হইতে থাকে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে উন্নীত করিয়াছেন, জগতের লোক তাঁহাকে পাঞ্জাবের রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া জয় জয় কারে বরণ করিবেন। এখন শিখেরা তাঁহাকে শিখ সমাজের মধ্যে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মানিত করে। হাণ্টার কমিটির মধ্যে গরম লোকদিগকে সদস্য করা বড়ই অনুচিত হইয়াছে, নম্রতায় অপব্যবহার ঘটিয়াছে, ডায়ারের দলের কেহ হাণ্টার কমিটিতে স্থান পায় নাই। আগাগোড়া জেনারে ডায়ারকে অসুবিধায় পড়িয়া থাকিতে হইয়াছিল। জেনারেল ডায়ারের বিদায়ের এই একটা মহা ত্রুটি যেমন করিয়া জেনারেল ডায়ারকে দাগা দিয়া ছাড়া হইয়াছে তাহা করিবার কোন দরকারই ছিল না। যদি ভারতে আবার চাকুরী দেওয়া সম্ভব না হইত, তিনি না হয় অন্য স্থানে চাকুরী পাইতেন। কোন বিচার না করিয়া একটা ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে অপদস্থ করা হইয়াছে। প্রকাশ্য বিদ্রোহের একটা অংশ লইয়া তাঁহাকে নাড়াচাড়া করিতে হইয়াছিল। মুমূর্ষ এবং আহতদের শুশ্রূষা না করিয়া জেনারেল ডায়ার অত্যন্ত অমানুষিকতা দেখাইয়াছেন বলিয়া মিঃ মণ্টেগু অভিযোগ তুলিয়াছেন তাহা অত্যন্ত অসমীচীন। হাণ্টার কমিটির রিপোর্টে ঐ বিষয়ের জন্য তাঁহাকে কোন রকমে দোষী করা হয় নাই।"

লর্ড ফিনলের প্রস্তাবই শেষে গৃহীত হয়।

পোষাক
সকল রকম
পোষাক
কাপড়
বেনারসী শাড়ী
সকল রকম
ধুতী
শাড়ী
জন্য বিশেষ
বন্দোবস্ত

মালঞ্চ

৭ম বর্ষ | ভাদ্র—১৩২৭ | ৫ম সংখ্যা

পল্লীমঙ্গ

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নায়েব খানা।

মণীশ—সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় ও নির্ভরহীন না হলে আমরা ভগবানকে খুঁজে দেখিনে। যখন এই ক্ষুদ্র কুটীরখানিতে শুয়ে আকাশ পাতাল ভেবে কোন কূল কিনারাই পাইনে, তখন সেই নিরাশার মধ্যে কার যেন আশার আলো দেখতে পাই, সান্ত্বনাবাণী শুনতে পাই। প্রাণে একটা অকারণ আনন্দ পাই, যেন ভগবানের বাহন গরুড়ের পাখার বাতাস এসে গায়ে লাগে, প্রাণ জুড়িয়ে দেয়।

(অদূরে জমাদার ও একটী অপরিচিত লোক মণীশকে শুনাইয়া কথাবার্ত্তায় রত)

জমাদার—ওই ছোঁড়াটাকে আবার সঙ্গিন পাহারা দিয়ে কলকাতা পাঠাতে হবে।

অপরিচিত—কি হবে, কেন সরাচ্ছে?

জমাদার—একেবারে সরাবে বলে। শুনেছি সেখানে ১০৮ জনের ফাঁসি হবে, এ তার মধ্যে একজন।

ভদ্রলোক—আপনি ঠিক জানেন?

জমাদার—আমরা পুলিস, জানি নে? কপালজোরে যদি নিতান্তই ফাঁসি না হয়, দীপান্তরের কথাটী নাই। সরকার যে পুলিসের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা দেন নি নইলে একা এই [illegible] তিনদিনে বিদ্রোহ দমন করে দিত। কিন্তু কাজে [illegible] আমগাঁয়ের ব্যাপার থেকে।

ভদ্রলোক—সে [illegible] শুনতে পাইনে?

জমাদার—[illegible] কেন? আপনি ত কাণে [illegible] আমিই ছিলাম [illegible] দারোগা, কারো পোঁ-ধরা নয়, নিজেই সর্ব্বেসর্ব্বা। হ'ল একটা গ্রামে ধানচুরি। চুরি ত চুরি আমারি এক বন্ধুর বাড়ী। কাজেই সদলে গমন, চোরের বাড়ী ডাকাতের মত পতন। ধর, বাঁধ, মার। ৭ জন লোককে কনুই কনুই বেঁধে আমতলাতে ফেলে পেটে গোড়ালি ও রুলের গুঁতা। পটাপট্ কবুল। ৫ মণ ধানের স্থানে ১০ মণ হাজির, সঙ্গে সঙ্গে সনাক্ত। এদিক ওদিক করে ৩ জনকে চালান। হাকিমটা ছিল গবুচন্দ্র, কলের কেরাণী বাঙ্গাল, ৩ জনকেই খালাস, আমার উপর কৈফিয়ৎ। একটা বৈরাগী S. P ছিল, অমনি আমাকে ডিগ্রেড [illegible], সেই অবধি খানিগাছে ঘোরা। আজ এখানে, [illegible] সেখানে। এখানকার মুসলমান জমাদার ছুটী নিয়েছেন তাই দুদিন এসেছি, আমার নামে এখনো একটা [illegible] pending। এবার আমি কাজে ইস্তফা দেব। এ বিভাগে বিচার নাই, দক্ষতার আদর নাই।

ভদ্রলোক—বেশ, সে কেসে ধান সনাক্ত হল কি করে?

জমাদার—কেন, তার সব এক বাবুরীর, ধান 'দুধ-কলমা'।

ভদ্রলোক—কেন, দুধকলমা কি আর থাকতে নাই?

জমাদার।—ওই ত মজা, আজকাল সবাই নতুন [illegible] মত জেরা করতে শিখেছে, আর [illegible] হাকিমই [illegible] [illegible]। কাজেই খুন ডাকাতির [illegible]।

(দারোগা বাবুর প্রবেশ)

দারোগা বাবু—মণীশ বাবু, [illegible] হবে।

মণীশ—(বিষণ্ণ হইয়া) কেন দারোগা বাবু ?

দারোগা বাবু—তা বলতে পারি নে, পুলিস আফিস থেকে ডেকেছে ; বোধ হয়, trial (বিচার) হবে। কাল প্রাতেই যেতে হবে।

[দারোগার প্রস্থান।

মণীশ (স্বগত)—অন্তর্যামী, তুমি জানো, আমি নির্দ্দোষ। জমাদার যা বল্লে তা ঠিক। হয় ত ফাঁসিই হবে। হয় ত একবার মা বাবার মুখও দেখতে দেবে না। থাক; ও সব ভাববার সময় আর নাই। সবে মাত্র একটী রাত্রি, এরি মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ পাথেয় সংগ্রহ করে নিতে হবে। এত সকাল সকাল যেতে হবে তা জানি নাই, ভগবানকে একদিনও প্রাণ ভরে ডাকা হয় নাই। আজ এই রাত্রিই পুঁজি। এর এক মুহূর্ত্তও অপব্যয় করলে চলেবে না। গীতা-পাঠ ও হরিনামে কাটাতে হবে। যাবার সময় যেন একেবারে রিক্তহস্তে যেতে না হয়। সমস্ত ভাবনা ভুলে অন্তিমের বন্ধুকেই ডাকতে হবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কলিকাতার বাড়ী।

সত্যহরি—গিন্নি, চিহ্ন ত কিছু শুভ দেখছি না। ভগবান বড় নিদারুণ পরীক্ষায় ফেললেন। অভাব ত যতদূর হতে হয়, গ্রামের লোকও ত চিঠির কোন উত্তর দিলে না। এখন বিভাস যে কেমন করে বাঁচবে সেই ভাবনাই আমাকে পাগলের মত করছে।

গিন্নি—কি অশুভক্ষণে মঙ্গলবারে গ্রাম থেকে এলাম। বিপদ যে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। কপালে কি শেষে পুত্রশোক আছে ? গা যে কাঁপছে।

[ক্ষিতীশের প্রবেশ।

ক্ষিতীশ—এ বাড়ীটে ও জমিদারী নিলামে বিক্রয় হয়ে গিয়েছে। একজন লোক কিনেছেন, তিনি বাড়ী দখল করতেন, কেবল বিপদের কথা শুনে পারেন নাই। যদি বেশীদিন থাকতে হয়, একটা ভাড়াটে বাড়ীর সন্ধান করেছি, সেটাতে পরিবর্ত্তন করতে পারেন।

গিরিবালা—কলিকাতায় বিভাসের শরীর সারবে না, একটু কমলেই বাড়ী নিয়ে যাব বাবা। ৭ দিন কি তাঁরা থাকতে দেবেন না ?

ক্ষিতীশ—তা খুব দেবেন। আর হাইকোর্টে বার-লাইব্রেরীতে একটা সভা হয়েছিল, স্বয়ং দাস সাহেব সভাপতি হয়েছিলেন, সকলেই এই আকস্মিক বিপদের জন্য দুঃখ ও সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। এবং কি ভাবে সাহায্য করা যায় তাই স্থির করছেন।

গিরিবালা—বাবা, দেশে গেলে সাহায্যের দরকার হবে না। সেখানে ভাত কাপড় জুটবেই ! তাঁরা বলেছেন,—এতেই আমরা কৃতার্থ, কিন্তু সাহায্য নিতে হবে না, তুমি বলবে।

[ক্ষিতীশের প্রস্থান।

সত্যহরি—মহাজনরা অবিরত জ্বালাতন করছে, তাদের প্রাপ্য না নেবে কেন ? বাড়ী বিকিয়ে গিয়েছে শুনে আরও অধিক তাগাদা আরম্ভ করেছে। সেটা ত বুঝিনি, যাই দুয়ারটা দিয়ে আসি।

গিরিবালা—তাই ত, এমন করে থাকা যাবে কি করে ? বিভাসকে দেখে যে প্রাণ শুকিয়ে যাচ্ছে। মা দয়াময়ী ! আর দুঃখ দিও না। বাবা বিভাস, কেমন আছ বাবা ?

বিভাস—মা, আমার সবাই ভালো। যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি নে, সব আশাই ফুরুলো।

[অশ্রু বিসর্জ্জন।

(দ্বারে করাঘাত)

সত্যহরি—ওই আবার কোন পাওনাদার এসেছে, যাই দ্বার খুলে দিয়ে আসি।

[দ্বার উদ্ঘাটন।

(নিতাই, কমল, তিনু, মোক্ষদার প্রবেশ।)

সত্যহরি—নিতাই নিতাই, তোমরা এলে ভাই ! (বক্ষে ধারণ ও রোদন) আমাদের বড় দুর্দ্দিনে এসেছ। আমার এ নির্ব্বান্ধব নিরানন্দ পুরীতে, স্বদেশী বন্ধু, অভিভাবক, আপনার জন এলো। এত চাল, এত জিনিষ এনেছ বিভাসের পথ্যের জন্য ? বিভাস কি পথ্য করবে ভাই ? গিন্নি, এদিকে এসো। বাবা বিভাস, তোমার ব্যারাম শুনে দেশ থেকে তোমার জন্য নানা পথ্যের জিনিষ নিয়ে এসেছেন, দেখ।

বিভাস—অ্যাঁ ! এঁরা এসেছেন ! আমি উঠতে পারছি নে, ওঁদের পায়ের ধুলো আমার মাথায় দিয়ে দিন। যা' হক, মরবার সময়ও গ্রামের লোকের মুখ দেখে মরতে পারো।

নিতাই—তুমি যে কালকের ছেলে, কেন মরবে বাবা ?

আমি নিত্যানন্দের মৃত্তিকা সর্ব্বাঙ্গে বুলিয়ে দিচ্ছি, সব পীড়া আরোগ্য হয়ে যাবে। কোন ভয় নাই, তোমাকে ভালো করে নিয়ে যেতেই এসেছি। সত্যহরি, তুমি আহার করগে, আমি এই বিভাসকে কোলের কাছে করে রইলাম। দেখি, আমার শ্রীগৌরাঙ্গ কি করেন! আমরা সকলে পথে আহার করে এসেছি। তুমি যাও।

বিভাস আমার প্রতি আপনাদের অপার দয়া, মনে হচ্ছে যেন গোটা গাটাই কাছে পেলাম।

নিতাই দয়া কি বাবা, এ ত কর্ত্তব্য।

কমল—দাদা, এত অসুখ, আমাদিকে সংবাদ দিতে হয়! এখানে কি একলা থাকা শোভা পায়? কাকের মুখে বার্ত্তা পেলে চলে আসতাম।

তিনু—সেই দাদনের টাকা ও সুদ এখন দরকার বলে সঙ্গে করে এনেছি। ১৩০০ তেরশ টাকা আছে, গুণে নিন।

সত্যহরি—খুড়ো, ও আর গুণতে হবে না, ও ঋণশোধ নয়, ও আমি গ্রামের লোকের—তোমাদের দান—সাহায্য বলে গ্রহণ করলাম। বড় দুঃসময়ে সাহায্য পেলাম। মা মোক্ষদা, বাইরে একখানা গাড়ী থামলো, দেখে এসো, দুয়ারটা খুলে দাও।

[দ্বার উন্মোচন।

মোক্ষদা—দিদি ঠাকরুণ আর জামাই বাবু এসেছেন।

সত্যহরি—এসো মা, এসো ধর্ম্মদাস, গ্রাম থেকে এঁরা তত্ত্ব করতে এসেছেন। তোমার মা আহ্নিকে আছেন, দিন লক্ষ নাম জপ করছেন; বিভাস যে বড় কাহিল!

ছায়া—দাদার অসুখ শুনে সমস্ত পথ কাঁদতে কাঁদতে আসছি, দেখা হবে তা ভাবিনি, যে কপাল! দাদা, দাদা!

বিভাস—এসো বোন! যাক, মরবার সময় সবারি সঙ্গে দেখা হলো। সুখে মরতে পারবো এবার।

তৃতীয় দৃশ্য

কলিকাতার বাড়ী।

সত্যহরি—গিন্নি, কবিরাজ মশায় বল্লেন, বিভাস রক্ষা পাবে, অবস্থা ভালর দিকে। গোস্বামী মশায় ও কমল প্রভৃতির ব্যবহার দেখে আমি অবাক হয়েছি। এঁদের অমৃত দৃষ্টিতেই যেন বিভাসের রোগের বিষ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। গোস্বামী দীর্ঘকাল ধরে বিভাসের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করছেন। আহা, দুগণ্ড অশ্রুতে ভেসে যাচ্ছে! ভক্তিবলে কি না হয়? আমাদের ত কোন আশাই নাই, যদি এঁদের কৃপায় বিভাস রক্ষা পায়।

গিন্নি—কমল নিজেই রন্ধন করছে। মোক্ষদা না এলে কি, আহা, বিভাসের যত্ন হত? সবারি কি ভক্তি, এসে যেন বাড়ীতে শান্তি এনে দিয়েছে।

ছায়া—মা, এঁদের কৃপাতেই দাদা রক্ষা পাবেন, যেন রঙ্গালয় ভেঙ্গে এঁরা মন্দির গড়ে তুলেছেন। এত গান শুনেছি, সকাল বেলায় গোস্বামী মশায়ের টহলের মত, অমন মিষ্টি কিছুই শুনেছি বলে মনে হয় না। মা, আমরা দীন হয়েছি কিনা, তাই সত্যই দীনবন্ধুর আগমন হয়েছে।

সত্যহরি—আজই এ বাড়ী ছেড়ে দিয়ে রওনা হতে হবে। কবিরাজ মশায় তাতেই মত দিলেন। আসবাব-গুলো ক্ষিতীশের বাড়ী সরাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভগবান যদি করেন, বিভাস ভাল হয়ে এসে নেবে। পাল্কী প্রভৃতি ঠিক করা হয়েছে। কি বলেন?

নিতাই—বিভাস ছয়মাস পরে ভাল হয়ে আবার ওকালতি করবে, দুঃখ কর না। বাবা বিভাস পাল্কী তৈয়ারী, একটু সকালে যাওয়া যাবে।

বিভাস—বেশ তাই হ'ক।

(স্বগতঃ) ঘণ্টাদুয়ের মধ্যে কলকতা ত্যাগ করে যাবো, কঠিন নগরী তার প্রস্তর চক্ষু নিয়ে উদাসীন ভাবে তাকিয়ে থাকবে। এখানে ১৫।১৬ বৎসর বাস করছি, কই একটা ক্ষীণ রেখাও ত অঙ্কিত করে যেতে পারলেম না। এ আলোকময়ী পুলকময়ী নগরী হতে একটা আঁধার হৃদয় বিদায় নেবে, তাতে তার ক্ষতিবৃদ্ধি কি? এইটা যদি আমাদের পল্লীগ্রাম হ'ত, তা হলে অসংখ্য নরনারীর হৃদয় সমবেদনায় ব্যথিত হয়ে উঠতো। করুণ নয়নের স্নিগ্ধজলে আরোগ্য-স্নান করিয়ে দিত।

আর এই বাড়ীটে ছাড়তে আমার পক্ষাঘাতপীড়িত বুকেও ব্যথা লাগছে। এর প্রত্যেক ইটখানি আমি নিজে বসে গাঁথিয়েছি। বাড়ী, তুমি আমার বড় সখের বড় আদরের ছিলে, আজ হতে পর হয়ে যাবে। এখানে আসবার আর আমার অধিকার থাকবে না। এই যে দেয়ালে কত সুখদুঃখের স্মৃতি রইলো, তার উপর নির্দয়

চূণকাম পড়বে। আমার এই নিতান্ত আপনার জিনিষকে হয়ত পথিকের মত দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে। অন্ত লোক তাকে অধিকার করবে।

নিতাই—বাবা বিভাস, পাল্কীতে ওঠ, বৌ ওঠো।

[উহাদের পাল্কীতে আরোহণ।

গিরিবালা—(স্বগত)—মা কালীঘাটের কালী, বড় বিপদে বড় দুঃখে তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি। যেন আমার বিভাস বাঁচে মা"।

[প্রণামান্তে আরোহণ।

নিতাই—সত্যহরি, তোমরা পশ্চাতে এসো, আমরা আগিয়ে এঁ দিকে আর মোক্ষদাকে নিয়ে চললাম। কমল, তিনুকে সঙ্গেই এনো।

[প্রস্থান।

(মহাজনের প্রবেশ)

মহাজন—বিভাস বাবু কই?

সত্যহরি—হাঁ, আপনাদের ২০০০৲ টাকা আমি বাড়ী গিয়ে পাঠিয়ে দেব। বড় বিপদে আছি।

মহাজন—তা কোনক্রমেই হবে না, টাকা চাই-ই। গাড়ী যেতে দেবই না। আপনাদের বাড়ী বিকিয়ে গিয়েছে, কিসে দেনা শোধ দেবেন?

সত্যহরি—তাই ত কি করা যায়, ধর্ম্মদাসও এখানে নেই, থাকলে যা হ'ক ব্যবস্থা হত। বাপু, তুমি ভয় করো না, এখন দেবার সাধ্য নাই, গিয়েই পাঠাবো।

মহাজন—তা হতেই পারে না।

কমল—আমার কাছে এক হাজার টাকার War Bonds আছে, নেবে?

সত্যহরি—তোমার টাকাটাই নেব?.যা'ক তাই নিই।

কমল—তাতে কি? পরে দেবেন!

(একজন সুসজ্জিত চাপরাশীর প্রবেশ, বিভাস বাবুর নামের চিঠি সেলাম করিয়া সত্যহরির হাতে প্রদান ও প্রস্থান)

সত্যহরি বোধ হয় হাইকোর্টের কোন্ জজ বা ব্যারিষ্টার বিভাসের অসুখ শুনে সংবাদ নিয়েছেন। চিঠিটা খুলে পড় ত?

কমল—কাকাবাবু, দুই হাজার টাকার নোট। বাঙ্গলায় লেখা আছে,—"আপনার স্নেহের ঋণের যৎকিঞ্চিৎ।

দীনদাস।"

সত্যহরি—দীনদাস নয় হে, ও দীনবন্ধুর দেওয়া। চিঠিটা রেখে দাও, আর নোট মহাজনকে দিয়ে চল গাড়ীতে উঠিগে, এ ভগবানের দয়া।

(নোট লইয়া মহাজনের প্রস্থান)

একটু অপেক্ষা কর বাড়ীর ভিতর হতে আসি।

(স্বগত) যাবার সময় বাড়ীটে একবার শেষবার দেখে আসি। আর মায়ের সে পাখীটে, সেটা তার বড় প্রিয়, তাকে ভুলে গিয়েছিলাম, নিয়ে আসি।

(প্রত্যাবর্ত্তন ও প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

গ্রাম

পারের ঘাট।

১ম পথিক—হ্যাঁগা, ঘাটে এত লোক জমেছে কেন?

খেয়ারী—আমাদের বাবুরা আসছেন কি না, তাই এত লোক। অনেক দিন পরে আসছেন গো।

২য় পথিক—কি হে পাটুনী, বিয়ে টিয়ে আসছে নাকি? এ যে ছেলে মেয়ে, বড় ঘরের বৌ ঝি সব গা শুদ্ধ হাজির, যেন বিসর্জ্জনের নাচ দেখতে এসেছে।

বড় মা—বালাই, বিসর্জ্জন কেন? বোধনের ঘট আনা দেখতে এসেছে।

২য় পথিক—মা ঠাকুরুণ, আমরা ওসব ত বুঝিনে, কিছু মনে করবেন না।

১ম পথিক—ও হে রসিক সর্দ্দার, আজ যে বড় খাটতে যাওনি?

রসিক—আজ কে আমাদের মনিব আসবে, তুমি ও মোড়ল, রয়ে যাও। আমাদের দাদাবাবুকে দেখে যাবে।

৩য় পথিক—ওগো মাঝি, আমাদিগে একটা খেয়া দিয়ে দাওনা ভাই।

মাঝি—না ভাই, পারবো না, একটু সবুর কর, ওই পাল্কী দেখা দিয়েছে, এলো বলে।

বড় মা—ও বিমল, ও গোবিন্দ, ঘরের উঠানে ঘট রাখা হয়েছে ত? ও গয়লা বউ, তোমার কাঁকের কলসী খালি নয় ত?

গয়লা বৌ—দেখেন দেখি, আমি বাবুরা আসবেন বলে ভরা কলসী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

বড় মা—বেশ থাকো, ওরে ভুঁদি, খাঁছ, হরি, কালো, রাম, তোরা নৌকার সঙ্গে ওপার যা, বেশ ধীরে ধীরে পাল্কী তোলাবি, যে রোগা শরীরে কোন কষ্ট না হয়।

(নৌকায় প্রত্যাবর্ত্তন)

ওঃ সতী, তুই সধবা মেয়ে, গিরিকে ধরে ধরে নামা।

বিভাস—বড় মা, রাঙ্গাদিদি, আমি ত উঠতে পারছি নে; এখান থেকে প্রণাম করছি।

বড় মা ও রাঙ্গাদিদি—(সমস্বরে) প্রণাম করতে হবে না, তুমি আমাদের লোহার কাঠী হয়ে বেঁচে থাকো। মা মঙ্গলা তোমাকে চিরজীবী করুন।

(গিরিবালাকে বক্ষে জড়াইয়া) -আহা, সোণার দেহ কালি হয়ে গিয়েছে, কেঁদে কেঁদে গলা ভেঙ্গেছে, এসো ঘরের লক্ষ্মী, ঘরে এসো।

গিরিবালা—বিভাসকে যে নিয়ে এখানে আসবো তা ভাবিনি। এখন আপনাদের আশীর্ব্বাদে বিভাস বাঁচুক।

সকলে—(সমস্বরে) কোন ভয় নাই, মা মঙ্গলচণ্ডী রক্ষা করবেন।

[গৃহাভিমুখে প্রস্থান।

(নৌকায় প্রত্যাবর্ত্তন)

(সত্যহরি বাবুর অবতরণ)

কেহ দাদা ঠাকুর, বাবা ঠাকুর, খুড়া ঠাকুর বলিয়া প্রণাম ও কুশল জিজ্ঞাসা। সারি সারি প্রণাম।

সত্যহরি—সব ভাল, আঃ? তোমাদিগকে দেখে বাঁচলাম।

(একটা রাখাল—"তুই কি ঘরে আলিরে রামধন" গীত—)

পঞ্চম দৃশ্য

সুঃ কান্তিলাল—ইনস্পেক্টর রায়, বোধ হয় শুনেছেন, শরীশের সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড আজ্ঞা হয়েছে। লাকটা জাল গোয়েন্দার বেশে বহু স্থানে বহু কাণ্ড করেছে। উপরে এমনি একটা সরলতার আবরণ যে তার প্রকৃত চরিত্রের সন্ধান পেতে আমাদিগকেও সময় লেগে-ছল। জালগোয়েন্দা ধরা পড়ায় প্রকৃত গোয়েন্দাদের গৌরব অনেক পরিমাণে হ্রাস হলো। আমি চাই, গোয়েন্দা পুলিশ যেন চরিত্র গৌরবে ও মহত্ত্বে আদর্শ হয়ে থাকে। মিথ্যাকে যেন কখন আশ্রয় না দেয়। আপনাদের নিম্ন কর্ম্মচারীদের মধ্যেও আমার এ আদেশ জানিয়ে দেবেন। গভর্ণমেণ্টের ন্যস্ত বিশ্বাসের যেন আমরা সম্পূর্ণ উপযুক্ত হতে পারি, তার জন্য প্রত্যেককেই চেষ্টা করতে হবে। মণীশ বাবু কি উপস্থিত?—তাঁকে একবার ডাকান।

ইঃ রায়—এই যে উপস্থিত—

[অভিবাদন করে মণীশের দণ্ডায়মান।

মণীশ—(স্বগত)—এখন কোথায় পাঠাবে বলা যায় না, যা হ'ক সবেরই জন্য প্রস্তুত।

সুঃ কান্তিলাল—মণীশ বাবু, যে শিরীশ আপনাকে হত্যাকাণ্ডে মিথ্যা জড়িত করেছিল, তা'র জেল হয়েছে। সে গোয়েন্দা পুলিসের কেউ নয়, তা জানবেন। আপনার নাম বহু বিষয়ে জড়িত হয়ে গিয়েছে, তথাপি সদাশয় গভর-মেণ্ট আপনাকে Home interned (গৃহে ও গ্রামে অন্তরীণ) করেছেন। সেখানে গিয়ে থাকবেন এবং যে সব আইন মেনে চলতে হয় তা জানেন, সেই মত চলবেন। সম্রাটকে ও গভরমেণ্টকে ধন্যবাদ দেবেন এবং কৃতজ্ঞ থাকবেন।

মণীশ আমার পক্ষে এ যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে। এ জন্য তাঁদের ও আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। একটা প্রশ্ন আছে, আমার দাদা কি জীবিত আছেন?

সুঃ কান্তিলাল—হাঁ, তিনি ভাল আছেন, সকলেই গ্রামে গিয়েছেন। আপনিও যাবেন, এ আফিস হতেই খরচ পাবেন। গ্রামের গোস্বামী মহাশয়কে আমার প্রণাম জানাবেন।

মণীশ—আনন্দের সহিত। তবে আমি এখন যেতে পারি?

[অভিবাদনান্তে প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

বিভাস—মা গ্রামের হাওয়ায় প্রাণ জুড়লো, যেন অর্দ্ধেক পীড়া উপশম হলো। বেলগাছে পাপিয়াটা সমস্ত রাত্রি ডেকেছে, যেমন আমাদের ছোটবেলায় ডাকতো। মা, রোগে ভুগে যেন ছেলে মানুষ হয়ে গিয়েছি। এই জানলা দিয়ে দেয়ালে যে রোদটুকু পড়েছে, ছোট বেলা এর দাগ দেখে আমরা পড়তে বসতাম, আজ যেন সব কথা মনে পড়ছে।

কলকাতার পথের ভিখারী হয়ে পড়েছিলাম, গ্রামের লোকের কি স্নেহ,—সমস্ত গ্রাম যেন আপনার হয়েছে। প্রভাতে খবর না নিয়ে অন্য কাজে যায় না।

গিরিবালা—বাবা, আজ স্নান করে মা মঙ্গলচণ্ডীর কাছে মানত করে আসবো। তুমি ভাল হলে পূজো দেব। আমি যাই।

সত্যহরি—বাবা বিভাস, আমরা আসবার সময় ২০০০৲ টাকার নোট আর এই চিঠি কে দিয়েছিলেন। সে টাকা না পেলে কলকাতা থেকে আসতেই দিত না, মহাজন গাড়ী আটকেছিল।

বিভাস—(পত্র পাঠান্তে) বুঝেছি, এ রকম হৃদয় আর কার হবে, সেই ব্যারিষ্টারপ্রবর মহাত্মার। কি প্রশান্ত উদার হৃদয় নিয়েই জন্মেছেন! কি বলবো, ভগবান তাঁকে সুখী করুন।

(নিতাইএর প্রবেশ)

নিতাই—আজ আমাদের বড় সুখের দিন, ঘরের ছেলে ঘরে এলো। কবিরাজ মশায় বল্লেন, একমাসে বিভাস সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করবেন। পক্ষাঘাত নয়ই। কলিকাতার বাড়ী ও জমিদারী কিনে রেখেছেন যিনি, তিনি আমার পরিচিত বন্ধু, তাঁর মেয়ের সঙ্গে বিভাসের বিয়ে দিয়ে সেই বাড়ীতে আবার ওকালতি করতে বসিয়ে তবে সুখী হবো। বাছা আসবার সময় বাড়ীর জন্য বড় কাতর হয়েছিল। আহা, আজ মণীশ এখানে এলেই সব সুখের হত। বাছা কোথায়!

(মণীশের প্রবেশ)

মণীশ—দাদা ভাল আছেন?

সত্যহরি—হ্যাঁ, এসো বাবা মণীশ, এসো। ও গিন্নি, মণীশ—মণীশ এসেছে!

নিতাই—আরে আরে মণীশ, বহুদিন বাঁচবে বাবা, এই নাম করছিলাম।

"নিতাই আমার বড়ই দয়াল
এমন দয়াল আর হবে না;"

(মণীশকে আলিঙ্গন)

মণীশ—আপনার দয়াতেই মুক্তি পেয়েছি জানবেন। সুঃ কাঙ্গিলাল আপনাকে প্রণাম জানিয়েছেন।

নিতাই—বাবা আমার খেপা, আমি কি করেছি?

গিরিবালা—(পুত্রকে কোলে লইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন) আমার সোণার গ্রাম আমার বাছাকে ফিরিয়ে এনে দিলে।

সত্যহরি—এবার গ্রামে এসে যে আনন্দ, যে ভালবাসা পেলাম তা অপ্রত্যাশিত। সুখের, ঐশ্বর্য্যের বিলাসের ভার নিয়ে এসেছি, পেয়েছি—হিংসা দ্বেষ, অভিমান, উপহাস! আজ নিঃস্ব হয়ে এসে পেলাম,—কেবল স্নেহ, কেবল ক্ষমা কেবল ভক্তি, কেবল ভালবাসা! আমি গ্রামের কিছুই করি নাই, আজ গ্রামই আমাকে বুকে তুলে আশ্রয় দিলে। একটা ঘৃণা ও অবহেলার ভার নিয়ে গ্রামে আসতাম, সেই ভাবেরই প্রতিদান পেতাম। পল্লীগ্রামের হুলই এতদিন সহ্য করেছি, আজ তার মধুর সন্ধান পেলাম।

নিতাই—এবার বাকি—সেই মহাসমারোহে দুর্গাপূজা, বুঝলে কিনা?

সত্যহরি ও গিরিবালা—নিশ্চয়ই, যদি মহামায়া করুণা করেন। সে দিন কি আসবে?

নিতাই—আমি বলছি আসবে।

যবনিকা পতন

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ।

জলপ্লাবন

দূর প্রান্তর-পারে—
দামোদর নীর বহিছে অধীর,
তরু-ছায়াতলে জীর্ণ কুটীর
নিবিড় বনের ধারে;

জনৈক অন্ধ করিত বসতি,
কন্যা তাহার সরলা সুমতি
পিতারে লইয়া ভিক্ষার তরে
ফিরিত গ্রামের মাঝে,

মধ্যদিবসে নিরত হইত
আপনার গৃহকাজে।
একদা বর্ষা হইল প্রবল,
প্লাবনে বহিল দামোদর জল,
নিশিথ গগন ঘন কোলাহলে
চকিতে উঠিল ভরি,
আশ্রয় আশে ধনীর দুয়ারে
নিধন যত অবনত ভাবে,
ছেলেমেয়েদের সঙ্গে লইয়া
ছুটে যায় ত্বরা করি।
অন্ধ তখন আপনার বাসে
নিদ্রিত ছিল কন্যার পাশে
চমকি উঠিল জাগি।
নাহিক নয়ন, কিন্তু হৃদয়
পিতার বক্ষে অনাটন নয়
ব্যথিত শঙ্কা। কাঁদিয়া উঠিল
বালিকা কন্যা লাগি।
শির'পরে ঝরে শ্রাবণের ধারা,
সমীর বহিছে উন্মাদ পারা,
গরজি উঠিছে প্লাবনের বারি
বৃক্ষ টুটিছে দবে।
নিমিলিত আঁখি স্বপ্নাবিষ্ট
বিকচ আনন ক্লান্তি-ক্লিষ্ট
নিদ্রিত বালা, মুখপানে চাহি
মৃদু-সকরুণ সুরে —
ডাকিল বৃদ্ধ, "মলিনা আমার
খোল মা নয়ন, দেখ একবার,":
রুধিল কণ্ঠ ধীরে,
চক্ষুহীন চোখে এক ফোঁটা জল
ঝরিয়া পড়িল তরল অনল'
সিক্ত হইল শুষ্ক কপোল।
আবার কহিল ফিরে—
"মলিনা আমার", কেহ শুনিল না
দূরে শুনা যায় প্লাবন ঘোষণা
ক্ষুব্ধ হৃদয়ে গরজিল পিতা
"ওরে হতভাগা মেয়ে,"—

"কেন বাবা" বলি আধ ঘুমঘোরে
পার্শ্ব ফিরিয়া পিতৃ অঙ্ক' পরে
ঘুমাইল পুন নির্ভয় প্রাণে
ধীরে হাত দুটি ছেয়ে।
ঘরের দেয়াল কাঁপিয়া উঠিল,
রুদ্ধ সলিল বেগেতে ছুটিল
প্রান্তর পরিপূর্ণ।
একবার জলশব্দ পানে চায়,
একবার ঘন গগনে তাকায়
বালিকার পানে নিরখি বারেক
করিল শঙ্কা চূর্ণ।
বুকেতে তুলিয়া লইল কন্যারে
ভাবিল উপেক্ষা করিয়া বন্যারে
চলিয়া যাইবে ধনীর প্রাসাদে
যদি আশ্রয় পায়।
স্বপ্ন টুটিল, সুপ্তি ঘুচিল,
জাগিয়া বালিকা নয়ন মুছিল,
"কি হ'য়েছে বাবা" জিজ্ঞাসিল ধীরে;
"আয় ছুটে চলে আয়"
নীরবিল পিতা, "কোথা যেতে বল"
শুধাইল বালা, আঁখি ছলছল
প্রবাহের বারিরাশি,
পরশিল তনু শিহরিল কায়
কাঁপিল পরাণ বিষম ব্যথায়
অন্ধ পিতারে একেলা রাখিয়া
কোথা সে যাইবে ভাসি।
"বাবা চলে এস, দামোদর বাঁধ
ভেঙ্গেছে নিশ্চয়, বিষম প্রমাদ,"
"তুই চলে যাবে মলিনা আমার"
ফুকারিল ধীরে অন্ধ।
"তুমি চলে এস নহে ত যাব না"
"মোর তরে তোর কেন এ ভাবনা"
প্লাবনের নীর গরজি গভীর
ঘুচাল সকল দ্বন্দ্ব।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইংরেজ আমলে হিন্দুসমাজ ও নীতি

সাধারণ দৃষ্টিতে আমরা দেখি যে, ইংরেজ আমলে ভারতের একমাত্র রাষ্ট্রীয় গগনের যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এরূপ পরিবর্ত্তন হিন্দু বা মুসলমান আমলে হয় নাই। হিন্দু ও বৌদ্ধযুগে গণতন্ত্রের ক্ষীণচিহ্ন প্রত্নতত্ত্বের ভিতর দিয়া দেখিতে পাওয়া গেলেও, ইহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে, সাধারণতঃ হিন্দু ও বৌদ্ধযুগে কতকটা Patriarchal ও মুসলমান আমলে কতকটা autocratic form of Government কিংবা স্বেচ্ছাতন্ত্রের প্রচলন ছিল। প্রজাসাধারণের ব্যক্তিগত হিসাবে বিশেষ কিছু অধিকার ছিল না এবং সেই জন্য রাজ-চরিত্রের উপর প্রজার শুভাশুভ নির্ভর করিত। ইংরেজ আমলে প্রজা সাধারণের কিংবা ব্যষ্টির (individualএর) রাজনৈতিক অধিকারের প্রসার ও পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সন্দেহ নাই! কিন্তু প্রজাসাধারণের রাষ্ট্রীয়শক্তির প্রসার পরিবর্ত্তন যতটা হউক না কেন, ইংরেজ আমলে হিন্দুসমাজের যে একটা আমূল পরিবর্ত্তন নিঃশব্দে অথচ অত্যন্ত দ্রুতগতি হইতেছে তাহা আমরা অনেকেই দেখিয়াও দেখিতে পাইতেছি না। বাস্তবিক পক্ষে ইংরেজ আমলে হিন্দুসমাজের যেরূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে, সেরূপ পরিবর্ত্তন রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হয় নাই। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রজার রাষ্ট্রীয়শক্তি বৃদ্ধির এবং বর্ত্তমান হীনাবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য অর্দ্ধশতাব্দী পর্য্যন্ত কতই না আন্দোলন করা হইতেছে, কিন্তু সামাজিক ব্যাপারে ইংরেজ সম্পূর্ণ উদাসীনতা দেখাইলেও পরিবর্ত্তনের দিক দিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, সমাজ রাজনীতিকে পশ্চাতে ফেলিয়া হুহু শব্দে ইংরেজী ভাব ও আদর্শের অনুকরণ করিতেছে। বস্তুতঃই ইংরেজ আমলে হিন্দুসমাজের একটা প্রকাণ্ড অন্তর্বিপ্লব ঘটিয়াছে, সামাজিক প্রাচীন আদর্শের ব্যতিক্রম লক্ষিত হইতেছে এবং সেই সঙ্গে আচার রীতি নীতির পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইতেছে।

মূল কথা।

এই পরিবর্ত্তনের অনেকে নাম দিয়াছেন Evolution বা ক্রমোন্নতি এবং ইহার জন্য তাঁহারা এই পরিবর্ত্তনের অত্যন্ত পক্ষপাতী। পরিবর্ত্তনের পক্ষে বা বিপক্ষে অল্প কথায় কিছু বলা সহজসাধ্য নহে। তবে এই পরিবর্ত্তনের ধারা যে স্বাভাবিক ক্রমোন্নতির দিকেই প্রধাবিত হইতেছে, ইহা বলা বড়ই শক্ত বরং একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, এই পরিবর্ত্তনটি Evolution বা অভিব্যক্তির নিয়ম না মানিয়া Revolution বা বিপ্লবের ধারা মানিয়াই চলিতেছে।

Revolution (বিপ্লব) কি Evolution (অভিব্যক্তি)

সহজ কথায় অস্বাভাবিকভাবে আমূল পরিবর্ত্তনকে আমরা Revolution বা বিপ্লব বলি, আর মূল ঠিক রাখিয়া স্বাভাবিক নিয়মে ভিতরের আবর্জ্জনা ঝাড়িয়া পুছিয়া ক্রমে ক্রমে ভিত্তিকে দৃঢ় করিয়া প্রাচীরের (System) উন্নতি সাধনকে Evolution বা ক্রমোন্নতি বলে। ফরাসীরা মূলটিকে ছেদন করিয়া অস্বাভাবিক উপায়ে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের movement বা আন্দোলন বিপ্লব বা Revolution নামে অভিহিত হয়; ইংরেজরা দ্বিতীয় জেমসের (James II) সময় মূলটি দৃঢ় রাখিয়া স্বাভাবিক উপায়ে জনসাধারণের প্রাধান্য বজায় রাখিয়া রাষ্ট্রতন্ত্রের স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের কার্য্যকে Evolution বলা যাইতে পারে। রাজনীতি সম্বন্ধে যে নিয়ম, সমাজনীতিতেও তাহাই প্রযোজ্য। সেই জন্য Slavs, Russians, কিংবা Grreeksরা যে বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় সমাজের আচার, রীতি, নীতি গ্রহণ করিয়াছে তাহা সেই স্বাভাবিক নিয়মের ফলে কিন্তু জাপান হঠাৎ যে ইয়োরোপীয় ভাব ও আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে তাহারা সফলকাম হইলেও সত্যের খাতিরে বলিতে হইবে যে, ইহাতে তাহাদের সামাজিক অন্তর্বিপ্লব ঘটিয়াছে এবং বিলাতী ভাবানুকরণের মধ্যে তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ অনন্যতন্ত্রতা মিশিয়া গিয়াছে।

ফলতঃ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সমাজনীতির মধ্যে এরূপ পার্থক্য যে উভয় সভ্যতার সংঘর্ষে সমাজে Revolution বিপ্লব ভিন্ন Evolution (ক্রমোন্নতি) হওয়া একরূপ অসম্ভব। দুইটি সমাজের দুই বিপরীত ধারায় উৎপত্তি ও স্থিতি। প্রাচ্য সমাজ সামাজিক সমষ্টির উপর অবস্থিত, প্রতীচ্য সমাজ ব্যষ্টির (Individual) সুখ সুবিধার জন্য গণিত। প্রাচ্যসমাজ অন্তর্মুখী, প্রতীচ্য সমাজ বহির্মুখী। প্রাচ্যের আদর্শ পরমার্থ, প্রতীচ্যের আদর্শ স্বার্থ। প্রাচ্যসমাজ পরকালের (Spiritual Salvation) জন্য ব্যস্ত, প্রতীচ্য সমাজ ইহকালের (Materialistic Enjoyment) ভোগেচ্ছায় প্রণোদিত। সুতরাং একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখা যায়,

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার সংঘর্ষের ফল

এই দুই সভ্যতার সংঘর্ষে সমাজে একটি অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তন হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

এই দুই সমাজের সংঘর্ষের ফলে যদি ইংরেজদের সামাজিক সদ্‌গুণরাজিই প্রাচ্য-সমাজ গ্রহণ করিত তাহা হইলে এরূপ সামাজিক বিপ্লব ঘটিত না নিশ্চিত। কিন্তু স্থির ভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, সেরূপ compromise (মিলমিশ) হওয়া অসম্ভব। দুইটি সমান ভাবের পরস্পর আদান প্রদান হইলে জাতীয় বৈশিষ্ট রক্ষা করিয়াও অন্য জাতির ভালটা গ্রহণ করা যাইতে পারে, কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে হিন্দুর সংঘর্ষের ফল ওরূপ না হওয়াই স্বাভাবিক। ইংরেজ যখন ভারতে আসিলেন, তখন তিনি বিজয়ী বীর, সগৌরবে ভারতের বক্ষে বিচরণ করিয়া দেশ-দেশান্তরে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিশিষ্টতা, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অত্যাশ্চর্য্য সাধনা ও সিদ্ধি, পাশ্চাত্য শিল্পকারীর উজ্জল সৌন্দর্য্য এই অজ্ঞাত চির-পদদলিত এবং বিপর্য্যস্ত দুর্ব্বল হিন্দুর সম্মুখে আনয়ন করিয়া, সেই ইহকালবিস্মৃত ভোগ-বিমুখ হিন্দুকে ইহকালের রূপোন্মত্ত করিয়া তাহার নিকট কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। হিন্দু বহুকাল ধরিয়া "মূঢ় জহিহি ধনাগমতৃষ্ণাং" ইত্যাদি বলিয়া অস্বাভাবিক উপায়ে সংযম অভ্যাস করিতেছিল, হঠাৎ ইহকালের রূপোন্মাদ দামোদরের বন্যার ন্যায় প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া "দেহিপদপল্লবমুদারম্" বলিয়া ইংরেজী ভাবের নিকট সম্পূর্ণ আত্মবিক্রয়(Complete Su render) করিল; হিন্দুর জীর্ণ প্রাচীর ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল এবং যখন সেই বৈলাতিক মোহের বন্যা জলবুদ্‌বুদের মত ভাসিয়া মুহূর্ত্তের জন্য বিলীন হইল, তখন দেখা গেল যে, দুইটি ভাবের সংঘর্ষের ফলে compromise বা আদান প্রদান, admixture বা সংমিশ্রণ হয় নাই, কেবলমাত্র surender বা আত্মসমর্পণ এবং conversion হইয়াছে।

প্রত্যেক বস্তুর সহিত প্রত্যেক বস্তুর সংমিশ্রণ হইতে পারে না। সাদার সহিত অন্য বর্ণের লাল, নীল, কাল্‌চার সংমিশ্রণ হইয়া একটি সুন্দর ও বিশিষ্ট বর্ণের সৃষ্টি হইতে পারে; কিন্তু কাল ও লালের মধ্যে, তেল ও জলের মধ্যে সেরূপ সংমিশ্রণ হয় না। কাজেই দুইটি বর্ণ অস্বাভাবিক উপায়ে মিশ্রিত হইলে যে-বর্ণ প্রবল তাহারই রং বজায় থাকে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সংঘর্ষের ফলেও সেইরূপ হিন্দু-সমাজের বৈশিষ্ট প্রবল পাশ্চাত্য সমাজের নীচে পড়িয়া রহিল এবং ইংরেজের, তথা ইয়োরোপের সবই ভাল বলিয়া গ্রহণ করিয়া হিন্দু অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ইংরেজকে উপদেষ্টার আসন প্রদান করিল। ইংরেজ কিন্তু আপন গৌরবে গৌরবান্বিত থাকিয়া হিন্দুর সমস্ত বিষয় ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিল, হিন্দুও নূতন গুরুর উপদেশানুসারে নিজেদের ভাব ও আদর্শ অবজ্ঞার সহিত দূরে নিক্ষেপ করিয়া বিলাতী ভাব ও আদর্শের অন্ধ অনুকরণ করিতে লাগিল।

হিন্দুর এই নবজাগরণের ফলে কতকগুলি লোক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, পাশ্চাত্য উদ্দীপনায় উদ্দীপিত হইয়া সমাজের গণ্ডী ছাড়িয়া একটু স্বতন্ত্র ভাবের সমাজ গঠন করিলেন; কিন্তু কালক্রমে তাঁহারাই আবার আমাদের সমাজের শীর্ষস্থানীয় হইলেন।

(ক)—বিলাত-ফেরতা সমাজ

এই বিলাত-ফেরতা সমাজ সম্পূর্ণরূপে বিলাতী ভাব, বিলাতী আচার রীতি-নীতির নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন এবং বিলাতের গুণগুলি যতটা আয়ত্ত করিতে পারুন বা নাই পারুন বিলাতী বিলাসিতার স্রোত প্রবলবেগে হিন্দুসমাজের মধ্যে প্রবেশ করাইয়াছেন। *

সামাজিক অন্তর্বিপ্লবের জন্য বিলাত ফেরতা সমাজ যতটা দায়ী তদপেক্ষা অধিকতর দায়ী এই ইংরেজীশিক্ষা।

(খ)—ইংরেজী শিক্ষা।

Religious non-intervention কিংবা ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবেন না, এই মূলনীতির অনুসরণ করিয়া আমাদের অনেক সম্প্রদায় ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন করেন। ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে, প্রত্যেক হিন্দু ৫ বৎসর হইতে ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত ধর্ম্মবিবর্জ্জিত শিক্ষা লাভ করে। এই সময়ে তাহার দেহ ও মন গঠিত হয়, পাশ্চাত্য ভাবে ও পাশ্চাত্য আদর্শে—প্রাচ্যভাবের অবমাননা করিয়া এবং প্রাচ্য আদর্শের অবহেলা করিয়া সে বিলাতী মোহে মুগ্ধ, বিলাতী ভাবে অণুপ্রাণিত, বিলাতী উদ্দীপনায় উদ্দীপিত; সুতরাং ইংরেজীশিক্ষিত

ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দুর মানসিক গতি।

একজন সাধারণ (average) হিন্দুর মানসিক গতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, বহিরাবরণে প্রাচ্য হইলেও অন্তরে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন। অথচ দুঃখের বিষয় এই যে, তাহারা পাশ্চাত্য আদর্শ ও নীতির অন্ধ অনুকরণ

করিতে চেষ্টা করে বটে, কিন্তু সে আদর্শ ও নীতিকে assimilate বা নিজ করিয়া লইতে পারে না। ফলে এই হয় যে কোন বিষয়েই তাঁহার একটা সুস্পষ্ট ধারণা বা মত হয় না এবং সমস্ত বিষয়েই গড্ডালিকাপ্রবাহে শরীর ভাসাইয়া দিয়া অন্ধ অনুকরণ করিতে থাকে। সেইজন্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদাসীনতা বা Indifference৭, অবিশ্বাস বা scepticism ভিন্ন কোন স্পষ্টমত তাহার নাই; সমাজ সম্বন্ধে বিলাতী চসমায় হিন্দুসমাজের দোষ প্রদর্শন ভিন্ন সূক্ষ্ম বিচার করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার ক্ষমতা তাহার নাই, এবং রীতিনীতি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য রীতিনীতির অন্ধ অনুকরণ ভিন্ন প্রাচীন রীতিনীতির আবর্জ্জনাগুলি পরিষ্কার করিয়া ভালটুকু সংরক্ষণ করার ক্ষমতা বা সৎসাহস (moral courage) তাহার নাই। এক কথায় তাহার আদর্শ ধনী বিলাত ফেরতা সমাজ; সেই সমাজ যখন যাহা করিবেন তাহাই অর্থ ও সামর্থ্যানুসারে নিজের পরিবারের মধ্যে প্রচলন করার প্রবল ইচ্ছা তাহার হৃদয়যন্ত্রকে সদাসর্ব্বদা নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

হিন্দুসমাজের অনেকেই আজকাল ইংরেজী শিখিতেছেন। সেইজন্য যদিই বা তাঁহাদের ভাবে ও আদর্শের পরিবর্ত্তন দেখা যায়, তাহাতে তাঁহাদের কোন দোষ দেওয়া যায় না। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা ইংরেজের তথা ইয়োরোপের ভালটুকু না নিয়া মন্দগুলিই বেশী গ্রহণ করিয়াছি। যে গুণে আজ ইয়োরোপ সমস্ত জগতের উপর প্রভুত্ব করিতেছে, যে গুণে আজ ইয়োরোপ জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদের অধিকারী, সেই গুণের সামান্যতম অংশও যদি আমরা নিজের করিয়া লইতে পারিতাম তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা শ্লাঘার বিষয় আর কিছু থাকিত না। কিন্তু ১৫০ বৎসর ইংরেজের সহিত একত্র থাকিয়া তাহাদের ব্যবসায়বুদ্ধি, কর্ম্মপটুতা, একাগ্রতা, একতা, সাহসিকতা ও সততা প্রভৃতি গুণের অংশীদার হইতে পারি নাই, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তাহাদের বিলাসিতা, দাম্ভিকতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি দোষগুলি বেমালুম হজম করিয়া ফেলিয়াছি।

অনুসৃত নীতি—

ইংরেজীশিক্ষাভিমানী আমরা কতকগুলি ইংরেজী নীতি (abstract principles) অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেকেরই দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় তাহার উপযোগিতা বা সার্থকতা উপলব্ধি করার ক্ষমতা নাই। অথচ ঐ সমস্ত নীতির অন্ধ অনুসরণ করিয়া সমাজের মধ্যে ঘোর বিপ্লব সংঘটন করিতেছি। উদাহরণ স্বরূপ প্রথমেই স্ত্রীশিক্ষার কথা বলা যাইতে পারে। ইংরেজ বলিতেছেন স্ত্রীশিক্ষার প্রসার না হইলে হিন্দুজাতির উন্নতির আশা নাই। কথাটা সত্য, কিন্তু কিরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত সে বিষয় ইংরেজ আমাদের হইয়া ভাবিতে পারেন না; পরন্তু আমাদেরই কিরূপ শিক্ষা উপযোগী হইবে তাহা চিন্তা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু সে চিন্তা করার শক্তি আমাদের নাই, সেইজন্যই ইংরেজের প্রদর্শিত পথ অন্ধভাবে অনুসরণ করিতেছি। ফল এই হইয়াছে যে, শিক্ষার নামে বিলাসিতা, শ্রমবিমুখতা, ভোগেচ্ছা কঙ্কালসার জীর্ণ হিন্দুসমাজকে আরও ভারাক্রান্ত করিতেছে। খনা, লীলাবতীর কথা ছাড়িয়া দিলেও প্রাচীনকালে মহিলারা ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন, শ্রদ্ধাবনত হৃদয় লইয়া একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রয়োজনীয় কার্য্যগুলি করিতেন, বিনয় ও নম্রতাদ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করিতেন, অকৃত্রিম সেবা দ্বারা সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন। বর্ত্তমান শিক্ষায় তৎপরিবর্ত্তে আস্থাহীনা প্রগল্‌ভা মহিলার উদ্ভব আমরা দেখিতে পাইতেছি। যদি বাস্তবিকই তাঁহারা শিক্ষিত হইতেন তাহা হইলে ক্ষোভের কিছুই ছিল না। কিন্তু শিক্ষা ত কিছু পানই না, পরন্তু কুশিক্ষা বা অত্যল্প শিক্ষার ফলে তাঁহাদের দ্বারা সমাজ কিম্বা পরিবারের উপকার অপেক্ষা অপকারেরই বেশী আশঙ্কা করা যাইতে পারে।

ইংরেজী নীতি (abstract principle) অনুসরণ করা অনুচিত এরূপ কথা বলিতেছি না, তবে সে নীতি আয়ত্ত (assimilate) না করিয়া শুধু অন্ধ অনুকরণ blind imitation করিলে বোধ হয় সুফলাপেক্ষা কুফলই অধিক হইবে। বস্তুতঃই সেই সমস্ত নীতির অন্ধ অনুকরণ করিতে গিয়াই আমরা হিন্দুসমাজের প্রাচীন অথচ সুদৃঢ় প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি। উদাহরণ স্বরূপ আরও কয়েকটি কথা বলা যাইতে পারে। অর্থনীতিশাস্ত্রে আমরা দেখিতে পাই যে জাতীয় ধন বৃদ্ধি করিতে হইলে, আমাদের স্বচ্ছন্দতার মাপ কাঠি একটু বড় করিতে হইবে। জার্ম্মাণী জাপান আমেরিকা প্রভৃতি এই নীতি অবলম্বন করিয়া শিল্পবাণিজ্যের বিস্তার করতঃ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধন সম্পদ আহরণ করিতেছে, আর

আমরা সেই নীতিরই অনুসরণ করিয়া সুদূর পল্লীগ্রামে পর্য্যন্ত অপরিমিত বিলাসিতার বিস্তার করিতেছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার দিন দিন দারিদ্র্যের ভয়াবহ ছবি বঙ্গের প্রত্যেক স্নিগ্ধ শ্যামলশান্তিময় গৃহে কি এক বিভীষিকা আনয়ন করিতেছে তাহা বলিবার আবশ্যক নাই, প্রত্যেকে বোধ হয় অল্লাধিক উপলব্ধি করিতে পারেন।

Individualistic good বা ব্যক্তিগত সুবিধার বিকৃতার্থ করিয়া আমরা হিন্দু পরিবারের শান্তি নষ্ট করিয়াছি। জ্যেষ্ঠ পালন করিবে কনিষ্ঠ সেবা করিবে, জ্যেষ্ঠ স্নেহ করিবে কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা করিবে, পরস্পর পরস্পরের জন্য স্বার্থকে খর্ব্ব করিবে, ইহাই ছিল আমাদের সমাজের মূলনীতি। আজ আমরা ব্যক্তিত্বের অনাবশ্যক এবং অশোভনীয় প্রসার করিয়া সেই শ্রদ্ধাস্নেহ বিজড়িত সম্বন্ধরজ্জু ছেদন করিতেছি।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের যে সময়ে এবং যে কারণেই প্রবর্ত্তন হউক না কেন, হিন্দুসমাজ যে সেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উপরই সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত এ বিষয় কাহারও মতভেদ নাই। আজ আমরা সেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছি, জাতিভেদ প্রথা উঠাইয়া দিতেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুসমাজের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি। জাতিভেদ প্রথা কার্য্যতঃ practically উঠিয়া যাওয়াতে সমাজের উপকার হইয়াছে কিম্বা সে আলোচনা করিব না; যদি জাতিভেদ প্রথা সত্য সত্যই একেবারে উঠিয়া যাইয়া গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইত, তাহা হইলে কোন ক্ষোভের বিষয় কিছু ছিল না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, জাতিভেদ ঠিক সেইরূপই আছে, শুধু প্রকারের বিভিন্নতা ঘটিয়াছে মাত্র পূর্ব্বে জাতি জন্মগত ছিল, এখন অর্থগত হইয়াছে, একটুকুমাত্র প্রভেদ। এ প্রকারের জাতিভেদের সার্থকতা কি বলা বড়ই কঠিন, তবে ইহা যে পাশ্চাত্য প্রথার অন্ধ অনুকরণের ফল ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমন্মথনাথ রায় এম এ, বি-এল।

অশ্রুময়

(৭)

পরদিন বিকালের দিকে এক পশলা বৃষ্টির পর, চোখের জলে মাখামাখি পরমসুন্দর মুখখানির উপরকার অতর্কিত হাসিটার মতই, সলিলসিক্ত নবীন পল্লবরাজির উপর সান্ধ্য সূর্য্যের রঙ্গিন আভা ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

জানালার কাছে দাঁড়াইয়াই বাহিরের খোলা বিচিত্র আকাশের খানিকটা চোখে পড়িতেছিল। খণ্ড, লঘু মেঘ, সাদা পাইল্ তোলা ছোট নৌকাগুলির মতই অনন্ত নীলিমার বুকে আনাগোনা করিতেছে। দু'একখানা কালো মেঘের শীর্ষে বিচিত্র রশ্মির ছটা, নিরাশার বুকে সুখের কল্পনার মতই রঙ্গিন্ হইয়া উঠিয়া জল্ জল্ করিতেছে!

অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া যখন দুই চোখ্ জ্বালা করিয়া উঠিল, তখন জানালার দিক্ হইতে পিছন ফিরিতেই প্রতিমা দেখিল, ঘরের মধ্যে টেবিলটার ঠিক্ কাছটীতেই উৎপল দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

উৎপলের ম্লান মুখের দিকে চাহিতেই প্রতিমার দুই চোক জলে ভরিয়া আসিতেছিল, কিন্তু সে জোর করিয়াই মুখের উপর হাসি আনিয়া, "তুমি কখন এলে ঠাকুরঝি, আমি তো কিচ্ছুটী জানতে পাইনি," বলিয়াই কাছে আসিয়া উৎপলের হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল, "বেলা পড়ে গেছে, চল্, তোর চুল বেঁধে দি'; এ চুলের বোঝা এম্নি দেখলে তোর কর্ত্তাটি আমাকে মনে মনে যে গাল দেবেন, সেটি আমি নিশ্চিতই জেনে রেখেচি!"

এক নিশ্বাসে এত গুলি কথা বলিয়া ফেলার পরও যখন উৎপল এতটুকুও উৎসাহ না দেখাইয়া শুধু মলিন মুখে কহিল, "কি হবে চুল বেঁধে, তুই চল্ মার কাছে! আজ সমস্তদিনে একবারটী যাসনি! মুকু আর আমি কতই তো বল্লাম,—কিন্তু সেই যে বিছানা নিয়েছেন আর এতবড় বেলাটা কেটে গেল, কিছুতেই কি উঠাতে পারলাম!"—তখন প্রতিমার দুই চোখের সম্মুখের আলো যেন একেবারেই

নিভিয়া গেল; এবং একটা কান্নার ঢেউ বুকের ভিতরে ছাপাইয়া উঠিয়া তাহার গলাটা একেবারেই বুজাইয়া দিতে চাহিল, কিন্তু তবু সে জোর করিয়াই অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে কহিল, "প্রত্যেক খুটিনাটিকে খুব শক্ত একটা কিছু করে তোলাই যে তোদের কাজ তা আমি তো বেশ্ ক'রেই জানি!" এবং উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার জন্য খানিকটা অগ্রসর হইয়া গেল। তার পরই হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "হাঁ, তুই ওখানে দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছতে থাক্! আচ্ছা, তোদের হ'ল কি, বলতে পারিস্? আর এমন পানসে চোখও তোদের এই গোষ্ঠীর!"

তার পর মুহূর্ত্তে একেবারেই চুপ করিয়া যাইয়া মনে মনে কহিল, "শুধু আমিই বুঝি তোদের মাঝখানে এমন একজন এসে পড়্লাম, যার বুকটাও পাষাণ দিয়ে বাঁধানো, আর চোখ ছুটোও একেবারেই মার্বেল পাথরের তৈরী!"

কিন্তু এমন একটা কথা ভাবিলেও, সে মনে মনে ঠিক্ই জানিয়া রাখিয়াছিল যে, আজ এই এতবড় বাড়ীটার সমস্ত নিরানন্দ দূর করিবার ভার শুধু তাহার উপরেই অর্পণ করিয়া নিষ্ঠুর দেবতাটী নিশ্চিন্ত রহেন নাই, সঙ্গে সঙ্গে সকলের বেদনা হরণ করিয়া লইবার ভারও তাহারই উপর দিয়া রাখিয়াছেন!

ওরে, অদৃষ্টের এমনি তীব্র উপহাস যে, যে বেদনা দিয়া গেল, সে যে কত বড় নিষ্ঠুর, সে বিচার কেহই করিবে না। শুধু সেই যে কতখানি ভাগ্যহীনা প্রত্যেকের করুণ ইঙ্গিতে তাহাই ফুটিয়া উঠিয়া নিশিদিন তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবে! অথচ তাহার এই যে এত বড় দুর্ভোগ, এটা তাহার নিজের কোন অপরাধের জন্যই তো নহে!

কিন্তু এটা তবু একটা মস্ত সত্য কথা যে, সে সত্যই অত্যন্ত দুর্ভাগিনী. এ কথাটা সে নিজের কাছেও যেমন আজ আর অস্বীকার করিতে পারে না,—তেমনি বাইরের দশ-জনের কাছেও এ খবরটার সত্যতা এতটুকু প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না!

এই বাড়ীটার মধ্যে এই অদ্ভুত প্রকৃতির মেয়েটাকে উৎপল যেমন করিয়া চিনিয়াছিল, তেমন করিয়া আর কেহই চিনিতে পারে নাই। তাই সে হঠাৎ কাছে আসিয়া প্রতিমার দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "দেখ্ বৌদি, তুই যদি ঠিক্ এম্‌নি করেই সব চাপা দিয়ে নিজেকে নিয়ে ছুটোছুটি করিস্, তা' হলে তুই ক'দিন বাঁচ্‌বি!"—

মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত দৃষ্টি তুলিয়া ধরিয়া উৎপলের মুখের দিকে চাহিয়া প্রতিমা বুঝিল যে, এর কাছে ফাঁকিটা যেমন একেবারেই চলিবে না, তেমনি এর গলা ধরিয়া কাঁদিতে বসিয়া গেলেও শুধু কান্নার হাটই মিলানো হইবে!

সুতরাং সে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে কহিল, "দেখ্ ঠাকুরঝি, ও চোখের জলের ভারটা আমি তোদের উপর দিয়েই নিশ্চিন্ত হয়ে বসেচি! সবাই গলা ধরাধরি করে কাঁদতে বসে গেলে দুনিয়া একটুও অচল হ'য়ে রইবে না! শুধু কতকগুলি প্রাণীর মুখে তৃষ্ণার সময় এক ফোঁটা জলও পড়্বে না, আবার খিদের সময় দুটো যা' হোক্ যোগাড়ও হয়ে উঠ্বে না! বরং চোখের জল না ফেলেও বাঁচা চল্তে পারে, কিন্তু ওটাকে উপেক্ষা করে রক্তমাংসের শরীর যে মোটেই বয় না, এটাতো আর দু'বার করে বল্বার দরকার হবে না।"

উৎপল মনে মনে কহিল, "হাঁ, মেয়ে বটে! তোর মর্ম্ম যে বুঝ্ল না, সে যে কত বড় ভুল করে গেল, তা' তাকে একদিন যিনি বেশ্ ভাল করেই জানিয়ে দেবেন, তিনি আজ বুঝি তোর বুকের মাঝের প্রত্যেকটা নিঃশ্বাস গণে গেঁথে ঠিক্ করে রাখ্চেন, আর তোর দুই অশ্রুহীন চোখের জ্বালাটাকে জমিয়ে দারুণ করে তুল্চেন!"

প্রতিমা কহিল, "আচ্ছা বেশ্ কথা, তোদের এই চোখের জলের ফল তো এতদিন পাস্‌নি, এবার না হয় একটু,"—বলিয়াই উৎপলের মুখের দিকে চাহিয়া একেবারেই চুপ করিয়া গেল।

মানুষের চোখের দৃষ্টির ভিতর দিয়া যে এমন করিয়া অন্তর বেদনার পরিচয়টা ফুটিয়া উঠিতে পারে, তাহা সে বোধ হয় এই প্রথমই লক্ষ্য করিয়া শিহরিয়া উঠিল। তার পর প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "না ঠাকুরঝি, তোর কাছে আর বেশী কথা বলব না। আজ আমাকে তুই ক্ষমা কর্! তোকেই আমার সব চেয়ে বেশী ভয় ছিল; তোর কাছেই যে আমি ধরা পড়ে যাব, তা' আমি ঠিকই জান্তাম্। এ পোড়া চোখের জল দেখ্তে চাস্‌নে, ঠাকুরঝি,—তা' হলে তুইও বাঁচবি নে, আর বাঁচবে না! নিজের কথা কিছু ধরিনে। বিধাতাপুরুষের খাতা থেকে সে পাতাটা অনেক

পূর্ব্বেই হারিয়ে গেছে,"—বলিয়াই প্রতিমা দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

যে জানালার কাছটীতে কিছুকাল পূর্ব্বে প্রতিমা দাঁড়াইয়াছিল, উৎপল সরিয়া আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল।

তখন অস্তমিত সান্ধ্যসূর্য্যের রঙ্গিন রশ্মিজাল মলিন হইয়া গিয়াছিল, দূর পল্লীপ্রান্তের বাঁশ ঝাড়ের কাছ দিয়া নিবিড় ধূমরেখা আসন্ন সন্ধ্যার সূচনা করিতেছিল। আঁকা বাঁকা পথটী ধরিয়া পল্লীবধূর জল আনা শেষ হইয়া গিয়াছে! দূরের গ্রাম্য দেবালয়ে আরতির কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিতেই, উৎপল তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ঠাকুর ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

সেখানে সান্ধ্য আরতির আয়োজন শেষ করিয়া দিয়া আঁচলখানি ঘুরাইয়া গলায় জড়াইয়া প্রণাম করিতে করিতে অস্ফুটস্বরে কহিল, "ও পাষাণ ঠাকুর, তুমি সত্যি-কার পাষাণের মতই নির্ব্বিকার হয়ে রইলে; কতই যে তোমাকে ডাকলাম, কই, তোমার পায়ের কাছে তার একটা ডাকও কি পৌঁছাল না!"—

"তা' কি হয়রে পাগ্‌লী, একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাসও যাঁর অগোচরে পড়তে পায় না, তাঁর কাছে প্রাণের ডাক্ পৌঁছবে না, এমনটা তো হ'তেই পারে না, রাণি!"—

উৎপল চমকিয়া উঠিয়া ফিরিয়া চাহিল। ঠিক্ তাহার পিছনে কখন সতীশ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—যেন তাহারই প্রাণের ঠাকুর কখন মূর্ত্তি ধরিয়া বাহিরে আসিয়াছেন!

উৎপল সতীশের দুইপায়ের উপর মাথা রাখিয়া মনে মনে কহিল, "বুঝি ভিতরে ভিতরে এতক্ষণ এইটুকুর অপেক্ষায়ই ছিলাম। তোমার মুখ দিয়ে শোনা কথাটা আমার কাছে যে কত বড় একটা অভ্রান্ত সত্যের মূর্ত্তিতে দেখা দেবে, সেটা শুধু অন্তরে অন্তরে আমিই তো ভাল করে জেনেচি!"—

তার পর মুখ তুলিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, "ঠাকুরঘরেও একটু নিরিবিলি পাব না, এখানেও তুমি এসে দাঁড়িয়েচ!"—

সতীশ দুই হাতে উৎপলকে টানিয়া তুলিয়া কহিল, "দুনিয়ার আঘাত পেতে সুরু করেই ঠাকুরের কাছে এসে জানাও যে 'ও ঠাকুর তুমি আমার কথা শুন্‌লে না!—ওরে, এ পথটা চল্‌তে গেলে কত বাধা-বিঘ্নই যে দু'পাশে ঠেলে যেতে হবে"—কথা শেষ করিতে না দিয়া উৎপল তাড়া-তাড়ি ডান হাতে সতীশের মুখ চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—

"থাক্, তোমার আর অমন করে ভয় দিতে হ'বে না, প্রভু!"—

সতীশ উৎপলের হাতের উপরেই ক্ষুদ্র একটু চুম্বন দিতেই সে হাসিয়া হাত সরাইয়া লইল।

"আচ্ছা, না হয় নাই বা বল্‌লাম্! কিন্তু আজ এই ঠাকুরের সাম্‌নেই তোমাকে একটা কথা বল্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে, রাণি! সেইটেই শুধু বলব। দুনিয়াটাকে যতটা কোমল মধুর বলে মনে হয়, ঠিক্ তেমনটাই নয়। এর মাটি, পাথরে কঠিন আঘাত দেবেই। আলোর পাশে ছায়ার মতই এর সুখের পেছনেই দুঃখের নিবিড় নিষ্ঠুরতা রয়েচে। তাকেও স্বীকার করে নিলেই তবে দুনিয়াটাকে ঠিক্ চেনা যাবে!"

"আচ্ছা, আচ্ছা আমি ও সব খবর জান্‌তে চাইনে! কি দরকার আমার ও সব দিয়ে!"—বলিয়াই উৎপল সতীশের হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল, "চল, ঘরে চল;—তোমার চোখের অম্‌নি দৃষ্টি দেখ্‌লে আমার বুকের মধ্যে সত্যি কেমন করে ওঠে!"—

সতীশ তাহার দুই চোখের নিবিড় ম্লানদৃষ্টি এই সংসার-জ্ঞানানভিজ্ঞা নারীর মুখের উপর কিছুক্ষণ স্থির করিয়া রাখিল, তার পরই একটা চাপা নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিল,—

—"তোমার গায়ে দুঃখের আঁচড়টীও না লাগে, জীবনে এর চেয়ে বড় কামনা তো আমার আর কিছুই নেই!"—

স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া নিতান্ত অকারণেই দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিতেছিল।

সে সতীশের হাত ছাড়িয়া দিয়া আর একবার অঞ্চল-প্রান্তে কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ঠাকুরের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

উঠিয়া দাঁড়াইয়াই দেখিল, সতীশ মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

"আঃ, তোমার মুখের হাসি দেখে বাঁচ্‌লাম" বলিয়াই উৎপল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হাসিয়া উঠিল।

ঘরের কাছ পর্য্যন্ত সতীশকে পৌঁছাইয়া দিয়া উৎপল কহিল, "খোকনকে একটু দেখো; যদি কেঁদে ওঠে,"—

—"তোমার কাছে দিয়ে আস্‌ব এই তো! আচ্ছা, সে আমি খুব পার্‌ব!"—

—"ওগো, না গো, তাকে একটু রেখো! কাঁদলে"—

—"হাঁ, কাঁদলে কি করব তা' বলে যাও! আমার কাছে তার খাবারের ভাণ্ডারটী তো নেই, লক্ষ্মীটী,"—

"যাও, আমি পারিনে তোমার সঙ্গে,"—বলিয়াই কুটিল-দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে একবার চাহিয়াই উৎপল দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

সতীশ ডাকিয়া কহিল "এ লোকটা নিতান্তই একলাটী রইল, সেটা একেবারেই ভুলে যেওনা কিন্তু!"—

(৮)

সতীশের কথা শুনিতে শুনিতে স্মিতমুখী উৎপল ক্ষমাসুন্দরীর পূজার ঘরের কাছে আসিয়া দেখিল, তিনি তখনও মোটা চাদরটা মুড়ি দিয়া পড়িয়া রহিয়াছেন।

প্রতিমা নীরবে পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছিল। উৎপল আসিতেই প্রতিমা ডাকিল, "মা, ওঠ, অঞ্জলিটে দিয়ে নাও।"—

এর চেয়ে বেশী কথা বলার শক্তি প্রতিমার আজ আর ছিল না। তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু তবুও আজ সে বেশ্ করিয়াই জানিয়া রাখিয়াছিল যে, তাহার সমস্ত লজ্জা ও অপমানের উপরেও তাহার কর্ত্তব্য অনেকটা বেশী বাড়িয়া উঠিয়াছে।

তাই সে জোর করিয়াই শান্তস্বরে কহিল, "এমন করে পড়ে রইলে তুমি, মা, এতে যে আমাদের অকল্যাণ হবে! ঠাকুরঝিরা মুখ মলিন করে ঘুরচে, তুমি যদি না ওঠ, ওরা কার মুখের দিকে চাইবে?"—

ক্ষমাসুন্দরী তিলমাত্রও বিলম্ব না করিয়া উঠিয়া বসিলেন এবং দুই হাতে প্রতিমার মাথাটা বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া কিছুক্ষণ একেবারেই চুপ করিয়া রহিলেন, তার-পর ধীরে ধীরে কহিলেন, "ওরে, সবই তো আমি বুঝি, কিন্তু ভাবি, এমন কি মহাপাপ করেছিলাম যে, তোদের এ কাঁচা বয়সের হাসিখেলা দেখে চোখ্ জুড়াব, তাও অদৃষ্টে ঘটল না। ওরে, তোকে যে দিন কর্ত্তারা ঘরে এনেছিলেন, কত আহ্লাদে বরণ করে ঘরে তুললাম, কিন্তু তখন তো একবারটীও মনে করিনি, যে, তোকে এই ঘরেই এম্নি করে ব্যথা সইতে হবে!"—

কথা শুনিয়া প্রতিমার বুকের মধ্যে শুকাইয়া উঠিতে-ছিল, তবু সে জোর করিয়া মুখের উপর হাসি টানিয়া আনিয়া কহিল, "ঐটে তোমার একটা মস্ত ভুল, মা! এমন সোণার সংসারের মধ্যে যাকে কত আশা করেই নিয়ে এসেছিলে, সে যে তোমাদের সবারই ব্যথার কারণ হ'য়ে উঠেচে, এর চেয়ে বড় দুঃখ আর তার কিছুই তো নেই, মা! নইলে, ঠাকুরঝিদের মত বোন্ যে পায় এবং তোমার মত মায়ের কোলে ঠাঁই পেয়ে যে কৃতার্থ হয়ে গেছে, তার কাছে ও কথা বললে চলবে কেন, মা!" বলিয়াই তাড়া-তাড়ি নীচু হইয়া ক্ষমাসুন্দরীর পায়ের উপর মাথা ঠেকাইতে তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

ক্ষমাসুন্দরী দুইহাতে বধূকে টানিয়া তুলিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "কর্ত্তা বলতেন, 'এ সোণা আমি দুঃখের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিয়ে এসেচি। এ বংশের গৌরব আমার এই ছোট্ট মা-টীই রক্ষে করতে পারবে, সে কথা, গিন্নি, আমি বেশ করে জেনেই একে নিয়ে এসেচি। একে যত্ন করে রেখো, কোনও দুঃখ দিও না, ভবিষ্যতের বংশ-প্রদীপ এর কোল থেকেই আমার কুল উজ্জ্বল করবে!' ঠাকুর বলতেন 'এবংশে কেউ মহাপাপ করেনি', এসব কথাও আমি এই কাণেই শুনেচি; আর এম্নি পোড়া অদৃষ্ট আমার যে, এসবও আমাকে চোখে দেখে যেতে হ'ল! কিন্তু শুধু এই কথাটাই ভাবি যে, ওরে, এসব দেববাক্যি কি মিথ্যে হবার?"

সরযূ দুয়ারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে কহিল, "দেববাক্যি মিথ্যে হয় না, মা! এত অল্পেই বিশ্বাস হারিয়ে ফেললে চলবে কেন? ঠাকুর এর চেয়েও বড় আঘাত যদি কোনও দিন দিয়ে বসেন তখন কি করবে মা?"

ঠিক্ এম্নি ধরণের কতকগুলি কথা সতীশের কাছ হইতে এই মাত্র শুনিয়া আসিয়া উৎপলের মনটা পূর্ব্ব হইতেই ভার হইয়াছিল এবং সে একথাও জানিত যে, এসব বিষয়ে সরযূ সতীশেরই শিষ্যা। তাই অস্পষ্ট স্বরে তর্জ্জন করিয়া কহিল, "তুই যা, তোর বোনাইয়ের কাছে! সৃষ্টি ছাড়া কথারে বাপু এ দুটীর! গুরুর উপযুক্ত শিষ্যাই জুটেচে।"

সরযূ কহিল, "তা' যাচ্ছি দিদি, খোকন্ কান্না সুরু করেচে শুনে এলাম! কিন্তু সত্যি দিদি, দুঃখের নগ্নমূর্ত্তিটাকে একটু আগে থেকেই চিনে রাখ্লে ক্ষতি ত কিছু নেইই, বরং দুঃখকে সহ্য করবার শক্তিটা বেড়ে যায়। কিন্তু তা' কি কেউ পছন্দ করে?—করে না ত! আর করে না বলেই তো এত গোল!"

সরযূ চলিয়া গেল।

উৎপলের ইচ্ছা হইতেছিল, সরযূকে টানিয়া বুকের মধ্যে আনিয়া বলে, "ওরে, তোর কচি-বুকের মধ্যে কতখানি দুঃখকেই তুই আর নগ্ন করে দেখেচিস্! দুঃখের কোথায় আরম্ভ এবং কোথায় শেষ সে খবরটা এই বয়সেই তোর কাছে তো এখনই পৌঁছায় নাই রে! কিন্তু যেদিন পৌঁছিবে সেদিন দুঃখের সে রুদ্র নগ্নমূর্ত্তি দেখে তুই একেবারেই মুসড়ে না যাস্, শুধু এই একটা কথাই যে এবাড়ীটার সকলেরই বুকের মধ্যে তীক্ষ্ণ কাঁটার মতই নিশিদিন বিঁধে রয়েচে।"

কিন্তু আজ সমস্ত দিন ধরিয়া তাহার যে কি হইয়াছে, তাহা সে যেমন বুঝিতে পারিল না, তেমনি তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল যে, চোখের জল জিনিশটাকে বাধা দিতে গেলেই ও আরও বেশী করিয়া দেখা দেয়।

তাই সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া চোখ দুটো বেশ করিয়া মুছিয়া ফেলিয়া সোজাসুজি মার কাছে যাইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "হুঁ! তবেই হয়েচে! বৌটাকে এম্‌নি করে তুমিই অতিষ্ঠ করে তুলবে দেখচি! আচ্ছা মা, এমন কি ব্যাপার হয়েচে যে, ইষ্টদেবতার পূজাও ভুলে যেয়ে এই রাত পর্য্যন্ত পড়ে রইলে। ছেলে চাকরী বাকরী করতে কারই বা বিদেশে না না যায়? এখন ওঠ বাপু, বৌটাকেও একটু নিশ্বেস্ ফেল্‌তে দাও।"

পূজার আয়োজন সরযূ পূর্ব্বেই করিয়া রাখিয়াছিল। ক্ষমাসুন্দরী আসনের উপর বসিতেই উৎপল ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

যত জোর দিয়াই সে কথা বলুক না কেন, আর এক মুহূর্ত্তও এখানে অশ্রুশূন্য চোখে দাঁড়াইয়া থাকা তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। কারণ, জননীর দিকে সে যখন চাহিয়া দেখিল, তখন মনে হইল, তাঁহার মুখের উপর দিয়া কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তনই এই ক'য়েকটা ঘণ্টার মধ্যে আসিয়া গিয়াছে!

ঠিক্ যেন দশবৎসর বয়স বাড়িয়া গিয়াছে, এম্‌নি ভাবে আসনের উপর আসিয়া বসিলেন এবং যে ভাবে মালাগাছটী হাত বাড়াইয়া তুলিয়া লইলেন, তাহা দেখিয়া উৎপলের বুক ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল।

প্রতিমা কহিল, "মা, তুমি অঞ্জলিটে আজ একটু তাড়াতাড়ি দিয়ে শেষ কর। আমি যা' হোক্ দুটো কিছু সিদ্ধ করে নামাইগে।"

প্রতিমা চলিয়া গেল। তাহার গমন পথের দিকে স্নেহ-পরিপ্লুত দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ক্ষমাসুন্দরী কহিলেন, "দুঃখের কষ্টিপাথরে যিনি তোকে যাচাই করে নিয়ে এসেছিলেন, এখন ভাবি, তিনি কি আগে থাক্‌তেই সব জান্‌তেন? আর তা' না জান্‌লেই বা তাঁর মুখ দিয়ে অমন কথা বেরুবে কেন? এই পূজোর আসনে বসেই আমার মনে হচ্ছে সরযূর মুখ দিয়েই তো তিনি আমাকে জানিয়ে দিলেন যে, "দেববাক্যি মিথ্যে হয় না।" আজ শুধু সেই জোরেই আবার বল্‌চি যে, আমি দেখি আর নাই দেখি মা লক্ষ্মীটি আমার, তোর মুখে হাসি ফুটবেই।—তুই যে ঠাকুরের দেওয়া দুঃখকে স্বীকার করে নিতে পেরেচিস্, তার চেয়ে বড় পাওয়া সংসারে তো আর কিছুই হতে পারে না।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত বি, এ।

ইষ্টলীন

দ্বিতীয় খণ্ড

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্বামীর সঙ্গে ইন্দ্রাবেল গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। ছেলে-পিলেদের আবার কাছে পাইয়া প্রাণ তাঁহার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আর লেডিজনকে যে দূরে এড়াইয়া আসিয়াছেন, তাহাতে বড় একটা স্বস্তিও অনুভব করিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই কেমন একটা উদাস নিরানন্দ ভাব আসিয়া তাঁহার চিত্ত অধিকার করিল। মনে হইত যেন অতি প্রিয়জন কেহ একা তাঁহাকে এই পৃথিবীতে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে! প্রাণে বড় গভীর একটা অবসাদ, বড় একটা শূন্যতা তিনি অনুভব করিতেন। লেডিজনের চিন্তা মন

হইতে দূর করিয়া দিবার জন্ত অবিরত চেষ্টা করিতেন। কিন্তু করিলে কি হইবে? একবার যদি চাপিয়া দেন, তখনই আবার তার মোহনমূর্ত্তি প্রাণ ভরিয়া জাগিয়া উঠে। আনমনা ভাবে বসিয়া আছেন,—অলক্ষ্যে আপনা হইতে এই চিন্তায়ই ইজাবেলের মন ভরিয়া উঠিত. আহা, যদি আর একটিবার, একদিনের জন্ত, একঘন্টা—একটুকালও যদি তাহাকে দেখিতে পান.তারপর তিনি মনটা বেশ স্থির ও শান্ত করিয়া নিতে পারেন। একদিন দুই দিন নয়, অনেক দিন ইজাবেল এইরূপ চিন্তায় নিজের কাছে নিজে ধরা পড়িয়া ঘৃণায় লজ্জায় আপন মনে আপনি যেন মরিয়া গিয়াছেন। এসব কথা ভাবিতে তিনি কখনও চান না.—বরং যাতে না মনে উঠে তারজন্তই সতর্ক থাকেন—কিন্তু তবু জোর করিয়া সব যেন মনের মধ্যে ঠেলিয়া উঠিত। অনবধানে জাগ্রত এমন মুহূর্ত্ত তাঁহার যাইত না, যখন এই চিন্তা তাঁহার চিত্তকে না রঙাইয়া তুলিত। আর রাত্রিতে নিদ্রার ঘোরে এই স্বপ্নই তিনি দেখিতেন। জাগিয়া শেষে কি গ্লানি কি বেদনাই না সারাটি প্রাণ ভরিয়া তাঁহার উঠিত। হায়, কোথায় সেই স্বপ্ন, আর কোথায় তাঁহার বাস্তব জীবন! আর ছি ছি! স্বপ্নেও যে এসব কথা তাঁহাকে ভাবিতে নাই। প্রাণপণ চেষ্টা তিনি করিতেন, এরূপ কোনও স্বপ্ন তিনি না দেখেন? কিন্তু কি করিয়া এড়াইবেন? মন যখন এইরূপ কোনও ভাবে ভরপুর থাকে, আর হিতাহিত বুদ্ধির প্রেরণায় সর্ব্বদাই একটা অস্বস্তি ও গ্লানি তার জন্ত অনুভূত হয়, নিদ্রাবস্থায় যখন এ প্রেরণা থাকে না, এই ভাবেরই অনুরূপ স্বপ্ন লোকে দেখিবে। নিদ্রা যখন ভাঙ্গিত, স্বপ্নের ঘোর কাটিত, অনুতাপে ইজাবেলের চিত্ত দগ্ধ হইত, অধীর যাতনায় তিনি ছটফট করিতেন। আকুল প্রাণে এই কামনাই কেবল করিতেন, যেন সময়ে চিত্তের এই দারুণ ব্যাধি তাঁহার সমূলে দূর হইয়া যায়। এখনই হইবে না, ইহা তিনি বুঝিতেন, কিন্তু সময় সকল আধি ব্যাধি সকল দুঃখ ক্লেশ লোকের হরণ করে, তাঁহার এই ব্যাধি, এই ক্লেশ কি দূর করিবে না?

কার্লাইল লেভিসনকে প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছিলেন, একটু অবসর হইলেই সার পিটারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন। সার পিটারের বাসগৃহ—লেভিসন পার্ক [illegible] হইতে অধিক দূরে নয়। একদিন প্রাতরাশের পর ঘোড়ায় চড়িয়া তিনি যাত্রা করিলেন,—দ্বিপ্রহরে গিয়া সেখানে পৌছিলেন। দ্বারবান্ একটি গৃহে নিয়া তাঁহাকে উপস্থিত করিল। জাঁকাল বেশভূষায় সজ্জিত সুন্দরী একটী যুবতী সেখানে বসিয়াছিলেন,—ইনিই সার পিটারের নব-পরিণীতা পত্নী লেডী লেভিসন। লেডী লেভিসন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি চান?"

"সার পিটারের কাছেই আমি একটা কাজে আসিয়াছি, মেম সাহেব।"

"সার পিটার বড় অসুস্থ,—কোনও কাজের কথা নিয়া কাহারও সঙ্গে তিনি দেখা করিতে পারেন না; করিলে শেষে বড় অস্থির হইয়া পড়েন।"

কার্লাইল উত্তর করিলেন, "সার পিটারের কথামতই আমি আসিয়াছি। দুপুর বারটায় তিনি আসিতে লিখিয়াছিলেন,—বারটা এই বাজিল।"

লেডী লেভিসন ঠোঁটে কামড় দিয়া গম্ভীর ভাবে শির নত করিয়া অগত্যা এই সাক্ষাৎকারে তাঁহার অনুমোদন জ্ঞাপন করিলেন। সেই মুহূর্ত্তেই একটি ভৃত্য আসিয়া কার্লাইলকে সার পিটারের গৃহে লইয়া গেল! ফ্রান্সিস লেভিসন তাঁর দেনা, আর বিশেষ ভাবে তাঁর দুর্ব্বৃত্ততা—এই সব সম্বন্ধে অনেক তীব্র আলোচনা করিয়া সার পিটার শেষে কহিলেন, "তার সব দেনা শুধিয়া দিয়া আজই তাকে আবার তার পায়ের উপরে আমি দাঁড় করাইয়া দিতে পারি। কিন্তু জীবনের শেষ পর্য্যন্ত বার বার আমাকে ইহাই করিতে হইবে, যেমন আগেও অনেক বার করিয়াছি। তার পিতামহ ছিল আমার একমাত্র ভ্রাতা, তার পিতা ছিল আমার বড় প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র। কিন্তু যেমনই ভাল লোক ছিল ইহারা এই হতভাগা হইয়াছে তেমনই লক্ষ্মীছাড়া একেবারে অপদার্থ সে, মানুষের মত একটা গুণও তাতে নাই।"

কার্লাইল উত্তর করিলেন, "তাঁর কথা শুনিয়া আমার বড় দুঃখ হইয়াছিল,—তাই বলিয়াছিলাম, আপনার সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁর দুরবস্থার কথা আপনাকে জানাইব। ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর দোষগুণ সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না।"

"যত কম জানেন ততই ভাল।—বোধ হয় সে চায়, তার সব দেনা শুধিয়া আবার নূতন করিয়া যাতে সে জীবন-

যাত্রা আরম্ভ করিতে পারে তাই করিয়া দিব,—সেই রকমই আমার মনে হইল।"

"কিন্তু কি করিয়া তা হইতে পারে? আমি এখানে আর সে আছে সেই সাগর পারে। সে যে কার কাছে কত ধারে, কত তার মোট দেনা, তার নিজের কাছে না শুনিয়া কিছুই বুঝিবার উপায় নাই,—এমনই বিশ্রী একটা গোলমাল করিয়া সব সে রাখিয়াছে। কতকগুলি দেনার টাকা আমি তাকে দিয়াছি, কিন্তু পাওনাদার শপথ করিয়া বলে, একপয়সাও তার পায় নাই। যদি সে কিছু করিতে চায়, এখানে তাকে আসিতে হইবে।"

"কিন্তু কোথায় সে আসিয়া দাঁড়াইবে? তাকে ত একেবারে লুকাইয়া থাকিতে হইবে।"

সার পিটার ত্রস্তভাবে কহিলেন, "আমার এখানে সে আসিতে পারে না। লেডী লেভিসন একদিনও তাকে এ বাড়ীতে স্থান দিবেন না।"

কার্লাইল তাঁহার স্বাভাবিক উদারতার প্রেরণায় বলিয়া ফেলিলেন, "ইষ্টলীনে তিনি থাকিতে পারেন, সেখানে কেহ তাঁর খোঁজ করিবে না। তবে এটা বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা যে, তাঁকে সাহায্য করিতে আপনার ইচ্ছা হইলেও, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ আপনার হইবার সম্ভাবনা নাই।"

সার পিটার কহিলেন, "আপনার এত অনুগ্রহের যোগ্য সে একেবারেই নয়। হাঁ, একটা কথা, আপনি কি তার উকিল হইয়া এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চান?"

"না।"

আরও দুইচারিটি কথার পর শেষে স্থির হইল, অবিলম্বে ইংলণ্ডে আসিবার জন্য ফ্রান্সিস্ লেভিসনকে পত্র লেখা হইবে।

বিদায় নিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র লেডী লেভিসনের সঙ্গে কার্লাইলের সাক্ষাৎ হইল। লেডী লেভিসন কহিলেন "তাঁর ভ্রাতার পৌত্র ফ্রান্সিস্ লেভিসনের কথা লইয়াই আপনি অবশ্য আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন?"

"হাঁ, তাই আসিয়াছিলাম বটে।"

"কিন্তু, যতদূর জানি, ফ্রান্সিস্ লেভিসন লোক ভাল নয়। এ কথা বলিলাম, তার জন্য ভরসা করি, কোনও অন্যায় ধারণা আমার সম্বন্ধে আপনার মনে নিয়া যাইবেন না। তিনি আমার স্বামীর নাতি এবং বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারীও বটেন। সুতরাং তাঁর বিরুদ্ধে এমন আমি শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়া আছি, এটা খুবই অসঙ্গত বলিয়া মনে হইবে। দুই তিন বৎসর আগে ফ্রান্সিস্ লেভিসনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তখন সার পিটারের সঙ্গে আমার বিবাহ হয় নাই,—তাঁকে জানিতামও না। আমাদের কোনও বন্ধুপরিবারের সঙ্গে ফ্রান্সিস্ লেভিসনের আলাপ পরিচয় ছিল, তাদের বাড়ীতেই তাঁর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। বন্ধুভাবে তাঁদের গৃহে তিনি কিছুদিন ছিলেন, যথেষ্ট আদর যত্নও তাঁরা করিতেন। কিন্তু এই সৌজন্যের বিনিময়ে অতি জঘন্য ব্যবহার তিনি তাঁহাদের সঙ্গে করেন,—অতি বিশ্রী কৃতঘ্নতার পরিচয় দেন। তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে আরও কতকগুলি কথা আমি তখন জানিতে পারি। মোটের উপর আমার বিশ্বাস, স্বভাবে ও আচরণে অতি নীচ, অতি জঘন্য লোক তিনি—জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এমনই থাকিবেন।"

কার্লাইল কহিলেন "তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে আমি কিছুই বড় জানি না। হাঁ, এই যে আপনার বন্ধু-পরিবারের সঙ্গে তাঁর দুর্ব্ব্যবহারের কথা বলিলেন, সেটা কি রকম জানিতে পারি কি?"

"তাদের সর্ব্বনাশ তিনি করেন—একেবারে সর্ব্বনাশ করেন, কার্লাইল সাহেব। অতি সরল সহৃদয় গ্রাম্য লোক তারা, ছল-চাতুরীর কথা কিছু বুঝিত না, পৃথিবীর লোক কত যে পাপাচার করিতে পারে, তাও জানিত না। ছলে ভুলাইয়া তার কতকগুলি বাকী দেনার বিলে তিনি তাদের নাম সহি করাইয়া নেন। বলিয়াছিলেন, মাস খানেকের জন্য তারা এই নামমাত্র দায়িত্ব গ্রহণ করিলে অনেক ঝঞ্ঝাট তাঁর কমিয়া যায়। কিন্তু সে টাকা আর তিনি দিলেন না। গোড়া থেকেই দিবার মতলব তাঁর ছিল না,—এই দেনাটা তাদের ঘাড়েই চাপাইয়া দিয়া সরিয়া পড়িবেন, তাই ভাবিয়াছিলেন। টাকাও অনেক,—তাদের যথাসর্ব্বস্ব গেল, বাড়ী ঘর ছাড়িয়া শেষে তাদের চলিয়া যাইতে হইল। আরও অনেক এমন কথা আমি বলিতে পারি, তবে তার দরকার কিছু দেখি না। সার পিটার বোধ হয় আপনাকে বলিয়াছেন, এই গৃহে তাঁকে স্থান দিতে আমি প্রস্তুত নই। হাঁ, তা নই-ই বটে।

লোকে বলে, সার পিটারের সম্ভাবিত উত্তরাধিকারী বলিয়া তাঁকে আমি হিংসা করি, দেখিতে পারি না। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়,—তাঁর এই অতি জঘন্য চরিত্রের জন্যই আমার এই আপত্তি। তাঁর সঙ্গে আত্মীয়ভাবে এক বাড়ীতে থাকিতে হইবে একথা মনে করিতেও আমার ঘৃণা বোধ হয়। সার পিটারের ইচ্ছা হয়, তাঁকে সাহায্য করিতে পারেন। যতবার খুসী তাঁর দেনা শুধিয়া দিতে পারেন, কিন্তু এই বাড়ীতে আমি তাঁকে আসিতে দিতে পারি না।"

কার্লাইল উত্তর করিলেন, "হাঁ শুনিলাম, সেটা আপনি ইচ্ছা করেন না। কিন্তু তাঁর সব দেনাপত্র চুকাইয়া তাঁকে আবার স্থিত করিয়া দিতে হইলে, ইংলণ্ডে আসিয়া সার পিটরের সঙ্গে তাঁর দেখা করিতেই হইবে।"

"একেবারে লুকাইয়া চোরের মত ছাড়া কি ইংলণ্ডে আসিয়া তিনি থাকিতে পারেন?"

"না, তা পারেন না। তবে আমি বলিয়াছি, তিনি ঈষ্টলীনে আসিয়া থাকিতে পারেন। আপনি হয় ত জানেন লেডী ইজাবেলের একরূপ আত্মীয়ও তিনি বটেন।"

"সাবধান কার্লাইল সাহেব! দেখিবেন, এই দয়ার বিনিময়ে আপনার বড় কোনও অহিত তিনি না ঘটান। ইহাই তাঁর রীতি।"

কার্লাইল হাসিয়া কহিলেন, "সেরূপ প্রবৃত্তি হইলেও, আমার কি ক্ষতি তিনি করিতে পারেন, দেখিতে পাই না। আমার মক্কেল কেহ তাঁর ভয়ে পলাইবে না, আমার ছেলেপিলেদেরও ধরিয়া তিনি মারিবেন না। টাকাকড়িও আমি খুব সাবধানে রাখি, তা চুরি করিয়া নিতে পারিবেন না। আর কয়দিনই বা তিনি থাকিবেন ওখানে।"

লেডী লেভিসনও একটু হাসিয়া কার্লাইলের করমর্দন করিয়া কহিলেন, "আপনার গৃহে হয়ত দুর্বৃত্ততার কোনও সুযোগ তিনি পাইবেন না। তবে এটাও স্থির জানিবেন, যদি কিছু পান, তা ছাড়িবেন না, অহিত একটা করবেনই।"

ফিরিয়া আসিয়াই কার্লাইল লেভিসনকে পত্র লিখিয়া দিলেন। কিন্তু কাজের ভিড়ে ইজাবেলকে এসম্বন্ধে কিছু বলিতে একেবারে ভুলিয়া গেলেন।

দিন দুই পরে কোনও ডিনারের ভোজে কি কথায় কথায় হঠাৎ ফিরিবার পথে কার্লাইলের মনে পড়িল, লেভিসনকে অবিলম্বে আসিতে লেখা হইয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইজাবেল, অতিথি কেহ আসিলে তাকে থাকিতে দেওয়ার মত ঘর বোধ হয় আমাদের ঠিক-ঠাক করা সর্ব্বদাই দুই একটা থাকে? নয়?—একজনের আসিবার কথা আছে।"

"ঘর ঠিকঠাক করা আছে বই কি? আর না থাকিলেও যখনই দরকার করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।"

"হাঁ, কাল রবিবার, কালই বোধ হয় তিনি আসিবেন। আমার বড় ভুল লইয়া গিয়াছিল, আগে তোমাকে একথা বলি নাই।"

"কে আসিবে?"

"কাপ্তেন লেভিসন।"

"কে!" যেন একটা আকস্মিক আতঙ্কের তীব্র কণ্ঠে ইজাবেল বলিয়া উঠিলেন, "কে!"

"কাপ্তেন লেভিসন। তাঁর দেনাপত্র সব শুধিবার একটা বন্দোবস্তের জন্য সার পিটার তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু লেডী লেভিসন সে বাড়ীতে গিয়া তাঁকে থাকিতে দিতে চান না। তাই আমি বলিয়াছি, ঈষ্টলীনে আসিয়া কয়দিন তিনি থাকিতে পারেন।"

ইজাবেলের সমস্ত মাথা যেন ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল, সকল ইন্দ্রিয়ের বোধশক্তি লুপ্ত হইয়া আসিল। প্রথম মুহূর্ত্তে তাঁহার মনে হইয়াছিল, যেন এই নীরস পৃথিবী ফাঁক হইয়া আনন্দময় দেবলোকের একটা পথ তাঁর সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দিল! কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, না না, ফ্রান্সিস্ লেভিসনকে আবার তাঁহার সঙ্গে আসিয়া এখানে মিলিতে দেওয়াই যাইতে পারে না। কার্লাইল লেভিসনের দেনার কথা, সার পিটারের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা, কি প্রকারে এই সব দেনা শোধ হইতে পারে, এই সব কথা বলিতে লাগিলেন, কিন্তু একটি কথাও ইজাবেলের কাণে গেল না। তিনি কেবলই ভাবিতে লাগিলেন, কি প্রকারে ইহা নিবারণ করা যাইতে পারে। ভাবিতে ভাবিতে শেষে বলিয়া ফেলিলেন, আর্কিবাল্ড, ফ্রান্সিস্ লেভিসন যে আসিয়া ঈষ্টলীনে থাকে, এটা আমি ইচ্ছা করি না।"

কার্লাইল উত্তর করিলেন, "মাত্র কয়দিনের জন্য বই ত নয়। হয়ত মোটে একদিনে কি দুইদিনেই কাজ হইয়া যাইবে। সার পিটারের খেয়াল হইয়াছে তার সব দেনা শোধ করিয়া দিবেন। তিনি দিবেন এইটা লোকে জানিতে

পারিলেই কাপ্তেন লেভিসন নির্ভয়ে দেশে চলা ফেরা করিতে পারিবেন ; যেখানে খুসী যাইতে পারিবেন।"

একটু অধীর ভাবে ইজাবেল বলিয়া উঠিলেন, "তা হইতে পারে, কিন্তু আমাদের বাড়ীতে কেন সে আসিবে?"

"আমি নিজে যে এই প্রস্তাব করিয়াছি। তুমি এটা পছন্দ করিবে না, তা ত জানিতাম না। কিন্তু আপত্তি কেন কর?"

"তাকে আমার মোটেই ভাল লাগে না। যাই হ'ক, ঈষ্টলীনে আসিয়া সে থাকিবে, এটা একেবারেই আমার ভাল লাগিতেছে না।"

"কি জান, এর আর উপায় কিছু নাই। হয়ত সে বওনা হইয়াছে কালই আসিয়া পড়িবে। আপনা হইতে আসিতে বলিয়াছি, এখন আসিলে কিছু আর বাড়ী হইতে তাকে বাহির করিয়া দিতে পারি না। তার আসাটা তোমার এত অপ্রিয় হইবে যদি বুঝিতাম, এ প্রস্তাবই আমি করিতাম না।"

"কাল! কালই সে আসিবে।" কাল লেভিসন আসিবে, ঐ একটি কথাই মাত্র ইজাবেলের কাণে গিয়াছিল।

কার্লাইল কহিলেন, "কাল রবিবার, আর কোনও কাজ নাই, খুব সম্ভব এই সুযোগটাই সে নিবে। কিন্তু সে কি করিয়াছে যে এত আপত্তি তুমি করিতেছ? কই, ওখানে থাকিতে ত তুমি বল নাই যে,তার উপরে এত বিরক্ত তুমি।"

"না—করে নাই সে কিছু।" ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে ধীরে ধীরে ইজাবেল এই উত্তর মাত্র করিলেন। তিনি বুঝিতে ছিলেন, আপত্তির যত কারণই দেখান, কিছুই টিকিবে না।

কার্লাইল কহিলেন, "লেডী লেভিসন তাকে খুব খারাপ লোক বলিয়া মনে করেন দেখিলাম। আগে নাকি তিনি তাকে জানিতেন। দুই একটা ঘটনার কথাও তিনি বলিলেন, —তা যদি সত্য হয়, তবে খুব খারাপ বলিতে হইবে। তবে এরূপও হইতে পারে, লেডী লেভিসন তাকে মোটে ভাল চক্ষেই দেখেন না।"

ইজাবেল কহিলেন, "এই রকমই একটা বিরূপ ভাব তাঁর আছে। ফ্রান্সিস্ লেভিসনও তাই বলিয়াছিল। ওরা কেউ কাহাকেও দেখিতে পারে না।"

—"যাই হ'ক, কয়দিন মাত্র সে ঈষ্টলীনে থাকিবে, তার দোষ গুণে আমাদের এমন কিছু আসিয়া যাইবে না। তোমারও মনে যেন একটা কুধারণা তার সম্বন্ধে আছে।"

কার্লাইলের মনে এই যে বিশ্বাস জন্মিয়াছে, তার প্রতিবাদে কিছু না বলিয়া ইজাবেল চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। মনটা বড় দমিয়া যাইতেছিল। হায়, স্বয়ং ভাগ্যদেবীই তাঁহার প্রতিকূল হইয়াছেন! এই লোকটি যদি তাঁহারই গৃহে উপস্থিত হয়, সর্ব্বদা তাঁর সঙ্গে মিলিতে মিশিতে হয়, তাকে ভুলিবার জন্য এই যে প্রাণপণ চেষ্টা তিনি করিতেছেন, তাহা সার্থক হইবে কি প্রকারে? ভাবিতে ভাবিতে সহসা লেডী ইজাবেল ফিরিয়া স্বামীর কাঁধে মাথাটি রাখিলেন।

কার্লাইলের মনে হইল, ইজাবেল বুঝি ক্লান্তি বোধ করিতেছেন। স্নেহভরে বাহুতে তাঁহার কটিদেশ বেষ্টন করিয়া ধরিয়া মাথাটি সরাইয়া বুকের কাছে আনিলেন, নিজের মুখখানিও নত করিয়া তাঁহার মুখের উপরে রাখিলেন। ইজাবেলের তখন মনে হইল, মনের কথা যতটা সম্ভব স্বামীকে এখনই বলিয়া ফেলেন। এই সবল বাহুই এই বিপদে তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিতে পারে। এই যে স্বামীর দেহে তিনি লগ্ন হইয়া আছেন, রক্ষা-স্তম্ভের ন্যায় ইহাই যে আজ এই আবর্ত্তে তিনি আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিতে পারেন। হায়, সরল শিশুর ন্যায় কেন তিনি আজ মনের কথা খুলিয়া বলিয়া এই আশ্রয় চাহিলেন না? আর কেন? সাহসে কুলাইল না। একবার, দুইবার, মনের কথা মুখের আগে আসিল, কিন্তু বাহির হইল না। পরে কতদিন ইজাবেল ঠিক এই সময়ের কথা ভাবিয়াছেন আর পরিতাপ করিয়াছেন, কেন মুখ ফুটিয়া স্বামীকে তখন মনের এই কথা বলেন নাই?

পরদিন রবিবার—বড় বৃষ্টি হইতেছিল। দুপুরে একটু থামে, পরে আবার খুব বৃষ্টি আরম্ভ হয়। তাঁহারা গির্জ্জায় গিয়াছিলেন, ফিরিবার সময় ভগ্নীর নিকট গিয়া কার্লাইল কহিলেন, "কর্ণেলিয়া, বড় বৃষ্টি হইতেছে, গাড়ীতে কেন আমাদের সঙ্গে চল না?"

না, তা হইতেই পারে না। একেবারে মুষলধারেই কেন বৃষ্টি হউক না। গির্জ্জায় যাইতে কি গির্জ্জা হইতে ফিরিতে কর্ণেলিয়া যে গাড়ী চড়িবেন, ইহা একেবারেই অসম্ভব। ভ্রাতার কথায় ভ্রূক্ষেপও না করিয়া কর্ণেলিয়া তাঁহার বৃহৎ ছাতাটি খুলিয়া হাঁটিয়াই গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে কতদূর গিয়া কার্লাইল দেখিলেন, কর্ণেলিয়া ফুটপাথের উপর দিয়া চলিয়াছেন,—কয়েকটি দাস-দাসী তাঁহার পশ্চাতে।

ইহারা যে কার্ণেলিয়ার সঙ্গে যাইতেছিল, এরূপ কেহ মনে করিবেন না। আজ রবিবারে, বিশেষ গির্জ্জা হইতে ফিরিবার পথে, দাসদাসী কাহারও আনুচর্য্য কার্ণেলিয়া গ্রহণ করিবেন না। তিনি তাঁর মনে, ইহারাও তাদের মনে, যাইতেছিল। মাথায় সেই ছাতা—ছাতাটি এত বড় যে একটা খড়ের গাদাও তাহাতে ঢাকা পড়ে। শীত, গ্রীষ্ম, রৌদ্র, বৃষ্টি যখন যেমন অবস্থাই থাক, সর্ব্বদাই কর্ণেলিয়া এই ছাতাটি লইয়া বাহির হইতেন। বড় হিসাবী মেয়ে তিনি,—এখন রৌদ্র আছে, কে জানে পথে যদি কোথাও বৃষ্টি নামে, তখন কি হইবে? তাই ছাতাটি ছাড়িয়া তিনি কখনও বাহির হইতেন না। একটা প্রবাদ আছে, 'দিন ভাল থাকিলে ছাতা নিয়া বাহির হইও, যদি বৃষ্টি হয়, তখন যা খুসী করিতে পার।' অর্থাৎ বৃষ্টি হইলে ছাতা লোকে নিবেই, সেজন্য উপদেশের আবশ্যক কাহারও হয় না। ভাল দিনেই ভাবী বৃষ্টি-বাদলের আশঙ্কায় ছাতা নিবার কথা লোককে বলিতে হয়। কার্ণেলিয়া সর্ব্বদাই এইরূপ সব প্রবাদের উপদেশ অনুসারেই চলিতেন, যে কখনও ঠকিতে কিছুতে না হয়।

কার্ণাইল বাড়ীর ফটক পার হইয়া সিঁড়ির কাছে আসিয়াছেন, তখন তাহাদের কন্যা বালিকা ইজাবেল কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া আসিল।

"বাবা! বাবা! এস—শীঘ্র এস!—বুঝি মরিয়াই গিয়াছে।"

মেয়েকে কোলে তুলিয়া নিয়া কার্ণাইল কহিলেন, "চুপ! চুপ! তোমার মা ভয় পাইবেন! কেন, কি হইয়াছে?"

ইজাবেল তখন সব কথা খুলিয়া বলিল। জয়েস্ নিষেধ করিয়াছিল,—কিন্তু তার কথা না শুনিয়া সে বৃষ্টিতে বাহির হইয়া ছুটাছুটি করিতেছিল। জয়েস্ তাকে ধরিয়া নিবার জন্য দৌড়িয়া আসিতে পা পিছলাইয়া পড়িয়া গিয়াছে,—নড়ে চড়ে না, একেবারে মড়ার মত পড়িয়া রহিয়াছে।"

ইজাবেলকে তার মাতার হাতে দিয়া কার্ণাইল ছুটিয়া গেলেন। জয়েস্ সিঁড়ির নীচে পড়িয়া আছে—যাতনায় কাতরাইতেছে। কার্ণাইল অবিলম্বে লোকজন ডাকিয়া ধরাধরি করিয়া তাকে গৃহমধ্যে লইয়া আসিলেন। একজন চাকর গাড়ী লইয়া ডাক্তারের জন্য ছুটিয়া গেল।

কার্ণাইল ও লেডী ইজাবেল জয়েসের কাছে বসিয়া আছেন,—কর্ণীবিবিও ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে ছুটাছুটি করিয়া এরূপ রোগীর জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন হইতে পারে, সব গুছাইয়া রাখিতেছেন, আর বকাবকি করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে জয়েস্‌কেও এটা ওটা খাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন, যদি কিছু আরাম তাতে পায়। কিন্তু জয়েসের সাধ্য ছিল না, কিছু মুখে তোলে। মোটের উপর কর্ণীবিবির এত ব্যগ্রতায় আর বকাবকিতে জয়েস্ আরাম অপেক্ষা অস্বস্তিই বেশী বোধ করিতেছিল।

বালিকা ইজাবেল চুপিচুপি ঘরে ঢুকিয়া মাতাকে টানিয়া বাহিরে লইয়া গেল। কহিল, "মা, একটি ভদ্রলোক গাড়ীতে আসিয়াছেন, তাঁকে চিনি না। একটা বাক্সও আছে। তোমার আর বাবার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।"

ইজাবেলের মুখ শুকাইয়া গেল। সত্যই কি সে তবে আসিয়াই পড়িল? যাহা হউক কন্যার কথার উত্তরে তিনি কহিলেন, "কে তিনি ইজাবেল?"

"জানি না। আমার ভাল লাগিল না তাকে। আমার হাত ধরিয়া সে টানিয়া রাখিয়াছিল,—আর আমার পানে চাহিয়াছিল। চোক দুটা যে কেমন—চাহনিও আমার মোটেই ভাল লাগিল না।"

"যাও, তোমার বাবাকে গিয়ে বল।"

কার্ণাইল সংবাদ পাইয়া নীচে নামিয়া গেলেন,—বলা বাহুল্য অভ্যাগত আর কেহই নন, কাপ্তেন লেভিসন।

তাঁহার দাসী অসুস্থ এই ছুতা করিয়া ইজাবেল সেদিন আর নীচে গেলেন না,—অতিথির যথারীতি অভ্যর্থনা কার্ণাইল নিজেই করিলেন।

ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, জয়েসের পা একেবারে ভাঙ্গে নাই, তবে খুব বেশী মচ্‌কাইয়া গিয়াছে। তিন চার সপ্তাহ তাকে বিছানায় থাকিতে হইবে।

রাত্রিতে কার্ণাইল লেভিসনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন,—তাঁহার পুত্র ও কন্যা উইলিয়ম ও ইজাবেল তাঁহার কাছে ছিল। কথায় কথায় লেভিসন ইজাবেলকে টানিয়া কাছে নিয়া কহিলেন "এবার আর পলাইতে পারিবে না। যখন আসিলাম, ছুটিয়া পলাইয়া গেলে, নামটাও আমাকে বলিলে না।"

"আমি মাকে খবর দিতে গিয়াছিলাম,—জয়েসের কাছে মা ছিল।"

"জয়েস্! জয়েস কে?"

কার্লাইল উত্তরে কহিলেন "লেডী ইজাবেলের খাস দাসী। আছাড় খাইয়া তারই পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। চাকরাণীটা বড় ভাল।"

"জয়েস্! অদ্ভুত নাম বটে। জয়েস্। কখনও শুনি নাই ত এরকম নাম! এ তার নিজের নাম না পদবী।"

"তার নিজেরই খৃষ্টানী নাম জয়েস্। এটা এমন একটা অসাধারণ নাম ত নয়—অনেকের আছে। পুরা নাম জয়েস্ হ্যালিজন। অনেক বৎসর যাবৎ সে আমাদের বাড়ীতে আছে।"

বালিকা ইজাবেল লেভিসনের হাত ছাড়াইয়া যাইতে এতক্ষণ বড় চেষ্টা করিতেছিল, না পারিয়া হঠাৎ তখন কাঁদিয়া ফেলিল।

কার্লাইল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি, কি, হইল?"

কাঁদিয়া ইজাবেল কহিল, "উনি কেন আমাকে ধরিয়া রাখিয়াছেন বাবা?"

লেভিসন হাসিয়া উঠিলেন,—আরও শক্ত করিয়া ইজাবেলকে চাপিয়া ধরিলেন। কার্লাইল তাকে টানিয়া ছাড়াইয়া নিজের কাছে আনিলেন, কোলে তুলিয়া তাকে বসাইলেন। পিতার বক্ষে মুখ লুকাইয়া ছোট হাত দুখানি তুলিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া ইজাবেল আস্তে আস্তে কহিল, "বাবা! ওঁকে আমার ভাল লাগে না, আমার ভয় করে। আবার আমাকে টানিয়া নিতে ওকে দিও না।"

ইজাবেলকে স্নেহে বুকে একটু চাপিয়া ধরিয়া কার্লাইল কহিলেন, "কাপ্তেন লেভিসন, ছেলেপিলেদের নিয়া নাড়াচাড়া করা আপনার অভ্যাস নাই। এরা অদ্ভুত জীব,—খেয়াল এদের বোঝা ভার।"

লেভিসন উত্তর করিলেন, "ছেলেপিলে নিয়ে থাকা বড় একটা ঝঞ্ঝাটও বটে। হাঁ, আপনার এই চাকরাণীটির—বোধ হয় খুব গুরুতর আঘাতই লাগিয়াছে। বোধ হয় কিছুদিন তাকে একেবারে বিছানায় শুইয়া থাকিতেই হইবে?"

"হাঁ, ডাক্তার বলিলেন, কয় হপ্তা তাকে একেবারে শুইয়া থাকিতে হইবে।"

লেভিসন উঠিয়া খুব স্ফূর্ত্তিতে বালক উইলিয়ামের হাত দুটি ধরিলেন,—তাকে তুলিয়া চারিদিকে কয়বার ঘুরাইলেন, উইলিয়ম ভয় পাইল না, আনন্দে হাসিয়া উঠিল।

(ক্রমশঃ)

সুপ্তি-সুখ

পূজিব না অন্নদেবে খুঁজিব না ভগবানে—
তুমি যদি স্বপ্নদেবি! চাহ এ দীনের পানে।
তোমার করুণা দেখি, বুঝিতে নাহিক বাকি,
তোমার মহিমা হেরি বিস্ময়-মগন আঁখি।
বাস্তবের এ রাজত্বে চেতনার কারালয়ে,
পারি না রহিতে আর নিশিদিন ভয়ে ভয়ে।
হেথা শুধু প্রতারণা, হেথা শুধু ঈর্ষা দ্বেষ,
নাহি কার' দয়া মায়া, নাহি সরলতা-লেশ।
স্থির চিত্তে ভাবি যবে ঈশ্বরের ব্যবহার,
মনে হয়—ঠিক যেন নিরদয় জমিদার।
প্রজাদের সুখ দুঃখে কোন কাজে দৃষ্টি নাই,
মাল গুজারির টাকা কিস্তিমত চাই-ই চাই।
হাজা, শুকা, পতিতের আপত্তি না তুলে কাণে
কাতর রোদন হেরি করুণা না হয় প্রাণে।
মাতোয়ান বাকিদার কিস্তিখেলাপের দায়,
স্থাবরাস্থাবর হায়! ডিক্রিতে বিকিয়ে যায়!
তুমি দেবি দয়াময়ী, মহৎ তোমার প্রাণ,
জীর্ণ-শয্যাশায়ী জনে লক্ষ মুদ্রা কর দান।
বাস্তবের এ রাজত্বে যায় যাহা একবার,
ফিরা'য়ে আনিতে তারে সাধ্য নাই বিধাতার।
ইচ্ছাময়ী তুমি, যদি ইচ্ছা তব জাগে মনে—
অবহেলে দিতে পার ফিরা'য়ে সে হারাধনে।
আমি এ অভাগা মাগো হারায়ে জীবনাধারে,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরি, সাধি কত দেবতারে;

কেহ না পারিল মোরে যারেক দেখাতে তা'র,
জীর্ণ বক্ষে জীর্ণ আশা করে শুধু হায় হায় !
দুঃখ দেখি দয়াময়ি, তাই কি গো নিশি শেষে,
চায়াণ-রতন মম দেখাইলে লয়ে এসে ?
মনের মন্দিরে রাখি জাগায়ে যে মূর্ত্তিখানি
তুমি তারে একেবারে করেছ সৌন্দর্য্যরাণী।
নিস্পন্দ নির্ব্বাক্ আমি দেখিতেছি অনিমিষে,
কুমতি প্রকৃতি হেরি, জলিল রিষের বিষে ;
বিহঙ্গ-কাকলি ছলে করি ঘোর কলরব,
পলকে ভাঙ্গিয়া দিল সে অপূর্ব্ব সুখ সব।
এ নিদয় দেশে দেবি ! আর না করিব বাস,
তোমার সুখের দেশে যেতে বড় অভিলাষ
তব রাজ্যে নিত্য সব বাস্তবে কেবল ফাঁকি,
তুমি যদি আশা দাও, আর কি এ দেশে থাকি ?
চৌদ্দ পোয়া ভূমে আছে নবদ্বারী ঘরখানা,
ভেঙ্গে দিয়ে চ'লে যাব ক'রে সব বেচাকেনা।
সেই পুঁজি ল'য়ে, হ'য়ে তব রাজ্যে উপনীত,
বাঁধিব আপন বাসা স্থান করি মনোনীত।

নদী-চরে কি প্রান্তরে গ্রামোপান্তে বাপীতীরে,
নাহি যেথা মানুষের আনাগোনা ফিরে ফিরে ;
সেই নিরজনে রচি সুখশয্যা আপনার,—
চিরস্থায়ী,—নিতি নিতি তোলাপাড়া নাহি যার ;
পৃথ্বী হবে আস্তরণ, তরুকাণ্ড উপাধান,—
যুগ যুগ উপভোগে হবে না যা ছিন্ন, ম্লান।
সে সুখ-শয্যার 'পরে, এ আকাঙ্ক্ষা বুকে রাখি
ঘুমাইব মহাঘুমে অঙ্গারে এ অঙ্গ ঢাকি।
তখন করুণাময়ি ! একবার কৃপা করি—
লাজময়ী প্রতিমা সে, এনো তা'র করে ধরি ;
ধীরে ধীরে বসাইয়া দিও মোর শয্যাপাশে
সারা জীবনের দুঃখ ভুলে যাব সে উল্লাসে।
সে কোমল কর দুটি এ তাপিত বুকে রাখি,
সুখের আবেশে মোর মুদে যাবে দুটি আঁখি।
বাহিরে বিশ্বের বুকে কালের এ চক্রখানি,
কত যুগ আকর্ষিয়া পশ্চাতে ফেলিবে টানি।
বাস্তবে বিদ্রূপ করি তুমি দেবি, ততক্ষণ,—
আমার জীবনী কর ছায়াচিত্রে প্রদর্শন।

নারায়ণচন্দ্র ভট্ট।

তিলকের মহাপ্রয়াণ

(১) ভারতে শোকের প্লাবন

বোম্বাই সহরে ১৬ই শ্রাবণ, শনিবার রাত্রি ১২-৪০ মিনিটের সময় লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক পরলোকে গমন করেন।

কলিকাতায় শোকের উচ্ছ্বাস

১৬ই শ্রাবণ, রবিবার অপরাহ্নে লোক-মান্য বালগঙ্গাধর তিলকের মৃত্যুর সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছে। সহরের অনেক লোক তখন টাউনহলের সভার দিকে ছুটিতেছিল—এই সংবাদ দেখিতে দেখিতে সারা সহরে ছড়াইয়া পড়ে। সহরের লোক তিলকের অসুস্থতার সংবাদ পাইবার পর হইতে উদ্বিগ্নমনা ছিল। শনিবার সমস্তটা রাত্রিতে সংবাদপত্রের অফিসসমূহে চারি দিক হইতে লোকে টেলিফোন করিয়া তিলকের খবর জানিবার জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতেছিল—এত সত্বর যে এমন নিদারুণ সংবাদ আসিয়া পড়িবে কেহ তাহা মনে করে নাই।

শনিবার হিন্দু-নাট্য-পরিষদের উদ্যোগে ভোর আটটার সময় এক শোভাযাত্রা বাহির হয়। ঐ মিছিল চিৎপুর রোড, জ্যাকারিয়া ষ্ট্রীট, সেণ্ট্রাল এভেনিউ, হ্যারিসন রোড হইয়া বেলা দশটার সময় গঙ্গার ধারে পৌঁছে। ঐ শোভা-যাত্রায় হিন্দু, মুসলমান, জৈন প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোকই ছিল। এই শোভা-যাত্রার পথে যত মসজিদ এবং

মন্দির পড়িয়াছিল, সকল স্থানেই মিছিলের লোকেরা লোকমান্য তিলকের মঙ্গল কামনা করিয়া উপাসনা করেন। সহস্র সহস্র দরিদ্রকে ভিক্ষা দান করা হয়। কটন ষ্ট্রীটে সত্যনারায়ণ স্বামীর মন্দিরে রীতিমত পূজা-অর্চনা হইয়াছিল।

রবিবারের ভোরে সংবাদ-পত্র পড়িয়া সাধারণের মন বরং একটু আশ্বস্তই হইয়াছিল। বেলা তিনটার সময় তিলক আর নাই—এ সংবাদ সারা সহরময় শুনা যাইতে লাগিল। একদল যুবক নগ্নপদে বড়বাজারের দ্বারে দ্বারে এই শোকাবহ বার্ত্তা প্রচার করিতেছিল। দেখিতে দেখিতে হাজার হাজার মাড়োয়ারী—হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের লোক বড়বাজারের রাজপথে দাঁড়াইয়া গেল। হাজার হাজার লোক শোকাকুল হইয়া নগ্নপদে, নগ্নমস্তকে পথে ছুটিয়া বাহির হইল—"হায়-হায়"—"তিলক মহারাজকি জয়" শব্দে বড়বাজার মুখরিত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে শোকের একটা ঘন-কৃষ্ণ যবনিকা সহরের বুকের উপর দিয়া কে যেন টানিয়া দিয়া গেল! মানুষ আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া মুক্তকণ্ঠে কাঁদিতেছিল। বেলা ৪টার সময় হিন্দিনাট্য-সভার সম্মুখভাগে এক বিপুল জনতার সৃষ্টি হইল—হ্যারিসন রোড এবং আপারসার্কুলার-রোডের সংযোগস্থলে লোক জমিতে লাগিল—৪-৩০ টার সময় প্রায় ২০ হাজার লোক কৃষ্ণপতাকা হস্তে লইয়া ঐ স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। মটরগাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, ট্রামগাড়ী হইতে লোকে অবতরণ করিয়া পায়ে হাঁটিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় একটা প্রকাণ্ড মিছিল করিয়া লোকমান্য তিলকের প্রতিমূর্ত্তি পুষ্পপরিশোভিত দোলায় বসাইয়া বড়বাজারের গঙ্গার ঘাটে লইয়া যাওয়া হইল। বড়বাজারের উচ্চ গৃহচূড় এবং বাতায়ন পথ হইতে তিলকের সেই প্রতিমূর্ত্তির উপর ঘন ঘন পুষ্পদাম বর্ষিত হইতেছিল—সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য!

অপরাহ্নে বড়বাজারের গঙ্গার ঘাটে এক বিরাট শোক-সভা হয়—পণ্ডিত অম্বিকাপ্রসাদ বাজপেয়ী, শ্রীযুক্ত মূলচাঁদ আগরওয়ালা, বাবু পদ্মরাজ জৈন, ভোলানাথ বর্ম্মণ, পণ্ডিত মহাদেবপ্রসাদ সুকুল এবং আরও অনেক মুসলমান এবং পঞ্জাবী ভদ্রলোক সভায় বক্তৃতা করেন। বক্তাগণ বলেন, তিলক মরেন নাই—তিনি অমর। তাঁহার নাম ভারতের ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত থাকিবে। কোটি কোটি ভারতবাসীর স্মৃতিপটে গঙ্গাধর তিলকের মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকিবে—ভারতের গৃহে গৃহে তিলকের স্মৃতির পূজা হইবে—যুবক-সম্প্রদায়কে সাধনার পথে নবীন প্রেরণা দান করিবে। অতঃপর সমবেত জনগণ তিলকের প্রতিমূর্ত্তি গঙ্গা গর্ভে বিসর্জ্জন করেন। তখন গগন বিদারী কণ্ঠে 'জয়—তিলক মহারাজকী জয়' এই ধ্বনি উত্থিত হয়। ইহার পর সহস্র সহস্র হিন্দু গঙ্গাস্নান করিয়াছিলেন।

বোম্বাইয়ে শোকোচ্ছ্বাস

লোকমান্য তিলকের মৃত্যুর সংবাদ দাবানলের মত বোম্বাই সহরে ছড়াইয়া পড়ে। মহীয়ান মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ এবং জননায়ককে একবার শেষ দেখা দেখিবে বলিয়া বোম্বাইয়ের সর্দ্দার গৃহের দিকে জন-স্রোত ছুটিতে থাকে। হোটেলের দুয়ারে অসংখ্য নর-নারী সমবেত হয়। তিলকের মৃতদেহ হোটেলের বারান্দায় আনিয়া ভিড়ের দিকে সম্মুখ করিয়া বসান হয়। রাস্তাঘাটের সমস্ত যান-বাহন এমন কি ট্রাম লাইনও বন্ধ হইয়া যায়।

সমাধিক্ষেত্রে

দিনের গতিক বড় ভাল ছিল না, তথাপি সমাধিতে এত লোক যোগদান করিয়াছিল যে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। বেলা ১টার সময় তিলকের শব রাস্তায় বাহির করা হয়—এই দলে কয়েকজন মুসলমানও ছিলেন। এই মিছিল বাহির হইবার বহুপূর্ব্ব হইতে সমস্ত রাজপথে কেবল মানুষের মাথাই দেখা যাইতেছিল। শব লইয়া সে বিরাট মিছিল যখন চলিতে লাগিল তখন এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। কাহারও সমাধিতে এত লোক সমাবেশ দেখা যায় নাই—এমন কি সার ফিরোজ সা মেটা বা দাদাভাই নৌরাজীর সমাধিতেও এত অধিক লোক যোগ দেয় নাই। সমস্ত পথে এত লোকের ভিড় হইয়াছিল যে মিছিলের গতির অনুকূলে ছাড়া অন্য কোন দিকে মানুষের গতি-বিধি অসাধ্য হইয়া উঠে। দুই মাইল অতিক্রম করিতে মিছিলের তিন ঘণ্টার অধিক সময় লাগিয়াছিল,—চৌপাটি নামক স্থানে, উদার উন্মুক্ত সাগরের সৈকত ভূমিতে—অসীম অনন্ত নীলাম্বরের তলে—মহাপ্রাণ তিলকের চিতা-শয্যা রচিত হয়। চিতা চন্দন কাঠের দ্বারা সাজান হইয়াছিল। নানা

সম্প্রদায়ের ভলাণ্টিয়ারের দল সমাধিকার্য্যে সাহায্য করে। শববাহী দলের পশ্চাতে ৪০টি ভজনের দল কীর্ত্তন করিতে করিতে আসিতেছিল। শ্মশান ভূমিতে লইয়া যেমন তিলকের শবাবরণ উন্মোচিত হয়, অমনই চারিদিক হইতে তদুপরি পুষ্পবৃষ্টি হইতে থাকে।

শ্মশান-বন্ধুগণ

ইহার পর, মহাত্মা গান্ধী, শ্রীযুক্ত খাপর্দ্দে, মুঞ্জি, দেশপাড়ে, কারাণ্ডিকার, ছোটানী, ব্যাপটিষ্টা, শ্রীমতী সরলা-দেবীচৌধুরাণী শ্মশানক্ষেত্রে আগমন করেন। এ সমাধির মিছিলে উচ্চ-নীচ ধনী-নির্ধনের বিচার ছিল না—কোটিপতি যে তাহারই পাশে দাঁড়াইয়া ছিন্নবস্ত্র জীর্ণবেশ কুলী ছুটিতেছিল। পুর-মহিলাগণ প্রাসাদ-সমূহের আলিন্দের বাতায়ন-পথ হইতে পুষ্প বর্ষণ করিতেছিলেন। লোকমান্য তিলকের দুই পুত্র যথাশাস্ত্র পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্ব্বাহ করেন।

("হিন্দুস্থান")

(২) তিলকের গুণ গরিমা

যে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ আজ চল্লিশ বৎসরকাল ভারতবর্ষের রাজনীতিক গগনে "শুকতারার" ন্যায় প্রোজ্জ্বল ভাবে শত শুভমস্তকের বিভায় কপালতিলকের মত জ্বলিতেছিলেন, বিধাতার বিধানে ভারতজননী দেশমাতৃকার নির্দ্দেশে সেই জ্ঞানবীর, কর্ম্মবীর, দানবীর, সন্ন্যাসবীর বালগঙ্গাধর তিলক, পঁয়ষট্টি বৎসর পূর্ণ করিয়া, পরাজিত, পরাধীন ভারতবর্ষের শিখর হইতে চিরদিনের জন্য যেন সহসা অস্তমিত হইলেন। যেন মধ্যগগনের জ্যোতিষ্ক মধ্যগগনে থাকিয়াই হঠাৎ দীপ নির্ব্বাণের মত নির্ব্বাপিত হইল। দুঃখ করিব কি,—শোক করিব কি? আর যে আমাদের দগ্ধ কপালে এমন শুভ্র হরিচন্দনের তিলক নাই। বিধাতা অশেষ কৃপায় এই একটা বিজয় তিলক দিয়াছিলেন, সে তিলকও কালের প্রভাবে মুছিয়া গেল।

এমন কে আর ছিল! কে আর হইবে! বেদ-বিদ্যায়, শাস্ত্র বিদ্যায় বালগঙ্গাধর তিলক সারদাদেবীর বড় আদরের সন্তান ছিলেন! তাঁহার Orion, তাঁহার Artic Home of the Vedas অপূর্ব্ব ও অতুল্য দুইখানি গ্রন্থ। এই দুই গ্রন্থ লিখিয়া তিলক জগতের বিদ্বজ্জন-সমাজে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছিলেন। ম্যাক্সমূলর, সিলভান লেভী, জিমরম্যান প্রভৃতি তিলক মহাশয়কে ভারতবর্ষের Savant বা শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া মান্য করিতেন। তিলক সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল কথা কহিতে ও বক্তৃতা করিতে পারিতেন। তিনি শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ শাস্ত্রে সমান অভিজ্ঞ ছিলেন; দর্শন শাস্ত্রেও তিনি অসাধারণ ও অসামান্য পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার গীতা-ভাষ্য এক অপূর্ব্ব সামগ্রী; উহার হিন্দী ভাষায় অনুবাদ হইয়াছে; বাঙ্গালায় হয় নাই। বাঙ্গালী এখন আর গীতার তত্ত্ব বুঝিতে তেমন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে না;—করিলে, দেশাত্মবোধের বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত তিলকের এই গীতাভাষ্য বাঙ্গালার বিদ্বজ্জন-সমাজ মাথায় করিয়া লইত। তিলকের গীতাভাষ্য যেন ভগবানের মুখনিঃসৃত সত্য ও সনাতন বাণী।

গণিত ও অঙ্ক শাস্ত্রে তিলক মহাশয় অদ্বিতীয় পুরুষ ছিলেন। তিনি বহুদিন পুণার ফারগুসন কলেজে গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি হিন্দু-গণিত সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক ও পুস্তিকা লিখিয়াছেন, তাহা এখনও আদর্শ ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রাহ্য এবং মান্য। সঙ্গে সঙ্গে এটুকুও বলিব যে, তিলক মহাশয়ের ইংরেজী ভাষার উপর অতিমাত্রায় অধিকার ছিল। তাঁহার পুস্তক সকলের ইংরেজী ভাষা চাঁচা-ছোলা, মাজা-ঘসা। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পর আর কোন ভারতবাসী পণ্ডিত বেদ বেদান্ত, গণিত বেদাঙ্গ সম্বন্ধে এমন সরল অনায়াসবোধ্য, অথচ নির্ভুল ইংরেজি ভাষায় ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়ন করিতে পারেন নাই। ম্যাক্সমূলর তিলকের নিষ্কৃতিপ্রার্থনাকালে এটুকু মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন। তিলক মহারাষ্ট্র ভাষায় অসাধারণ বক্তা ছিলেন; তিন চারি ঘণ্টাকাল অবিশ্রান্ত ও অনবরত মহারাষ্ট্র ভাষায় তিনি ব্যাখ্যান বিবৃতি করিতে পারিতেন। আর সহস্র সহস্র শ্রোতা মুগ্ধ নয়নে উৎকর্ণ হইয়া তাঁহার ব্যাখ্যান শুনিত। তিনি ইংরেজি ভাষায়ও বেশ বক্তৃতা করিতে পারিতেন, তবে এ পক্ষে বাঙ্গালার লালমোহন ও সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে হটাইতে পারিতেন—পারিয়াছিলেনও।

কাজেই বলিতে হয়, এমন ত ছিল না। এমনটি আর ত হইবে না। এত বড় পণ্ডিত, এত বড় শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষ, এমন

অদ্বিতীয় গণিত অধ্যাপক পূর্ব্বে রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই। ভারতবর্ষের কোন প্রদেশের কোন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক বিদ্যায় এবং পাণ্ডিত্যে তিলকের সমকক্ষ হইবেন না—হইতে পারেন না। রাজা রাজেন্দ্রলাল রাজনীতিক ছিলেন বটে, কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ কংগ্রেসে যোগ দিয়াছিলেন বটে, পরন্তু তিলকের মতন এমন একনিষ্ঠ দেশ-সেবক আর কেহ হইতে পারেন নাই। তিলক সত্যই তনু-মন-ধন সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া সংযমী সন্ন্যাসীর ন্যায় দেশ সেবা—জাতির সেবা করিয়াছিলেন। ভারতবাসীর ভাগ্যগুণে আমরা একটিই তিলক পাইয়াছিলাম, হায় আজ সে পোড়া কপালের তিলকও মুছিয়া গেল। নির্দ্দয় বিধাতা আমাদের কাতর প্রার্থনা শুনিলেন না।

তিলক সংযমী ও আচারনিষ্ঠ গোঁড়া ব্রাহ্মণ ছিলেন। পুণার প্রথম কংগ্রেস মণ্ডপে সমাজসংস্কারকগণের মজলিস করিবার বিরুদ্ধে তিনিই ঘোর আন্দোলন করেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন, শাস্ত্রশাসিত ব্রাহ্মণ আমি, শাস্ত্রাদেশ উপেক্ষা করিতে আমি পারিব না। তাঁহার বিদ্যা এবং বুদ্ধি অনুসারে তিনি শাস্ত্রবাণী যে ভাবে ব্যাখ্যা করিতেন, তদনুসারেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তিলক মহারাষ্ট্র দেশের অতি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি চিৎপাবন ব্রাহ্মণ শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণই পূর্ব্বে পেশবের পদ অধিকার করিতেন; ভগবান শঙ্করাচার্য্য কহ্লণের এই ব্রাহ্মণকুল পবিত্র করিয়াছিলেন। তিলক সচ্চরিত্রতায় ও সাধুতায় আদর্শ পুরুষ ছিলেন। অতি বড় নিন্দকও তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে কখনও কোন কুৎসা কীর্ত্তন করিতে পারে নাই। তিলক-চরিত্র নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক ও নিরাবিল ছিল। কখনই তিনি পরস্বাপহরণ করেন নাই, কোন ন্যস্তধন আত্মসাৎ করেন নাই, ফন্ ফন্দী করিয়া চাঁদা তুলিয়া স্বয়ং ধনী হন নাই; বরং লোকে তাঁহাকে ব্যক্তিগত ভাবে যে সকল উপঢৌকন দিয়াছে, তাহা তিনি অম্লান মুখে দেশের ও জাতির কার্য্যে বিনিয়োগ করিয়াছেন। তিলক নির্লোভ ও ত্যাগী পুরুষ ছিলেন। তিনিই সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্ব প্রথমে দারিদ্র্যকে আলিঙ্গন করিয়া দেশহিতব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এ পক্ষে তিনিই আদর্শ ও প্রথম এবং উত্তম পুরুষ।

বাল গঙ্গাধর তিলকের রাজনীতি দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম,—প্রাদেশিক; কেবল মহারাষ্ট্র বা দাক্ষিণাত্যে নিবদ্ধ; হিন্দু জাতির সমবায় চেষ্টায় কেন্দ্রীভূত। দ্বিতীয়—নিখিল ভারতবর্ষব্যাপী সার্ব্বজাতিক ও সার্ব্বজনীন। প্রথম অংশে তিনি গণপতি পূজা, শিবাজী উৎসব প্রভৃতি ঘটাইয়া দাক্ষিণাত্যের হিন্দুসমাজের উদ্বোধন চেষ্টা করেন। শিবাজী উৎসবের প্রতিধ্বনি আমাদের বাঙ্গালা দেশেও হইয়াছিল। উপাধ্যায় ব্রহ্ম বান্ধবের চেষ্টায় একবার শিবাজী উৎসব কলিকাতায় অতি সমারোহে হইয়াছিল। তিলক মহোদয়, খপর্দে ও মুঞ্জী মহাশয়দ্বয়কে সঙ্গে লইয়া, সে উৎসবে প্রধান পুরোহিতের কাজ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালায় তিলক তত্ত্বের প্রধান ব্যাখ্যাতা ছিলেন পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর। তিনি হিতবাদীতে তিলক সমাচার সকলই প্রকাশ করিতেন, বাঙ্গালী পাঠকবর্গকে তিলকের সহিত পরিচয় করাইয়া দিতেন। তাঁহারই উদ্‌যোগে বর্ষে বর্ষে কলিকাতায় শিবাজী উৎসব হইত। দেউস্করের অবসানের পরে আর তেমন করিয়া তিলক কথা বাঙ্গালায় কেহ বলে না—বলিতে জানে না। হিন্দুত্বের অভ্যুত্থানের জন্য তিলক যে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন মহারাষ্ট্রের হিন্দু সমাজকে জাগাইয়া—মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা আধুনিক বাঙ্গালী যুবকগণ তেমন ঠিকমত জানে না। নিখিল ভারতবর্ষের সমন্বয় জন্য তিলক কংগ্রেসকে ধরিয়াছিলেন। ঐ এক আশালুব্ধ হইয়া তিলক কংগ্রেসের বাবুর দলের অনেক উৎপাত উপদ্রব সহ্য করিয়াছিলেন। শেষে সুরাটের মজলিসে তিনি কংগ্রেসকে দখল করিয়া বসেন। গরম দলের এখন যে প্রাধান্য ঘটিয়াছে তাহা কেবল একমাত্র তিলকের নেতৃত্ব প্রভাবে হইয়াছিল।

তিলকের তুল্য দেশনায়ক পুরুষ ইদানীং ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে আর জন্মে নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। মহারাষ্ট্রের তথা হিন্দুস্থানের আবালবৃদ্ধবনিতা তিলক মহারাজকে জানে—বুঝে—চিনে। বোম্বাই ও মধ্য প্রদেশের সর্ব্বত্র রাতভিখারী তিলকের গান করিয়া বেড়ায়, যাহারা যাদুকরের খেলা দেখায়, বানর ভলুক ছাগল লইয়া নাচানাচি করিয়া বেড়ায়—তাহারাও তিলক মহারাজের জয় ঘোষণা করিয়া তবে খেলা আরম্ভ করে। মহারাষ্ট্রের দাক্ষিণাত্যের গৃহে গৃহে কুটীরে কুটীরে আজ তিলক মহারাজের জন্য—লোকমান্য তিলকের জন্য শোকের

অশ্রুধারায় ধরাতল অভিষিক্ত হইবে। গুরু, নায়ক, মালিক, মহাপুরুষ, পূজ্য-প্রতিপালক বলিয়া মহারাষ্ট্রে—দাক্ষিণাত্যে তাঁহাকে সকলে উপাসনা করিয়া থাকে। তিলকের ছবি সর্ব্বত্র পাইবে, সকল কুটীরের শোভাবর্দ্ধন করিয়া উহা সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছে। তিলক সত্যই আপামর সাধারণের পূজ্য ছিলেন। এই কলিকাতায় গতবার কংগ্রেসের সময়ে লোকমান্য তিলক আসিলে তাঁহাকে দেবতার সম্মান দিয়া আরতি করিয়া ঘরে তোলা হইয়াছিল।

কাঁদ ভারতবর্ষ; তোমার বাটকোটি নয়নের অশ্রুধারায় ভারতবক্ষঃকে প্লাবিত করিয়া কাঁদ। ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান লোকমান্য তিলকের তিরোধানে রোদন কর। সে রোদন ব্যোমমার্গ হইতে দেবতারা দর্শন করুন এবং ভারতবর্ষের ভক্তি শ্রদ্ধার পরিমাণ করিয়া লউন। তিলক দেশের জন্য, জাতির জন্য চিরজীবন ধর্ষিত মথিত নির্জ্জিত পীড়িত বিড়ম্বিত হইয়াছিলেন। ইচ্ছা করিলে তিনি সুখে জীবন যাপন করিতে পারিতেন। সে সুখ পরিহার করিয়া তিনি বিড়ম্বনার ও বেদনার রাজনীতিক জীবন অবলম্বন করিয়াছিলেন। কাঁদ ভাই হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, মান্দ্রাজী, বিহারী, গুজরাটী সকলে মিলিত কণ্ঠে এমন মহাপুরুষ—শহীদ—তপস্বী—ত্যাগী—সন্ন্যাসী দেশনায়কের তিরোধানে রোদন কর। তাঁহার জীবনকথা ত একদিনে ও এক মুখে শেষ হইবার নহে। যে কয়টা দিন বাঁচিয়া থাকিব, তাঁহার গুণগান করিব—জীবন ধন্য করিব।

(নায়ক হইতে উদ্ধৃত)

(৩) তিলকের জীবনচরিত

জন্ম ও বংশ পরিচয়

১৮৫৬ সনের ২৩শে জুলাই তারিখে বালগঙ্গাধর তিলকের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা গঙ্গাধর রামচন্দ্র তিলক প্রথমতঃ স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক ছিলেন এবং পরে থানা ও পুনা জেলার স্কুলসমূহের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত হন। রামচন্দ্র তিলক শিক্ষকতা কার্য্যে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ব্যাকরণ ও ত্রিকোণমিতি সম্বন্ধে কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। গণিত ও প্রাচ্য শাস্ত্র আলোচনা সম্বন্ধীয় অনুরাগ সম্ভবতঃ বালগঙ্গাধর পিতার নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন। মাত্র ষোল বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়, কিন্তু ইহাতে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে কোন ব্যাঘাত হয় নাই। ১৮৭২ সনে তিলক ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করেন, অতঃপর ১৮৭৬ সনে পুনা ডেকান কলেজ হইতে তিনি অনার সহিত বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৭৯ সনে বি-এল পরীক্ষা পাশ করেন। আইন অধ্যয়নের সময় আগরকার মহোদয়ের সহিত তাঁহার সখ্যতা জন্মে।

বৃত্তি নির্ব্বাচন

উভয় বন্ধুর মধ্যে, ভারতীয় যুবকের পক্ষে চিরন্তন জটিল সমস্যা যাহা, অর্থাৎ—ভবিষ্যৎ জীবনের উপজীবিকা নির্ব্বাচন সম্বন্ধে অনেক সময় আলোচনা হইত। তাঁহারা স্থির করিলেন, একটি স্কুল ও কলেজ স্থাপনা করিয়া তাহার শিক্ষকতা কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিবেন। কিন্তু ধনিজনের সাহায্য ব্যতীত এরূপ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করা অসম্ভব, কাজেই বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহাদিগকে এজন্য নানারূপ পরিহাস করিতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে এই সময়ে স্বর্গীয় বিষ্ণুকৃষ্ণ চিপলুঙ্কার মহাশয় গবর্ণমেণ্টের চাকুরী ছাড়িয়া এইরূপ একটি বিদ্যালয় গঠন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। অতঃপর এই তিনজন মিলিত হইয়া এ বিষয়ের উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন এবং অচিরেই বিশেষ কর্ম্মনিষ্ঠ এবং মেধাবী পরলোকগত নামযোশী মহোদয়কে তাঁহাদিগের একজন সহযোগী পাইলেন। ১৮৮০ সনের ২রা জানুয়ারী তারিখে ইঁহারা "পুনা নূতন ইংরেজী বিদ্যালয়" নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পরবর্ত্তী জুন মাসে ভি, এস্ আপ্তে এম, এ মহোদয় তাঁহাদিগের সহিত যোগদান করেন। ঐ বৎসরের শেষভাগে আগরকার মহাশয় এম্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষকতা কার্য্য আরম্ভ করেন। এই শিক্ষাদান কার্য্যের সহিত সমসাময়িক ভাবে এই পাঁচটি বন্ধু, মাতৃভাষায় "কেশরী" ও ইংরেজীতে "মারহাট্টা" নামে দুইখানি সংবাদপত্র প্রচার করিতে লাগিলেন।

দাক্ষিণাত্য-শিক্ষা-পরিষদ

সত্বরেই তিলকের জীবনের প্রথম সঙ্কট আসিয়া উপস্থিত হইল। কোলাপুরের মহারাজার প্রতি অন্যায় ব্যবহার সম্বন্ধে "কেশরী" ও "মারহাট্টা" পত্রে তীব্র সমালোচনা

বাহির হইয়াছিল : উক্ত রাজ্যের প্রধান ইংরেজ কর্ম্মচারী মিঃ বার্ভে এজন্য তিলক ও আগরকারের বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। বিচারে দুই বন্ধুর চারিমাস কারাদণ্ড হইল। সচারাচর যেরূপ হইয়া থাকে, এই বিচারেও কারাদণ্ডের ফলে দুই বন্ধুর খ্যাতি ও কার্য্যকারিতা উভয়ই বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইল। চতুর্দ্দিক হইতে অযাচিত সাহায্য আসিতে লাগিল। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিলক ও তাঁহার বন্ধুর সাহায্যকল্পে একটি নাটক অভিনীত হয়,—এই অভিনয়ে ভবিষ্যতে স্বনামধন্য মহামতি গোখেল একটি ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

চিপলঙ্কার মহাশয়ের মৃত্যুর পর বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় কার্য্যে তিলকের দায়িত্বভার আরও বৃদ্ধি পাইল। ১৮৮৪ সনে উক্ত সহকর্ম্মিগণ আইন-সম্মত একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার উদ্দেশ্যে "দাক্ষিণাত্য-শিক্ষা-পরিষদ" প্রতিষ্ঠা করিলেন। ক্রমে আরও উৎসাহী যুবকগণ আসিয়া তাঁহাদিগের কার্য্যে যোগদান করিতে লাগিলেন, এইরূপে ক্রমে ক্রমে কোল্‌কার, ধরপ্‌ গোল এবং কিছু পরে মহামতি গোখেল আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। ক্রমে স্কুলটির সহিত "ফারগুসন কলেজ" নামে একটি কলেজ ১৮৮৫ সনে খোলা হইল। তিলক সাধারণতঃ গণিতশাস্ত্র এবং মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত ও বিজ্ঞান পড়াইতেন। শিক্ষকতা কার্য্যে তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষাদান প্রণালী অভিনব ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছিল।

অধ্যাপকপদ-পরিত্যাগ

১৮৯০ সনে তাঁহাকে অধ্যাপক পদ পরিত্যাগ করিতে হয়। ইহার কারণ অনেক ছিল। সে সকলের আলোচনা এ স্থলে অনাবশ্যক। এ বিষয়ে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সমাজসংস্কার সম্বন্ধে ১৮৮৮ সন হইতেই পরিষদের অন্যান্য সভ্যগণের সহিত তিলকের মতভেদ উপস্থিত হয়, বিশেষতঃ আগরকার মহাশয়ের সহিত। ইহার ফলে আগরকার পৃথক একখানি পত্রিকা প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন এবং "কেশরী" ও "মারহাট্টা" কাগজদ্বয়ের ভার পাইলেন তিলক। যে বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে তিনি পদত্যাগ করেন তাহা এইরূপ,—১৮৮৯ সনে উক্ত কলেজের তৎকালীন অধ্যাপক গোখেল মহোদয় সার্ব্বজনীক সভার সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। প্রাচীন জেস্যুইট সম্প্রদায়ের আদর্শানুযায়ী শিক্ষকগণ যাহাতে অনন্যকর্ম্মা হইয়া শিক্ষকতা কার্য্যে মনোনিবেশ করেন ইহাই তিলকের অভিপ্রেত ছিল। কাজেই তিনি গোখেল মহোদয়ের এইরূপ কার্য্য গ্রহণ করার বিরোধী ছিলেন। এই বিষয় লইয়া অন্যান্য সভ্যগণের সহিত মতভেদ হওয়ায় তিনি ১৮৯০ সনে পরিষদের সভ্যপদ পরিত্যাগ করিলেন।

রাজনীতি ক্ষেত্রে

শিক্ষকতা কার্য্য পরিত্যাগ করায় তিলক রাজনীতি ক্ষেত্রে কার্য্য করিবার অধিক অবসর পাইলেন। এই সময়ে সহবাসসম্মতি আইন পাশ উপলক্ষে দেশে তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। তিলক স্বভাবসিদ্ধ আন্তরিকতার সহিত এই আন্দোলনে যোগ দিলেন। রাজনীতির দিক হইতে বিশেষভাবে তিনি এই আইনের প্রতিবাদ করেন। তাঁহার যুক্তি এই ছিল যে, ভারতবাসিগণের সামাজিক ও ধর্ম্ম অনুষ্ঠান সংসৃষ্ট কোনও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে বাধ্যকর কোনও আইন প্রবর্ত্তন করা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী বিদেশী শাসকসম্প্রদায়ের পক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত। এই সময়ে তিলক আইন শিক্ষা দিবার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপনা করেন; এবং তাঁহার "কেশরী" পত্রিকার প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা দেশে ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছিল।

"ওরায়ণ"

জ্ঞানানুশীলন ও মৌলিক গবেষণার প্রতি তিলকের স্বাভাবিক অনুরাগ চিরদিনই প্রবল ছিল, কিন্তু ঘটনাচক্রে রাজনীতির জটিল আবর্ত্তে আসিয়া তাঁহাকে পড়িতে হয়। বাল্যকাল হইতেই ভগবদ্গীতা ও বেদানুশীলনের প্রতি তাঁহার আন্তরিক আকর্ষণ ছিল। এই দুই বিষয়েই তিনি স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণবুদ্ধি সহকারে ও মৌলিক ভাবে আলোচনা করিতেন। বহুবৎসর যাবত বেদের কাল নিরূপণ সম্বন্ধে চর্চ্চা করিয়া তিনি যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হন তৎসম্বন্ধে এই সময়ে তিনি একখানি গ্রন্থ রচনা করেন এবং তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম ১৮৯২ সনে লণ্ডন নগরীতে প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদগণের আন্তর্জাগতিক সম্মিলনীর অধিবেশনে প্রেরণ করেন। এই প্রবন্ধটি ১৮৯৩ সনে "ওরায়ণ" নামক

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'এই প্রবন্ধে তিলক যুক্তিদ্বারা এই সিদ্ধান্ত স্থাপনা করেন যে, "ওরায়ণ" সম্বন্ধীয় যে সকল প্রাচীন গ্রীক কিম্বদন্তী ও পুরাণ কথা প্রচলিত আছে এবং গ্রীক ভাষায় যে একটি নক্ষত্রপুঞ্জের নাম "ওরায়ণ" দেখিতে পাওয়া যায় এ সকলই প্রাচীন সংস্কৃতের "অগ্রায়ণ" বা "অগ্রহায়ণের" সহিত সংশ্লিষ্ট। "অগ্রায়ণ" শব্দে বৎসরের প্রারম্ভ বুঝায়। ঋক্‌বেদের বহুস্তোত্রে যে "অগ্রায়ণ" নক্ষত্র-পুঞ্জের ও তৎসম্বন্ধীয় নানা কিম্বদন্তীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সহিত গ্রীক্ প্রাচীন কিম্বদন্তী প্রভৃতির সাদৃশ্য দেখা যায়। এবং তাহা হইতে সমীচীনরূপে প্রতিপন্ন হয় যে, উভয় কিম্বদন্তীর উদ্ভবকালে গ্রীক্ আর্য্য ও ভারতীয় আর্য্যদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ একই স্থানে বসবাস করিতেন এবং সেই সময়ে বৎসরের প্রারম্ভে সূর্য্য অগ্রায়ণ নক্ষত্রপুঞ্জে উদিত হইত। জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রমাণিত হয় যে অন্যূন খৃষ্টপূর্ব্ব ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে বৎসরের প্রারম্ভে সূর্য্য "ওরায়ণ" বা "মৃগশিরা" নক্ষত্রে উদয় হইত। অতএব এতদ্দ্বারা ঋক্‌বেদ রচনা কালও যে সেই সময়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

মোক্ষমুলার, জেকবি, ওয়েবার, হুইট্‌নি প্রভৃতি প্রধান প্রধান প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতগণ তিলকের এই প্রবন্ধের ভূয়সী প্রশংসা করেন। "জার্নাল অব্ দি এমেরিকান ওরিএন্টেল সোসাইটি" নামক পত্রে, অধ্যাপক হুইট্‌নি এই প্রবন্ধের যথেষ্ট সুখ্যাতি করেন। ডাক্তার ব্লুমফিল্ড তিলকের গ্রন্থ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "বর্ত্তমান বৎসরের সাহিত্য গ্রন্থের মধ্যে একখানি সর্ব্বাপেক্ষা অভিনব-তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ"।

আইন ও রাজনীতি

আইন, সংবাদপত্র ও রাজনীতি সংক্রান্ত কার্য্যে তিলক বিশেষ বিব্রত ছিলেন, কাজেই এই গবেষণার কার্য্য চালান তাঁহার পক্ষে ঘটিয়া উঠিল না। ১৮৯৪ সনে বরোদা রাজ্যের রাও সাহেব বাপট মহোদয় ঘুষ লওয়া অপরাধে অভিযুক্ত হন। এই মোকদ্দমার কার্য্যে তিলক বিশেষরূপে জড়িত হইয়া পড়েন। তিলকের সহিত আপ্তে ও খারে মহোদয় আসামী পক্ষ সমর্থন করিতে নিযুক্ত হন, কিন্তু পরিশ্রমের ভার অধিকাংশই তিলকের উপর পড়ে। এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, ফরিয়াদী পক্ষে কৌন্সিলি ছিলেন স্যার ফিরোজসাহ মেটা—যিনি উত্তরকালে রাজনীতি ক্ষেত্রে তিলকের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিলেন।

এই সময়ে বহুকাল যাবত তিলক বোম্বাইয়ের প্রাদেশিক সম্মিলনীর সেক্রেটারী ছিলেন। এই সভার প্রথম পাঁচ বৎসরের অধিবেশন তাঁহার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এবং তন্মধ্যে পঞ্চম বৎসরে পুনার অধিবেশন বিশেষ সফলতার সহিত নির্ব্বাহ হয়। ইহার পরবর্ত্তী বৎসর একটি রাজনীতিক সংগ্রামে তিলক বিশেষ ভাবে যোগদান করেন। হিন্দু মুসলমানের কয়েকটি দাঙ্গা এই সময়ে হয়। তিলক প্রচার করিতে লাগিলেন, লর্ড ডাফেরিণের অনুসৃত ভেদ-নীতিই এই সকলের মূল কারণ। এজন্য তিলক বোম্বাই সরকারের বিরাগভাজন হইয়া পড়িলেন।

শিবাজী মাহাত্ম্য প্রচার

ক্রমে তিলকের আরও কঠোর পরীক্ষার দিন সন্নিকট-বর্ত্তী হইয়া আসিল। ১৮৯৫ সনে তিনি শিবাজীর জন্মোৎসব অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলেন। মহারাষ্ট্র ইতিহাসে তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন, মহারাষ্ট্র জাতির অতীত কীর্ত্তিকলাপ তিনি সম্যকরূপে বিদিত ছিলেন। তিনি বুঝিলেন, বহুযুগের নিদ্রার অবসানে যখন কোনও জাতি নবজীবনের উন্মেষে জাগরিত হইতে আরম্ভ করে, সেই সময়ে অতীত গৌরবকাহিনীর আলোচনা জাতীয়জাগরণের পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ হয়। তাই তিনি স্থির করিলেন, শিবাজীর জন্মোৎসব অনুষ্ঠান দেশে প্রচারিত করিতে পারিলে, মহারাষ্ট্রে বিশেষভাবে জাতীয়জীবনের নবশক্তির সঞ্চার হইবে। এ বিষয়ে "কেশরী"তে একটি প্রবন্ধ বাহির হয়। তাহার ফলে রায়গড় দুর্গে শিবাজীর সমাধিমন্দিরের সংস্কার-কার্য্যের জন্য অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার হস্তে বিশহাজার টাকা সংগৃহীত হয়। এই সংস্কার কার্য্য উপলক্ষে শিবাজীর জন্মোৎসব এবং রাজ্যাভিষেক উৎসবের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল।

দুর্ভিক্ষ ও প্লেগ

১৮৯৬।৯৭ সালে বোম্বাই প্রদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ ও প্লেগ দেখা দিল। ১৮৯৬ সনের দুর্ভিক্ষের ন্যায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ এদেশে অতি অল্পই ঘটিয়াছে। দেশবাসিগণের প্রতি যে প্রবল অনুরাগ তিলকচরিত্রের একটি প্রধান

মালঞ্চ

লোকমান্য তিলক

(যমুনা ও অঞ্জলি হইতে গৃহীত)

Engraved & Printed By
L. B. Color Studio & Printing Works

ভূষণ ছিল তাহার প্রেরণায় অচিরেই তিলক আর্ত্ত জনসাধারণের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইলেন। দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য সরকারী বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা সকল অবলম্বন করা হউক, তিলক গবর্ণমেণ্টের নিকট এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। তিনি স্বয়ং পুনা নগরীতে সস্তা দরে খাদ্যশস্য বিক্রয়ের দোকান নানাস্থানে খুলিলেন। সোলাপুরের কলের কুলীদিগের সাহায্য করিবার একটি ব্যবস্থা স্থির করিলেন; কিন্তু নানা কারণ বশতঃ ইহা কার্য্যে পরিণত হইল না।

দুর্ভিক্ষের অবসান হইতে না হইতেই প্লেগ দেখা দিল। তিলক নিঃস্ব অসহায়গণের সেবা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। একটি হিন্দু-প্লেগ-হাসপাতাল খুলিলেন, পীড়িতগণের সেবাশুশ্রূষা ও স্বেচ্ছাসেবকগণের কার্য্যে সহায়তা করিতে লাগিলেন। প্লেগ দমনকল্পে সরকার পক্ষ হইতে যে সকল বিধিব্যবস্থা প্রচলিত হইল তিলক তাহার সমর্থন করিতে লাগিলেন; এবং এইসকল ব্যবস্থার কঠোরতা সম্বন্ধে গবর্ণর ও রাজকর্ম্মচারিগণের গোচর করিয়া তাহার প্রতিকারের চেষ্টাও করিতে লাগিলেন।

প্রথম রাজদ্রোহের অভিযোগ

সাধারণের সেবার কাজ আর বেশীদিন করিবার অবসর তিলক পাইলেন না। ১৮৯৭ সনের ১৫ই জুন তারিখে "কেশরী" পত্রিকায় শিবাজী উৎসবের একটি বিবরণ বাহির হয়। ৭০ই তারিখে শিবাজীর রাজ্যাভিষেক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ২৩শে তারিখে প্লেগ দমনের ব্যবস্থা সংসৃষ্ট সরকারী কর্ম্মচারী মিঃ র‍্যাণ্ড ও লেফটেনাণ্ট আয়ার্ষ্ট গুপ্ত-ঘাতক হস্তে নিহত হন। চতুর্দ্দিকে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। কেশরীতে প্রকাশিত প্রবন্ধের সহিত এই হত্যাকার্য্যের সংস্রব আছে সন্দেহ করিয়া গবর্ণমেণ্ট তিলককে গ্রেপ্তার করিলেন। যে জুরির সাহায্যে তিলকের বিচার হয় তাহার মধ্যে ৫ জন ইউরোপীয়ান, একজন ইউরোপীয় ইহুদী, দুইজন হিন্দু ও একজন পার্শী ছিলেন। ছয়জন ইউরোপীয়ান তিলককে দোষী ও তিনজন ভারতবাসী তাঁহাকে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত করিলেন। অধিকাংশের মতানুযায়ী বিচারক তিলকের প্রতি ১৮ মাস সশ্রম কারাবাসের দণ্ড বিধান করিলেন। বিলাতে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করা হয়। ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ এসকুইথ এই আপীলে তিলকের পক্ষে কাউন্সিল ছিলেন, কিন্তু আপীলে কোনও ফললাভ হইল না। ইহার কিছুকাল পরে পণ্ডিত সার উইলিয়ম হাণ্টার ও অধ্যাপক মোক্ষমুলার মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিকট তিলকের কারামুক্তি প্রার্থনা করিয়া আবেদন করেন। তিলকের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হউক, এই যুক্তির অনুবলে তাঁহারা তাঁহার মুক্তি প্রার্থনা করেন। ইহার ফলে অবশেষে তিলক মুক্তি লাভ করেন। তাঁহাকে এই মর্ম্মে একখানি অঙ্গীকার পত্র স্বাক্ষর করিতে হয় যে—তিনি ভবিষ্যতে কখনও কোন লেখা, বক্তৃতা বা কার্য্যদ্বারা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ প্রচার করিবেন না।

"বেদে আর্য্যগণের মেরুপ্রদেশে বসতির উল্লেখ"

তিলক তাঁহার পাণ্ডিত্যের সম্মানের জন্য নির্দ্দিষ্ট কাল পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই কারামুক্ত হইয়াছিলেন। জেলে অবস্থান করিবার সময় এই কঠোর দণ্ডাদেশে তিনি বিচলিত বা ম্রিয়মাণ হন নাই। বরং জেলে থাকায় অন্যান্য কার্য্য হইতে অবসর পাইয়া মৌলিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে "ওরায়ণ" গ্রন্থে বেদের রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব্ব ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে এই যে সিদ্ধান্ত তিনি করিয়াছিলেন, প্রত্নতত্ত্ব (Archaeology) এবং ভূতত্ত্ববিদ্যার (Geology) যে সকল নূতন আবিষ্কার বাহির হইয়াছিল তাহার সাহায্যে এই বিষয়ে আরও আলোচনা করিতে লাগিলেন। এই সকল গবেষণার ফলে তিনি এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হইলেন যে, বর্ত্তমান ভারতবাসী, পারস্যবাসী এবং ইউরোপবাসী আর্য্যদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের আদিম বাসভূমি এক সময়ে উত্তরমেরুর প্রান্তবর্ত্তী দেশে অবস্থিত ছিল। ১৮৯৮ সনের শেষভাগে কারামুক্ত হইয়া যখন তিনি সিংহগড়ে কিছুকাল বিশ্রাম করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার নূতন গ্রন্থের প্রথম পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। এই গ্রন্থ বহু বৎসর পরে ১৯০৩ সনের মার্চ্চ মাসে প্রকাশিত হয়, কারণ তিলক এই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত প্রচার করিবার পূর্ব্বে এ বিষয়ে ভারতীয় পণ্ডিতগণের সহিত আলোচনা করিয়া ও বিজ্ঞানের নূতন আবিষ্কার সকলের সম্যক পর্য্যালোচনা দ্বারা স্বীয় যুক্তি ভ্রমপ্রমাদশূন্য করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার এই অভিনব সিদ্ধান্তের যুক্তি সংক্ষেপতঃ এইরূপ—ভূতত্ত্ববিদ্যার

নূতন আবিষ্কার দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে যদিও বর্ত্তমানে শীতের প্রাদুর্ভাব এত বেশী যে, সেখানে জীবনধারণ করা মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব, বহুপূর্ব্বে এই স্থানে শীতের প্রকোপ অনেক কম ছিল। বর্ত্তমানে মধ্য-এসিয়ায় যেরূপ, বহুপূর্ব্বে মেরুসন্নিহিত প্রদেশে শীতাতপের অবস্থা তদনুরূপ ছিল। বিজ্ঞানাবিষ্কৃত প্রাকৃতিক নিয়মে বহুপূর্ব্বে এক সময়ে মেরুপ্রদেশে হিমানিসম্পাত আরম্ভ হইয়া ঐ প্রদেশে শীতের বর্ত্তমান আধিক্য উপস্থিত হয় কাজেই হিমানিসম্পাত যুগের পূর্ব্বে ঐ প্রদেশ মনুষ্যবাসের উপযোগী ছিল। এক্ষণে দ্বিতীয় প্রশ্ন এই, উক্ত প্রদেশে যে প্রাচীন আর্য্যগণ বাস করিতেন এরূপ কোনও প্রমাণ বেদে পাওয়া যায় কি না? অন্ততঃ পরোক্ষভাবে এ বিষয়ের উল্লেখ বেদে পাওয়া যায়। বেদে নানা স্থানে কতকগুলি জ্যোতিষিক ব্যাপারের উল্লেখ আছে,যাহা কেবল মাত্র মেরু-প্রদেশেই প্রত্যক্ষ হইতে পারে। ঋক্‌বেদে ছয়মাসব্যাপী দিবা ও ছয়মাস ব্যাপী রাত্রির উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণ ও মহাভারতেও এ বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায়। তারপর এক মাত্র মেরুপ্রদেশেই উষা দুইমাস ব্যাপী হইয়া থাকে। এ বিষয়ের কোনও উল্লেখ বেদে দেখিতে পাওয়া যায় কি? বেদে উষার মহিমা-কীর্ত্তন সম্বন্ধে যে সকল স্তোত্র আছে তাহা কবিত্বের হিসাবে জগতের কাব্য সাহিত্যের প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাইবার যোগ্য। যজুর্ব্বেদে উষা আরম্ভ হইবে কি না এ বিষয়ের আশঙ্কা মূলক নানাবিধ উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। উষা সম্বন্ধে এমনই সকল ব্যাকুলতা উষাস্তোত্রে দেখা যায়। ছয়মাসব্যাপী রাত্রির অবসানে এই উষার আগমন হইত তাহাই কবিগণের এই আশঙ্কা ও ব্যাকুলতার কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। একস্থানে যথেষ্ট উল্লেখ আছে যে উষার আলোক দেখা দিবার বহু ঘণ্টা নয়—বহু দিন পরে সূর্য্যের উদয় হইল। অতএব দে।। যাইতেছে উষার আলোক বহু দিন স্থায়ী হইত! এই শ্লোকটি অতি সরল ভাষায় লিখিত; ইহার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে কোনও ভিন্নমত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এই যে বহুদিন ব্যাপী উষা ইহা মেরু সন্নিহিত প্রদেশের ব্যাপার -অন্যত্র ইহা প্রত্যক্ষ হইতে পারে না! অতএব এই সকল নৈসর্গিক ব্যাপারের উল্লেখ হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা সমীচীন যে বেদ যাঁহারা রচনা করিয়াছিলেন সেই আর্য্যগণ মেরুসন্নিহিত প্রদেশে বাস করিতেন।

অন্যান্য প্রমাণ দ্বারাও এই সিদ্ধান্তের সমর্থন হয়। এইরূপ একটি আখ্যান দেখিতে পাওয়া যায় যে বিষ্ণু একাদশী গৃহে গমন করিয়া চারিমাস নিদ্রিত থাকেন। বেদে বিষ্ণু সূর্য্যের প্রতিপাদক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বিষ্ণু চারি মাস নিদ্রিত থাকেন এই কথার তাৎপর্য্য চারিমাস ব্যাপী রাত্রি। ইন্দ্র এবং শিব সম্বন্ধেও এইরূপ সকল আখ্যান দৃষ্ট হয়। দুই মাস ব্যাপী রাত্রি, দুই মাস ব্যাপী দিবা, অবশিষ্ট আট মাস দিবা ও রাত্রি; দশমাস কাল সূর্য্য আকাশে উদিত থাকে এবং দুইমাস সূর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না—এইরূপ উল্লেখও নানাস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। পার্শীদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ জেন্দ আভেস্তায়ও ছয়মাস ব্যাপী দিবা ও ছয়মাস ব্যাপী রাত্রির উল্লেখ আছে। পার্শিগণও প্রাচীন আর্য্যজাতির একটি শাখা। তাঁহাদিগের ধর্ম্ম গ্রন্থেও এইরূপ কিম্বদন্তীর উল্লেখ আছে যে, তাহাদিগের আদিম বাসভূমি মেরুসন্নিহিত দেশে ছিল—এই দেশ হিম সম্পাতে ধ্বংস হওয়ায় তাঁহারা দক্ষিণদিকে প্রয়াণ করেন। অন্যান্য দেশের সাহিত্যেও কিম্বদন্তী দেখিতে পাওয়া যায় যে, সূর্য্য বহুমাস যাবত অস্তমিত থাকিত ও ৩৬০ দিন হিসাবে বর্ষ গণনায় বৎসরে প্রায় নয়মাস নিরবচ্ছিন্ন রাত্রি বিরাজ করিত।

তাই মহারাজের মোকদ্দমা

এস্থলে একথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, কারামুক্তির পরে তিলক যখন পূর্ব্বোক্ত গবেষণা প্রভৃতি করিতে ছিলেন সেই সময়ও তিনি শান্তিতে বা নিরুপদ্রবে ছিলেন না, নানারূপ গোলযোগের মধ্যেই তাঁহাকে এই সকল জ্ঞানচর্চ্চা করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে তিনি একটি মোকদ্দমায় জড়িত হইয়া পড়েন, ইহাতে তাঁহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। তিলক তাঁহার একজন বন্ধুর উইল অনুযায়ী একজিকিউটার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই বন্ধুর নাম তাই মহারাজ। তিলক বিশেষ পরিশ্রম সহকারে মৃত বন্ধুর সম্পত্তির বিধি ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলা সম্পাদন করিতেছিলেন। তিলকের শত্রুগণের প্ররোচনায় মৃত বন্ধুর বিধবা পত্নীর ধারণা জন্মিল যে, তিলক নিজ স্বার্থ অন্বেষণে এষ্টেটের অহিত সাধন করিতেছেন। ১৯০১ সালে ২৯শে জুলাই তারিখে পুনা জেলার জজ আদালতে তিলকের বিরুদ্ধে এক মোকদ্দমা উপস্থাপিত হয়! ১৯০৪ সনের মার্চ মাসে সুদীর্ঘকাল এই মোকদ্দমা চলিবার পর, স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে

তিলকের ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়। সেসন জজের নিকট আপীলের ফলে দণ্ডকাল ছয় মাসে পরিণত হয়। অবশেষে হাইকোর্টের বিচারে তিনি নির্দোষী সাব্যস্ত হন।

কংগ্রেসের কথা

ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি, তিলক দেশের রাজনৈতিক কার্য্যে অল্প বয়স হইতেই যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রগাঢ় স্বদেশ-প্রেম স্বদেশ ও স্বজাতির অতীত গৌরব-কাহিনী আলোচনার ফলে ক্রমশঃই প্রবলতর হইতেছিল। তাঁহার কর্ম্ম-জীবনের প্রারম্ভ হইতেই তিনি এ দেশের আমলা তন্ত্র রাজসরকারের কার্য্যাবলীর তীব্র ভাবে সমালোচনা করিতে আরম্ভ করেন।

কংগ্রেস আরম্ভ হইবার কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিলক উহাতে যোগদান করেন। তিনি পাঁচ বৎসর বিশেষ পটুতার সহিত বোম্বাই প্রাদেশিক সম্মিলনীর সেক্রেটারীর কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। অতঃপর কংগ্রেসের দশম অধিবেশনে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সেক্রেটারী মনোনীত হন, কংগ্রেস সভামণ্ডপে সমাজ-সংস্কার সম্মিলনীর বৈঠক হওয়া সঙ্গত কি না এ বিষয়ে সহযোগিগণের সহিত গুরুতর মতভেদ হওয়ায় তিনি উক্তপদ পরিত্যাগ করেন। এক প্রকার প্রারম্ভ হইতেই প্রতি বৎসর তিনি ডেলিগেট রূপে কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিতেন। ১৮৮৫ সনের কংগ্রেসের বিষয় নির্ব্বাচন কমিটিতে তাঁহার নাম দেখা যায়। এই সভায় তিনি একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন এবং গোখেল মহোদয় উহা সমর্থন করেন। নাগপুরে কংগ্রেসের সপ্তম অধিবেশনে তিনি অস্ত্র-আইন সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করেন, লাহোরে কংগ্রেসের দশম অধিবেশনে চিরস্থায়ী রাজস্বের প্রচলন করার অনুকূল প্রস্তাব তিনি সমর্থন করেন। পুনা নগরীতে কংগ্রেসের একাদশ অধিবেশনে ভূমির রাজকর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়ার প্রস্তাব সম্বন্ধে তিনি একজন বক্তা ছিলেন। কলিকাতার কংগ্রেসের দ্বাদশ অধিবেশনে প্রাদেশিক সরকারের রাজস্ব-সংক্রান্ত অধিকার ও দায়িত্ব বৃদ্ধি করার অনুকূলে একটি প্রস্তাব তিনি একটি সংক্ষিপ্ত ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা সভায় উপস্থিত করেন। কংগ্রেসের ষোড়শ অধিবেশনের বিবরণে দেখিতে পাওয়া যায়, সাধারণ শ্রেণীর হিতকর একটি প্রস্তাব তিলক এই সভায় সমর্থন করিয়াছিলেন। কলিকাতায় কংগ্রেসের সপ্তদশ অধিবেশনে শিক্ষাদান বিষয়ক একটি প্রস্তাব তিলক সমর্থন করেন। ভারতের কতিপয় প্রতিনিধি বিলাতে পাঠান হউক, এই মর্ম্মে স্যার উইলিয়াম ওয়েডার বার্ণ কংগ্রেসে যে প্রস্তাব উপস্থিত করেন, তিলক তাহার সমর্থন করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, রাজনৈতিক আন্দোলনের এই পন্থা তিলক অনুমোদন করিতেন। তিনি বলিতেন যে, আমাদের বিচারকগণ ইংলণ্ডে আছেন, অর্থাৎ ব্রিটিশ জাতিই প্রকৃত ভারতের ভাগ্য-বিধাতা। বারাণসীতে ১৯০৫ সনের কংগ্রেসে তিলক বিশেষরূপে অভিনন্দন পাইয়াছিলেন। ১৯০৬ সনের কলিকাতা কংগ্রেসে স্বদেশী সম্বন্ধীয় প্রস্তাব আনন্দ চার্লু মহোদয় উপস্থিত করেন এবং তিলক তাহার সমর্থন করেন।

চরম মতবাদ

এই সময়ে ভারতবর্ষের রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রাচীন শান্ত-শিষ্ট আন্দোলনের যুগ অবসান হইয়া নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত হইল। লর্ড কর্জ্জন কর্ত্তৃক বঙ্গ-ভঙ্গের ফলে যে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হইল, সরকার পক্ষ ইহা দমনকল্পে কঠোর শাসন নীতি অবলম্বন করিলেন; সভা সমিতি বন্ধ হইল, বিনা বিচারে লোকের দেশান্তর হইতে লাগিল। দমন-শাসনের বিভীষিকায় দেশে আতঙ্ক উপস্থিত হইল। যাহারা রাজনীতি ক্ষেত্রের কোনও সমাচার রাখিত না তাহারাও সংক্ষুব্ধ ও বিচলিত হইয়া উঠিল। এই শাসননীতির ফলে প্রাচীন শান্তশিষ্ট আন্দোলন নীতিতে যাঁহাদিগের আস্থা ছিল, তাঁহাদের অনেকেরই বিশ্বাস শিথিল হইল। তাঁহারা বুঝিলেন, এ নীতিতে আর ফল লাভের কোনও আশা করা যায় না। দেশের মধ্যে নূতন এক মতবাদ গড়িয়া উঠিল "ভিক্ষায়াং নৈব চ নৈব চ"—দাবীর জিনিষ ভিক্ষা করিয়া ভিক্ষুকের মত চাহিয়া পাওয়া যায় না।

দেশের এই নূতন ভাব বন্যার ঢেউ কংগ্রেসে আসিয়া পৌছিল, নূতন দল প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। এ অবস্থায় কংগ্রেস যে নব্যতন্ত্রের হাতে আসিয়া পড়িবে, তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক, তবে মাত্র সময়ের অপেক্ষা ছিল। সুরাটের ব্যাপার না হইলেও অন্যভাবে এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইত। কাজেই সুরাট কংগ্রেসের গোলযোগের ব্যাপার কংগ্রেসের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বর ঘটনা বলিয়া উল্লেখ যোগ্য নহে। এই ব্যাপারে উভয় পক্ষের দোষাদোষের বিশ্লেষণ করাও নিষ্প্রয়োজন।

১৯০৮ সনে তিলকের বিরুদ্ধে অভিযোগ

সুরাট কংগ্রেসের দলাদলির পর দেশের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিল। সরকার পক্ষের কঠোর দমন নীতি অপ্রতিহত প্রভাবে চলিতে লাগিল। ইহার পরিণামে ১৯০৮ সনে বঙ্গদেশে আততায়ীর প্রথম বোমা আকাশ-মণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া বিপ্লববাদিগণের আবির্ভাব ঘোষণা করিল। দেশের সর্ব্বত্র এই সংবাদ প্রচারিত হইয়া নূতন আতঙ্কের সৃষ্টি করিল। ইউরোপীয়ান পরিচালিত সংবাদপত্র সমূহে এ সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য সকল বাহির হইতে লাগিল। সংবাদপত্র সমূহেও বিপ্লববাদিগণের বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশিত হইল, কিন্তু তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, এই বিপ্লববাদ দেশ হইতে দূর করিতে হইলে শিক্ষিত জন-সাধারণের মতানুযায়ী দেশের শাসন-প্রণালী সংস্কার করা প্রয়োজন, দমননীতির সাহায্যে ইহা দূরীভূত হইবে না। পক্ষান্তরে ইউরোপীয়ান পরিচালিত সংবাদপত্র সমূহ উন্মত্তবৎ আরও কঠোরতর দমন নীতির প্রয়োগ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

বঙ্গদেশের এই বোমার আলোচনা দেশের সর্ব্বত্রই চলিতে লাগিল। তিলকের "কেশরী" পত্রিকায় বিপ্লববাদ দমন সম্বন্ধে ধারাবাহিকরূপে কয়েকটি প্রবন্ধ বাহির হইল। ইহাতে সুস্পষ্টভাবে দেশের অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপনা করা হয় যে, বোমা নিক্ষেপকারী যদিও অবজ্ঞার পাত্র বটে, কিন্তু বোমার উদ্ভবের মূল কারণ গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাতন্ত্র শাসননীতি ও কঠোর দমননীতি। সরকার পক্ষ যদি এইরূপ কঠোর শাসননীতি অবলম্বন করিয়াই চলিতে থাকেন, তাহা হইলে বিপ্লববাদ আরও প্রবল হইতে থাকিবে। ইহার স্থায়ী প্রতিকার করিতে হইলে গবর্ণমেণ্টের শাসননীতির উপযুক্ত সংস্কার সাধন করা একান্ত আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট সাব্যস্ত করিলেন, এই সকল প্রবন্ধের উদ্দেশ্য বিপ্লববাদীদিগকে উৎসাহিত করা; অকস্মাৎ একদিন তিলক সহসা গ্রেপ্তার হইয়া জেলে আবদ্ধ হইলেন। এই সময়ে তাঁহার বন্ধু পারঞ্জপে মহোদয় রাজদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত হওয়ায় তদুপলক্ষে বোম্বাই নগরীতে ছিলেন। যদিও সম্ভবতঃ কেশরীর এই সকল প্রবন্ধ তাঁহার লিখিত নয়, তথাপি তিলক উদার ভাবে ঐ সকলের যাবতীয় দায়িত্ব স্বয়ং স্বীকার করিয়া লইলেন। তাঁহাকে জেলে আবদ্ধ রাখা হইল, পুনঃ পুনঃ জামিনের প্রার্থনা করিয়াও কোনও ফল লাভ হইল না। ইহাতে তাঁহার পক্ষসমর্থন করার উপযুক্ত ব্যবস্থাও তিনি করিবার অবসর পাইলেন না। ১৩ই জুলাই তারিখে বোম্বাই হাইকোর্টে বিচার আরম্ভ হইল। যে নয়জন জুরী নিযুক্ত হইলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ৭ জন ইউরোপীয়ান ও ২ জন পার্শী অথচ যে প্রবন্ধ উপলক্ষে অভিযোগ তাহা মারাঠি ভাষায় লিখিত; জুরীদিগের মধ্যে কেহই অথবা জজ স্বয়ং সে ভাষা জানিতেন না। এবার তিলক আর কোন কাউন্সিল নিযুক্ত করিলেন না; স্বয়ং নিজের মোকদ্দমার সোয়াল জবাব করিলেন। বিচারের তৃতীয় দিনে প্রায় ৪ ঘটিকার সময় তিলক স্বীয় পক্ষ সমর্থন করিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করেন এবং ৮ম দিনে তাহা সমাপ্ত করেন, উপযুক্ত তদ্বিরাদি করিবার অবসর না পাওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁহার বক্তৃতায় অসাধারণ আইন জ্ঞান ও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিলক যেদিন শেষ করিলেন, সেইদিনই সরকারী পক্ষে এড্‌ভোকেট জেনারেল মিঃ ব্রান্‌সন বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া বেলা ৫টার সময় শেষ করেন। বড়ই দুঃখের বিষয় মিঃ ব্রান্‌সন স্বীয় পদমর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া তিলকের প্রতি নানা বিদ্রূপ ও শ্লেষোক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিলক তাঁহার সুদীর্ঘ বক্তৃতায় কখনও শিষ্টাচারের মাত্রা উল্লঙ্ঘন করেন নাই। বিচারপতি মিঃ ডাভার ঐ দিনই মোকদ্দমা শেষ করিবেন জানাইয়া জুরীদিগকে মোকদ্দমার বিষয় বুঝাইয়া দিলেন। তিনি মোকদ্দমার অবস্থা তিলকের প্রতিকূলে ব্যাখ্যা করিলেন। ৮টার সময় জুরীগণ পরামর্শ করিবার জন্য অবসর লইলেন। রাত্রি প্রায় ৯৷৷০ টার সময় তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া তিলক দোষী এই মত প্রকাশ করিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে ৭ জন বিরুদ্ধে ও ২ জন তিলকের অনুকূলে মত দিয়াছিলেন। জজ তিলকের শাস্তি বিধান করিলেন—ছয় বৎসর দ্বীপান্তর ও ১০০০৲ টাকা জরিমানা।

এই দণ্ডাদেশ প্রচার হইবামাত্র বোম্বাই নগরীতে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল, সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হইল, শ্রমজীবীরা কাজ বন্ধ করিল, রাস্তায় রাস্তায় মারা মারি দাঙ্গা বাধিল।

কিন্তু যাঁহার উপর এই নিদারুণ দণ্ডাদেশ হইল, তিনি স্থির, ধীর, অটল রহিলেন। তিনি শোকে ম্রিয়মাণ হইলেন না, কিম্বা ক্রোধে বিচলিত হইলেন না। [illegible]

জুরীগণ তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া মত প্রকাশ করিলেন তখন তিলক বলিলেন :—

"আমি একটি কথামাত্র বলিতে চাই। জুরীগণ যে মতই প্রকাশ করুন না কেন আমি জানি আমি নির্দ্দোষ। এ জগতের ব্যাপার সকল রাজার উপরেও যে রাজা আছেন তাঁহারই বিধানে নিয়মিত হয়। আমার জীবনের যে ব্রত, তাহার কার্য্য আমার স্বাধীনভাবে থাকা অপেক্ষা আমার ক্লেশভোগ দ্বারাই অধিকতর অগ্রসর হইবে -হয়ত ইহাই বিধাতার বিধান।"

এই ভাবে উদ্দীপিত হইয়া তিলক দ্বীপান্তরে গেলেন। সুদূর বিদেশে মান্দালয়ের সঙ্কীর্ণ কারাগার ছয়টি সুদীর্ঘ বৎসরের জন্য তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিল।

গীতা রহস্য

এই সুদীর্ঘ কারাবাসে তিলক ভগ্নহৃদয় বা ম্রিয়মাণ হইলেন না। অবসরবিহীন কর্ম্মজীবন হইতে এই অবসর লাভ করিয়া তিলক স্বাভাবিক জ্ঞানস্পৃহা চরিতার্থ করিবার সুযোগ পাইলেন। তিনি তাঁহার প্রিয় গ্রন্থ ভগবদ্গীতার গভীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিলক-চরিত্রের এই মাহাত্ম্য এই ঔদার্য্য তাঁহার স্বদেশবাসীগণের সবিশেষ অনুধাবনার বিষয়। এই গীতার আলোচনা সম্বন্ধে যে একখানি পত্র তিনি সেই সময়ে লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে তাঁহার এই নূতন গবেষণার ধারা আমরা বুঝিতে পারি, এবং আরও বুঝিতে পারি কি অদ্ভুত শক্তি ছিল তাঁহার হৃদয়ে, যাহার বলে এই নিদারুণ আঘাত উপেক্ষা করিয়া তিনি ধীর প্রশান্তভাবে দার্শনিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিলেন। এই পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, "গীতার আলোচনা-গ্রন্থখানি শেষ করিয়াছি, ইহার নাম রাখিয়াছি 'গীতারহস্য'। ইহাতে মৌলিকভাবে গীতার উদ্দেশ্য এবং আমাদের ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থে কিরূপ ভাবে নীতিসংক্রান্ত প্রশ্ন সকলের সমাধান করা হইয়াছে তাহা বিবৃত করিয়াছি। আমার মতে গীতা নীতিশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ। গীতার প্রতিপাদ্য নীতির ভিত্তি ইউরোপীয় প্রয়োজনবাদ অথবা অন্তর্জ্ঞানবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে—ইহা পরমার্থবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। গ্রীণ প্রণীত "প্রোলোগমেনা টু এথিক্স" নামক গ্রন্থ খানিতে এইরূপ ধরণের আলোচনার আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। আশাকরি, "ওরায়ণের" ন্যায় এই গ্রন্থখানিও সম্পূর্ণ অভিনব ধরণের বলিয়া স্বীকৃত হইবে। আমি যতদূর অবগত আছি, ইতিপূর্ব্বে আর কেহ এই প্রণালীতে গীতার সম্বন্ধে আলোচনা করেন নাই। প্রায় ২০ বৎসর যাবৎ এই ভাবে আমি গীতার সম্বন্ধে মনে মনে আলোচনা করিয়া আসিতেছি। আমার নিকটে যে সকল গ্রন্থ ছিল, তাহা হইতে অনেক অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি। কিন্তু যে সকল গ্রন্থ আমার নিকটে নাই তাহার অনেক অংশ স্মৃতির সাহায্যে উদ্ধৃত করিতে হইয়াছে। গ্রন্থ প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে এই সকল অংশ মূলের সহিত মিলাইয়া দেখিতে হইবে। কাজেই আমার কারামুক্তির পূর্ব্বে আর এ গ্রন্থ প্রকাশ হইতে পারে না।"

কারামুক্তি ও নব্যমত প্রচার

১৯১৪ সনে নিখিল ভারতবাসীর আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া সুদীর্ঘ ছয় বৎসর পরে তিলক স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। বহুদিন পরে বিদেশ হইতে প্রত্যাগত পিতাকে শিশুরা যেমন চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করে—তেমনি স্নেহে মহারাষ্ট্রবাসিগণ তিলকের চতুর্দ্দিকে সমবেত হইল। তখন ইউরোপীয় মহা-সমর আরম্ভ হইয়াছে, মিণ্টো-মর্লি শাসন সংস্কার দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয়ের শাসনকাল অর্দ্ধেক গত হইয়াছে; আন্তর্জাতিক সংঘর্ষের ফলে ভারতীয় সমস্যা সকল বৃটিশজাতি নূতন দৃষ্টিতে উদার ভাবে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে নূতন যুগের অবতারণা হইয়াছে।

সুদীর্ঘ কারাক্লেশে তিলকের মতের কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। তিনি অচিরেই কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তৎপূর্ব্বে নূতন অবস্থা সম্বন্ধে দেশবাসী-দিগকে নিজের অভিমত জানান সঙ্গত বোধ করিয়া নিম্ন-লিখিত চিঠিখানি "মারহাট্টা" পত্রিকায় ১৯১৪ সনের ৩০শে আগষ্ট তারিখে প্রকাশ করিলেন—"কেবলমাত্র সুসভ্য শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিয়া নহে, তাহার ফলে ভারতের বিভিন্ন জাতি সমূহ একই শাসনাধীনে আনিয়া একটি সম্মিলিত জাতি গঠনের সুবিধা করিয়া দিয়া, ব্রিটিশ-অধিকার ভারতের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছে, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। স্বাধীনতাপ্রিয় ব্রিটিশ জাতি ভিন্ন অন্য কোনও জাতি আমাদিগের প্রভু হইলে তাঁহারা আমাদিগের জাতীয় আদর্শ গঠনের পক্ষে এতদূর সহায়তা করিতেন, ইহা

আমি বিশ্বাস করিতে পারি না। ভারতবর্ষের প্রকৃত কল্যাণকামনা যিনি অন্তরের সহিত করেন, তিনি ব্রিটিশ শাসনের এই সকল ও অন্যান্য উপকার বিস্মৃত হইতে পারেন না। বর্ত্তমান সঙ্কট, আমার বিবেচনায়, বিপদের আবরণে এক হিসাবে আমাদিগের পক্ষে কল্যাণকর; যেহেতু এই উপলক্ষে ব্রিটিশ সিংহাসনের প্রতি আমাদিগের সম্মিলিত হৃদয়ের অনুরাগ ও রাজভক্তি প্রকাশিত হইবার সুযোগ ঘটিয়াছে। আপনারা সকলেই জানেন, নানা সন্ধি-সর্ত্তের বিরুদ্ধে এবং ক্ষুদ্র দেশের স্বাধীনতা অব্যাহত রাখিতে পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াও জার্ম্মাণ সম্রাট সেই সকল দেশের অভ্যন্তরে সৈন্য চালনা করিয়াছেন। তাঁহার এই আচরণে এই সকল দুর্ব্বল শক্তিগণের রক্ষার্থে ব্রিটিশজাতি এই যুদ্ধে যোগদান করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমার মতে এইরূপ সঙ্কটে ছোট, বড়, ধনী, নির্ধন প্রত্যেক ভারত-বাসীরই সম্রাটের সাহায্যার্থে যথাসাধ্য চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য। অতএব অগৌণে অন্যান্য স্থানের ন্যায় জাতি, বর্ণ, দল নির্ব্বিশেষে প্রকাশ্য সভায় সম্মিলিত হইয়া এ বিষয়ে পুনাবাসিগণের মনোভাব স্পষ্ট ভাবে জ্ঞাপন করা নিতান্ত প্রয়োজন। এরূপ অনুপ্রাণের সাপক্ষে পূর্ব্বদৃষ্টান্তের উল্লেখ অনাবশ্যক, তত্রাপি একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৮৭৯-৮০ সনে আফগান-যুদ্ধ সংক্রান্ত গোলযোগের সময়ে পুনাবাসিগণ এইরূপ একটি প্রকাশ্য সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইবে যে, আমাদিগের রাজভক্তি এবং বিপদে রাজসরকারকে সাহায্য করিবার প্রবৃত্তি আন্তরিক ও অবিচলিত বটে এবং রাজার সঙ্কটে প্রজার কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধেও আমরা উদাসীন নহি।"

তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ চূর্ণবিচূর্ণ করিতে যে রাজসরকার প্রয়াস করিয়াছেন, সেই সরকারের বিপদ সময়ে তাঁহার এই উদার ভাব, রাজনীতির ইতিহাসে মহত্ত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সমূহের মধ্যে পরিগণিত হইবার নিতান্ত উপযুক্ত।

কার্য্যারম্ভ

বহুবৎসর যাবত কর্ম্মক্ষেত্রের সহিত কোনও সংস্রব না থাকায় ছিন্নকর্ম্মসূত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া লইতে তিলকের কিছু সময়ের প্রয়োজন হইল। দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রের অবস্থাও সেই সময়ে তাঁহার পক্ষে সবিশেষ অনুকূল ছিল না। তখন কংগ্রেসে দুই দলের মধ্যে কোনও আপোষ হয় নাই, কাজেই দেশে ফিরিবার পর কার্য্য আরম্ভ করিতে তিলকের কিছু বিলম্ব হইল। এই সময়ে, ১৯১৫ সনে মিঃ জোসেফ ব্যাপ্‌টিষ্টা মহোদয়ের সভাপতিত্বে পুনায় নূতন দলের যে কন্‌ফারেন্স হয় তাহাতে তিলক যোগদান করেন। কিন্তু লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে উভয় দলের আপোষ হওয়ার পর এবং হোমরুল আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পরেই প্রকৃত প্রস্তাবে তিলক বিশেষ ভাবে কার্য্যে অগ্রসর হইলেন। ১৯১৬ সনের মে ও জুন মাসে বোম্বাই প্রদেশ পরিভ্রমণ করতঃ নানা স্থানে বিরাট সভার অনুষ্ঠান করিয়া তিলক মারাঠি ভাষায় জনসাধারণের নিকট স্বায়ত্ত শাসনের মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করেন। এই সকল বক্তৃতা হইতে মারাঠি রচনায় তিলকের অপূর্ব্ব নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়।

তিলকের মুচলিকা

তিলক জনসাধারণের মধ্যে স্বায়ত্ত-শাসনের মর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিতেই সরকারের আসন টলিয়া উঠিল। তিলকের ওজস্বিনী ভাষায় জনসাধারণের চিত্ত এ বিষয়ে আকৃষ্ট হইতে লাগিল ইহা সরকার পক্ষের অসহ্য বোধ হইল। তিলকের বিরুদ্ধে অবৈধ-আচরণের অভিযোগ আনা হইল। পুনার ম্যাজিষ্ট্রেট তিলকের উপর পরোয়ানা জারি করিলেন,—যাহাতে ভবিষ্যতে শিষ্ট ব্যবহার করেন এজন্য তাঁহাকে ৪০,০০০, টাকার জামিন দিতে হইবে। এ দেশের দণ্ডবিধি আইনে যিনি অভিযোগ আনেন তিনিই অভিযোগের বিচার করেন,, কাজেই উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে উক্ত আদেশই বলবৎ হইল। তিলক হাইকোর্টে আপীল করিলেন। হাইকোর্টের বিচারে ব্রিটিশ ধর্ম্মাধি-করণের মর্য্যাদা রক্ষা হইল, তিলক নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হইলেন। বিচারপতিগণ ধার্য্য করিলেন, তিলকের বক্তৃতা তীব্র এবং আপত্তিজনক হইলেও উহাতে বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীর বিরুদ্ধে সমালোচনা মাত্র করা হইয়াছে, ব্রিটিশ রাজ্যাধিকারের, বিরুদ্ধে কোনও উক্তি তাহাতে নাই। ভারতে প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশশাসনের বিরুদ্ধে তিলক কিছুই বলেন নাই, অথবা ব্রিটিশ সংস্রবের বিরুদ্ধে কোনও মত তিনি প্রকাশ করেন নাই, কাজেই এই সকল বক্তৃতা উপলক্ষে রাজদ্রোহ অভিযোগ তাঁহার বিরুদ্ধে চলিতে পারে না। তাঁহারা আরও ধার্য্য করেন যে, কোনও বক্তৃতা হইতে

কয়েকটি বাক্য মাত্র সংগ্রহ করিয়া তাহা রাজদ্রোহমূলক প্রাবাস্ত করা অসঙ্গত, সমগ্র বক্তৃতাটি আলোচনা করিয়া তাহার প্রকৃত মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য অবধারণ করাই যুক্তিসঙ্গত। এইরূপ রিপ স্থির হলে তিলকপ্রদত্ত জামিনের টাকা ফেরত পাইলেন।

কিন্তু এদেশে সরকার পক্ষের বক্র-দৃষ্টিতে পড়িয়া বিচার-আদালতের সাহায্যে নিরাপদ হওয়া অসম্ভব। আদালতের বিচার পণ্ড করিবার অনেক কৌশল ও অস্ত্র সরকারের হাতে আছে। তিলক যেমন হাইকোর্টের বিচারে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হইবেন, অমনই সরকার পক্ষ ভারতরক্ষা-আইন অনুসারে তাঁহার উপর আদেশ প্রচার করিলেন, তিনি পাঞ্জাব ও দিল্লী প্রদেশে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। ভারতসচিব মণ্টেগু মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য একবার তাঁহাকে এই প্রদেশে যাইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল।

একষষ্টীতম জন্মদিনের উৎসব

যেদিন পুনার ম্যাজিষ্ট্রেট তিলকের উপর অবৈধ ব্যবহার উপলক্ষে পরোয়ানা জারী করেন, ঐ তারিখে তিলকের এক-ষষ্টিতম জন্মদিন উপলক্ষে মহারাষ্ট্রবাসিগণ তাঁহাকে অভিনন্দন করিবেন স্থির হইয়াছিল। তাঁহার গুণমুগ্ধ দেশবাসিগণ ঐ তারিখে তাঁহার গুণ-কীর্ত্তন করিয়া ও তাঁহার প্রতি তাঁহা-দিগের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জ্ঞাপন করিয়া একখানি অভিনন্দন পত্র ও একলক্ষ মুদ্রা উপহার দিলেন। ইহার প্রত্যুত্তরে তিলক যে বক্তৃতা করেন তাহা হইতে তাঁহার অসাধারণ চরিত্রের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। স্বদেশের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম, স্বদেশের সেবায় নির্ভীক সাহস, তিলক-চরিত্রের এই সকল গুণ এই বক্তৃতায় বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। মাতৃভূমির আহ্বান সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন,—

"বর্ত্তমান ক্ষেত্রে দেশের প্রতি আমাদের যে কর্ত্তব্য তাহা যেমনই মহৎ তেমনিই বিশাল ও গুরুতর। ইহা সাধন করিতে সকলকেই একযোগে কাজ করিতে হইবে—উৎসাহের সহিত, সাহসের সহিত কাজ করিতে হইবে—আমার জীবনে যদি ইহার কোনও পরিচয় দিতে পারিয়া থাকি, তাহা অপেক্ষাও আরও উৎসাহ আরও সাহসের সহিত এই কার্য্য সাধন করিতে হইবে। একাজ ফেলিয়া রাখা চলিবে না। মাতৃভূমি আমাদের প্রত্যেককেই এই কার্য্যে ব্রতী হইতে আহ্বান করিতেছেন। সন্তানেরা জননীর এই আহ্বান উপেক্ষা করিবেন একথা আমি মনে করি না; তথাপি কর্ত্তব্য বোধে আমি আপনাদিগকে অনুরোধ করি, আপনারা দেশমাতার আহ্বানে অগ্রসর হউন। আজ মতভেদ, বিরোধ যা কিছু আছে সে সকল বিস্মৃত হউন, আজ প্রত্যেকেই মাতৃসেবায় ব্রতী হউন, প্রত্যেকেই জাতীয় আদর্শে অনু-প্রাণিত হউন। একার্য্যে পরস্পর রেষারেষি রেষারেষির অবসর নাই। আমাদিগের এই চেষ্টা ও উদ্যম বিধাতার আশীর্ব্বাদে সফল হইবেই—আমাদের জীবদ্দশায় না হউক—আমাদের পরবর্ত্তিগণ ইহার ফলভোগ করিবেই।"

হোমরুল ও কংগ্রেসের কাজ

১৯১৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসে প্রধানতঃ তিলকের নেতৃত্বে "মহারাষ্ট্র হোমরুল লীগ" সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। তদবধি এই সভা নানা স্থানে বক্তৃতার ব্যবস্থা ও নানা বিষয়ে পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া স্বায়ত্ত-শাসন সম্বন্ধে শিক্ষা ও প্রচার কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া আসিতেছেন। এই বৎসর তিলক লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং তাঁহাকে বিশেষ সম্বর্দ্ধনার সহিত অভ্যর্থনা করা হয়। এই কংগ্রেসে তিনি সুবিখ্যাত স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধীয় প্রস্তাব সমর্থন করেন।

১৯১৭ সালের কলিকাতা কংগ্রেসে তিলক পুনরায় ঐ প্রস্তাব সমর্থন করেন। এস্থলে ইহা সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য যে এই কংগ্রেসে যখন একদল উক্ত প্রস্তাবে অধিকারের দাবী আরও বাড়াইতে চাহিয়াছিলেন তখন মহামতি তিলকই তাঁহাদিগকে এই অতিরিক্ত দাবী পরিত্যাগ করিয়া অপর দলের সহিত একমত হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি মহারাষ্ট্র রাজনীতিকের সূক্ষ্মবুদ্ধি ও কার্য্য-তৎপরতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন।

তিলকের জীবনে ইহাই তাঁহার শেষবার কলিকাতায় আগমন। কংগ্রেসের কাজ শেষ হইবার পরেও কিছুদিন তিনি কলিকাতায় ছিলেন। এই সময়ে বিলাতে ভারতীয় রাজনীতিক আন্দোলন বিশেষভাবে চালাইবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে স্থানীয় জননায়কগণের সহিত তিনি পরামর্শ করেন। এতদুপলক্ষে বিডন-উদ্যানে ও অন্যান্য স্থানে কয়েকটি প্রকাণ্ড সভার অধিবেশন হয়। এই সকল সভায় ও বড়বাজারের ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে তিলক বিলাতের রাজনীতিক আন্দোলন চালাইবার জন্য কতক অর্থ সংগ্রহ করেন।

বিলাতে ভারতীয় আন্দোলনের সংকল্প

তিলক কলিকাতায় এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে মণ্টেগু, চেম্‌সফোর্ড রিপোর্ট বাহির হইবার পর ভারতে ও বিলাতে ঘোরতর আন্দোলন আরম্ভ করা প্রয়োজন। উপযুক্তরূপ আন্দোলন করিতে পারিলে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় শাসন সংস্কার আইন অধিকতর উদার হওয়ার আশা করা যায়। ভারতবর্ষে আন্দোলনের বিশেষ প্রয়োজন এই যে, অন্যথায় বিলাতে এইরূপ ধারণা হইবে যে, ভারতবাসিগণ মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড প্রস্তাবেই সন্তুষ্ট আছে, অথবা যতদূর আশা করিয়াছিল তাহা অপেক্ষাও বেশী পাইয়াছে। আর বিলাতে আন্দোলন করার প্রয়োজন এই যে, ভারতের প্রকৃত ভাগ্য-বিধাতা বিলাতের জনসাধারণ, আমাদের প্রভুগণ আমাদের সম্বন্ধে সংবাদ খুবই কম রাখেন, ভারত সরকার ভারতবাসিগণের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া পাঠান তাহার অতিরিক্ত কোনও তথ্য তাঁহারা জানেন না। অতএব আমাদের প্রভুদিগকে আমাদের বিষয় ভাল করিয়া জানাইতে ও বুঝাইতে হইবে। বিলাতে যদি জনসাধারণের মত ভারত বাসীর স্বায়ত্তশাসন লাভের অনুকূলে সংগঠন করা যায় তাহা হইলে বিলাতের পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় ভারতীয় শাসন-সংস্কার প্রস্তাব উদার আকার ধারণ করিবে আশা করা যায়। তিলক আরও বলেন যে, বিলাতী রাজনীতিক্ষেত্রে নূতন শ্রম-জীবী দলের প্রাধান্য ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহাদিগকে আমাদিগের অবস্থা বুঝাইতে পারিলে অধিকতর সাহায্য ও সহানুভূতি পাইবার আশা করা যায়। তিনি এইরূপ মত প্রকাশ করেন যে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে অন্যূন ৮।১০ জন উপযুক্ত লোক বিলাতে পাঠান প্রয়োজন। যে পর্য্যন্ত না মহাসভা হইতে শাসন সংস্কার আইন পাশ হয় সে পর্য্যন্ত নিয়ত ৮।১০ জন বিশেষ ভাবে এই আন্দোলন চালা-ইতে থাকিবেন। ইহাদিগের ব্যয়ভার ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ হইতে অংশমত সংগ্রহ করিয়া দিতে হইবে। কলিকাতার জাতীয় দলের নায়কদিগকে তাঁহার ব্যবস্থামত ব্যক্তি নির্ব্বাচন ও অর্থ সংগ্রহের উপদেশ দিয়া তিলক দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাগমন করিলেন।

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ

অন্যান্য প্রদেশে তাঁহার ব্যবস্থানুযায়ী কার্য্য কি হইবে না হইবে তাহার প্রতীক্ষার তিলক ... তিনি বলিয়া গিয়াছিলেন, অন্য কোনও প্রদেশ এ বিষয়ে কিছু না করিলেও দাক্ষিণাত্য হইতেও তিনি এ ব্যবস্থানুযায়ী ... কার্য্য করিবেন। তিলক মহারাষ্ট্রে পৌঁছিয়া তাঁহার প্রস্তা-বানুযায়ী কার্য্য করিতে অগ্রসর হইলেন। অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি সমগ্র দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করি-লেন। নায়কগণের মধ্যে তিলকই যে প্রকৃত প্রস্তাবে জন-গণ-মন-অধিনায়ক ছিলেন, ও মহারাষ্ট্রে যে তিলকের কিরূপ অসাধারণ প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল তাহার সম্যক পরিচয় তাঁহার এই দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকাহিনী হইতে পাওয়া যায়। তিলক প্রায় দুইমাস যাবত দাক্ষিণাত্য প্রদেশের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করেন। যখন যেখানে উপস্থিত হইয়াছেন সেখা-নেই তাঁহাকে দেখিবার জন্য, তাঁহার মুখের দুইটি কথা শুনিবার জন্য বিশাল জনতার সমাবেশ হইয়াছে। অনেক স্থানে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় সহস্র সহস্র লোক সভায় সমবেত হইয়াছে। অনেক স্থানে তিনি রেলগাড়ী হইতে অবতরণ করিতে পারেন নাই, অথচ ষ্টেশনে বহু লোক থালা ভরিয়া মাতৃসেবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া রেলগাড়ীতেই তাঁহাকে উপহার দিয়াছে। প্রতি সভাতেও এইরূপ অযাচিত ভাবে অর্থ সংগ্রহ হইয়াছে। এইরূপে প্রায় দুইমাসের মধ্যে লক্ষাধিক টাকা বিলাতে ভারতীয় আন্দোলনের জন্য তিলক সংগ্রহ করেন।

১৯১৮ সনের আগষ্ট মাসে ভারতীয় শাসন সংস্কার সম্বন্ধে মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড রিপোর্ট আলোচনা করিবার জন্য বোম্বাই নগরীতে কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনের কার্য্যে তিলক একজন প্রধান অগ্রণী ছিলেন। ১৯১৬ সনে লক্ষ্ণৌয়ের কংগ্রেসে জাতীয় দলের যে প্রাধান্য স্থাপিত হয়, তিলকের ভারতব্যাপী প্রভাব ও প্রতিপত্তি তাহার প্রধান কারণ। ১৯১৭ সনের কলিকাতা কংগ্রেসে এই প্রাধান্য পরিস্ফুট হয়। তৎপরে বোম্বাইয়ের বিশেষ অধিবেশন। এই অধিবেশনের সফলতার জন্য তিলক যথেষ্ট শ্রম স্বীকার ও সংযম প্রকাশ করিয়াছিলেন।

চিরোলের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা

১৯১৮ সনের শেষভাগে তিলক বিলাত যাত্রা করেন। এই সময়ে বিলাত যাওয়ার তাঁহার আর একটি উদ্দেশ্য কারণ ছিল। তাহা চিরোলের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা। ... সার

ভেলেনটাইন চিরোল "ভারতে অশান্তি" নামক একখানি পুস্তকে তিলকের অনেকগুলি মিথ্যা অপবাদ রটনা করেন। এই অপবাদের মূল বিষয়গুলি এইরূপ :—তিলকের জন্ম মহারাষ্ট্র চিত্তপাবন ব্রাহ্মণকুলে। মহারাষ্ট্রের পেশবাগণ এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। ভারতে ব্রিটিশ অভ্যুদয়ের সহিত পেশবাদিগের রাজ্যাধিকার বিলুপ্ত হওয়া অবধি এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ ব্রিটিশ অধিকার লুপ্ত করিবার জন্য নানা প্রকার ষড়যন্ত্র করিয়া আসিতেছেন। তিলক এই ষড়যন্ত্রকারীদিগের অগ্রণী। তাঁহারই প্রচেষ্টায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এই ষড়যন্ত্রের নানা শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইয়াছে। র‍্যাণ্ড ও আয়াষ্টের হত্যাকাণ্ডের মূলেও তিনি ছিলেন। শিবাজী উৎসব প্রতিষ্ঠা এই ষড়যন্ত্রের অন্তর্গত। ভারতের নানা স্থানে যে বিপ্লববাদের সূচনা হইয়াছে তাহার মূলেও এই ষড়যন্ত্র। ভারতব্যাপী অশান্তি ও বিক্ষোভের মূল কারণই তিলক।

তিলক বিবেচনা করিলেন যে, এই সকল অলীক অপবাদ অবাধে বিলাতে প্রচলিত হইতে থাকিলে ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের সফলতার বিশেষ অন্তরায় উপস্থিত হইবে, এজন্য বিলাতের আদালতে এই সকলের অলীকতা প্রমাণ করা আবশ্যক। বিলাতের আদালতে ন্যায় বিচার হইবে এবং সেখানে বর্ণভেদে বিচার বিভেদ হয় না ইহাও তিলকের বিশ্বাস ছিল। এই সকল কারণে বিলাতের আদালতে চিরোলের বিরুদ্ধে তিনি মানহানির মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। এই মোকদ্দমার তদ্বির উপলক্ষেও ১৯১৮ সনের শেষভাগে তাঁহার বিলাত যাওয়া প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছিল। তিলক বিলাতের খ্যাতনামা কাউন্সিল দিয়া মোকদ্দমা চালাইলেন ; কিন্তু সুবিচারের আশায় তাঁহাকে হতাশ হইতে হইল। মোকদ্দমায় তাঁহার পরাজয় হইল। এই মোকদ্দমা উপলক্ষে তাঁহার প্রায় তিন লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হয়, ইহার অধিকাংশই বোম্বাই প্রদেশের অধিবাসিগণ চাঁদা তুলিয়া তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলেন।

বিলাতে ভারতীয় আন্দোলন

তিলক মোকদ্দমায় হারিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে ভগ্নহৃদয় বা ভগ্নোৎসাহ হইলেন না। যিনি ভারতের ও ব্রহ্মদেশের কারাগারে আবদ্ধ থাকাকালে পরম নিশ্চিন্ত মনে বৈদিক গবেষণা ও গীতা রহস্যের আলোচনা করিতে পারিয়াছেন তাঁহার পক্ষে চিরোলের মোকদ্দমার পরাজয় গুরুতর বিষয় হইতে পারে না। তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া দেশের কার্য্যে মন প্রাণ ঢালিয়া দিলেন। তিলক সহকর্মিগণের সাহায্যে ইংলণ্ড, স্কটলাণ্ড ও আয়র্লণ্ডের নানা স্থানে বিরাট সভার আয়োজন করিয়া ভারতের প্রকৃত অবস্থা, ভারতের আকাঙ্ক্ষা ও অভিযোগের বিষয় বিলাতের জনসাধারণকে বুঝাইতে লাগিলেন।

তিলকের চেষ্টা যত্ন ও কার্য্যকুশলতায় বিলাতের শ্রমজীবীদল ভারতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে বিশেষ সহানুভূতি দেখাইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের দলভুক্ত পার্লামেণ্টের মহাসভার সভ্যগণ শাসন সংস্কার আইন যাহাতে বিশেষ উদার আকার ধারণ করে এইরূপ চেষ্টা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ঐ দলের সংবাদপত্রাদিতে ভারত সম্বন্ধীয় নানাবিধ উদার মতের প্রবন্ধ বাহির হইতে লাগিল। এইরূপে বিলাতে ভারতীয় আন্দোলন সম্বন্ধে এক নবযুগের অবতারণা হইল।

বিলাতে ভারতীয় কংগ্রেসের একটি স্থায়ী কমিটি আছে, ইহার নাম ব্রিটিশ কংগ্রেস কমিটি। এই কমিটি হইতে "ইণ্ডিয়া" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। কমিটি ও পত্রিকার যাবতীয় ব্যয় কংগ্রেসের তহবিল হইতে দেওয়া হয়। কংগ্রেসের বিধান অনুযায়ী এই কমিটি কংগ্রেসের অধীনে কংগ্রেসের মতানুযায়ী চলিতে বাধ্য। কিন্তু কংগ্রেসে দলাদলি আরম্ভ হওয়ার পর হইতে এই কমিটির কার্য্য বিশেষ শিথিল হইয়া উঠে। এবং কংগ্রেসে জাতীয় দলের প্রাধান্য হইবার পর হইতে এই কমিটি কংগ্রেসের মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। তিলক বিলাতে যাইয়া এই কমিটির সংস্কার সাধন করিয়া যাহাতে ইহার কার্য্য কংগ্রেসের মতানুযায়ী পরিচালিত হয় তদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন। কিছুকালের মধ্যেই তিলক সহযোগিগণের সাহায্যে এ বিষয়ে সফলতা হয়েন। এবং তদবধি বিলাতে ভারতীয় আন্দোলনকার্য্যে এই কমিটি ও "ইণ্ডিয়া" পত্রিকা বিশেষরূপে সাহায্য করিতেছেন।

আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মিলনী

১৯১৮ সনের নভেম্বর মাসে ইউরোপীয় মহা সমরের অবসান হয়। মার্কিন রাজ্যের রাষ্ট্রপতি উইলসন মহোদয়ের চেষ্টায় একটি আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মিলনী আহ্বান করিয়া

তাঁহার মতানুযায়ী সন্ধিপত্রের সর্ত স্থির করিবার প্রস্তাব হয়।

এই সম্মিলনীতে বিভিন্ন জাতি সমূহের প্রতিনিধিগণ আহূত হইবেন এইরূপ ব্যবস্থা হয়। ভারতবর্ষকে এই সম্মিলনীর সভ্যপদের মর্য্যাদা দেওয়া হয় এবং ভারতবর্ষের প্রতিনিধি ইহার অধিবেশনে যোগদান করিবেন এইরূপ ব্যবস্থা করা হয়। এই উপলক্ষে ১৯১৮ সনের দিল্লী কংগ্রেসে এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব পরিগৃহীত হয় যে, ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শাসনের অধীন থাকায় ও ভারতবর্ষের শাসনকার্য্যে ভারতবাসিগণের কর্ত্তৃত্ব না থাকায় ভারত-সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত ব্যক্তি শান্তি সম্মিলনীতে প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিস্বরূপে গণ্য হইতে পারেন না অতএব ভারতের জাতীয় মহা সম্মিলনী কংগ্রেস মহামতি তিলক মহোদয়কে শান্তি সম্মিলনীতে ভারতের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিলেন, তিনি উক্ত সম্মিলনীতে যোগদান পূর্ব্বক ভারতবর্ষের কল্যাণকর প্রস্তাব সকল ঐ সভায় উপস্থিত করিবেন। একথা বলা বাহুল্য যে, ভারত-সচিব এ প্রস্তাব সমর্থন করিলেন না; কিন্তু তিলক তাহাতেও নিরস্ত না হইয়া সম্মিলনীর সভাপতি উইলসন মহোদয়ের নিকট সভায় ভারতের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া আবেদন করেন এবং ভারতের পক্ষ হইতে যে সকল প্রস্তাব তিনি উপস্থিত করিতে চাহেন তাহারও উল্লেখ করেন। তাঁহার এ আবেদন অগ্রাহ্য হয়, কাজেই শান্তি সম্মিলনীর কার্য্যে তিনি যোগদান করিতে পারেন নাই।

স্বদেশে প্রত্যাগমন

১৯১৯ সনের শেষভাগে তিলক দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বিপুল সমারোহের সহিত মহারাষ্ট্রবাসিগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। তৎপর ডিসেম্বর মাসে অমৃতসহরের কংগ্রেসে তিলক যোগদান করেন। বঙ্গদেশ হইতে যাঁহারা অমৃতসহর কংগ্রেসে গিয়াছিলেন তাঁহারা দেখিয়াছেন, তিলক সুদূর পাঞ্জাবের জন সাধারণেরও কিরূপ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র ছিলেন। সুদূর পল্লীবাস হইতেও দলে দলে স্ত্রীপুরুষ আসিয়া প্রত্যহই তিলক মহারাজের দর্শন আকাঙ্ক্ষায় ডেলিগেট ক্যাম্প ও কংগ্রেস মণ্ডপের নিকট জড় হইত ও তাঁহাকে দেখিবামাত্র "তিলক মহারাজের জয়" ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিত। তিলকই প্রকৃত মহারাজ ছিলেন। লক্ষ লক্ষ নরনারীর হৃদয়ে যাঁহার ভক্তি-সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে মহারাজপদবাচ্য।

শেষ কথা

অমৃতসহর কংগ্রেস হইতে ফিরিবার পর সাধারণের কোনও বড় কাজে যোগ দিবার অবসর আর তিলকের হয় নাই। বিলাতে নানা পরিশ্রমসাধ্য কার্য্যে ও অনিয়মে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিবার পর তাঁহার স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি আর হয় নাই। কয়েক মাস যাবত তিনি ম্যালেরিয়ায় ভুগিতে ছিলেন। স্থান পরিবর্ত্তনে স্বাস্থ্যের উন্নতি আশায় জুলাই মাসের মধ্যভাগে তিনি বোম্বাই আসেন। ৩০শে তারিখে, তিনি একটু সুস্থ বোধ করিয়া বায়ু সেবনার্থ মোটরে চড়িয়া বাহির হইয়াছিলেন। তাহার পরদিনই বিশেষ অসুস্থ বোধ করেন। প্রসিদ্ধ ডাক্তারগণ তাঁহার রোগ পরীক্ষা করিয়া নিউমোনিয়া হইয়াছে স্থির করেন। ২৬শে জুলাই সোমবার পীড়ার অবস্থা খুব খারাপ হইয়া পড়ে এবং ডাক্তারেরা তাঁহার রোগমুক্তির আশা পরিত্যাগ করেন। কিন্তু ঐরূপে চারিদিন কাটিয়া শুক্রবারে অবস্থা অনেকটা ভাল দেখা যায়। শনিবার প্রাতে অবস্থা আরও ভাল হয়। ঐ দিন অপরাহ্নেই আবার অবস্থা খারাপ হইয়া পড়ে; রাত্রি নয়টার সময় বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, আর কোনও আশা নাই। ধীরে ধীরে তাঁহার জীবন-প্রদীপ স্তিমিত হইয়া আসিতে লাগিল। রাত্রি ১২টা ৪০ মিনিটের সময় সব শেষ হইল। প্রাণবায়ু বহির্গত হইবার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে তিনি শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতার নিম্নলিখিত শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার শ্রীমুখের শেষ বাণী :—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানায় ধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মজুমদার এম-এ, বি-এল।

সুখ

তুমি বল আছে সুখ ধনের গৌরবে,
আমি বলি নাই ;
তুমি ভাব আছে সুখ যশের সৌরভে,
আমি ভাবি 'ছাই'।

ধন মান যাহা কিছু ইহ-জগতের
অসুখের সবি,
ভোগের লালসা-দগ্ধ অতৃপ্ত জীবন
বিষাদেরি ছবি।

আছে বটে—আছে সুখ নর-জীবনের,
সংসারেই আছে।
তাই বলে নাই তাহা মরভু-জীবন—
সংসারীর কাছে।

সুখ যদি চাও তুমি, শোন বলি তবে
সুখের সন্ধান ;—
খুলে দাও—খুলে দাও হৃদয়-দুয়ার
মুক্ত করি প্রাণ।

সকল বন্ধন খুলি বাঁধ আপনারে
প্রীতির বন্ধনে ;
ভুলি আত্মপর সবে বুকে তুলে লও
প্রেমের চুম্বনে।

মুক্ত পাখীটির মত গান গেয়ে চল
অসীমের পানে ;
ক্ষুদ্র তটিনীর মত বয়ে যাও ধীরে
মৃদু কুলু তানে।

স্ফুট কুসুমের প্রায় প্রাণের সৌরভ
কর বিতরণ ;
মত্ত ভ্রমরের প্রায় শোনাও প্রেমের
পুলক-গুঞ্জন।

রবিবার বারিরূপে ঝরিয়া ঝরিয়া
সিক্তকর ভূমি ;
ঢেউ হয়ে নাচ তুমি পাষাণে ঘেরিয়া
শিলা-তট-চুমি।

নীলিমার বুকে বুকে চাঁদ হয়ে হেসে,
তারা হয়ে ফুটি,
প্রভা হয়ে ধারাকারে ধরণীর বুকে
পড় লুটি লুটি।

সুখ যদি চাও প্রিয়, লও বুক পেতে
অসীমের ঢেউ,
সুখ যদি পাও প্রিয় পাবে এই পথে,
বারিবে না কেউ।

শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ

দুলীর বিয়ে

শচীন্দ্রনাথ লেখাপড়ার দিকে অত্যধিক আগ্রহ দেখাইতে লাগিল, তখন তাহার বিধবা মায়ের মনে একটা আশঙ্কার সঞ্চার হইয়াছিল। কুলপুরোহিত শিরোমণি মহাশয় শচীনের মাতাকে কহিলেন "দেখ বউমা, কলিকাতার সহর, ওখানে যত লাট বেলাটের কাণ্ড। তুমি খোকাকে একটা তার ক'রে বাড়ী আনাও। সে দিন আমাদের রোহিত খবরের কাগজে পড়ছিল যে, কোম্পানী বাহাদুর যত কলেজের ছোক্‌রাকে ধ'রে ধ'রে জেলে পুরে দিচ্ছে।"

শচীন্দ্রনাথের মাতা বিধুমুখী একটি চাপা নিশ্বাস টানিয়া উত্তর করিলেন, "কি করব পুরুৎ ঠাকুর, খোকা চিরদিনের মাথাপাগলা ছেলে, ও কি কারুর দোহাই মন্তু মানে?"

শিরোমণি মহাশয় একটু নস্য টানিয়া কহিলেন, "তাই ত

আমিও ভয় করছি বউমা। ইংরেজী পড়েই আজকালকার ছেলেগুলি সব বিগড়ে যাচ্ছে। শুনছি ওরা নাকি হোটেলে যার তার হাতের রান্না খায়! নিষিদ্ধ পক্ষীর মাংস, রাধামাধব, ফরমাইস্ ক'রে রাঁধিয়ে খায়। শচীন অবিশ্যি তেমন ছেলে নয়। তথাপি শাস্ত্রে আছে কিনা 'স্নেহ পাপশঙ্কী'—" বিধুমুখী মস্তক অবনত করিয়া উত্তর করিলেন, "আশীর্ব্বাদ করুন ওর পরীক্ষা হ'য়ে যাক্। তারপর একটি পাত্রী দেখে দিন। শচীনের বউ দেখে যেতে পারলে জীবনের সকল সাধ পূর্ণ হয়।"

"রাধামাধব তোমার আশা পূর্ণ করবে বউমা। তোমার মত সতী লক্ষ্মী ভূ-ভারতে জন্মে না। তুমি স্বর্গীয় কালীনাথ ভায়ার সহধর্ম্মিণী—তাঁর দেব-দ্বিজে ভক্তি, ব্রাহ্মণে অকাতরে দান ধ্যান যদি বৃথা যায় তা হ'লে ত শাস্ত্রই মিথ্যা।"

বর্ষণক্লান্ত মেঘের মত বিধুমুখীর স্থির চক্ষুদুটি জলে ভরিয়া উঠিল। একটি দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বক্ষে করিয়া এই ষোল বৎসর পর্য্যন্ত তিনি কত কষ্টে স্মৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই স্বামীর শোক ভুলিতে পারেন নাই। যাহা তিক্ত ছিল তাহা কালক্রমে মধুর হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু হৃৎপিণ্ডের মত তাহাকে মুহূর্ত্তের জন্যও সঙ্গীহীন করিতে পারেন নাই।

নৈয়ায়িক ব্রাহ্মণের চক্ষে এই পবিত্র বেদনার ছবিখানি কেবল করুণার মূর্ত্তি বলিয়াই বোধ হইত; সুতরাং তিনি জানিতে পারিলেন না যে, স্বামীর কথা উল্লেখ করিয়া বিধুমুখীর হৃদয়ে কি ভাবান্তর উপস্থিত করিয়াছেন।

শিরোমণি মহাশয় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "খোকা ত এখন আইন্ দেখ্‌ছে?"

"হাঁ এই আসছে মাসে পরীক্ষা।"

রাত্তির জেগে জেগে ওর অত পরীক্ষা দেবারই বা বাতিক কেন, বউমা! রাধামাধবের ইচ্ছায় ওকে ওকালতী করতেও হবে না, আর হাকিম হ'তেও হবে না।"

"সে কথা আমিও ব'লেছিলেম যে, এদিকে যাহোক্ বাড়স্থ। বিদেশে বিভুয়ে প'ড়ে এত পরীক্ষা দেব'র কি দরকার? কিন্তু জানেন ত পুরুৎ ঠাকুর, খোকা কি আমার তেমন ছেলে।"

"আচ্ছা পরীক্ষাটা হ'য়ে যাক্। এই আসছে বৈশাখে মিত্তিরদের মেয়েটি দেখে আসতে হবে। এ ঘরে মেয়ে কে না দেবে? তথাপি দেখ্‌বার দরকার; শাস্ত্রে আছে কিনা—"

এই শাস্ত্রের উক্তি আবৃত্তি করিবার পূর্ব্বে যখন শিরোমণি মহাশয় নস্যের কৌটা খুলিতেছিলেন সেই অবসরে বিধুমুখী কহিলেন, "খোকার ইচ্ছা যে, সে কল্‌কাতাতে বে ক'রে। একটি মেয়ে দেখেও নাকি খুব পছন্দ ক'রেছে। আপনি যদি দেওয়ানজি মশাইকে নিয়ে একবার যেতেন।" শিরোমণি মহাশয় একটু চমকিত হইয়া কহিলেন, "কি বল্লে, কল্‌কাতা বে ক'রবে? একটা মেম্‌কে এই ভদ্রাসনে বউ সাজিয়ে আনতে চাও? রাধামাধব!"

"কি করব পুরুৎ ঠাকুর, আমি ওর কালামুখ দেখতে পারি না, জানেন ত ওকে বুকে ক'রেই ত—"

"তোমরাও বউমা সেই ইচ্ছা? তোমাদের ঘরে পালি-পার্ব্বণ, ক্রিয়াকর্ম্ম আছে। বছরের ভিতরে ৪।৫ বার ব্রাহ্মণ-পদধূলি এ বাড়ীতে পড়ে আসছে। এগুলি কি তুমি লোপ ক'রে দিতে চাও?"

"আশীর্ব্বাদ করুন, শচীন বেঁচে থাকুক আর যেন চিরদিন তার উপরে আপনার অনুগ্রহ থাকে। আপনি দেওয়ানজিকে নিয়ে একবার মেয়েটি দেখে আসুন।"

শিরোমণিমহাশয়ের প্রস্তাবটা কিছুতেই মনঃপুত হইতেছিল না, বিধুমুখী অসন্তুষ্ট হয়েন এই ভয়ে কহিলেন, "আচ্ছা মেয়ে দেখতে দোষ কি? এই উপলক্ষে গঙ্গাস্নানটাও হ'য়ে যাবে। কিন্তু বউমা, আমি ত আর খিষ্টান মিষ্টানের হোটেলে গিয়ে উঠ্‌তে পারব না; আর রামতনু দেওয়ানজিও তা পারবে না। কালীঘাটে আমার শিষ্যবাড়ী আছে সেই খানেই গিয়া না হয় ওঠা যাবে। আজ হ'ল অশ্লেষা, কা'ল হ'ল চন্দ্রগ্রহণ। গ্রহণের সাতদিন ত আর পা বাড়াবার জো নাই। এর পরে পঞ্জিকা দেখে একবার বেড়িয়ে আসা যাবে। বউ মা, তুমি দেওয়ানজিকে ব'লে সব বন্দোবস্ত ঠিক্ ক'রে রাখবে। বেলাও হ'য়ে উঠ্‌ল, আমি তবে এখন আসি,—রাধামাধব।"

বিধুমুখী দুইটি টাকা শিরোমণি মহাশয়ের পদপ্রান্তে রাখিয়া তাঁহার পদধূলী লইলেন। কুলপুরোহিত তাঁহার মামুলী আশীর্ব্বচনগুলি আবৃত্তি করিয়া কহিলেন "বউমা, কল্‌কাতার মেয়েই যে মেম্ হ'য়ে যাবে তার ত কোন কথা নেই। শাস্ত্রে আছে 'স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি'—তা . মন্দ'

রি ;. শচীনের যখন অভিপ্রায় হ'য়েছে, এত অন্তায্য কিছু নয়। এখন তবে আসা যাক্—ভাল কথা, শ্রীবিষ্ণু, ভুলে যাচ্ছিলুম, এ মাসের শান্তি স্বস্ত্যয়নটা তা হ'লে ঘুরে এসেই না হয় হবে, কি বল, বউমা ?" বিধুমুখী উত্তর করিলেন—"আচ্ছা তাই করবেন।"

২

বাইশ বৎসর বয়সে বিধুমুখী স্বামীহারা হইয়াছিলেন, শচীন তখন কোলে; তারপর বুকে স্বামীর স্মৃতি, মাথায় জমিদারীর চিন্তা এই তিনটি সঙ্গী লইয়া একটি বিধবা সংসার করিয়া আসিতেছেন।

প্রজারা পরস্পর আলোচনা করিতেন, "আমাদের মা ঠাকরুণ সাক্ষাৎ ভগবতী আর ছোট হিস্তার জান-মারা চৌধুরাণী যেন উগ্রচণ্ডা।"

অত্যাচারী বলিয়া জাহ্নবী চৌধুরাণীর ঐ নামকরণ হইয়াছিল। শচীন্দ্রনাথের বাড়ী বাঙ্গালা দেশের একটি পল্লীগ্রামে, সেখানে বোধ করি, যাতায়াতের অসুবিধা এবং তরুলতার নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়া সভ্যতার পূর্ণ আলোক প্রবেশ করিতে পারে নাই। বাঙ্গালাদেশ বলিলে সুশিক্ষিত পাঠকের মনে একখানি অখণ্ড মানচিত্রের উদয় হয় না। কারণ পূর্ব্ব বাঙ্গালাকেও ঐ বিশেষ নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে ভূগোলবিৎ পণ্ডিতদিগের আপত্তি থাকিতে পারে, কিন্তু সাহিত্যিকের সে জন্য কোনও জবাবদিহি করিতে হয় না।

বিশেষ সতর্কতার সহিত পাঞ্জিকা দেখিয়া, রাশি নক্ষত্র সমস্ত মিল করিয়া দেওয়ানজি ও শিরোমণি মহাশয় কন্যা দেখিতে আসিলেন। বৃদ্ধ দেওয়ান্ রামতনু সরকারি বিষয়কর্ম্মে বিচক্ষণ লোক; কিন্তু কখনও কলিকাতায় আসেন নাই। কারণ ও হিস্তায় মাম্‌লা মোকদ্দমা ত খুবই কম, যাহা হয় তাহাও প্রায় ৭ ধারা; জেলা কোর্টেই বিচার হইয়া থাকে। জাহ্নবী চৌধুরাণীর প্রজারা রামতনু দেওয়ানজিকে সে জন্য ঠাট্টা করিয়া বলিত, "দেয়ানজি খুব হুঁসিয়ার লোক, কিন্তু বিবি বাজের ডাকে মূর্চ্ছা যান।"

উভয়েই কালীঘাটে শিরোমণি মহাশয়ের শিষ্য বাড়ী নামিয়া উঠিলেন। পরের দিন এক দুর্ঘটনা ঘটিল; দেওয়ানজি ভুলক্রমে তাঁহার অহিফেনের কৌটাটি ফেলিয়া আসিয়াছেন। শিরোমণি মহাশয় কহিলেন, "দেখ, ও রামতনু ভায়া, আমি ত আগেই ব'লেছিলেম যে ইষ্টিমারটা ছাড়ে বেস্পতির শেষ, দু'কোশ হেঁটে না হয় বাকলগাছি এষ্টেশনে গিয়া ওঠা যাবে। তুমি ত তা শুনলেনা ভায়া।"

যা হউক, শিষ্যের উড়িয়া চাকরকে ডাকিয়া শিরোমণি মহাশয় কহিলেন 'বাপু হে, আবকারী দোকান কোথায় আছে জান ?"

উড়িয়া ভৃত্য উত্তর করিল যে, বড় বাজার ব্যতীত সে অসময়ে আর কোথাও আঁব পাওয়া যাইবে না।

শিরোমণি মহাশয় দেখিলেন চাকর ঠিক বুঝিতে পারিলনা; তখন পুনরায় কহিলেন "আরে আম নয়, আফিং—অহিফেণ—যা খেলে একটু একটু—"

এই কথা বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটু তন্দ্রার অভিনয় করিলেন। চাকর চুপ করিয়া থাকিয়া উত্তর করিল "মুই বুঝিতে মারিল।"

শিরোমণি মহাশয় চটিয়া উঠিলেন "যা বেটা মৃৎপিণ্ড বুদ্ধি কোথাকার। এদ্দিন রাজধানীতে চাকরি কচ্ছিস্ আর আফিং কাকে বলে জানিস্ না। সাধে কি বলে উড়ে মেড়া।"

অতঃপর তাঁহার শিষ্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দ্বারা আফিং আনাইয়া লইলেন।

শিরোমণি মহাশয় সন্ধ্যাদির অনুষ্ঠান, শিষ্যদিগকে প্রসাদ ও পদধূলি দান প্রভৃতি নিয়া বেশ একরকম সময় কাটাইতে ছিলেন, কিন্তু দেওয়ানজি মহাশয়ের কলকাতার সহরটা বড়ই বেখাপ্পা লাগিতে লাগিল। কলের মাপা জলে স্নান, ঘড়ি দেখিয়া দেখিয়া কাজ করা, পায় পায় গাড়ী ঘোড়ার ভয়, চতুর্দ্দিকে ফেরিওয়ালার চীৎকার ও কর্ম্মযন্ত্রের ঘর্ঘর ধ্বনীর মধ্যে বৃদ্ধ রামতনু বড়ই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন।

শচীন্দ্রনাথ খবর পাইয়া কালীঘাটে উভয়ের সঙ্গেই দেখা করিয়া গেল, কিন্তু কলিকাতার পাত্রী দেখিবার আদব কায়দা কিছু কিছু বলিবার ইচ্ছা করিয়াও বলিতে পারিল না। কারণ এই ত্রুটি বৃদ্ধ লোককে সে অভিভাবকের মত মনে করিত।

যথা সম্ভব বৃহস্পতির বারবেলা, শনির শেষ বাদ দিয়া, দক্ষিণদিকে যোগিনী রাখিয়া শিরোমণি মহাশয় বকুল বাগান যাইবার দিন স্থির করিলেন। রামতনু দেওয়ানজি সকালেই প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া যাইবার জন্য

প্রস্তুত হইয়াছেন। শিরোমণি মহাশয় কহিলেন "রামতনু ভায়া, আহ্নিক না ক'রে ত যাওয়া উচিত নয়; এ হ'ল সম্বন্ধ দেখার কাজ, কিছু মিষ্টি মুখ না করিয়ে কি তারা অম্নি ছেড়ে দেবে?"

এই বলিয়া তাড়াতাড়ি মতান্তরে পূজা আহ্নিক সারিয়া শিরোমণি মহাশয় তাঁহার রেশমী নামাবলি স্কন্ধে ফেলিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

ভবানীপুর চৌদ্দ নম্বর বকুল বাগানে কন্যার পিতা বাস করিতেন; তাঁহার নাম সরোজনাথ ঘোষ। বেশ ফিট্‌ফাট্ একখানা তেতালা বাড়ী; বৈঠকখানাটি নানাবিধ দেশী বিলাতী ছবি ও চেয়ার টেবিলে সুসজ্জিত।

সরোজ বাবু রেলিভ্রাতার আফিসে চাকরি করিতেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় রামদয়াল ঘোষ ঐ আফিসের মুচ্ছুদ্দি ছিলেন; এবং তিনিই বাড়ী, বাগান, কোম্পানীর কাগজ, ছেলের চাকরি স্বহস্তে করিয়া দিয়া গিয়াছেন। সরোজ বাবু চাঁদি রূপার মত পিতার সকল চাকচিক্য বজায় রাখিয়াছেন বটে, কিন্তু তদনুরূপ মূল্যে বাজারে তাঁহার কাট্‌তি হয় নাই। আজকালকার সাহেব সুবো বাঙ্গলা দেশের হাওয়া খাইয়া চিত্রগ্রীবের মত এমনই সাবধান হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহারা লম্বা লম্বা সেলাম অথবা খোসামুদির পাশবদ্ধ হইতে চাহে না। সুতরাং সরোজবাবুর কোম্পানীর কাগজের বাণ্ডিল দিন দিন ম্যালেরিয়ার রোগীর মত ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতে লাগিল। যাহা আছে দুলালীর বিবাহ বোধ হয় তাহাতে সঙ্কুলন হইবে না।

সকালবেলা হইতে একটু মেঘ মেঘ করিতেছিল। বেলা নয়টার সময় বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। শিরোমণি ও দেওয়ানজি পদব্রজে আসিতেছিলেন এ কথা বলাই বাহুল্য। তাঁহাদের জীর্ণ ছাতায় বৃষ্টি মানাইতে পারিল না, পথে সুরকির কাদায় উভয়ের ছিন্ন বিনামা গৌরবর্ণ ধারণ করিল বেলা আন্দাজ সাড়ে নয়টার সময় দুইটি প্রাণী ভিজিতে ভিজিতে সিক্ত মার্জ্জারের মত সরোজবাবুর বৈঠক-খানায় আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের কাপড় ও ছাতার জলে ঘরের মেজে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কোনও-রূপে কাপড় নিংড়াইয়া শিরোমণি মহাশয় যাত্রার দিনটার অখ্যাতি করিতে লাগিলেন এবং শাস্ত্র বচনের সহিত মিল করিয়া কহিলেন: "শাস্ত্রকার কি সাধে ব'লেছে, স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী।" দেওয়ানজি মহাশয়ের সেদিকে নজর ছিল না, তিনি একমনে বৈঠকখানার ছবিগুলি দেখিতেছিলেন। উভয়ই অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন, কিন্তু অতিথিসৎকারের কোনও গতিক দেখিতে পাইলেম না। শিরোমণি মহাশয় যথাসাধ্য কাশিতে লাগিলেন, যদি সেই শব্দে কেহ বাহিরে আসে তাহা হইলে সংবাদ দিবেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, কলিং বেল ও কড়ানাড়া আবিষ্কৃত হইবার পর কাশির প্রচলন এক রকম উঠিয়া গিয়াছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের তাহা জানা ছিল না। কাঁহাতক এইরূপ বসিয়া থাকা সম্ভব? পল্লীগ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঘড়ি না চিনিতে পারেন, আর মেঘাচ্ছন্ন দিনে সূর্য্যও না দেখিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা ক্ষুধার পরিমাণে বেলা আন্দাজ করিয়া লইতে জানে। শিরোমণি মহাশয় অধৈর্য্য হইয়া অবশেষে ডাকিলেন, "এ বাড়ীর কর্ত্তা কি বাড়ীতে আছেন?"

ডাক শুনিয়া সরোজবাবু বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, দুইটি লোক তীর্থের কাকের মত বসিয়া রহিয়াছে। বাঙ্গাল-দেশ হইতে ক'নে দেখিতে আসিবার কথা তাঁহার জানা ছিল সত্য, কিন্তু এই দুইটি ভদ্র লোকই যে সেই দর্শক এ কথা তাহার দুঃস্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

সরোজবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কাকে চাচ্ছেন?" শিরোমণি মহাশয় উত্তর করিলেন "আমরা হরিপুর থেকে পাত্রী দেখ্‌তে এসেছি। জমিদার স্বর্গীয় কালিনাথ রায়ের একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ শচীন্দ্রনাথের একটি বিবাহের সম্বন্ধ উপস্থিত আছে। তা দেখুন মশাই, কি যাত্রার ফের! শাস্ত্রে আছে শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি। আপনারই বোধ হয় এই বাড়ী তা না হবে কেন! মহাশয়ের নাম?"

সরোজবাবু এতক্ষণ পরে বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু এই কালীঘাটের পাণ্ডা যে দুলালীকে দেখিতে আসিবে এ কথা কল্পনা করাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। যাহা হউক, কন্যার পিতার একটু সহ্য করিয়া লইতেই হয়; তিনি উত্তর করিলেন "আমার নাম সরোজনাথ ঘোষ। তা দেখ্‌ছি আপনাদের খুব কষ্ট হ'য়েছে। ওরে ভজা দু কাপ্ চা, আর আমার সিগারেটের কেস্‌টা নিয়ে আয় ত।"

শিরোমণি মহাশয় কহিলেন "আজ্ঞে, আমরা মফঃস্বলের লোক, চা চুরুট কিছুই খাই না।"

"আচ্ছা, তা বেশ। আরে, একটা থেলো হুঁকায় তামাক নিয়ে আয় ত। আপনাদের ঢের কষ্ট হ'য়েছে আসতে।"

"দেখুন কষ্ট আর কি? কালীনাথ রায় ছিলেন একজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। শচী তার একমাত্র ছেলে। দেখতে কার্ত্তিকের মত চেহারা। এই বয়সে এম, এ পাস দিয়ে দেখ্ছে। আমি হচ্ছি সে বংশের কুলপুরোহিত; নাম গুরুপ্রসন্ন দেবশর্ম্মা, উপাধি শিরোমণি। নবদ্বীপের হলধর তর্কসিদ্ধান্তের চতুষ্পাঠীতে একাদিক্রমে দ্বাদশ বৎসর ন্যায়-শাস্ত্রের অধ্যয়ন ক'রেছি। আর ইনি মহা বিচক্ষণ লোক। কালীনাথ রায়ের দেওয়ানগোষ্ঠি। প্রকাণ্ড জমিদারীটা এঁর হাতেই ঘুরছে।"

"বেশ বেশ, আপনারা এসেছেন বেশ সুখী হ'লুম। বড় অসময়ে এসেছেন। আফিসের সময় হ'য়ে এল প্রায়।"

"আপনি কোন্ আফিসে চাক্‌রি কচ্ছেন?

"রেলিব্রাদার?"

"কত মাইনে?"

"মাইনে আর কি। কোন রকমে চ'লে যাচ্ছে। এই শ আড়াইয়েক টাকা। দেখুন এই মাগ্‌গির দিন। তার উপরে মেয়েকে এজুকেসন্ দিতে হ'চ্ছে।"

"আড়াইশ টাকা! উপরি সুপরি কিছু পড়ে?"

"না, তেমন কিছু নয়, তবে কি না, এই ধরুন—"

"বেশ চাক্‌রি। আপনারা সহরের লোক। আপনার পিতার নাম শুনেছি—তিনি অতিশয় সদাশয় লোক ছিলেন। আপনি কার পৌত্র?"

"আমার পিতামহের নাম ছিল নকুলচন্দ্র ঘোষ।"

"আপনার প্রপিতামহের নাম ছিল কি? তাঁরা কোন গোত্র? কত পর্য্যায় বলুন দেখি? আর আজকাল ত এ সব উঠেই গেছে—"

"দেখুন এ সব কথার উত্তর ত মেয়েদের কাছে না জিজ্ঞাসা ক'রে আমার বল্‌বার জো নেই।"

"ঘোষজা, বল্লে অসন্তুষ্ট হবেন, আজকালকার ছেলেরা উইলসনের চৌদ্দ পুরুষের নাম মুখস্থ বলতে পারে, কিন্তু নিজের প্রপিতামহের নাম জানে না, রাধামাধব!"

সরোজবাবু মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। দেওয়ানজী মহাশয় দরজার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছেন, কিন্তু ভজা তামাক লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল না। শিরোমণি মহাশয় নস্য টানিয়া পুনঃ পুনঃ হাঁচিতে লাগিলেন। তাঁহার সম্মুখস্থ শ্বেত পাথরের টেবিলখানি তাম্রকূটবেদ্‌শিমিশ্রিত অজস্র শ্লেষ্মকণায় রঞ্জিত হইয়া গেল। শিরোমণি মহাশয় কহিলেন "দেখুন ঘোষজা, আপনি কল্‌কাতার লোক, কিন্তু এখানে প্রজাপতির ইচ্ছায় কাজ হ'লে দেখ্‌বেন, এমন কুটুম্ব হয় না।"

"হালফ্যাসনে মেয়েদের স্কুলে পড়াবার এক বাতিক উঠেছে, কিন্তু আমাদের গিন্নি লেখাপড়ি জানেন না; অথচ প্রকাণ্ড একটা জমিদারী তাঁর মাথার মধ্যে। এমন সতী সাধ্বীর কোলে আপনার মেয়ে পরম সুখে থাক্‌বে, সেকথা ব'লে যাচ্ছি। তবে এখন পাত্রীটি একটু দেখবার দরকার, বেলাও হ'য়ে গেল।"

সরোজ বাবু কহিলেন, "এ অসময়ে আপনারা কি রকম ক'রে দেখ্‌তে চান? একবার দয়া ক'রে ওবেলা আস্‌বেন।"

"ওবেলা কি ক'রে আস্‌ব ঘোষজা মশাই, দেওয়ানজি কখনো কল্‌কাতা আসেন নি। তাঁকে বিকেল বেলা যাদুঘরটা দেখাতে হবে। তারপর কাল সকাল বেলা বড় গঙ্গায় স্নান ক'রে বিকেলের গাড়ীতেই দেশের দিকে রওনা হ'তে চাই। এমাসে আবার শান্তি স্বস্ত্যয়ন আছে কি না। তা পাত্রী দেখা, মনে করুন, আমাদের ছেলেবেলায় ত এসব ছিলই না, এখন হাল ফ্যাসানে, ইংরেজী-কায়দায় এই প্রথাগুলির সৃষ্টি হ'য়েছে।"

সরোজ বাবু একটা খবরের কাগজের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া যেন কি ভাবে এই আহাম্মকের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় সেই কথাই ভাবিতেছিলেন। এমন সময় গড় গড় করিয়া একখানা গাড়ী গাড়ী-বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। কোচম্যান উপর হইতে নামিয়া গাড়ীর কবাট খুলিয়া দিল এবং চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া একটি বালিকা খানকয়েক বই হাতে করিয়া একটু মুচ্‌কি হাসিয়া অন্দরের দিকে চলিয়া গেল। তাহার বিকাশোন্মুখ সৌন্দর্য্যের দিকে নৈয়ায়িক ব্রাহ্মণেরও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। সরোজ বাবু ঘড়ির দিকে চাহিয়া কহিলেন, "না এগারটা বেজে গেল। খুকীও ইস্কুল থেকে এল, মর্নিং ইস্কুল কিনা। এইটিই আমার মেয়ে। পড়া শুনায় চমৎকার। ফি-বছর প্রাইজ পাচ্ছে।"

দেওয়ানজী মহাশয় শিরোমণিকে একটি টিপ্ দিয়া মনের কথা ব্যক্ত করিলেন।

শিরোমণি মহাশয় বিস্তর শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছিলেন, কিন্তু স্ত্রী-জাতির যে জুতা পরিবার অধিকার আছে কোথাও তাহার উল্লেখ দেখিতে পান নাই। কলির শেষে এই ঘোরতর ব্যভিচার দর্শন করিয়া তিনি রাধামাধবের নাম স্মরণ করিলেন। কন্যা দেখিবার অতিথি দুইঘণ্টা বৈঠকখানায় বসিয়াছেন, অথচ এক ছিলিম তামাকের বন্দোবস্ত হইল না; আর শিরোমণি মহাশয় যে আশ্বাসে সংক্ষেপে আহ্নিকাদি সারিয়া আসিয়াছিলেন সে আশা ত সুদূর-পরাহত! -পল্লীগ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট এ সকল ব্যবহার ঘোরতর অশিষ্ট বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। শিরোমণি মহাশয় আর একটু নস্য টানিয়া পুনরায় কহিলেন, "ঘোষজা মহাশয়, তবে আর বিলম্ব করবেন না। বেলা হ'য়ে গেল —" সরোজ বাবু দেখিলেন যে, ক'নে দেখার কথা পাড়াতে রাষ্ট্র হইবার পূর্ব্বে এ দুইটি জানোয়ারকে বিদায় করা ভাল। তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একবার শিরোমণির দিকে চাহিলেন, তারপর ঝিকে ডাকিয়া কহিলেন, "মঙ্গলা, খুকীকে একবার এখানে আস্তে বল্ ত।"

(৩)

দুলালী ইস্কুল হইতে আসিতে না আসিতে তাহার ছোট ভগ্নী লিলি হাতে তালি দিয়া গাহিয়া উঠিল, "বাঙ্গলা হ'তে আসবে টিয়ে, সোণার মুকুট মাথায় দিয়ে"; দুলালীর সমপাঠী বীণা বাঙ্গাল দেশে দুলালীর বিবাহের কথা শুনিয়া উপরোক্ত কবিতা রচনা করিয়াছিল। দুলালী বুঝিতে পারিল যে এতদিন ধরিয়া যে আলোচনা শুনিয়াছিল তাহা সত্য সত্যই কার্য্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে। বৈঠকখানায় যে বামুন-ঠাকুর আর বাজার সরকারের মত দুইটি লোক বসিয়া আছে তাহারাই বাঙ্গাল দেশ হইতে তাহাকে দেখিবার জন্য আসিয়াছে। এ হতভাগা দুইটার মরণ হইল কেন? এই জন্যই কি দুলালীর পিতা তাহাকে ইংরাজী স্কুলে পড়িতে দিয়াছেন? সে স্থির করিয়া ফেলিল যে, একথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে গলায় দড়ি অথবা কেরোসিন তেল—

পড়ার ঘরে টেবিলের উপর বইগুলি ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া ফেলিয়া দিয়া দুলালী শুইয়া পড়িল। মঙ্গলা আসিয়া কবাটে ধাক্কা দিয়া ডাকিল, "ওকি দিদিমণি, তোমার খাবার তৈরি। কাপড় চোপড় ছাড়, আবার পিত্তি পড়বে এখন।"

তপ্ত অঙ্গার যেমন একটু বাতাস পাইলেই দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, ঝির এই অভ্যর্থনায়ও দুলালী সেইরূপ ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিয়া কহিল "এখান থেকে দূর হ'য়ে যা, ভারী আদর দেখাতে এসেছেন। আমার জিওগ্রাফি খানা কোথায়? আবার ড্রয়িং বইখানা কে নিয়ে পালাল." ইত্যাদি বিড়ির খিড়ির করিতে করিতে বইগুলি ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মঙ্গলা রাগের সম্পূর্ণ কারণটা বুঝিতে না পারিয়া কহিল, "তোমার ছবিগুলি আমি এখন ওদের দেখাব। তুমি এস বাছা চুলটা ঝট ক'রে বেন্ধে দি। মা, দিদিমণির গয়নাগুলি বের ক'রে দাও শিগ্গীর।"

রাগে দুলালী কথা কহিতে পারিল না! গোলাপের পাপড়ির মত তাহার লোহিত ওষ্ঠ দুখানি ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল। ভগ্ন বীণার রুদ্ধ ঝঙ্কারের ন্যায় একটা অব্যক্ত ধ্বনি তাহার বক্ষ ভেদ করিয়া বাহিরে মিলাইয়া গেল! অবশেষে আগ্নেয় গিরির তরল নিঃস্রাবের মত ক্রোধে ও অভিমানে তাহার দুই চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল।

শিরোমণি মহাশয়ের নিরবচ্ছিন্ন তাগিদে সরোজ বাবু বৈঠকখানায় তিষ্ঠিতে পারিলেন না, অন্তঃপুরে আসিয়া কহিলেন "দুলী, আমার সঙ্গে একবার বাইরে এস ত মা।" পিতার বক্ষে মুখ লুকাইয়া দুলালী এবার বুঝি সত্য সত্যই কাঁদিয়া ফেলিল। সরোজ বাবু কোঁচার খোটে তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া, কপালের উপর হইতে চুলের গুচ্ছ সরাইতে সরাইতে কহিলেন, "পাগ্লী, আমার মাকে কি আমি যার তার হাতে তু'লে দেব? এস মা, একবার ঐ নাছোড়বান্দা বাঙ্গাল দু'টোকে বিদেয় ক'রে দি।"

নিরাভরণা অশ্রুমুখী দুলালী সৌন্দর্য্যচ্ছটায় বৈঠকখানার নিস্তব্ধতাকে মুখর করিয়া শিরোমণি মহাশয়ের অনতিদূরে দণ্ডায়মান হইল। তাহার মুখে সঙ্কোচ বা লজ্জার চিহ্ন নাই, বরং একটা বিজাতীয় ঘৃণা যেন তাহার স্বাভাবিক কমনীয়তাকে কঠোর করিয়া দিয়াছিল। দুলালীর মুখের দিকে চাহিয়া শিরোমণি মহাশয় বলিলেন, "বেশ মেয়ে আপনার, ঘোষজা মহাশয়। এ যে ঘরে যাবে সে ঘরের উপযুক্ত বটে। খাসা দেখতে। যেমনি ছেলে, তেমনি বউ। বেশ মানাবে। কিন্তু, মেয়েটির কোষ্ঠি আছে ত, কি গণ বলুন দেখি?"

সরোজ বাবু কহিলেন "তা কে জানে মশাই! আমাদের বংশে কেউ কখনো সংস্কৃতের চর্চ্চা করে নাই।"

শিরোমণি একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নামটি কি মা?"

দুলালী উত্তর করিল, "কুমারী দুলালী ঘোষ।"

শিরোমণি মহাশয় অতঃপর প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বে দুলালী সেখান হইতে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। মঙ্গলা লিলিকে কোলে করিয়া সেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সে কহিল "দিদিমণি হারমোনির সঙ্গে যে কি গাওনা করে তা যদি তুমি শুন্‌তে পাব্! এমন মেয়ে আর এ তল্লাটে নেই।"

শিরোমণি মহাশয় কহিলেন "পাত্রী ত দেখা হ'ল। আর আপনার সঙ্গে কাজ, এর আর কথাবার্ত্তা কি? তবে কি না শাস্ত্রে আছে যে লক্ষ কথা পূর্ণ না হ'লে বিবাহ হয় না। দেশে গিয়েই আপনাকে চিঠি লিখে জানাব। এখন তবে আসা যাক্, এসহে দেওয়ানজী।" সরোজ বাবু বিনয়-সূচক মস্তক অবনত করিয়া একখানি হাত মাথায় ঠেকাইলেন।

রাস্তায় বাহির হইয়া দেওয়ানজী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। এতক্ষণ পরে তিনি কহিলেন, "ও ভট্‌চাজ, একি রকম কথা হ'ল। আদর অভ্যর্থনা ত দূরের কথা এক ছিলিম তামাকের পেত্যাসা নাই। একটা দোকানে চলুন। আমি তামাক না খেয়ে এক পাও হাটতে পারব না।"

শিরোমণি একটু রুক্ষস্বরে কহিলেন, "একি হরিপুরের বন্দর। এযে কলকাতার সহর ভায়া।"

দেওয়ানজী পূর্ব্ববৎ বিরক্তি সহকারে কহিলেন, "দণ্ডবৎ মেয়ে দেখ্‌বার পায়। আমি ত আগেই ব'লেছি—"

"আরে আমার কি মত ছিল? তবে গিন্নি ঠাকরুন্ দেখেছ ত একেবারে ধনুর্ভঙ্গ পণ ক'রে ব'সেছেন। আর আজকালকার ছেলেগুলি ত বেয়াড়ার হদ্দ। কল্‌কাতায় হাল ফ্যাসানের মেয়ে না হ'লে তাদের আর বিয়ে করা চলবে না। এই ত কলির শেষ দেওয়ানজী। মেয়ে মানুষ স্কুলে যাবে, কোর্ত্তা গায় দিয়ে, জুতা এষ্টাকিন্ প'রে সহরে বেড়াতে যাবে, হা রাধামাধব! তুমি আর কত দেখাবে। ব্রাহ্মণ দেখে মাথা নোয়াবার নামটি নেই। বাপ! বেটি যেন সূর্য্যবংশী রাজা।"

তখন মেঘ কাটিয়া গিয়াছে। বাদশ ব্রাহ্মণের রুদ্র মেজাজ লইয়া সূর্য্য যেন আকাশে জ্বলিতেছিল। এই বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময় দুইটি অভুক্ত প্রাণী ভবানীপুর হইতে পদব্রজে কালীঘাট রওনা হইলেন।

শিরোমণি মহাশয় কলির শেষের এই দুর্নীতির সমর্থন-সূচক শ্লোকগুলি ঝড়ের মত আবৃত্তি করিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার পশ্চাৎগামী দেওয়ানজি যদিও ততটা রসগ্রাহী ছিলেন না, তথাপি বক্তা শিরোমণি গায়ের ঝাল মিটাইয়া বলিলেন, "এরই নাম নভেলি মেয়ে, বুঝ্‌লে হে রামতনু ভায়া।"

পশ্চাৎ চাহিয়া দেখিলেন যে দেওয়ান্‌জি মহাশয় প্রায় দশগজ দূরে একটা চৌতলা বাড়ীর দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিয়াছেন!

(৪)

বাঙ্গাল্ দেশে দুলালীর বিবাহের কথাটা ক্রমশঃ রাষ্ট্র হইতে লাগিল। সরোজ বাবুর বন্ধুবান্ধবগণ নিজের নিজের রুচি অনুসারে নানাপ্রকার অযাচিত মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সরোজনাথ হাঁ, না, কোন কথাই বলেন না। তাঁহার দারুণ দুশ্চিন্তার বিষয় হইয়াছে এই যে, পাঁচ ছয় হাজার টাকার কম যেখানেই হউক মেয়েটি পার করিতে পারিবেন না। এই টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবেন না। এই টাকা সংগ্রহ করিতে তাহাকে প্রায় পথের ভিখারী সাজিতে হইবে। ধন্য শাস্ত্রকারের প্রতিভা! তাঁহারা কি শুভক্ষণেই কন্যার নাম দুহিতা রাখিয়াছিলেন!

সেই পাড়ার বীণা আর রাণী দুলালীর সমপাঠী। তাহারা বিকাল বেলা প্রায়ই দুলালীর সঙ্গে বসিয়া গল্প গুজব করিয়া সময় কাটাইত। আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে দুলালী তাহার পড়ার ঘরে বসিয়া নিজের জীবনের এই উপস্থিত বিপদের কথা একান্ত মনে ভাবিতেছিল। রাণী ধীরে ধীরে পা টিপিতে টিপিতে দুলালীর চোক্ দুইটি পশ্চাৎ হইতে চাপিয়া ধরিয়া গুন্ গুন্ করিয়া গাহিল—

"সোণার টোপর মাথায় দিয়ে লুকায়েছিলে কোন বনে?
আমার বর, আমার বর—ওগো আমার বর।"

বীণা হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। দুলালী হাত ছাড়াইয়া দিয়া ঈষৎ হাসির সহিত কহিল, "ভাই ছেড়ে দাও সব সময় ইয়ারকি ভাল লাগে না।"

রাণী। এখন ত এসব ভাল লাগ্‌বেই না।

বীণা। হাঁ ভাই দুলী, তুই কি আমাদের ছেড়ে তবে সত্যি সত্যি চল্‌লি।

দুলা। কোথায় যাচ্ছি।

রাণী। ন্যাকামি দেখ। আমরা বুঝি আর শুনিনি। যাচ্ছ ত বরের দেশে, বাঙ্গালা মুল্লুক।

দুলা। নিমতলা।

বীণা। আচ্ছা দুলী, তোর বাবা কি শেষে বাঙ্গাল দেখেই ম'জে গেলেন। কল্‌কাতার সহরে শ্রীমতী দুলাল কুমারীর আর বর জুট্‌ল না।

দুলা। না বাবা বলেছেন. সেখানে বে হবে না।

বীণা। না হ'লেই বাঁচি। হ'লে কি আর আমরা তোমায় পাব? কপালে উল্‌কি কেটে, একহাত ঘোমটা টেনে তুই ত বউ সেজে বস্‌বি; আর তোর শাওড়ি এসে বল্‌বে—"বউমা লো, তুমি খেসারির ডাইল রান্‌তে জান?"

তিন জনেই হাসিতে হাসিতে এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িল। রাণী জিজ্ঞাসা করিল "তুই একথা পেলি কোথা বল্‌দিকি?"

রাণী কহিল, "আমার মামার বাড়ী, বাঁশবেড়ের হাসির বাঙ্গাল্‌ দেশে বে হ'য়েছে, তার কাছে শুনেছি। হাঁ ভাই ওদেশে কারুর বে হওয়ার চাইতে গঙ্গায় ডোবা বরঞ্চ ভাল। শাওড়ি মাগীরা নাকি দিন রাত্‌ বউকে কুলীর মত খাটায়, আর একটু ফিট্‌ফাট্‌ দেখ্‌লে কুকুরের মত ঠেঙ্গায়।

রাণী দুলালীর পৃষ্ঠে একটি কাঁপা চপেটাঘাত করিয়া কহিল, "তা হ'লে সেইখানেই আমাদের দুলুমণির বে হওয়া উচিত। একটু সজুত হ'য়ে আস্‌বে। আর আমরা এসে ওর কাছে বাঙ্গাল্‌ দেশের রূপ কথা শুনব।"

বীণা কহিল, "ওগো বাঙ্গালেরা কখনো বউকে বাপের বাড়ী পাঠায় না। খুনী আসামীর খালাস্‌ আছে, কিন্তু বাঙ্গাল্‌ দেশের বউদের মুক্তি নেই। হাসির যেবার মা মারা গেল সে তখনো ছুটি পেল না।"

রাণী কহিল, "সত্যি ভাই, বাঙ্গাল দেশের পুরুষ গুলো যেন এক একটা জাহাজী গোরা। আমার দেখ্‌লে কেমন ভয় করে।"

বীণা জিজ্ঞাসা করিল, "কাল ইস্কুলে যাবিত ভাই দুলী। এখন থেকে লেখাপড়া খতম্‌ কর; বাঙ্গাল দেশের শাওড়ি বউকে চিঠি লিখ্‌তে দেখ্‌লে কিন্তু আঙ্গুলের আগা কেটে দেয়। সাবধান! বাঙ্গাল মনুষ্য নহে উড়ে এক জন্তু।

দুইজনে হি হি করিয়া হাসিতে হাসিতে দুলালীকে জড়াইয়া ধরিল। তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে। চন্দ্রের তীব্ররশ্মি চঞ্চল বালিকার মত পৃথিবীর বক্ষে ছুটাছুটি করিতেছে। প্রতিবেশী অঘোর বাবুর বাড়ী হইতে হার-মনিয়ামের অলস মূর্চ্ছনা আসিয়া পরিহাস-নিরতা বন্ধুদ্বয়কে সন্ধ্যার আগমন জানাইয়া গেল। বীণা আর রাণী বিলম্ব না করিয়া দুলালীর নিকট হইতে সেদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিল।

দুলালী সেই ঘরে চুপ করিয়া শুইয়া রহিল। তাহার সখিদিগের স্বচ্ছ উপহাসের ভিতরে যেন একটা কঠোর বিভীষিকা আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছিল। দুলালী ভাবিয়া ঠিক করিল যে যদি এই বিবাহই সাব্যস্ত হয় তাহা হইলে বড় গঙ্গায় ডুবিয়া মরিব। তারপর ভবানীপুর হইতে কি ভাবে হাবড়া গিয়া গঙ্গায় ডুবিতে হইবে তাহার উপায় স্থির করিতে করিতে স্নেহময়ী নিদ্রা আসিয়া তাহার মেঘের মত সজল আঁখির পল্লব দুইটি মুদ্রিত করিয়া দিল।

(৫)

সাড়ে পাঁচটার সময় সরোজ বাবু আফিস হইতে ফিরিয়াছেন, ভৃত্য আসিয়া তাঁহার জুতা, চাপকান প্রভৃতি যথাস্থানে রাখিয়া দিল। সরোজ বাবু খাইতে বসিলেন; গিন্নি কাছে বসিয়া একটু গৌরচন্দ্রিকার পর কৈফিয়ৎ চাহিলেন যে দুলার বিবাহের সম্বন্ধে তাঁহার এত নিশ্চিন্ত থাকিবার কারণ কি? তবে কি তিনি বাঙ্গাল দেশেই মেয়েটাকে বিলিয়ে দিতে চান?

সরোজ বাবু অর্দ্ধচর্ব্বিত সিঙ্গারাখানা গালের মধ্যে সামলাইয়া লইয়া উত্তর করিলেন "দেখ্‌তে দেখ্‌তে ত মেয়েটা ডাগর হ'য়ে উঠ্‌ল। দুলীর দিকে ত আর চাইতে পাচ্ছি না।"

"নাকে তেল দিয়ে ঘুমুলে কি ক'রে চাইবে বল? কাজের ভেতর ত দেখ্‌ছি আফিসে যাওয়া; আর সে পাল্লা পনর। চোরবাগানের সে ছেলেটিকে একবার দেখা হ'ল না কেন?"

"কেনর কি আর উত্তর আছে? অভিধানে অব্যয় গুলির কোন মানে লেখা নেই। আর ঘরে বাইরে যদি আমাদের

show cause করতে হয় তা হ'লে ত আর পেরে উঠ্ছি না।

"তা পার আর না পার মেয়েটাকে যে বাঙ্গালের হাতে দিবে সেটি কিন্তু হচ্ছে না। যেদিন থেকে ঐ মিন্সে ছুটো এ বাড়ীতে এল, সেদিন থেকে যে ওর কি চেহারা হ'য়েছে তা একবার দেখেছ? তুমি চোরবাগানে গিয়ে সিঙ্গিদের ছেলেটিকে দেখে এস। বিন্দু ঠাকুরঝির কাছে শুনেছি, ছেলেটি নাকি বেশ!"

"হুঁ, কিন্তু সিঙ্গির গর্জ্জন শুনেছ? তিন হাজার নগদ, পাঁচ হাজার গয়না, আর দুই হাজার জিনিষ পত্তর; এই মোট দশহাজারের দাবী। মাইনে ত পাচ্ছি মোটে আড়াইশ খানি"—

এক গেলাস জল পান করিয়া কহিলেন, "টাকা, বাবা যা রেখে গেছ্লেন তা থেকে ত খরচই কচ্ছি।"

গিন্নি পানের ডিবাটি হাতে দিয়া কহিলেন "আফিস্ টাফিসে বেরুচ্ছে বরং এমন একটি ছেলে দেখ। আমার বাঙ্গালদেশী এম্, এ পাশ কার্ত্তিকে কাজ নেই।"

বাহির হইতে এমন সময় নবকুমার "সরোজ দা, সরোজ দা" বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল।

গিন্নি কহিলেন,"কেও? নব ঠাকুরপো বুঝি। এই ত পাশার আড্ডায় যাওয়া হচ্ছে। আমার কথাগুলি যেন মনে থাকে।"

সরোজ বাবু বৈঠকখানায় আসিয়া দেখিলেন, নবকুমার একখানা ইজি চেয়ারে শুইয়া একটা প্রকাণ্ড বার্ম্মিজ্ চুরুট টানিতেছে।

সরোজনাথকে দেখিয়া নবকুমার উঠিয়া বসিল। সরোজ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খবর নবকুমার?" "এই যে চাঁপাতলার মেস্ থেকে হ'য়ে এলুম। ঐ যে পুরুৎ বামুন মার দেওয়ান্ মিন্সে এসেছিল ওরা ত সব মাটি ক'রে ফেলেছিল আর কি? কিন্তু শুনেছি, ছোঁড়া নাকি একটু বেঁকে ব'সে তার মাকে রাজী করিয়েছে। ওঁর এদিকে ঝোঁক কিনা। ছেলেটাকে যখন হাত করতে পেরেছি তখন কেল্লা ফতে। বুঝ্লে কিনা।"

এই বলিয়া নবকুমার শরতের মেঘের মত খানিক অর্থশূন্য হাসি হাসিল। সরোজনাথ কহিলেন "কেল্লা ত ফতে কচ্ছ, এদিকে তোমার ভ্রাজ্ যা বলছে, তা শুন্লে যে একেবারে মাথা ঘুরে যাবে।"

"কি বল দিকি। মাথা ত ঘোরাবারই জিনিষ। ওটা ত আর টেরি কাটার জন্য নয়।" নবকুমার আবার হাসিল।

"যাও! তুমি কেবল সারকাসের ক্লাউনের মত হাস্বে। এখনো একটু সিরিয়াস্ হ'তে শিখ্লে না।"

"তোমার মত আমি ত জমাখরচ ক'রে হাসি না। আমার হাসির কোন হিসাব নিকাশ নেই। কি বল না দিকি।"

"তোমার ভাজের ঝোঁক্ চোরবাগানের ছেলের দিকে।"

"কে? সেই চারু সিঙ্গির বয়াটে ছেলেটা! সাধে কি স্ত্রী জাতি কাছা দিয়ে কাপড় পরে না!"

"এখন কি করি ভাই বলদিকি। একে ত নবলক টাকার কাজ তার উপর এটা নয়, সেটা নয়, আমি ভেবে ভেবে কূল কিনারা পাচ্ছি না।"

"হাঁ দাদা, একটা মেয়ের বে দিতেই অকূলে পড়লে; আর এই নবকুমার বুঝ্লে কিনা, তিন তিনটা পার ক'রেছে।"

"অবশেষে কি বাঙ্গাল্ দেশেই মেয়েটা দোব?"

"না, তা দিও না, খর্পদার! বাঙ্গাল কি মানুষ? চা খায় না, চুরুট খায় না, কেবল হুঁকোতে তামাক খায়। বাঙ্গলা কি দেশ? যেখানে মোটর গাড়ী নাই, ইলেকট্রিক লাইট্ নাই, কেবল ধানে ক্ষেত ধূ ধূ করে! যারা নিষ্কর্ম্মার মত দীর্ঘকাল বেঁচে থাকে অসুরের মত শরীর নিয়ে; একা রোজগার ক'রে যারা মা বাপ, বোন ভাগ্নেকে খেতে দেয় তারা কি দুনিয়ায় মানুষের মধ্যে গণ্য?"

"চমৎকার একটা স্পিচ্ দিলে কিন্তু নবকুমার! বুঝি ত ভাই সকল। এখন কি করি বল দিকি? তুমি দেখ না, যদি তোমার ভাজ্‌কে রাজী করতে পার।"

"তা না পারি ত আর মুখ দেখাব না। তুমি আজ থেকে বল যে কোন্নগরে সম্বন্ধ স্থির হ'য়েছে। না হয় শান্তিপুর টান্তিপুর যা হয় একটা বল। আমি কাজ হাঁসিল ক'রে দিচ্ছি।"

সরোজ বাবু এবার না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। "কি বল নবকুমার, নিজের স্ত্রী, নিজের মেয়ের সঙ্গে এই ছলনা করব?"

"করবে তাদের ভালর জন্য। এতে তারা সুখী হবে। নইলে সর্ব্বস্ব খুইয়ে এক মেয়ের বে দিয়ে যদি বানপ্রস্থ

অবলম্বন করতে চাও তবে ঢাল টাকা, ছেলের ভাবনা কি ?”

“আমি ভাই, ভালমন্দ কিছুই বলব না। যা হক্ তুমি কর।”

“ব্যস্। তবে নির্ভর করতে শেখ দিকি। দুলালী তোমারও যেমন আমারও তাই ; আমি সকল ঠিক ক’রে দিচ্ছি।” দিন দুই বাদে নবকুমার সরোজ বাবুর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করিলেন। গিন্নী নবকুমারকে দেখিয়া কহিলেন, “এস ঠাকুর পো, ভাল একেবারে টীকি দেখবার জোটি নেই।”

“টিকি কি আর রাখলে তোমরা বৌদিদি ? টিকি কেটে যে আমাদের একেবারে সাহেব করে দিলে।”

“টিকিই না হয় কাটলে, গোঁপটা—”

“টিকির সঙ্গে গোঁপের কি রকম সম্বন্ধ জান বৌদি ? যেন সাপ আর বেজি, যেন ইহুদি আর ইংরেজ। গোঁপ কামিয়ে টিকি রাখ, তুমি খাঁটি ভটচায্; আর এক সিকি গোঁপ রেখে টিকিটি কাট, তুমি একজন দস্তুর মত সাহেব। বুঝলে কি না ?”

এই কথা বলিয়া নবকুমার তাহার স্বভাবোচিত হাস্যে ঘরখানা মুখরিত করিয়া তুলিল। পাশের ঘরে দুলালী ছিল, সে হাসির শব্দে সেখানে আসিয়া কহিল, “নব কাকা, এদ্দিন যে আসনি ? খুকী কেমন আছে ?”

“আসিনি তোমার বাবার সঙ্গে ঝগড়া ক’রে। আমি বল্লুম,—তুমি শোন বৌদি, যে, কোন্নগরের ছেলেটির অবস্থা ভাল, দেখতেও বেশ। এখানে ল পড়ছে, খরচ পত্র মোটেই না। এরকম বেয়ারিং পোষ্টে আজ কালকার বাজারে মেয়ে পার করা সবাই পেরে উঠে না। কিন্তু ওর কিরকম ধরণ ! চাতক পক্ষীর মত বাঙ্গাল দেশের দিকে হাঁ ক’রে ছিল, কিন্তু আমি শুনে এসেছি, সেই যে পুরুৎ বামুন, আর একটা বাজার সরকার এসেছিল তারা ভাঙচি দিয়েছে। সে গুড়ে বালি।”

দুলালী ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল। গিন্নি একটু ঔৎসুক্যের সহিত কহিলেন, “সে ভালই হ’য়েছে নব ঠাকুর পো, তুমি ভাই ওকে একটু বুঝিয়ে না হয় সেই কোন্নগরের ছেলেটি ঠিক ক’রে দাও।”

“সে ছেলে ত এক রকম ঠিক। তার বাপের এক ফ্রেণ্ড আমাদের আফিসে চাকরি কচ্ছে। আমি নিজে দেখেছি সে বেশ ছেলে। এ বাজারে ওরকম ছেলে পাওয়া দুর্ঘট।”

“তবে আমার মাথা খাও ঠাকুর পো, তুমি না করে দিলে আর একাজ হবে না। দেখলে মেয়েটার দিকে চেয়ে, কিরকম ছিরি হ’য়েছে। ও নাকি রাণীর কাছে বলাবলি কচ্ছিল যে, বেম্মদের মত বে না ক’রে থাকলে কি হয়। ঠাকুর পো, তোমার হাতে ধরছি ভাই, তুমি একটু দেখে শুনে ওর বে’টা দিয়ে দাও।”

নবকুমার প্রতিশ্রুত হইল। দুলীর বিয়ে এত’ তার নিজের কাজ, এজন্য এত খোসামুদি করা কেন ইত্যাদি ভূমিকা করিয়া নবকুমার বিদায় গ্রহণ করিল।

৬

প্রধানতঃ নবকুমারের উদ্যোগে বিশেষ সমারোহের সহিত শচীনের সঙ্গে দুলালীর বিবাহ হইয়া গেল। দুলালীকে কয়েকশ টাকার গহনা ব্যতীত সরোজ বাবুর আর বিশেষ কোন খরচ হইল না। মেসের কয়েকটি বন্ধুবান্ধব সঙ্গে করিয়া শচীন্দ্রনাথ বিবাহ করিয়া গেলেন। জামাতার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিয়া গৃহিণী মনে মনে কহিলেন, “বাঙ্গাল হলে কি আর এমন হ’ত !” দুলালীর মাথা হইতে একটা দারুণ বোঝা নামিয়া গেল। শুভদৃষ্টির সংক্ষিপ্ত মুহূর্ত্তে সে তাহার জীবন দেবতার চরণে আমিত্বের শেষ অধিকারটুক বিসর্জ্জন দিয়া আপনহারা হইয়া পড়িয়াছে। রাণী ও বীণা আসিয়া দুলালীর গলা জড়াইয়া কতক্ষণ হাসিল, “বাঙ্গালের আক্রমণ হ’তে রক্ষা পেয়েছিস্ ভাই। তোর কপাল ভাল। এই নে আমাদের উপহার” এই বলিয়া দুইজনে অকৃত্রিম স্নেহে দুলালীকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিল।

বিবাহের একমাস পরে দুলালী শচীন্দ্রনাথের সঙ্গে কল্পিত কোন্নগর হইতে ফিরিয়া আসিল। সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন, তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া হীরক ও মুক্তা খচিত এক রাশি বহুমূল্য অলঙ্কার ঝলমল্ করিতেছে। প্রভাতের তরুণ সূর্য্যের মত একটি প্রকাণ্ড সিন্দুরের ফোঁটা তাহার সুগৌর কপালটুকু উজ্জ্বল করিয়া শোভা পাইতেছে। সরোজবাবু নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বে যে ছলনাটুকুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন আজ তার অনুতাপ হৃদয় হইতে অপসারিত হইল। সহসা নবকুমারকে আসিতে দেখিয়া সরোজবাবু আগ্রহসহকারে কহিলেন, “এস ভাই, আজ তোমার বুদ্ধি কৌশলে ফকির হ’তে হ’ল না। মনে হচ্ছে, দুলী আমার সুখেই থাকবে।”

নবকুমার হো হো করিয়া হাসিয়া কহিল "বাঙ্গাল দেশে কি সুখ আছে দাদা। তুমি বাঙ্গাল আমি মেড়ো, ফয়ানা উত্তর, দখনা বঙ্গজ—এই রকম বাঙ্গলা দেশের এক গ্রামে সাড়ে সতের গণ্ডা সম্প্রদায় লইয়া তোমরা আবার দেশ উদ্ধার করবে! বার চাড়ালের তের হুকো!"

"না ভাই তোমার দয়ায় দুলালী সুখী হ'ল।"

"কেন হবে না। 'কন্যা কাময়তে রূপং, মাতা বিত্তং, পিতা শ্রুতং, বান্ধবা কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ।' শাস্ত্র ত জান না। কেবল আফিসে ডেবিট্ ক্রেডিট্ ক'রেই জীবন কাটালে। এখন একটা ভোজের জোগাড় কর দেখি।"

নবকুমার আবার খুব হাসিল। কালবৈশাখীর মত তাহার হাসির কোন নির্দ্ধারিত সময় ছিল না।

মঙ্গলা ফিরিয়া আসিয়া গিন্নির কাছে কহিল "মা, কি বল্ব? জামাই বাবুদের বাড়ীখানা যেন লাট সাহেবের বাড়ী, ধপ্ ধপ্ করছে! মেজে গুলো সব শ্বেত পাথরের, পা দিতে গা শিম্ শিম্ করে। উঠোনটা—এই হেথা হ'তে হোথায় গিয়ে ঠেকেছে, যেন একটা গড়ের মাঠ। খিড়কীর পুকুরটা চাঁপাতলার গোলদিঘীর মত বড়। এমন বাড়ী আমার বাপের বয়সেও দেখিনি। যখন দিদিমণির পাল্কি গিয়ে পৌঁছাল তখন যে ইংরাজী বাদ্যের ধুম্ তা যদি তুমি দেখ্তে মা! আমি এখন থেকে আর তোমার এখানে থাক্তে নারছি। দিদিমণির হোথায় থাক্ব। দু' দুটো রাঁধুনী, এককুড়ি ঝি। আর দিদিমণির যে শাশুড়ী ঠাক্রুণ যেন সাক্ষাৎ ভগবতী ঠাকুর। দেখ্লে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়। কিন্তু মা কোন্নগরের কথা কি বিশ্রী! দেশলাইকে বলে ম্যাজ্বাতি। শুনে আমার হাসি আস্তে নাগল।"

নবকুমার সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। গিন্নি হাসিতে হাসিতে কহিলের "ঠাকুর পো, দুলীর শাশুড়ী বলে ম্যাজ্বাতি, শুনেছ?"

দুলালী আসিয়া নবকুমারকে প্রণাম করিল। নবকুমার দুলালীকে বক্ষে লইয়া সস্নেহে কহিল, "আয় মা বাঙ্গাল দেশের রাণী, তোর নবকাকাকে ভুলে যাস নি।"

নবকুমার একটু মৃদু হাস্যের সহিত উত্তর করিল "বৌদি হিষ্টিরিয়া ক'রে বস না। এ কিন্তু বাঙ্গাল দেশের কোন্-নগর।"

দুলালী নবকুমারের বক্ষে মুখ লুকাইয়া হাসিল।

শ্রীজনার্দ্দন মুখোপাধ্যায় বি-এ সরস্বতী।

পাহাড়-পথে

প্রবাস হতে আস্তে ফিরে পাহাড় ঘেরা পথের মাঝে,
মুগ্ধ হল নয়ন আমার শোভাময়ীর অতুল সাজে।
সকল শোভা উজাড় করি কোন দেবতা এই বিজনে—
তুল্ল গড়ি রূপ্ নগরী স্বপ্নপুরীর ভাব সনে।
হেথায় বুঝি স্বর্গলোকের কিন্নরীদের চল্ছে লীলা,
মঞ্জীরেরি মঞ্জুরবে মুঞ্জরিছে সুপ্ত-শিলা!
বিহঙ্গদের কূজন মাঝে সে সুর যেন ঝঙ্কারিছে
বন্ধন হীন মুক্ত-বায়ু আনন্দ-সুখ সঞ্চারিছে।

নিত্য এসে দীপ্ত রবি শৈলরাণীর কণ্ঠে গো—
সাত লহরের সোনালী হার সোহাগভরে দিচ্ছে গো।
অতীত দিনের সাক্ষী গিরি—সুপ্ত ওদের বল্ছে কে?
লক্ষযুগের কীর্ত্তি ওরা বক্ষে বহি জাগছে যে!
উচ্ছ্সিত তরঙ্গিনী বইছে আকুল আবেগ ভরে,
আকাশ ভেঙ্গে কনক-ধারা বক্ষে তারি পড়ছে ঝরে।
দৃষ্টি আমার বেড়ায় ভেসে রূপসীর ওই কূলে কূলে,
লুটিয়ে পড়ে চিত্ত খানি শৈলরাণীর চরণ মূলে।

শ্রীভক্তিসুধা রায়

স্বাস্থ্যপ্রসঙ্গ

(বৃদ্ধের কথা)

১। হাওয়া পরিবর্ত্তন।

চিকিৎসকগণ, বিশেষতঃ এদেশীয় ডাক্তারী চিকিৎসকগণ যখন কোন রোগীকে ঔষধ খাওয়াইতে খাওয়াইতে সমস্ত শরীর ঔষধময় করিয়া তুলিয়া আরোগ্যের পন্থা দেখিতে পান না, তখনই আবহাওয়া পরিবর্ত্তন ভিন্ন রোগীকে গত্যন্তর নাই বলিতে বাধ্য হন। এই আবহাওয়া পরিবর্ত্তনে অনেকেরই উপকার হইয়া থাকে। এই আবহাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্ম নানা স্বাস্থ্যকর স্থানে অনেকেই যাইতে হয়। অনেক সময় দেখা গিয়াছে, যেস্থান স্বাস্থ্যকর নহে সে স্থানেও কোন কোন রোগী গিয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। আবার অনেক স্থলে বাসগৃহ পরিত্যাগ করিয়াও কেহ কেহ ভাল হইয়াছেন। ইহার একটা কারণ এই মনে হয় যে, অনেক ঔষধ শরীরস্থ করার পর যে কোন স্থানে গিয়া বিশ্রাম করিলেই ঔষধের ক্রিয়া বিশ্রামে ও সাধারণ হাওয়ার জন্ম কমিয়া গিয়া দেহ সুস্থ ও সবল হয়। এই কারণে কোনও স্থান বিশেষ স্বাস্থ্যকর না হইলেও রোগীর পক্ষে উপকারী হইয়া থাকে। বিহার অঞ্চলে বক্সার স্থানটি জররোগীর আরোগ্যের জন্ম খুব উৎকৃষ্ট স্থান ছিল। পূর্ত্ত বিভাগে জল-সেচনের জন্ম বর্ত্তমানে স্থানটি অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে এবং অনেক লোক ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে। এ অবস্থা সত্ত্বেও দেখা গিয়াছে, বঙ্গদেশ হইতে ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত অনেক লোক সেখানে গিয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, আমার একটি আত্মীয় চারিমাস বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়া জরে ভোগার পর যেদিন প্রথম বক্সারে পদার্পণ করেন, সেইদিন জর হওয়ার পরে যে "রেমিশন" হয় তাহার পর আর জর হয় নাই। বর্ষার সময় স্থল ও হাওয়া জল বা জলীয় বাষ্পদ্বারা সিক্ত থাকিলেও বৎসরের অন্যান্য সময় সে স্থানেও হাওয়া শুষ্ক থাকে। ঔষধের উগ্রতা কমিয়াই হউক বা যে কোন কারণেই হউক, আবহাওয়া পরিবর্ত্তন করিলেই সেস্থানে রোগী উপকার পায়, তাহার সন্দেহ নাই।

এমন অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে যাওয়ার পর রোগী ক্রমে ভাল হইতে থাকিলেও কতদূর উন্নতির পর আর কোন উন্নতি দেখা যায় না। এ রকম অবস্থা কেন হয়? এ বিষয়ে অনেক চিকিৎসক চিন্তা করেন না বা চিন্তা করার আবশ্যকতা বোধ করেন না। চিন্তা করিলে, এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য রোগীকে বলিয়া দিয়া রোগীর উপকার সাধন করিতে পারিতেন। রোগী কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া সেই স্বাস্থ্যকর স্থানে দীর্ঘকাল যাপন করেন। ইহার ফলে কোন কোন সময় দেখা গিয়াছে যে, রোগীর শরীর ক্রমে খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। হাওয়া বা জলে, বিশেষতঃ জলের মধ্যে যে ধাতু বর্ত্তমান থাকাতে প্রথম শরীরের উন্নতি হইয়া থাকে শরীরের সেই ধাতুটির পূর্ণক্রিয়া হওয়ার পর ঐ ধাতুরই প্রাচুর্য্যবশতঃ দেহের অনিষ্ট হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে একটু দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেছি। আমার এক শ্রদ্ধেয় বন্ধু পুরী জেলার খুরদা রোড জংসনে গিয়া থাকেন। সেখানে প্রথম ছেলে পিলে নিয়া তাঁহারা সকলেই সুস্থ হইয়া উঠেন, কয়েকমাস পরে তাঁহারা সকলেই ম্যালেরিয়া জরে ভুগিতে থাকেন। স্থানটি স্বাস্থ্যকর; তবে এই রকম হওয়ার কারণ কি? সেখানকার সকলে কুঁয়ার জল পান করিয়া থাকেন। কুয়া লাল ল্যাটারাইট্ প্রস্তরের মধ্যে খোদিত। ল্যাটারাইট পাথরের মধ্যে লৌহ (আয়রণ অক্সাইড়) আছে, আমার মনে হয়, এই জল পান করাতে রক্তের লৌহ উপাদান পরিপুষ্ট হইয়া শরীরের উন্নতি হয়। কিন্তু পূর্ণতা (point of saturation) প্রাপ্তির পর জলপানে শরীরের উন্নতির ব্যাঘাত হইতে থাকে এবং কোষ্ঠবদ্ধ লইয়া জরাদি ব্যারামের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তবে যাহারা সেখানে অনেকদিন বাস করিয়া থাকে, তাহারা কোষ্ঠবদ্ধের প্রতিকার করিয়া বাঁচিয়া থাকে। অথবা জল তাহাদের ক্রমে অভ্যস্ত হইয়া যায় (acclamatised)। এখানে যেমন লৌহধাতুই শরীরের প্রাথমিক উন্নতির কারণ ঐ ধাতুরই প্রাচুর্য্য অনিষ্ট করিয়া থাকে। এ জন্মই বলিতেছি কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে যাওয়ার পর শরীরের কতক উন্নতি হওয়ার পরেই আর উন্নতির লক্ষণ না দেখা গেলে তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করা উচিত। অন্য কোনও স্থানে যাওয়া

বা গৃহে ফিরিয়া আসা কর্ত্তব্য এবং আবশ্যক হইলে পুনরায় উক্ত স্বাস্থ্যকর স্থানে গেলে উপকার হইলেও হইতে পারে। যাঁহারা কার্য্যোপলক্ষে একস্থানে কয়েকদিন করিয়া বেড়াইয়া বেড়ান তাঁহাদের শরীর বেশ সুস্থ থাকে। সহরের ধূলিময় এবং বদ্ধ বায়ু হইতে মফঃস্বলের যে কোন স্থানে গেলে বিশুদ্ধ হাওয়ার গুণে যে কোন রোগী উপকার পাইতে পারেন।

২। **উত্তেজক ঔষধ**—সচরাচর উত্তেজক (stimulant) ঔষধের ব্যবহার আজকাল বড়ই বেশী হইতেছে। ইহার ফল অত্যন্ত অনিষ্টকারী। সময় সময় তাহাতে হৃৎপিণ্ডের অবসাদ আনিয়া রোগীকে মৃত্যুমুখে পতিত করায়। ইহাকে হার্টফেইল করা বলে। কয়েকজন ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা করাতে তাঁহারা বলিলেন fatty heart হইলে অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডে মেদোপজনন হইলে উত্তেজক ঔষধের উক্ত রূপ অনিষ্টকারক ফল কখন কখনও দেখা যায়। আমার মনে হয়, কোন অবস্থাতেই উগ্র বা উত্তেজক ঔষধ ব্যবহার করা উচিত নহে। একবার বেহারের অন্তর্গত ডুবরাওনের এক বড় জমিদারের ভাইয়ের রেমিটেন্ট জ্বর হয়, যে কয়জন ডাক্তার চিকিৎসা করিতেছিলেন তাঁহাদিগকে আমি উত্তেজক ঔষধ দিতে নিষেধ করিলে তাঁহারা বলিলেন যে, fatty heart হইলে উত্তেজক ঔষধের প্রতিক্রিয়া কখন কখনও রোগীর মৃত্যু ঘটায়! এই রোগীটি বয়স হিসাবে অত্যন্ত স্থূলকায় ছিলেন, তাহার হৃৎপিণ্ডে মেদোপজনন হওয়া স্থির করিয়া ডাক্তারগণ উত্তেজক ঔষধ ব্যবহার নিষিদ্ধ স্থির করিলেন। কিন্তু পরে তাঁহাদের মধ্যে একজন গোপনে উত্তেজক ঔষধ দেওয়াতে আর সকলে বিরক্ত হন। বলা বাহুল্য যে, রোগী যদিও আরও দিন দুই বাঁচিতে পারিত, সে ১২ ঘণ্টার মধ্যে পঞ্চত্ব পাইল। আবার উত্তেজক ঔষধ না দিলেও হয়তো সে বাঁচিত না।

প্রতিক্রিয়া (Reaction) শব্দটা অনেকের মধ্যেই শোনা যায়, কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ কি তাহা কয়জনে বুঝেন? সাধারণ লোক বুঝে না, বুঝিবার চেষ্টাও করে না। শব্দটা বুঝিবার সময় সকলেই বলেন যে, উহার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু হৃদয়ঙ্গমকরাটি কেমন, তাহা বুঝাইতেছি।

আমার এক শ্রদ্ধেয় বন্ধু আমাকে বলেন, শিক্ষিত লোকে যে জিনিষটি সহজে বুঝিতে পারেন না, অনভিজ্ঞ লোকদের তাহা বুঝিতে বেশী কষ্ট হয় না। যদি কোন অনভিজ্ঞ লোক প্রশ্ন করে যে, "উড়ো জাহাজ, জলযান, রেলগাড়ী প্রভৃতি কি রকমে চলে?" উহাদের মধ্যে কেহ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিবে,—"ওগুলি কলে চলে"। ইহাতে সকলে বুঝিতে পারিল ভাবিয়া অথবা বুদ্ধির অগম্য বলিয়া আর কোন প্রশ্ন করার আবশ্যকতা বোধ করে না। প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধেও সাধারণ লোকের ঐ রকমই ধারণা। অনেকে ইহার তাৎপর্য্য বোঝার আবশ্যক বোধ করে না। কেহ হঠাৎ পরিশ্রমের পর বরফ, লেমনেড পান করিলে, কোন অভিজ্ঞ লোক জবাব দিবে, "ওটা খেও না, ওতে শরীর গরম হবে" কারণ যদিও পানীয়টি ঠাণ্ডা, কিন্তু ইহার প্রতিক্রিয়া-ফল গরম। একজন মদ খাইয়া মাৎলামী করিয়া পরে অবসন্ন হইয়া পড়িলে, অভিজ্ঞ লোকে বুঝাইবে যে, মদ উত্তেজক হইলেও পরিণামে প্রতিক্রিয়ায় উহা অবসাদক হইয়া থাকে। উহা "কলে চলার" মতন সাধারণ লোকে প্রতিক্রিয়া স্বীকার করিয়া লন। কিন্তু আসল কথাটা তলাইয়া বুঝিবার কেহ চেষ্টা করেন না। করিলে, উত্তেজক ঔষধের কুফল বুঝিতে পারিতেন। এই প্রতিক্রিয়াটা কি বুঝাইতে পারি কিনা চেষ্টা করিয়া দেখি। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। পাহাড়ে চড়িতে হইলে যিনি তাড়াতাড়ি উঠিতে চেষ্টা করিবেন তিনি বেশী উচুতে উঠিতে পারিবেন না, অথবা হার্টফেইল হইয়া মারা যাইবেন। যিনি আস্তে আস্তে উঠিতে চেষ্টা করিবেন, তিনি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির বহু গুণ ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিবেন। আমি দেখিয়াছি যে, এক স্থূলকায়া স্ত্রীলোক সিঁড়ি বাহিয়া দোতালায় উঠিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম না করিলে কথা পর্য্যন্ত বলিতে পারেন না। তিনি দার্জ্জিলিঙ্গে সেই হালকা বায়ুতে (কলিকাতার বায়ুস্তরের চাপ ৩০ ইঞ্চি পারদের সমান ও দার্জ্জিলিঙ্গে ২৩ ইঞ্চি পারদের সমান) আস্তে আস্তে চলিয়া এক ক্রমে পাঁচ ছয় শত ফুট উঠিয়াও ক্লান্ত হন নাই। ইহার কারণ কি? একটা ভারী জিনিষ ঊর্দ্ধে তুলিতে হইলে শরীরের যথেষ্ট শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। একজনের শরীরের ওজন যদি ২ মণ হয় তাহাকে দশ হাত ঊর্দ্ধে উঠিতে হইলে অনেক কষ্ট করিতে হইবে। এই উত্তোলনের জন্য শারীরিক অনেক শক্তি ব্যবহার করিতে হয় এবং তাহার

শরীরের মাংসপেশী প্রভৃতির অপচয় ঘটে। সেই অপচয় কোন জিনিষ দ্বারা পূর্ণ হয়? শরীর মধ্যে খাদ্যাদির পরিপাক ও সমীকরণ দ্বারা এই অপচয় আস্তে আস্তে পরিপূর্ণ হয়। তাড়াতাড়ি দেহের ওজনটাকে ঊর্দ্ধে তুলিতে হইলে শরীরের যে ক্ষুদ্র ক্ষয় হয়, অল্প সময়ের মধ্যে খাদ্যাদি সমীকরণ দ্বারা উক্ত ক্ষতি পূরণ হইতে পারে না। সুতরাং শরীরের শক্তি-ক্ষয় ক্ষতিপূরণ অপেক্ষা বেশী হইলেই লোকের সহ্য করা কষ্টকর হইবে। আস্তে আস্তে ঊর্দ্ধে উঠিলে শরীরের যতটা অপচয় হইবে সেই সময়ের মধ্যে ক্ষতিপূরণ প্রায় সমান হইলেই দেহের বেশী কষ্ট হইবে না; অনেক ঊর্দ্ধে উঠিয়াও কম ক্লান্তি হইবে। মাতালের কথাও ঐ রকম। মদ উত্তেজক, মদ খাইলে সমস্ত শরীরে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্রিয়া খুব দ্রুত চলিতে থাকে, তদ্দ্বারা শরীরের শক্তির এত শীঘ্র শীঘ্র অপচয় হইতে থাকে যে, খাদ্যাদির সমীকরণ দ্বারা অনেক কমই পূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। ক্রমে শক্তির এত ক্ষয় হয় যে, শক্তির অভাবে আর নড়িতে পারে না; ইহাই অবসাদ। অনেককাল পড়িয়া থাকিলে আস্তে আস্তে উক্ত শক্তি লাভ করিয়া মাতাল প্রকৃতিস্থ হয়। রোগীর সম্বন্ধেও ঐ রকম ষ্টীমুলেণ্ট ঔষধ, যাহার ক্রিয়া মদের ক্রিয়ার মত উগ্র, দুর্ব্বল রোগীর গুপ্ত (Latent) শক্তির মধ্যে কার্য্য করিয়া শক্তিকে এত শীঘ্র নষ্ট করিয়া ফেলে যে, সেই সময়ের মধ্যে ক্ষতিপূরণ না করিতে পারিয়া রোগী শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে। এবং উত্তেজকের ক্রিয়া বেশী হইলে হার্টফেইল করিয়া মরিয়া যায়। এই জন্যই দুর্ব্বল শরীরে ষ্টীমুলেণ্ট ব্যবস্থা গর্হিত।

ঔষধ এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে যে, শরীরের শক্তিকে আস্তে আস্তে বাড়াইয়া তুলিতে পারে। শক্তির আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হইলে শরীর টিকিতে পারে না।

৩। **খাদ্য**—সুপক্ব কলা খাইলে যকৃতের (liver) পাকরসের সহিত মিলিত হইয়া খাদ্যের পরিপাক ক্রিয়ার খুব সাহায্য করিয়া থাকে, এ কথা সকলেই জানেন। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন যে, তবে কলা হজম করিতে কষ্ট হয় কেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, কলা খুব ঠাসা (নিরেট)। ছেলে পিলেরা দু এক কামড় দিয়াই প্রায় কলা গিলিয়া ফেলে। সুতরাং নিরেট জনিষের ভিতরে পাকরস পৌছান কষ্টকর বলিয়া হজম হইতে দেরী হয় এবং তাহাতে পেটের পীড়া হইতে পারে। কলাকে চটকাইয়া অন্য পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইলে পরিপাক ক্রিয়ার সুবিধা হইবে। এ নিয়মটি যে কোন কঠিন নিরেট দ্রব্য খাইবার সময় মনে রাখিতে হইবে। অনেকক্ষণ ধরিয়া চর্ব্বণ করিয়া কঠিন দ্রব্য খাইলে দাঁত হইতে পরিপাক রস বাহির হইবে। এবং খাদ্য পেষিত হওয়াতে দাঁতের ও যকৃতের পাকরস উহার প্রত্যেক অংশে মিলিত হইয়া অল্প সময়ের মধ্যে পরিপাক ক্রিয়া সাধন করিতে পারিবে। কেহ কেহ বলেন, কলাও সঙ্গে সামান্য লবণ মিশ্রিত করিলে সুপাচ্য হয়। অবশ্য যাহাদের পরিপাক শক্তি খুব প্রবল, তাহারা কঠিন দ্রব্য ভাল করিয়া না চিবাইয়া খাইলেও বিনা ক্লেশে পরিপাক করিতে পারে। কিন্তু বেশী দিন এই রকম করিলে পরিপাক শক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এজন্য তাহাদিগকেও উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া খাওয়া কর্ত্তব্য। স্কুলের ছেলেদের সাধারণতঃ তাড়াতাড়ি গিলিয়া খাওয়া অভ্যাস। এই অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে হইবে।

৪। **দুগ্ধ**—আজকাল অনেকের কাছে শুনিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা দুগ্ধ হজম করিতে পারেন না। এজন্য কেহ বা দুগ্ধ পান করেন না, কেহ বা দুগ্ধের মাখন তুলিয়া লইয়া দুগ্ধ পান করেন। দুগ্ধ একটি আদর্শ খাদ্য। এটি না খাইতে পাওয়া বড়ই দুঃখের কথা। লেখকও দুগ্ধ খাইতে পারিতেন না। একদিন এক ডাক্তার তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, দুগ্ধ হজম করিতে হইলে (যাঁহারা হজম করিতে পারেন না) দুগ্ধও চিবাইয়া খাইতে হইবে। ইহার অর্থ এই যে, দুগ্ধকে ভাত এবং অন্যান্য পদার্থের সহিত মিশাইয়া অথবা কিছু না মিশাইয়া আস্তে আস্তে খাইলে হজম হইবে। লেখকের পরিচিত আত্মীয় বন্ধুবান্ধব ঐ প্রণালীতে দুগ্ধ খাইয়া হজম করিতে সক্ষম হইতেছেন। ইহার পর একবার একখানি ডাক্তারী কাগজে দেখিলাম, এক পেয়ালা দুধ ৪।৫ মিনিট ধরিয়া আস্তে আস্তে পান করিলে যে কেহ তাহা হজম করিতে পারিবে। ইহার কারণ সহজেই বুঝা যাইতে পারে। এক চুমুকে অনেকখানি দুধ, বিশেষতঃ খালি পেটে গলাধঃকরণ করিলে দুধ জমাট বাঁধিবে, পাকরস এই সময় উহার সর্ব্বস্থানে ক্রিয়া করিতে সুবিধা পায় না; এজন্য বদহজম হয়। আস্তে আস্তে অল্প করিয়া পান করিলে

ছোট চাপ বাদ্ধা পরিবর্ত্তিত দুধের সঙ্গে পরিপাকরস মিলিত হইয়া আর একটা চাপ হইবার পূর্ব্বেই উহাকে পরিপাক রসের উপযুক্ত করিয়া তুলিতে পারে।

৫। তৃষ্ণা—সুস্থ শরীরে যখন খুব তৃষ্ণা পায় তখন ঠাণ্ডা জল এক নিঃশ্বাসে লোকে অনেকটা পান করিয়া থাকে। তাহাতে আপাততঃ তৃষ্ণা নিবারণ হয়; কিন্তু আবার অনেকেরই কিছুক্ষণ পরে তৃষ্ণা পায়। দুই তিন গেলাস জল পান করিয়াও তৃষ্ণা নিবারণ না হওয়াতে লোকে কষ্ট বোধ করে। তৃষ্ণায় ঠাণ্ডা জল না খাইয়া যদি এক-পেয়ালা গরমজল বা চা কেহ পান করিতে পারেন তাহা-হইলে তৃষ্ণার সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি হয়। আমার এক বন্ধু সকাল বেলা অনেকটা বেড়াইয়া আসিয়া খাওয়ার পূর্ব্বে দুই তিন গেলাস জল ও সরবৎ খাইতেন এবং আহারের সময়ও দুই তিন গেলাস জল পান করিতেন। একদিন তাঁহার সঙ্গে অনেক দূর ভ্রমণ করিয়া আমরা দুইজনেই বড় ক্লান্ত হইয়া একস্থানে পৌছিলাম। সেদিন তাঁহাকে সেখানে ঠাণ্ডা জল খাইতে দেই নাই, দুজনেই এক এক পেয়ালা গরম জল আস্তে আস্তে পান করি। বন্ধুটি অনেক কষ্টে গরম জল গলাধঃকরণ করিলেন। সেদিন তাহাকে খাওয়ার পূর্ব্বে আর ঠাণ্ডা জল খাইতে দেখি নাই এবং খাওয়ার সময়ও তিনি ঠাণ্ডা জল বা অন্য কোন পানীয় স্পর্শ করিলেন না। খাবার সময় যে তিনি জল খান নাই, ইহা পশ্চাৎ স্মরণ করিয়া অবাক্ হইলেন। আর একবার আমার এক বন্ধু একদিন গ্রীষ্মকালে দুইটার সময় ছোট এক পেয়ালা চা ও নানারকম খাবার আমাকে খাইতে দিলেন। তখনও ক্ষুধা না হওয়াতে খাবার খাইতে অস্বীকার করি। তিনি আমাকে বিশেষ করিয়া চা পান করিতে বলিলেন। আমার তখন চা পান অভ্যাস ছিল না; বিশেষ তখন গ্রীষ্মকালের তৃতীয় প্রহর। আমার তখন রেলওয়ে ট্রেণে কোনস্থানে যাইবার কথা। বন্ধুটি বলিলেন, চা পান করিলে রাস্তায় গরম বা তৃষ্ণায় কষ্ট হইবে না। চা পান করিলাম। সেদিন বাস্তবিকই গরমের মধ্যেও ট্রেণে বিশেষ কষ্ট হয় নাই এবং তৃষ্ণা পায় নাই। অন্য দিন ওই রাস্তায় চলিতে ঐ সময় হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তিন গেলাস স-বরফ লেমনেড পান করিয়াও তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারি নাই এবং অস্থিরতা বোধ করিয়াছি। ঐ দিন চা পান না করিয়া খুব গরম জল পান করিলেও ওই ফলই পাইতাম। ইহার পর হইতে অনেক পরিশ্রমের পর বা ভ্রমণের পর ঠাণ্ডা পানীয় পান না করিয়া গরম জল বা গরম চা পান করিয়া থাকি। ইহাতে সব সময়েই উপকার বোধ করিয়াছি। গরম পানীয় সহজে হজম হইয়া শরীরের অভাব শীঘ্র পূরণ করিতে পারে বলিয়াই ইহাদ্বারা শীঘ্র তৃষ্ণা নিবারণ হইয়া থাকে।

নির্ভয়

যদবধি মরিয়াছি মুখপানে চাহি।
অনলে অনিলে জলে আর ভয় নাহি
চোখে বুকে মনে তাঁরা পাতিয়াছে ঠাঁই
যায় না তো প্রাণ শুধু যাতনা সদাই!

স্বর্গীয় হেমচন্দ্র কবিরত্ন।

হিংসকের গুণজ্ঞতা

গুণিজনে সমাদর করে বহুজনে
হিংসক গুণজ্ঞ তার সব হতে বেশী।
অন্যে করে সমাদর মুখের বচনে
মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করে যেবা দ্বেষী।

শ্রীকালীদাস রায় বি, এ।

চুক্তির দাবী

(৯)

কুমার বীরেন্দ্রমোহন সিংহ যে খুব বড় একটা শিকার, সর্ব্বাংশে তার ধরিবার উপযুক্ত, ধরিতে পারিলে আগের শিকারটা হারাইবার ক্ষতি সুদে আসলে পুরিয়া আইসে, এবং ডাক্তার রায়ের উপরে; আর যারা তার পরাভবে উল্লসিত হইয়াছিল ও তাকে জব্দ করিতে চাহিয়াছিল তাদের উপরেও, খুব একটা টেক্কা সে দিতে পারে —এ কথাটা কৌমুদীর একেবারেই মনে হয় নাই। কুমার বীরেন্দ্রের মুগ্ধ দৃষ্টি যে তার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল, আর সকলেই তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল, করে নাই কেবল কৌমুদী। এরূপ কিছু লক্ষ্য করিবার মত মন সেদিন তাহার ছিল না। এই ভাবে সে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল যে আজ এই সামাজিক সম্মিলনে সকলকে সে দেখাইবে, ডাক্তার রায়ের পত্নীত্ব লাভের জন্য সে এতটুকুও লালায়িত ছিল না, যার সঙ্গেই রায়ের পরিণয় হইয়া থাক্, তার তাহাতে কিছুই আসিয়া যাইতে পারে না। আগে সে যেমন ছিল এখনও তেমনই আছে। কেন থাকিবে না? রায় তার কে ছিল? আর পাঁচজনের মত পরিচিত একজন বন্ধু মাত্র। সে যাকেই বিবাহ করুক, তার কি?—দুইদিন বহু সংগ্রাম করিয়া, ক্ষতবিক্ষত চিত্ত কোনও মতে দৃঢ় সংযমে বাঁধিয়া এই পর্য্যন্ত সে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু এখানে স্বয়ং রায়ের সঙ্গেই তার সাক্ষাৎ হইবে বা হইতে পারে এটা সে কখনও ভাবে নাই। যখন শুনিল, রায় আসিয়াছে, তার সম্মুখীনও তাকে হইতে হইবে,—অতি তীব্র একটা আঘাতে চিত্ত তার অসহনীয় যাতনায় ছটফট করিয়া উঠিল, উদ্দাম একটা বেদনাময় রক্তোচ্ছ্বাসে স্ফীত হইয়া সকল সংযমের বন্ধন ছিন্ন করিয়া বুক যেন ভাঙ্গিয়া বাহির হইতে চাহিল। মুহূর্ত্তে সে স্তব্ধ হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কিন্তু মুহূর্ত্ত মাত্র। প্রাণপণপ্রয়াসে মনের সকল শক্তি, সকল আগ্রহ এক কেন্দ্রে সংগ্রহ করিয়া এই এক লক্ষ্যের দিকেই তখন আজ সে প্রয়োগ করিল যাহাতে অতি কঠোর এই পরীক্ষাতেও সে পার হইতে পারে, স্বয়ং রায়কে এবং রায়ের সম্মুখেই আর সকলকে দেখাইতে পারে, সত্যই সে সাধারণ একজন পরিচিত বন্ধু বই আর কিছুই তার ছিল না। প্রয়াস তার সার্থক হইল,—কিন্তু এই সার্থকতা বজায় রাখিতে, অবিরত যে আত্মসংগ্রাম তাকে করিতে হইয়াছিল, তাহাতে বিশেষ ভাবে আর কিছু লক্ষ্য করিবার মত মন তার থাকিতে পারে না। রায় যখন সত্যই তার সম্মুখীন হইল, কঠোর এই সংগ্রামে চিত্তের বিক্ষোভ তার অসহনীয় মাত্রায় গিয়া উঠিয়াছিল। কি ভাবে যে তাহা দমন করিয়া হাসিমুখে রায়কে সম্ভাষণ করিল, তার বিবাহের কথা স্ত্রীর কথা তুলিয়া বিদ্রূপরঙ্গও করিল, সে নিজেই তাহা ঠিক বুঝিয়াছিল কিনা জানি না। তামসী কাছে ছিল, তার কথার ইঙ্গিতে এই মাত্র তার মনে হইয়াছিল সেই কথার মত কথাই তাকে বলিয়া যাইতে হইবে। রায়ের সেই বিবর্ণ বিশুষ্ক মুখ, সেই কুণ্ঠিত বিক্ষুব্ধ ভাব সে লক্ষ্য করিয়াছিল। একবার তার মনে হইয়াছিল, কাঁদিয়া সে রায়কে জড়াইয়া ধরিয়া বলে, "ওগো, কেন এ লজ্জা, কেন এ কুণ্ঠা তোমার। আমি যে তোমারই, তুমিও আমার। কোন্ অলঙ্ঘনীয় নিয়তির বশে, অজেয় কি বলে, কিম্বা অবোধ্য কি ছলে কে তোমাকে ছিনাইয়া নিয়া অন্যের সঙ্গে বাঁধিয়া দিয়াছে,—নহিলে তুমি কি স্বেচ্ছায় আমাকে ছাড়িয়া যাইতে পার! যা হইয়াছে হউক। কিন্তু তবু তুমি আমার, আমি তোমার। কেন আজ তুমি এত কুণ্ঠিত, এত ক্ষুব্ধ আমার কাছে হইতেছ।

কিন্তু হিতাহিত বুদ্ধি সে একেবারে হারায় নাই,—প্রাণভরা এই উদ্বেল আবেগও সে চাপিয়া দমাইয়া দিল।

বাহিরের অবস্থায় যাহাই তার মনে হউক, তামসীর কথায় যাহাই সে বুঝুক, এই একটি কথা সর্ব্বদাই তার মনে হইয়াছে, অকস্মাৎ যে রায় তাকে কিছু না বলিয়া অন্যত্র গিয়া বিবাহ করিল, ইহার মধ্যে বড় গূঢ় একটা রহস্য আছে। সে যে একটা খেলা করিয়া হেলায় তাকে ছাড়িয়া গিয়াছে, ইহা যতই যে বলুক, কিছুতে সে একেবারে মনে করিয়া নিতে পারিতেছিল না। এই

রহস্য কি, কিসে বাধ্য হইয়া এমন একটা অসম্ভব কাণ্ড সে করিয়া ফেলিল, তাহা জানিবার জন্ম মনটা যারপরনাই উৎকণ্ঠিত তার হইয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল, রায় তাকে সব কথা খুলিয়া লিখিবে, কিন্তু ছয় সাত দিনের মধ্যেও কোনও পত্র যখন আসিল না, কোনও রকমে কোনও ভাবেই সে কিছু জানাইল না, তখনও এক একবার তার মনে হইত, সত্যই বুঝি তাকে লইয়া একটা হেলা খেলাই সে করিয়াছে। মনে মনে রাগও হইত। তামসীর কথা-গুলিও তখন তার মনে ধরিল। তার উপদেশ মত চলিতেই প্রস্তুত হইল। কিন্তু তবু যখন তখন এই কথাটাই তার মনে খোঁচা দিয়া উঠিত, না না, সে হেলা খেলা করে নাই, করিতে পারে না ; অলঙ্ঘনীয় কোনও কারণে বাধ্য হইয়াই এইরূপ করিয়াছে, করিয়া একেবারে মর্ম্মাহত হইয়া আছে—দুঃখে লজ্জায় আমার কাছে আসিয়া কিছু বলিতে পারিতেছে না! আজ রায়ের বিষণ্ণ মুখ, কুণ্ঠিত ভাব লক্ষ্য করিয়া এই ধারণাই তার দৃঢ় হইয়া উঠিল। কিন্তু হউক, আজ এখানে এই সব লোকের সম্মুখে এই অভিনয়ই তাকে করিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু-তারপর! একটি বার কি দেখা হইবে না?—ইহার পরও একখানি চিঠি কি সে লিখিবে না? তার মনের বেদনা তাকে জানাইবে না? জানাইবে! অবশ্য জানাইবে! কিন্তু তারপর?—হায়, তারপর—

প্রাণটা কৌমুদীর বড় কাঁদিয়া উঠিল। তার পর হায়, কি হইতে পাবে? কি তারা করিতে পারে? অলঙ্ঘনীয় এক ব্যবধান যে তাহাদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে!

কতক্ষণ কৌমুদী চিত্ত স্থির রাখিয়া এই সংগ্রামের বেদনা সহিতে পারিত জানি না। তামসীও বুঝিয়াছিল, অধিকক্ষণ আর কৌমুদীকে লইয়া এখানে থাকা তার উচিত নয়। রায় চলিয়া যাইবার অল্পক্ষণ পরেই মাথাধরার ছুতা করিয়া সে বিদায় গ্রহণ করিল।

গাড়ীতে উঠিয়া কৌমুদী একেবারে গা ছাড়িয়া দিল, কঠিন সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হৃদয় তার একেবারে অবসন্ন হইয়া তখন পড়িয়াছিল। তামসী তার হাতখানি ধরিয়া কহিল "বেশ ক'রেছিস্ কোমু! এতটা পারবি তা ভাবিনি। এক রকম গোল এখন চুকে গেল! কিন্তু কি বজ্জাতিটাই ওরা ক'রেছে,—ভেবেছিল, তোকে খুব অপদস্থ করবে এখানে।—উল্টো জব্দ হ'য়েছে।"

কৌমুদী কিছু বলিল না, গভীর একটি নিশ্বাস তার বুক ভরিয়া উঠিতেছিল, চাপিয়া চাপিয়া প্রায় নিঃশব্দে তাহা ত্যাগ করিল। তামসী একবার তার দিকে চাহিল,—কৌমুদীর মনটা যে বড় শান্ত তখন ছিল না,—থাকিতে পারে না, তা সে বুঝিতেছিল। কতদূর গিয়া কি ভাবিতে ভাবিতে বোধ হয় কৌমুদীর মনটাকে অন্য দিকে—একটু নিবার অভিপ্রায়ে—আবার সে কহিল, "একটা ব্যাপার লক্ষ্য ক'রেছিলি কোমু?"

"কি দিদি?"

"ঐ যে কুমার বীরেন্দ্রমোহন সিংহ—"

"কে?"

"বাঃ! বলিস্ কি? এরি মধ্যে ভুলে গেলি। ঐ যে আমাদের কাছে এসে ব'সেছিল সুন্দর যুবকটি—প্রভাদের বন্ধু—সে পরিচয় করিয়ে দিলে—"

"হাঁ, তার কি?"

"তার কথাই ত বল্‌ছিলাম, ছেলেটি বেশ—আমেরিকা থেকে এসেছে। শুনলাম বাপ খুব বড় জমিদার—রাজা উপাধি পেয়েছিল—"

"হাঁ—তা কি হ'য়েছে?"

"কেন, তুই লক্ষ্য করিস্‌নি কিছু?"

"হাঁ, একটি ভদ্রলোক এসে ব'সেছিলেন—প্রভা কি নাম ব'লে...—"

"কুমার বীরেন্দ্রমোহন সিংহ—আমেরিকা ফেরত—রাজা নরেন্দ্রমোহন সিংহের ছেলে।"

"হুঁ—"

আনমনা ভাবে উত্তরে মাত্র এই একটি কথা কৌমুদী উচ্চারণ করিল।

তামসী কহিল, আমার মনে হ'ল, সে তোকে দেখে একেবারে মুগ্ধ হ'য়েছে। আচ্ছা, যদি সত্যি ভালবেসে বিবাহের প্রস্তাব এখন করে—"

হায় প্রেম যে তুলনা করিয়া বাছিয়া নিতে জানে না—যাকে সে চায়, তাকেই চায়, দূর হউক কে এই পাপ বীরেন্দ্র মোহন। তার বাঞ্ছিতকে বঞ্চিত করিয়া তাকে কাড়িয়া নিতে কে সে। কেন এ স্পর্দ্ধা তার।

কৌমুদী ভ্রূকুটি করিল—মুখে বিরাগের একটা বক্রভাব দেখা দিল। তার মনের অবস্থা এখন যেরূপ, তাহাতে অপর

কেহ, সে যেই হউক না কেন, তাকে ভালবাসে, তাকে বিবাহ করিতে পারে এই কথাটা শুনিলেই তার প্রতি মনটা দারুণ বিরাগই পূর্ণ হইবার কথা! তামসী সেটা লক্ষ্য না করিয়া কহিল, "তাহ'লে খুব চমৎকার হয়, না কোমু? তোর আজ এই জয়ের গৌরব একেবারে ষোলকলায় পূর্ণ হয়! এর কাছে নরেন রায় কি?"

কৌমুদী দাঁতে ঠোঁট কামড়াইয়া রহিল, কিছু বলিল না। তামসী ফিরিয়া চাহিল, ভগ্নীর মুখের ভাব লক্ষ্য করিল, কিন্তু মনের কথা ঠিক ধরিতে পারিল না। বুঝিবার জন্য কহিল "কেমন ঠিক নয়? কি বলিস্ কোমু?"

"জানি না। আজ থাক্ দিদি! মাথাটা বড্ড ধরেছে আমার—বড় ঘুম পাচ্ছে।"

তামসী একটি নিশ্বাস ছাড়িল,—আর কিছু তখন বলিল না।

(১০)

"তা ঘরে ব'সে এখন রাগারাগি বকাবকি ক'রে ত আর লাভ কিছু হবে না রমু—"

"তা জানি খুড়ীমা, জানি! কিন্তু গায়ের ঝাল যে মেটে না! এমনি করে—আমি রমাকান্ত দত্ত—মোটা সোটা মারোয়ারীদের এক হাটে কিনি এক হাটে বেচি, বড় বড় সাহেবদের হাতের ইসেরায় নাচাই—এম্‌নি ক'রে আমাকে ঠকালে। শালার ব্যাটা শালা!—"

খুড়ীমা ইচ্ছাময়ী জিভে কামড় দিয়া কহিলেন, "আঃ ছি ছি! রমু, একেবারে ক্ষেপলি? মুখে একটু লাগাম নেই—কি ব'লছিস্! সে হ'ল জামাই—"

"আমার শালা সে! শালার ব্যাটা শালা। দুশ বার বলব। কিসের জামাই সে? জামাই হ'তে পাবে এ ত বড় একটা পেজোমো শ্বশুরের সঙ্গে—যে শ্বশুর নাকি বাপের মত! মতিচ্ছন্ন হ'য়েছিল আমার, বাজে ছুটো সঙকিড়িমিড়ি মন্তর না ছাই আওরে মেয়ের হাত ধরে তার হাতে একদিন দিয়েছিলাম—তাতেই সে জামাই হ'ল?"

"তাতেই হ'ল বইকি, বাবা, তাতেই হ'ল বই কি? অগ্নি শালগ্রাম বামুন সব সাক্ষী ক'রে শাস্তরের মন্তর পড়ে মেয়ে উচ্ছুগ্‌গো ক'রে দিলি—"

"কিছু না, ও সব কিছু না খুড়ীমা! আগুন একটা দেশলাইয়ের কাঠিতে জ্বলে, ফুঁ দিলে নেভে—তাও কি আবার দেবতা নাকি? শালগ্রাম ত পাথরের নুড়ী—পথে ঘাটে গড়াগড়ি যায়। আর বামুন—আরে রাম! ভিখিরীর অধম, দুটো টাকা হাতে বাজিয়ে তু করে ডাক দিলে ছুটে আসে—"

"আঃ ছি ছি ছি! ওরে হতভাগা 'দোহাই তোর' অমন অধম্মে কথা মুখেও আনিস্ নি। একেবারে সর্ব্বনাশটা করিস্‌নি। এম্‌নিই ত যদ্দূর হবার তা হয়েছে! ঐ সব পাপ কথা মুখে এনে দেবতার অভিশাপ আর কুড়োস্‌নি। ওরে, টাকা টাকা করিস্, টাকার কি বড়াই কিছু আছে? রাজরাজেশ্বরও পথের ভিখিরী দেখ কত কত হ'চ্ছে! তোর কথাবার্ত্তা শুনে, চালচরিত্তির দেখে গা আমার শিমশিম করে। ওরে, এ পিথিমীতে কিছুই কারও থাকে না। এক ধর্ম্ম যদি—"

"রেখে দেও তোমার ধর্ম্ম। কোথায় ধর্ম্ম? কোথায় তোমার দেবতা? ওসব যদি থাক্‌ত কিছু, তা হ'লে এমন হয়?"

"কপাল—সব কপাল! কর্ম্মে যার কপালে যা লেখা পড়েছে—বিধেতা পুরুষের আপনা হাতে লেখা—তাকি কেউ এড়াতে পারে?"

"ঐ ত তোমাদের বড় একটা ফাঁকি। বড় একটা অন্যায় হ'ল, বোঝাতে পারবে না, তখন যত দোষ নন্দঘোষ—ঐ এক কর্ম্ম আর কপাল! বিধেতা পুরুষ ত লিখে রেখেছেন, কই দেখাতে পার কোথায় কি লেখা আছে? কেউ পেয়েছে কখনও?"

"নরলোকের পাপচক্ষুতে কি আর তা দেখা যায় বাবা?"

"কাজেই! ঐ এক ফাঁকি আর তার ফাঁক ঢাকতে আর একটা মস্ত ফাঁকি হ'ল ওই! পরলোকের পাপচক্ষু! কার কোন্ পুণ্যির চক্ষুতে কবে কে তা দেখেছে তবে?"

ইচ্ছাময়ী কহিলেন, "আমি মেয়ে মানুষ বাবা, জ্ঞানবুদ্ধি কিছু নেই, আমি কি এই তত্ত্বের কথা তোকে বোঝাতে পারি? তবে ছেলেবেলা যা শিখেছি, তাই মেনে চলি। তোরাও যদি মান্‌তে পারতিস বাবা, দেবতা ধম্মে মতি রেখে দুঃখ ক্লেশ সব মাথায় তুলে নিতে পারি। ও রে, এই একটা জন্মই ত সব নয়, কত জন্ম আগে গেছে, কত জন্ম আরও হবে—"

"ও সব কিছু মানিনে খুড়ীমা। তোমাদের খুসী মান, জন্ম জন্মের স্বপ্ন ব'সে দেখ। এই একটা যা জন্ম জানি,

তাই মানি। কি এমন অন্যায় কাজ আমি ক'রেছিলাম যে, এমন ঠকাটা আমাকে ঠক্‌তে হ'ল? সাত হাজার টাকা খরচ করে বিলেত পাঠিয়ে ব্যাটাকে মানুষ করে আনলাম, তার উপর আবার একটি লাখ টাকা লক্ষ্মীছাড়াকে ঘুষ দিলাম—"

"তবু ত এই হ'ল! কিছুই সে শুনল না। আর জন্মের কর্ম্মফল ছাড়া কি বল্‌বি?"

"আর জন্মে কি তার জমিদারী ঠকিয়ে নিয়েছিলাম আমি? কে দেখেছে? কি তার প্রমাণ আছে?"

"এই ত প্রমাণ! তাই হয় ত শোধ ক'রে নিল।"

"শোধ ক'রে নিল? আচ্ছা দেখব, পাজি ব্যাটা, ছুঁচো গর্ভস্রাব কোথাকার! শোধ ক'রে নেওয়াটা আমি দেখে নেব! আমি রমাকান্ত দত্ত—ব্যাটা ভেবেছে কি?"

"যা ভেবেছে তা ত দেখতেই পাচ্ছি। আবাগী মেয়েটাকে একেবারে পাথারে ভাসিয়ে এত গুলো টাকা নিয়ে সরে পড়্‌ল। আর তুই যে তার কি কত্তে পারিস্ এখন, তাও ত বুঝতে পাচ্ছিনি কিছু!"

"পারবে—পারবে! যখন দেখবে কি ক'রছি তখন পারবে। নালিশ ক'র্‌ব, হয় আমার মেয়ে নিয়ে ঘর করবে, না হয় টাকা আদায় ক'রে নেব। জেলে দেব হারামজাদাকে। আমার সঙ্গে জুচ্চুরী!"

ইচ্ছাময়ী উত্তর করিলেন "বুড়ো হাবা মেয়েমানুষ আমি, তোদের আইন কানুনের কথা কিছু বুঝিনি। তা কি নালিশ করবি যে, তার জেল হবে আর তোর টাকা আদায় হবে? তোরা ত বিয়ের সম্বন্ধ করিস্‌নি, করেছিলি চুক্তি। তুই টাকা দিবি, সে তোর মেয়ে বিয়ে করবে। বিয়ে ত ক'রেইছে। বউ নিয়ে যদি সে ঘর না করে, আদালতের হুকুমে ক'র্‌বে? আর সে কি ঘর করা হয়? পোড়াকপাল! ওরে পাগল! এ সব আইন আদালতের কথা নয়; ধর্ম্মের কথা। ধর্ম্ম মেনে বউ নিয়ে ঘর সংসার যদি কেউ না করে, কারও সাধ্যি আছে, আইনের ভয় দেখিয়ে জোর করে করাতে পারে?"

রমাকান্তও তাহা জানিতেন,—এটর্ণী বিনোদবাবু পূর্ব্বেই একথা তাঁহাকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়া নালিশে তাঁহাকে নিরস্ত করিয়াছেন।

কিন্তু অধীর চিত্তে এই কথাটাই সর্ব্বদা তাঁহার ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঠিত, আঃ! এত বড় জুচ্চুরীটা করিল, নালিশ করিয়া যদি ব্যাটাকে জব্দ করিতে পারিতেন! ক্রোধের উত্তেজনায় আজ ঠিক সেই কথাটাই তাই মুখের বাহির হইল। খুড়ীমার এই সহজ বুদ্ধির মন্তব্যটা তাঁহাকে মনে করাইয়া দিল, হাঁ, বিনোদও তাই বলিয়াছে বটে!

তাই ত! খুড়ীমা বুদ্ধি রাখেন বটে। তখনও তিনি বলিয়াছিলেন, এই বিবাহ দিস্ না। এটর্ণী বিনোদও তাই বলিয়াছিল। হায়, হায়! কেন ইহাদের উপদেশ তখন শোনেন নাই। সুবিজ্ঞ বিচক্ষণ এটর্ণী আর অন্তঃপুরের এই বুড়ী খুড়ীমা—দুই জনেই ত ঠিক একই কথা বলিয়াছিলেন—কথাটা তবে সত্যই ছিল বটে! কিন্তু কেন তিনি বুঝিলেন না, কেন খেয়ালের বশে এত বড় সর্ব্বনাশটা করিয়া ফেলিলেন। টাকা ত গেলই, আরও মেয়েটার একেবারে সর্ব্বনাশ হইল! বিধবার অধম হইয়া সে তাঁহার ঘরে পড়িয়া থাকিবে! হায়, তখন যদি চুপ করিয়া থাকিতেন, আর পাজি গিয়া অন্য কোথাও বিবাহ করিত, অমনি চুক্তিভঙ্গের একটা নালিশ রুজু করিতেন—হায়, হায়! কি মজাটাই হইত! হারামজাদা যেমন পাজি—তেমনই জব্দ হইত! ওদের ওই সাহেবী সমাজে মুখ তুলিয়া আর কোথাও দাঁড়াইতে পারিত না। শ্বশুর বাড়ী হইতে কুকুরমারা হইয়া বাহির হইতে হইত। সাধের বউ মুখে থুথু দিয়া পয়জার মারিয়া চলিয়া যাইত! হায় হায়! কেন তা করেন নাই! কি দুষ্ট সরস্বতীই ঘাড়ে চাপিয়াছিল,—কারও কথা শুনিলেন না। তাকে জব্দ করিবেন, না নিজের মাথাটা নিজের হাতে কাটিয়া তার পায়ের তলে ফেলিয়া দিলেন! সে তা পায়ে দলিয়া তাঁরই টাকায় এখন বাহার দিয়া বেড়াইতেছে! রমাকান্তর মনে হইতেছিল, নিজের গায়ের মাংস নিজে কামড়াইয়া ছিঁড়িয়া ফেলেন।—কিছুক্ষণ অধীরভাবে ইতস্ততঃ পাদচারণা করিয়া শেষে কহিলেন, "কি এখন করা যায় বল ত খুড়ীমা? হায়, হায়! কত আহ্লাদের বিনো আমার,—হীরে মুক্তোয় গা ঢেকে দিয়েও যে আমার সাধ কখনও মেটে নি?—এক লাখ দিয়েছি, পাঁচ লাখ এখনই দেব, যদি তার সুখ হবে এটা বুঝতে পারি। হায়, হায়! কি ভাবলাম, কি হ'ল! তা কি করি এখন বল ত? তাকে কি ব'লে পাঠাব,—টাকা যা চায় নিক—এক লাখ, দু লাখ,—হাঁ, পাঁচ লাখই দেব,—বাগানের নতুন

বাড়ীটা তাকে ছেড়ে দেবে, বিনোটিক নিয়ে সে ঘর করুক।"

"ওরে রমু, এই বুদ্ধি নিয়ে নাকি তুই ব্যবসা করিস্? ওরে পাগল, সোয়ামীর ভালবাসা বাপের টাকায় কেউ কিনতে পারে? আরও একরাশি দে, একখানা বাড়ী দে, তার ত পোয়াবার হবে। তারপর মেয়েটাকে যখন বাড়ী থেকে বের ক'রে দেবে, কি ক'রবি তখন?"

"কেন, পাকা লেখাপড়ায় চুক্তি ক'রে নেব, আদর যত্নে তাকে নিয়ে ঘর ক'ত্তে হবে। যদি না করে, সব আমার মেয়ের হবে, সে কিছু পাবে না।"

"পাগল! পাগল! একেবারে বদ্ধ পাগল! নইলে এমন কথাও একটু ঘটে যার বুদ্ধি আছে, সে বলে! হাসি পায়! কোন্ কপালের খোঁচা ছিল, ব্যবসায় কি ক'রে একরাশি টাকা ক'রে ফেলেছিস্। নইলে আর কোন বুদ্ধি বিধেতা তোর মাথায় দেন নি,—না হয় টাকার গরমে যেটুকু ছিল, ধোঁয়া হ'য়ে উড়ে গেছে। তাই ভাবিস টাকাতে সব হয়, টাকা দিয়ে সব কেনা যায়! এই বুদ্ধি না হ'লে এক লাখ টাকা দিয়ে আবার তুই গেলি তখন চুক্তির দাবী আদায় ক'ত্তে। তা সেত সেই দাবী চুকিয়ে দিয়েই খালাস হ'য়েছে। আবার আরও একরাশি টাকা দিয়ে—আবার একটা চুক্তি গিয়ে কর, আরও পস্তাবি শেষে। ভাল কথা ত কারও কাণে শুনবিনি।"

"আচ্ছা, বল সেই ভাল কথাটা কি তোমার, শুনিই না একবার।"

"ওসব বাজে কথা ছেড়ে দিয়ে তাকে গিয়ে ধ'রে পড়ে পড়। যদি সুবুদ্ধি তার হয়, কি দয়া হয়, তবে যদি মেয়েটার হিল্লে একটা হয়। নইলে মেয়েটা যে ভাসল ত ভাসল। মুখে সেকথা আন্‌তে নেই—ঐ যেমন হ'য়ে থাকে, বাপের ঘরেই পড়ে থাক্‌বে. কেবল দুবেলা দুটি মাছভাত খাবে—এই যা তফাৎ'।"

রমাকান্ত তখন কাঁদ কাঁদ হইয়া কহিলেন, "তা ত করেছি খুড়ীমা। কিন্তু তার সেই কাটাকাটা সব কথা যদি কাণে একবার শুন্‌তে, ব'ল্‌তে না যে, আবার তার বাড়ীতে যা।"

"তা কি করবি বাবা? সন্তানের জন্য বাপ মাকে জলে আগুণেও ঝাঁপ দিতে হয়।"

রমাকান্ত এবার একেবারে কাঁদিয়াই ফেলিলেন,—চোক মুছিতে মুছিতে কহিলেন, "পরশু আবার গেছলুম,—দারোয়ান সাফ জবাব দিলে, সাহেবের হুকুম নেই, দেখা হবে না।"

ইচ্ছাময়ী গভীর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অঞ্চলে নয়ন মার্জ্জনা করিলেন, কিয়ৎকাল কি ভাবিয়া শেষে কহিলেন, "এক কাজ ক'র্‌বি রমু? যদি কিছু হয়, তাতেই হবে, নইলে উপায় আর কিছু নাই। সেই শেষ চেষ্টা একবার ক'রে দেখ, তারপর—কি আর হবে? যেমন কপাল নিয়ে এসেচে—সেই ভোগ ভুগবে। কেউ কিছু কারও ক'ত্তে পারে না রমু, কেউ কিছু কারও ক'ত্তে পারে না। কপাল! সব কপাল। নইলে ভিকিরীর মেয়ে কত রাজার রাণী হ'চ্ছে; আর যে রাজার মেয়ে—এ দুর্ভোগ তার ভুগতে হবে কেন?"

"হুঁ—তা কি ক'ত্তে হবে বল না?"

"আমি বলি কি—মান অপমানের কথা কিছু ভাবিসনি—বিয়ে হ'য়েছে, সোয়ামীর কাছে আবার মেয়েমানুষের মান অপমান কি? কোনও অপমানই আর থাক্‌বে না, যদি মান সে রাখে। আর নাই যদি রাখে, কি এসে যাবে এ অপমানে? আমি বলি কি, বিনোকে একবার পাঠিয়ে দে—"

"বিনোকে! বল কি খুড়ীমা? বিনো গিয়ে কি ক'র্‌বে। সে কি মুখ তুলে কথাটি ব'ল্‌তে পার্‌বে? ভয়ে লজ্জায় কেঁদেই দেবে।"

"যদি কিছু হয় বাবা, তার সেই চোকের জলেই হবে, তোর লাখ লাখ টাকায় কিছুই হবে না।"

"দারোয়ান যদি ঘাড়ে ধ'রে তাকে পথে বের ক'রে দেয়।"

"না না, তা কি কেউ দিতে পারে? ও ত খাঁড়া তরোয়াল হাতে ক'রে তাকে যুদ্ধে জয় ক'ত্তে গিয়ে উঠবে না। ভাল তার না লাগে, ফেরত পাঠিয়ে দেবে। তা দিক্। একেবারে এ ভরসা ক'রে ত পাঠান হচ্ছে না যে, ঘরে পা দিতেই অম্‌নি তাকে মাথায় তুলে নেবে? কি জানিস, তোর ওপর একটা রাগ তার আছে. তোকে আমল দেয় না, অপমান করে। কিন্তু অবলা একটা মেয়ে, আর ও সতি অপরাধও কিছু তার কাছে করে নি। হয় ত দয়া হ'তেও পারে। না হয় নেই, ক্ষতি ত আর বেশী কিছু হবে না।"

রমাকান্ত ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে কহিলেন, "আমি রমাকান্ত দত্ত—আমার মেয়ে—আমার টাকায়—ভিখিরী, পথের খেঁকী কুকুর—আজ যে ডালকুত্তার মত দাঁত খিঁচুনী দিতে পাচ্ছে—আমার মেয়ে তার দয়ার ভিখারী হ'য়ে তার বাড়ীতে গিয়ে জোড় হাত ক'রে দাঁড়াবে! না খুড়ীমা, সে হবে না!"

"ওরে, মেয়ে তার হাতে দিইছিস্—ইহপরকালের দেবতা সে আজ তার। তোর মেয়ে ব'লে কোনও মান আজ তার নেই। অত বড় দক্ষ রাজার মেয়ে মা ভগবতী; ভিকিরী শিবের ঘরে, তিনিও গিয়ে যোগিনী হ'য়ে রইলেন। বাপ সেই শিবের নিন্দে করেছিল, অমনি অপমানে দেহত্যাগ কল্লেন। ওরে, মেয়েমানুষ বিয়ে হ'লে আর বাপের মেয়ে থাকে না, সোয়ামীর দাসী হয়। তার কাছে তার মান অপমান কিছু আছে?"

রমাকান্ত উত্তর করিলেন, "ওসব কথায় মন ভেজে না খুড়ীমা? যাহোক্, ভেবে দেখি একটু। বিনোকেও বল, সে ত বড় হয়েছে—লেখাপড়াও শিখেছে—দেখ, সেই বা কি বলে।"

(ক্রমশঃ)

—ডুবুডুবু তরী—

[১]

একাকী চলেছি বেয়ে
　　ডুবু ডুবু তরীখানি;
কোথা ঘাট কোথা বাট,
　　কিছু আজ নাহি জানি!
ছল ছল কল কল
ধেয়ে আসে বীচি দল,
বুকে নিতে কুতূহল
　　বাড়ায়ে হাজার পাণি।
একাকী চলেছি বেয়ে
　　ডুবু ডুবু তরীখানি!

[২]

গগনে নিবিড় মেঘ
　　বহে হুহু সমীরণ,
চমকে চপলাবালা
　　করে দেয়া গরজন,
দুই তীরে বিটপীর
শাখা শাখী কি অধীর,—
উড়ায়ে পাখীর নীড়
　　মাতালের হানা হানি
একাকী চলেছি বেয়ে
　　ডুবু ডুবু তরীখানি!

[৩]

মাথার উপরে মোর
　　নীড়-হারা পাখীগুলি,
উড়িছে ডাকিয়া ভয়ে,
　　কে লইবে কোলে তুলি'!
চারি ধারে ঘেরে তমঃ,
দূরে গ্রাম ছায়া সম,
কেহ নাই কাছে মম
　　শুনাতে আশার বাণী!
একাকী চলেছি বেয়ে
　　ডুবু ডুবু তরীখানি!

[৪]

তবু যে জাগে না ভয়,
　　কাঁপে না একটু বুক,—
সারা প্রাণে ভরে গেছে
　　কার হাসি মাখা মুখ!
যদি আজ ডুবে তরী,
ডুবিব সে হাসি স্মরি,—
অমর হইব মরি,
　　জনম সফল মানি,
একাকী চলেছি বেয়ে
　　ডুবু ডুবু তরীখানি!

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

পিসিমার চশমা

পিসিমাকে দেখেই আমি থমকিয়া গেলাম।

বাবা প্রায়ই পিসিমার কথা বলিতেন। একদিন বলিলেন, "কানু, তোর পিসিমা আসচে" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কবে, বাবা?" বাবা বলিলেন, "শীগগিরই।" বলিয়া তাঁহার এমনই গুণগান করিলেন যে, আমি ভাবিলাম, যদি কাউকে আমি ভালবাসি তবে সে পিসিমা। মা ছিলেন না, তাঁহার মুখশ্রী আমার মনে পড়ে না; বুকের মধ্যে তাঁহার মুখের দাগ আঁকিয়া বসিবার আগেই তিনি আমাকে নামাইয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। বহুদিন ধরিয়া পিসিমার কথা শুনিতে শুনিতে একটি মাতৃমুখের ছবি আমার মনের মধ্যে আকার ধারণ করিয়া উঠিয়াছিল এবং তাহারই আশে পাশে আমার কল্পনা এবং আকাঙ্ক্ষা লালায়িত হইয়া ঘুরিতে সুরু করিয়াছিল।

ব্যস্তভাবে আফিস হইতে ফিরিয়া বাবা একদিন বলিলেন, "আজ তোর পিসিমা আসবে, কানু, তাকে আনতে ষ্টেশনে যাবি ত চ'।" আমি লাফাইয়া উঠিলাম। লাফানি থামাইয়া দিয়া, তাড়াতাড়ি পোষাক পরাইয়া লইয়া বাবা আমার হাত ধরিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। প্লাটফর্মে বেড়াইতে বেড়াইতে বাবা বলিলেন, "গাড়ী আসতে দেরী আছে, বেড়িয়ে দেখ। এইটে ষ্টেশন মাষ্টারের ঘর, এখানে টিকিট বিক্রী হয়, কত লোকে কিনছে দেখছিস?" আমি বলিলাম—"হুঁ"। বাবা বলিলেন "এখানে মাল ওজন হয়, বাক্স সিন্দুক সব জিনিষই, এইটের ওপর ওজন করে, এটা আমাদের মত ভদ্রলোকের অপেক্ষা করবার ঘর, এটা সাহেব সুবোদের, এখানে মদ আর সাহেবদের খাবার বিক্রী হয়, এটা হুইলারের ষ্টল।" ব্যাপারটি কি বুঝিতে না পারায় বাবা বলিলেন, "বই, খবরের কাগজ আরও সব অনেক জিনিষ বিক্রী হয়।" বলিয়া একটা মণিব্যাগ দর করিলেন, কিন্তু দুই টাকা দাম চাহিল বলিয়া নিলেন না, আমাকে বলিলেন, "বাজারে ও-র দাম পাঁচ সিকে।"

ফুঁ দিয়া গাড়ী আসিয়া ঢুকিল। আমি বাবার আঙুল ধরিয়া তাঁহার সম্মুখে কোণের কাছে দাঁড়াইয়া ছিলাম, গাড়ীর গর্জ্জন শুনিয়া পিছাইয়া আসিয়া তাঁহার পাশে দাঁড়াইলাম। গাড়ীর ভিতর হইতে যাহারা নামিতে চাহিতেছে তাহারাও ব্যস্ত, ভিতরে যাহারা ঢুকিতে চাহিতেছে তাহারাও ব্যস্ত, কাজেই প্রায় প্রত্যেক গাড়ীর দরজায় ঠেলাঠেলি লাগিয়া গেল। মগ্ন হইয়া এই ঠেলাঠেলি আর গোলমাল দেখিতেছিলাম—হঠাৎ বাবা বলিয়া উঠিলেন, "কানু, ঐ যে তোর পিসিমা, চ' চ'।" বলিয়া আমাকে কোন দিকে চাহিবার অবসর না দিয়াই আমার হাত ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন। যে রকম চেহারার পিসিমার কাছে আমাকে টানিয়া লইয়া গিয়া বাবা দাঁড়াইলেন, আমার কল্পনা-লালিত পিসিমার সে রকম চেহারাই নয়। কাজেই থমকিয়া গেলাম।

তাঁহার চোখের সামনেই প্রকাণ্ড দুইখানি কাঁচ সূর্য্যের লাল আভা পড়িয়া ধক্ ধক্ করিয়া যেন জ্বলিতেছিল। একলাই আসিয়াছেন, তাঁহার পায়ে জুতা, কাপড় যেন কি রকম করিয়া পরা, সচরাচর যেমন দেখিয়া থাকি তেমন নয়, গায়ে নানারূপ কারুকার্য্য করা জামা, মাথায় কাপড় অতি সামান্য, বাবার চাইতে তাঁহার শরীর ঢের বেশি মোটা, রং কাল।

আমরা পিতাপুত্রে নিকটবর্ত্তী হইতেই—তিনি হাসিয়া বাবাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "এসেছিস্, সতী, তুমিও এসেছ, বাবা, আমাকে নিতে? —এস", বলিয়া তিনি হাত বাড়াইলেন, কিন্তু আমি ধরা দিলাম না। পিসিমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"লজ্জা কি? এস আমার কাছে।" কিন্তু তিনি আমাকে গ্রেপ্তার করিবার পূর্ব্বেই বাবা বলিলেন, "তোমরা দাঁড়াও এখানে, আমি গাড়ী দেখি।" পিসিমা বলিলেন, "গাড়ী? গাড়ী কি হবে, হেঁটেই যাব এখন, কত দূরই বা।"

রাস্তায় চলিতে চলিতে বাবার কাছে পিসিমা আমার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। বাবা বলিলেন, "ডাক নাম কানু, পোষাকী নাম ব্রহ্মব্রত।" পিসিমা হাসিয়া বলিলেন, "এক চক্রবর্ত্তী যথেষ্ট কষ্টকর, তার উপর আবার ব্রহ্মব্রত? তোর

ছেলে খাজনা দিতে পারবে না, সতী।" বাবা বলিলেন, "বুঝলাম না, দিদি।"

পিসিমা বলিলেন, "কোথাকার এক জমিদারের সেরেস্তায় একটা লোক খাজনা দিতে এসেছে, খাজাঞ্চি জিজ্ঞাসা করলে- 'তোমার নামটি কি বাপু?' লোকটি বল্লে, 'আমার নাম যজ্ঞেশ্বর মণ্ডল।" খাজাঞ্চি জিজ্ঞাসা করলে, 'ওরফে?' সে বল্লে, 'ওরফে বুদ্ধ'। খাজাঞ্চি তার খাতা খুলে' লিখ্‌তে গিয়েছিল, কলম তুলে জিজ্ঞাসা করলে, "বাপের নাম?"

'যুধিষ্ঠির মণ্ডল।'

'বাড়ী?'

'ধনঞ্জয়পুর।'

খাজাঞ্চি বল্লে —'তোমার খাজনা আমি নিতে পারব না, যিনি খাজাঞ্চি তিনি তিন চারদিনের ছুটিতে গেছেন, তিন চার দিন পরে এস।' এখন হ'য়েছে কি, নতুন খাজাঞ্চিটি লেখাপড়া তেমন জান্‌ত না, যুক্ত অক্ষর লিখ্‌তে তার কষ্ট হত।"—বলিয়া পিসিমা এমনই হাসিতে লাগিলেন, আর বাবাও সে হাসিতে যোগ দেওয়ায় আমি লজ্জায় মরিয়া গেলাম। মনে হইল, পৃথিবীতে পিসিমার মত শত্রু আমার কেউ নাই এবং প্রতিজ্ঞা করিলাম, যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, ইনি তোমার কে? তাহা হইলে আমি বলিব, কে আবার? কেউ না।

বাড়ী পৌছিয়া পিসিমা তাঁহার ঘরে গেলেন, তাঁহার জন্য আলাদা একটা ঘর সাজান হইয়াছিল।

বাবাকে একলা পাইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— "পিসিমা কতদিন থাক্‌বেন, বাবা?"

বাবা বলিলেন, "অনেক দিন, কেন রে?"

আমি কোন্ উত্তর দিলাম না; ভাবিলাম, গেলে বাঁচি।

বাবা বলিলেন, "তোকে খুব ভালবাস্‌বে, আদর ক'রবে, পড়াবে"—

"আমি চাইনে কিছু" বলিয়া আমি চলিয়া আসিলাম।

সন্ধ্যার সময় বোধ হয় ভাল করিয়া লক্ষ্য হয় নাই, কিন্তু সকাল বেলায় আমাদের ঘর দুয়ারের শ্রী দেখিয়া পিসিমার গা জ্বালা করিতে লাগিল, এটুকু বুঝিলাম তাঁহার কথার ভঙ্গীতে। ঝি আসিতেই তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন,— "দেখ, বাছা, ঘর দোর যদি এমন নোংরা করে' রাখ তবে তোমার চাকরী যাবে। খবরদার, ছাই ঘোলা চারুকে পাবে না, রাস্তায় নিয়ে ফেলে দেবে। ভাঙ্গা হাঁড়ী, সরা কি সঙ্গে নেবে যে জমিয়ে রাখ্‌ছ? ঘর দোর ঝক্‌ঝকে রাখ্‌তে পার থাক, না পার যাও।" ঝি কিছু বলিল না, কিন্তু আমি রাগে গদ্‌গদ্ করিতে লাগিলাম। ছাই আর হাঁড়ী রাস্তায় ফেলে নাই এই অপরাধে আমাদের বহুদিনের পুরাতন ঝিটিকে চাকুরীর ভয় দেখান উচিত হইতেছে না মনে করিয়া কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু পিসিমা তাঁহার চশ্‌মা জোড়ার ভিতর হইতে আমার দিকে এমনি একটি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন যে, আমার প্রতিবাদের সঙ্কল্প বারকতক টলিয়া ভূমিসাৎ হইয়া গেল। দৃষ্টিটা ক্রোধের নয় তবু যেন মনে হইল, তিনি আমার মুখের দিকে চাহিয়াই আমার মনের কথা পাঠ করিয়া লইয়াছেন এবং আমি যে তাঁহার দলের লোক নহি, তাহা তিনি নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিয়াছেন। এই পরাজয়ে আমার রাগ আরও বাড়িয়া গেল।

রীতিমত পড়িতে বসান, ধরিয়া গা মাজিয়া দেওয়া প্রভৃতি অত্যাচারগুলি ক্রমশঃ সহ্য হইয়া গেল, কিন্তু পিসিমার চশমা আমার সহ্য হইল না। দ্বিতীয় দিন সেই যে অনুভব করিয়াছিলাম যে, পিসিমার চশ্‌মার দৃষ্টি আমার মনের আবরণ ভেদ করিতেছে, তাহার ফলে তাঁহাকে আমি এড়াইয়া বেড়াইতে লাগিলাম। তাঁহার বিরুদ্ধে যে সমস্ত ন্যায়বিরুদ্ধ কামনা পোষণ করিতাম তাহা আমার মুখে চাহিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যেই তিনি জানিতে পারিবেন সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। আমার মা কি এমনটি ছিলেন?—ভাবিতে আমার বুক ফাটিয়া কান্না আসিত। তাঁহার দৃষ্টি কি এমন প্রাণে বিঁধিত, ভয় দেখাইত? কখ্‌খন না।

পিসিমা ঘর দুয়ারের অপরিচ্ছন্নতার দিকে বাবার মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন, বাবার অনুরোধে সর্ব্ব দিকে মার্জ্জনা করিলেন, দুই দিনের মধ্যেই আমাদের বাড়ীখানায় আপাদমস্তক যেন উৎসবের নূতন বেশ পরিয়া হাসিতে লাগিল। কিন্তু আমার মন বাঁকিয়াই রহিল।

একদিন পিসিমা আমাকে লজ্জাও দিলেন। পিসিমা তাঁহার ঘরে ছিলেন, আমি উঠানে দাঁড়াইয়া দুই হাত মেলিয়া দিয়া বোঁ বোঁ শব্দে ঘুরপাক খাইতেছিলাম। বার-

কতক ঘুরিয়া দাঁড়াইলেই মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে, সমস্ত শরীর টলিতে থাকে। নিজের মাথা এবং শরীরের এবম্বিধ অস্থিরতা উপভোগ করিবার উদ্দেশ্যেই সে দিনও ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু শেষ না হইতেই চোখ পড়িল—পিসিমা বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার বিদ্যুৎ-দৃষ্টির সঙ্গে চোখোচোখি হইতেই আমার ঘূর্ণন থামিয়া গেল এবং পলায়নের অভিপ্রায়ে পা বাড়াইতেই ভূপতিত হইলাম। পিসিমা দ্রুতপদে নামিয়া আসিয়া আমার হাত ধরিয়া তুলিয়া খাড়া করিয়া ধরিলেন; রাগ করিলেন না, তিরস্কার করিলেন না, ব্যথা পাইয়াছি কিনা তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন না।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন দুপুর বেলা কি কাজে পিসিমার ঘরে ঢুকিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। দেখিলাম, তাঁহার চোখে সে ভয়ানক চশমা জোড়া নাই এবং চোখের পাতা ভিজে—চোখের জলে কি কুঁজোর জলে তাহা জানি না; কিন্তু তখন তাঁহাকে এমন পোষমানা ভাল মানুষটির মত দেখাইতেছিল যে, আরাম বোধ করিলাম। চোখে চশমা নাই এমন অবস্থায় তাঁহাকে এই প্রথম দেখিলাম; দেখিলাম তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্ব-দি'র দৃষ্টির চাহিতে কর্কশ নহে। আসান পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "পিসিমা, তুমি চশমা পর কেন?" পিসিমা হাসিয়া বলিলেন, "নইলে যে চোখে দেখতে পাইনে"। বলিয়া চশমা পরিলেন। বাহিরে আসিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম, নষ্টের মূল ঐ চশমা জোড়া হস্তগত করিতে হইবে, তাহা হইলেই পিসিমার চোখ আর আমাকে পাহারা দিয়া ফিরিতে পারিবে না, আমার মনের কথাও পিসিমা বুঝিতে পারিবেন না।

কিন্তু ব্যাপারটা শক্ত—চশমা নাক ছাড়া হয়ই না; যখন হয়, তখন তাঁহার হাতের কাছেই থাকে।

তকে তকে ফিরিতে ফিরিতে একদিন দুপুর বেলায় শুনিলাম, পিসিমার ঘর হইতে নাকডাকার শব্দ আসিতেছে। নিদ্রিতা পিসিমার নাকের উপর হইতেই আলগোছে চশমা তুলিয়া লইব স্থির করিলাম। বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ করিতেছিল, তথাপি পা টিপিয়া টিপিয়া তাঁহার ঘরে ঢুকিয়াই আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম, নাকের উপর চশমা নাই। আমার কখন মনে হয় নাই যে, ঘুমাইবার সময় চশমা চোখে নাও থাকিতে পারে। যদিও চশমাই চুরি করিতে আসিয়াছিলাম তবু নাকের উপর তাহাকে না দেখিতে পাইয়া মনে হইল, বাঁচা গেল, চশমা নাকে নাই। নাকের উপর ছাড়া অন্য কোন স্থান হইতে চশমাকে স্থানচ্যুত করিবার উদ্দেশ্য আমার ছিল না—পিছন ফিরিব এমন সময় পিসিমা চোখ মেলিলেন। ঘটনার এই গতিপরিবর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না, থতমত খাইয়া গেলাম। "ক্ষিদে পেয়েছে?"—জিজ্ঞাসা করিয়াই পিসিমা আমার হাত ধরিয়া টানিয়া কোলের কাছে বসাইয়া দিলেন এবং নিজে উঠিয়া বসিলেন।

আমি ক্ষীণস্বরে উত্তর করিলাম—"ক্ষিদে পায়নি। পিসিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে আমার জাগাতে এসেছিলি কেন?"

মিথ্যা করিয়া একটা যা তা বলিতে পারিলাম না, মিথ্যা কথা যোগাইত না,—বলিলাম, "তোমায় জাগাতে ত আসিনি, পিসিমা; তুমি ঘুমাও দেখে তোমার চশমা চুরি করতে এসেছিলাম।"

অতিশয় বিস্মিত হইয়া পিসিমা বলিলেন—"আমার চশমা চুরি করতে এসেছিলি? কেন রে?" বলিয়া আমাকে আরও খানিকটা কোলের কাছে টানিয়া লইয়া আমার মাথার উপর হাত রাখিলেন। আমার ভয় ও বিদ্বেষ দূর হইয়া গেল।

একটু গলা চড়াইয়া অভিমানের সুরে বলিলাম—"তোমার চশমা কেন আমায় ভয় দেখায়? তুমি আর চশমা পরতে পাবে না।"

এই সামান্য অনুরোধটির মধ্যে হাসির কারণ কি ছিল জানি না, কিন্তু পিসিমা তাহা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কি হ'য়েছে ঠিক করে' বল্ ত কানু।"

আমি ঘাড় তুলিয়া চোখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "তুমি চশমা পরে' চাইলে মনে হয়, চোখ দুটো যেন জলছে, আর যেন আমার ভিতর অবধি দেখতে পাচ্ছ, আমার কেমন ধাঁধ ধাঁধ ভয় ভয় লাগে।"

"তাই বুঝি তুই আমার কাছে আসিস্ না?" বলিয়া তিনি আমার এক মুহূর্ত্ত আগেকার অভিমানের নালিশ অগ্রাহ্য করিয়া চশমা তুলিয়া লইয়া পরিলেন। চশমা

প্রাণের মধ্যে ভয়ঙ্কর ভাবে ধুক্ ধুক্ করিতে লাগিল, চোখ দুটি ভয়েতেই বড় বড় দেখাইতে লাগিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এখন তাহাতে ভয়ের কোন কারণই দেখিতে পাইলাম না।

হঠাৎ পিসিমার বুকের উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িয়া বলিলাম—"এখন ভয় ক'র্‌ছে না, পিসিমা।"

"পাগল ছেলে" বলিয়া পিসিমা নত হইয়া আমার ললাট চুম্বন করিলেন। তারপর বলিলেন, "আমি কি তোকে এখানে ভয় দেখাতে এসেছি, কানু? এখন থেকে আমার কাছে আস্‌বি?"

আমি বলিলাম, "আস্‌ব।"

তারপর তাঁহাকে মনের সব গোপন কথা খুলিয়া বলিলাম। বাবার কাছে তাঁহার গল্প শুনিয়া আমার কি মনে হইয়াছিল, মায়ের মুখ মনে পড়ে না, তাঁহারই কথা শুনিয়া শুনিয়া মায়েরই মুখের একখানি ছবি মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তারপর তাঁহার চশমা দেখিয়া এবং কথা শুনিয়া আমার ভয় হইয়াছিল, রাগও হইয়াছিল, তাঁহাকে ঠিক মায়ের মতন মনে করিতে কষ্ট হইত, মা পিসিমার মত হইলে মাকে ভালবাসিতে পারিতাম না বলিয়া মনে হইত সব বলিলাম।

ঝর্ ঝর্ করিয়া পিসিমার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, নিঃশব্দে আমাকে বুকের উপর তুলিয়া লইয়া পিসিমা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত।

নির্ঝর

কোন সুদূরে গহন পুরে,
গোপন ঘন পাহাড় চূড়ে
ছিনুগো পড়ে তন্দ্রাহত
ধবল হিম আস্তরণে, ;
মাথার পরে চন্দ্রতারা
ঢালিত শুধু কিরণ-ধারা,
বিজন বায়ু কাঁপাত পাতা
মৃদুল মধু সঞ্চরণে॥

[২]

কুহেলিকার বন্ধ টুটি'
কোন অনাদি উষার আলো
সব জড়তা মুছায়ে দিয়ে
প্রাণে গানের ঢেউ জাগালো,
কোন দেশের শঙ্খনাদে
আজকে আমার পরাণ কাঁদে,
কোন অজানার সন্ধানে গো
হঠাৎ হিয়া আন্দোলিল॥

কোন রবি তার বহ্নি-তুলি
আমার বুকে বুলাল রে-
কোন পাখী তার তরল তানে
পাষাণ হিয়া গলাল'রে-
আপন বেগে উথলি উঠি
সুদূর পানে চলিনু ছুটি—
নিরুদ্দেশের যাত্রা-পথে
বক্ষ আমার উচ্ছ্বসিল॥

(৩)

পাষাণ ছিঁড়ি' বাঁধন ভাজি'
পাথর ঠেলি চল্‌ছি ছুটে,
একটী হিয়ার হাজার ধারা
হাজার রাগে পড়্‌ছে লুটে॥
শত ঊষর মরুর বুকে
প্রাণের হাসি ঢাল্‌ছি সুখে,
আমার গানের আমেজেতে
ধরার হাসি উঠ্‌ছে ফুটে॥

(৪)

আমার সচল সজীবতা
সকলে আজ নেয়গো লুটি'।
বালু-ধূসর তীরে-তীরে
শ্যামলতা উঠছে ফুটি'॥

তবু বিশাল প্রাণের ভাবে
মন্ত্র নত দুইটি ধাবে।
আমার চির আনন্দ-গান
সকল বিষাদ দেয়গো টুটি'।

শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য, বি, এ,

বিবিধ (সংগ্রহ)

আমেরিকাতে কৃষির প্রভূত আয়োজন

আমেরিকাতে কলে লাঙ্গল ও মই দেওয়া হয়, জমি কোপান হয়, জমিতে জল সেচন হয়।

সেখানে চাষীর সহিত ধনীর যোগ আছে- সেখানে সমবায় প্রণালীতে কাজ হয়—আমেরিকায় ২।৩।১০ জন চাষীতে মিসিয়া নূতন নূতন কৃষিযন্ত্র কস করে এবং আবশ্যক মত সকলে ব্যবহার করে। তাহারা লাঙ্গল বিশেষের সাহায্যে ক্ষেত্রের আলু, পিঁয়াজ উঠায়। এই লাঙ্গলকে potato grubber বলে। আমেরিকায় কলে ভুট্টা বা জনার কাটা এবং বাঁধা হয়।

কলে ধান, যব, গম কাটা ও বাঁধা হয়। একজন লোকেই এ কল চালাইতে পারে। ১০ ঘণ্টা কল চালাইলে ১০০০ বিঘা জমির ফসল কাটা ও বাঁধা হইয়া যায়। এই কলের নাম মোলাইন। ইহা আমেরিকায় ইলিনয় ষ্টেটের মোলাইন নামক স্থানে প্রস্তুত হয়।

আমেরিকার চাষীরা ফলের গাছে পোকার উপদ্রব দেখিলে পিচকারী দ্বারা গাছ ধৌত করে। ২০।২৫ ফিট উচ্চ গাছও ইহার দ্বারা ধৌত করা যায়।

তাহারা পোকার উপদ্রব দমনের জন্য ফসলের অনিষ্টকারী পোকার শত্রু-পোকা পালন করে এবং সেগুলিকে ক্ষেতে ছাড়িয়া দিয়া ফসলের শত্রু নাশ করে।

আমেরিকার গোশালা বড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—ধোয়া কাপড় পরিয়া, হাত পা ধুইয়া তাঁহাদের গোয়ালিনিগণ দুগ্ধ দোহন করে।

কৃষি বিদ্যালয়ে আমেরিক ছাত্রগণ দোহান পাইপের ব্যবহার ধান শিক্ষা করে।

কৃষি বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ জীবতত্ত্ব অধ্যয়ন কালে ঘোড়া, গো, মহিষাদির ও ভেড়া ছাগল প্রভৃতির প্রকৃতির চর্চ্চা করে।

কৃষি বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ উদ্ভিদ বিদ্যা শিক্ষা করে এবং এখানে তাহারা উদ্ভিদ সম্বন্ধে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করে।

আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থীরা এখানে ভেষজ উদ্যান রচনা করে। ভেষজ উদ্ভিদের সহিত এখানে ছাত্রদের পরিচয় হয়। ভেষজ উৎপাদন, রক্ষা ও তাহার প্রয়োগ শিক্ষা ছাত্রগণ করিতে পায়। ভেষজ দ্বারা চিকিৎসাও তাহারা কিয়ৎপরিমাণে শিক্ষা করিতে পারে।

ফলের বাগান, ফুলের বাগান, সবজীর বাগানের ন্যায় ভেষজ উদ্যানও সুন্দররূপে নির্ম্মিত হয়।

আমেরিকার কৃষক ও গভর্মেণ্ট

আমেরিকার কৃষি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত প্রণালীতে পরিচালিত হয় বলিয়া ক্ষেতে ফসল উৎকৃষ্ট ও অধিক উৎপন্ন হয় এবং তার ফলে কৃষক চাষীরা বেশ সচ্ছল এমন কি, ধনী অবস্থাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। আমেরিকার চাষীরা শ্রমলাঘবকারী কলের যন্ত্র চাষে প্রয়োগ করিয়া অর্থ শ্রম ও সময় অল্প ব্যয় করিয়াই অনেক ফসল জমির নিকট হইতে আদায় করে। মাতা বসুমতী তাঁর উদ্যোগী সন্তানদের ধনধান্যে আশীর্ব্বাদ করিয়া লক্ষ্মীশ্রীতে তাদের মণ্ডিত করিয়া তোলেন।

আমেরিকার চাষীদের সফলতার দ্বিতীয় কারণ, তাদের সমবায়। একজন চাষীর পক্ষে চাষের নানা রকম কলের যন্ত্র কেনা যদি সম্ভবপর না হয়, সেইসব কলে একদিনে একটানায় যতখানি ক্ষেত চষিতে নিড়াইতে পারে, অথবা যত বড় জমিতে বিধে বা মই দিতে, অথবা ফসল কাটিতে পারে ততখানি জমি যদি একজন চাষীর না থাকে, তবে বহুচাষী একত্র দলবদ্ধ হইয়া সমবায় করে এবং একের যাহা বোঝা হইত দশের তাহা লাঠি হইয়া উঠে; সকলের চাঁদায় এক প্রস্থ কলের যন্ত্র কেনা হয় এবং সেই যন্ত্রে সকলের ক্ষেত চষা, নিড়ানো, বিধে বা মই দেওয়া হয় এবং সকল ক্ষেতের ফসল কাটা, আঁটি বাঁধা, আছড়ানো, ঝাড়া, বস্তাবন্দী, মাপা অল্প সময়ে ও অল্প খরচে হইয়া যায়।

চাষীদের পরস্পরের সহযোগিতা ছাড়া গভর্মেণ্টও চাষীদের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া থাকেন। আমেরিকায় আমাদের দেশের মতন চু-থাক গভর্মেণ্ট—খণ্ড খণ্ড ষ্টেট বা প্রদেশগুলি নিজেদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নির্ব্বাহ করিবার জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত করে, এ-কে বলে ষ্টেট গভর্মেণ্ট; আবার এই সমস্ত ষ্টেট গভর্মেণ্ট সমবায়ে পরস্পরের মধ্যকার ও বিদেশের সঙ্গে ব্যবহারের সমস্যা মীমাংসার জন্য যে সব কর্ম্মচারী নিযুক্ত করে তারা হয় সমবায় গভর্মেণ্ট, যাকে আমেরিকায় বলে ফেডারেল গভর্মেণ্ট—যেমন আমাদের প্রাদেশিক বা প্রভিন্সিয়াল গভর্মেণ্ট এবং ইণ্ডিয়া ইম্পিরিয়াল গভর্মেণ্ট। আমেরিকার সমবায় গভর্মেণ্টের সঙ্গে যে কৃষিবিভাগ আছে তার কর্ম্মচারীদের সংখ্যা অনেক, কুড়ি হাজার; আর এই বিভাগের খরচ বছরে একুশ কোটি টাকা! এই বিভাগের উদ্দেশ্য, দেশে চাষীদের যন্ত্র বা কৃষিতত্ত্ব তাদের জানাইয়া বুঝাইয়া অবলম্বন করিতে সাহায্য করা, নব নব কৃষিতে তাদের উৎসাহ দেওয়া, নিরন্তর প্রবৃত্তি উৎপাদন করা। এই উদ্দেশ্যে বৎসরে পঁচিশ কোটি পত্রিকা, পুস্তিকা রিপোর্ট চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

কলে ভুট্টা বা জনার ফসল কাটা ও আঁটি বাঁধা—কলে ধান যব গম কাটা ও আঁটি বাঁধা। একজন লোকেই কল সহজে চালাইতে পারে। ১০ ঘণ্টা কল চালাইলে ১৬০ বিঘা জমির ফসল কাটা ও বাঁধা হইয়া যায়। এই কলের নাম মোলাইন। আমেরিকার ইলিনয় ষ্টেটের মোলাইন নামক স্থানে প্রস্তুত হয়। ফলের গাছে কীটনাশক ঔষধের ধারা দিবার পিচকারীও তাহারা ব্যবহার করিয়া থাকে। এইরূপে তাহারা শত সহস্র বিঘাব্যাপী ফলের বাগান তাহারা কীটাদির উপদ্রব হইতে রক্ষা করে। আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে যাটটি কৃষিপরীক্ষার ক্ষেত্র আছে; সেখানে কৃষির যন্ত্র পদ্ধতি উপায় তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষা প্রবর্ত্তন ও অনুসন্ধান করা হয় এবং সন্ধানের ফল কৃষিবিভাগের মারফতে দেশের কৃষকদের মধ্যে প্রচার করা হয়। এই সব কৃষি-পরীক্ষা ক্ষেত্রে সন্ধান করা হয়—(১) উদ্ভিদ ও পশুর শরীর-তত্ত্ব সম্বন্ধে নূতন তথ্য আবিষ্কার অথবা আবিষ্কৃত তত্ত্বের সত্যতা নিরূপণ ও তাহা কর্ম্মে প্রয়োগ ও ব্যবহার; বিভিন্ন উদ্ভিদের বৃদ্ধির ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় তাদের দেহের বিবিধ রাসায়নিক অবস্থা নির্ণয়; (২) এক জমিতে নানা ফসল ঘুরাইয়া উৎপন্ন করার উপকারিতা এবং কোন্ ফসলের পর কোন্ ফসল উৎপন্ন করিলে জমির উর্ব্বরতা নষ্ট ত হয়ই না বরং বৃদ্ধি হয় এবং ফসলও উৎকৃষ্ট ও প্রচুর পাওয়া যায়; নূতন গাছ বা ফসল বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া কেমন করিয়া দেশে আব্জানো যাইতে পারে, দেশের আবহাওয়া বিদেশী উদ্ভিদ কেমন অবস্থায় সহ্য করিয়া টিকিয়া থাকিতে পারে; (৩) ক্ষেত্রের মাটী ও জল বিশ্লেষণ করিয়া পরীক্ষায় গুণাগুণ নির্দ্ধারণ এবং ক্ষেত্রের মাটি ও জলে যে যে পদার্থ আছে তাহা কোন্ কোন্ ফসল ফলনের অনুকূল; (৪) স্বাভাবিক ও কৃত্রিম সার নির্ণয়, বিভিন্ন সারের রাসায়নিক বস্তু বিভাগ নির্ণয় বিভিন্ন ফসল ফলনের কোন্ সারের কিরূপ ক্ষমতা ও উপযোগিতা তাহা নির্দ্ধারণ; (৫) পশুখাদ্য ঘাস তৃণ উৎপাদন, বিভিন্ন তৃণের পুষ্টিকারিতা ও পশুদেহে উপকারিতা নির্ব্বাচন; (৬) গৃহপালিত পশুদের বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের বস্তুতত্ত্ব ও হজমের তারতম্য করা; (৭) ঘি মাখন ছানা ক্ষীর প্রস্তুতের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কার এবং ভাল জিনিষ সস্তায় উৎপাদন ও দেশ বিদেশে যোগান দিবার উপায় সন্ধান।

এই সব পরীক্ষাক্ষেত্রে কোন চাষী তার জমির মাটী ও জল অল্প দিয়া আসিলে সন্ধানীরা পরীক্ষা করিয়া বলিয়া দেবে তার জমিতে কোন্ কোন্ ফসল ফলিবে ভাল, কোন অবস্থায় কোন্ সার দিলে কোন্ ফসল ভাল হইবে ইত্যাদি।

আমেরিকার কৃষিবিভাগ অনেকগুলি দপ্তরে বিভক্ত। চারা আব্জানো দপ্তর নূতন ফসল আমদানী করিয়া দেশের

সম্পদ বৃদ্ধির জন্য সতত সচেষ্ট ; এই দপ্তরের কর্ম্মচারীরা বসুমতীর কোল খুঁজিয়া নূতন অথবা উন্নত আকার ও গুণের ফল ফুল তরকারী শস্য গাছ ঝোপ বাহির করে এবং নিজেদের দেশে সেই সব আজ্জাইতে চেষ্টা করে। অল্প দিন আগেও আমেরিকায় ধান হইত না, আমেরিকানরা বিদেশের চাল কিনিত ; কিন্তু চারা আজ্জানো দপ্তরের চেষ্টায় এখন আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল প্রদেশে প্রচুর ধান জন্মিতেছে ; টেক্সাস ও লুইসিয়ানা প্রদেশে ধেনো জমিতে উৎকৃষ্ট ধান্য উৎপন্ন হয়। এখন আমেরিকা নিজের ঘরের অভাব মিটাইয়া বিদেশে, এমন কি ধেনো দেশেও উদ্বৃত্ত ধান রপ্তানী করিয়া আনিতে পারিতেছে। ভারতবর্ষ মধ্যে সব চেয়ে প্রধান ধান্য উৎপাদনের দেশ ; ভারতের চাল বিদেশে রপ্তানী হইয়া মদের ভাঁটিতে যখন মাদকতার উপকরণ যোগায় তখন ভারতবাসীর পেটের ক্ষুধা নিবৃত্তির উপকরণের অভাবে যে অবস্থা হয় তাকে গভমেণ্ট না বলিলেও আমরা বলি দুর্ভিক্ষ ; এইরূপ অবস্থায় আমাদের অন্নপূর্ণা ভারতমাতা আমেরিকার কাছে ভিক্ষাপাত্র পাতিতে বাধ্য হন !

আমেরিকায় কয়েক বৎসর পর পর অনাবৃষ্টি হওয়াতে গমের ফসল নষ্ট হইয়া ক্ষতি হইতে থাকে ; তখন চারা আজ্জানো দপ্তরের চেষ্টা হইল সন্ধান করিতে হইবে পৃথিবীতে এমন কোনো জাতের গম আছে কি না যাহা অল্প জলেই জন্মিতে পারে। ভূমণ্ডল তল্লাস করিয়া বাহির করিল সাইবেরিয়া দেশে ডুমরুম নামে পরিচিত গম অল্প বৃষ্টিতেই ফলে। চারা আজ্জানো দপ্তরের কর্ম্মচারীরা সাইবেরিয়া হইতে আমেরিকায় ডুমরুম গমের বীজ রপ্তানী করিতে লাগিল। এবং অল্প দিনেই গমের ফসলের অনাবৃষ্টির ভয় দূর করিয়া ডুমরুম আমেরিকায় কায়েমী ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। এখন ডুমরুম চাষে বছরে নব্বই কোটি টাকা আমেরিকার চাষীরা লাভ করে।

চারা আজ্জানো দপ্তর নূতন চারা আমদানী করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকে না ; তারা গাছপালার রোগ সম্বন্ধেও ডাক্তারদের মতন সন্ধান ও প্রতিকার করে।

কোনো চাষার ক্ষেত্রের কোনো ফসলের কোন রকম পীড়া বা উপদ্রব উপস্থিত হইলে তারা ঐ দপ্তরে জানায় ; দপ্তরের বিশেষজ্ঞ প্রাজ্ঞেরা ঐ রোগ পীড়া বা উপদ্রবের স্বরূপ ও প্রকৃত কারণ পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করে ও তার প্রতিকারের উপায় চাষীকে জানাইয়া দেয়। এর জন্য চাষীর কাছে কোনো মূল্য লওয়া হয় না।

ফসলের শত্রু পোকার শত্রু-পোকার পালনের ক্ষেত্র—পাতি লেবুর গাছে এক রকম পোকা লাগিয়া ফসল নষ্ট করিত ; সেই পোকার শত্রু খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির হইল দক্ষিণ আফ্রিকার একরকম উকুন মাছি ; সেই মাছি দেশে লইয়া গিয়া পোকাদের লেলাইয়া তাদের বিনাশ করা হইতেছে। তুর্কীদেশে এক রকম পোকা আছে যারা ডুমুরের গাছে লাগিয়া ডুমুরের ফলন বেশী করে। চারা আজ্জানো দপ্তর তার সন্ধান পাইয়া সেই পোকা আমেরিকায় আমদানী করিয়া ডুমুর ফলনের সুবিধা বাড়াইয়া লইয়াছে। এক ক্যালিফর্ণিয়া দেশে বছরে ২০০।২৫০ মণ ডুমুরের ব্যবসা ফলাও করিয়া তুলিয়াছে।

কৃষিবিদ্যালয়ে দোহাল গাইএর তত্ত্ব অধ্যয়ন—কৃষি-বিদ্যালয়ে জীবতত্ত্ব শ্রেণীর ছাত্রেরা ঘোড়ার প্রকৃতি শিক্ষা করিয়া থাকে। ধোয়া বিশুদ্ধ কাপড় পরিয়া আমেরিকার গোয়ালিনীর দুধ দেওয়ার নিয়ম। পশুপালন দপ্তর দেশের পশুপালন ও পশুপক্ষীর ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধির তত্ত্বাবধান করে। গোরু ঘোড়া ভেড়া ছাগল শূকর মুরগী হাঁস ইত্যাদি পশুপক্ষীর জাতের উৎকর্ষসাধন, ভিন্ন ভিন্ন দেশের উৎকৃষ্ট বড় পশুপক্ষী আমদানী করিয়া দেশে তাদের বংশ বিস্তার, শ্রেষ্ঠ নির্ব্বাচন করিয়া করিয়া তাদের বংশানুক্রমে গুণের উৎকর্ষ সাধন, পশুর আহার বাস রোগ-চিকিৎসা ইত্যাদি এই দপ্তরের ব্যবস্থায় পরিচালিত হয়। কোথাও কোনো লোকের পালিত পশুপক্ষীর রোগ বা মারী হইলে এই দপ্তরে খবর পাঠাইলেই প্রাজ্ঞেরা গিয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন। দোহাল পশুদের পালনপ্রণালী প্রচার করাও এই দপ্তরের প্রধান কর্ত্তব্য। গোয়ালাদের ক্ষীর ছানা মাখন সর প্রস্তুত করিবার বৈজ্ঞানিক ও বিশুদ্ধ প্রণালী শিক্ষা দিবার জন্য অভিজ্ঞ লোকেরা গ্রামে গ্রামে টহল দিয়া বেড়ায় এবং কেহ নূতন ব্যবসা আরম্ভ করিবার ইচ্ছা করিলে তারা তাদের সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করে।

এইরূপ আরো অনেক রকমের দপ্তর দেশের কৃষক ও ব্যাপারীদের সাহায্যের জন্য কৃষিবিভাগের অন্তর্গত হইয়া আছে।

চাষী যদি আরো বেশী জমি জমা লইবার, জমির সার কিনিবার, মোটর লাঙ্গল ইত্যাদি কলের যন্ত্র কিনিবার, বা ঘোড়া গোরু কিনিবার ইচ্ছা করে এবং কোথাও সুবিধার সুদে টাকা কর্জ্জ করিতে না পারে তবে তারা গভর্মেণ্টের প্রতিষ্ঠিত কৃষিব্যাঙ্কে গেলেই কর্জ্জ পায়। দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এমন বারোটী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত আছে। এই সব ব্যাঙ্ক চাষীদের বছরে ৫।৬ টাকা সুদে টাকা কর্জ্জ দেয়: সেই টাকা ৪০ বছরের মধ্যে শোধ করিতে পারিলেই হইল। এইরূপে ব্যক্তির ইচ্ছা ও আগ্রহকে ফলবান করিতে দেশের গভর্মেণ্ট নানা প্রকারে সাহায্য করিয়া থাকেন।

বিজ্ঞান যেমন শিল্পসাধনার ভৃত্য হইয়া উঠিয়াছে, তেমনি কৃষিরও ভৃত্য হইয়াছে। কৃষি ও চাষ এখন প্রতিপদে বিজ্ঞানের নিপুণ সেবায় ও যত্নে ক্রমশঃ বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছে।

বিশুদ্ধ জড়বিজ্ঞান ও রসায়ন, জীবতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব, যন্ত্রবিজ্ঞান সমস্তই কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইতেছে এবং চাষীকে এই সব বিজ্ঞানের সাহায্যে কৃষি কার্য্য করিতে হয় বলিয়া তাকেও এই সব বিদ্যায় অভিজ্ঞ হইতে হইতেছে। জমির গুণাগুণ নির্ণয়ের জন্য ভূতত্ত্ব সারের জীবাণুর ও ফসলের কীটের প্রকৃতি জানিবার জন্য জীবতত্ত্ব, ফসলের উৎকর্ষ সাধনের জন্য উদ্ভিদ বিদ্যা ও রসায়ন, যন্ত্রপাতি চালনা ও মেরামতের জন্য জড়বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিজ্ঞান পশুপক্ষী পালন ও রক্ষার জন্য প্রাণীতত্ত্ব জানা কৃষক ও চাষীর পক্ষে একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। এখন আর চাষা বলিতে অসভ্য মূর্খ লোক বুঝায় না. চাষা এখন ডাক্তার উকিল ইঞ্জিনিয়ারের সমতুল্য সুশিক্ষিত ভদ্র ব্যবসাদার; চাষা হইতে হইলে বহু বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া হাতেহাতিয়ারে কাজ শিখিয়া তবে সিদ্ধ হইতে হয়। এখন আমেরিকায় প্রত্যেক কৃষি-বিদ্যালয়ের কলেজে স্কুলে নানা শিক্ষার সঙ্গে কৃষি শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, শত শত চাষা শিক্ষক অধ্যাপক হাজার হাজার ছাত্রকে চাষা হইবার শিক্ষা দিয়া থাকেন; এখন সমস্ত দেশে হাজার হাজার ছাত্র চাষের কাজ শিখিতেছে। চার বৎসর অন্তর এতগুলি চাষা ক্ষেতে ক্ষেতে ছড়াইয়া যায়।

আমেরিকার চাষারা এইরূপ শিক্ষার ও গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে ও সহযোগীতায় পৃথিবীর মধ্যে সবার সেরা চাষা হইয়া উঠিয়াছে. তাদের কাছে পৌছিতে পারে এমন চাষা কোন দেশেই দেখা যায় না। গোরু ঘোড়ায় টানা লাঙ্গল দিয়া চাষ একরকম উঠিয়াই গিয়াছে; এখন জমি চষা, বিধে দেওয়া, মই দেওয়া, আস নিড়োনো, ফসল কাটা, আটী বাঁধা, শস্য আছড়ানো, মাপা, বস্তাবন্দী, সব কলে চটপট হয়, সেই সব কল চলে হয় মটরে নয় কেরোসিন তেলের আগুনের তেজে। পাঁচ বৎসর আগে দেশে একটীও কলের লাঙ্গল ছিল না; কিন্তু এখন ৫ লক্ষ কল ক্ষেতে ক্ষেতে খাটিতেছে। কলের সাহায্যে ক্ষেতের উৎপন্ন ও কৃষকের লাভ শতগুণ বাড়িয়া উঠিয়াছে। কলের সাহায্যে চাষার কাজ লাভজনক যেমন হইয়াছে তেমনি সুখকর সহজ ও সম্ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

কৃষিবিদ্যালয়ে উদ্ভিদ বিদ্যা শিক্ষা—আমেরিকার চাষাদের এই সমূহ উন্নতি ও সুখসম্পদ হইয়াছে দুই কারণে—(১) চাষারা উন্নত কল্যাণকর উপায় বুঝিয়াছে ও তাহাই তৎপরতার সহিত অবলম্বন করিয়াছে, পুরাতনের বর্জ্জনে ও নূতনের অর্জ্জনে তাদের দ্বিধা হয় নাই, বাপপিতামহের আমলের জ্ঞানের জন্য মোহ তাদের অন্ধ করিয়া রাখে নাই; (২) গভর্ণমেণ্ট নানা রকমে সাহায্য করিয়া চাষাদের শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত অগ্রসর তৎপর করিয়া তুলিয়াছেন। সে দেশের গভর্ণমেণ্ট জানেন যে বৃহৎ সমাজদেহেরই সামান্য অবয়ব গভর্ণমেণ্ট সমগ্র কলেবরের তুলনায় অবয়ব নগণ্য। কলেবরের কল্যাণকর সেবার জন্যই অবয়বের আবশ্যকতা; অবয়ব কলেবরের ভৃত্য মাত্র, ভৃত্যের কর্ত্তব্য প্রভুর সেবা শুশ্রূষাই করা; কলেবরের উপর প্রভুত্ব ফলাইবার অধিকার তার নাই। গভর্ণমেণ্ট সমাজের সেবক ও ভৃত্য, সমাজের শাসক ও প্রভু নয়; নায়ক গভর্ণমেণ্ট সামাজিক হিতসাধনের উপায় মাত্র। দেশের জন্যই গভর্ণমেণ্ট, গভর্ণমেণ্টের জন্য দেশ নয়।

ভারতের গভর্ণমেণ্ট কি তাঁদের এই কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন? ("কৃষক")

একটী প্রশ্ন

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়কে কি উপায়ে সমস্ত দোষ-ত্রুটির হাত হইতে উদ্ধার করিয়া যথার্থ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পরিণত করিতে পারা যায় তাহাই স্থির করিবার জন্য যখন এদেশে 'স্যাডলার কমিশনে'র বৈঠক বসিল তখন শিক্ষার দিক দিয়া যাহাদের সংশ্রব ও জানাশুনা আছে তাঁহাদের অনেকের কাছে চিঠি গিয়াছিল অনেককেই জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান হইয়াছিল—এই সংস্কার কোনপথ ধরিয়া চলিলে বিশ্ব-বিদ্যালয়কে সকল দিক দিয়া কার্য্যকরী এবং পূর্ণতর করিয়া তুলিতে পারা যাইবে। তাঁহাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কোন ধারা অবলম্বন করিয়া চলিতে পরামর্শ দেয়; বিশ্ব-বিদ্যালয়কে ছাটিয়া কাটিয়া ছোট করা কি আরো বড় করিয়া

তোলা তাহারা সঙ্গত মনে করেন ইত্যাদি। এই প্রশ্ন সকলের ভিতর একটি প্রশ্ন ইহাও ছিল—নারীদের শিক্ষা সম্বন্ধে কোন পথ ধরিয়া চলা তাঁহারা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন ; মহিলাদের পক্ষে পুরুষের সহিত সমানভাবে শিক্ষা লাভ করার আবশ্যকতা আছে কিনা।

অন্যান্য প্রশ্ন সম্বন্ধে দেশের এই বাণী-সেবকেরা কি মন্তব্য পাঠাইয়াছিলেন এখানে তাহার আলোচনা অনাবশ্যক। কারণ স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের দেশের শিক্ষিতদের ধারণা কোন যায়গায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহারই সম্বন্ধে আজ আমরা একটু বিচার করিয়া দেখিতে চাই। বৈঠকের এই পরামর্শ প্রদানের নিমন্ত্রণে অধিকাংশ মনীষীরাই প্রায় এক বাক্যে বলিয়াছেন—এদেশে অন্ততঃ, পুরুষদের সহিত টক্কর দিয়া শিক্ষা বিষয়েও নারীদিগকে চলিতে দেওয়া উচিত নহে—শিক্ষার স্থলে নারীদের স্থান পুরুষদের সমান হওয়া অনুচিত। অনেকে আবার এমন কথাও বলিয়াছেন, ঘরই নারীদের শিক্ষার পক্ষে একমাত্র উপযুক্ত স্থান—তাহার বাহিরে তাহাদের জন্য যে ব্যবস্থা হইবে তাহাতে সমাজের উপকার অপেক্ষা অপকারেরই বেশী সম্ভাবনা। তাহাদিগকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেও ঘরের বাহিরে আনিতে চেষ্টা করিও না, তাহাতে সুফল ফলিবার আশা অনুমাত্রও নাই।

এদেশে এমন লোক খুব কমই আছেন, বিশেষতঃ শিক্ষিতদের ভিতর, যিনি মনে করেন যে, স্কুল কলেজের শিক্ষা আমাদের পক্ষে কল্যাণকর নহে—বর্ত্তমান বিশ্ব-বিদ্যালয় আমাদের বালকদিগকে উন্নতির পথে না টানিয়া সর্ব্বনাশের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে! আমাদের এ ধারণা যে সত্য তাহা প্রমাণের জন্য বেশীদূরে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। বাংলাদেশে প্রতি বৎসর যেরূপভাবে ছাত্রদের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্কুল কলেজের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা হইতেই তাহা অনায়াসে বোঝা যায়। তাহা ছাড়া কোনো স্কুল বা কলেজকে তুলিয়া দিবার জন্য কোনো কেন্দ্র হইতে কোনো প্রকার চেষ্টা হইলেও তাহাতে দেশের জন-গণ যেরূপ খাপ্পা হইয়া উঠে তাহা হইতেও এ সত্যের কতকটা আভাস মেলে। সুতরাং এই শিক্ষাটাকে যাঁহারা মুখের কথায় মন্দ বলেন তাঁহারাও যে ইহাকে পছন্দ করেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। সুতরাং ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে সকলেই নিঃসন্দেহ—এ কথাটা যদি আমরা সত্য বলিয়া মানিয়া লই তবে বোধ হয় কাহারও উপর অবিচার করা হইবে না।

এ কথাতো ঠিক যে, জ্ঞান বা শিক্ষা যে দরের জিনিষ, তাহা কোনো ব্যক্তি বা শ্রেণী বিশেষের পক্ষে উপকারী এবং কোনো ব্যক্তি বা শ্রেণী-বিশেষের পক্ষে অপকারী এরূপ হইতে পারে না, এ-সব বিষয়ে পুরুষের পক্ষে যাহা কল্যাণকর, নারীদের পক্ষে তাহা কল্যাণকর হইতেই হইবে। সুতরাং ইহারা যখন বলেন পুরুষকে এই ধরণের শিক্ষা দেও তাহাতে আপত্তি নাই ; কিন্তু নারীকে দলে টানিও না, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ হইবে, তখন তাহাদের সেই সর্ব্বনাশের মাত্রা বুঝিয়া উঠা সহজ হইয়া পড়ে না। একটা দৃষ্টান্ত লইয়া কথাটা বুঝিতে চেষ্টা করা যাক।

একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে স্ত্রীলোকের চিকিৎসা স্ত্রীলোকের দ্বারাই হওয়া উচিত মেয়েদের পক্ষে পুরুষ ডাক্তার অপেক্ষা মেয়ে ডাক্তারই ভালো। কিন্তু মেয়েদিগকে ডাক্তার করিয়া তুলিতে হইলে ঘরে বসিয়া তাহা যে সম্ভব নয় তাহা কাহারো অবিদিত নাই। ডাক্তারিশ পুঁথিগত বিদ্যাটা না হয় বাড়ীতে বসিয়া শিক্ষা করা চলে কিন্তু তাহার অস্ত্রাদি চালনা শিক্ষার জন্য, অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য হাঁসপাতালে যাওয়া অপরিহার্য্য। যাঁহারা বলেন ঘরের বাহিরে যে শিক্ষা তাহার প্রয়োজন মেয়েদের নাই, তাঁহারা যে ভুল করেন তাহা এই একটি মাত্র উদাহরণ হইতেই বেশ বোঝা যায়। এইরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রের উদাহরণের অভাব নাই। "সঞ্জীবনী"

নীরব পাঠ

পুস্তক পাঠে কিঞ্চিৎ অভ্যস্ত হইয়া আসিলে আর এক প্রকার দ্রুত পাঠের অনুশীলন দেওয়া যাইতে পারে। এ অনুশীলন আরও একশ্রেণীর উপরে উঠিলে পর দিলে ভাল হয়। বোর্ডে পরিষ্কার করিয়া একটি ছত্র লিখিয়া নিমেষ মাত্র দেখিবার সময় দিতে হইবে। ছাত্রগণকে খুব মনোযোগের সহিত বোর্ডের দিকে চাহিয়া থাকিতে বলিয়া, ঢাকা কাগজখানির প্রান্ত ধরিয়া একবার তুলিয়া অমনি ছাড়িয়া দেওয়াই ইহার উপায়। তাহার পর ছাত্রেরা কি পড়িল, তাহা খাতায় লিখিয়া দেখাইবে।

প্রথম প্রথম এক ছত্র হইতে আরম্ভ করিয়া কিছুকাল

পরে দুই, তিন অথবা চারি ছত্র পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া দেখা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। ছাত্রদের মধ্যে এমন মেধাবী কেহ থাকিতে পারে যে, এক নিমিষে তিন চারি ছত্র পর্য্যন্ত পড়িয়া ফেলা তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে। এমন কেহ থাকিলে তাহার সে শক্তি পরিস্ফুট করিবার অবসর দেওয়া সর্ব্বোতোভাবে কর্ত্তব্য।

স্কুলে প্রত্যহই এইরূপ নীরবপাঠের অনুশীলন করা সম্ভব নহে। সুবিধামত সপ্তাহে দুই একদিন ইহার জন্য সময় নির্দ্দিষ্ট থাকা বাঞ্ছনীয়। অধিকন্তু এ পাঠের জন্য পূর্ণ ঘণ্টারও দরকার হয় না। রচনা বা অন্য কোন বিষয়ের ঘণ্টার এক অংশ মাত্র নীরব পাঠের জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখা যাইতে পারে। দুই তিন বৎসর নীরব পাঠ, অনুশীলনের পর মধ্যে মধ্যে রচনার ঘণ্টায় পাঠ্যেতর কোন সহজ পুস্তক হইতে তিন চারি পৃষ্ঠার একটি গল্প বা দুই কি আড়াই পৃষ্ঠার একটি প্রবন্ধ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নীরবে পাঠ করিতে দিয়া, পরে তাহার সার সঙ্কলন করিতে দেওয়া যাইতে পারে। ইতিহাস পাঠ কালেও মধ্যে মধ্যে নীরব পাঠের চর্চ্চা করা যায়।

হাই স্কুলের চতুর্থ শ্রেণী হইতে পাঠ্যেতর পুস্তক পাঠ করিবার জন্য ছাত্রদিগকে উৎসাহিত করা কর্ত্তব্য। শিক্ষা-তত্ত্ববিদগণের মতে এই সময়ে ছাত্রদের স্বাধীন ভাবে ব্যবহার করিবার জন্য স্বতন্ত্র একটি লাইব্রেরী রাখা প্রয়োজন। তাহাতে নানা বিষয়ের পুস্তক থাকিবে, এবং ছাত্রদের যাহার যে বিষয়ে মন আকৃষ্ট হয় সেই বিষয়েরই পুস্তক পাঠ করিতে দিতে হইবে। ইহাতে কোন ছাত্রের মানসিক প্রবণতা কোন্‌দিকে তাহাও বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হয়। এই ক্ষেত্রেই নীরব পাঠের বিশেষ উপযোগিতা ও উপকারিতা দেখিতে পাওয়া যাইবে।

নীরব পাঠ সম্বন্ধে একটি কথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। কে কি পড়িল তাহা ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া না দেখিলে নীরব পাঠের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। এরূপ পরীক্ষার অনেক উপায় আছে; তাহার দুই একটি নিম্নে বিবৃত করা গেল।

(১) নির্দ্দিষ্ট বিষয়টি পাঠ করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট সময় শেষ হইয়া গেলেই প্রত্যেক ছাত্র পঠিত বিষয়ের সার সঙ্কলন করিবে। এই কার্য্যের জন্য প্রত্যেককে একখানি করিয়া আলগা কাগজ পূর্ব্ব হইতেই দিয়া রাখিতে হইবে। সার লেখা হইয়া গেলে শিক্ষক কাগজগুলি সংগ্রহ করিবেন এবং সংশোধন করিয়া দিবেন। কাগজে ছাত্রেরা নাম লিখিয়া দিবে।

সার সঙ্কলনের পাঠের জন্য ইতিহাস বা ভুগোলের (বিশেষতঃ ভ্রমণবৃত্তান্ত) বিবরণমূলক পাঠ্যেতর কোন সহজ পুস্তক দেওয়াই প্রশস্ত। ইহাতে ছাত্রদিগের তথ্য-চয়ন কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হইতে পারে।

(২) পাঠ হইয়া গেলে শিক্ষক পঠিত বিষয়ের উপর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন। প্রশ্নগুলি এমন হওয়া উচিত যে, এক একটি (বা নিতান্ত পক্ষে দুইটি) শব্দই তাহাদের উত্তর হয়। ছাত্রদিগের হাতে লম্বা কাগজের টুক্‌রা দেওয়া হইবে এবং তাহার শীর্ষে স্ব স্ব নাম এবং বামপার্শে ১ হইতে ১৫ কিম্বা ২০ পর্য্যন্ত নম্বর লিখিয়া লইবে। শিক্ষক যেমন প্রথম প্রশ্নটি বলিবেন, ছাত্রেরা অমনি ১এর স্থানে তাহার উত্তরটি লিখিবে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর ২এর স্থানে লিখিবে, ইত্যাদি। প্রশ্নের উত্তর লিখিবার জন্যও সময় নির্দ্দিষ্ট থাকিবে, এবং সে সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলেই আর একটি প্রশ্ন বলা হইবে। ক্ষিপ্রতা বৃদ্ধির জন্যই সময় নির্দ্দেশ বিশেষ আবশ্যক। প্রশ্ন শেষ হইলে শিক্ষক কাগজ সংগ্রহ করিবেন, এবং দেখিয়া নম্বর দিতেও পারেন।

প্রথম প্রথম এরূপ অনুশীলনের ভাল ফল নাও পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু ক্রমে অভ্যাসের ফলে ছাত্রেরা বেশ সন্তোষজনক উত্তর দিতে সমর্থ হইবে।

এ প্রণালী অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীতে যেখানে নীরব পাঠের জন্য পুস্তকাদি দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে, তাহারই উপযুক্ত।

"শিক্ষক"

পাটের চাষ খুব বেশী করিও না

আজ তিন বৎসর হইল আমি সঞ্জীবনীতে লিখিয়াছিলাম যে, পাটের চাষের অতি বৃদ্ধি হওয়াতে দেশের সর্ব্বনাশ হইবার উপক্রম হইয়াছে।

১। গরুর অনাহার

পাটের পাতা, ফুল, আঁশ, ইহার কিছুই গরুর খাদ্য নয়; সুতরাং ধানের জমিতে যে পরিমাণ পাটের চাষ হইয়াছে, সেই পরিমাণ ধানের খড় এবং ঘাসের গাভীর আহার

কমিয়াছে। পল্লীগ্রামে দশ কি বার আনা জমিতে পাট চাষ হয়; অবশিষ্ট ছয় কি চারি আনা জমিতে ধানের চাষ হয়। সুতরাং পাটের চাষ হওয়ায় গবাদির খাদ্য দশ আনা কমিয়া গিয়াছে। খড়, বিচালি কম হইয়াছে। ধান ভানিয়া চাউল করিলে কুড়া হইত। পাট বিক্রী করিয়া তৈয়ারী চাউল খরিদ করিয়া খাওয়ার প্রথা হইতে গরুর খাদ্য চাউলের কুড়া দুর্লভ হইয়াছে। ইহাতে পল্লীগ্রামে গাভীর দুধের অভাব এবং চাষের বলদের খাদ্যের অভাব অত্যন্ত উৎকট হইয়া পড়িয়াছে।

২। গোচরণ ভূমির অভাব

পাটের চাষে প্রথম প্রথম বেশ লাভ হইত। তাহাতে চাষী গ্রামের গোচর জমি পর্য্যন্ত জমিদারের নিকট বন্দোবস্ত করিয়া পাট চাষ করিতে আরম্ভ করে। এখন আর পাটের চাষে তেমন লাভ নাই; গোচরণ জমিতে পাটের চাষ বন্ধ করিয়া তাহা পুনরায় গোচর ভূমিতে পরিণত করিতে জমিদার ও প্রজা উভয়েই বাধা দিতেছেন।

৩। ধানের চাষ ও চাউলের আমদানী

ধানের চাষ কমিয়া গিয়াছে। এজন্য ধানের দর অত্যন্ত বাড়িয়াছে। বিশেষতঃ বিদেশে চাউল রপ্তানি হইতেছে, এজন্য জাহাজ ও রেলওয়েব প্রচুর লাভ হইতেছে। চাউল আমদানীকারী মহাজনেরা অবস্থা বুঝিয়া হঠাৎ চাউলের দর বাড়াইতেছে; তাহার উপর প্রজাদের কোন হাত নাই। প্রধান খাদ্য—প্রধান জীবনোপায় চাউলের জন্য বাঙ্গালার প্রজারা বিদেশীদের অধীন হইয়া পড়িতেছে। আবার পাটের কলের দালালেরা একমত হইয়া পাটের দাম যতদুর সম্ভব কমাইতেছে। এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া প্রজার প্রাণে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা হইয়াছে।

৪। একার্দ্ধ জমিতে পাটের চাষ হউক

এই সকল আশঙ্কা করিয়া আমি লিখিয়াছিলাম যে, ধানের চাষ অবহেলা করিয়া যেন পাটের চাষ না করা হয়। যে সকল জমিতে ধান ও পাট উভয়ের চাষ হইতে পারে, এমন জমির অর্দ্ধাংশে পাট চাষ হউক এবং অপর অংশে ধান চাষ হউক; তাহা হইলে কোন ক্ষতি হইবে না। দশ বিঘা জমিতে পাট চাষ করিয়া যদি ৫০/ মণ পাট হয়, এবং তাহা ৮৲ টাকা দরে বিক্রী হয়, তবে চাষী ৪০০৲ টাকা পাইবে। আর আট বিঘা জমিতে ৪০/ মণ পাট উৎপন্ন করিলে পাটের দর নিশ্চয়ই ১০৲ টাকার বেশী পাওয়া যাইবে। ইহার উপর দুই বিঘা জমির চাষের খরচ বাঁচিয়া যাইবে এবং তাহাতে ধান উৎপন্ন হইতে পারে। এই সিধা কথা সকল চাষীতেই বোঝে। কিন্তু সকলেই মনে করে যে, আমি ভিন্ন আর সকলেই পাটের চাষ কম করুক, আর পাটের দর বাড়ুক; কিন্তু আমি পাটের চাষ কম করিব না; তাহা হইলে বেশী দরে পাট বিক্রী করিয়া লাভ বেশী করিব।” এই প্রকার ভাবিয়া সকলেই পাটের চাষ বাড়াইতেছে এবং ধানের চাষ কমাইতেছে। তাহাতে এই দুর্দ্দশা হইয়াছে যে, পাট আর বিক্রী হয় না; চাউল আর কিনিতে পাওয়া যায় না।

প্রত্যেক জিলার প্রজারা সকলে মিলিয়া যদি ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করে যে, জমির একার্দ্ধের বেশীতে ধান এবং অপরার্দ্ধের কমেতে পাট চাষ করিবে, এবং এই প্রতিজ্ঞানুযায়ী কাজ করে, তবেই পাটের উচ্চদর বজায় থাকিতে পারে, ধান সুলভ হইতে পারে, চাষের বলদ সতেজ হইতে পারে এবং গাভী আবার পয়োধারা বর্ষণ করিতে পারে।

৫। আবার দাদন-রাক্ষসীর মুখ ব্যাদন

যে প্রকারে পরিশ্রম ও প্রাণপণ করিয়া বাঙ্গালাদেশের জমিদারেরা “নীলকর, বিষধর, বিষপোকামুখ” প্রজার পরম শত্রুকে তাড়াইয়া প্রজাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, তাহা পল্লীগ্রামের জমিদারদের অনেকেই অবগত আছেন। নীলকরের দাদন তাঁহাদের অন্যতম বিষদন্ত ছিল। এখন পাটের দাদন এবং ধানের দাদন এমন কি যে কোন ফসল উৎপন্ন হয়, তাহার দাদন প্রদানের নিয়ম প্রচলিত হইতেছে। এই দাদনের লোভে পড়িয়া প্রজা উৎপন্ন ফসলের পূরা মূল্য দাদনকারীর নিকট পায় না। ইহাতে মোটের উপর অন্ততঃ টাকায় সিকি ক্ষতি হইতেছে। জমিদারেরা এখন সহরে বাস করিতেছেন। তাঁহাদের পিতা পিতামহ প্রজার মা ও বোনকে নিজের মা ও বোন মনে করিয়া তাহাদের সম্ভ্রম রক্ষা করিতেন। এখন বিদেশগত জমিদারেরা আমোদ আহ্লাদের ও বিলাস পূরণের জন্য নগদ টাকা চাহেন, এবং তাঁহাদের নগরের তহশীলদারেরা দাদন গ্রহণ করিতে বরং প্রজাদিগকে উৎসাহ দেন, কারণ তাহা হইলে আশু খাজানা আদায়

হইতে পারে। যাহারা ইংরেজী শিখিয়াছেন, তাঁহারা তো আর গ্রামের দিকে মুখ ফিরাইয়া চান না; গ্রামবাসী কৃষকদের কোন সংবাদ রাখেন না। সুতরাং পাটের দাদন জলৌক র ন্যায় প্রজাদিগের রক্ত শনৈঃ শনৈঃ শোষণ করিতেছে। প্রতি গ্রামে মাড়োয়ারী মহাজনেরা দাদনের টাকা লইয়া ফিরিতেছে।

৬। চাউল খরিদ করিয়া খাওয়া দারিদ্র্যের এক প্রধান কারণ

এক মণ ধান ভানিলে ॥৬ সের চাউল হয়, এবং /৬ সের চাউল লাভ থাকে। তা ছাড়া গবাদির খাস্থ কুড়া পাওয়া যায়। এক গৃহস্থের ঘরে যদি পাঁচটি পোষ্য থাকে, অন্ততঃ ১/ মণ চাউল তাহার প্রতি মাসে আবশ্যক হয়। ধান ভানিয়া খাইলে অন্ততঃ আধ মণ ধান লাভ থাকে। সুতরাং প্রতি বৎসর প্রত্যেক গৃহস্থের ৬/ মণ চাউল অথবা আজকালকার বাজার দরে ৫০।৬০ টাকা ক্ষতি হইতেছে। বাঙ্গালাদেশে ৪॥ কোটি লোকের মধ্যে ৩ কোটি লোক ধানচাষী ও পাটচাষী। যদি ইহাদের মধ্যে ১ কোটি লোক ধান না ভানিয়া বর্ম্মা হইতে আমদানী চাউল খায়, তাহা হইলে তাহাদের অর্থ ক্ষতি ১০ কোটি টাকার উপর হয়। পাটচাষের প্রথম অবস্থায় এই ক্ষতি পূরণ হইয়া যাইত। এখন পাটের দর প্রায় মাটির মত হইয়াছে, পাটচাষের খরচও পোষায় না। আর চাউলের দর তিন গুণ এবং ধান ভানিয়া নিজের প্রয়োজনীয় চাউল না করিলে আর চাষীদের নিজের এবং তাঁহাদের বলদ ও গাভীর দুই বেলা উদরপূরণ করিবার সম্ভাবনা নাই।

৭। দেশব্যাপী চাষীর একতা কি সম্ভব?

এই বাঙ্গালা দেশে গ্রামে গ্রামে জিলায় জিলায় অতি সামান্ত কারণে দলাদলি চলিতেছে। সমগ্রবাঙ্গলার চাষীরা সকলেই অর্দ্ধেকের বেশী জমিতে ধান এবং অর্দ্ধেকের কম জমিতে পাট চাষের নিয়ম করিবে, তাহা আশা করা যায় না। কিন্তু তাহা না করিলেও দেশের জমিদার ও প্রজা কাহারও রক্ষা নাই। পূর্ব্ববৎসরের পাট কত সঞ্চিত আছে, তাহা প্রজাদিগকে কে বলিবে? পৃথিবীর কোথায় কত পাট আগামী বৎসর আবশ্যক হইবে তাহা প্রজারা কি করিয়া জানিবে? পাটের উচ্চদর কি করিয়া করা যায়, তাহা কে চাষীদিগকে বলিয়া দিবে? এখন যে কৃষিবিভাগ হইয়াছে তাহাদের উচ্চ কর্ম্মচারীরা ইংরেজ, যাহাতে চাষ বাড়ে পাটের কলের মালিকদের অধিক লাভ হয় তাহার জন্য তাঁহারা চেষ্টা করেন। প্রজারা যাহাতে পাট ধান প্রভৃতি সকল প্রকার ফসল চাষ করিয়া সুখসচ্ছন্দে থাকিতে পারে, তৎপ্রতি তাহাদের তেমন দৃষ্টি নাই। আমাদের জমিদারেরা এবং শিক্ষিত ব্যক্তিরাও প্রতি জিলায় অন্ততঃ ২০।২৫ জন মিলিয়া একটা সভা বা সমিতি করিয়া, প্রজাদিগকে কি শিক্ষাবুদ্ধি দিতে পারেন না? প্রজারা অনেকেই নিরক্ষর যাহারা লিখিতে পড়িতে পারে তাহারা সংবাদ পত্র বা পুস্তক পড়ে না; সুতরাং প্রজাদিগকে কোন সংবাদ জানাইতে হইলে ইংরাজী বা বাঙ্গালা কাগজে প্রবন্ধ প্রকাশিত করিলেই যথেষ্ট হইবে না। প্রত্যেক গ্রাম্য সমিতি যদি এই বিষয়ে উদ্যোগী হয়েন, তবেই কল্যাণ হইতে পারে। এখন কৃষিবিভাগ হইতে পাট, চাউল, তিল, সরিষা প্রভৃতি ফসলের যে সংবাদ প্রতি মাসে বা ছয় মাসে প্রকাশিত হয়, চতুর বণিক্ ও সওদাগরেরা তাহা জানিয়া এবং সমবেত হইয়া তাঁহাদের নিজের স্বার্থ সাধন এবং প্রজার অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। ঐ সকল সংবাদ তো আর প্রজারা জানে না। তাহাদিগকে তাহা জানায় এবং বোঝায়, এমন লোকও তো এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। নব প্রতিষ্ঠিত গ্রাম্যসমিতি কি প্রজাদিগকে বৎসর বিশেষে কম পরিমাণে পাটচাষ করিবার অথবা অধিক পরিমাণে ধান চাষ করিবার সুমতি দিতে পারেন? 'সঞ্জীবনী'

১০৬০ দোকানের মালিক

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে অতি উচ্চ উপাধিধারীরাও অন্ন সংস্থান করিতে পারিতেছেন না। কিছু দিন অগ্রে আমাদের দেশহিতৈষী চিন্তাশীল সার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, কলিকাতা ইউনিভারসিটী ইনিষ্টীটিউটে ২।৩ দিন এই সকল যুবকদিগের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, "বর্ত্তমান সময়ে ওকালতী বা মোক্তারী, কেরাণীগিরী, ডাক্তারী, কলেজ স্কুলের অধ্যাপক বা মাষ্টারের দ্বারা আর জীবিকা নির্ব্বাহ হইবে না। এখন অন্য উপায় দেখিতে হইবে। তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, বর্ত্তমান সময়ে যুবকদিগকে চাষ-বাস, ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা করিতে হইবে, বা আমাদের দেশের ব্যবহার্য্য জিনিষ বিদেশের মুখাপেক্ষা না করিয়া নিজের দেশে প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহাতে মানাপমান জ্ঞান করিলে চলিবে না। সামান্য হইতে বড়

হাতে হইবে। প্রথমে অর্থ-লালসা পরিত্যাগ করিয়া শিক্ষা ও দীক্ষার ভিতর নিজকে নিয়োজিত এবং সত্য ও ন্যায়ের উপর চরিত্রকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আমাদের দেশে সুবর্ণ বণিক জাতি ব্যবসায় বাণিজ্য দ্বারা এক সময়ে ধন-কুবের হইয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই জাতি আজ তাহা পরিত্যাগ করিয়া কেরাণীগিরী অবলম্বন করিয়াছেন। বালুকাময় মরুভূমি বিকানীর হইতে মাড়োয়ারী জাতি একটি লোটা ও এক গাছি দড়ি সম্বল করিয়া এই ভারতের সর্ব্ব স্থানে ধনশালী হইয়া যাইতেছেন। কলিকাতার সহরের মাড়োয়ারীরা বস্ত্র ও চিনি প্রভৃতির ব্যবসায় দ্বারা প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া, কলিকাতার বাটী সকল দশগুণ মূল্যে ক্রয় করিতেছেন। তাই অতীতের প্রবাদ বাক্য "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী"—বাণিজ্য ব্যবসায় ভিন্ন দেশের মঙ্গল কখনও হইবে না।

ক্যানেডা দেশীয় ১৭ বৎসর বয়স্ক যুবক কি প্রকার সামান্য কাজ অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান সময়ে এক হাজার যাইট খানা দোকানের অধ্যক্ষ হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন তাহার জীবনী পাঠ করিলে সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইবেন।

হারবার্ট টি পারসন ক্যানেডা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহার বয়স ৪৮ বৎসর। তাহার পিতা তৈল ব্যবসায়ে অনেক টাকা লোকসান করিয়াছেন দেখিয়া, পারসন ১৭ বৎসর বয়সে কার্য্যানুসন্ধানে বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমে ১২ টাকা বেতনে এক চাকরী পাইবার ইচ্ছায় সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া দিলেন।

"একটি উদ্যমশীল যুবক হিসাবপত্র ও সাধারণ কেরাণীগিরী কার্য্যে সপ্তাহে ৭৫ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে এমন একটি চাকরী চায়।"

উলওয়ার্থ নামক একটি দোকানদার এই বিজ্ঞাপনটি পাঠ করিয়া, পারসনকে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য পত্র লিখিলেন। পারসন তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। তাহাতে উলওয়ার্থ সাহেব তাহাকে ২৫ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন। তাহাতে পারসন ৩৬ টাকার কমে কাজ করিব না"—বলিয়া চলিয়া গেলেন। উলওয়ার্থ পারসনের আকার প্রকারের ভিতর একটি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা আছে দেখিয়া সেই যুবকের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাহাকে পুনরায় আসিবার জন্য পত্র লিখিলেন। পারসন্ তাঁহার সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ করিলে, উলওয়ার্থ তাহাকে সপ্তাহে ৩৬ টাকা দিতে স্বীকার করিয়া, তাহাকে কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। যে সময়ে উলওয়ার্থ পারসনকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন সেই সময়ে উলওয়ার্থের ১৪ খানি দোকান ছিল এবং আফিসের কার্য্যনির্ব্বাহার্থে দুইজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোক ছিল। উলওয়ার্থ দিবারাত্র এই দোকানগুলির জন্য পরিশ্রম করিতেন।

পারশন্ দিবসে ১৪ ঘণ্টাকাল কার্য্য করিয়া সপ্তাহ শেষে বড়ই নিরুৎসাহ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, এই কার্য্য হইতে অপসৃত হইব, না এই কার্য্য করিব। কারণ পারসন সেই সময়ে ইহা অপেক্ষা অল্প পরিশ্রমের একটি কার্য্য পাইয়াছিলেন। অনেক চিন্তা করিয়া পারসন সাহেব স্থির করিলেন যে উলওয়ার্থের কার্য্যে আমি চিরজীবন কাটাইব।

যে পারসন দিবসে ১৪ ঘণ্টা ব্যাপী কঠিন কেরাণীপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, আজ সেই পারসন, উলওয়ার্থের মৃত্যুর পর, আমেরিকার উলওয়ার্থ কোম্পানীর প্রেসিডেণ্ট হইয়া এক হাজার যাইট্ খানি দোকান পরিচালনা করিতেছেন।

পাঠক দিগের অবগতির জন্য উলওয়ার্থ কোম্পানীর ১৯১৯ সালের জিনিষ বিক্রয় এবং লাভের তালিকা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

১৯১৯ সাল—ক্রেতা সংখ্যা ১০০,০০,০০০০০, যত জিনিষ বিক্রয় হইয়াছে ২,০০,০০০,০০০০; গড়ে প্রত্যেক জিনিষের দাম ৵১০, প্রত্যেক জিনিষের গড়ে লাভ এক পয়সা, সর্ব্বসমেত লাভ ৩০,০০০,০০০, কোটি টাকা, এক হাজার যাইট খানি দোকানে ৩৫,০০০ কর্ম্মচারী কর্ম্ম করে।

১৯১৯ সালে বিক্রয়ের তালিকা।

মিঠাই বিক্রয় ১৮ কোটি সের। মোজা গেঞ্জি প্রভৃতি বিক্রয় ৫,০০, ০০,০০০ জোড়া। রুমাল বিক্রয় ৫,৪০,০০,০০০ খানা। দেশলাই বিক্রয় ৪,২০,০০,০০০ বাক্স। গানের কাগজ ২,০০,০০,০০০ তা। সাবান, ১,৫০,০০,০০০ খানা। নেকটাই বিক্রয় ৬২,৫০,০০০টী।

"সঞ্জীবনী"

বিগ্রহ রক্ষা

(১)

কল্যাণরূপা কল্যাণী—সন্ন্যাসীর জীবনের একমাত্র অবলম্বন!

ছোট মার্জ্জিত মন্দিরটি—তার মাঝে দেবতার বিগ্রহ; পূজক তার সন্ন্যাসী; পূজা আয়োজনকারিণী জ্যোতির্ম্ময়ী—কল্যাণী!

মন্দিরের সম্মুখে ক্ষুদ্র অপরিসর ভূমিখণ্ড,—কল্যাণীর লীলাক্ষেত্র। প্রতি প্রভাতের সঙ্গে সহস্র পুষ্প মন্দিরবাসী বিগ্রহের পূজার জন্ম ফুটিয়া উঠে—আর কোণের দাড়িম্ব বৃক্ষের ডালের উপর বসিয়া দোয়েল, শ্যামা পূজার আয়োজন-সঙ্গীত গান করে!

কিছুদূরে ছোট সরোবর;—তটভূমি তার উপল খণ্ডে পরিপূর্ণ! প্রস্তরে প্রস্তরে বাঁধিয়া কোন্ অতীত যুগে কে এই সরোবর নির্ম্মাণ করিয়াছিল! পর্ব্বতগাত্র হইতে একটী ক্ষুদ্র সলিল-রেখা নামিয়া আসিয়া সরোবরে মিশিয়াছে! অপর পার্শ্বে আর একটী সলিল-রেখা,—সেই পথে সরোবরের অতিরিক্ত জল বাহির হইয়া যায়—এমনি নির্ম্মাণ-কৌশল!

কল্যাণী ফুল তোলে—পূজার আয়োজন করে, আর অবসর সময়ে সরোবরের সোপানে বসিয়া দূর পর্ব্বতগাত্রে মেঘের খেলা দেখে! নীলাকাশ—মধুর বাতাস, আর ফুলের সুবাস, তার প্রাণে একটা স্বপ্নলোকের কাহিনী জাগাইয়া তোলে!

সন্ন্যাসী মন্দিরবাসী দেবতার সেবক! এক নূতন প্রণালীতে সে তার দেবতার অর্চ্চনা করে! পূজা তার মন্ত্রবিহীন;—কল্যাণীর সাজানো পূজার ফুল সম্মুখে স্তূপীকৃত পড়িয়া থাকে,—আর তার অশ্রুর প্রবাহ, আরাধ্য দেবতার চরণোদ্দেশে নামিয়া আসে! তখন তার আননশ্রীতে হোমাগ্নি নিষ্প্রভ হইয়া যায়,—মন্দির উজ্জ্বল হইয়া উঠে! ধ্যানান্তে মুগ্ধ সন্ন্যাসী সেই চন্দন-চর্চ্চিত ফুলের রাশি দেবতার পায়ে ঢালিয়া দেয়! কল্যাণী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পূজা দেখে—আর পূজান্তে মন্দিরবাসী দেবতাকে, আর পিতাকে প্রণাম করে! এমনি পূজায় প্রতিদিন কাটে! তবু নিত্য নব অনুরাগে কল্যাণী পূজার পুষ্প চয়ন করে;—আর ভক্তিতন্ময় সন্ন্যাসী তার দেবতার অর্চ্চনা করে!

(২)

সে প্রথম দিন শিকারীর বেশেই আসিয়াছিল! উজ্জ্বল প্রতিভাদীপ্ত যুবক! তীক্ষ্ণ দীপ্ত চক্ষু—দৃপ্তগরিমায় উজ্জ্বল,—তবু কি সংযত-নম্র! শিকারী মন্দিরের অতিথি! সন্ন্যাসী বাহির হইয়া আসিল; চক্ষু ভরিয়া সেই দীর্ঘাকৃত বীরবপু দেখিয়া লইল! তারপর সাগ্রহে তার যুগলহস্ত ধরিয়া তাহাকে মন্দিরের মধ্যে লইয়া গেল! নির্ব্বাক কৌতূহলে যুবক কোনো বাধা প্রদান করিল না!

কল্যাণী বুঝিল, এ কোন অতিথি! সে ফিরিয়া গিয়া সোপান শিলায় বসিয়া বসিয়া দেখিতেছিল,—পর্ব্বতের চূড়ায় এতটুকু মেঘ অস্তগামী সূর্য্যের কিরণে কেমন জ্বলিতেছে!

প্রভাতে শিকারী চলিয়া গেল! বলিয়া গেল,—"আমি সপ্তাহান্তে আবার আসিব, আপনার এ পূজা আবার দেখিব!"

কল্যাণী বলিল—"বাবা"—

—"কেন, মা"—

"ইনি কে, বাবা?"

"আশা ও ভরসা!"

কল্যাণী কথা কহিল না! পূজার নির্ম্মাল্য তুলিয়া লইয়া কবরীতে ধারণ করিল। একবার মনে মনে ভাবিল,—

"আশা ও ভরসা, কার?"—

কল্যাণী কাহারো নিকট প্রশ্নের উত্তর চাহে নাই—পাইলও না!

(৩)

সপ্তাহান্তে শিকারী আবার আসিয়াছে! সরোবরতীরে অশ্ব বাঁধিয়া রাখিয়া, সে সোপান-শিলার দিকে চাহিল! সেখানে কল্যাণী ছিল না! সন্ন্যাসী শিকারীর অপেক্ষায় বসিয়া আছে! শিকারীকে দেখিয়া তাহার কুঞ্চিত ললাটদেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল!

"আসুন"—সন্ন্যাসী কহিল।

"মন্দিরে চলুন, আপনার পূজা দেখিয়া যাইব!"

"পূজার প্রধান পুরোহিত আসিয়াছেন; আমি আর পূজা করিব না!"

"আপনিই প্রধান পুরোহিত" শিকারী মৃদুস্বরে কহিল!

সন্ন্যাসীর ইঙ্গিতে কল্যাণী পূজার আয়োজন করিতেছিল! শুধু রাশি রাশি পুষ্প আর চন্দন! আরতির জন্য ধূপ-দানীতে—ধূপ,গুগ্‌গুল, কুঙ্কুম, চন্দন চুয়া, পুড়িয়া পুড়িয়া যেন আত্মনিবেদন করিতেছিল। সহজ সুন্দর আয়োজন!—প্রতি কার্য্যে পূজা আয়োজনকারিণীর নিপুণ হস্তের সেবা চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছিল!

সন্ন্যাসীর পূজা—শুধু ধ্যান আর ধারণা!—অশ্রুপ্লাবিত নয়নে সন্ন্যাসী তাহার আরাধ্য দেবতার করুণ সুন্দর মুখের পানে চাহিয়া আছে! সন্ন্যাসীর দক্ষিণে গললগ্নীকৃতবাসা কল্যাণী,—দেবতার মুখের জ্যোতিঃ যেন তাহার প্রেম-উচ্ছ্বসিত আননে আসিয়া লাগিয়াছে!

শিকারী কোষমুক্ত কৃপাণে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—দৃষ্টি তাহার শান্ত, মুগ্ধ, সম্ভ্রমময়!

ধ্যানান্তে সন্ন্যাসী, চন্দনচর্চ্চিত পূজার ফুলরাশি অঞ্জলি অঞ্জলি করিয়া দেবতার চরণে দিতে লাগিল! কি তাহার মন্ত্র,—সে অনুচ্চস্বরে বলিতেছিল,—

'মা—মা, তোর পূজার প্রধান পুরোহিত আসিয়াছে—শক্তিময়ী, তাকে শক্তি প্রদান কর্!'—

ও কি কণ্ঠস্বর? আবেগ কম্পিতকণ্ঠে একি মন্ত্রোচ্চারণ!

রুদ্ধ আবেগে উদ্বেলিত কণ্ঠে সন্ন্যাসী ডাকিল,—'মা'—

শিকারী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ডাকিল, 'মা!'—মৃদুকম্পিতকণ্ঠে কল্যাণী ডাকিল, 'মা!'—ছোট মন্দিরটীর মধ্যে প্রতিধ্বনি ঘুরিয়া ফিরিয়া গম্ভীর মন্দ্রে ডাকিল—"মা-মা-মা!"

(৪)

দুই বৎসর অতীত হইয়াছে! সেদিনকার অখ্যাতনামা শিকারী;—ইহারই মধ্যে তাহার নাম লোকের মুখে মুখে ফিরিতেছে!

মন্দিরের সম্মুখে সরোবর—অদূরে সারি বাঁধা ছোট ছোট পর্ব্বতশ্রেণী! কল্যাণী যেখানে পূর্ব্বে নিবিড় মেঘের খেলা দেখিত, আজি সেখানে সুদৃঢ় দুর্গ শোভা পাইতেছে! শিকারীর ইচ্ছানুসারে সেই পর্ব্বতের নাম 'কল্যাণী শৈল' হইয়াছে! সরোবরও কল্যাণীর পবিত্র নামে আখ্যাত!

জ্যোৎস্না পুলকিতা যামিনী! সরোবর সোপানে কল্যাণী অনেকক্ষণ কাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে! চঞ্চল বাতাসে তাহার মুক্ত কুন্তল মৃদু মৃদু উড়িতেছে! রজতশুভ্র জ্যোৎস্নারাশি সরোবরের নীলজলের উপর পড়িয়া ঝক্ ঝক্ করিতেছে—কল্যাণীর চরণপ্রান্তে, সোপানের উপর, সে জল, মন্দ বাতাস সংস্পর্শে ছোট ছোট ঢেউ তুলিয়া আঘাত করিতেছে!

কল্যাণী আলেখ্যলিখিত চিত্রবৎ স্থির নিমেষশূন্য নয়নে দূর-গিরিমুকুটরূপী দুর্গের দিকে চাহিয়া আছে!

বন্ধুর পথে অশ্বপদশব্দ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল! মুহূর্ত্ত পরে যে আসিল, তাহার যোদ্ধ্‌বেশ! কল্যাণী সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল!

'কল্যাণী,'—আগন্তুক মৃদুকণ্ঠে ডাকিল! কল্যাণী উত্তর দিল না। একবার যোদ্ধ্‌বেশীর মুখের দিকে চাহিয়া মুখ ফিরাইল! সরোবরের নীল জলে একটি স্ফুটনোন্মুখ পদ্মকোরক পবন-হিল্লোলে হেলিতেছে, দুলিতেছে; কল্যাণী তাহাই দেখিতেছিল।

আগন্তুক, সেই শিকারী। শিকারী কহিল, 'কল্যাণী, এ স্থান নিরাপদ নহে!

"আপনি যেখানে আছেন, সেখানে বিপদ কোথায়?"

"বিপদ আমার চিরসঙ্গী!"

"বিপদকে তো বরণই করিয়াছেন;—তবু"—

"পুনা আক্রমণ করিব"—

কল্যাণী কথা কহিল না।

"তার পূর্ব্বে তোমাকে রায়গড়ে যাইতে হইবে;"

"কেন?"—উৎকণ্ঠাবিহীন একটা ক্ষুদ্র প্রশ্ন।

"মুসলমান জানে আমি এখানে আসি।"

"ক্ষতি কি?"

"পুনা আজি হইতে চতুর্থ দিবসে আক্রমণ করিব; ইতিমধ্যে মুসলমান এই দুর্গ আক্রমণ করিবে!"

"জানিয়া থাকেন তো দুর্গ আক্রমণের জন্য প্রস্তত অবশ্যই হইয়াছেন।"

"হইয়াছি—কিন্তু অন্যভাবে। আমরা দুর্গ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বেই চলিয়া যাইব। মুসলমান শূন্য দুর্গ অধিকার করুক!"

"লাভ?"

"আছে; এই দুর্গ রক্ষার জন্য তাহারা কতক সৈন্য এখানে রাখিবে, তাহাতে পুনা আক্রমণের সুবিধা হইবে!"

"বুঝিয়াছি ; কৌশলে তাহাদের সৈন্য বিভাগ করিয়া বলক্ষয় করিবেন !"

শিকারী হাসিল।

কল্যাণী কহিল "তা' আমি এখান হইতে যাইব কেন ? —বিগ্রহ কে রক্ষা করিবে ?"

"বিগ্রহ উপযুক্ত ব্রাহ্মণের দ্বারা স্থানান্তরিত করিব।"

"মন্দির শূন্য করিয়া বিগ্রহ স্থানান্তরে পাঠাইবেন ?" কল্যাণী তাহার বিস্মিত দৃষ্টি তুলিয়া ধরিয়া শিকারীর মুখের দিকে চাহিল।

"মুসলমান মন্দির অপবিত্র করিতে পারে"—

"মহারাজ, আপনার মুখে এ কথা শুনিব আশা করি নাই। মহারাজ যদি মন্দির রক্ষার উপায় না করিতে পারেন, আমিই করিব। মারাঠী রমণী মরিতে জানে— মহারাজ শিবাজীর জননীও মহারাষ্ট্রীয়া রমণী !"

শিকারী প্রশংসমান্ নেত্রে কল্যাণীর মুখের দিকে চাহিল —সে মুখ দীপ্ত গরিমাময়।

হায়, কল্যাণী, কবে তোমার মত শক্তিশালিনী জননী মহারাষ্ট্রের প্রতি গৃহে গৃহে শক্তি সঞ্চারের জন্য আবির্ভূতা হইবে! দেশপ্রাণ শিকারী মুগ্ধ হৃদয়ে তাহাই ভাবিতেছিল!

শিকারী বুঝিল কল্যাণী মন্দির ত্যাগ করিয়া যাইবে না। "কল্যাণী, মন্দির রক্ষার যথাসাধ্য চেষ্টা করিব, তোমার পিতা কল্য শেষ রাত্রে ফিরিবেন—সমগ্র কঙ্কনপ্রদেশ তাঁহারই পুণ্য জাগরণ মন্ত্রে উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছে! তুমি সাবধানে থাকিও!"

শিকারী চলিয়া গেল ; নৈশনিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া তাহার সুশিক্ষিত অশ্ব সেই পার্ব্বত্য পথে ছুটিতেছিল! যতক্ষণ শুনা যায় কল্যাণী কাণ পাতিয়া অশ্বপদ শব্দ শুনিল।

তাহার বুকের মধ্যে কেমন একটা অন্ধ আকুলতা জাগিয়া উঠিতেছিল! সে যে কি, কল্যাণী তাহা কোন মতেই বুঝিতে পারিল না!

কল্যাণী ভাবিতেছিল, সমগ্র কঙ্কনপ্রদেশ, যাঁহার লীলাভূমি, পুণ্য বেদমন্ত্র মুখরিত হিন্দুস্থান যাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র, 'মর্ম্মবিতানের কোন্ স্থানে সে তাঁহার আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবে ?

সে যে দেবতার মত অর্ঘ্য ও পূজা লইয়াই চলিয়া যায়, রমণীর মর্ম্মকাতরতা উপলব্ধি করিবার জন্য এতটুকুও তো অপেক্ষা করে না!

সমগ্র দেশ যাহাকে চাহে,—একা নারী,—সেকি তাহাকে হৃদয়ের গোপনতম অন্তঃপুরে ধরিয়া রাখিতে চাহিবে ? ছি !!

একনিষ্ঠ প্রেম তখনি সুন্দর, যখন ত্যাগের মঙ্গল হস্তস্পর্শে সে পুলকিত হইয়া উঠে !

মারাঠী রমণী কি শুধু স্বার্থবিজড়িত প্রেম-মন্ত্রেই দীক্ষা গ্রহণ করিবে! সেকি তাহার একমুখী প্রেমকে দেশব্যাপী করিয়া দিতে পারিবে না ? তাহার বক্ষের রক্ত দ্রুততর তালে নাচিয়া উঠিল,—তাহার হৃদয়ের গুরুস্পন্দন তাহাকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মনে করিয়া দিতেছিল, "সে যে মারাঠী রমণী! সে যে মারাঠিণী !"

কুন্দদন্তে অধর চাপিয়া ধীরপাদবিক্ষেপে কল্যাণী মাতৃমন্দিরে ফিরিয়া আসিল।

তখন মুখে তাহার প্রতিজ্ঞার আভাস, আর নয়ন কোণে উজ্জ্বল গরিমা-রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে!

(৫)

শান্ত নীরব যামিনী! অষ্টমীর ক্ষীণ চন্দ্র একটী বিষাদ মাখা জ্যোৎস্নাবরণে বনভূমি ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

কল্যাণী—শৈলের পাদদেশে লতাগুল্মান্তরিত দুইজন অশ্বারোহী, দূরে কি দেখিতেছিল।

একটী বক্রপথ বাহিয়া কতকগুলি সৈনিক নিঃশব্দে পর্ব্বতারোহণ করিতেছে।

অশ্বারোহীদ্বয় কোন বাধা দিল না, শুধু দেখিতেছিল।

দুর্গে পৌছিয়া সৈন্যগণ দেখিল, দুর্গ শূন্য! "কাফের ভাগিয়াছে,"—একজন কহিল 'চল, খুঁজিয়া দেখিব।'

তখন প্রায় পঁচিশজন সৈনিকপুরুষ আবার পর্ব্বত হইতে নামিতে লাগিল।

লুক্কায়িত অশ্বারোহীদ্বয় এত লোক নামিতে দেখিয়া সরিয়া গেল।

"মুসলমান নামিল কেন ?"

"বোধ হয় খুঁজিয়া দেখিবে।"

"লক্ষণ ভাল নহে।"

"উহারা প্রায় 'সরোবর' অতিক্রম করিয়া বোধ হয় মন্দিরের দিকে যাইতেছে। উপত্যকার পার্শ্বে মাওয়ালী সৈন্যগণ অপেক্ষা করিতেছে—সত্বর সংবাদ দাও।" সঙ্গী অশ্ব ছুটাইয়া চলিয়া গেল। যে রহিল, সে শিকারী!

সরোবরের অপর তীর দিয়া শিকারীর অশ্ব দ্রুতবেগে ছুটিয়াছে। দুর্গে যে অবশিষ্ট সৈন্য ছিল, তাহারা জ্যোৎস্না-লোকে দেখিল, কে অশ্ব ছুটাইয়া যাইতেছে! তাহারাও 'দীন দীন' রবে নিস্তব্ধ নৈশগগন প্রকম্পিত করিয়া পর্ব্বতাবরোহণ করিতে লাগিল।

যাহারা পূর্ব্বেই নামিয়াছিল, তাহারা সরোবরের তীর অতিক্রম করিয়াই দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। এক ভাগ মন্দিরের সম্মুখে গেল, অন্যভাগ যে পথে শিকারী আসিতেছিল, সেই পথ অবরোধ করিল।

শিকারী ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, অমিত তেজে তাহার অশ্ব ছুটাইয়া দিল। সুশিক্ষিত অশ্ব পর্ব্বতগাত্রচ্যুত প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডের ন্যায়, প্রবলবেগে পথাবরোধকারী সৈন্যশ্রেণীর উপর গিয়া পড়িল। মুহূর্ত্তে কয়জনকে বিমর্দ্দিত করিয়া সে তাহার পথ পরিষ্কার করিয়া লইল।

প্রভাতশুক্রতারারূপিণী কল্যাণীর করুণ মূর্ত্তিখানি তাহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিয়াছিল,—কোন্ পার্থিব শক্তি আর তাহার গতিরোধ করিবে?

মন্দির সম্মুখস্থ অপরিসর ভূখণ্ডে সমবেত সৈন্যগণ এই অশ্বারোহী বীরপুরুষের নিকট বিধ্বস্ত হইতেছিল, কিন্তু মুহূর্ত্ত পরে আর আশা রহিল না। দুর্গ হইতে যাহারা নামিতেছিল, তাহারাও এতক্ষণে আসিয়া পঁহুছিল। তখন প্রায় শত সৈন্য একযোগে অশ্বারোহীকে বেষ্টন করিল; আর একদল গেল,—মন্দিরের দিকে!

নিরুপায়! যখন আর কোন আশাই রহিল না তখন সেই অশ্ব ও অশ্বারোহী, উন্মত্তের মত বিপুলবিক্রমে সেই শত সৈন্যকে দলিত, মর্দ্দিত করিয়া ফিরিতে লাগিল। বিকট চীৎকারে, অস্ত্রের ঝঙ্কারে, সেই নিস্তব্ধ পর্ব্বতপ্রদেশ কোলাহল মুখরিত হইয়া উঠিল। কল্যাণী বুঝিল, রক্ষা নাই—আর আশা নাই! তবু তো বিগ্রহ রক্ষা করিতে হইবে; সম্মান অব্যাহত রাখিতে হইবে। একা নারী, কি করিবে সে?

সে যে মারাঠী রমণী; সে কি এই বিপদের মুহূর্ত্তে, অবলা সুলভ ক্রন্দনের মধ্যে, হতাশার মধ্যে নিজকে বিসর্জ্জন দিবে? না, কখনই না!

তখন সহসা মন্দিরের অর্গলবদ্ধ কবাট খুলিয়া গেল! আক্রমণকারীগণ সবিস্ময়ে দেখিল—এক অপূর্ব্ব প্রভাশালিনী জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি—হস্তে তাহার কোষমুক্ত কৃপাণ, আর বামহস্তে বেষ্টিত, এক পাষাণ প্রতিমা—ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী শোভাময়ী দেবীমূর্ত্তি!

যুদ্ধ-কোলাহল থামিয়া গেল; সসম্ভ্রমে, সবিস্ময়ে মুসলমান দেখিল,—'কোন্ বেহেস্তের হুরি রে!' সেই জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি দ্রুত পাদবিক্ষেপে অপরিসর ভূখণ্ড অতিক্রম করিয়া গেল! সরোবর সোপান অতিক্রম করিয়া গেল! তার পর সরোবরের নীল জল ম্লান চন্দ্রকিরণে উচ্ছ্বসিত, আলোড়িত হইয়া উঠিল!

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে অশ্বারোহী, অশ্বত্যাগ করিয়া ভূতলে নামিয়া পড়িল, তাহার পার্শ্বে স্তম্ভিত শত্রুসৈনিক; পদাঘাতে পথাবরোধকারীকে ভূতলশায়ী করিয়া শিকারী ছুটিয়া গেল! আবার অস্তমিত প্রায় চন্দ্রকিরণে সলিলোচ্ছ্বাস ধ্বনি; আর পরক্ষণেই বনভূমি কম্পিত করিয়া, নৈশ অম্বর প্লাবিত করিয়া, ধ্বনি উঠিল—

"হর হর মহাদেও! মহারাজা শিবাজী কি জয়!!"

প্রায় একশত মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহী উপত্যকার পথে অতর্কিতে আসিয়া উপস্থিত হইল; কয়েক মুহূর্ত্তের যুদ্ধে শত্রুসৈন্য পরাভূত হইয়া পলায়ন করিল!

তখন মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহীগণ সরোবর তীরে আসিয়া দেখিল, সোপানোপরি অদূরে বিগ্রহ রক্ষিত হইয়াছে! পাষাণ প্রতিমাখানি এতটুকুও মলিন হয় নাই!

আর তাহার অদূরে শিলাতল আলোকিত করিয়া এক অপূর্ব্ব দেবীমূর্ত্তি শায়িত রহিয়াছে!—কণ্ঠে তাহার দেবতার আশীর্ব্বাদী অম্লান পুষ্পমালিকা! তাহার রুক্ষ, সংসর্পিত, নিবিড় কেশদাম, তখনো জলসিক্ত! আর তাহার পাণ্ডুর মুখশ্রী, পতিত জ্যোৎস্নালোকের ম্লান আভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে!—জীবনের এতটুকু লেশও আর সে মুখে নাই!

আর সেই দেবীমূর্ত্তির পার্শ্বে দণ্ডায়মান, সিক্ত যোদ্ধৃ-বেশে "মহারাজ শিবাজী!"

তাঁহার পলকশূন্য নেত্রে বিশ্ববিদাহী জ্বালা জ্বলিতেছে!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।

মালঞ্চ

মালঞ্চ

৭ম বর্ষ } আশ্বিন—১৩২৭ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

অশ্রুময়

(৯)

উৎপল হিসাবে একটা মস্ত ভুল করিয়া রাখিয়াছিল।

সরযূ তাহার কচিবুকের মধ্যে দুঃখকে যে কতখানি নগ্ন করিয়া দেখিয়াছে, সে খবরটা উৎপলের কাছে না পৌছিলেও আর একজনের কাছে ধরা পড়িয়া গিয়াছিল।

সতীশ জানিত ঐ ক্ষুদ্র বালিকার কচিবুকের মধ্যে একটা বোঝাপড়া ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবং সে সংগ্রাম যে কতখানি বিপুল ও তীব্র সে খবরটারও কিছু একদিন তাহার কাছে অজ্ঞের অলক্ষ্যে পৌছিয়া গিয়াছিল।

তাই সে দিন হঠাৎ সরযূ যখন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, সতীশ বাবু, আপনি সেদিন দিদিকে বল্‌ছিলেন, 'দুঃখটা তার কাছে মোটেই দুঃসহ হয়ে ওঠে না, যে ওটাকে ঠাকুরের দেওয়া বলে স্বীকার করে নিতে পারে, এবং দুঃখ যতই তীব্র হোক্‌না কেন, ওর মধ্যে তাঁর মঙ্গল বিধান রয়েচে বলে বিশ্বাস কর্ত্তে পারে'। কিন্তু আমি তো শুনে অবধি, ও কথাটাকে ঠিক্ মনের মধ্যে গ্রহণ করে উঠ্‌তে পার্‌লাম না", তখন সতীশ একটুও বিস্মিত হইল না।

শুধু তাহার দুই চোখের গভীর দৃষ্টি সরযূর মুখের উপর স্থাপন করিয়া কিছুকাল একেবারেই চুপ করিয়া রহিল, তার-পর ধীরে ধীরে কহিল, "ওরে পাগ্‌লি, গ্রহণ করে উঠ্‌তে কি একদিনেই পারা যায়,—আর তা' ক'জনেই বা পেরেচে! কিন্তু তবু একটা সব চেয়ে বড় সত্যি কথা যে, পার্‌লেই দুনিয়ার একটা প্রকাণ্ড সমস্যার মীমাংসা হয়ে যেত!"

সরযূ কহিল, "কিন্তু যা' পারলেই ভাল হয়, তা' মানুষ পারে না কেন?—বা পার্‌তে চায়না কেন?"—

"এমন একটা প্রশ্ন করে বস্‌লে, লক্ষ্মীটি, যার উত্তর ঠিক্ কথায় বলে বুঝিয়ে দেওয়া চলে না ত! মানুষ যে কেন পারে না, তার উত্তর তার নিজের মনের কাছেই রয়েচে, এবং দুঃখের ঝঞ্ঝা যখন তার কাছে এসে পৌছে যায়, ঠিক্ তখনি সে বুঝ্‌তে পারে, যে, সে কেন পারে না।"—

—"কিন্তু যে শুধু দুঃখকেই জেনেচে, সুখের সন্ধান কোনও দিনই পায় নাই, বা পাবে না, তার কাছে বোধ হয় এই গ্রহণ করে উঠ্‌তে পারাটা সহজ হয়ে উঠে।"—

বলিয়াই সরযূ দেওয়ালের টাঙ্গানো 'রামচন্দ্রের বন-গমনের' ছবিখানির দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

সতীশ বিস্মিত দৃষ্টিতে সরযূর দিকে চাহিয়া চাহিয়া মনে মনে কহিল, "মিথ্যার আয়োজন যতই বিপুল হোক্ না কেন, মানুষের মন জিনিষটাকে ফাঁকি দেওয়া কিছুতেই চলে না! ঐ টুকু বালিকার কাছেও আজ যে তার চিরন্তন দুঃখের খবরটা ধরা পড়ে গেছে, তার কারণ ও ছাড়া আর কিছু তো নয়ই, কিন্তু তবু মনে হচ্ছে, ও এত কথা কোথায় শিখ্‌ল?"

ছবিখানার দিকে চাহিয়া চাহিয়া হঠাৎ সরযূ কহিল, "দুঃখকে স্বীকার করে নিয়ে উনি যখন বনে গিয়েছিলেন, তখনও কিন্তু দুঃখটা যে কত বড় হয়ে উঠ্‌তে পারে, তা' মনে কর্‌তে পারেন নি! পাশে সীতাদেবী ও পিছনে লক্ষ্মণকে পাওয়া, হাজার দুঃখের মধ্যেও যে কতখানি সুখ তা' উনি মনে মনে নিশ্চিতই জান্‌তেন। তাই যখন সীতাকে হারালেন, তখন কত চোখের জলই ফেলেছিলেন, এবং এ সবই দুঃখকে ঠিক্ গ্রহণ কর্‌তে পারেন নি বলেই তো? আপনি ঠিক্‌ই বলেছেন, সতীশবাবু, দুঃখের ঝঞ্ঝা ঠিক্ সামনে

এসে না পড়লে, কেউ বুঝতে পারে না, যে, তার শক্তি কতখানি, এবং এসব কথার উত্তর তার নিজের মনের কাছেই রয়েচে !"

"এই যায়গায় একটা মস্ত ভুল করে ফেলছেন, স্বামী ! উনি বলে যাবেন সেই দুঃখটাকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং গ্রহণও করেছিলেন, এক মুহূর্ত্তের জন্যও তো সে দুঃখটাকে গ্রহণ করতে মনের ভিতর থেকেও আপত্তি জানান নি' !— অম্লান মুখে সে সত্যকে উনি রক্ষে করেছিলেন, কিন্তু তা' বলে সীতাদেবীকে হারাবেন এবং অত বড় দুর্ভোগ ভুগবেন, এটাকেও তো ওঁর অংশ বলে মেনে নিতে পারেন না ! কিন্তু যেদিন কর্ত্তব্যের জন্য ঐ সীতাকেও বর্জ্জন করা দরকার হয়েছিল, সেদিনও তো পিছিয়ে যান্‌নি ; সেই মহৎ দুঃখকে বরণ করে নিতে শুধু ওঁর পক্ষেই পারা সম্ভব হয়েছিল ; জগতে আর কেউ কি পেরেছে ?"

"কিন্তু ভিতরে ভিতরে যে একেবারেই ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিলেন, তাতেও তো সন্দেহ করবার কিছু নেই !"

সতীশ একটু হাসিয়া কহিল, "মানুষগুলি ইটপাথর দিয়ে তৈরী নয় তো, সরযূ ! রক্তমাংসের একটা দাবী আছে ; সেটাকে অগ্রাহ্য করা গেলেও, অস্বীকার করা তো চলে না ! ক্ষতবিক্ষত হতেই হবে ! কিন্তু ক্ষতবিক্ষত হয়েও মুসড়ে না পড়বার মধ্যেই গ্রহণ করবার শক্তির পরিচয় রয়েচে ! বাইরে কোনও প্রকাশ বা চিহ্ন না রেখেও সমুদ্রের একেবারে অন্তস্তলে বিপুল আন্দোলন চলতে পারে ; —যাকে দুঃখ বলে জেনেচি, তার সঙ্গে যুঝতে হবে ; তাকে আয়ত্ত করে নিতে হবে ; কখনই তার কাছে পরাজয় স্বীকার করা হবে না।"

সরযূ ম্লান মুখে কহিল, "কিন্তু আপনি একদিন গীতার একটা শ্লোক বুঝিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, যে, সুখেও যেমন বিগতস্পৃহ হবে, ঠিক তেমনি দুঃখেও অনুদ্বিগ্নমন হতে হবে ! এতে তো তা' হচ্ছে না, সতীশ বাবু ! এ যে দুঃখের উদ্বেগ ও ক্ষত সবটাই বুকের মধ্যে জমা রয়ে গেল ; —শুধু বাইরে তার প্রকাশ হচ্ছে না, এইটুকুই তো !"—

প্রবীণ দার্শনিকের মতই উত্তরে সতীশ অনেক কথাই বলিতে পারিত, কিন্তু সরযূর এই ক'টা কথায় এমন একটা বিপুল ব্যথার চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছিল; যাহা প্রত্যক্ষ করিয়া সে অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া উঠিল।

দুনিয়ার এমন অনেক ব্যাপার আছে এমন অনেক মর্ম্মন্তুদ ব্যথার কাহিনী আছে, যাহা নীরস দর্শন বিজ্ঞানের, যুক্তি তর্কের কোনও ধার তো ধারেই না, পরন্তু একটা চিরন্তন নিষ্ঠুর সত্যের মতই জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত বুকের মধ্যে বাসা বাঁধিয়া রহিয়া যায় এবং অহরহঃ তাহার নিষ্ঠুর অস্তিত্ব জানাইয়া দিয়া অতিষ্ঠ করিয়া তোলে। একে যেমন অস্বীকার করাও চলে না, তেমনি ঝাড়িয়া ফেলাও যায় না।

সতীশের দুই চক্ষের দৃষ্টি ব্যথায় ম্লান হইয়া উঠিল !

কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বেই সরযূ অন্য দেওয়ালের আর একখানি ছবির দিকে ফিরিয়া কহিল,—

"হাঁ, আপনি আর একদিন বলেছিলেন, ক্রুশের কাঠে যখন এঁকে বিঁধে মারলে, তখনও উনি ওঁর শত্রুদের ক্ষমা করে গেলেন ; অতবড় বিশ্বাসের জোর ছিল বলেই না অমন করে নিজের চরম দুঃখকেও গ্রহণ করতে পেরেছিলেন," বলিয়াই একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ম্লান হাসি মুখে কহিল, "কথাটা কি জানেন, মানুষ এই দুনিয়ার সুখ দুঃখের হিসাবটাকে, রক্তমাংসের দাবীটাকেই বড় করে দেখে ; এর সঙ্গে যে পরের জীবনটারও একটা যোগ রয়েচে, সেটা একেবারেই ভুলে যায় "—

এইটুকু বলিয়াই হঠাৎ দুইটা চক্ষু কেন যে জলে ভরিয়া উঠিল, তাহা না বুঝিয়া সে একটু হাসিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,

"এই দেখুন, চোখগুলি এমনি পান্‌সে, এই দু'টো কথা বলতে গিয়েও এর কাছে রেহাই পাওয়া দায় হয়ে ওঠে"—বলিয়াই সরযূ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কৈশোর কখন শেষ সীমারেখার কাছটীতে আসিয়া পৌছিয়া গিয়াছে এবং যাহার আগমনবার্ত্তা সে সূচনাতেই জানাইয়া দিয়া গেল, সতীশ জানিত, তাহার দাবী ক্রমে বাড়িয়া ওঠাই স্বাভাবিক রীতি। এ দাবী মানুষকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া তোলে, মুহূর্ত্তের জন্য স্বস্তি দেয় না, এতটুকু আরামের অবসর প্রদান করে না।

আজ এই ক্ষুদ্র বালিকা, সেই সীমারেখার কাছটাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াই, সম্মুখে যাহা দেখিল, তাহা নির্ম্মম ঝঞ্ঝার মূর্ত্তি ধরিয়া ব্যাকুল হইয়াই রহিয়াছে, এবং যবনিকার অন্তরাল একটুকু যে সরাইতেই, দুঃসহ অন্ধকার তাহার

চোখে ঠেকিল, তাহা একান্তই দুর্ভেদ্য ও অন্তহীনের মতই নিষ্ঠুর!

সতীশ ভাবিল, 'এ নির্মম পরীক্ষায় এই বালিকাকে যিনি যষ্টি ধরে পথ দেখাবেন, শুধু তিনিই জানেন যে ওর ব্যথার পরিমাণই ঠিক কতখানি, এবং কেমন করেই বা ও ওর চিত্তের শান্তি লাভ করবে!

ঘরের মধ্যে অনেকক্ষণ একলাটী বসিয়া থাকিয়া সতীশ হাঁপাইয়া উঠিতেছিল। এখন খোলা বারান্দার উপর দিয়া পায়চারি করিতে করিতে হঠাৎ থামিয়া গেল, এবং ঠিক্ তখনই বিকালের আফিস্ ট্রেণ্‌টার শব্দ শুনিয়া রেলিংএর উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে অন্যমনস্ক ভাবে চাহিয়া রহিল।

গাড়ীর জানেলা দিয়া অসম্ভব রকম ঝুঁকিয়া পড়িয়া এই বাড়ীটার অলিন্দ, গবাক্ষ, খাটুলার উপর দিয়া যে তাহার দুইটী ব্যগ্র চক্ষু বুলাইয়া লইতেছিল, সতীশ প্রথম দৃষ্টিতেই তাহাকে চিনিল। এবং ঐ ব্যাকুল দৃষ্টি যে কাহার অনুসন্ধানে ফিরিতেছে তাহাও জানিতে তাহার বাকী রহিল না।

সতীশ একবার চকিত দৃষ্টিতে ফুল বাগানের চারিদিকটা, খাটুলার পাশটা দেখিয়া লইল; কাহাকেও দেখা গেল না।

গাড়ী দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেলে, সতীশ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ফিরিতেই দেখিল, ছেলে কোলে লইয়া উৎপল কখন আসিয়া পিছনে দাঁড়াইয়াছে এবং মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

ছেলে বাপের মুখের দিকে চাহিয়া লহর তুলিয়া হাসিল এবং ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কোলে গেল। সতীশ তাহাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "কখন এলে ঠাক্‌রুণ?"

"তুমি বুঝি তা' জান্‌তে পাওনি?"

"কেমন করে জানব বল, তুমি তো আর বলে কয়ে আসনি!"

"বাঃ বলে কয়ে না আসলে বুঝি আর জান্‌তে নেই; তুমি বাড়ীতে পা' দিলেই যে আমি জান্‌তে পাই!"

উৎপলের জোড়্যানার বেণীটা ধরিয়া একটু টানিয়া দিয়া সতীশ কহিল, "আচ্ছা, গিন্নি, কেমন করে জান্‌তে পাও, ওটা আমায় শিখিয়ে দিতে পার?"

উৎপল তাহার ক্ষুদ্র রক্তাধর একটু উল্টাইয়া, একটু বক্র দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল, তার পর মৃদু হাসিয়া কহিল, "দূর, তুমি আমায় ও বুড়ো কথাটা বলে ডেক না আর!"

তার পরই স্মিত মুখে একেবারে সতীশের বুকের কাছে সরিয়া যাইয়া দাঁড়াইল এবং মুখ তুলিয়া কোমল দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অস্ফুট স্বরে কহিল, "ওগো, ও কি শিখিয়ে দিতে হয়! ও যে বুকের ভিতর থেকেই বলে দেয়।"

রক্তাভ বামগণ্ডের যে খান্‌টায় ক্ষুদ্র একটা তিলক দেখা যাইতেছিল, ঠিক সেই খান্‌টা দুইটী আঙ্গুলে একটু টিপিয়া দিয়া সতীশ মৃদুস্বরে কহিল, "বটে, 'গিন্নি' হতে এতই অসাধ? ছেলের মাও হয়েচ, বয়সও তো কম হয় নি! আঠারো যে পার হতে চল্‌ল! জান তো কুড়ি হ'লে মেয়েমানুষ কি হয়?"

তার পর কিছুক্ষণ উৎপলের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়া কহিল, "সত্যি? বুকের ভিতর থেকে ডেকে বলে দেয়? আচ্ছা, আমি বুকের উপর কাণ পেতে শুনব, কেমন বলে দেয়!"

একটা দ্রুত শোণিতোচ্ছ্বাস উৎপলের মুখের বর্ণ-সুষমা আরও একটু বাড়াইয়া দিয়া গেল; সতীশের দুই চক্ষুর নিবিড় দৃষ্টি নিম্নমুখী হইয়া তাহার মুখের উপর অপরিসীম প্রীতি স্মরণ করিতেছিল!

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। স্পষ্টতর আকাশ হইতে চতুর্থীর ক্ষীণ শশাঙ্ক ম্লান রশ্মিপাতে অন্ধকার দূর করিবার জন্য, দুর্দশাগ্রস্ত বুনিয়াদি ঘরের উত্তরাধিকারীর পূর্ব্ব গৌরব রক্ষা করিবার চেষ্টার মতই ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিল।

নীচের বাগানে বেলফুল ফুটিয়াছে, পাতার আড়াল সরাইয়া বায়ুপ্রবাহ গন্ধ হরণ করিয়া লইতেছিল। যুঁইয়ের কুঁড়ির মুখে মৃদু স্পর্শ দিয়া লজ্জা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য সন্তর্পণে বহিয়া আসিতেছিল।

তখন ত গর্ব্বিতা রজনীগন্ধার মুখ ফুটে নাই; সে এই দুই প্রেমিকের কাণ্ড দেখিয়া অভিমানে গুমরিতেছিল। এবং কত নিবিড় প্রীতি, কত গন্ধই যে সে তাহার দয়িতের জন্য বুকের মধ্যেই জমাইয়া তুলিয়াছে, সে খবরটা জানাইয়া দিবার জন্য অন্তরে অন্তরে উন্মুখ হইয়া উঠিতেছিল!

সরযূর কণ্ঠ শুনা গেল, "দিদি, মা ডাক্‌চেন, শীগ্‌গির!"

মুহূর্ত্তের জন্য সতীশের উত্তপ্ত নিশ্বাসের স্পর্শ উৎপলের ললাটে আসিয়া লাগিল, তারপরই সে ছেলে কোলে লইয়া চলিয়া গেল!

[১০]

প্রতিমাকে যে এ ঘরে আনা হইয়াছিল, তার একটু বিশেষ কারণ ছিল।

শৈলেশের পিতা শশাঙ্ক মুখুয্যের সহিত প্রতিমার পিতা চন্দ্রচূড় বাঁড়ুয্যের বান্ধবতার কথা এ অঞ্চলের লোকদের কাছে গল্পের বিষয় হইয়া পড়িয়াছিল।

ছেলেবেলায় পাঠশালার ছেলেদের মধ্যে যে প্রীতির সঞ্চার হইতে দেখা যায় বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাহার অস্তিত্ব বড় একটা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

কারণ প্রাচীন বটগাছগুলির পক্ষ হইতে যেমন তাহাদের সাক্ষ্যের কথা জানাইয়া দিবার জন্য কোনও উদ্যোগ একেবারেই দেখা যায় না, তেমনি আকাশের চিরকালের পুরাতন চাঁদটীও একপ্রকারের প্রতিজ্ঞা-বিনিময় এতই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, তিনিও একেবারেই নির্ব্বাক্ থাকিয়া তাঁহার নিজের হ্রাসবৃদ্ধির চিরন্তন পরীক্ষাগুলির মধ্য দিয়া নিজেকে টানিয়া নিয়া যাইতেই ব্যস্ত থাকিয়া যান, এসব কথা স্মরণ করাইয়া দিবার এতটুকু লক্ষণও আর দেখান না।

সুতরাং সাক্ষীদের এই বিশ্বাসঘাতকতায়ই ও ব্যাপারটা যদি একেবারেই তলাইয়া যায়। তাহাতে উভয় পক্ষে কাহাকেই দোষ দেওয়া চলে না।

কিন্তু এই শশাঙ্কশেখর মুখুয্যে ও চন্দ্রচূড় বাঁড়ুয্যে কোনও দিনই এ সব প্রতিজ্ঞা-বিনিময়ও করেন নাই এবং তাঁহারা উভয় উভয়ের প্রতি কতটুকু প্রীতি পোষণ করেন, তাহাও মুখ ফুটিয়া বলিতে চাহেন নাই।

তাই একটা অচ্ছেদ্য প্রীতির সম্বন্ধ ভিতরে ভিতরে বাড়িয়া উঠিয়া যখন উভয়কে পারিবারিক জীবনের কাছটীতে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিল, তখন এই দুই পরিবারের নবাগতেরাও জানিল যে, এই প্রীতির ফল্গুধারাটী চিরন্তন সত্তারূপে এখন একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

বধূরূপে ক্ষমাসুন্দরী যখন এই পরিবারে আসিলেন, তাহার ঠিক দুই সপ্তাহ পূর্ব্বেই চন্দ্রচূড়ের মাতাঠাকুরাণীও বিরজাসুন্দরীকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন।

বিরজাসুন্দরী অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যশালিনী বলিয়া খ্যাতি লাভ না করিতে পারিলেও, শিল্পে, চিত্রে, রন্ধনে, গৃহকর্ম্মে তুলনারহিত ছিলেন। চুল বাঁধিতে, টিপ্ কাটিতে, আলিপনা দিতে পার্শ্ববর্ত্তী দশখানা গ্রামের মধ্যে কোনও বধূই তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। গ্রামের কোনও বাড়ীতে ক্রিয়া কর্ম্ম উপস্থিত হইলে বিরজাসুন্দরীকে রন্ধনের জন্য আদর করিয়া লইয়া যাইত। পাঁচসাত শত লোকের উপযুক্ত আহার্য্য প্রস্তুত শেষ করিয়া দিয়া যখন দিনান্তে এই বধূটী বাড়ী ফিরিয়া আসিত, তখন উপস্থিত সকলেরই প্রশংসাগুঞ্জন শুনিয়া শুনিয়া অবগুণ্ঠনের অন্তরালে তাহার মুখখানি লজ্জায় রঙ্গিন্ হইয়া উঠিত এবং পুত্রবতীরা এমনি একটী বধূ পাইবার কামনা দেবতার পায়ে জানাইয়া রাখিতেও ভুলিতেন না।

অল্প দিন পূর্ব্বেও পল্লীবধূরা এমনি প্রশংসা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেন। প্রবীণারা এইরূপ বধূকন্যাই কামনা করিতেন!

তখন দেশে স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্য ছিল; দেশের লোকের বুক ভরা আশা ছিল, আনন্দ ছিল। ক্ষেতের সোণার ধানে প্রাঙ্গণ ভরিয়া উঠিত; গোশালায় দুগ্ধবতী গাভীর অভাব ছিল না; পুকুরে প্রচুর মৎস্য ছিল। বাগানের ফুলে, ফলে তরকারীতে নিত্য সাজি ভরিয়া উঠিত! মনে সুখ ছিল, আত্মীয়কে দেখিলে প্রীতি উচ্ছ্বসিত হইত; অতিথি পাইলে গৃহস্থ কৃতার্থ হইত।

সিংহাসনে গৃহদেবতা শালগ্রাম ছিলেন; তুলসীমঞ্চ ছিল। প্রতি সন্ধ্যায় ঠাকুরদালানে, তুলসীগাছের তলায় বধূরা প্রদীপ জালিত; গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিতে জানিত, এবং মনে মনে গৃহের কল্যাণ কামনা করিয়া এই দীপশিখাটীকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রার্থনা জানাইয়া, লজ্জানত দুইচক্ষুর দৃষ্টি আনন্দ দীপ্তিতে ভরিয়া তুলিত।

ছেলেগুলির "দক্ষিণপাড়" প্রাণ, আনাগোনা হইত। তাহারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলে ডুবাইত, সাঁতার কাটিত; পেয়ারা কুল কাঁচা আমের যম ছিল। বর্ষায় নালা কাটিয়া মাছ ধরিত; রৌদ্রে বৃষ্টিতে শরীরটাকে লৌহবৎ করিয়া গড়িয়া তুলিত। কিন্তু বয়োজ্যেষ্ঠদের দেখিলে পলাইতে পথ পাইত না।

যুবকেরা প্রাণ ভরিয়া উচ্চরোলে হাসিতে পারিত; গান

বাঙ্গলায় আখড়া বসাইত; মোটা লাঠি হাতে করিতে জানিত; মুগুর ভাজিত, তীর ছুঁড়িত; বাজি রাখিয়া আধখানা পাঁঠার মাংস খাইয়া ফেলিত; একটা কাঁঠাল হজম করিতে পারিত!

প্রবীণেরা চণ্ডীমণ্ডপে আস্তৃত ফরাসের উপর বসিয়া বসি! রামায়ণ মহাভারতের চির নবীন রসভাণ্ডারের মধ্যে 'মস্‌গুল্' হইয়া থাকিতে জানিতেন! আপদে, বিপদে পড়্শীর বাড়ীতে বুক দিয়া পড়িতেন; সমবেদনা জানাইতেন; দায়ে পড়িলে উদ্ধার করিতেন।

—কিন্তু কোথায় গেল বাঙ্গালার এই সোণার পল্লী?—

এ আনন্দমুখর পল্লীর গৃহে গৃহে কে এ নিরানন্দের বঁশী বাজাইল?

এ রাজপুরী কাহার নিঠুর মায়ার কাঠিটীর দারুণ স্পর্শে এমন করিয়া নিঝুম্, নিস্তব্ধ হইয়া গেল?

গোশালায় গাভী নাই; সিংহাসনে শালগ্রাম নাই; তুলসীমঞ্চ লোপ পাইয়াছে; সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বলে না; মঙ্গল শঙ্খ আর বাজে না; সন্ধ্যারতি আর হয় না!

নির্ম্মম ফুৎকারে কে হৃদয়হীন বাঙ্গালার পল্লীর প্রদীপটী নিভাইয়া দিল?—দেবতার দেউল্ অন্ধকার করিয়া দিল? —বাঙ্গালার বেণুবন, নীলকুঞ্জ, মাধবীমূল, মধুমালঞ্চ শ্রীহীন করিয়া দিল?

ওরে, কোথায় গেল, দোয়েল-শ্যামাকোয়েল মুখরিত বাঙ্গালার সোণার পল্লী?—কোথায় গেল?

শৈলেশের অন্নারম্ভের দিনও বিরজাসুন্দরী পাকশালার ভার গ্রহণ করিয়াছিল। দিনান্তের অবসরের পর এই কর্ম্মনিরতা বধূটী যখন ক্ষমাসুন্দরীর ঘরে আসিয়া মুখের অবগুণ্ঠন ফেলিয়া হাঁপ ছাড়িল তখন ক্ষমাসুন্দরীও পিছনে পিছনে ঘরে আসিয়া কহিল, "ইস্, মুখখানা একেবারে রাঙ্গা হয়ে গেছে যে! এত বড় দিনটা কেটে গেছে,—মুখে জল-ফোঁটা পড়েনি; তার পর সেই শেষ রাত্রি থেকে এ পর্য্যন্ত আগুনের কাছে রয়েছ!—ধন্যি মেয়ে তুমি!"—

বিরজা মৃদু হাসিয়া কহিল, "তুমিই কি কম, ঠাক্‌রুন্?"—তারপরই ক্ষমাসুন্দরীর বাম কপালের উপর একটী আঙ্গুলের একটু স্পর্শ দিয়া স্মিতমুখেই কহিল, "তোর ছেলের অন্নপ্রাশনের রান্না রাঁধ্‌ব বহুদিনের সাধ ছিল; আজ যখন বাড়ী থেকে বের হই, ঠাকুরের কাছে ভোগ মানত করে এসেছিলাম।"

দুই হাতে বিরজার মুখ তুলিয়া ধরিয়া ক্ষমাসুন্দরী কহিল, "ওরে, এ সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার আর ভোগ মানত করা দরকার হয় না!"

বিরজা কহিল, "ঠাকুর দেবতারা যদি ভাল করে না দেন, তা' হ'লে কি ভাল হবার যো আছেরে! ও আমি দেখেছি, যেদিন নিজের উপর নির্ভর করতে যাই, সেদিন আর কিছুই সুবিধে করে উঠ্‌তে পারিনে!"

—"তা' কি আমি জানিনেরে! ওরে, তোর উপর যে ঠাকুর দেবতাদের যথেষ্ট অনুগ্রহ রয়েচে!—"—বলিয়াই ক্ষমাসুন্দরী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুমৃদু হাসিতে লাগিল।

—"তা' তুই অত হাস্‌চিস্ কেন লা?"—

"হাস্‌চি যে কেন, তা' তোকে বল্‌ব!"—

—"কি?"—

"দেখ্ অনেক দিন থেকে একটা কথা ভাব্‌চি।"—বলিয়াই একটু এদিক ওদিক চাহিয়া গলার স্বর খাটো করিয়া কহিল, 'তোর যদি মেয়ে হয়, তা' হলে সে মেয়েটীকে আমাকে দিবি?"

বিরজা সুন্দরীর মুখ এবার সত্যই লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল, ক্ষমাসুন্দরীকে একটু ঠেলিয়া দিয়া কহিল, "দূর, কি যে বলিস্,"—

কিন্তু যে কথাটা তুলিয়াছে, সে সহজে ছাড়িবার পাত্রী নহে।

সুতরাং ক্ষমাসুন্দরী কহিল, "তোদের রক্ত আমাদের এ সংসারে আন্‌ব, এর চেয়ে বড় সাধ আমার আর কিছু নেই, তাই ও যখন পেটে এল,"—বলিয়াই একটু মৃদু হাসিয়া সখীর মুখের উপর লজ্জাতাড়িত চকিত দৃষ্টি বুলাইয়া লইতেই দেখিল, বিরজার মুখ হাসির ছটায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

"খুব বেহায়া ভাব্‌ছিস্ বুঝি? [illegible] হ'লামই বা তোর কাছে একটু বেহায়া! তারপর যা' বল্‌ছিলাম ঠাকুর ঘরে সন্ধ্যা প্রদীপ জাল্‌তে যেয়ে কত রকেই মাথা খুঁড়ে জানিয়েচি, যে, প্রথম ছেলেই যেন আসে। এবং সে ছেলে, তোর মেয়ে হলে, তার সঙ্গে যেন বিয়ে দিতে পারি।" বলিয়াই ক্ষমাসুন্দরী বিরজার মুখের দিকে চাহিল।

বিরজার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, সে জোর করিয়া হাসিয়া অস্ফুটস্বরে কহিল, "এই ছাদে যাকে বিধাতা-

পুরুষ গড়ে তুলবেন্ সে সুন্দরী হবে না ত!—তাই তার এত সৌভাগ্য কল্পনা করতেও আমার কিন্তু সাহস হচ্ছে না, ক্ষমা!"

ক্ষমাসুন্দরী দুই হাতে বিরজাসুন্দরী॰ কণ্ঠবেষ্টন করিয়া কহিল, "তোর চেয়ে সুন্দরী কে, বিরু? তোর ছাঁচে ঢালা মেয়েটিকে যদি আমার ছেলে পায়, তার চেয়ে বড় কামনা আমি আর কিছুই করব না।"

দুই সখীর নিভৃত আলাপ শেষ হইলে ক্ষমাসুন্দরী বিরজার কানের কাছে মুখ নিয়া কহিল, "তা' হ'লে তুই আমার বেয়ান্ হলি আজ থেকে, বিরু?"

বিরজা মৃদু হাসিয়া কহিল, "গাছে না উঠ্‌তেই কাঁদি! আচ্ছা, মনে থাকে যেন, বেয়ান্ ঠাকৃরুণ্!"

ক্ষমাসুন্দরী পরম গম্ভীর মুখে কহিল, "কিন্তু বৌভাতের দিন্‌কার রান্নার কি হবে?"—

"আচ্ছা, সে দেখা যাবে।"—দুই সখীর মুখের উপর দিয়া একটা অনাবিল হাসির প্রবাহ বহিয়া গেল।

তার পর কয়েক বৎসরের মধ্যে অবস্থার কত পরিবর্ত্তনই ঘটিয়া গেল। দুই পরিবারের প্রবীণ প্রবীণারা একে একে স্বর্গারোহণ করিলেন। যাঁহারা একদিন নবীন নবীনা ছিলেন তাঁহারা সংসারের ভার গ্রহণ করিলেন। আর তাহাদের স্থানে এমন আর একদল তরুণ তরুণী দেখা দিল, যাহাদের জীবনের দিনগুলি অন্তহীন বিচিত্রতায় রঙ্গিন হইয়া উঠিতেছিল!—

"চিরদিন কখনও সমান না যায়," এই অত্যন্ত খাটি কথাটা যাঁহার মুখ দিয়া প্রথম বাহির হইয়াছিল, তিনি যে কত বড় একটা সত্যের প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহা সম্যক্ বোধ হয় তিনিও তখন জানিতেন না।

প্রতিমার জন্মের প্রায় চৌদ্দ বৎসর পরে একদিন ভোরের দিকে কেহ আসিয়া জানাইয়া গেল চন্দ্রচূড়ের শারীরিক অবস্থা ভাল নহে, শশাঙ্কশেখরকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন।

শশাঙ্ক যাইতেই চন্দ্রচূড় শয্যার উপর একবার উঠিয়া বসিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিলেন।

শশাঙ্ক উদ্বেগপূর্ণ মুখে কহিলেন, "থাকনা, শুয়েই কথা বল, শরীরটা হঠাৎ এমন হয়ে পড়্‌বার কারণ কি?"

চন্দ্রচূড় হাসিয়া কহিলেন, "ওর আর কারণ কিছু নেই, ভাই! কিছু আগেই যেতে হ'ল, তা' বেশ তো—অজানা যায়গা, একটু আগে গিয়ে সব দেখে শুনে গুছিয়ে রাখা যাবে"—

"কি যে বল,"—তার পর একটু হাসিয়া কহিলেন, "ঘরসংসার পাতাবার মত যায়গাই যদি হয়, কর্ত্তারা সব আগে গিয়েছেন এবং তাঁরাই সব ঠিক করে নিশ্চয়ই রেখেছেন; ওর জন্ম তোমার যাবার তাড়া কিছু নেই তো!"—একটু চুপ করিয়া থাকিয়া গম্ভীর মুখে কহিলেন, "রহস্য থাক্,—ব্যাপারটা কি বল ত?—শরীরটা খুব খারাপ মনে হচ্ছে কি?"

"কাল রাত থেকেই শরীরটা ভাল নেই; যে প্রথম আক্রমণেই এমন অবস্থা করে তুলেছে, সে যে আমাকে এতদিন পরে এ দেহটার অধিকার থেকে বেদখল করবেই, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ রাখিনে," বলিয়াই চন্দ্রচূড় হাসিলেন।

কিন্তু তাঁহার হাসি দেখিয়াও বেশ বুঝা গেল শরীর কত খানি কাতর হইয়াছে।

শশাঙ্কশেখর ভিতরে ভিতরে শিহরিয়া উঠিলেও জোর করিয়াই কহিলেন, "ও কিছু-না, ওষুধ খাও, ভাল হয়ে যাবে, বলিয়াই তিনি কবিরাজ ডাকিতে লোক পাঠাইয়া দিলেন।"

"সেরে উঠি ভালই তো! তবু কয়টা কাজের কথা তোমাকে বলে রাখি কি জানি, যদি শেষে সময় না পাই।"

দুই জনের কথা শেষ করিতে বেশী সময় লাগিল না। গৃহ দেবতার সেবার ব্যবস্থার কথা হওয়ার পর, যে সম্পত্তিটুকু ছিল তাহার কথা উঠিতেই চন্দ্রচূড় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—

"এই দেখ, মানুষের হিসাবেরও যেমন শেষ নাই, ভুলেরও তেমনি অন্ত নেই; যাবার সময়ও কি এই চিরদিনের অভ্যাস ছাড়তে পারে! যাক্ ওসব থাকুক ও নিয়ে আলোচনা করে আজ আর মনটাকে অপ্রসন্ন করে তুলতে চাইনে! যতক্ষণ আছি, এখান থেকে তুমি আর যেতে পাচ্ছ না শশাঙ্ক! ওরে প্রতিমা তোর কাকা বাবুর পূজো আহ্নিকের ব্যবস্থা করে রাখিস না! কই, এদিকে এসে প্রণাম তো করে গেলিনে পাগলি!"

অশ্রুমুখী প্রতিমা আসিয়া শশাঙ্ককে প্রণাম করিতেই

তিনি তাহাকে কোলের মধ্যে টানিয়া আনিয়া পরম স্নেহে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিলেন,

"লক্ষ্মী মা আমার, তোমার মা ঠাকুরুণের মতই হও ; এর চেয়ে বড় আশীর্ব্বাদ আর আমি কিছুই জানিনে। বলিয়াই কিছুক্ষণ একেবারেই চুপ করিয়া রহিলেন তারপর ধীরে ধীরে কহিলেন,—"কিন্তু আজ একটা কথা তোমার বাবার সামনেই তোমাকে জানিয়ে যাচ্ছি মা! তোমার জন্মের বহুপূর্ব্বেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল, লক্ষ্মী, যে তুমি তোমার মা ঠাকুরুণের সকল গুণের সম্পদ নিয়ে তোমার এই কাকাবাবুটীর ঘরেই চিরদিনের লক্ষ্মীটি হয়ে রইবে! আজ তোমার বাবার শরীরের এই অবস্থা দেখে আমার মনে হচ্ছে, হয়তো আমারও আর বেশী দিন নেই; কারণ জ্ঞান হয়ে অবধি তো ওঁকে ছেড়ে একদিনও থাকিনি মা! তাই আজ তোমাকে এ খবরটা জানিয়ে রাখলাম!—

তারপর চন্দ্রচূড়ের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "শৈলেশের জন্ম কোষ্ঠীতে উনিশ বছরটা ভারি খারাপ ছিল, তাই একথা এতদিন তুলিনি চন্দ্রচূড়! এখন তা কেটে গেছে"—

প্রতিমার হঠাৎ মনে হইল, সে যেন একটা নূতন আলোকের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহার জন্মের বহুপূর্ব্ব হইতেই যে কথাটা একেবারে পাকা হইয়া রহিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে যেন কাহারও কিছু বলিবারই থাকিতে পারে না। যে শৈলেশকে সে এতদিন বড় ভাইয়ের মতই দেখিয়া আসিয়াছে এবং সেই এতটুকু বয়স হইতে এপর্য্যন্ত ছোট বড় নানা আব্দারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে তাহার সঙ্গে সম্পর্কটাকে এতই নিবিড় করিয়া অনেক পূর্ব্ব হইতেই গড়িয়া রাখা হইয়াছে অথচ তাহারা কেহই একথাটার বিন্দুবিসর্গও জানিত না ইহা মনে করিয়া তাহার মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল!

ঘরের কাছের যে মাটীর স্তূপটা চিরদিনের পরিচয়ের ভিতর দিয়া নিতান্তই নিত্যকার হইয়া রহিয়াছে এবং যাহার দিকে লক্ষ্য রাখিবার কোনও দরকারই হয় নাই, তুচ্ছ প্রয়োজনে সেই স্তূপটাকে কাটিয়া ফেলিতে যাইয়া যদি কেহ গুপ্ত ঐশ্বর্য্যের সন্ধান পাইয়া বসে তাহা হইলে তাহার মনের অবস্থাটা যেমন হওয়া সম্ভব প্রতিমারও বোধ হয় তেমনই একটা অবস্থা হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রতিমার লজ্জাবনত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া শশাঙ্ক-শেখর চন্দ্রচূড়ের দিকে চাহিয়া কহিলেন "তোমার বৌঠাকরুণ যে একে এর জন্মের পূর্ব্বেই চেয়ে নিয়েছিলেন সে খবরটা ওর মা নিশ্চয়ই তোমাকে বলেন আজ আবারও ওকে আমি তোমার কাছ থেকে চেয়ে নিচ্ছি। এরপর সব হিসেব নিকেশ মিটাতে আমিই বা ক'দিন সময় পাব তাওত জানা নেই। কিন্তু আমাদের দুঃখ করবার কিছু নেই; সাংসারিক সুখ যাকে বলে তাত ঠাকুর আমাদের একটুও কম করে দেন নি, চন্দ্রচূড়!"

অশ্রুসজল দুই চোখের দৃষ্টি এতক্ষণ শশাঙ্কশেখরের মুখের উপর স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন ধীরে ধীরে গাঢ় স্বরে কহিলেন, "এত আনন্দের মধ্যেও একটা দুঃখ হচ্ছে শশাঙ্ক, ওর মা কি আমার চেয়েও তোমাকে বেশী করে চিনল? প্রতিমার বিয়ের কথা তুলতেই সে বরাবরই বলে এসেচে, 'জন্মের আগেই, ও যার হাতে পড়বে, তা' ঠিক্ হয়ে রয়েচে! ওর জন্যে তোমার ছেলে খুঁজতে হবে না,'—কিন্তু আমি যে একথা কোনদিনই তোমাকে মনে করে দিতে পারব না, তা' যখনই বলেছি, তখনি ও হেসে বলেচে, 'ওগো, তা' তোমাকে জানাতে হবে না, ও তিনি সময় হলে নিজেই বল্‌বেন।' ওরে, মানুষের দর্প এম্‌নি করেই ঠাকুর চূর্ণ করে দেন; একটা তুচ্ছ বিষয়ের এতটুকু দর্প, তাও তিনি সইতে পারেন না! গর্ব্ব ছিল, আমি তোমাকে যতখানি চিনেছি, এমন আর কেউ চেনে নি'; কিন্তু আজ যাবার আগেই ঠাকুর আমাকে এম্‌নি করেই জানিয়ে দিলেন যে, এতেও আমি নিজের ঘরের লোকের কাছেই হেরে গেছি।"

বিরজা সুন্দরী কবাটের আড়ালে বসিয়া কথা শুনিতে-ছিলেন; এখন চোখের জল মুছিতে মুছিতে উঠিয়া যাইতে-ছিলেন, চন্দ্রচূড় সেই দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আজ আর লজ্জা করবার তোমার কিছু নেই, ওখানেই থাক। মেয়েকে এতদিন আগ্‌লে রেখেছ, ওঁর সম্পত্তি উনি বুঝে নিলেন; ছেলেটা আর তুমি; তা ঠাকুর রয়েছেন, শশাঙ্কও যে ক'দিন থাকে!"

চোখে অশ্রুর আভাষ বুকের মধ্যে একটা অজ্ঞানিত কম্পন লইয়া প্রতিমা উঠিয়া যাইতেই চন্দ্রচূড় তাহার গমন পথের দিকে স্নেহস্রাবী দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া, একটা পরম

নিশ্চিন্ততার নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "যা, একটু অপূর্ণ ছিল, তা'ও আজ মিটে গেল! সারাজীবন ভরেই তো তোমার অসীম করুণা অনুভব করে কৃতার্থ হয়ে গেছি, ঠাকুর!"—

এর পরই যেন অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন এমনি ভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

তৃতীয়দিন পবিত্র ব্রহ্ম মুহূর্ত্তেই চন্দ্রচূড়ের অবিনশ্বর আত্মা স্বর্গগত হইল।

প্রায় এক বৎসর পরে একদিন ভোরের দিকে শশাঙ্ক-শেখর ক্ষমাসুন্দরীর পূজার ঘরের কাছে দাঁড়াইয়া একটু মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "জানইতো গিন্নি শ্রীকৃষ্ণ চলে গেলে অর্জ্জুন আর গাণ্ডীব ধরতে পারেন নি;—কাজ করবার শক্তি একেবারেই হারিয়ে ফেলেছিলেন।"—

ক্ষমাসুন্দরী দুয়ারের কাছে আসিয়া উদ্বিগ্নমুখে কহিলেন, "আজ শরীর কি খুব বেশী খারাপ হয়েচে? এত ভোরেই স্নান করে এলে!"—উদ্বেগে আশঙ্কায় ক্ষমাসুন্দরীর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল।

শশাঙ্কশেখর হাসিয়া কহিলেন, "মুখের চেহারা অমন করে তুললে কেন? ভয় নেই কিছু, তবে হিসেবগুলি যত শীঘ্র মিটিয়ে ফেলা যায় সেই ভাল নয় কি?—২৯ এ ভাল দিন আছে, কাজটা সেরে ফেলি,—কি বল?"—

ক্ষমাসুন্দরী স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বিবর্ণ মুখে কহিলেন, "কিছুই বলিনে, কি আর বল্‌ব! একটু সাবধানে থাকতে এত বলি, তা'তো শুন্‌বেনা, এমন করে শরীর আর ক'দিন বইবে?"—

শশাঙ্ক ক্ষমাসুন্দরীর মুখের দিকে ক্লান্ত দৃষ্টি তুলিয়া ধরিয়া একটু হাসিলেন এবং কোনও কথা না বলিয়া বৈঠক খানা ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

ক্ষমাসুন্দরী দুই হাতে দুয়ারের কাঠটা চাপিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন, যেন কত অবসাদ ও ক্লান্তি আসিয়াছে, এমনিভাবে স্বামী হাটিয়া চলিয়া গেলেন!

দুই চক্ষু ভরিয়া জল আসিতেছিল। আঁচলে চ মুছিয়া ফেলিয়া কম্পিত বক্ষে পূজার আসনের উপর যাইয় বিহ্বলের মতই অনেক ক্ষণ বসিয়া রহিলেন।

ঠিক সেইদিন হইতে শশাঙ্কশেখরকে সমস্ত হিসা নিকাশ লইয়া ব্যতিব্যস্ত দেখা গেল। নিজেকে আর এব মুহূর্ত্তেও বিশ্রাম না দিয়া ছোট বড় সমস্ত কাজগুলি মিটাইয়া ফেলিলেন।

এবং তাহারই ফলে, শৈলেশের গোপন অশ্রু ও নিষ্ফ অসন্তুষ্টি সত্বেও একদিন বৈশাখী সন্ধ্যায় প্রতিমা বধূরূপে আসিয়া এ বাড়ীতে দেখা দিল।

এ ঘর তাহার চিরদিনের আপনার ঘরের মতই ছিল তবুও আজ প্রথম বধূজীবনের রঙ্গিন্ আলোকের মধ্যে নবীন আশায় কম্পিত হৃদয় লইয়া এখানে পা দিয়াই বুঝিতে একটুও বিলম্ব হইল না, যে, স্বামীর অন্তরে তাহার জন্য বিরাগ ও অপ্রীতিই পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে!— এতটুকু প্রীতিও নাই, এতটুকু আদর, সোহাগও নাই।

যাহার অন্তর নবনীত কোমল বলিয়াই এতকাল সে জানিত, অদৃষ্টদোষে আজ তাহাই তুষার শীতল প্রস্তর খণ্ডে পরিণত হইয়াছে!

—কিন্তু কেন এমনটা হইল?—কেন এমন হয়?—

প্রীতিরাজ্য জয় করিতে আসিয়া কেন সে এমন নিষ্ঠুর বাধা পাইল?

এই বাড়ীটার প্রত্যেকেই যখন তাহাকে স্নেহের বন্যা প্লাবিত করিয়া দিল, তখন সে শুধু এমন এক জনেরই প্রীতিতে বঞ্চিত রহিয়া গেল, যাহার কাছে তাহার সমস্ত আনন্দ ও উৎসবের সোনার কাঠিটি লুকানো রহিয়াছে!

শুধু একটী মাত্র স্পর্শ দিয়াই তো সে তাহার সাজানো মালঞ্চ মুঞ্জরিত করিয়া তুলিতে পারিত,—ফলে পুষ্পে সুশোভিত করিয়া দিতে পারিত!

কিন্তু ওরে, সে তো নিষ্ঠুর, অকরুণই রহিয়া গেল!—

(ক্রমশঃ)

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত, বি, এ।

বাদ্‌লা রাতের ব্যথা

বাদ্‌লা রাতের উদ্‌লা হাওয়ায় উথ্‌লে উঠে উদাস্ প্রাণ,
পড়্‌ছে মনে পুরাণ্ কথা—বইছে বুকে ব্যথার বান।
কাজল-পরা সজল চোখের সেই দিঠি টি আজ্‌কে গো—
নূতন করে বেদন্ দিতে হৃদয়-কোণে জাগ্‌ছে গো।

পড়্‌ছে মনে কথায় কথায় চল্‌ত যে তার কপট্ মান,
এম্‌নি শাওন ধারার মত ছুট্‌ত আঁখির অশ্রু-বান।
সোহাগ্ করে বক্ষে ধরে দিতেম চুমো অধর-পুটে,
বিজ্‌লীসম আঁধার টুটি হাস্ত যে তার উঠ্‌ত ফুটে।

আজ্ সে কথা স্বপ্ন শুধু—বাদ্‌লা রাতের সান্ত্বনা,
জমাট্ মেঘে চাঁদের উঁকি—কবির বুকের কল্পনা।
আলেয়ারি আলোর মতন এযে শুধুই বঞ্চনা,
দুখের মাঝে সুখের কুহক কর্‌ছে কেবল উন্মনা।

যক্ষ সম দরদ্ আমার—মরম্ ব্যথা কই কারে,—
তাকিয়ে আছি মেঘের পানে ক্ষণিক্ যদি পাই তারে!
হাওয়ার তালে তার্ সে কেশের সুবাস যেন আস্‌ছে গো,
নীল্ মেঘে তার নীলাম্বরীর আঁচল খানি দুল্‌ছে গো!

ওই না মেঘের পাল্ তুলে সে আস্‌ছে হেথা আস্‌ছে না?
—হৃদ্-বীণে মোর উঠ্‌ল বাণী—'মিথ্যে এ সব কল্পনা'।
তাই'ত প্রিয়া মনের বনে ফুট্‌ল না যূঁই-মল্লিকা,
ব্যর্থ হল প্রতীক্ষা-যাগ—জ্বল্‌ল না সে প্রেম্-শিখা।

চাতক্‌সম পিয়াস্ আমার—তিয়াস্'ত হায় মিট্‌ল না,
স্বপন্-পারা স্মৃতির পরশ্ করল মিছে আন্‌মনা।
বাদ্‌লা রাতের আর্ত্তনাদে উথ্‌লে উঠে দুখের বান,
হৃদয়-জুড়ে বাজ্‌ছে—শুধু একটি ব্যথার করুণ-গান!

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ

চাকুরী-তত্ত্ব

একটা কথা আছে, বাঙ্গালী অন্নগত প্রাণ—সেটা সত্য। কিন্তু বাঙ্গালী যে চাকুরীগতপ্রাণ সেটা আরও সত্য, কারণ চাকুরী না হইলে বাঙ্গালীর অন্ন জোটে না। ঘরমুখো বাঙ্গালী—একথা অনেক কাল হইতেই প্রচলিত আছে, কিন্তু চাকুরীর খাতিরে আজকাল বাঙ্গালী 'ঘরমুখো'র চাইতে আপিসমুখোই বেশী। বেলা সাড়ে দশটার মধ্যে আপিসে হাজির হইতে হবে, তাড়াতাড়ি যা হোক্ নাকে মুখে কিছু গুঁজিয়া, চাপ্‌কানের বোতাম আঁটিতে আঁটিতে উর্দ্ধশ্বাসে আপিস অভিমুখে ধাবমান হইবার সময় বাঙ্গালী বাবুদের যতখানি গতিকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়,—সমস্ত দিবস কলম পিশিয়া ও সাহেবের গালি ভক্ষণ করিয়া লম্বিত-শুষ্ক ও শুষ্ক বদনে, শ্লথচরণে ও মন্থর গমনে, আপিস হইতে গৃহে প্রত্যাগমনের সময় তাঁহাদের ভাব দেখিয়া মনে হয় না যে, তাঁহারা গৃহে ফিরিতে খুব উৎসুক। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ঘরমুখোর চাইতে বাঙ্গালীর আপিসমুখো টানই বেশী।

জীব-জগতে যেমন মনুষ্য শ্রেষ্ঠ, চাকুরী জগতে সরকারী চাকুরে শ্রেষ্ঠ; কারণ তাঁহাদের 'পে' আছে, 'প্রোমোশন' আছে ও 'পেনসন' আছে। আরো আছে 'ট্রান্সফার' অর্থাৎ বদ্‌লী—এটা গোলাপফুলে কাঁটার মতন। সরকারী চাকুরী ও তৎসংক্রান্ত বদলী ব্যাপারের মধ্যে যে গূঢ় আধ্যাত্মিক তথ্য নিহিত আছে অনেকেই তদ্বিষয় সম্যক অবগত নহেন! তাঁহাদের অবগতির জন্য আমরা সেই গূঢ় তথ্য বিশ্লেষণের চেষ্টা করিতেছি।

পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফলে জীব মনুষ্য জন্ম পরিগ্রহ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়, আর এ জন্মের সুপারিশের ফলে উমেদারগণ সরকারী চাকুরীতে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হয়। স্বর্গে একবার প্রবেশ করিতে পারিলে সহজে পতন হয় না, আর সরকারী চাকুরীতে একবার বহাল হইতে পারিলে সহজে বরখাস্ত হয় না। ব্যক্তিগত সুকৃতি বা কৃতিত্বের অভাবে, চাকুরী প্রাপ্তি সম্বন্ধে অলৌকিক আহরিকা

কিঞ্চিৎ হইলেও, যদি সুপারিসের জোর থাকে তাহা হইলে সমস্ত বাধাবিঘ্ন সহজেই অতিক্রম করা যায়। পরজন্মের পথের সম্বল সুকৃতি, আর চাকুরী প্রবেশের প্রাথমিক সম্বল সুপারিস্। সাধনার সিদ্ধির জন্য যেমন উত্তর সাধকের প্রয়োজন, 'নমিনেসনের' পূর্ব্বে চাকুরী-দেবতাদিগকে প্রসন্ন করিবার জন্য যে সাধনার প্রচলিত পদ্ধতি আছে, তাহাতে নিজ নিজ আত্মীয়, যথা পিতা, শ্বশুর, মাতুল প্রভৃতি যাঁহারা সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন বা ছিলেন—তাঁহাদের সাহায্য বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। যাঁহার কেহই সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত নাই বা ছিলেন না, তাঁহার পক্ষে চাকুরী পাওয়া দুষ্কর। প্রকৃতপক্ষে নিকটাত্মীয় কেহ না থাকিলেও 'মামার শালা' ও 'পিসের ভাই' গোছ সম্পর্কও যদি সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে খুঁজিয়া বাহির করা যায়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকেই 'মামা' ও 'পিসে' পরিচয়ে চালাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। যদি কেহই না থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্ব হইতে বন্দোবস্ত করিয়া কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে ভগ্নীপাত বলিয়াও চালাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। ফলকথা, চাকুরী প্রাপ্তির প্রথম প্রয়াস ও উদ্যমে এই প্রকার উত্তর-সাধক না থাকিলে উমেদারের সাফল্যের আশা বড়ই কম।

সরকার বাহাদুর বাছাই করিয়া লোক চাকুরীতে ভর্ত্তি করেন সত্য, তবে যাঁহারা নিযুক্ত হন তাঁহারাই যে উপযুক্ত তাহা বলা যায় না; কারণ সুপারিসের বলে অনেক অকর্ম্মাও কর্ম্ম পায়। তবে তাহাতে সরকারী কার্য্যের বিশেষ কোন অনিষ্ট হয় না, একত্রে মিলেমিশালে কাজকর্ম্ম লেফাপামাফিক একরকম চলিয়া যায়। এই, গয়লার গরুতে নিয়মিত পরিমাণ দুধ না দিলেও যেমন কেবলমাত্র জলমিশ্রণ সাহায্যেই তাহার খরিদ্দারের দৈনিক যোগান দেওয়ার পরিমাণের কখনই কোন অভাব হয় না, তেমনি সরকারী কার্য্যেও শুধু সুপারিসের বলে প্রবিষ্ট অকর্ম্মার দল সত্ত্বেও নিয়মিত কার্য্য পরিচালনে বিশেষ কোনই অসুবিধা হয় না—ওটা ভালতে মন্দতে বাগমিশালে চলনসই রকম চলিয়া যায়।

দেবতার মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ হইতে, শীতলা, বিষহরি, মঙ্গলচণ্ডী, মাণিকপীর, মায় সিন্দুরমাখান কাঠ পাথর নোড়ানুড়ি প্রভৃতি অনেক ছোটবড় দেবতা আছেন। সংসার ধর্ম্ম পালন করিতে হইলে সকল দেবতাকেই সন্তুষ্ট রাখা প্রয়োজন। আবার এদিকে আপিস দেবতাদের মধ্যে বড় সাহেব, ছোট সাহেব হইতে বড়বাবু ছোটবাবু, মায় আরদালী চাপরাসী প্রভৃতি ছোট বড় অনেকেই আছেন; চাকুরী বজায় রাখিতে হইলে সবাইকেই খুসী রাখিতে হয়। ব্রহ্মা বিষ্ণুর চেয়ে অনেক সময় শীতলা মনসাকেই বেশী ভয় করিতে হয়; বড়সাহেবের চেয়ে তাঁর কেরাণী চাপরাসীদের বিষ অনেক বেশী, সুতরাং তাহাদের খাতির একটু বেশী রকমই করা প্রয়োজন। কালভৈরবের পূজা না দিলে বাবা বিশ্বনাথের দর্শন পাওয়া যায় না। চাপরাসী সাহেবকে দর্শনী না দিলে কলির মহাদেব বড়সাহেবের নিকট দর্শন-প্রার্থনাসূচক লিপি অথবা কার্ড মোটেই পৌঁছে না, সুতরাং দেবদর্শন ভাগ্যে ঘটে না। চাঁদসওদাগর, মহেশ্বরের একজন অনুগৃহীত ভক্ত হইয়াও মনসার পূজা না দেওয়ায় অনেকখানি নাকানি চুবানী খাইয়াছিলেন; অনেক বড় চাকুরে আপিসের বাবুদের পূজাখাতির না করায়, বড়সাহেবের পরিচিত ও অনুগৃহীত কর্ম্মচারী হওয়া সত্ত্বেও অনেক ঘোর রূপ শীতল পানীয় ভক্ষণ করিয়া থাকেন। সুতরাং নোড়ানুড়ি, সিন্দুরমাখান কাঠপাথরকে সব জায়গাতেই একটা করিয়া গড় করা উচিত, কারণ কোন দেবতা কিসে রুষ্ট হন বলা যায় না; তাই বাছবিচার না করিয়াও একটা একটা গড় করাই ভাল। চাকুরী করিতে হইলে আপিসের সাহেব, বাবু, চাপরাসীর ত কথাই নাই, এমন কি সাহেব দেখিলেই—তা তিনি গৌরাঙ্গই হউন আর মেটেঅঙ্গই হউন সরকারীই হউন আর বেসরকারীই হউন, পরিচিতই হউন আর অপরিচিতই হউন—সবাইকে একটা করিয়া সেলাম ঠোকা নিতান্তই প্রয়োজন, কি জানি কোনটা কোন সময় কোন কাজে লাগিয়া যায় তার স্থির ত নাই,—ও দুই চারিটা সেলাম খরচ করিতে কার্পণ্য করা উচিত নহে। জাত সাপের যেমন ছোট বড় নাই, ও সাহেবের মধ্যেও কোন ছোট বড় নাই, সবাই মনিবের জাত—অন্ততঃ চাকুরী প্রয়াসী ও চাকুরীজীবী বাঙ্গালীর পক্ষে।

শুধু সৎকর্ম্মে দেবতা তুষ্ট হন না,—স্তব চাই, স্তোত্র শ্লোক। শুধু কৃতিত্বে চাকুরীর উন্নতি হয় না,—খোসামোদ চাই। কৃতিত্ব না থাকিলেও শুধু খোসামোদে জোরেও অনেক দূর পর্য্যন্ত চলিতে পারে। ভিতরে কোন

গুণ থাকুক আর নাই থাকুক, ছাপাকাটা মোটামার্কা ও কুঁড়োজালির প্রভাবে যেমন অনেক অপহৃতা সংসারে ধার্ম্মিক নামে চলিয়া যায়, তেমনি অনেক অকর্ম্মাও শুধু লেফাপা ও কেতা দোরস্তের জোরে, সেলামের বহরে কাজের লোক বলিয়া প্রমাণিত হয়। যাঁহারা বাহিরে মালা জাপ করেন, কিন্তু গোপনে পরস্বাপহরণ করেন, প্রকাশ্যে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা ও গোপনে বারাঙ্গণা প্রতিপালন করেন, তাঁহারাও সংসারে বেশ সাধু নামে পরিচিত হন। তেমনি যাঁহারা সরকারী কার্য্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া উৎকোচ গ্রহণ ও অন্যান্য নানা প্রকার অপকার্য্য সাধন করেন, তাঁহারাও শুধু লম্বা সেলাম দোরস্ত লেফাপা, ফোঁপরদালালী ও ডালি ইত্যাদির সাহায্যে নিজেদের কর্ম্মিষ্ঠ কর্ম্মচারীরূপে প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন। এই ডালি' শব্দের মধ্যে একটি ছোট খাট গূঢ় তথ্য নিহিত আছে, তাহার কিঞ্চিৎ বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। 'ডালি' শব্দে বংশ বা বেত্র নির্ম্মিত নাতিসুবৃহৎ আধার বিশেষ বুঝায়—ইহার অপর নাম ধামা। সাধারণতঃ বংশ নির্ম্মিত হইলে ডালি বলে—ইহা দিতে হয়। আর বেত্র নির্ম্মিত হইলে তাহার নাম ধামা—ইহা ধরিতে হয়। "ডালি দেওয়া" এই স্থানে আধার আধেয়ের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে (container for the contained), মোলায়েম ভাষায় ইহাকে প্রীতি-দান কহে; কার্য্যতঃ ইহা পূজার উপকরণ সংগ্রহ মাত্র। পারত্রিক মঙ্গলের জন্য স্তব ও পূজা যেমন প্রয়োজন, ঐহিক মঙ্গলের জন্য চাকুরের পক্ষে ধামা ও ডালিরও তদ্রূপ প্রয়োজন।

এই নিখিল বিশ্বসংসারে বিধাতার নিয়মে জীব যেমন জন্ম হইতে জন্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া থাকে, এই 'সার্ভিস' জগতে চাকুরীজীবীও তেমনি বদলী নিয়মের মাহাত্ম্যে স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিয়া থাকেন। যেমন কর্ম্মফল অনুসারে প্রাণিগণ উচ্চনীচ পর্য্যায়ে জীব জন্ম লাভ করে, তেমনি আপনার কৃতকার্য্যের সুকৃতি বা দুষ্কৃতি অনুসারে চাকুরেগণও ভাল বা মন্দ স্থানে ও কার্য্যে বদলী হইয়া থাকেন। জীবের যেমন পরমায়ুর পরিমাণের স্থিরতা নাই, তেমনি চাকুরীজীবীরও একস্থানে স্থিতির স্থিরতা নাই—যখন হুকুম বাহির হইবে তখনই তল্পী তুলিতে হইবে। চিত্রগুপ্তের খাতায় যেমন জীবের ইহজন্মের কৃতকর্ম্মের হিসাব নিকাশ লেখা থাকে, তেমনি চাকুরেদের সার্ভিসবুকেও তাহাদের ভালমন্দ সকল কর্ম্মেরই হিসাব নোট করা থাকে।

ইহ সংসারে মায়াবন্ধনে বদ্ধ হইয়া জীব যখন জড়িত হইয়া পড়ে, ভগবান্ তখন একে একে তাহার বন্ধনগুলি ছিন্ন করিয়া, তাহাকে অনেকটা নির্লিপ্ত করেন, এবং পরকালের চিন্তা করিবার অবসর প্রদান করেন। পাছে একস্থানে অধিক দিবস স্থিত হইলে স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সহিত আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের বন্ধনে কোন কর্ম্মচারী জড়িত হইয়া পড়েন, তাই পরমকারুণিক সরকার বাহাদুর মায়াবন্ধন ছিন্ন করিবার সুবিধা করিয়া দিতে ঘন ঘন বদলীর ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। বদলীর সময় উপস্থিত কর্ম্মক্ষেত্র ও অনেক দিনের পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের ছাড়িয়া যাইতে হয়, পাতান সংসার ওলটপালট করিয়া গুটাইতে হয়—ইহা কতকটা মহাপ্রস্থানের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। বোধহয়, সরকার বাহাদুরের বদলীর উদ্দেশ্য যে তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের মনে শেষের সেই দিনের কথা ইঙ্গিতে ধারণা করিয়া দেওয়া আর বুঝাইয়া দেওয়া যে, তোমরা সকলে এই সংসার প্রান্তরে পথিক মাত্র, পথ চলাই তোমাদের ব্যবসায়।

মৃত্যুর পর নির্ব্বাণ প্রাপ্তি আর চাকুরীর মেয়াদ শেষের পর পেন্‌সনপ্রাপ্তি। চাকুরের জীবনে ইহাই চরম লক্ষ্য, এই মোক্ষ অর্জ্জনের আশায় অনেকেই অনেক অকর্ম্ম কুকর্ম্ম করিয়া উপরওয়ালার মনস্তুষ্টি সাধনে প্রাণপণ করেন; অনেক গালি, অপমান, কাণমলা গলাধঃকরণ ও হজম করিয়া শেষ পর্য্যন্ত স্থির ও সহিষ্ণুভাবে চরম লক্ষ্য পেনসন মোক্ষে উপনীত হইতে প্রাণপাত করিয়াও চেষ্টা করেন। ভারবাহী জীবগণের মধ্যে গর্দ্দভ ও দার্জিলিংএর পাহাড়িয়া কুলী শ্রেষ্ঠ, কিন্তু অপমান লাঞ্ছনা গঞ্জনা প্রভৃতির বোঝা বহিবার শক্তিতে বাঙ্গালী চাকুরের মত সহিষ্ণু জীব এ জগতে মেলা ভার।

"গোলাম আলী"

নীরব প্রার্থনা

প্রাণ মোর যাহা চায়—
আমি পারি না ত ওহে প্রাণনাথ!
কথায় জানাতে তায়।
বলিবার কালে কথা নাহি মিলে
প্রকাশ হবে তা' কি কথা বলিলে
বুঝিতে না পারি, নয়ন সলিলে
বয়ান ভাসিয়া যায়!
বলি বলি তবু বলা যে হয় না
হৃদি শুধু গুমরায়।

তুমি—অন্তর যামী
অন্ধ হিয়ার
পড়ে' লও তুমি স্বামী।
আমি যাহা চাই জান ত সকলি,
আশাহত করি যেও নাক চলি'!
জানাতে জানি না,—হৃদয় আমার
সদা কার অনুগামী,
তাই জুড়ি কর সদা চেয়ে রই
তব মুখ পানে আমি।

শ্রীমুরারি ভূষণ মল্লিক।

ঈষ্টলীন

দ্বিতীয় খণ্ড—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মিসেস্ হেয়ারের স্বপ্ন

পূর্ব্ব বর্ণিত ঘটনার পরের দিনটি ছিল বড়ই সুন্দর ও মনোরম! নির্ম্মল মেঘশূন্য আকাশে সূর্য্য উঠিয়া—তাহার কিরণরশ্মি মিসেস্ হেয়ারের শয়নকক্ষে ছড়াইয়া দিল। মিসেস্ হেয়ার তখনও শুইয়াছিলেন—শুষ্ক গাল দুখানিতে তাঁর একটা উত্তেজনার ভাব লক্ষিত হইতেছিল—কোমল চোখ দুটি বড় উজ্জ্বল দেখাইতেছিল—যেন গত রাত্রিতে তিনি বড় একটা উদ্বেগ ভোগ করিয়াছেন। নিকটে একখানা চেয়ারে বসিয়া জাষ্টিস্ হেয়ার রাত্রিবাস পরিত্যাগ করিয়া প্যাণ্টালুন পরিতেছিলেন। প্যাণ্টালুন পরা হইলে তিনি ওয়াস্ ষ্ট্যাণ্ডের কাছে গিয়া মুখেচোখে খানিকটা জল দিয়া আসিলেন। জাষ্টিস্ ও মিসেস্ হেয়ার সেই সেকেলে লোক, পৃথক সজ্জা গৃহের আবশ্যকতা তাঁহারা বুঝিতেন না। শোবার ঘরই তাঁদের খুব প্রকাণ্ড ছিল। তাহাই সজ্জা-গৃহরূপে ব্যবহার করিতেন।

হাত মুখ ধুইয়া আসিয়া হেয়ার সাহেব স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আজ সকাল বেলায় কি খাইবে?"

"আমার একটু চা হইলেই হইবে। আর কিছু খাইতে পারি বোধ হয় না। বড় তৃষ্ণা বোধ হইতেছে।"

"সব বাজে কথা। একটা ডিম অন্ততঃ খাও।"

মিসেস্ হেয়ার স্বামীর দিকে তাকাইয়া একটু হাসিলেন, তারপর মৃদুভাবে একটু মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না রিচার্ড, আমি কিছুই খাইতে পারিব না। তবে বার্বারা সামান্য একটুকরা রুটি পাঠাইয়া দিতে পারে।"

জাষ্টিস্ হেয়ার একটু বিরক্ত ভাবে বলিলেন, "দেখ এন্ (Anne), সবই তোমার মনের অসুখ। তুমি যদি এ রকম অসুখ অসুখ না ভাব, তবে বেশ চলা ফেরা, খাওয়া দাওয়া করিতে পার। আর তা' না করিয়া বিছানায়

পড়িয়া থাকিয়া কেবল অস্থখের কথাই ভাব, আর অবিরত চা খাও। এই সবই তোমাকে দুর্ব্বল ও একেবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিতেছে!"

এই কথায় মিসেস্ হেয়ার যেন একটু অসন্তুষ্ট হইলেন। কহিলেন, "গত ফাল্গুন মাসে একবার বিছানায় শুইয়া ব্রেকফাষ্ট খাইয়াছিলাম। তারপর আজ পর্য্যন্ত আর কোন দিন এত অসুস্থ হইয়াছি বলিয়া মনে হয় না।"

"উঠিয়া বসিয়া যে খাইয়াছ তাতে ত ভালই ছিলে।"

"কিন্তু আজ আমার উঠিবার সাধ্য একেবারেই নাই। যাবার সময় এই জানালাটা খুলিয়া দিয় যাইও। একটু ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিলে বোধ হয় ভাল লাগিবে।"

"এই জানালাটা খুলিলেও তুমি বেশ হাওয়া পাইবে"—বলিয়া দূরের একটা জানালা খুলিয়া দিয়া মিঃ হেয়ার নীচে নামিয়া গেলেন! ইহাই তাঁহার প্রকৃতি। যদি তার স্ত্রী তাঁকে দূরের জানালাটা খুলিতে বলিতেন, তিনি নিকটেরটা খুলিয়া দিতেন।

তিনি নামিয়া গেলেন। দু'তিন মিনিট পরে বার্বারা দৌড়িয়া উপরে আসিল। গোলাপী মসলিনের পোষাকে তাকে বড়ই সুন্দর দেখাইতে ছিল। কাছে আসিয়া বার্বারা মাকে চুম্বন করিল।

গত কয়েক বৎসরে বার্বারার স্বভাবটি বড়ই কোমল, বড়ই মধুর হইয়া উঠিতেছিল যেন দুঃখই তার চরিত্রকে ধীর ও সংযত করিয়া তুলিতেছিল।

স্বভাবানুযায়ী মিষ্ট ভাবে বার্বারা জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তোমার কি আবার অসুখ করিয়াছে? এতদিন ত বেশ ভাল ছিলে। কাল যখন শুইতে যাও তখনও বেশ ছিলে-বাবা বলিলেন—"

বার্বারার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই মিসেস্ হেয়ার অত্যন্ত ভীত ভাবে ঘরের চারিদিক ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া অতি চাপা গলায় বলিলেন, "বার্বারা, মা আমার, আবার আমি সেই ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়াছি।"

একটু চমকিয়া উঠিয়া বার্বারা বলিল, "ওমা, কেন, কেন তুমি একটা ছাই স্বপ্ন দেখিয়া এমন অস্থির হইয়া পড়, এমন অসুস্থ হও? সব বিষয়ে তোমার এত বুদ্ধি, আর এ সময় সব ভুলিয়া যাও?"

"কি করিয়া আমি এ স্বপ্নের হাত হইতে রক্ষা পাই না?" বলিতে বলিতে তিনি কন্যার হাত দুখানি চাপিয়া ধরিয়া তাকে নিজের কাছে টানিয়া নিলেন। কহিলেন, "এই স্বপ্ন না দেখিয়াও পারি না, আর যখনই দেখিব তখনই অসুস্থ হইয়া পড়িব। কাল আমি বেশ ভাল ছিলাম, শুইতে যখন যাই তখনও বেশ ভাল ছিলাম। সমস্ত দিনে তার কথা একবারও ভাবিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তবু স্বপ্ন দেখিলাম, বল্ দেখি মা, আমি কি করিয়া রক্ষা পাই?"

"অনেক দিন তুমি এই ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখ নাই। হাঁ, কত দিন হবে মা?"

"সে অনেক দিনের কথা। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সেই যে একদিন রাত্রে গোপনে রিচার্ড আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল, তার পর আর তাকে স্বপ্নে দেখিয়াছি এরূপ মনে হয় না।"

"স্বপ্নটা কি খুব খারাপ রকমের?"

"হাঁ মা, খুবই খারাপ রকমের। আমি যেন দেখিলাম, সত্যই যে খুনী সে ওয়েষ্টলীনে আসিয়াছে—আমাদেরই কাছে আসিয়াছে, আর আমরা—"

মিসেস্ হেয়ার তাঁহার কথা শেষ করিতে পারিলেন না। ঘরের দরজা হঠাৎ খুলিয়া গেল এবং জাষ্টিস হেয়ারের কঠোর গম্ভীর মুখখানা দেখা গেল। তাঁকে দেখিয়া মিসেস্ হেয়ার ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন—বার্বারা তাড়াতাড়ি মার নিকট হইতে চলিয়া গেল। তাঁরা যে কি কথা বলিতেছিলেন হেয়ার সাহেব বোধ হয় তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তিনি বার্বারাকে ডাকিয়া অতি কর্কশভাবে বলিলেন, "বার্বারা, আজ কি তুমি খাইবে না? আমাকে কি একাই সব গুছাইয়া নিয়া খাইতে হইবে?"

মিসেস্ হেয়ার ধীরে অতি ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, "বার্বারা এখনই খাইতেছে রিচার্ড।" হেয়ার সাহেব দুমদাম করিয়া আবার নীচে চলিয়া গেলেন।

"বার্বারা, আমরা যে রিচার্ডের কথা বলিতেছিলাম, তা কি তোমার বাবা শুনিতে পাইয়াছেন?"

"কখনও না! অসম্ভব! দরজা বন্ধ ছিল, শুনিবার কোন উপায়ই ছিল না। যাক্, আমি আগে তোমার খাবার লইয়া আসি, তার পর তোমার স্বপ্নের কথা বলিও।" বার্বারা তখনই চলিয়া গেল। পিতার জন্য একটু কাফি তৈয়ারী করিয়া দিয়া যখন দেখিল, তিনি আহারে ব্যস্ত, তখন

কিছু চা ও রুটি লইয়া মার কাছে ফিরিয়া আসিল। মাকে খাইতে দিয়া বলিল, "এ'ন তোমার স্বপ্নের কথা বল মা।"

"তোমার খাবার যে ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে।"

"থাক্, তাহাতে কিছু হইবে না। তুমি কি রিচার্ডকে স্বপ্নে দেখিয়াছ ?"

"রিচার্ডের কথা বেশী নয়, তবে সে যে দূরে কোথায় আছে—আমার কাছে আসিতে পারিতেছে না—এই চিন্তার বেদনাটা আমার স্বপ্নের মধ্যে আগা গোড়াই ছিল। বার্বারা, তোমার বোধ হয় মনে আছে, সেইরাত্রে যখন রিচার্ডের সঙ্গে গোপনে আমার দেখা হয়, সে বলিয়াছিল, সে খুন করে নাই—আর একজন করিয়াছে।"

"হ্যাঁ, আমার বেশ মনে আছে।"

"বার্বারা, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, সে সত্য কথাই বলিয়াছিল !"

"আমারও মনে হয় রিচার্ড দোষী নয়।"

"বোধ হয় তোমার মনে আছে, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, অটোয়ে বেথেল খুন করিয়াছে কিনা—আমার যেন তারই উপরে কেমন সন্দেহ হইত। রিচার্ড বলিয়াছিল, বেথেল খুন করে নাই—আর কেহ করিয়াছে। বার্বারা, আমি স্বপ্নে দেখিলাম, সেই লোকই যেন ওয়েষ্টলীনে, এই বাড়ীতেই আসিয়াছে এবং অন্য পাঁচজন লোকের সঙ্গে আমরা যে ভাবে কথাবার্ত্তা বলি, তারও সঙ্গে এই সম্বন্ধে সেই ভাবেই কথা বলিতেছি। এমনভাবে কথা বলিতেছি যে, আমরা যেন জানি, সেই খুনী এবং সেই ভাবেই তার সঙ্গে কথা বলিতেছি। সে কিন্তু সে কথা অস্বীকার করিল। সে রিচার্ডের ঘাড়েই সব দোষ চাপাইতে লাগিল এবং অটোয়ে বেথেলের সঙ্গে চুপি চুপি কি বলাবলি করিতে লাগিল। পাছে রিচার্ডের ঘাড়ে সব দোষ চাপাইয় সে একেবারে খালাস হইতে পারে এবং রিচার্ডের সর্ব্বনাশ করিতে পারে, এই আশঙ্কা আমাকে অস্থির করিয়া তুলিল এবং তাহাতেই আমি জাগিয়া উঠিলাম।"

বার্বারা একটু চাপ্‌রা গলায় জিজ্ঞাসা করিল, "সেই লোকটি দেখিতে কি রকম ?"

"সে কথা আমি ঠিক করিয়া বলিয়া উঠিতে পারি না। তার চেহারাটা আমার মোটেই মনে নাই। দেখিতে সে ভদ্র-লোকের মত; এবং আমরা তার সঙ্গে আমাদের সমকক্ষ গৃহস্থরূপে ব্যবহার করিয়া কথা বলিতেছিলাম।"

কাপ্তেন থর্ন্‌এর কথাই বার্বারার মনে আসিতে লাগিল। কিন্তু তার নাম পূর্ব্বে মিসেস্ হেয়ারের কাছে বলা হয় নাই, এখনও বলিতে পারে না। বার্বারা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইল এবং দুইবার ডাকিয়াও মিসেস্ হেয়ার তার কোনও সাড়া পাইলেন না।

"আচ্ছা বার্বারা, তোর কি মনে হয় না যে, বিনা কারণে আমার এই স্বপ্ন দেখা কোন অমঙ্গলের পূর্ব্বলক্ষণ। আমার মনে হয়, এই খুনের ব্যাপার লইয়া নিশ্চয়ই শীঘ্র কোন গোলমাল হইবে।"

"আমি কিন্তু স্বপ্ন মোটেই বিশ্বাস করি না। অমুক স্বপ্ন অমুক বিষয়ের লক্ষণ, ইহা আমার কাছে পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত ও অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। তবে তোমার স্বপ্নের মানুষটার চেহারাটা যে কেমন সে কথা যদি তোমার মনে থাকিত, বড় ভাল হইত।"

এক টুকরা রুটি ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে মিসেস্ হেয়ার উত্তর করিলেন, "আমিও ত বুঝি যে, তাহা হইলে খুব ভাল হইত। তাকে দেখিতে ভদ্রলোকের মত, কেবলমাত্র এই টুকুই আমার মনে পড়ে।"

"সে কি দেখিতে খুব লম্বা, তার মাথায় কি কাল চুল ছিল ?"

মিসেস্ হেয়ার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "আমার কোনও কথাই মনে নাই মা। তার চুল কাল কি না, আমি বলিতে পারি না। তবে আমার মনে হয়, সে লম্বা ; কিন্তু সে বসিয়াছিল আর অটোয়ে বেথেল তার চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়াছিল। আমার যেন বোধ হইতেছিল যে রিচার্ড দরজার বাহিরে লুকাইয়া আছে। পাছে লোকটা বাহিরে যাইয়া তাকে দেখিয়া ফেলে, তাই যেন সে ভয়ে কাঁপিতেছিল। আমিও সেই আশঙ্কায় কাঁপিতেছিলাম। বার্বারা, সে যে কত বড়ই ক্লেশদায়ক স্বপ্ন, তা আর বলিতে পারি না।"

"মাগো, আর যেন তুমি এ রকম স্বপ্ন দেখিও না। এ স্বপ্ন তোমাকে একেবারে অস্থির করিয়া দেয়।"

"আচ্ছা বার্বারা, লোকটা লম্বা কি না, তার চুল কাল কি না, একথা জিজ্ঞাসা করিলে কেন ?"

মার প্রশ্নে বার্বারা একটা ব্যস্ত উত্তর করিল। সে যে কাহাকেও সন্দেহ করিতেছে একথা মিসেস্ হেয়ারকে বলা

।চিত হইবে না, কারণ তাহা হইল তিনি অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিবেন।

মিসেস্ হেয়ার আবার বলিতে লাগিলেন, "স্বপ্নটা এত স্পষ্ট, এত পরিষ্কার ছিল যে, যখন জাগিলাম, কতক্ষণের মধ্যে বিশ্বাস করিতে পারি নাই যে, প্রকৃত খুনী ওয়েষ্টলীনে নাই। সে এখানেই আছে অথবা শীঘ্রই এখানে আসিবে; এখনও আমার মনের মধ্যে সেই ভাবটা রহিয়াছে,—যদিও বুঝি, এ ধারণায় আমার কোন ভিত্তি নাই।" তারপর যেন হঠাৎ কোন দারুণ বেদনায় অধীর হইয়া মিসেস্ হেয়ার 'সাম্‌নের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কন্যার হাতের উপর মাথা রাখিয়া অত্যন্ত কাতর ভাবে বলিতে লাগিলেন, 'বার্বারা, বার্বারা, মা আমার, আর কত দিন এভাবে যাইবে? বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল, রিচার্ড আমার এখনও নির্ব্বাসিত।"

বার্বারা কোন কথা বলিল না। কি বলিয়া সে তাকে সান্ত্বনা দিবে, তার কিছুই বলিবার ছিল না, শুধু নিজের ঠোঁট দুখানি মার কপালের উপর রাখিল।

তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, "বার্বারা, মা আমার, রিচার্ডের কোন খবর পাইবার জন্য আমি বড় অস্থির হইয়া পড়িয়াছি। তাকে একবার দেখিবার জন্য আমার মন বড় ব্যাকুল হইয়াছে। আগামী ফাল্গুন মাসে সাত বৎসর হইবে সে গোপনে একবার আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল। সাত বৎসর হইয়া গেল, আর একবারও তার মুখখানি দেখিলাম না! সে বাঁচিয়া আছে কিনা সে খবরও পাইলাম না। আর কোনও মা কি আমার মত এত যন্ত্রণা কখনও ভোগ করিয়াছে?"

"মাগো, আর ও কথা ভাবিও না। ওতে যে তোমাকে বড় অসুস্থ করে।"

"আমাকে আর কি অসুস্থ করিবে বার্বারা? আমি ত অসুস্থ আছিই।"

"কিন্তু এই দুর্ভাবনা যে তোমার শরীর আরও খারাপ করিবে। লোকে বলে যে সাত বৎসরে সাধারণতঃ মানুষের জীবনে কিছু একটা পরিবর্ত্তন হয়। কে জানে মা, এবার রিচার্ডের সম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তন হইতেও পারে। হয়ত বা সে নির্দ্দোষী বলিয়াও সাব্যস্ত হইতে পারে। নিরাশ হইও না।"

"না মা, আমি নিরাশ হই না। মাঝে মাঝে শত চেষ্টা সত্ত্বেও মন খারাপ হইয়া যায়; কিন্তু সেটা নিরাশা নয়। আমি বিশ্বাস করি, খুবই বিশ্বাস করি, যে এক-দিন না একদিন ভগবান সত্য প্রকাশ করিবেন। আমি যে ভগবানকে বিশ্বাস করি, তবে নিরাশ হইব কেমন করিয়া মা?"

কতকক্ষণ পর্য্যন্ত মা ও মেয়ে কেহই কোন কথা বলিলেন না। তারপর বার্বারা সেই নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিল তাঁর জন্য আর কিছু চা আনিবে কি না।

"না, মা, তোমার আর উপরে আসিতে হইবে না। কিছু চা পাঠাইয়া দিও। আমার তৃষ্ণা এখনও যাইতেছে না। তুমি নীচে থাকিয়া তোমার খাবার খাইও। তুমি যদি এখন কিছু না খাও, তবে তোমার বাবা না জানি কি সন্দেহ করিবেন। তোমার মুখে যেন দুঃখের কোন চিহ্ন না থাকে। আমার সব সময়ই ভয় হয় যে, আমাদের বিষণ্ণ মুখ দেখিলে পাছে তিনি সন্দেহ করেন যে আমরা রিচার্ডের কথা ভাবিতেছি।"

"তা সন্দেহ করেন করিবেন! আমাদের চিন্তা নিশ্চয়ই স্বাধীন।"

মেয়ের এই কথা শুনিয়া মিসেস্ হেয়ার একটু চাপা গলায় বলিলেন, "চুপ কর, বার্বারা, চুপ কর। রিচার্ডকে শাস্তি দিবার জন্য তিনি কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তা ত' জানিস্। তিনি যে রিচার্ডকে প্রকৃত দোষী বলিয়া মনে করেন সে কথাও তুই জানিস্। যদি তিনি বুঝিতে পারেন যে, আমরা রিচার্ডকে নির্দ্দোষ বলিয়া মনে করি, তবে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড খুঁজিয়া তাঁকে বাহির করিয়া আদালতের কাছে সমর্পণ করিবেন। তোর—বাবা—এত বড়—"

মার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বার্ব্বারা বলিয়া ফেলিল "মূর্খ"।—বলিয়াই সে বুঝিল তার পক্ষে এরূপ কথাটা বলা বড়ই অন্যায় হইয়াছে এবং লজ্জায় তার ঠোঁট দুখানি ফুলিয়া উঠিল।

"মূর্খ নয় বার্বারা, আমি বলিতে যাইতেছিলাম এত বড় সাধু।"

বার্বারা উত্তর করিল, "যদি তিনি তার নিজের ছেলেকে সমস্ত দেশ খুঁজিয়া বাহির করিয়া মৃত্যুর হাতে সঁপিয়া

কেন, তবে সেটা তাঁর পক্ষে সাধুতা না হইয়া বরং একটা বড় অস্বাভাবিক নিষ্ঠুরতার কাজই হইবে।" বলিতে বলিতে বার্বারার চোখ দুটি জলে ভরিয়া উঠিল। কিন্তু তখনই সে জল ভাল করিয়া মুছিয়া ফেলিল এবং ধীরে ধীরে খাইবার ঘরে প্রবেশ করিল।

বাড়ীতে কোন অতিথি অভ্যাগত না থাকিলে হেয়াররা সাধারণতঃ চারটার সময় ডিনার খাইতেন। সেদিনও চারটা বাজিলে তাঁহারা আহারে বসিবেন। মিসেস্ হেয়ার তখন অপেক্ষাকৃত একটু ভাল ছিলেন। জাষ্টিস্ জয়েসের বিপদের সংবাদ দিলেন। জয়েসকে সবাই খুব ভাল বাসিতেন। তাই তার এই বিপদের সংবাদ পাইয়া সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন।

আহারের পর হেয়ার সাহেব অন্য একজন বিচারক হারবার্ট সাহেবের সঙ্গে বসিয়া চুরুট খাইতে লাগিলেন।

বার্বারা পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, তিনি চা খাইতে বাড়ী আসিবেন কিনা। হেয়ার সাহেব বলিলেন, "সে কথায় তোমার দরকার কি?"

"কিছু না, তবে যদি আপনি আসেন, আমরা আপনার জন্য অপেক্ষা করিব।"

মিসেস্ হেয়ার কহিলেন, "আমার মনে হয় তুমি বলিয়াছিলে যে, বৈকালটা তুমি হারবার্ট সাহেবের সঙ্গে কাটাইবে।"

"হ্যাঁ বলিয়াছিলাম, কিন্তু বার্বারা বড় বেশী কথা বলে।"—বলিয়া হেয়ার সাহেব বাহির হইয়া গেলেন। পিতা বাহির হইয়া গেলেন দেখিয়া বার্বারা যেন বেশ একটা আনন্দ অনুভব করিল। মনের আনন্দে সুন্দর একটি গান গাহিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিল, এখন তাঁকে চা আনিয়া দিবে কি না।

"এখন ত আর তোমার সাতটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে না।"

"বার্বারা, জয়েসের বিপদের সংবাদ পাইয়া আমি বড় কষ্ট পাইয়াছি। চল একবার ঈষ্টলীনে গিয়া তাকে দেখিয়া আসি।"

ঈষ্টলীনে যাইবার কথা শুনিয়া বার্বারার হৃদয়ের স্পন্দন দ্রুত হইতে লাগিল। তার প্রেম বড় পবিত্র, বড় মধুর। সে প্রেম কোন সময়ের বা পরিবর্ত্তনের নিয়মাধীন নয়। সেই প্রেম হৃদয়ের মধ্যে গোপন থাকায় যেন তার গভীরতা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। বার্বারার বাহ্যিক ব্যবহার দেখিয়া কেহ কি মনে করিতে পারে যে, তার হৃদয়ে একজন আছেন, যিনি তার সমস্ত প্রাণ জুড়িয়া রহিয়াছেন; অথচ আর সেখানে থাকিবার কোন অধিকার তাঁর নাই। তাই সে তার প্রেমাস্পদের কাছে যাইতে পারে—এই সংবাদে তার সমস্ত শরীর যেন আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল।

"হাঁটিয়া যাওয়া কি তোমার পক্ষে উচিত হইবে মা?"

"হ্যাঁ, আমি বেশ হাঁটিতে পারিব। হাঁটা এখন আমার বেশ অভ্যাস হইয়াছে। তবে কখন যাইবে বার্বারা?"

"সাতটায় গেলে তখন তাদের খাওয়া হইয়া যাইবে।"

"হাঁ, তবে যাইবার আগে আমাকে একটু চা দিও।"

বার্বারা মাকে চা আনিয়া দিল। চা খাওয়া শেষ হইলে তাঁহারা ঈষ্টলীনের দিকে রওয়ানা হইলেন। বড় সুন্দর বৈকাল। বেশ মিষ্ট একটু উষ্ণ হাওয়াও ছিল। মিসেস্ হেয়ার প্রথম প্রথম বেশ চলিতে লাগিলেন, কিন্তু ঈষ্টলীনে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। সাধারণতঃ তিনি এতদূর হাঁটিতে কোনদিনই সাহস করেন নাই, তার পর প্রাতঃকালের উত্তেজনা তাঁর শরীর আরও খারাপ করিয়া দিয়াছে। বাগানে ঢুকিবার সময় লোহার দরজার উপর ভর করিয়া মিসেস্ হেয়ার চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন, "বার্বারা, এতটা পথ হাঁটিয়া আসিয়া আমি বড়ই অন্যায় করিয়াছি।"

"আমার উপর ভর করিয়া আস্তে আস্তে ওই বেঞ্চিগুলির কাছে চল। সেখানে বসিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া তবে বাড়ীর ভিতর যাইব। আজ দিনটা বড় গরম কি না, তাই তোমাকে এত ক্লান্ত করিয়াছে।"

আস্তে আস্তে বেঞ্চির কাছে যাইয়া মিসেস্ হেয়ার পড়িলেন। বসিয়া কার্লাইল, তাঁহার স্ত্রী ও ভগ্নী, এবং তাঁহাদের অতিথি ফ্রান্সিস্ লেভিসন তখন সান্ধ্যভোজের পর বাগানে বেড়াইতেছিলেন। মিসেস্ হেয়ার ও বার্বারাকে দেখিয়া তাঁহারা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লেডী ইজাবেল মিসেস্ হেয়ারকে অতি আদরে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। ইহাকে তিনি বড় শ্রদ্ধা করিতেন। মিঃ কার্লাইল যখন মিসেস্ হেয়ারের করমর্দ্দন করিতে গেলেন তখন

তিনি বলিলেন, "আমি একজন বড় অদ্ভুত মানুষ, মা আর্কিবাল্ড। নিজেই রোগী হইয়া অপর একজন রোগীর খোঁজ নিতে আসিয়াছি।—জয়েসের কথা শুনিয়া আমি বড় ব্যস্ত হইয়াছি।"

লেডী ইজাবেল বলিলেন, "যদি আসিয়াছেন তবে সন্ধ্যাটা এখানেই কাটাইতে হইবে। এতে আপনার একটু বিশ্রাম হইবে, একটু চা খাইলে শরীরটাও বেশ সুস্থ হইবে।"

"না, আর চা চাই না। আমি চা খাইয়া আসিয়াছি।"

"তাতে কি আর একবার চা খাওয়া যায় না? না, আপনাকে এত ক্লান্ত দেখাইতেছে যে, আপনাকে এখানে দু' এক ঘণ্টা বন্দী থাকিতে হইবে।"

"হাঁ, আমি বড়ই ক্লান্ত হইয়াছি।"

ক্যাপ্টেন লেভিসন্ একটু দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন এবং নিজের মনে বলিতেছিলেন, "কে এরা? যুবতীটি ত বড় সুন্দরী! উহার সঙ্গে আলাপ করিতেই হইবে। বোধ হয় কোন গোল করিবে না।"

লেভিসন্ তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কার্লাইল তাঁদের পরিচয় করাইয়া দিলেন। সামান্য আলাপের পর লেভিসন কার্লাইলের ছেলেটির সঙ্গে খেলা করিতে করিতে দূরে চলিয়া গেলেন। লেডী ইজাবেল ও মিস্ কার্লাইল যখন মিসেস্ হেয়ারের সঙ্গে কথা বলিতে ব্যস্ত, তখন কার্লাইল বার্বারার সঙ্গে গল্প করিতে করিতে একটু দূরে চলিয়া গেলেন। কার্লাইল কহিলেন, "তোমার মাকে কি ভয়ঙ্কর রোগা দেখাইতেছে!—সম্প্রতি ত তিনি বেশ ভালই ছিলেন।"

"এখানে হাঁটিয়া আসিয়া তিনি বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাই তাঁকে এখন এত খারাপ দেখাইতেছে। তবে আজ তাঁর মনটা বড় বেশী খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল কেন জান?"

কার্লাইল বিস্মিত ভাবে বার্বারার মুখের দিকে চাহিলেন।

বার্বারা বলিতে লাগিল, "আজ সকালে বেলায় বাবা নীচে আসিয়া আমাকে বলিলেন যে, মা আবার আগের মত অরে...অস্থিরতায় কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। বাবার কথা শুনিয়া আমি মনে মনে ভাবিলাম, তবে কি মা আবার সেই স্বপ্ন দেখিয়াছেন? তুমি ত জান যে, ওই স্বপ্ন দেখিয়া মা কেমন অস্থির হইয়া পড়েন। আমি তাড়াতাড়ি উপরে গেলাম। যাইতেই মা বলিলেন, তিনি আবার সেই ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়াছেন।"

"আমি ভাবিয়াছিলাম, তিনি বোধ হয় ওই ভয়ের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন—ভাবিয়াছিলাম যে, তিনি বোধ হয় এতদিনে বুঝিয়াছেন, স্বপ্নের কোন ভিত্তি নাই—যদিও তাঁর স্বপ্নের সঙ্গে সেই শোচনীয় রহস্যের একটা যোগাযোগ আছে।"

"মা যখন ওই স্বপ্ন দেখেন তখন তাঁর সঙ্গে যুক্তি তর্ক করায় কোন ফল নাই। আজ সকাল বেলায়ও আমি তাঁকে একথা বলিয়াছিলাম। তিনি শুধু বলিলেন, কি করিয়া তিনি তাঁর মনের ভাব চাপিয়া রাখিবেন! তিনি ত রিচার্ডের কথা ভাবেনও নাই, তবু সে স্বপ্ন আসিয়া তাঁকে দিশাহারা করিয়া তুলিল। সত্যসত্যই মা যেন কিছুতেই এ স্বপ্নের হাত এড়াইতে পারিতেছেন না।"

কার্লাইল হঠাৎ কোন কথা বলিলেন না। পায়ের কাছে ছেলেদের একটা বল পড়িয়াছিল। সেটা তুলিয়া নিয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে আস্তে আস্তে বলিলেন, "এটা কিন্তু বড়ই অদ্ভুত যে রিচার্ডের কোন খবর পাওয়া যাইতেছে না।"

"সত্যই, মা এরই জন্য এত অধীর। আজ সকাল বেলায় যে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন তাহাতেও ইহা বুঝা যায়। আর্কিবাল্ড, আমি স্বপ্ন বিশ্বাস করিনা বটে, কিন্তু মা যে স্বপ্ন দেখেন, বিশেষ কাল রাত্রে যে স্বপ্ন দেখিয়াছেন তার সঙ্গে মনে হয় ওই রহস্যের কেমন-যেন একটা সম্বন্ধ আছে।"

কার্লাইল জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি?"

"তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন যে, প্রকৃত খুনী ওয়েষ্টলীনে আসিয়াছে। সকাল বেলায় আমাদের বাড়ী গিয়াছিল। আমি আর মা তার সঙ্গে ওই খুনের সম্বন্ধেই কথা বলিতেছি। সে অস্বীকার করিয়া রিচার্ডের উপরেই দোষ চাপাইল। ফিরিয়া আবার অটোয়ে বেথেলের কাণে কাণে কি বলিল। বেথেল তার চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়াছিল। এও কিন্তু বড় অদ্ভুত।"—বলিয়া বার্বারা তার নীলচোখ দুটি উঁচু করিয়া কার্লাইলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে চোখে যেন তার হৃদয়ের বেদনা প্রতিভাত হইতেছিল।

মিঃ কার্লাইল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি অদ্ভুত তোমার কথা—যেমন হেঁয়ালির মত বোধ হইতেছে!"

"অদ্ভুত এই যে অটোয়ে বেথেলই সব সময় তাঁর স্বপ্নে দেখা দিবে। রিচার্ডের সেদিন আমাদের সঙ্গে গোপনে দেখা করিতে আসিবার পূর্ব্বে আমাদের কথন মনে হয় নাই যে, বেথেল ঘটনাস্থলের নিকটে ছিল, কিন্তু স্বপ্নে সে সব সময়ই দেখা দিয়াছে। যদিও রিচার্ড মাকে বারে বারে বলিয়াছিল যে বেথেলের সে খুনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই, কিছু থাকিতে পারে না; তবু যে মা সেকথা বিশ্বাস করেন এরূপ মনে হয় না। তাঁর যেন এখনও বিশ্বাস যে প্রকৃত খুনী না হইলেও ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন না কোন সংস্রব তার আছে। রিচার্ডের আসিবার পর হইতে কাল রাত্রির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি এ সম্বন্ধে কোন স্বপ্ন দেখেন নাই; কিন্তু কাল রাত্রের স্বপ্নে আবার বেথেলকে দেখিয়াছেন। এটা একটু অদ্ভুত নয় কি আর্কিবাল্ড্?"

যে বিষয় নিয়া মানুষ কোন প্রকারের কোন ঠাট্টা করে না—সে বিষয়ে কথা বলিতে হইলে যেরূপ গম্ভীর ভাবে বলিতে হয় সেরূপ গম্ভীর ভাবে কার্লাইল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মার স্বপ্নের সেই খুনী কে?"

"সে কথা তিনি ভাল করিয়া মনে করিতে পারেন না। তবে দেখিতে সে এক ভদ্রলোকেরই মত এবং আমরা যেন তার সঙ্গে আমাদেরই সমকক্ষ লোকের মত কথা বলিতেছিলাম। এও কিন্তু বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার! আমি তাঁকে কোন দিনই বলি নাই যে, আমরা কাপ্তেন থর্ণকে সন্দেহ করি। রিচার্ড বলিয়াছিল যে অন্য একজন খুন করিয়াছে, কিন্তু সে যে কে—কোন সমাজে সে চলা ফেরা করে সে বিষয়ে সে মাকে কোন কথাই বলে নাই। আমার মনে হয় যে মা যদি স্বপ্নে দেখিতেন, সে একজন অজানিত অপরিচিত লোক তবেই বোধ হয় স্বাভাবিক হইত। সাধারণতঃ আমরা ভদ্রলোককে খুনী বলিয়া সন্দেহ করি না, কিন্তু মা স্বপ্নে দেখিলেন খুনী একজন ভদ্রলোক।"

কার্লাইল একটু হাসিয়া বলিলেন, "তোমার কথা শুনিয়া মনে হয় বার্বারা, যে তুমিও স্বপ্নে বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছ।"

"না, না, আমি স্বপ্নে মোটেই বিশ্বাস করি না; কিন্তু রিচার্ডের জন্য আমি বড় অস্থির হইয়াছি। যদি এ রহস্য ভেদ করিবার শক্তি আমার থাকিত, তবে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া দেখিতাম। এই সত্য বাহির করিবার জন্য পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত খালি পায়ে হাঁটিয়া যাইতেও আমি প্রস্তুত। যদি থর্ণ একবার ওয়েষ্টলীনে আসিত তবে যে ভাবেই হউক, আমি তাকে বুঝিতে দিতাম যে আমরা তাকে সন্দেহ করি—"

"থর্ণ যে ওয়েষ্টলীনে আসিয়া আমাদের দেখা দিতে খুব ব্যস্ত এরূপ তো—"

কার্লাইলের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বার্বারা তাঁর হাত টানিয়া তাকে কথা বলিতে নিষেধ করিল। তাঁহারা কথা বলিতে বলিতে বাগানের এক প্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। চতুর্দ্দিকে কৃত্রিম পাহাড়ে ঘেরা একটা নির্জ্জন রাস্তায় তখন তাঁহারা পৌঁছিয়াছিলেন। যে পাহাড়ের গোড়ায় কার্লাইল ও বার্বারা দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহারই মাথায় কাপ্তেন লেভিসন বসিয়াছিলেন। অন্যদিকে তাকাইয়া যেন ছেলেদের সঙ্গে খেলা দেখায় খুব ব্যস্ত এরূপ একটা ভাব তাঁহার দেখা যাইতেছিল। তাঁহাদের সেখানে আসাটা তিনি টের পান বা না পান, সেদিকে ফিরিলেন না। কার্লাইল ও বার্বারা দ্রুত সেস্থান ত্যাগ করিয়া অন্যান্য সব লোক যেখানে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন সেইদিকে চলিলেন। বার্বারা একটু চাপাগলায় জিজ্ঞাসা করিল, "আমরা যা বলিতেছিলাম লেভিসন কি তাহা শুনিয়াছে?"

কার্লাইল বার্বারার দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "একেবারে অন্যমনস্ক না থাকিলে নিশ্চয়ই কিছু শুনিয়াছে। আর শুনিলেই বা এমন ক্ষতি কি? কাপ্তেন থর্ণ যে খুনী, আমি এই কথা বলিতেছিলাম। তুমি ত রিচার্ডের কথা বলিতেছিলে না, তবে আর ভয় কি? লেভিসন্ এ বিষয়ের কিছুই জানে না, আর তার সঙ্গে এর কোনও সম্বন্ধও নাই। যদি সে থর্ণের নাম শুনিয়াও থাকে, আমরা কি বিষয়ে কথা বলিতেছি তাহা যদি বুঝিয়াও থাকে, তবুও কিছু যায় আসে না। আমাদের কথা তার এক কাণ দিয়া গিয়াছে অন্য কাণ দিয়া বাহির হইয়াছে। কোন চিন্তা করিও না বার্বারা!"

কথা বলিবার সময় কার্লাইল বার্বারার দিকে অতি স্নেহ-কোমল দৃষ্টিতেই তাকাইতেছিলেন। লেডী ইজাবেল তাহা লক্ষ্য করিলেন। তাঁহার মনে কোন ঈর্ষা উদয় হওয়া উচিত নয়, কারণ তাঁহাদের মনে তো কোন মন্দ অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু তিনি সব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অন্যদিকে চলিয়া যাওয়াও তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং স্থির

করিলেন এ সমস্তই তাঁহাদের পূর্ব্ব সংকল্পিত। তাঁহার দৃষ্টির বাহিরে কার্লাইল ও বার্বারা কিছুকালের জন্য পরস্পরের সঙ্গ ভোগের জন্যই তাঁদের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। তার মনোরম পোষাকে, তার উজ্জ্বল নীল চোখে, তার অতি সুন্দর দেহসৌষ্ঠবে এবং সর্ব্বোপরি তার অতি সুন্দর বর্ণে বার্বারাকে আজ বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। এ অবস্থায় কার্লাইল কেন, অন্য যে কেহ তার সঙ্গে একটু কাল কাটাইবার জন্য প্রলুব্ধ হইতে পারে। বার্বারা তাঁদের নিকট আসিতেই মিসেস্ হেয়ার বলিলেন, "বার্বারা, এখন আমরা বাড়ী ফিরি কেমন করিয়া? বেঞ্জামিনকে গাড়ী নিয়া আসিতে বলিলে বড় ভাল হইত।"

কার্লাইল বলিলেন. "আমি তাকে খবর পাঠাইতে পারি।"

"না. না, তোমাদের চাকরবাকরকে হঠাৎ আসিয়া এ ভাবে কষ্ট দেওয়া আমাদের উচিত হইবে না।"

কার্লাইল একটু বিদ্রূপের ভাবে উত্তর করিলেন, "হাঁ, বড়ই কষ্ট হইবে বটে! যে চাকরটি যাইবে সে এই ক্লেশে একেবারে সারা হইয়া যাইবে। বাস্তবিক মিসেস্ হেয়ার, আপনি নিজের অপেক্ষা পরের জন্য অনেক বেশী ব্যস্ত।"

"আর্কিবাল্ড, তোমার গুণের যথেষ্ট প্রশংসা করা আমার অসাধ্য।" বলিয়া মিসেস্ হেয়ার লেডী ইজাবেলের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "লেডী ইজাবেল, আমার যদি এখন কাচা বয়স থাকিত আমি তাহা হইলে আপনার স্বামীভাগ্যে হিংসা করিতাম। কার্লাইলের মত স্বামী পাওয়া স্ত্রীলোকের মহাভাগ্যের ফল। তাঁর মত লোক অত্যন্ত বিরল।"

মিসেস্ হেয়ারের এই কথায় বোধ হয় লেডী ইজাবেলকে মনে করাইয়া দিল যে আর একজন আছে, যার বয়স কাচা, সে তাহাকে হিংসা করে। ইজাবেলের গাল দুখানি লাল হইয়া উঠিল। কার্লাইল মিসেস্ হেয়ারকে ঘরে গিয়া বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিলেন। এবং তাঁর হাত ধরিয়া তিনি ঘরের দিকে যাইতেছিলেন এই সময় রাস্তায় একটি ভদ্রলোকের দিকে মিসেস্ হেয়ারের দৃষ্টি পড়িল। তিনি তাড়াতাড়ি বার্বারাকে বলিলেন; "বার্বারা, যা' শীঘ্র ছুটিয়া যা! ওই বুঝি টম্ হারবার্ট আমাদের বাড়ীর দিকে যাইতেছে। আমাদের বাড়ী যাইয়া গাড়ীখানা পাঠাইবার কথা ওকে বলিয়া আয়। তাহাহইলে কার্লাইলের চাকরদের আর কষ্ট করিতে হইবে না।"

বার্বারা মার কথায় দৌড়িয়া রাস্তার দিকে চলিয়া গেল। তাহাকে যে নিষেধ করিবেন কার্লাইলের এমন সুযোগ হইল না। বার্বারাকে তাঁর দিকে আসিতে দেখিয়া টম হারবার্ট একটু দাঁড়াইলেন। বার্বারা তাঁহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল,"আপনি কি বাড়ীর নিকট হইয়া যাইবেন?"

টম্ হারবার্ট ভদ্রতার বড় বেশী ধার ধারিতেন না। তিনি তার স্বাভাবিক রুক্ষ স্বরে বলিলেন,—

"হাঁ, কেন?

"মা বলিলেন, আপনি যদি আমাদের বাড়ী যাইয়া বেঞ্জামিনকে গাড়ী নিয়া এখানে আসিতে বলিয়া দেন তবে বড় ভাল হয়। হাঁটিয়াই বাড়ী ফিরিবেন মনে করিয়া মা তাকে কিছু বলিয়া আসেন নাই। কিন্তু এখন তিনি এত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে,হাঁটিয়া বাড়ী ফিরিতে আর ভরসা পান না।"

"বেশ, বলিয়া দিব। কখন গাড়ী চাই?"

সময়ের কথা তো মিসেস্ হেয়ার তাকে বলিয়া দেন নাই, তা সে তার নিজের ইচ্ছামতই বলিতে পারে। একটু ভাবিয়া বলিল, "১০টার সময় আসিতে বলিবেন, তাহা হইলে বাবার আগে আমরা বাড়ী পৌছিতে পারিব।"

টম্ হারবার্ট তার স্বাভাবিকভাবে উত্তর করিলেন, "হাঁ, তা' খুব পারিবে।—ভালকথা,বার্বারা, তুমি গোটাকত বনভোজনে যাইতে পারিবে?"

"খুব পারিব।"

"জ্যাক্ বাড়ী আসিয়াছে। আমাদের বাড়ীর মেয়েরা সেই উপলক্ষে কয়েকটা বনভোজনের যোগাড় করিবে।"

"হাঁ, কাল তাঁর একখানা চিঠি পাইয়াছিলাম। আজ সে আসিয়া পৌছিয়াছে। সে বলিয়াছে যে, এবার যদি মেয়েরা তার আমোদের জন্য বিশেষ যোগাড় না করে, সে আর ছুটীতে বাড়ী আসিবে না। তার আমোদের জন্য কিন্তু যথেষ্ট যোগাড় করিতে হইবে, বার্বারা,—বলিয়া হারবার্ট চলিয়া গেল।

অটোয়ে বেথেল নিকটে দাঁড়াইয়াছিল। সেও বার্বারাকে "গুড্ ইভ্নিং" বলিয়া অভিবাদন করিল। বার্বারা তাহাকে প্রত্যভিবাদন করিয়া ফিরিবে,—এমন সময়

পিছনে কার পায়ের শব্দ শুনিয়া সে ফিরিয়া দেখিল, দুইজন ভদ্রলোক পরস্পরের হাত ধরিয়া তার দিকে আসিতেছেন। উঁহাদের ভিতরে একজনকে চিনিল। সেই মেজর হারবার্ট —ওরফে "জ্যাক্।"

জ্যাক বার্বারার সঙ্গে করমর্দ্দন করিয়া বলিল, "কতদিন বাদে তোমার সঙ্গে দেখা বার্বারা, কিন্তু একদিনের জন্যও তোমার সুন্দর মুখখানি আমি ভুলি নাই। তখন তুমি ছোট্ট মেয়েটি ছিলে আর এখন মহিমাময়ী সুন্দরী যুবতী।"

বার্বারা হাসিয়া উত্তর করিল, "এই মাত্র তোমার দাদার কাছে শুনিলাম যে, তুমি ওয়েষ্টলীনে আসিয়াছ, কিন্তু এখনই এইখানে তোমার সঙ্গে যে আমার দেখা হইবে তা' ভাবি নাই। মিঃ হারবার্ট আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন যে আমি বন "

বার্বারা আর তার কথা শেষ করিতে পারিল না। একটা কি ভাবের উত্তেজনায় মুখখানি লাল হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সে রক্তিমা তখনই মিলাইয়া গেল। জন হার্বার্টের পাশে, তার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ও ব্যক্তি কে? সে ওমুখ মাত্র একবার দেখিয়াছে, কিন্তু একবারেই তা যেন আগুনের অক্ষরে তার মনে ছাপ পড়িয়া গিয়াছে। মেজর হারবার্ট কথা বলিতেছিলেন, কিন্তু বার্বারার যেন কোন জ্ঞান ছিল না। সে কোন কথা শুনিতে পারিতেছিল না —কোন কথার জবাবও দিতে পারিতেছিল না। একদৃষ্টে সে সেই মুখের দিকে তাকাইয়াছিল। তার সেই সুন্দর নীল চোখে কি যে উৎকণ্ঠা কি যে অস্থিরতা! কেমন একটা বিস্ময় ও ভয় তার মন ভরিয়া উঠিতেছিল। যে লোকটা তার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে—সে কি বাস্তবিকই মানুষ— না একটা স্বপ্ন মাত্র! মেজর হারবার্ট বার্বারার এই অন্যমনস্ক ভাব লক্ষ্য করিয়া ভাবিলেন, বোধ হয় তার বন্ধুর সঙ্গে পরিচিত না হওয়ায় বার্বারা একটু লজ্জা বোধ করিতেছে। তাই তিনি বার্বারাকে তাঁর বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া বলিলেন "উনি কাপ্তেন থর্ণ।"

বার্বারার জ্ঞান আবার ফিরিয়া আসিল। সে বুঝি তার ব্যবহার বড়ই খারাপ হইয়াছে। কথা বলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বাধিয়া যাইতে লাগিল। তবুও চেষ্টা করিয়া কোন রকমে সে বলিল, "কোথায় যেন উঁহাকে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হওয়ায় আমি কাপ্তেন থর্ণের দিকে তাকাইয়াছিলাম।"

"পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে দু'এক দিনের জন্য আমি ওয়েষ্টলীনে ছিলাম।"

"ঠিক। এবার কি কিছু দিন বেশী থাকিবেন?"

"আমাদের কয়েক সপ্তাহের ছুটী আছে। সব ছুটীটা এখানে থাকিব কি না বলিতে পারি না।"

বার্বারা তাঁদের নিকট হইতে চলিয়া আসিল। ফিরিয়া যাইবার সময় নানা চিন্তা তার মনে আসিতে লাগিল। দৌড়িয়া ঘরের মধ্যে গিয়া সে অন্যের অগোচরে কার্লাইলকে দরজার আড়ালে ডাকিয়া নিয়া বলিল, "আর্কিবাল্ড, আমি গোপনে তোমার সঙ্গে একটা কথা বলিতে চাই। একবার বাহিরে আসিতে পারিবে কি?"

কার্লাইল মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া বার্বারার সঙ্গে বাহিরে আসিলেন। তিনি কোন সতর্কতা অবলম্বন না করিয়া সাধারণ ভাবে চলিয়া আসিলেন। আর সতর্কই বা কি হইবেন? তাঁহার ত গোপন করিবার কিছু ছিল না। কিন্তু লেডী ইজাবেল সব লক্ষ্য করিলেন। বার্বারা, গোপনে কার্লাইলকে ডাকা, তাঁর ব্যস্ততা, সব তিনি দেখিলেন। তারপর জানালার কাছে গিয়া দেখিলেন, ঘর হইতে বাহির হইয়া বাগানের মধ্যে একটু নির্জ্জন স্থানে তাঁহারা যাইতেছেন। বালিকা ইজাবেল পিতার সঙ্গে যাইতেছিল। কার্লাইল তাহাকে ফিরাইয়া পাঠাইয়া দিলেন। লেডী ইজাবেল সব লক্ষ্য করিলেন। এ সমস্ত লক্ষ্য করিয়া—সে দিন তাঁর মনে যে সন্দেহ—যে ঈর্ষার উদয় হইয়াছিল, জীবনে আর কোনদিন অতটা হয় নাই।

বড় একটা দুঃস্বপ্ন দেখিতেছে এইরূপ ভাবে বার্বারা কার্লাইলকে বলিল—"আমি বুঝিতে পারিতেছি না আর্কিবাল্ড যে আমি জাগিয়া আছি না স্বপ্ন দেখিতেছি। তোমাকে এ ভাবে বাহিরে ডাকিয়া আনিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করিবে।"

কার্লাইল একটু ঠাট্টার ভাবে বলিলেন, "শুনি তোমার কি ভয়ানক গোপনীয় কথা বলিবার আছে।"

"আমরা মার স্বপ্নের কথা বলিতেছিলাম। তাঁর মনের বিশ্বাস যে, প্রকৃত খুনী ওয়েষ্টলীনে আছে এবং তিনি যে ভাবে কথা বলিতেছিলেন, তাহাতে মনে হয় যে শত যুক্তি, তর্ক সত্ত্বেও তিনি অন্যরূপ ভাবিতে পারেন না। কিন্তু এই মাত্র—"

বার্বারা এত উত্তেজিত হইয়াছিল যে ভাল করিয়া সে

কথাও বলিতে পারিতেছিল না। তার উত্তেজনা লক্ষ্য করিয়া —কার্লাইল বলিলেন, "তাহাতে কি হইয়াছে?"

বার্বারা উত্তর করিল, "আমি তাহাকে এইমাত্র দেখিয়াছি।"

কথাটা শুনিয়া বার্বারার বুদ্ধি ঠিক আছে কি না এই চিন্তায় যেন একটু সন্দেহে—একটু ভয়ে, ব্যস্ত হইয়া কার্লাইল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাকে দেখিয়াছ?" "কাকে?"

"আমি ইতিপূর্ব্বে তোমাকে না বলিয়াছিলাম যে যদি সে লোক আবার কোনদিন ওয়েষ্টলীনে আসে যে ভাবেই হউক আমি তাকে আমাদের সন্দেহের কথা বুঝাইয়া দিব। সে এখানেই আছে। আর্কিবাল্ড, আমি যখন টম্ হারবার্টকে গাড়ীর কথা বলিতে গেটের কাছে গিয়াছিলাম, তখন সেখানে তার ভাই মেজর হারবার্টও উপস্থিত ছিল। থর্ণ আর বেথেলও তার সঙ্গে ছিল। আমার কথা শুনিয়া তুমি বোধহয় আশ্চর্য্য হইতেছ আর্কিবাল্ড। বাস্তবিক আমি জাগিয়া আছি না স্বপ্ন দেখিতেছি বুঝিতে পারিতেছি না। শুনিলাম, তাদের কয়েক সপ্তাহ ছুটী আছে এবং সে ছুটীটা তারা এখানেই থাকিবে।"

"স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের এ বড় অদ্ভুত সামঞ্জস্য সন্দেহ নাই।"

বার্বারা সেই পূর্ব্বের মতই উত্তেজিত ভাবে বলিতে লাগিল, "যদিও থর্ণকে প্রকৃত খুনী বলিয়া বিশ্বাস করিতে আমার কোন সন্দেহ থাকিত, এখন আর তাহা নাই। মার স্বপ্ন ও তাঁহার মনের বিশ্বাস যে হেলিজনের হত্যাকারী ওয়েষ্টলীনে আছে—"

বার্বারা কথা শেষ করিতে পারিল না। রাস্তার মোড় ঘুরিতেই তাহারা দেখিল যে কাপ্তেন লেভিসন সেখানে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া বার্বারা বড় ত্যক্ত বোধ করিল। বোধহয় সে তাদের কথা কিছু কিছু শুনিয়াছে। লেভিসনকে বার্বারার মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। লেভিসন তাদের সঙ্গে সামান্য দু' একটা কথা বলিয়া একসঙ্গে যাইবার ভাব প্রকাশ করিল। তার সে ভাব লক্ষ্য করিয়া "আপনাদের কাছে আমি শীঘ্র যাইতেছি—" বলিয়া বার্বারাকে লইয়া কার্লাইল অন্যদিকে চলিয়া গেলেন। একটু দূরে যাইয়া বার্বারা হঠাৎ কার্লাইলকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কাপ্তেন লেভিসনকে পছন্দ কর কি?"

কার্লাইল উত্তর করিলেন, "পছন্দ করি এমন কথা বলিতে পারি না।"

"আমার মনে হয় ও আমাদের কথা শুনিবার জন্য ব্যস্ত।"

"না, না, তাতে ওর লাভ কি?"

বার্বারা এ বিষয়ে আর কোন কথা না বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "থর্ণের সম্বন্ধে এখন কি করা যায়?"

কার্লাইল বলিলেন, "এ সম্বন্ধে আমি যে তোমাকে কি বলিব তাহা ত বুঝিয়া পাইতেছি না। তার কাছে গিয়া তাকে একেবারে হেলিজনের হত্যাকারী বলিয়া অভিযুক্ত করিতে কিছু পারি না। আর রিচার্ড যার কথা বলিয়াছিল, এই যে ঠিক সেই থর্ণ তা ত নাও হইতে পারে?"

"কি করিয়া তুমি সন্দেহ করিতেছ তাই তো আমি বুঝিয়া পাই না। মার স্বপ্ন ও থর্ণের হঠাৎ এখানে আসা এসব কি যথেষ্ট প্রমাণ নয়?"

কার্লাইল একটু হাসিয়া বলিলেন," "না যথেষ্ট নয়। এখন আমাদের খুব সতর্ক হইয়া উহার হাবভাব লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে হইবে যে ওই খুনী কি না।"

বার্বারা অত্যন্ত কাতর ভাবে বলিল, "সে তো তবে তোমাকেই করিতে হইবে। আমি এই মাত্র বলিতেছিলাম যে যদি সে ওয়েষ্টলীনে আসে যে ভাবেই হউক আমি তাকে বুঝাইয়া দিব যে আমরা তাকেই খুনী বলিয়া সন্দেহ করি। সে ওয়েষ্টলীনে আসিয়াছে। এখন তো দেখিতেছি যে আমি কিছুই করিতে পারি না।"

তাঁহারা গৃহের দিকে ফিরিলেন। আর তাঁহাদের কিছু বলিবার ছিল না। কাপ্তেন লেভিসন ঘরে ঢুকিয়াছিলেন। লেডী ইজাবেল তখনও জানালার ধারে দাঁড়াইয়া তাঁহার কল্পিত দুঃখের কথা ভাবিতেছিলেন। ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে একটু বিদ্রূপের ভাবে লেভিসন বলিলেন, "এ মিস্ হেয়ার যুবতীটি কে? দু'জনের মধ্যে যেন কত বন্ধুতা। আজ বৈকালেই আমি তাঁদের দুবার গোপনে আলাপ করিতে দেখিলাম।" লেডী ইসাবেল বড় বিরক্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি আমাকে কিছু বলিলেন?"

লেভিসন আস্তে আস্তে অতি বিনীত ভাবে উত্তর করিল, "আমি আপনাকে অসন্তুষ্ট করিবার জন্য কিছু বলি নাই। আমি মিঃ কার্লাইল ও মিস্ হেয়ারের কথা বলিতেছিলাম মাত্র।" লেভিসন জানিতেন যে লেডী ইজাবেল তার পূর্ব্বের কথা শুনিয়াছেন।

ক্রমশঃ।

তা'র রূপ

নয়নে তাহার নীলোৎপলের দীপ্তি নাহিক মোটে।
সে নয়ন সাথে তুলনার তরে হরিণী এসে না জোটে।
খঞ্জন নাহি গঞ্জনা লভে বায়স সখ্য যাচে—
পারি আমি 'তিন সত্যি' করিতে ওগো তোমাদের কাছে।
মুখ খানি তার কি বলিব ভাই নহে পদ্মের মত,
মৃদু গুঞ্জনে 'আসি' অলি ভুল করে না ক' অবিরত।
যদিও পূর্ণচন্দ্র সদৃশ সুষমা নাহিক তার—
সাঁচ্চা বলিব মিলে শুধু তার আছে ঐ গোলাকার।
বেণী নয় তার নাগিনীর মত—চাচর চিকুর চুল।
রক্ত বরণ দন্ত দেখিয়া কুন্দ হয় না ভুল।
হাসি নহে তার চপলার মত ক্ষণিক সমুজ্জ্বল
কৌমুদী রাশি নহে সেই হাসি উচ্ছ্বাস অবিরল।
অশ্রুতে তা'র মুক্তা ঝরে না হাসিতে মাণিক নহে
কোকিল কাকলি নিন্দিত করি মোটেই কথা না কহে।
সপ্তস্বরের ঝঙ্কার নাহি কণ্ঠের মাঝে তার—
সেখানে কেবলি হেরি দিবানিশি ভারতীর হাহাকার।
অধর গোলাপে গঠিত নহে ত', ঠোঁট দু'টি নহে রাঙা
এখানে কখনো হয় নিক' সখে! মদনের ভুল ভাঙা।
তিল ফুল জিনি নাশা নয় তার, ফুল ধনু জিনি ভুরু
রম্ভার সাথে কোন কবি তার তুলনা করেনি উরু।
মৃদুল মন্দ গমনে তাহার করী না লজ্জা পায়।
কেশরীর মত কটি দেশ তার ক্ষীণ কভু নহে হায়!
গায়ের বর্ণ নহে ত' স্বর্ণ বিজয়ী চাঁপার মত;
অঙ্গঘ্রাণে নাহি বন ফুল ফোটে কহিব আর বা কত?
তার সিন্দুর-বিন্দু ললাটে ইন্দুর শোভা নহে,
নূপুরের রবে ভ্রমে আনমনে মরাল চেয়ে না রহে।
চম্পক জিনি অঙ্গুলী নহে, মৃণাল জিনিয়া পাণি;
তবু সুন্দর সকলি তাহার সে মোর হৃদয়-রাণী॥

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ

আনা

(১)

আষাঢ় মাসের পরমায়ু তখনো শেষ হয় নি। শেষ রাত্রিতে খুব জোরে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। প্রকৃতির আবিলতা দূর হয়ে বড়ই মনোলোভা হয়েছে। প্রশস্ত রাজ-পথগুলি ধূলিবিবর্জ্জিত হয়ে গৃহপ্রাঙ্গনের মত দেখাচ্ছে। দু'একটী মানুষ, দু'একখানা গাড়ী চল্‌তে আরম্ভ করেছে। প্রায় সকলেই আলস্য পরিহার করে দৈনিক কাজে প্রবৃত্ত হবার উদ্যোগ করছে, এমন সময়ে শয্যাত্যাগ করে তেতালা হ'তে একেবারে নীচে এসে চোখে মুখে জল দিলাম, তারপর দরওয়ানের তেপাইটী নিয়ে বাইরে বসলাম।

আমি এই প্রথম বাড়ীছাড়া, তার উপরে বাস একটী মেসে। জন্মে অবধি কোনো দিন মা-ছাড়া হই নি। বাবা আমাকে এমন করে এখানে ফেলে গেলেন ভেবে আমি কাল হ'তে কারো সাথে কথা কইনি। মন ভারী বিষণ্ণ, একেবারে অবসন্ন হবার মত হয়ে পড়ছিল, কিন্তু সকালের ফুরফুরে বাতাসে সে ক্রমে সতেজ হয়ে আস্‌ছে।

রাস্তা দিয়ে কত লোক কত গাড়ীঘোড়া যেতে আরম্ভ করেছে তার সংখ্যা নেই। একবার একখানি মটরের সাথে একখান ঘোড়ার গাড়ীর কোলাকুলি হবার উপক্রম হতেই আমি ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম। দরওয়ান ছুটে এসে বললে "কেয়া হুয়া বাবু, কেয়া হুয়া।"

আমি নিজের ভুল বুঝতে পেরে বললাম "কুছ নেহি সিংজী।"

অযোধ্যা সিং দরওয়ানকে কেউ বোধ হয় কোনো দিন সিংজী সম্মানে ভূষিত করেনি, তাই বললে "বাবু সাহেবকা বাতমে মালুম হোতা হ্যায় আপ বড়ে খানদানকে হ্যায়।"

আমি সম্ভ্রান্ত বংশের কিনা, সে সব পরিচয় দিয়ে লাভ কি ভেবে রাস্তা দিয়ে যা যাচ্ছিল সব তন্ন তন্ন করে

দেখতে আরম্ভ করলাম, এমন সময়ে আমার সমবয়সী গৌরবর্ণ একটী কিশোর জিজ্ঞাসা করলেন "মশায়, এটা কি একটা মেস ?"

আমি তাঁর স্বরের কোমলত্বের পরদাগুলি মনে মনে আবৃত্তি করছিলাম তাই উত্তর দিতে ভুলে গিয়েছিলাম দেখে তিনি বললেন "তাহ'লে আমার নম্বরটা ভুল হয়ে গেছে।"

তাঁর ভুল হয়নি, আমার হয়েছে ভেবে বললাম "আপনার কোনো ভুল হয় নি।" এই বলে তাড়াতাড়ি আসন হতে উঠে বললাম "বসুন।"

"না, আপনি বসুন।"

বসা আর কারো হলো না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর পরিচয় নিয়ে দেখলাম তিনিও আমার মত নূতন কলেজের পড়ো হতে এসেছেন। কলকাতা সহর তাঁর পক্ষে বোধহয় সম্পূর্ণ নূতন, নইলে মেসের সন্ধানই বা করবেন কেন? আমি একজন সমদুঃখী পেয়ে ভারী খুসী হলাম, তাই বললাম "বেশ ত আমাদের মেসেই থাকুন না!"

"আপনাদের এখানে সীট খালি আছে কি ?"

"সীট না পাওয়া যায় আমার ঘরে আমি একা থাকি, দুজনে এক রকম করে থাকব।"

"না, তাতে আপনার অসুবিধে হবে। তবে যে ক'দিন কোথাও সীট না পাই সে ক'দিন আপনি থাকতে দিলে খুবই উপকৃত হ'ব।"

"আমার অসুবিধে হবে কেন ? বরং আপনি থাকলে পড়াশুনায় মন বসবে। আর তা ছাড়া আমি একা থাকতে কোনদিন ভাল বাসিনে।"

(২)

সনৎ আজ আটবৎসর পিতৃহারা হয়েছে শুনে আমার চোখ দু'টো জলে ভরে এল। তারপর যখন শুনলাম তখনো তার একমাত্র বোন ম্রিয়মানার এজগতে পদার্পণ করবার একমাসকাল বিলম্ব ছিল, তখন আমার গণ্ড দু'টিতে বিষাদের অশ্রুরেখার ম্রিয়মান মূর্ত্তিটাকে যেন এঁকে দিয়ে গেল। আমি তারই চিন্তায় কতক্ষণ যে একমনে চুপকরে ছিলাম তা জানিনে, তবে সনৎ আমাকে তার ব্যথার ব্যথী বুঝে জিজ্ঞেসা করলে, "আপনার নাম ?"

আমি নিজেকে প্রকৃতিস্থ করে তাকে শুধু আমার নাম নয়, আমাদের বাড়ীর সব খবর দিলাম।

দু'টি বন্ধুতে বেশ পড়াশুনো চালাতে লাগলাম। সনতের সাহায্যে অনেক জটিল বিষয়ের সমাধা সহজ হয়ে এল। সনতের বাড়ীর অবস্থা ভাল ছিল না। সে একটী প্রাইভেট্ টুইসনের খোঁজে ছিল। আমি তাকে বললাম "আপনাকে সে জন্যে অন্য চেষ্টা পেতে হবে না। আমিই আপনার ছাত্র হব।"

"আমি আপনাকে পড়াতে পা'রব কেন!"

"যা পারবেন তাতেই হবে।"

পূজোর আমোদে কটা দিন বেশ কাটল। বিজয়ার পর-দিন সনৎকে পত্র লিখলাম। তার উত্তরে জানলাম হঠাৎ নদীর বানে তাদের একমাত্র ভরসা ধানের খেতগুলি ধুয়ে গেছে, তার উপর ঘর দরজাও কিছু নাই।

মাও চিঠিখানি দেখলেন আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন "গরীবের কপাল ঐ রকমই হয়।"

মা যা কিছু সাহায্য করলেন তাই নিয়ে সনতের কাছে পাঠালাম, আর লিখলাম "তুমি কলকাতা যেতে ভুলো না।"

সনৎ উত্তরে লিখিল, "তুমি ভাই বাপমার অসাক্ষাতে আমাকে আর কত সাহায্য করবে, আর তাঁরা যদি জানতে পারেন তাহলে তোমায় লাঞ্ছিত হ'তে হবে।"

আমি জানালাম, "তোমার সে ভয় নেই।"

আমাদের যে অবস্থা তাতে অনায়াসে সনৎকে পড়াতে পারি। কিন্তু বাবাকে এক দিনও সনতের কথা বলতে সাহস পাইনি। মার মন যদিও বা সনতের অবস্থা শুনে বিগলিত হয়েছিল, কিন্তু তিনি মাসিক কোনো নির্দ্দিষ্ট সাহায্য করবার ভরসা দিতে পারলেন না।

কলেজ খুলবার দিন পনর পরে সনৎ আবার বাড়ী গেল তার পর ফিরে এসে পড়াশুনোয় মন দিল। বড়দিনের ছুটীতে সে বাড়ী গেল না, আমি কিন্তু গেলাম। মা এবার সনতের কথা তত আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করলেন না, সুতরাং আমিও বেশী কিছু ব'ললাম না।

বড়দিনের বন্ধে কত তামাসা কত সার্কাস হয়, তার কোনটাও দেখবার জন্য সনৎ কিছুমাত্র আগ্রহ দেখায় নি। আমি ফিরবার পর শুনলাম একটা বিলিতি সার্কাস তখনো ভাল ভাল তামাসা দেখাচ্ছে। সনৎকে বললাম "চল না একদিন।" সে আমার দিকে এমনি তীব্র কটাক্ষ করলে, যে, আমি আর সে প্রসঙ্গে সাহস পেলাম না।

এর পর আমি সনতের সাথে বেশী কথা কইতে সাহস পেতাম না। সময়ে সময়ে তার চাউনি দেখলে মনে হ'ত তার পড়াশুনো ছাড়া অন্য কাজ নেই, আর কেউ যেন তাকে সে কাজে বাধা না দেয়।

গ্রীষ্মের ছুটী এল, বাড়ী গেলাম। ছুটীতে তাকে আমাদের বাড়ী যাবার অনুরোধ করেছিলাম, কিন্তু সে অনুরোধ রক্ষা হয় নি। তা হলেও আমি তাকে যেটুকু ভালবাসি তার কিছু কম করিনি।

(৩)

ছুটীর পর সনৎ তাদের মহাজনের ছেলেকে সঙ্গে করে এনেছে। তার ইচ্ছা আমাদেরি মেসে থাকে, তাই অনেক চেষ্টায় তার জন্যে একটা সীট্ ঠিক করলাম। ছেলেটার ভাল নাম কোনো দিন জিজ্ঞেস করা হয়নি, তবে সনৎ তাকে লালু বলেই ডা'কত।

এবার দ্বিতীয় বর্ষ, পড়া শুনো করবো ভাবলাম, কিন্তু দেখতে দেখতে পূজো এল। ছুটীর পর লালুকে তাদের দেশের খবর জিজ্ঞেসা করায় জানলাম, কার্ত্তিক মাসে বৃষ্টি না হওয়ায় তাদের দেশের প্রায় ধান মারা গেছে। সনতদের কিছুই আশা নেই। আমি দুঃখের হাসি মনে মনে হেসে ভাবলাম, "বেশ হয়েছে, এ নইলে তোমায় ভগবান্ বলবে কেন?"

সনৎ কিন্তু এসব দুঃখের অতীত হয়ে পড়েছে। সে খুব মন দিয়ে পড়তে আরম্ভ করেছে। আমার কিন্তু তাদের কথা শুনে এ'ব কিছুই ভাল লাগছে না। আমি আজ কাল প্রায় সময় লালুর কাছে কাটাই, আর তারই সঙ্গে বেড়াই।

আমাদের পরীক্ষার আর বড় বেশী বিলম্ব নেই, এমন সময়ে একদিন সনৎ আমায় বললে,"দেখ, আমি বাড়ী চল্লাম্। আমার বোন্ খুব কাহিল।"

"কি রকম কাহিল?"

"মা লিখেছেন পেটে ফোড়া, শিগ্‌গির অস্ত্র করাতে হবে।"

"আমিও তোমার সাথে যাইনা কেন?"

"না, তুমি বরং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একটা সীট ঠিক করে রেখ।"

"হাসপাতালে দেওয়া হবে না।"

"বাসা করবার আমার ক্ষমতা নেই।"

"তা কেন, আমার এই নিরিবিলি ঘরটা ছাড়া তেতালায় আর ঘর নেই। মা আসেন, তিনিও এখানে থাকবেন। তোমার মা আমাদের সবারি মা এ কথা যেন মনে থাকে।"

দুদিন পরে শেষ রাত্রিতে সনৎ পীড়িত বোনকে নিয়ে হাজির হলো। সে বোধ হয় মাকে কোন রকমে বুঝিয়ে রেখে এসেছে।

ম্রিয়মানাকে আমার বিছানাটা ছেড়ে দিয়ে লালুর ঘরে গেলাম।

পরদিন রোগের চিকিৎসা আরম্ভ হলো, ম্রিয়মানাও ক্রমে কিছু সুস্থ হলো। আমরা তিনজনে পালা করে তার কাছে বসে থাকতাম। মেয়েটা ভারী ধীর, এত যন্ত্রণায়ও সে একবারে আঃ উঃ করে নি।

মানার বয়স অনুমান দশের কাছাকাছি হবে। তাদের সংসারের কষ্ট সে অনেকটা বুঝতে পেরেছে, তাই এত কষ্টের মধ্যে একবার 'মা' বলেও ডাকে নি।

সপ্তাহের মধ্যে মানা অনেকটা সেরে উঠ্‌লো। আমরা পরীক্ষা দিতে আরম্ভ ক'রলাম। লালু দিনের বেলায় মানার কাছে থা'কত। সকালে রাতে আমিই তার সঙ্গী হ'তাম। মানা আজকাল আমার সাথে অনেক কথা কয়। অজয় নদের বানে তাদের সর্ব্বনাশ করে দিয়ে গেছে এ কথা সে আমার কাছে অনেক বারই বলেছে।

আমাদের পরীক্ষা শেষ হ'বার সপ্তাহ খানেক পরে মানা বেশ সেরে উঠ্‌লো। সনৎও তাকে বাড়ী নিয়ে গেল।

(৪)

জুলাই মাসে আবার কলেজে নাম লেখালাম। সনৎ দু'চার নম্বরের জন্যে বৃত্তি পেলে না। মানা ওরকম কাহিল না হলে সে অন্ততপক্ষে একটা কুড়ি টাকার বৃত্তি পেত। আর আমি কোনো দিন ভাল করে পড়িনি, কাজেই দ্বিতীয় বিভাগে পাস হয়ে নিজেকে ধন্য মনে করলাম।

সনৎ গণিত শাস্ত্রে অনার নিয়ে ব'সল। আমার শরীরের অবস্থা ভাল নয় কাজেই 'অনার' সইলো না।

সনৎ খুব পড়ে, আর আমি ইংরেজী বাঙ্গলা নভেল নিয়ে থাকি। আমাদের এ দু'বছর পড়ার মধ্যে কোন গোল মাল হলো না। বি, এ, পরীক্ষা দিয়ে আমরা যে যার বাড়ী গেলাম।

বাড়ীতে দিন গুলি বেশ কাটছে এমন সময়ে জ্যৈষ্ঠ-মাসের প্রথমে সনৎ জানালে তার মা ক্ষয়রোগগ্রস্ত হয়েছেন, এখন তাঁকে পুরী নিয়ে যেতে হবে।

সনৎ কোন দিক দিয়ে যাবে তার কিছুই জানালে না, তাই হাওড়া ষ্টেশনে তাদের খোঁজ করতে লাগলাম, কিন্তু তাদের দেখা না পেয়ে পুরীর টিকিট কিনে ফেললাম।

পুরী গিয়ে তিন দিন খোঁজের পর তাদের নাগাল পেলাম। মানা এখন বেশ ডাগর হয়ে পড়েছে। সে লজ্জায় আমার সুমুখে আসতে চাইলে না দেখে সনৎ তাকে ধমকাতে লাগল। আমি বললাম, "স্ত্রীলোকের ঐ টুকুই সৌন্দর্য্য, তোমার ধমকে সে টুকু যেন নষ্ট না হয়।"

পুরীতে মাস খানেক বাসেও যখন সনতের মাতার স্বাস্থ্যের কোনও উন্নতি হলো না, তখন আমার জিদে তাঁকে কলকাতায় মেসের বাসায় আনা হলো। যত ভাল ডাক্তার কবিরাজ ছিল সকলকেই দিনের পর দিন আনা হলো, কিন্তু সপ্তাহের মধ্যেই মানার হৃদয় বিদারক 'মা, মা' রবে পাড়ার লোক জানতে পারলে মেসে একটা কিছু হয়েছে।

মেস তখনো খুলতে বিলম্ব ছিল, কাজেই পাড়ার দু'চার জন ভদ্রলোকের সাহায্যে শেষ কাজ সমাধা করতে হলো।

সনৎ মানাকে নিয়ে বাড়ী গেল। আমি আর কোথাও না গিয়ে যেখানে ছিলাম সেখানেই থাকলাম।

সনৎ প্রথম শ্রেণীর সম্মান পেয়েছে আর আমিও কায়ক্লেশে নামটা গেজেটে তুলতে পেরেছি, একথা সনৎকে জানালাম। দুদিন পরে উত্তর এল, সে আর পড়বে না, চাকরীর চেষ্টায় বিদেশ যাবে।

আমি বড়লোকের ছেলে, কাজেই এম, এ, টা পড়া যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হলো। তাকে আমার ভর্ত্তির কথা জানালাম, কিন্তু কোনো উত্তর পেলেম না। মনটা বড়ই অস্থির হয়ে উঠলো। চারবৎসর এক সঙ্গে উঠে বসে তার অভাব আজ বড়ই কষ্টদায়ক বলে মনে হলো। তার উপর সব চেয়ে কষ্টের বিষয় হলো, তার কোনো খবর না পাওয়া।

লালু পড়া ছেড়ে বাড়ীতেই বাপের কাজ কর্ম্ম দেখে। তাকে লিখে জানলাম, ভায়ে বোনে দিনাজপুর গেছে। ভাবলাম, বেশ করেছে। একছত্র লিখলে কি তার চাকরী কেড়ে নিতাম? অবস্থায় না কুলুলে তাকে কি জোর করে ভর্ত্তি করতাম? বেশ বুদ্ধি বটে!

তাদের কথা না ভেবে আপন পাঠে মন দেব ভাবি, কিন্তু সনৎ মনটা এমনি করে ভেঙ্গে দিয়ে গেছে যে, তাকে নানারকমে মেরামত করেও ঠিক সুরে আনতে পারছিনে। সে অন্য সুরেই বয়ে যাচ্ছে।

আমি বি, এ, পাস করেছি, বয়সও একুশের কাছাকাছি তার উপর আবার বড়লোকের ছেলে, কাজেই আমার বিয়েটা হলে তোমাদের বোধহয় ভালই লাগত। আমার কিন্তু ও চেষ্টা আদৌ নেই। বলবে তোমার না থাকে, মা বাপের ত আছে। তা হলে তোমাদের বলে রাখি, সেদিক হ'তে আমার ভয় কিছুমাত্র নেই। আমার জন্মপত্রিকাখানি কারকাছে পড়িয়ে শুনেছেন, পঁচিশ বৎসর বয়সে আমার খুব একটা বড় ফাঁড়া আছে, কাজেই ঐ বছরটা পার না হলে ওসব কথা তিনি কাউকে মুখে আনতে দেবেন না।

এখন সম্ভবতঃ তোমরা বলবে, আমি মানার কথা ভাবছি। তা' হলে সত্যি বলছি, তাকে ভাববার কিছুই নেই, সে সাদাসিদে ভদ্রঘরের মেয়ে। তবে ভাবি তার দাদাকে আর তার মাঝদিয়ে সে যতটা মনে আসে ততটুকুই।

(৫)

এবার পুজোর বন্ধের কিছু আগেই বাড়ী গেলাম। বাড়ীর মধ্যে বেশী না থেকে বাবার দাতব্যচিকিৎসালয়টা নিয়ে পড়লাম। রোগীদের দেখে মনে হয়, আমি যদি মেডকেল কলেজে ভর্ত্তি হতাম তা হলে কাজ হ'ত। এখন এদিকটা সেরে ওদিকে যাওয়ার মত উৎসাহ থাকবে বলে মনে হয় না। পড়া শুনোয় আমার উৎসাহ কোনো দিনই ছিল না। যা একটু শিখেছি, সে কেবল সনতের উৎসাহ দেখে। ছোঁড়াটা যদি এম, এ, টা প'ড়ত তা হলে পাশ করতে পারতাম।

পুজোর ছুটীর পর কলকাতা যাবার ইচ্ছে না থাকলেও বাবার তাগাদায় যথা দিনে বাসায় এলাম। লালুকে আবার লিখিলাম, তাদের খবর কি? উত্তর এল, তারা পুজোয় কেউ দেশে আসে নি।

সনৎ পত্রের উত্তর দেয়নি ভেবে মনে করেছিলাম, তাদের কথা ভাবব না, কিন্তু, হায়, যেটা ভুলতে যাওয়া যায় সেইটাই বেশী করে চোখের সুমুখ দিয়ে চলাচল করে।

(৬)

মাঘমাসের কনকনে শীত। কলকাতার মত স্থানেও লোকে বলে 'ভারী শীত'। আমি একটু শীতকাতুরে, তাই আজ সন্ধ্যার আগেই দোর জানলা বন্ধ করে লেপের মধ্যে ঢুকে ভাবছি, দিনাজপুর এখান হইতে অনেক উত্তরে, সেখানে শীত খুবই বেশী তাতে সন্দেহ নেই। তারা আমার মত কুঁড়ে নয়। তাই এখনও আমার মত লেপের আশ্রয় নেয় নি। এই চিন্তার মধ্যে আমার ঘরের শিকলটা নড়ে উঠতেই আমি চমকে উঠে খুব জোরেই বলে উঠলাম "কে এসময়ে বিরক্ত করে?"

"বাবু, আমি টেলিগ্রাফ পিয়ন,আপনার একখানি জরুরী তার আছে।"

আমি কলকাতা এসে অবধি এই পাঁচবৎসরে মধ্যে কোনও দিন টেলিগ্রাফ পায় নি। কাজেই জরুরী তারের সংবাদে বাড়ীর কোনও অমঙ্গল আশঙ্কায় প্রাণটা আঁতকে উঠ্‌লো, আর এত শীতেও গাটা ঘাম দেবার মত হয়ে উঠলো। কিসের টেলিগ্রাম ভেবে আমি নাইটমেয়ারগ্রস্তের মত বিছানা ছেড়ে উঠ্‌তে পারছিলাম না, তা পিয়নের "বাবু, দেরী হয়ে যাচ্ছে শিগ্‌গীর সই করে নিন—" এই তাগাদায় এবার লুপ্তজ্ঞান কতকটা উদ্ধার করে কোনরকমে দোর খুলে বললাম "দেখি তোমার টেলিগ্রাম। তুমি বোধহয় ভুল করছ, আমার নামে কোনও টেলিগ্রাম থাকতে পারে না।"

"না বাবু, আপনার-ই।"

সত্যই ত এখান আমার। আমার পুরো ঠিকানা, তার উপর আমার রুম নম্বর পর্য্যন্ত লেখা, এ দেখে আমার এ কথাত আমি অস্বীকার করতে পারি নে, কাজেই পিয়নের নির্দ্দেশ মত একটা সই করে দিয়ে দোর বন্ধ করে দুরুদুরু বক্ষে আলোর খুব কাছে গিয়ে দেখি কি সর্ব্বনাশ, কি সর্ব্বনাশ! সনৎ বিষম ব্যা'ছিল, তাই মানা লিখছে "ছুটে আসুন দেখবেন যদি দাদাকে।"

আমিত ছুটতে পারছি নে। আমার যদি দুখানা ডানা থাকত তা হলে উড়তাম, সনৎকে দেখবার জন্য উড়তাম! সে আমার ভাল না বাসলেও আমি যে আজ প্রায় একবৎসর তার চিন্তায় হৃদয়টা কতখানি খাক করে ফেলেছি তা একবার দেখাতাম, কিন্তু দেখাতে পারি কিনা সন্দেহ। সে আমার পরম শত্রু তাই বড়ই অসময়ে খবর পেলাম। বেশ হয়েছে, যা হবার তাই হয়েছে, এখন আর ভাবলে কি হবে, তল্পী তল্পা বেঁধে এখনি কিন্তু রওনা হতে হবে। যে গাড়ী পাই তাতেই উঠে পড়তে হবে।

এখনো আটটা বাজেনি, কাজেই খাওয়া বিশেষ কিছু হ'ল না। একখান মটরে করে, ষ্টেসনে এসে জানলাম, কাটিহার প্যাসেন্জার মজুত, ওতে গেলে কাল বেলা বারটা আন্দাজ দিনাজপুরে পৌছতে পারব। বেশ তাই ভাল ভেবে এক সেকেণ্ডক্লাস রিটার্ণ টিকিট কিনে উঠে পড়লাম।

পরদিন অনেক খোঁজের পর একটী সরু গলির মধ্যে সনতের বাসার সন্ধান পেলাম। ঘরটী একতালা আর এতই স্যাঁতসেতে যে, আমার মনে হ'ল, আমি যদি এতে সপ্তাহ খানেক বাস করি তা হলে মা বাপের সাথে আর দেখা হয় না।

সনতের দু'টা উনিশ কুড়ি বছরের ছাত্র তাদের যথাশক্তি সেবা করছে। তাদের মুখে শুনলাম, ডবল নিউমোনিয়া। সনতের ইচ্ছায় টেলিগ্রাফ হয়েছে। "সকাল পর্য্যন্ত জ্ঞান ছিল, এখন অবস্থা খুবই খারাপ।" এই বলে তারা চোখ মুছতে লাগল। মানা আমার আসার খবর পায় নি। তার কথায় জানলাম, সে আজ চারদিন কিছুই খায়নি, তাই পাশের বাড়ীর তার সমবয়সা একটী মেয়ে তাকে জোর করে নিয়ে গেছে। সনতের অবস্থা দেখে আমার গাল বয়ে জল পড়তে লাগল; দেখে বড় ছাত্রটী বললে "আপনি এসময়ে অধীর হবেন না। মাষ্টার মশায় আজ সকালে যা বলেছেন তা শুনুন "মানাকে আপনি সঙ্গে নিয়ে যাবেন আর যেখানে সে ভাল থাকে সেখানেই রাখবেন।"

ছাত্রদের কাছে শুনলাম, সনৎ স্কুলে আশীটাকা মাইনে পায়, তা ছাড়া রাত দিন প্রাইভেট পড়িয়ে প্রায় একশো টাকা রোজগার করে। মানার ভাল ঘরে সুপাত্রে বিয়ে দিতে হবে বলেই এত পরিশ্রম। সে নিজে বিয়ে করে মানার বিয়ের টাকা সংগ্রহ ক'রতে পারে এ কথা তাকে অনেকেই বলেছিলেন। তার উত্তরে সে জানায় "নিজের বোনের বিয়ে দিতে কষ্ট পাচ্ছি বলে পরকে কষ্ট দিব না। মানার বিয়ে দিয়ে যে সব বিষয় বন্ধক আছে তা উদ্ধার করে একটী খুব গরীবের মেয়ে বিয়ে করব।"

আমি ভাবলাম, খুব বিয়ে করলে। যমের মেয়ের সাথেই তোমার বিয়ে হবে দেখছি। পাত্রের যে বাজার তাই বিনা পয়সায় এমন পাত্র পেয়ে যম তোমারি শরণ নিয়েছে। আমার এই চিন্তার মধ্যে মানা কখন এসে আমার হাঁটুর

মধ্যে মুখ লুকিয়ে গুমড়ে কেঁদে উঠলো। তাকে বুকের মধ্যে টেনে তুলে সান্ত্বনা দিয়ে ডাকলাম "সনৎ, সনৎ, সনৎ।" কোন উত্তর নেই। এইবার যতদূর পারলাম চেঁচিয়ে ডাকলাম "সনৎ"। সনৎ একটু চোখ মেলে জড়ান সুরে বললে "আমি তোমাকেই দেখছি ভাই, আমি ভুল করেছি, মাপ করে মানার একটা উপায় করিস্"।

মানার চিন্তায় সে পীড়ার মধ্যে শান্তি পাচ্ছে না, তাই তাড়াতাড়ি জানালাম "কেন ভাবছ ভাই, কোনো ভয় নেই, শিগ্‌গীর সেরে উঠবে"।

আমার কথা তার কাণে বোধহয় আর পৌঁছুলো না। ডাক্তার সাহেব এলেন। অক্‌সিজান গ্যাস নাকে দিয়ে নেবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। সনৎ সন্ধ্যার কিছু পরেই,— সব ফরসা,—চলে গেল।

মানা "দাদা আমায় কোথায় ফেলে চললে" বলে মেজের ওপরে পড়ে কাটা কৈ এর মত ছটফট্ করতে লাগলো। আমি তাকে কোনরকমে আপন পাশে বসিয়ে ভাবলাম, মানাকে শ্মশানঘাট পর্য্যন্ত সঙ্গে না নিলে তার চিতার আগুন নিভবে না, তাই তাকে সঙ্গে নেওয়া হলো। ছোটবড় অনেক গুলি ছাত্র ও মাষ্টার সেই দারুণ শীতে নদীর ধারে শ্মশানে তাদের কৃতজ্ঞতার শেষ অশ্রু ফেলবার জন্যে জড় হলো। আমি এসেই যা কেঁদেছিলাম তারপর আর পারি নি। পারি নি কেবল মানার জন্যে। ভবলাম, আমি কাদলে মানাকে সান্ত্বনা দেবার আর কে থাকবে!

কোনরকমে মানাকে দিয়ে মুখাগ্নিটা সেরে নিয়ে তাকে আমার শালের মধ্যে জড়িয়ে বুকের মধ্যে করে রাখলাম। সে একদৃষ্টে দাদার দেহের পরিণাম দেখে বললে "দাদা উল্টো কাজ করে গেলে। আমার যে তোমার আগেই যাওয়া উচিত ছিল। কলকাতা নিয়ে গিয়ে কেন আমায় বাচালে? আর তাই যদি হলো, নিজের বেলায় কলকতা যেতে চাইলে না কেন?"

আমার মনটা বড়ই অস্থির হলো। কেন সনৎ কলকাতা যেতে চাইলে না। আমার পত্রের উত্তর না দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো গুরুতর অপরাধ সে আমার কাছে করেনি। তবে আমার কাছে তার এত সঙ্কোচ হ'ল কেন? এবার আমি মনে মনে কথা কইতে না পেরে উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলাম "সনৎ ভাই, এমন কাজ করলি কেন? আমায় একটু আগে জানতে দিলি নি কেন?" আমার এ চীৎকার শুনে সকলে আমার কাছে বসে বললেন "কি করেন মোহিত বাবু, আপনি উতলা হলে মানা দিদির অবস্থা কি হবে"।

মানার আর কি হবে? যা হবার তাই হ'ল। সে আজ অকূল পাথারে ভাসতে ব'সল। আমি তাকে কূলে আনতে পারব কিনা জানিনে, তবে একবার চেষ্টা করে দেখি, তাই তাকে একেবারে মার কাছে এনে হাজির করলাম। মা কতকটা বেদনা দেখালেন, কিন্তু আমি তাতে সন্তুষ্ট হ'তে পারলাম না।

(৭)

সনতের শ্রাদ্ধ হয়ে গেল, আমি আপন কাজে চলে এলাম। মা আমায় মাস খানেক পরে জানালেন, "একটী ভাল পাত্রের সাথে মানার বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করেছি, কিন্তু আজ মানার কাছে শুনলাম, সে তোমাকেই ভালবাসে তাই 'মা মরা, দাদা মরা, কাল অশৌচ' এই সবের ওজর করছে। তুমি এসে তাকে বুঝিয়ে যাও। তোমার সঙ্গে বিয়ে দিতে আমার অমত ছিলনা, তবে তোমার বিয়ের সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করলে তার বয়স আঠার হবে। অতবড় মেয়েকে আমি এ সংসারে অবিবাহিত অবস্থায় রাখতে পারিনে। আর যখন তার ত্রিসংসারে কেউ নেই তখন তার বিয়ে না দিয়ে তাকে পাঠাই বা কোথায়?"

মায়ের কথায় কোনও প্রতিবাদ না করে মানাকে একরকম ধরে বেঁধে পাত্রস্থ করলাম। পাত্রটী আমাদের দেশেরই। গরীবের ছেলে, ভগ্নীপতির বাসায় কোনরকমে থেকে এবার বিয়ে পাস করে আমাদের স্কুলে মাষ্টারী করছিল। এম, এ পড়ার খরচ পেলেই সে বিয়ে করে।

কুমুদবন্ধু মানাকে বিয়ে করে এম, এ পড়তে গেল। মামার বাসায় না থেকে শ্যামপুকুরে তার মাসতোত ভাইয়ের টোলে বাসা নিলে! সে সংস্কৃতে এম, এ পড়বে, তাই জানালে টোলে থাকাই তার পক্ষে সুবিধে।

আমার সাথে তার কোনও দিন কলেজে, কোনও দিন বা তার বাসায় দেখা হ'ত। সে আমার সঙ্গে দেখা করতে না এলেও আমি তার খবর নিতে ভুলতাম না।

এইরকমে দু'মাস কেটে গেল, হঠাৎ একদিন আমায়

জ্বর হ'য়ে তিন চার দিন জামাইয়ের খবর নেওয়া হয় নি। তাকে একবার আসবার জন্য লিখব বলে ভাবচি, এমন সময়ে টোলের একটী ছাত্র এসে বড়ই শুভ সংবাদ দিলে, কারণ আমার জীবনটাই শুভ সংবাদ শুনবার জন্যে। আমি সেই জ্বর অবস্থায় শ্যামপুকুর গিয়ে দেখি, ইন্‌জেক্‌সন প্রভৃতি ডাক্তারদের যতরকম প্রচেষ্ট আছে সব ফাঁক করে সে ম্রিয়মানাকে চিরতরে ম্রিয়মান করে কোন্ অজানা পথে ছুটেছে।

শুনলাম, মানার কাছে সেই মাসতোত ভাইটী গেছে। সে না এলে সৎকারের ব্যবস্থা হ'তে পারে না একথা তাঁদের ভাল করে বুঝালাম। মরা বাসী হয় তাও আচ্ছা, মানা যেন তার স্বামীকে দেখতে পায়, নইলে বিধবা কি করে চিরকাল জীবনের ভার বইতে পারবে।

আমার জ্বরের কথা ভুলে বেলা ১০টা হ'তে রাত তিনটে পর্য্যন্ত মরা আগলে বসে থাকলাম। মানা এল। 'বলহরি হরিবোল' দিয়ে কাশী মিত্তিরের ঘাটে চলা গেল। সব শেষ হতে বেলা আটটা বেজে গেল। আমি একখান গাড়ী করে বাসায় ফিরতে মানা উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটে এসে আমার গাড়ীতে উঠে আমার দুর্ব্বল বুকের উপরে সজোরে পড়ল। আমি অজ্ঞান হয়ে গাড়ীতে বসে থাকলাম। তার পর যখন বাসার দোরে গাড়ী লাগল, তখন গাড়োয়ান অনেক হাঁকাহাঁকি করে বাসার লোকের মারফৎ আমায় নামিয়ে দিয়ে গেল। তিনদিন পরে আমার শরীর সুস্থ হলে সব শুনলাম; আর শুনলাম, মানার সেবার কথা।

আমার শরীরের কথা না ভেবে একটী প্রথম বর্ষের ছেলের সাহায্যে মানাকে এনে মার হাতে দিয়ে বার বাড়ীর আশ্রয় নিলাম। বাইরে বাইরে থেকে বাইরে বাইরে কলিকাতা এলাম।

মানার বয়স হয়েছে, সে সব বুঝতে পেরে আমায় লিখলে "দাদা, আপনি এসে আমাকে পৈতৃক ভিটেয় রেখে আসুন।" আমি সব বুঝতে পেরে বাড়ী এসে বললাম "বিধবা বিবাহ ত নিন্দের নয়, তাই যদি করিস আমি ভাল পাত্র ঠিক করি।"

মানা ব'লল "দাদা, খুব হয়েছে, আর ঘটকালিতে দরকার নেই।" "তবে লেখাপড়া শিখবি?" মানা তাতে সম্মতি জানাল, তাই তাকে কিছু নিজে আর কিছু মাষ্টার দিয়ে পড়িয়ে কলকাতা এনে ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি করে দিলাম। মা বাপের রাগের সীমা থাকল না। আমি সেদিকে নজর না দিয়ে মানাকে বোর্ডিংএ রেখে এলাম।

মানার যে যেখানে ছিল সকলেই গেল, এইবার পালা পড়ল আমার। মানার স্কুলে ভর্ত্তির পর বাবা গেলেন স্বর্গের পথে, তাই দেখে মা বললেন "মানা আর আমার বাড়ীর পথ মাড়াতে পাবে না। বড়ই অলক্ষুণে মেয়ে, ও সব খেয়েছে, এখন খাবে তোকে।"

সে আমায় খায় খাবে, আমি কিন্তু তাকে ছাড়ব না। কুল যায়, মান যায়, সেও ভাল তবু ধর্ম্ম পথে থেকে তাকে ছা'ড়ব না।

বাবার মৃত্যুর পর মেস ছেড়ে এক ছোট খাট বাসা করলাম। ছুটীর সময় বোর্ডিং বন্ধ হয়, সব মেয়েরা বাড়ী যায়; তাই মানাকে বাড়ী না এনে পূজোর ছুটী, গ্রীষ্মের ছুটী কলকাতার বাসায় রাখতে লা'গলাম। মার কাছে এ সংবাদ পৌঁছুতে বিলম্ব হলো না। তিনি আমাকে যতদূর পারলেন তিরস্কার করলেন।

মার বকুনী বছর দু'য়ের বেশী সইতে হ'লো না। এবার আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন, তাই ছুটীর সময় মানা আমার বাড়ীর অতিথি হ'তে লাগল।

সে মোটামুটি ইংরেজী শিখতেই তাকে বললাম্ "তোকে এবার ডাক্তারী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়ে দিই, কি বলিস?"

"এর চেয়ে ভাল কাজ আর আমি কি পাব দাদা!"

বৎসর চারেক পরে মানা ডাক্তার হয়ে আমার বাড়ী না এসে চাকরী নিয়ে বহু দূর আসামে গেল। আমার ইচ্ছা ছিল আমার দাতব্য চিকিৎসালয়টীর ভার তার হাতে দিই, কিন্তু তা হলো না। সে যাতে সুখে থাকে তাই করুক ভেবে তাকে আর কোন কথা ব'ললাম না।

মাঝে মাঝে মানার খবর পাই। সে সরকারী চাকরী ছেড়ে দিয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যে যা কিছু জমিয়েছে তাই নিয়ে আর তার দাদার জমান ডাকঘরের টাকায় একটা ছোট রকমের মেডিকেল স্কুল খুলে কতকগুলি অনাথা নারীকে—জীবন যে স্বপ্ন নয় আর এ পৃথিবীতে করবার জিনিষ অনেক আছে—তাই শিক্ষা দিচ্ছে। তার এ কাজে

সাহায্য ক'রবার জন্তে খবরের কাগজের মারফৎ সে দেশের মহিলাদের দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে।

মানার লক্ষ্য বড়ই উচ্চ দেখে আজ ভারী আনন্দ হলো। আমি আমার সব বিষয় তার আদর্শ কাজের সাহায্যের জন্তে উৎসর্গ করে দলিলখানি তার কাছে পাঠালাম। তার পর নিজেও ঘর সংসার ছেড়ে নাগপুরে এসে একটা স্কুলের মাষ্টার হয়েছি। আমার উপার্জ্জনের যৎসামান্ত নিজের জন্য রেখে বাকী সব মানার স্কুলে 'জনৈক বন্ধুর দান' বলে পাঠাচ্ছি।

শ্রীহরিপদ হালদার।

বিরহ-সুখ

বিফল হ'ল বড় সাধের মিলন-বাসর পাতা,
　　জেগে থাকা, হোক তাতে কি দুখ;
মর্ম্মে মরুর জ্বালার মত থাক বিরহ গাথা,
　　অশ্রু ঝ'রে সিক্ত ক নাক বুক।
　　যে জন তোমার পরম প্রিয়
　　তারে তোমার বক্ষে নিও,
　　চেয়ে রব তাহার হাসিমুখ;
তোমার প্রেমে পাগল আমি সেই ত আমার সুখ!

এত ছোট হৃদয় খানির সোহাগটুকু দিয়ে,
　　ওগো প্রিয়! তোমায় পেতে যাওয়া,
সে ত কেবল শিশুর মত ব্যর্থ প্রয়াস নিয়ে
　　সুধাকরে হাত বাড়ায়ে চাওয়া।
　　চাই না ওগো সে সুখ আমি,
　　আমায় বুকে ধরবে স্বামি!
　　ফুরাবে এ আঁখির জলে নাওয়া,
শত যুগের তৃষ্ণা আকুল প্রাণের দাবীদাওয়া।

ভ্রান্ত আমি, তাই ত ছিল অত অভিমান,
　　আজি বঁধু, সকল ঘুচে গেছে!
আড়াল পথের আনা গোনা শুনব পেতে কাণ,
　　আজি হতে আশায় রব বেঁচে।
　　রবে বাসর এমনি পাতা,
　　ফুলের মালা এমনি গাঁথা,
　　পায়ে ধরে রাখব শুধু যেচে—
জেগে থাকা, বিরহ মোর স্বপন ভেঙ্গে দেছে।

বুঝেছি আজ, তৃষ্ণা ভাল পরিতৃপ্তির চেয়ে,
　　দৈন্য আনে এঁকে প্রিয়ের ছবি;
অনুতাপের আঁধার পারে আঁখির জলে নেয়ে
　　ফুটে ওঠে প্রেমের পূত রবি।
　　প্রিয় যদি পলেক তরে
　　বুকে রেখে আদর করে
　　ক্ষমা ক'রে সকল বেয়াদবী,
সেইখানে শেষ ভালবাসা, প্রাণের দাবী সবি।

প্রিয় তুমি আমার ওগো, নয়ত নিঠুর কভু,
　　দয়া করে দেওনি মোরে দেখা;
এত সাধের শেষ যে তব প্রাণে বাজে প্রভু!
　　দূরে ফেলে তাই রেখেছ একা।
　　এ নয় কেবল অবহেলা,
　　এ নয় কেবল পায়ে ঠেলা,
　　এ যে তব স্নেহের স্মৃতি লেখা;—
প্রাণের দেওয়া দাগা গুলি,—অনুরাগের রেখা।

শ্রীকুঞ্জবিহারী চৌধুরী।

সাহিত্যের অবস্থা ভেদ

দেশ যখন কোন এক নবহিল্লোলে আন্দোলিত হইতে থাকে, দেশ যখন কোন নবীন ভাব, নবীন আদর্শ নবীন উত্তেজনায় প্লাবিত হইতে থাকে, যখন বিজাতীয় কোন সভ্যতা স্থানীয় প্রাচীন সভ্যতার সম্মিলনে নূতন ধারার সৃষ্টি করিয়া অভিনব পথে ছুটিতে থাকে, তখনই দেশে প্রতিভাশালী আদর্শ মানব সমূহ জন্ম ধারণ করিয়া নবীন আদর্শ, নূতন ধর্ম্ম, নবীন সাহিত্যের সৃষ্টি করে। পৃথিবীর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে সর্ব্বত্রই ইহার যথেষ্ট প্রমাণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এই হিল্লোল যখন কোন স্বাধীন দেশে নিজের জাতীয় জীবনের নব জাগরণে আন্দোলিত হয়, তখন আমরা দেখিতে পাই, সেই জাতি তখন নিজের সেই নব জাগরণের বিমলাদর্শ কাঞ্চন-থালায় সজ্জিত করিয়া জগৎকে অভিনন্দন প্রদান করিতে অগ্রসর হয়। বিশ্ববাসী তখন বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে আকুলচিত্তে তাহার সেই দাতব্য বস্তু গ্রহণ করিতে অগ্রসর হয়; কোন আপত্তি না করিয়া, ভালমন্দ, সদসৎ, উপযোগী কি অনুপযোগী কোন-টার বিচার না করিয়াই সাগ্রহে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করে। বাস্তবিক মানুষের তখন এমন কোন শক্তি থাকে না, যদ্দারা সে বিচার করনান্তর গ্রহণ করিতে পারে। বিচারবুদ্ধি তখন সভয়ে নবশক্তির পদতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। দলে দলে আবালবৃদ্ধ তাহার অনুকরণে আত্মহারা হইয়া যায়; যাহারা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে যত্নবান হয়, তাহারাই "সেকেলে" নামে অভিহিত হইতে থাকে। কেহ আর বড় একটা তাহাদের সংশ্রবে যায় না। তাহারা নিজেদের সেই প্রাচীন ঠাটটী বজায় রাখিয়া নিঃশব্দে কাল যাপন করিতে থাকে! কিন্তু তাহারাও এই নব-বসন্তহিল্লোলে কিঞ্চিৎ পরিমাণে অনুপ্রাণিত হইয়া পড়ে।

নব জাগরিত স্বাধীন জাতি যখন নব সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া জগৎ সমক্ষে উপনীত হয়, তখন সকলেই তাঁহার নিকট কিছু প্রার্থনা করে; বাস্তবিক তাহার দিবার অনেক জিনিষ থাকে। শিল্পকলা প্রভৃতি তাহার সম্যক না থাকিলেও তাহার সেই নবীন উৎসাহ, অশ্রান্ত কর্ম্মতৎপরতা, অবিচ্ছেদ একপ্রাণতা, প্রকৃতিসুলভ প্রফুল্লতা তাহাকে জগতের শীর্ষস্থানীয় করিয়া তুলে। এই সমুদয়ের অভাব থাকিলে নূতন জীবনলাভ অসম্ভব; কারণ নূতন অর্থ, জীবনের স্পন্দনশক্তির সম্যক পরিস্ফোটন। পতনোন্মুখ জাতি সঙ্কীর্ণ, পরস্পর প্রতিহিংসা পরায়ণ, পরসুখ-অসহিষ্ণু, কুটিল; তাহাদের সম্মুখে কেহ বড় হইতে চাহিলে অমনি তাহার শরীরে বিষদন্ত বসাইতে সতত ব্যগ্র। বিষদন্ত বসাইলে যে লাঙ্গুল খসিয়া যায় এ জ্ঞান তাহার কোথায়? মানবচরিত্র বিকাশের ইতিহাস পাঠ করিয়া নিজের অবস্থার সংশোধন করিয়া লইবে—এইরূপ চিন্তা তাহার সেই অশান্ত হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়া বিশ্বনিয়ন্তার ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইতিহাস এখানে কোন ফল প্রসব করিতে পারে না। বস্তুতঃ নবীন জাতীয় জীবনেই ইতিহাসের উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয়।

নব জাগরণের প্রধান চিহ্ন প্রেম, ভ্রাতৃত্ববন্ধন। এই সময়ে যে সমস্ত সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে, তৎসমুদয়ই উৎসাহময় নবীন জীবনের দ্যোতক। তাহাদের কার্য্য, তাহাদের ভাষা, তাহাদের আহ্বান তখন একপ্রাণ, একসুর, এক গাথায় গীত হয়; তাহারা যাহাই করুক না কেন, সমগ্র-জাতির বাণীই তাহাতে প্রকাশিত হয়। নব জাগরিত মানবগণের আশা আকাঙ্ক্ষা তখন ধৈর্য্য সহকারে সম্পন্ন হইতে থাকে। তাহাদের জীবনই এক অখণ্ড মহাকাব্য; সে কাব্যের মূল মন্ত্র—ধৈর্য্য। ধৈর্য্যহীন জাতি কি কখনও বরেণ্য হইতে পারে? যাহাদিগকে নবজীবন লাভ করিতে হইবে, তাহাদিগকে যে কত নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া,—কত বাধা-বিপত্তি পদদলিত করিয়া,—কত বিরুদ্ধ শক্তিকে প্রতি-হত করিয়া,—কত আগুনে পুড়িয়া অগ্রসর হইতে হয় তাহা বিলাসপ্রিয়, পতনোন্মুখ মানবের কল্পনারও অগোচর। তখন তাহারা শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া নিজেরা প্রকৃত শক্তিমান্ কি না প্রত্যেক পদবিক্ষেপে পরীক্ষা করিয়া দেখে। তখন শ্মশান তাহাদের নিত্যলীলা ভূমি; স্থান তাহাদের গভীর কান্তার; সমগ্রদেশ ব্যাপিয়া জন্মভূমি; মেথর, শ্বপচ তাহা-দের ভাই; ধ্যান তাহাদের সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়কর্ত্রী জগদ্ধাত্রী অথবা অসুর নিসূদন প্রলয় পয়োধি মধ্যস্থ নারায়ণ। তাহা-

দের তখন "জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন।" শত্র তখন তাহাদিগকে ছেদন করিতে অক্ষম! নব-জাগরিত শিখ-বীরের মন্ত্র "শির দিয়া, সার না দিয়া" "স্থির হ'য়ে বীরেরা মরে, না করি একটী কাতর শব্দ" জাতীয় গৌরব রক্ষার জন্ম কে অগ্রে জীবন আহুতি দিবে; তাহা লইয়াই তাহাদের ঝগড়া উপস্থিত হয়। তাহাদের স্ত্রীপুত্র—জ্ঞান বিশ্বনিয়ন্তার ক্রোড়ে গিয়া তাঁহারই কর্ম্মসাধন করিতে উৎসৃষ্ট হয়; তজ্জন্যই ধৈর্য্য আসে, তাহারা বোঝে একদিনে কোন মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না; এক দিনে কেহ বিশ্ব সৃষ্টি করে নাই। ইহা বুঝিয়া প্রথম জীবন হইতেই ধৈর্য্য শিক্ষা করে। এইরূপে তাহারা ক্রমে ক্রমে একটী বিরাট হিয়া গঠন করিয়া গৌরবসন গ্রহণ করে। গল্প, উপকথা তাহাদের খেয়ালে আসে না। তাহারা যাহা দেখে তাহা সত্য, যাহা শোনে তাহা সত্য, যাহা গায় তাহা সত্য, যাহা প্রচার করে তাহা সত্য, যাহা লেখে তাহা সত্য;—তাহাদের সকলই সত্য। অসত্যে পদার্পণ করিতেও তাহারা ঘৃণা বোধ করে। তখন তাহাদের সাহিত্য সত্যের বিমলাদর্শে গঠিত হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে কোন বুজরুকী প্রকাশ পায় না। জাতীয় শক্তি স্বস্বরূপে প্রকাশিত হইয়া—সাহিত্যে নবপ্রাণের সঞ্চার করে। নিজত্বই তাহার প্রধান উপকরণ।

দ্বিতীয়তঃ দেশ যখন অসত্যের ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে—যখন ধর্ম্মের নামে বিশ্ববিভ্রান্তকারী মতের প্রচার করিয়া, হীন-চরিত্র পশ্বধম মানব সমূহ সরল সত্য ধর্ম্মকে নিজেদের অভীষ্টসিদ্ধির উপযোগী কুটীল, কুরূপ করিয়া—দুর্ব্বল-মস্তিষ্ক মানব সমূহকে ভ্রান্ত-পথে চালিত করে, যখন তাহারাই সমাজের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা-পুরুষ সাজিয়া—লম্বা-লম্বা বচন-গম্ভীর বাক্যে সকলকে মুগ্ধ করিতে প্রয়াস পায়; তখনই দুষ্ট-দমন, অজ্ঞানান্ধকারবিদূরক ভগবান্—"পরিত্রাণায় সাধূনাং" আত্মাকে সৃজন করিয়া—দেশকে এমন এক প্রবল শক্তিদ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়া যান যে, অচিরেই তাঁহার সেই প্রবাহে সমস্ত জগৎ প্লাবিত হয়।

তাঁহার এই নবীনালোকে আবার সকলে নবজীবন লাভ করে। তাহার কর্ম্মের জন্ম দেশে অনেক ত্যাগী পুরুষ জন্মায়। এই সময়ের কর্ম্ম পূর্ব্বোক্ত প্রকারেই নিজ ক্ষেত্র প্রকৃত করিয়া লয় বটে, কিন্তু নূতনত্ব এই যে, ইহার ক্ষেত্র অত্যন্ত বিস্তৃত। এক জাতি, এক সমাজ মাত্র ইহার আলোকে জীবনীশক্তি লাভ করে না,—বিশ্বঅন্ধকারনাশক প্রভাকর যেমন ঘোরা অমা রজনীর তাবৎ অন্ধকার ও জড়ত্ব বিদূরীত করে, সেইরূপ তথাকথিত অবতার জীবন ও জগতে অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বের অজ্ঞানান্ধকার নিকাসিত করিয়া সমগ্র জগৎকে আলোকিত করে। যাহারা এই বিমলালোকে ক্লিষ্ট হয়, তাহারা ত পেচক। মানব জাতি হইতে তাহারা ঘৃণাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এই আধ্যাত্মিক শক্তি বিশ্বব্যাপিনী; সাহিত্যক্ষেত্রে ইহার বড়ই প্রয়োজন, এ যুগের অনুসন্ধিৎসা, ঐতিহাসিক গবেষণা নানা দিগ্‌দেশ, পাহাড় পর্ব্বত, উপত্যকা-অধিত্যকা, মরু প্রান্তর হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া জাতীয় সাহিত্যের পরিপুষ্টি সম্পাদন করে। পূর্ব্বোক্ত প্রকরণে যেরূপ সাহিত্যে শক্তি অর্জ্জিত হইয়া থাকে, ভাবী মানব জাতির জন্ম জাতীয় জীবন গঠনের জ্বলন্ত আদর্শ রাখিয়া যায় এবার আবার সেই সাহিত্যকে নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে না রাখিয়া বিস্তৃত করিয়া ফেলে। মানুষকে ভোগমার্গে না রাখিয়া—মানুষকে আর আপনা লইয়া ব্যস্ত থাকিতে না দিয়া—এক কথায় মানুষকে ই লোকসর্ব্বস্ব না করিয়া—ত্যাগের পথ—পরলোকের পথ প্রদর্শন করে।

এ সময়ে বহু বিদেশী বিজাতীয় ভাব আদান প্রদানের ফলে জাতীয় সাহিত্যকে বিকৃত করে সত্য, কিন্তু হৃদয়-শক্তির প্রভাবে সাহিত্যকে নষ্ট না করিয়া বরং নিজের উন্নতি লাভ করে। প্রাদেশিক ভাষা এই সময়ে নিজের পথ পরিষ্কার করিয়া লয়।

উপরোক্ত স্তরগুলি যখন মন্দীভূত হইতে থাকে, যখন পূর্ব্বের সেই জীবনীশক্তি সুপ্ত হইয়া লুপ্ত হইতে থাকে, তখন আবার সাহিত্যের একটী বিকৃত সংস্করণ বাহির হয়, সাহিত্যে তখন নূতনত্ব থাকে না—গভীর চিন্তা, অক্লান্ত ধৈর্য্য, প্রবল কর্ম্মশক্তি, বিশেষরূপ অনুসন্ধিৎসা তখন সাহিত্যক্ষেত্র হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া সাহিত্যকে অসার, জড়ত্বে পরিণত করিয়া যায়। তাহাকে উপযুক্ত সার দিয়া, যথারীতি কর্ষণ করিয়া, আবর্জ্জনা দূরীভূত করিয়া কেহ তাহাকে উর্ব্বরা করে না; কাজেই আশানুরূপ ফুল ফলে না, আগাছা জন্মে।

এসময়ে কেবল অসার গল্প, খণ্ড কবিতায় প্রচার দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকে। কেহ যে একখানা প্রাণময় বড় কাব্য

লিখিবে, সে ধৈর্য্য তাহার কোথায় ? জাতিকে কিছু দিতে ইচ্ছা নাই, ইচ্ছা কেবল রাতারাতি বড়লোক হওয়া ; ইচ্ছা কেবল—নিজে কবি, নিজে লেখক, নিজে ঔপন্যাসিক এই নাম নিতে। তখন কাজ করি না করি নাম চাই ; তখন পাঠকের চেয়ে লেখকের সংখ্যা বেশী, পূর্ব্বে এদেশে কেহ কিছু লিখিলে দেশময় সাড়া পড়িয়া যাইত ; এখন সুধীসঙ্ঘ লেখকের চর্ব্বিত-চর্ব্বণ মনোযোগ সহকারে পড়িতে বড় একটা চাহে না। আর এ অবস্থায় মানুষেরও রুচি বদলাইয়া গিয়াছে। একটু কঠিন বই হইলে, ভাব এবং ভাষা একটু মনোযোগসাপেক্ষ হইলে তাহার লেখকের চিরদৈন্যদশা অবলম্বন করিতে হয়।

এসময়ে বহু পুস্তকের সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু দায়াদদের জন্য কিছু থাকে না। যাহা পরবর্ত্তী সময়ে থাকে না, তাহার প্রচারে আবশ্যকতা কি ? আবর্জ্জনারাশির ন্যায় উহা কেবল পুস্তকাগারের আলমারীকে স্তূপীকৃত করিয়া রাখে, মানব সাধারণের উহাদ্বারা কোন কল্যাণ সাধিত হয় না। যাহা কাহারও উপকার করিতে পারে না তাহার সৃষ্টিতে দেশের ক্ষতি, তাহার স্থিতিতে দেশ সংক্ষুব্ধ, তাহার প্রলয়ে দেশ হইতে ধূমকেতুর অপসারণ।

দেশে মানুষ আছে কিনা তাহা সে দেশের লেখক, কবি প্রভৃতির বচনভঙ্গিমা দ্বারাই প্রতীয়মান হয়। দেশের যাহা সঙ্কল্প, যাহা আশা তাহাই ত নানাপ্রকারে প্রতিভাশালী লোকদ্বারা প্রকাশিত হয়, তাহাই যদি অসার হয়, তবে আর দেশের মনুষ্যত্ব কোথায় রহিল ? আমাদের বর্ত্তমান বঙ্গীয়-সাহিত্যালোচনা দেখিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ইহার লেখকবর্গ স্ব স্ব কর্ত্তব্যপথভ্রষ্ট হইয়া বিপথে চলিতেছেন। আশু ইহার প্রতিবিধান না করিলে দেশের অবস্থা আরও শঙ্কটজনক হইবে ; যে ছাত্রবৃন্দ বর্ত্তমানে দেশের আশা ভরসাস্থল, তাহারাই অসার গল্প, উপন্যাস নাটক নিয়া ব্যস্ত। একটু কঠিন বই হইলে তাহারা পুস্তকখানির নামটী পর্য্যন্ত দেখে না, ইহার চেয়ে অধঃপতন আর কি হইতে পারে ? তজ্জনই দেশে মানুষ গঠনের প্রয়োজন। শিক্ষা দীক্ষার, রীতি-পরিবর্ত্তন না করিলে মানুষ গঠিত হইবার আশা নাই ; আমরা যে শিক্ষায় শিক্ষিত হইতেছি, সে শিক্ষা যে আমাদিগকে কোন স্বর্গসিংহাসন প্রদান করিবে, তাহা শিক্ষকবৃন্দই জানেন।

আমাদের সাহিত্যকে আবার নবজীবনে সঞ্জীবিত করিতে হইলে আবার আমাদিগকে মানুষ হইতে হইবে ; কর্ম্মক্ষেত্রে আবার আমাদিগকে নামিতে হইবে ; আমাদিগকে সংযমী হইয়া, মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিয়া আবার নবজীবন লাভ করিতে হইবে। দেশকে আর পঙ্গু রাখিলে চলিবে না ; পরস্পর পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া আবার অগ্রসর হইতে হইবে। সম্পূর্ণ বিজাতীয় ভাবকে পরিহার করিয়া দেশকে নবস্রোতে প্লাবিত করিতে হইবে। ইহার আদর্শ ভিন্ন, ইহার গতি ভিন্ন, ইহার প্রচারের পথও ভিন্ন। এক কথায় যাহাতে সম্পূর্ণ জীবনীশক্তি অর্জ্জন করা যায়, তাহারই প্রয়োজন। তাহা না করিতে পারিলে আমাদের মঙ্গল নাই, আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিয়া যাইব। আমরা অগ্রসর হইলে ভগবান নিজেই আলো ধরিবেন, অনায়াসেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পারিব ; জগৎ বিস্ময় বিমুগ্ধনেত্রে আমাদিগের দিকে চাহিয়া থাকিবে।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভ্রান্তি

নিবিড় কুয়াসা-ঘরে ঘিরে দিল দেশ,
দেখিনু কি যেন দূরে ঘোর কাল বেশ।
কুয়াসার ঘনস্তর যাইলে সরিয়া,
দেখিনু সে বনপশু, রয়েছে পড়িয়া।

বাকী আবরণটুকু হইলে নিঃশেষ,
দেখিনু মানুষ এক দীনহীন বেশ।
দুপুর দিবস হল,—উজল গগন,
দেখিনু আমারি এক ভ্রাতা সেইজন।

"দীন-দাস"।

শ্রাদ্ধকৃত্য দ্বারা পিতৃপুরুষগণ তৃপ্ত হন কিনা, এই বিষয় লইয়া বহুকাল হইতে বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে; উভয়পক্ষের যাহা কিছু বলিবার ছিল তাহা বলা হইয়া গিয়াছে, সুতরাং এসম্বন্ধে নূতন কিছুই বলিবার নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, শ্রাদ্ধের মূল ভিত্তি বিশ্বাস,— তর্কের দ্বারা ইহার তথ্য নিরূপণ হয় না, বা হইতে পারে না। "শ্রদ্ধয়া দীয়তে যস্মাৎ শ্রাদ্ধং তেন নিগদ্যতে—ইতি পুলস্ত্যঃ" শ্রদ্ধার সহিত পিতৃপুরুষগণকে দান করা হয় বলিয়াই এই কার্য্যের নাম শ্রাদ্ধ। "শ্রদ্ধা শাস্ত্রার্থে দৃঢ়-প্রত্যয়ঃ—ইতি রঘুনন্দনঃ" শাস্ত্রার্থে শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ দৃঢ় প্রত্যয়। শ্রাদ্ধকৃত্যে যাঁহার বিশ্বাস আছে, তিনিই শ্রাদ্ধের অধিকারী; যাঁহার বিশ্বাস নাই, তাঁহার শ্রাদ্ধ করিবার কোনও প্রয়োজন করে না, বা তিনি শ্রাদ্ধ করিলে তদ্দ্বারা তাঁহার পিতৃপুরুষগণ তৃপ্ত হন কিনা, সে বিষয় যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

পিতৃপুরুষগণকে খাদ্যদ্রব্যাদি দান করিয়া তাঁহাদের তৃপ্তি সাধন করাই শ্রাদ্ধের কর্ত্ত্ব্য। এখন কথা হইতেছে যে, মৃতব্যক্তির, অর্থাৎ প্রেত বা পিতৃলোকগত আত্মার শ্রাদ্ধ-ক্ষেত্রে পিণ্ডাদি ভোজন করিতে আগমন করা কিরূপে সম্ভব হয়। বাস্তবিক কোনও পরলোকগত আত্মা স্বয়ং শ্রাদ্ধক্ষেত্রে কব্যাদি ভোজন করিতে আসেন না, ব্রাহ্মণ প্রতিনিধি দ্বারা তাঁহার তৃপ্তি সাধন করা হইয়া থাকে। এই প্রতিনিধি দ্বারা তৃপ্তি সাধন করিবার মূল,—"সর্ব্বং সর্ব্বাত্মকং" সকল আত্মা এক - এই সমষ্টিজ্ঞান। এই জ্ঞান সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অস্থিভূত, শ্রাদ্ধতত্ত্বের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। এই সমষ্টি জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়াই ব্রাহ্মণভোজনাদি দ্বারা পিতৃ-তর্পণ করিবার ব্যবস্থা। কিন্তু এই জ্ঞান এত উচ্চ এত গভীর যে, ইহা হৃদয়ঙ্গম করা সাধারণের পক্ষে সুকঠিন। ভোজনাদি দ্বারা একজন ব্রাহ্মণের তৃপ্তি সাধন করিলে সঙ্গে সঙ্গে পরলোকগত পিতৃপুরুষগণও যে তৃপ্তি লাভ করিবেন, এবিশ্বাস সাধারণের পক্ষে সহজসাধ্য নয়। আমরা আবহমান কাল হইতে জানি, ঘটাকাশ ও মঠাকাশ যেমন এক, সর্ব্বভূতে আত্মাও তেমনি এক। কিন্তু কথাটা কি আমরা অন্তরের সহিত অনুভব করি, অথবা সেরূপ অনুভব করিবার বা বিচার করিয়া দেখিবার ক্ষমতা আমাদের সকলের আছে? যখন এই ভাব গ্রহণ করিবার আমাদের সকলের ক্ষমতা নাই, অথচ ইহার উপর আস্থা স্থাপন না করিলে শ্রাদ্ধ করাও একপ্রকার নিষ্ফল, তখন এ সম্বন্ধে বিচার না করিয়া শাস্ত্রবাক্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করাই যুক্তিসঙ্গত।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, সকল আত্মাই যখন এক, তখন পিতৃপুরুষগণের প্রতিনিধি ব্রাহ্মণ না হইয়া একজন দরিদ্র চণ্ডালও ত হইতে পারে। এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে দেখা যাউক, পূর্ব্বে কি উপায়ে পিতৃপূজা করা হইত।

বৈদিক সময়ে অগ্নিকে পিতৃপূজার প্রতিনিধি করিয়া কব্যাদি আহুতি দেওয়া হইত। অগ্নি শ্রাদ্ধের কব্য (অর্থাৎ পরলোকগত পিতৃপুরুষগণকে দেয় খাদ্যদ্রব্য) বহন করিতেন বলিয়া অগ্নির অপর নাম কব্যবহ। কথিত আছে,—

> "যো অগ্নিঃ ক্রব্যবাহনঃ পিতৃন্যক্ষদৃতাবৃধঃ।
> প্রেদুহব্যানি বোচতি দেবেভ্যশ্চ পিতৃভ্য আ॥
> উশংতস্ত্বা নি ধীমহ্যুশংতঃ সমিধীমহি।
> উশন্নুশত আ বহ পিতৃন্ হবিষে অত্তবে॥"

[ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল ১৬ সূক্ত ১১।১২ ঋক]

অর্থাৎ অগ্নি শ্রাদ্ধের কব্য বহন করেন ও দেবগণকে এবং পিতৃগণকে আরাধনা করেন। তিনি হোমের দ্রব্য দেব-গণের ও পিতৃগণের নিকট প্রেরণ করেন। হে অগ্নি, যত্ন পূর্ব্বক তোমায় স্থাপন ও প্রজ্জ্বলিত করিতেছি। তুমিও যজ্ঞকামনাকারী দেবগণ ও পিতৃগণের নিকট তাঁহাদের ভোজনার্থ হোমের দ্রব্য (হব্য ও কব্য) বহন কর।

অধুনা আমাদের অগ্নি স্থাপন করিয়া শ্রাদ্ধ করিবার প্রথা না থাকিলেও এই "উশংতস্ত্বা" ঋকটি আজও পর্য্যন্ত আমাদের পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। বোধহয় সেই বৈদিক যুগের স্মৃতি জাগরূক রাখিবার জন্যই আমাদের এইরূপ ব্যবস্থা। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ও মান্দ্রাজ প্রদেশীয় আর্য্যব্রাহ্মণদিগের মধ্যে আজও পর্য্যন্ত অগ্নি স্থাপন করিয়া শ্রাদ্ধ করিবার প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়।

কোন সময়ে যে আমাদের শ্রাদ্ধে অগ্নিকে প্রতিনিধি

করিবার ব্যবস্থা লোপ পায় তাহা নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না। তবে দেখা যায়, মনুসংহিতা ও পুরাণাদিতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে প্রতিনিধি করিবার ব্যবস্থা আছে। মনু-সংহিতায় কথিত আছে,—

"অগ্ন্যভাবেত্তু বিপ্রস্ত পাণাবেবোপপাদয়েৎ।
যো হ্যগ্নিঃ স দ্বিজো বিপ্রৈর্মন্ত্রদর্শিভিরুচ্যতে॥"

[৩য় অধ্যায় ২১২ শ্লোকে]

অর্থাৎ অগ্নির অভাবে ব্রাহ্মণের হস্তেই (পিণ্ডাদি) প্রদান করিবে; কেননা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা বলেন, যিনি অগ্নি তিনিই ব্রাহ্মণ,—ইঁহাদের মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই।

ইহা হইতেই বুঝা যায়, পৌরাণিক যুগেই শ্রাদ্ধে অগ্নির পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণকে প্রতিনিধি করিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

এখন দেখা যাইতেছে যে, "সর্ব্বং সর্ব্বাত্মকং" কেবল মাত্র এই সমষ্টিজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়াই শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ প্রতিনিধি নিয়োগ করিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের পরিবর্ত্তে একজন চণ্ডালকেও অনায়াসে নিয়োগ করা যাইতে পারিত। কিন্তু এক্ষেত্রে সকল ব্রাহ্মণই শ্রাদ্ধে প্রতিনিধি হইবার অধিকারী নয়। অগ্নির প্রতিনিধি ব্রাহ্মণ, সুতবাং অগ্নির ন্যায় পবিত্র, জ্ঞানবলে বলীয়ান ব্রাহ্মণ আবশ্যক। এসম্বন্ধে মনু বলেন,—

"জ্ঞানোৎকৃষ্টায় দেবানি কব্যানি চ হবীংষি চ।
ন হি হস্তাবসৃগ্দিগ্ধৌ রুধিরেনৈব শুধ্যত:॥
জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বিজা: কেচিৎ তপোনিষ্ঠাস্তথাপরে।
তপঃ স্বাধ্যায়নিষ্ঠাশ্চ কর্ম্মনিষ্ঠাস্তথাপরে॥
জ্ঞাননিষ্ঠেষু কব্যানি প্রতিষ্ঠাপ্যানি যত্নতঃ।
হব্যানি তু যথান্যায়ং সর্ব্বেষেব চতুর্ষ্বপি॥

[৩য় অধ্যায় ১৩২।১৩৪।১৩৫ শ্লোক]

অর্থাৎ উৎকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে হব্য ও কব্য প্রদান করা উচিত, কেন না রক্তাক্ত হস্ত রক্ত দ্বারা প্রক্ষালন করা যায় না। কোন দ্বিজ জ্ঞাননিষ্ঠ কেহ তপনিষ্ঠ, কেহ তপঃ ও অধ্যয়ননিষ্ঠ আবার কেহ বা কর্ম্মনিষ্ঠ। ইহাদের মধ্যে শ্রাদ্ধে জ্ঞাননিষ্ঠ ব্রাহ্মণকেই পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে কব্য যত্নপূর্ব্বক প্রদান করিতে হয়। দেবোদ্দেশে হব্য অন্য চারি প্রকার ব্রাহ্মণকে দেওয়া যাইতে পারে।

অধুনা আমরা উপযুক্ত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অভাবে কুশের ব্রাহ্মণ নির্ম্মাণ করিয়া শ্রাদ্ধ করিয়া থাকি এবং শ্রাদ্ধ শেষে দ্রব্যাদি পুরোহিত বা অপর কোনও ব্রাহ্মণকে দান করি ও কয়েকটি (ইচ্ছানুরূপ সংখ্যক) ব্রাহ্মণ ভোজন করাই। এ সম্বন্ধে স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের এইরূপ ব্যবস্থা আছে,—

ব্রাহ্মণাসম্পত্তৌ কুশময় ব্রাহ্মণে শ্রাদ্ধমুক্তং—
"ব্রাহ্মণানামসম্পত্তৌ কৃত্বা দর্ভময়ান্ দ্বিজান্।
শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিধানেন পশ্চাদ্বিপ্রেষু দাপয়েৎ॥"
ইতি শ্রাদ্ধসূত্র-ভাষ্যকার সমুদ্রকরধৃতবচনাৎ

অর্থাৎ উপযুক্ত ব্রাহ্মণের অভাবে কুশময় ব্রাহ্মণের উপরেই শ্রাদ্ধ করিতে হইবে; কেন না শ্রাদ্ধসূত্রের ভাষ্যকার সমুদ্রকর কর্ত্তৃক এইরূপ বচন উদ্ধৃত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ-দিগের অপ্রাপ্তি ঘটিলে, দর্ভময় ব্রাহ্মণ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহাদের সন্নিধানে শ্রাদ্ধ করিয়া পরে ঐ শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রকৃত ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে।

পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় কিন্তু এ মতের ততটা পক্ষপাতী নহেন। তিনি তাঁহার আচার প্রবন্ধান্তর্গত শ্রাদ্ধকৃত্য প্রবন্ধে বলেন, "আমার বিবেচনায় সর্ব্বপ্রকার শ্রাদ্ধ এবং সকল স্থানে এবং সকল অবস্থাতে দর্ভবস্তুর নিয়োগ শাস্ত্রসম্মত কার্য্য নহে। পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণগণ খুব ভাল ছিলেন, এখন তেমন ভাল নাই, এ কথা স্বীকার করিলেও এখন যে কেবল দর্ভময় ব্রাহ্মণেরই নিয়োগ দ্বারা শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে, এরূপ স্বীকার করিতে পারা যায় না। সাক্ষাৎ ইষ্টদেবতার স্বরূপ মনে করিয়া যখন অনেকানেক ব্রাহ্মণের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করা যাইতেছে, তখন যে পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতিনিধি হইবার যোগ্য ব্রাহ্মণের একান্ত অভাব হইয়া পড়িয়াছে, এমত মনে করা যাইতে পারে না।" কথাটা আপাততঃ যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়, বটে; কিন্তু শাস্ত্র-বাক্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইলে, যে কোনও ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে নিয়োগ করা যায় না, বা এরূপ করিতে হঠাৎ প্রাণ চায় না। মনু শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ নিয়োগ সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহা অতি বিস্তার,—এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ করা অসম্ভব, কেননা তাহা হইলে মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের

শেষাংশ সমস্তই উদ্ধৃত করিতে হয়। উহার স্থূল মর্ম্ম এইরূপ ;—ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি পিতৃকার্য্যে যত্নের সহিত ব্রাহ্মণগণকে পরীক্ষা করিয়া লইবেন। যাঁহারা চুরি করে, অসত্য কথা বলে, পতিত, ক্লীব, নাস্তিক, বেদাধ্যয়নশূন্য, ব্রহ্মচারী, চর্ম্মরোগগ্রস্ত, দ্যূতক্রীড়াপরায়ণ, বহুযাজনশীল, চিকিৎসক, প্রতিমাপরিচারক, মাংসবিক্রয়ী, গ্রামের বা রাজার ভৃত্য, কুসীদজীবি, পঞ্চ মহাযজ্ঞানুষ্ঠান রহিত, ব্রাহ্মণদ্বেষী, মদ্যপায়ী, আচারহীন, ধর্ম্মকার্য্যে নিরুৎসাহী ইত্যাদি দোষযুক্ত তাঁহারা পিতৃ কার্য্যে পরিত্যাজ্য। অতএব দেখা যাইতেছে যে, মনুর নির্দ্দেশানুসারে অধুনা শ্রাদ্ধের ব্রাহ্মণ এক প্রকার দুষ্প্রাপ্য। যদি কচিৎ কোথাও একটি ব্রাহ্মণ পাওয়া যায়, তিনি যে সর্ব্বদোষ রহিত, সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারা যায় না। এই কারণেই বোধ হয়, আমাদের কুশময় ব্রাহ্মণ নির্ম্মাণ করিয়া শ্রাদ্ধ করিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আমরা যখন কেবল কুশময় ব্রাহ্মণে শ্রাদ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হই না, সঙ্গে সঙ্গে যথাসাধ্য ব্রাহ্মণও ভোজন করাইয়া থাকি, তখন কুশময় ব্রাহ্মণের ব্যবস্থা যে দোষযুক্ত এরূপও বলিতে পারি না।

এতদূর পর্য্যন্ত, যে উপায়ে পরলোকগত আত্মার তৃপ্তিসাধন করা হয়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা হইল। এখন কথা হইতেছে এই যে, শ্রাদ্ধকৃত্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইলে, সঙ্গে সঙ্গে পরলোকও মানিতে হয়। কিন্তু পরলোক সম্বন্ধে চিরকালই সন্দেহ বিদ্যমান।

"যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে-
হস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহহং
বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ॥"

[কঠোপনিষৎ ১ম বল্লী ২০ শ্লোক]

অর্থাৎ মনুষ্যলোকে পরলোক সম্বন্ধে সন্দেহ চিরকালই বিদ্যমান আছে। আস্তিকগণ বলেন, পরলোক আছে; নাস্তিকগণ বলেন, পরলোক নাই। অতএব আপনি কৃপা করিয়া আমার সন্দেহ দূর করুন, ইহাই আমার তৃতীয় বর প্রার্থনা।

ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, বহু পুরাকালেও পরলোক সম্বন্ধে সন্দেহ বিদ্যমান ছিল; এবং আজও পর্য্যন্ত যে এই সন্দেহ পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান আছে, তাহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু এই সন্দেহ সত্ত্বেও, আশ্চর্য্যের বিষয়, এই যে, শ্রাদ্ধকৃত্যাদি পিতৃপূজা বৈদিক সময় হইতে সমভাবে চলিয়া আসিতেছে।

নির্ব্বিবাদে যদি পরলোক মানিয়া লওয়া যায়, পরক্ষণেই প্রশ্ন উঠিবে,—সেটা কি প্রকার, অর্থাৎ মৃত্যুর পর জীব কি অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়েও আর্য্যঋষিগণ এক মত হইতে পারেন নাই; এবং এই কারণেই, আমার বোধ হয়, পরলোকের অস্তিত্ব সন্দেহপূর্ণ। হিন্দুশাস্ত্রে সকল বিষয়েই মতদ্বৈধ। কিন্তু এই বিভিন্ন মতের মধ্যেও একটা সামঞ্জস্য আছে, একটা সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য নিহিত আছে। বেদ ও পুরাণাদিতে মৃত্যুর পর জীবের অবস্থা বিভিন্নরূপে বর্ণিত হইলেও, অধিকাংশ স্থলে প্রেতলোক, পিতৃলোক ও জন্মান্তর গ্রহণ স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং শ্রাদ্ধকৃত্য সম্বন্ধে কোনও বিবাদ বিসম্বাদ করিবার হেতু নাই।

জীবের দেহ দুইটি,—একটি স্থূল ও একটি সূক্ষ্ম। মৃত্যুর পর পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন স্থূল দেহ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়, এবং জীবের আত্মা সূক্ষ্ম আতি-বাহিক দেহ ধারণ করিয়া অবস্থান করে। বৈদিক সময়েও এইরূপ ধারণা বিদ্যমান ছিল। ঋগ্বেদে কথিত আছে,—

"সূর্য্যং চক্ষুর্গচ্ছতু বাতমাত্মা দ্যাং চ গচ্ছ পৃথিবীং চ ধর্ম্মনা।
অপো বা গচ্ছ যদি তত্র তে হিতমোষধীষু প্রতিষ্ঠা শরীরৈঃ॥
অজো ভাগস্তপসা তং তপস্ব তং তে শোচিস্তপতু তং তে অর্চিঃ
যাস্তে শিবাস্তন্বো জাতবেদস্তাভির্বহৈনং সুকৃতামু লোকং॥"

[১০ মণ্ডল ১৬ সূক্ত ৩|৪ ঋক্]

অর্থাৎ, হে মৃত, তোমার চক্ষু সূর্য্যের সহিত মিশিয়া যাউক, তোমার শ্বাস বায়ুতে লয় পাউক, তুমি তোমার কর্ম্মফলে আকাশে (স্বর্গে) ও পৃথিবীতে (মর্ত্তে) যাও। জলে যাওয়াটা যদি তোমার হিতকর বিবেচনা কর, তবে জলে যাও, তোমার শরীর ওষধির সহিত অবস্থান করুক॥ হে অগ্নি, এই মৃতের যে অংশ জন্ম রহিত, তোমার তেজ দ্বারা সেই অংশকে উত্তপ্ত কর, তোমার ঔজ্জ্বল্য ও তোমার শিখা সেই অংশকে উত্তপ্ত করুক। হে জাতবেদা, তোমার যে সকল মঙ্গলময়ী মূর্ত্তি আছে, তাহাদের দ্বারা এই মৃত ব্যক্তিকে পুণ্যবান লোকদিকের ভুবনে বহন করিয়া লইয়া যাও।

কথিত আছে,— এই সূক্ষ্ম অতিবাহিক দেহ ধারণ অতি কষ্টকর। একারণ শাস্ত্রকারগণ অশৌচকাল মধ্যে দাহকারী দ্বারা দশপিণ্ড দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। দশপিণ্ড দ্বারা কষ্টকর অতিবাহিক দেহ পুরণ হইয়া প্রেত দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দেহ পুরণ হয় বলিয়া দশপিণ্ড দানের অপর নাম পুরক পিণ্ড দান। অতিবাহিক দেহে জীব যে কিরূপ ভাবে অবস্থান করে, তাহা দশপিণ্ড দানান্তর যে মন্ত্র পাঠ করা হয়, তাহা হইতে কতকটা আভাস পাওয়া যায়। দশপিণ্ড দানের পর প্রেতোদ্দেশে আমরা নীর ও ক্ষীর উৎসর্গ করিতে গিয়া মন্ত্রপাঠ করি,—"আকাশস্থো নিরালম্বো বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ।" অর্থাৎ হে মৃত, তুমি আকাশে বায়ুভূত হইয়া অবস্থান করিতেছ; তোমার কোনও অবলম্বন বা আশ্রয় নাই।

অতিবাহিক দেহত্যাগ করিয়া দশ দিনের পর জীব যে প্রেত-দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাকে এক শ্রেণীর ভোগ দেহ বলা যাইতে পারে। এই প্রেত শব্দটি কোন কোন পুরাণে অতি হেয় ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পদ্মপুরাণে প্রেতের আকৃতি সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

"বিকরালমুখং দীনং পিশঙ্গনয়নং ভৃশম্।
উর্দ্ধমূর্দ্ধজকৃষ্ণাঙ্গং যমদূতমিবাপরং॥
চলজ্জিহ্বঞ্চ লম্বোষ্ঠং দীর্ঘজঙ্ঘাশিরাকুলম্।
দীর্ঘাঙ্ঘ্রিং শুষ্কতুণ্ডঞ্চ গর্ত্তাক্ষং শুষ্কপঞ্জরং॥"

অর্থাৎ প্রেতের আকৃতি দ্বিতীয় যমদূতের ন্যায় করালবদন, দীন ভাবাপন্ন, চক্ষু অত্যন্ত পিঙ্গলবর্ণ, মাথার চুলগুলি সব খাড়া; কৃষ্ণবর্ণ, জিহ্বা লক্‌লকে, ঠোঁট লম্বা, জঙ্ঘা দীর্ঘ ও শিরাকুল, দীর্ঘচরণ, মুখ শুষ্ক, চক্ষু কোটরস্থ, এবং পঞ্জর শুষ্ক।

অগ্নি পুরাণেও প্রেতকে অতি অস্পৃশ্য পাপিষ্ঠ নরকস্থ জীব বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয়ও তাঁহার 'বাঙ্গলা ভাষার অভিধানে' লিখিয়াছেন,—"যথা নিয়মে ঊর্দ্ধদেহিক সম্পন্ন না হইলে মৃত ব্যক্তির আত্মা প্রেত নামে কথিত হয়।" স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত 'প্রেত' শব্দটি কিন্তু এই সকল অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। স্মৃতিশাস্ত্র মতে পাপাত্মা ও পুণ্যাত্মা সকলকেই প্রেতলোকে গমন করিতে হয়, সকলকেই কোনও নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য শ্রাদ্ধাদিতে 'প্রেত' নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

এরূপ হইতে পারে, জগতে সকল জীব যেমন সমান অবস্থা প্রাপ্ত হয় না, কর্ম্মফল অনুসারে কেহ সুখী, কেহ বা দুঃখী, কেহ ধনী, কেহ বা দরিদ্র হয়, প্রেত লোকেও সেইরূপ সকলে একরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় না, পাপপুণ্য অনুসারে বিভিন্ন দেহ ধারণ করিয়া থাকে। আমরা সাধারণতঃ ভূত বা evil spirit বলিতে যাহা বুঝিয়া থাকি, পুরাণে সেই সকল প্রেতদেহই বর্ণিত হইয়াছে,—উহা সাধারণ প্রেতাকৃতি নহে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। যে সকল জীব অতি পাপী, অর্থাৎ যাহারা নরকে যাইবার উপযুক্ত তাহারই এই পুরাণ বর্ণিত প্রেতদেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; পুণ্যাত্মা বা সাধারণে যে ইহাদের সহিত সমান অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। সাধারণ প্রেতদেহ নরকের ন্যায় জঘন্য না হইলেও, উহা অশুচি প্রাপ্ত; এবং এই কারণেই মৃতপিতৃককে (যাহার মাতা বা পিতা মৃত হইয়াছে) তাহার পিতামাতার প্রেতদেহ ধারণকালে অশৌচ গ্রহণ করিতে হয়। এই অশৌচকে সাধারণে কালাশৌচ নামে অভিহিত করিয়া থাকে।

শাস্ত্রে প্রেতলোকের স্থান চন্দ্রমণ্ডলের নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। চন্দ্রের একবার পৃথিবী পরিবেষ্টন করিতে প্রায় একমাস সময় লাগে বলিয়া, একমাসে প্রেতলোকের একদিন হইয়া থাকে। প্রতি প্রেতলোকের দিনে অর্থাৎ প্রতি চান্দ্রমাসে একবার করিয়া প্রেতশ্রাদ্ধ করা আবশ্যক। এই প্রেতশ্রাদ্ধকে মাসিকৈকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ বলা হইয়া থাকে। ইহা "নিত্য" অর্থাৎ একান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে গণ্য এবং না করিলে প্রেতত্বের উদ্ধার হয় না।

আত্মার প্রেতলোকে অবস্থানকাল এক বৎসর। বৎসর পূর্ণ হইলে (অর্থাৎ মৃত তিথি হইতে গণনায় দ্বাদশ চান্দ্র মাসের মৃত তিথিতে) সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধের দ্বারা মৃতের প্রেত দেহ বিমোচন হইয়া পিতৃলোক প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। এই সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধও 'নিত্য'—না করিলে পিতৃপুরুষগণের প্রেতত্ব নাশ হয় না। পুত্রকন্যার বিবাহাদি কর্ম্মে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধানুরোধে অনেক সময় বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই "অপকর্ষ' করিয়া পিত্রাদির সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ করা হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে রঘুনন্দন বলেন,—

যথাপরত্বং সপিণ্ডনজন্যাপূর্ব্বং পূর্ব্বসংবৎসরকালং প্রাপ্য পিতৃত্বপ্রাপকং।—"কৃতে সপিণ্ডীকরণে নরঃ সংবৎসরাৎ

পরং। প্রেতদেহং পরিত্যজ্য ভোগদেহং প্রপদ্যতে॥—"
ইতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরীয়াৎ।

অর্থাৎ অপকৃষ্ট সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ করিলেও, বৎসর পূর্ণ হইবার পর পিতৃ-পুরুষগণ পিতৃলোকে গমন করিয়া থাকে; কেননা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরীয়ে কথিত আছে, বৎসর মধ্যে সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হইলেও, জীবগণ এক বৎসরের পর প্রেতদেহ পরিত্যাগ করিয়া ভোগদেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ 'নিত্য' অর্থাৎ অবশ্য কর্ত্তব্য হইলেও, উহা প্রেতত্ব বিমোচনের হেতু নহে,—কালই প্রেতত্ব নাশ করিয়া থাকে। পাপাত্মাই হউক, আর পুণ্যাত্মাই হউক, সকলকেই পূর্ণ এক বৎসর কাল প্রেতলোকে বাস করিয়া পিতৃলোকে গমন করিতে হয়।

পিতৃলোকের স্থান চন্দ্রমণ্ডলের উপরে। চন্দ্র এক বৎসরে (পৃথিবী বেষ্টন করিতে করিতে) একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। একারণ এক চান্দ্র বৎসরে পিতৃলোকের একদিন হইয়া থাকে। প্রতি পিতৃদিনে অর্থাৎ প্রতি চান্দ্র বৎসরে একবার করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে হয়। এই শ্রাদ্ধকে সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ বলা হইয়া থাকে।

পিতৃলোক হইতে জীব পুনরায় জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে। কতকাল পরে এই জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হয়, তাহার কোনও নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই, উহা জীবের কর্ম্মফলের উপর নির্ভর করে। পিতৃপুরুষগণ পিতৃলোকেই বাস করুন অথবা জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া পৃথিবীলোকেই পুনঃ প্রত্যাগমন করুন, শ্রাদ্ধকৃত্যে ইহাতে কিছু আসে যায় না। পিতৃপুরুষগণ যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, তাহারা সর্ব্বদাই আমাদের পূজনীয়, তাঁহাদের লোকান্তরিত আত্মার তৃপ্তি-সাধন করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহাই হিন্দু শাস্ত্রের উপদেশ,—ইহাই শাস্ত্রের বিধান। বৈদিক সময়েও পৃথিবী-লোকগত পিতৃপুরুষগণের পূজা করা হইত, এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। বেদে কথিত আছে,—

ইদং পিতৃভ্যো নমো অস্ত্বদ্য যে পূর্ব্বাসো য উপরাস ঈয়ুঃ।
যে পার্থিবে রজস্যা নিষত্তা যে বা নূনং সুবৃজনাসু বিক্ষু॥
[ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল ১৫ সূক্ত ২ঋক্]

অর্থাৎ যে সকল পিতৃপুরুষ পূর্ব্বে অথবা পরে মৃত হইয়াছেন, যাঁহারা পৃথিবী লোকে আছেন (অর্থাৎ জন্মান্তর গ্রহণ করিয়াছেন), অথবা যাঁহারা ভাগ্যবান লোকদের মধ্যে আছেন, তাঁহাদের সকলকেই আমি অদ্য নমস্কার করিতেছি।

পিতৃলোক স্বর্গসদৃশ অতি পবিত্র স্থান। পিতৃপুরুষগণ দেবগণের সহিত যজ্ঞে আগমন করিয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ঋগ্বেদে এ সম্বন্ধে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে.—
যে সত্যাসো হবিরদো হবিষ্পা ইন্দ্রেণ দেবৈঃ সরথং দধানাঃ।
আগ্নে যাহি সহস্রং দেববন্দৈঃ পরৈঃ পূর্ব্বৈঃ পিতৃভির্ঘর্ম্মসদ্ভিঃ॥
[১০ মণ্ডল ১৫ সূক্ত ১০ ঋক্]

অর্থাৎ যে সকল সত্যবান পিতৃলোক দেবগণের সহিত একত্রে হবি গ্রহণ করিয়া থাকেন, ও ইন্দ্রের সহিত একরথে গমনাগমন করিয়া থাকেন, হে অগ্নি, সেই সকল দেবারাধনাকারী, যজ্ঞানুষ্ঠানকারী, প্রাচীন ও আধুনিক পিতৃলোকদিগের সহিত আইস।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, বৈদিক সময় হইতেই পিতৃ-পূজা দেবপূজার ন্যায় সমভাবেই আদরণীয় হইয়া আসিতেছে। অধুনা এই শ্রাদ্ধকৃত্যের উপর অনেকেই বীতশ্রদ্ধ; এমন কি অনেকে ইহার উপর—হিন্দু শাস্ত্রের উপর কটূক্তি পর্য্যন্ত করিতে পশ্চাৎপদ হয়েন না। সমাজের ভয়েই হউক অথবা লোকাচারের তাড়নায়ই হউক, অনেকে যেন দায়ে ঠেকিয়া, পিতামাতার মাত্র আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়াই পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া নিরস্ত হন; তাঁহারা একবারও ভাবেন না যে, পিতামাতা তাঁহাকে প্রাণপণ যত্নে আজীবন লালন পালন করিয়া আসিয়াছেন,—যাঁহাদের যত্নে ও অনুগ্রহে তাঁহার অস্তিত্ব বিদ্যমান, তাঁহারা বৎসরের মধ্যে মাত্র একটি দিনের জন্যও পুত্রের নিকট হইতে, কিছু না হউক, তাঁহাদের তৃপ্তিলাভের জন্য অন্ততঃ তর্পনটিরও অপেক্ষা রাখেন। অবশ্য স্বীকার করি, আজকাল এমন অনেক স্বার্থপর পুরোহিত আছেন, যাঁহাদের কার্য্যে অনেক সময় ধর্ম্মকর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ হইতে হয়। কিন্তু অধুনা উপযুক্ত শাস্ত্র-জ্ঞানী ধর্ম্মযাজক ব্রাহ্মণের যে একেবারে অভাব হইয়া পড়িয়াছে, এ কথা বলিতে পারা যায় না। সুতরাং অবশ্য-কর্ত্তব্য পিতৃপূজায় শাস্ত্র বিশ্বাসী হিন্দুর অবহেলা করা উচিত কি?

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

"আবাহন"

আজি, এস মাগো বঙ্গে
হাসি প্রেম-রঙ্গে,
আলো-পথে বেয়ে হেম-তরণি !
-- এস এস কল্যাণী জননী !

আজি, অম্বর ঘন-মেঘ-মুক্ত ;
অন্ধ-তামস-রাশি লুপ্ত ;
রূপ-রস-গন্ধে
শত-গীত ছন্দে
ঝঙ্কৃত নন্দিত ধরণি ;
এস মাগো, বেয়ে হেম-তরণি।

আজি, সুধাময়-সিত-শরদিন্দু ;
বিমল-সলিল-বাহী-সিন্ধু ;
মঞ্জুল-কুঞ্জে
অলিকুল-গুঞ্জে
সৌরভে মাতোয়ারা অবণি ;
এস, জ্যোৎস্না-তরণি বেয়ে জননি !

আজি, পথে পথে ছুটে যায় অন্ধ ;
কোথাও নাহিক পথ বন্ধ ;
জাগ্রত-সুপ্ত—
নব-বল-যুক্ত
ওগো, শুনাও অভয়-বাণী তারিণি !
দুর্গতি-দুখ শোক-বারিণি !

আজি, সকল কুটীর মাগো, শূন্য ;
আন তায় ধন-জন-পুণ্য—
উৎসাহ শান্তি
উজ্জ্বল-কান্তি
ওগো, শিবময়ি, শঙ্কর-ঘরণি !
কোটী কোটী জীব-কুল-ভরণি !

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বি, এ।

চির অপরাধী

(১)

নির্ম্মলার যেদিন হরেনের সহিত বিবাহ হইল সেদিন সে জানিত না যে তাহার স্বামী কোণ। চিরদুঃখের ক্রোড়ে পালিতা সে আজ বিবাহিত জীবনের সুখ, দুঃখ, আশা, আকাঙ্ক্ষা সব গোলাপী বসনে সজ্জিত করিয়া পতি-গৃহে যাত্রা করিল।

স্বামীগৃহে একটী চাকর ভিন্ন আর কেহই ছিল না। পাল্কী হইতে নামিবার দুইদিন পরেই তাহাকে গৃহের কর্ত্রীর আসন দখল করিতে হইল, কারণ হরেনের একমাত্র আত্মীয় পিসিমা বধূকে ঘরে তুলিয়া থুইয়াই কাশী অভিমুখে রওয়ানা হইলেন।

নির্ম্মলা দেখিল স্বামী তাহার সহিত একটা কথাও কহেন না। ইহার কারণ সে বুঝিতে পারিত না। অনেক চিন্তার পর সে নিজেকেই অপরাধী সাব্যস্ত করিল—হয়ত সে তাঁহার মনোমত হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া এত অবহেলা? সামান্য একটা কথার ভাগীও সে হইবে না। তবে সে সুদীর্ঘ জীবনপথে কাহাকে ধরিয়া চলিবে?

সে সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। নিজে উপযাচিকা হইয়া কথা বলিতে পারিল না কারণ তাহার ধারণা ছিল যে এ কাজটা প্রথম হইতে পুরুষের। আর উপযাচিকা হওয়ায় মধ্যে যেন একটা সূক্ষ্ম অপমান আছে। সে ভিতরে ভিতরে পুড়িতে লাগিল।

(২)

হরেন রূপে গুণে সমুজ্জ্বল স্ত্রী ঘরে আনিয়াই তাহার অপরাধের গুরুত্ব বুঝিতে পারিল। এ সে কি করিয়াছে? তাহার ব্যর্থ জীবনের সহিত আর একটা নবীন জীবনকে অটুট বাঁধনে বাঁধিয়া কেন সে তাহাকে ব্যর্থ করিয়া দিতেছে। কেন সে বিবাহ করিল—কেন এত বড় ভুল করিয়া বসিল? এ ভুল যে আর শোধরাবার নয়। সে কেমন করিয়া তাহাকে সুখী করিবে? সবুজ প্রাণের কাণায় কাণায় ভরা রঙীন আশা বিচূর্ণ হইয়া গেলে কি তাহার হৃদয়ও ভাঙিয়া যাইবে না? যদি যায় তবে? না—সে তাহাকে জানিতে দিবে না যে সে বোবা। কিন্তু এ' যে জুয়াচুরি এত বড় মিথ্যা সে কেমন করিয়া চালাইবে? তা' বর্ত্তমানে আর ত' উপায় নাই। যতদিন সে না জানিতে পারে—ততদিন সে ভুলিয়া থাকুক। হরেন তাই স্ত্রীর সহিত ভাব বিনিময়ের চেষ্টা ছাড়িয়া দিল—কিন্তু সে যে কত দুঃখে—তাহা তাহার অন্তর্য্যামী ভিন্ন আর কেহই জানিল না।

(৩)

বিবাহ দিনেই নির্ম্মলা স্বামীর উপর একান্তভাবে নির্ভর করিয়াছিল বলিয়া স্বামীর উদাসীনতা তাহাকে অতিমাত্র বিদ্ধ করিল। স্বামী তাহাকে দেখিয়াও দেখেন না কেন? না হয় সে তাঁহার অযোগ্যই। কিন্তু তিনিই ত' তাহাকে দেখিয়া শুনিয়া আনিয়াছেন—তবে অবহেলা করিলে চলিবে কেন? এত ঘৃণা—বিনা দোষে—এ' যে সহা যায় না।

সে ভাবিত সে ও উদাসীন থাকিবে। স্বামি যদি তাহাকে না চাহেন—সেই বা তাঁহাকে চাহিবে কেন? সে ত ভিখারিণীর অধিকার লইয়া এ বাটীতে ঢুকে নাই। যেখানে তাহার রাণীর অধিকার ক্ষুণ্ণ হইল সেখানে সে প্রার্থনার স্থান লইবে কেন? সে নিজেকে এত ছোট করিবে কেন? কিন্তু স্বামীর নিকট আবার মানাপমান কি? জীবনে মরণে যাহার সহিত অটুট সম্বন্ধ যে পতি স্ত্রীর দেবতা—সে পতির অবহেলা, তাহার গ্রাহ্য করা উচিত নহে। পূজারিণী কেবল নৈবেদ্য সাজাইয়া বসিয়া প্রতীক্ষা করিবে—দেবতা তাহাকে ইচ্ছামত একদিন দেখা দিয়া তাহার এতকালের মৌনারাধনা সার্থক করিবে। এই ত' তাহাদের সম্বন্ধ? তাই কি ঠিক? দেবতা যে তাহার নিকট—তাহার হৃদয়ে, নিজের আয়ন প্রতিষ্ঠিত করিলেন না—দেবতা যে তাহাদের মধ্যে অপরিচিতের ব্যবধান রচনা করিয়া পূজা নিষেধ করিলেন—তবে?

এ' প্রশ্নের মীমাংসা কে করিবে? একদিকে নারীত্বের পূর্ণজাগ্রত আত্মসম্মান—আর একদিকে পতির পায়ে নির্ব্বিচার আত্মনিবেদন। এরূপ ক্ষেত্রে পতির পতিত্ব-প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন যে সজাগ হইয়া উঠে। মনের কোণে কে যেন বলে—দেবতা কে—কাহাকে আত্মদান করিবে? যে দেবতার পরিচয়ের মাধুর্য্যের মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় নাই—সে দেবতার পূজার সার্থকতা কি? লাভ—দেবতার ঘৃণাদৃষ্টির মধ্যে নিজের আত্মগ্লানির তীব্র অনুভূতি।

নির্ম্মলা প্রতিজ্ঞা করিল সে কিছু চাহিবে না। "ওগো নিষ্ঠুর, ওগো পাষাণ, তোমার ভিতরে জাগ্রত দেবতার খোঁজ তুমি না দিলে আমি কিছুই চাহিব না—কিছুই দেখিব না।"

তবু এই প্রতিজ্ঞার পিছনে স্নেহ করুণাপূর্ণ নারীহৃদয় আকুল ব্যথায় জাগিয়া উঠে। প্রতিজ্ঞা বুঝি থাকে না।

(৪)

হরেন দেখিল যে গ্রামে থাকিয়া এরূপ লুকোচুরি বেশী-দিন চলিবে না। যে উদ্যত বজ্র সে নিশ্চিত পতন হইতে প্রাণপণে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছে, সে বজ্র কোন্‌দিন কোন্ অজ্ঞাত হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত হইবে কে জানে? তাই সে পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইল। সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া সে কলিকাতায় আসিল। সেখানে ত' আর কেহ তাহার খোঁজ লইবে না—তাহার স্ত্রীও বুঝিবে না সে কত বড় অক্ষমকে বরণ করিয়াছে।

হরেন বিবাহ করিয়া যে ভুল করে নাই, সে ভুল করিল আজ পূর্ব্ব ভুলের সংশোধন চেষ্টায়। জীবিত স্বামীর ছায়া লইয়া স্ত্রীর হৃদয় ত' পূর্ণ থাকিতে পারে না। স্ত্রী যে তাহার শরীরে, মনে, আত্মায় পর্য্যন্ত অনুভব করিতে চাহে যে, সে তাহার পতির সহিত চিরদিনের কর্ম্মে মিশিয়া আছে। পতির হাসিতে, অশ্রুতে, বেদনায়—সবস্থানেই সে সহযোগী অংশী হইয়া আছে, তবেই ত' তাহার নারীজীবনের সার্থকতা।

হরেন তাহা বুঝিল না। নিজের এতটুকু দৈন্য সে স্ত্রীর নিকট তুলিয়া ধরিয়া ভালবাসার নিবিড়তার মধ্যে তাহাকে ডুবাইয়া দিতে পারিল না। এই দৈন্যের অনুভূতি—

এই দ্বিধা তাহার জীবনযাত্রাকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করিয়া দিল। সে তাহার সংসার পথের সঞ্জীবনী শক্তিকে অনাত্মীয়তার কঠিন ব্যবধানে পৃথক করিয়া রাখিল। সে বুঝিল না, অসত্যের কমনীয় রূপ হইতে সত্যের অসহ্য নগ্নচিত্র ঢের ভাল। উভয়পক্ষে মনে মনে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি অপেক্ষা পূর্ণ মীমাংসা ভাল। তা' সে মীমাংসা যতই অপ্রিয় হউক্। মীমাংসা তিক্ত হইলেও শেষে তাহাকে মিষ্ট করা চলে। আজ বুঝিবার ভুলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ব্যবধান সাগরোপম হইয়া উঠিল।

(৫)

উভয় পক্ষেই যন্ত্রণা সহনের সীমা অতিক্রম করিয়া গেল। হরেনের পক্ষে লুকোচুরির বেদনা তাহাকে ক্লিষ্ট করিতে লাগিল। সে দেখে, তাহারই ভুলে আজ একটা আশা আকাঙ্খাভরা নবীন প্রাণ ধরে ধীরে ক্ষয়িত হইতেছে। তাহার অন্তরাত্মা প্রায়শ্চিত্তের উপায় অন্বেষণে অধীর ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে। সে দিনে দিনে দুর্ব্বল হইতে লাগিল জীবন তাহার নিকট দুর্ব্বহ ভার হইয়া উঠিল।

একদিন হঠাৎ সে আবিষ্কার করিল যে, ভুলাইয়া যাহাকে সুখী করিবে ভাবিয়াছিল—সেই আজ তাহার এই প্রতারণায় সব চেয়ে অসুখী। তবে কার জন্য এ অভিনয়? না—সে পত্র লিখিয়া সকল অবস্থা জানাইয়া ক্ষমা চাহিবে। তাহাতে ফল যত খারাপই হউক, জীবন সমস্যার ত' একটা মীমাংসা হইয়া যাইবে। সে পত্র লিখিয়া খামে বন্ধ করিল, কিন্তু আজ কাল করিয়া দিতে পারিল না। সঙ্কোচের পাহাড় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল।

চিন্তারোগে সে দিনে দিনে বড় দুর্ব্বল হইতে লাগিল। সে বুঝিল বাহিরে রোগচিহ্ন প্রকাশ না থাকিলেও ভিতরে ভিতরে তাহার কঠিন রোগ, সৃষ্টি হইয়াছে। সে রোগের প্রতিকার করিতে চাহিত না। 'জীবনের হলাহল ত যথেষ্ট পান করা গিয়াছে—এবার এস মৃত্যু, এস মুক্তি, আমার সব জ্বালা জুড়াতে এস।'

আজ পথে বহুদিনের পুরাতন ডাক্তার বন্ধু তাহাকে দেখিতে পাইয়া উদ্বেগের সহিত তাহাকে পরীক্ষা করিল ও শেষে সাবধান করিল—'বন্ধু, হৃদ্‌রোগের সূচনা করে ফেলেছ, খুব সাবধান। ভাবনা চিন্তার কাজ একদম ছেড়ে দাও। যে কদিন আছি—এস স্ফুর্ত্তি করা যাক্। তুমি এমন মুসড়ে গেলে কেন? শরীরের যত্ন করো।"

উত্তরে হরেন একটু হাসিল মাত্র।

(৬)

এদিকে অক্ষমতার অপরাধ নির্ম্মলার সারা গায়ে জড়ান থাকে। সে প্রাণপণে স্বামীর সেবা করে। স্বামীর বিমর্ষ মুখ দেখিয়া তাহার অন্তরের গ্লানি মুছাইয়া দিবার ব্যাকুল আগ্রহে তাহার দেহের সমস্ত শোণিত চঞ্চল থাকে। কিন্তু হায়! স্বামী ত' তাহাকে কিছু বলেন না। সে যে স্বামীর নিকট হইতে তিরস্কারও প্রার্থনীয় মনে করে। সে যে অনুভব করিতে চাহে, তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ আছে। সে আজ একটা কথার কাঙালী—তা' সে যে আকৃতিতেই আসুক্। স্বামীর কথার অমৃতের স্বাদ সে না হয় নাই পাইল—গরল হইতেও সে বঞ্চিত কেন? কোন্ নিষ্ঠুর অদৃষ্ট দেবতা আজ তাহার ললাটলিপি লইয়া নিষ্ঠুর খেলা খেলিতেছে? কে বলিবে কোন্ অপরাধে সে নারীজীবনের সকল সাধ হইতে বঞ্চিত—ওগো কে বলিবে!

(৭)

নির্ম্মলা অনেকদিন অপেক্ষা করিয়া দেখিল স্বামীর ব্যবহারের কোন পরিবর্ত্তন নাই। সে লজ্জার খাতিরে মীমাংসা চেষ্টা আর কতদিন স্থগিত রাখিবে? অস্বাভাবিক মৌনতা যে তাহার প্রাণে পাষাণ চাপাইয়া দিতেছে। আজ আর সে থাকিতে পারিল না। সে যে ক্রমশঃ পাষাণ হইয়া উঠিতেছে। এ অবস্থায় আর নহে। আজ তাহার মীমাংসা চাই নহিলে তাহার জীবন বাঁচিবে না। এ ভাবে জীবনযাত্রার শেষ করিতেই হইবে। সে নারীর মেয়ের সকল দুর্ব্বলতা ত্যাগ করিয়া স্বামীর পড়ার-ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। দেখিল, হরেন নিবিষ্টচিত্তে চেয়ারে বসিয়া একখানি বই পড়িতেছে।

শব্দ শুনিয়াই হরেন্দ্র চাহিল। চারিচোখে মিলন হইতেই নির্ম্মলার নিটোল গণ্ডে গোলাপ ফুটিয়া উঠিল। হরেন মুগ্ধের ন্যায় পরম স্নেহে চাহিয়া রহিল। কিন্তু নির্ম্মলা আজ মরিয়া লজ্জা সরম সে আজ সব ত্যাগ করিয়াছে। আজ সে তাহার নিজ প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী—আজ সে মুখরা।

তবুও কথা ফুটে না কেন? অধরপুটে ভাষা জড়াইয়া থাকে কেন? এখন ফিরিয়া যাওয়া যে আরও কঠিন। নির্ম্মলা নিজের এ দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিল। প্রবল চেষ্টায়

আত্মদমন করিয়া স্থির কণ্ঠে বলিল—'এরূপ ভাবেই কি চিরকাল কাটিবে ? এ যে অসহ্য'।

সে উত্তরের প্রতীক্ষায় চুপ করিল। স্বামী নির্ব্বাক্—তাহার সজল চোখের ম্লান বিষাদ-দৃষ্টি শুধু তাহার মুখে নিবদ্ধ।

নির্ম্মলা অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। সে যে তাহার জীবন মরণের প্রশ্ন মীমাংসা করিতে আসিয়াছে। এখনও এত অপমান শুধু পৌরুষের গর্ব্বে। নারী সে তাই সব অত্যাচার নীরবে সহ্য করিবে ?—না সে তা' পারিবে না। আহত আত্মসম্মানের বেদনায়, ক্রোধে সে বিবর্ণ হইয়া কহিল—"তুমি কি মনে কর ? নারী মানুষ নয় ? সে শুধু পরমুখাপেক্ষী জড় ? না, সে তা' নয়"। নির্ম্মলা ক্রমশঃ উত্তেজিত হইতেছিল। তাহার স্বর উর্দ্ধে উঠিল—নারীকে এত অপমান, তবে তার প্রয়োজন অস্বীকার করলেই 'ত' হত'। নারীরও প্রাণের ক্ষুধা আছে, তাহারও তোমারই মত আলো বাতাস সব দরকার।" ক্রমশঃ সে আবল তাবল বলিতে বাগিল—শেষে যখন সে বলিয়া ফেলিল যে, "এরূপ ভাবে থাকা আমার পোষাবে না"—তখন তাহার লুপ্ত জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। সে স্বামীর পানে চাহিল—দেখিল সে মুখ রক্তশূন্য পাথরের মত। চোখ যেন বেদনায় ম্লান হইতেছে। কথা বলিবার ব্যর্থ চেষ্টায় রুদ্ধ বেদনায় অধরোষ্ঠ কম্পিত হইতেছে। নির্ম্মলা দেখিল—হরেন একবার উঠিয়া দাঁড়াইল, পরক্ষণেই হতাশভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে বসিয়া পড়িল।

নির্ম্মলা বুঝিল, তাহার স্বামী একটা ধাক্কা সামলাইয়া লইলেন। তাহার প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। সে কহিল—'ক্ষমা করো—ওগো ক্ষমা করো—বড় বেদনায় তোমার উপর রুষ্ট হয়েছি।"

জীবনের সমস্ত শক্তি দ্বারা হরেন উঠিয়া দাঁড়াইল। এই বুঝি তার শেষ মুহূর্ত্ত। জীবনে যদি তাহার এ অদ্ভুত ব্যবহারের কারণ অজ্ঞাত থাকিয়া যায় ? নির্ম্মলা কি ভাবিবে ?

সে তখন ড্রয়ারের মধ্য হইতে খাম খানা লইয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে নির্ম্মলার দিকে অগ্রসর হইল। ভয় পাইয়া নির্ম্মলা দুই পদ পিছাইয়া গেল। পরমুহূর্ত্তেই হরেনের প্রাণহীন দেহ সশব্দে তাহার পাশে পড়িয়া গেল।

স্বামীর শেষ দান সেই খাম খুলিতেই প্রথম লাইন চোখে পড়িল "আমি বোবা তাই—"আর পড়া হইল না। নির্ম্মলা উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে পাষাণ শয্যায় লুটাইয়া পড়িল—"ওগো আমাকে আগে জানতে দাওনি কেন ? আমি যে চির অপরাধী রয়ে গেলাম—"

তাহার দীর্ঘশ্বাসে বাতাস আকুল হইয়া উঠিল।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

লীলা

জলে উঠে ঢেউ জলে অবসান,
সলিলের বুকে ফোটে কলগান।
ধরণীর রসে জাগে যেই প্রাণ
তারি' কোলে শেষে লভে অবসান
অজানা কোন্ সে ফুল বন হতে
ফুল গুলি সব আসিছে ধরায়,
সুবাস বিথারি' ধরা-বন-পথে
তারি কোলে শেষে সোহাগে লুটায়!

ধরণীতে তবে কেন আসে ব্যথা,
পায় কি বলিতে সে বাণী গোপন;
একটী সূতায় হাসি-জল গাঁথা
আলো-আঁধারের একি গো মিলন!
নব রবি হাসে তিমির টুটিয়া,
শশী হেসে যেথা আঁধারের গায়,
কোন্ জগতের বারতা বহিয়া
কার কোলে ওগো আপনা হারায়

শ্রীকিরণ চন্দ্র বসু।

য়িহুদী*

আজ পঁয়ত্রিশ বৎসর যাবৎ মিঃ এ্যালবার্ট ব্লাকহেন টাকা লাগাইবার ব্যবসা করিতেছেন, কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে একদিনও তিনি তার ডোভারষ্ট্রীটের আপিসে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পাঁচ মিনিট আগে বা পরে আসিয়াছেন কিনা সন্দেহ।

জুনমাসের একদিন সকাল বেলায়, মিঃ ব্লাকহেন যখন সিঁড়ি বহিয়া তাঁর অপিসে উঠিতেছিলেন তখন কাছে পিকেডেলির একটি গির্জ্জার ঘড়িতে দশটা বাজিল।

মিঃ ব্লাকহেনের বয়স প্রায় ৬০ বৎসর, কিন্তু তাঁর সুন্দর, বলিষ্ঠ দোহারা চেহারা দেখিয়া মনে হইত না, তাঁর বয়স অত বেশী। পোষাক পরিচ্ছদে তিনি খুব লক্ষ্য রাখিতেন। আঙ্গুলে হীরার উজ্জ্বল আংটি ও অযথা আড়ম্বরহীন সুন্দর পোষাক মিঃ ব্লাকহেনের সুরুচিরই পরিচয় দিত।

আপিসে ঢুকিতেই একটি যুবতী কেরাণী তাঁর টুপি ও দস্তানা নিয়া আলনায় রাখিয়া দিল।

ধীর গম্ভীর স্বরে য়িহুদী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিস্ জেসন, আজ কিছু প্রয়োজনীয় সংবাদ আছে কি?"

"বিশেষ কিছু না। চিঠিগুলি আপনার টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়াছি। লর্ড রেটন টেলিফোনে সংবাদ দিয়াছেন যে, তিনি ১০৷৷০ টার সময় আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবেন।"

যুবতী তাঁর নিজের কাজে চলিয়া গেল। মিঃ ব্লাকহেন তাঁর ছোট সুন্দর সাজান আপিস ঘরে প্রবেশ করিলেন। টেবিলের কাছে বসিয়া য়িহুদী একটি চুরুট ধরাইয়া—চিঠি গুলি পড়িতে লাগিলেন। এ কাজে—তাঁর প্রায় আধ ঘণ্টা সময় লাগিল, এমন সময় সেই যুবতী কেরাণীটি আসিয়া সংবাদ দিল যে লর্ড রেটন আসিয়াছেন। মিঃ ব্লাকহেন বাহিরে আসিয়া লর্ড রেটনকে অভ্যর্থনা করিয়া ঘরে আনিলেন।

লর্ড রেটন ইংলণ্ডের এক অতি পুরাতন এবং সম্মানিত পরিবারের একমাত্র বংশধর। ঘোড়দৌড় খেলার পোষাক পরিহিত লর্ড রেটন ঘরে প্রবেশ করিলে মিঃ ব্লাকহেন তাঁহাকে একখানি চেয়ার দেখাইয়া বসিতে অনুরোধ করিলেন। লর্ড রেটনের মুখে ভয়ানক উদ্বেগের চিহ্ন। তিনি বসিয়া বলিলেন, "ব্লাকহেন, তোমার চিঠি পাইয়া আমি তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি।" তাঁহাকে একটা চুরুট খাইতে অনুরোধ করিয়া মিঃ ব্লাকহেন তাঁহার নিকট চুরুটের বাক্সটা ধরিলেন। কম্পিত হস্তে লর্ড-রেটন একটা চুরুট ধরাইলেন। চেয়ারে একটু হেলিয়া মিঃ ব্লাকহেন বলিলেন, "কি বলিতেছিলেন মহাশয়?"

"তোমার চিঠি আমি কাল রাত্রে পাইয়াছি। তুমি যা লিখিয়াছ তা হইতেই পারে না—হওয়া অসম্ভব। তুমি কি আমাকে বিক্রয় করিতে চাও; ব্লাকহেন, ভগবান্—কি ভয়ানক!"—বলিয়া লর্ড রেটন অস্থির হইয়া ব্যাকুল ভাবে একটু সহানুভূতির জন্য য়িহুদীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

য়িহুদী ব্লাকহেনের কিন্তু ইহাতে মুখের ভাবের কোন পরিবর্ত্তন হইল না। তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ব্যবসাধারী ভাবে বলিলেন, "আমিও অনেককালই অপেক্ষা করিয়াছি, মহাশয়।"

"সত্যকথা। সম্প্রতি ঘোড় দৌড়ে আমার বড় ভয়ানক ক্ষতি হইয়াছে। আমার হাজার হাজার টাকা লোকসান হইয়াছে। একটা কিছু বন্দোবস্ত করিয়া দাও। আমাকে একটু সময় দাও, আমি তোমার সমস্ত সুদ শোধ করিয়া দিব। আমি তো আর পালাইয়া যাইতেছি না, ব্লাকহেন্" বলিয়া লর্ড রেটন্, একটু শুষ্ক হাসি হাসিলেন।

"না,—না; পালাইয়া যাইবার যো নাই। তবে কি জানেন—"

"জানি। কিন্তু আমার একটু সময় চাই ব্লাকহেন। তুমি তোমার টাকা পাইবে। আমি এবার হইতে রীতিমত তোমাকে সুদের টাকা দিব।"

"আচ্ছা, আপনাকে দু দিন সময় দিলাম। এ দু দিনের মধ্যে যদি টাকা না আসে তবে আপনার সম্পত্তি আমাকে বাধ্য হইয়া দখল করিতে হইবে।"

* [illegible] বোর্ণ্ড উইলিয়ামের The Jew গল্প অবলম্বনে লিখিত।

অল্প কথায় মিঃ ব্লাকহেন তাঁহার কঠোর মনোভাব জানাইলেন। সে কথা শুনিয়া আশু বিপদের আশঙ্কায় লর্ড রেটন ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। তার পর একটু সুস্থ হইয়া অতি কাতর ভাবে তিনি বলিলেন, "ব্লাকহেন তুমিও মানুষ—দয়া করিয়া একটু অপেক্ষা কর। আমাকে এক মাস, পনের দিন, অন্তত এক সপ্তাহের সময় দাও। আমাকে ঋণ মুক্ত হইবার একটু সুযোগ দাও—তোমার পক্ষে এ টাকা ছাড়া কিছুই না—কিন্তু আমার যে সব। আমার একেবারে সর্ব্বনাশ হইতেছে—আমার নাম, যশ, মান সবই যে একেবারে যাইবে।"

মিঃ ব্লাকহেনের ভাবের তবুও কোন পরিবর্ত্তন হইল না। তিনি বলিলেন, "দু'দিনের বেশী আর আমি অপেক্ষা করিতে পারিব না, মহাশয়।" লর্ড রেটন্ চলিয়া গেলেন। লর্ড রেটনের সে ঘর পরিত্যাগ করিবার কিছু কাল পরেই মিস্ জেসন্ মিঃ ব্লাকহেনের ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "একটি ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন।" বলিয়াই মিস জেসন আগন্তুকের একখানা কার্ড মিঃ ব্লাক হেনের সম্মুখে রাখিল। মিঃ ব্লাকহেন কার্ড খানি দেখিলেন। আগন্তুক তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিত। কার্ড খানি একটু নাড়িয়া চাড়িয়া একটু ভাবিয়া তিনি মিস্ জেসনকে ভদ্রলোকটিকে এখানে আনিতে আজ্ঞা করিলেন। ২৩|২৪ বৎসরের সুন্দর বলিষ্ঠ একজন যুবক ঘরে ঢুকিয়াই মিঃ ব্লাকহেনকে অভিবাদন করিলেন। ব্লাকহেন তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিলে যুবক পাশের একখানি চেয়ারে বসিয়া বলিলেন,"আমি যে আপনার কাছে কিছু টাকা ধার করিতে আসিয়াছি সেকথা বলা বাহুল্য।"

মিঃ ব্লাকহেন একটু হাসিয়া বলিলেন, "আপনি আমাকে চিনিলেন কি করিয়া মিঃ রেনল্ড ?"

"কেন ?—আপনার বিজ্ঞাপন দেখিয়া।"

"আপনার কত টাকার প্রয়োজন ?"

"আমার মোটের উপর আট হাজারের দরকার, তবে আজ অন্ততঃ পাঁচ হাজার হইলেই চলিবে।" তারপর একটু ব্যস্তভাবে যুবক বলিল, "আমার দেরী করিলে চলিবে না, যা' করিবার হয় শীঘ্র করিয়া ফেলুন।" য়িহুদীর মুখে গভীর চিন্তার ভাব লক্ষিত হইল। একদৃষ্টে তিনি যুবকের দিকে তাকাইয়া ছিলেন। জানিনা কেন হঠাৎ তাঁহার মুখের রংও একটু ফেকাসে হইয়া গেল। তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "সবই করা যাইবে; কিন্তু মিঃ রেনল্ড তার আগে কি ব্যাপার আমাকে একটু বলুন। কেন আপনি এত তাড়াতাড়ি টাকা ধার করিতে চান, আপনার কি জামিন আছে? আপনি কোন পরিবারের - অবশ্য আপনি যাহা বলিবেন আমি তার কোন কথা সাধারণে প্রকাশ করিব না।"

"বেশ! প্রথম কথা এই যে আমি বিবাহ করিতে চাই। এবিবাহে আমার বাবার মত নাই। আমি যে যুবতীকে বিবাহ করিব বাবা তাহাকে বিবাহ করিতে দিবেন না; কিন্তু আমি এ বিবাহ করিবই। ইহাতে আমার কিছু টাকা প্রয়োজন। আমার কিছু ধার আছে। সেগুলি সব শোধ করিয়া আমরা এখান হইতে চলিয়া যাইব এবং যতদিন বাবার মতের পরিবর্ত্তন না হয় ততদিন আর ফিরিব না।"

"আপনি কি জামিন দিতে পারেন ?"

"আমার কিছু সেয়ার আছে ও মা আমার নামে কিছু টাকা রাখিয়া গিয়াছেন।"

"আপনার মা তবে জীবিত নাই ?"

"না, আমার বয়স যখন কয়েকদিন মাত্র তখন আমার মা মারা যান। আমার নামে তিনি প্রায় ২০ হাজার পাউণ্ড রাখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু আর দু'বৎসর না গেলে আমার টাকা নেবার উপায় নাই।"

যুবকের কথা শুনিয়া মিঃ ব্লাকহেন চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া অত্যন্ত চিন্তাকুল ভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি কোন কথা বলিলেন না। তারপর হঠাৎ কি ভাবিয়া অত্যন্ত ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখ, তোমার পিতা—কে তিনি? তাঁর নাম কি?" য়িহুদীর মুখের সে নির্ম্মম কঠোর ভাব আর ছিল না তার পরিবর্ত্তে সে স্থানে কি একটা উদ্বেগ ও চাঞ্চল্যের ভাব ফুটিয়া উঠিল।

"মালয়, সিলোন প্রভৃতি স্থানের বিখ্যাত চা' ব্যবসায়ী রেণল্ড এণ্ড কোং'র প্রধান পরিচালক আমার পিতা। তাঁর নামের প্রথম তিন অক্ষর আর, বি, এস।" যুবক একটু ঠাট্টার ভাবেই কথা গুলি বলিল, কিন্তু সে কথা শুনিয়া য়িহুদীর মুখ কাগজের মত সাদা হইয়া উঠিল।

"তোমার আর কি কি নাম আছে যুবক ?"

"ফ্রান্স রেনেল –"

"রেনেল, ঠিক সে তো তাকে রেনেল বলিয়াই ডাকিত !"

ব্লাকহেন আর কোন কথা না বলিয়া তাঁর টেবিলের নিকট আসিলেন এবং দেরাজ খুলিয়া কাগজের মোড়া একটা প্যাকেট বাহির করিলেন। প্যাকেটটি খুলিয়া এক খানি ফটো, এক গাছি ফিতা ও একটি লকেট টেবিলের উপর রাখিলেন। ফটোখানি একটি ১৮ বৎসরের সুন্দরী য়িহুদী যুবতীর। কি সুন্দর সে মুখ ! যেন পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য্য ছাকিয়া বিধাতা ও মুখখানি প্রস্তুত করিয়াছেন। ঝাকড়া ঝাকড়া কাল চুলের গুচ্ছ যেন ও মুখের সৌন্দর্য্য আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। টানা বড় চোখ দুটিতে যেন কত মধুর ভাব।

কম্পিত হস্তে ছবিখানি চোখের সম্মুখে রাখিয়া মিঃ ব্লাক্‌হেন্ একবার সে খানির দিকে আবার ওই যুবকের মুখের দিকে তাকাইয়া উভয়ের সামঞ্জস্য তুলনা করিতে লাগিলেন। তারপর ছবিখানি যুবকের হাতে দিয়া বলিলেন, "যুবক এ তোমার মার একখানি ফটো।"

ফটো খানি দেখিয়া যুবক চমকিয়া উঠিয়া বলিল, "মারই তো ফটো বটে ? আপনি এ ফটো পাইলেন কোথায় ? আমার কাছেও তো এ রকম একখানি ফটো আছে।" তারপর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, "মা না জানি আমার কতই সুন্দর ছিলেন !"

ব্লাক্‌হেন্ ধীরে উত্তর করিলেন, "বাস্তবিকই সে বড় সুন্দর ছিল। হৃদয়ের সৌন্দর্য্য তার বাহিরের সৌন্দর্য্যকেও ছাড়াইয়াছিল। যুবক সে আমার একমাত্র কন্যা ছিল !"

"কি কি বলিলেন—" বলিয়া যুবক চীৎকার করিয়া উঠিল।

"অদৃষ্ট, যুবক সবই অদৃষ্ট।" বলিয়া মিঃ ব্লাক্‌হেন্ কাঁপিতে লাগিলেন।

একটু চিন্তা করিয়া যুবক বলিল, "আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

ব্লাক্‌হেনের মুখে তাঁর বয়সানুযায়ী বার্দ্ধক্যের ভাব প্রকাশ পাইল। সম্মুখের একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া তিনি বলিলেন, "আমি তোমাকে সব বলিব, সব বলিব।"

তারপর যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তুমি আমার নাতি ! একজন কুসীদজীবী য়িহুদীর নাতি বলিয়া তোমার কি লজ্জা হইতেছে না ?"

রেনল্ড আস্তে আস্তে উত্তর করিল, "লজ্জা—লজ্জা হইবে কেন ?"

মিঃ ব্লাক্‌হেন্ বলিতে লাগিলেন, "প্রায় ২৩ বৎসর আগে এমনই একদিন সকালবেলায় তোমার বাবা আমার কাছে টাকা ধার করিতে আসিয়াছিলেন। তোমারই মত তিনি তখন আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন। তখন তিনি রেনল্ড কোম্পানীর ছোট সাহেব। বিপদে পড়িয়াই তিনি আমার কাছে আসিয়াছিলেন। থিয়েটারের একজন নর্ত্তকীর সঙ্গে মিশিয়া তিনি মদ ধরিয়াছিলেন এবং নানা প্রকার বাজে আমোদ আহ্লাদে বিস্তর খরচ করিয়া ঋণে জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁকে দেখিয়া, তাঁর কথা শুনিয়া আমার তার প্রতি অত্যন্ত দয়া হইল। আমার অবস্থা তখন ভাল ছিল না, তবুও আমার সাধ্যের অতিরিক্ত আমি তাঁকে ধার দিয়াছিলাম।" একটু থামিয়া য়িহুদী আবার বলিতে লাগিলেন, "দেখিতে দেখিতে তোমার বাবার সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব জন্মিল। প্রায়ই তিনি আমাদের বাড়ীতে আসিয়া আহারাদি করিতেন। আমিও তাঁর সঙ্গে সর্ব্বদা খুব খোলাখুলি ব্যবহার করিতাম। একদিনের জন্যও কখনও তাঁর কাছে টাকার কথা তুলি নাই। তিনি যে আমার পরম বন্ধু, আমার বিশ্বাস ছিল, সময় মত তিনি আমাকে টাকা ফিরাইয়া দিবেন। তারপর একদিন রাত্রে" বলিতে বলিতে য়িহুদীর চক্ষু অশ্রু পূর্ণ হইয়া উঠিল, "বাড়ীতে ফিরিয়া দেখি আমার কন্যা—সে ছাড়া এ পৃথিবীতে আর কেহই ছিল না—আমার কন্যা বাড়ীতে নাই। সে তোমার বাবার সঙ্গে নিরুদ্দেশ হইয়াছে।"

রেনল্ড নির্ব্বাক হইয়া নিজ পরিবারের এই গুপ্ত ইতিহাস শুনিতে লাগিলেন। মিঃ ব্লাক্‌হেন্ বলিতে লাগিলেন, "তারা দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেলে আর একদিনের জন্যও আমি তাদের দেখি নাই। শুনিয়াছি, আমার মেয়ে তোমাকে প্রসব করিয়াই মারা যায়।"

রেনল্ড মাথা নীচু করিয়া রহিল।

ব্লাকহেন্ রেনল্ডের হাত জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য, বালক, তুমি আমার নাতি, আমার কন্যের ছেলে !"

"আমি তো এখন বড় হইতেছি ঠাকুর্দ্দা।"

"তোমার জন্য—সুখের জন্য – আমি তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিব।"

রেনল্ড কোন কথা বলিতে পারিল না। কেবল মাত্র চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

মিঃ ব্লাকহেন্ আবার বলিতে লাগিলেন, "তুমি যখন ঘরে ঢুকিলে তখনই তোমার মুখে তোমার মার মুখের সাদৃশ্য দেখিয়া আমি চমকিয়া উঠিয়াছিলাম। এতদিন পরে সে মুখের মত মুখ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। সে তাহাকে রেনেল বলিয়া ডাকিত, ওই নামেই ডাকিতে ভালবাসিত।"

"তুমি বিবাহ করিতে চাও? তোমার বাবা সে বিবাহে মত দিবেন না কেন? তিনি কি এখন ইংলণ্ডে আছেন?"

যুবক উত্তর করিল, "না, আমার যতদূর মনে পড়ে তিনি মালয় হইতে আর ফিরিয়া আসেন নাই। এখন বুঝিতেছি, কেন এখন তাঁর সব পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন আর তাঁকে আপনি চিনিতে পারিবেন না, ঠাকুর্দ্দা। তিনি আমার ভাবী শ্বশুরকে পছন্দ করেন না। আমার কিন্তু তাঁকে খুব ভাল লাগে। লোকে বলে তিনি দেউলিয়া—লর্ড রেটনের নাম বোধ হয় আপনি শুনিয়াছেন।"

ব্লাকহেন কাতর ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "রেটন! লর্ড রেটন তোমার ভাবী শ্বশুর?"

অদৃষ্ট বাস্তবিকই ব্লাকহেনের সঙ্গে পরিহাস করিতেছিল। টেবিলের উপর একটু ঝুঁকিয়া তিনি, বলিলেন, "শোন বালক, আমি তোমাকে সাহায্য করিব। আমি তোমাকে সাহায্য করিতে পারি। তুমি লর্ড রেটনের কন্যাকেই বিবাহ করিবে। আমার সুখের ছেলে নিশ্চয়ই সুখী হইবে।" বলিয়া ব্লাকহেন চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া, ঘরের এক কোণে একটা সিন্দুক ছিল সেখানে গেলেন। সিন্দুকটা খুলিয়া এক বাণ্ডিল কাগজ বাহির করিলেন। সেগুলি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া তিনি বলিলেন, "তোমার আট হাজার পাউণ্ডের দরকার—তুমি সে অর্থ পাইবে ও তার সঙ্গে আশীর্ব্বাদও পাইবে।"

ব্লাকহেন টেবিলের কাছে ফিরিয়া আসিয়া আট হাজার পাউণ্ডের একখানি চেক্ লিখিয়া সে খানা রেনল্ডকে দিলেন। রেনল্ড চেক্ পাইয়া বৃদ্ধের সঙ্গে কর মর্দ্দন করিয়া চলিয়া গেল।

রেনল্ড চলিয়া গেলে দশ মিনিট পর্য্যন্ত মিঃ ব্লাকহেন চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তার পরে পূর্ব্বোক্ত বাণ্ডিল হইতে "রেটন" চিহ্নিত কাগজ গুলি বাহির করিয়া সে গুলি গভীর মনোযোগের সঙ্গে দেখিতে লাগিলেন। তার পর কি যেন ভাবের প্রেরণায় সেগুলি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

টুকরা কাগজ গুলি যখন তাঁর আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া নীচে ছড়াইয়া পড়িতেছিল য়িহুদী তখন ভয়ঙ্কর এক হাসি হাসিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "চুরানব্বই হাজার পাউণ্ড—এক মহা সম্পত্তি!"

মিঃ ব্লাকহেন উঠিয়া খোলা জানালার কাছে দাঁড়াইয়া নীচে রাস্তার দিকে চাহিয়া রহিলেন। সূর্য্য তখন উজ্জল ভাবে লণ্ডন সহরে কিরণ দিতেছিল। ব্লাকহেনের চোখে সে কিরণ সেদিন আরও উজ্জল বোধ হইতেছিল। মিঃ ব্লাকহেনের সেদিনের সুখের আর তুলনা ছিল না।—

শ্রীঅমলেন্দু দাশ গুপ্ত

অপরূপ

অনামা তোমার কে রেখেছে নাম?
অহে প্রাণারাম! নাম শুনে মোর জুড়ায় কাণ!
অরূপ তোমার কে এঁকেছে রূপ?
অতি অপরূপ! রূপ হেরে মোর আকুল প্রাণ!
অনাদি অনন্ত তুমি পরাৎপর,
অচিন্ত্য অবাঙমনসো গোচর;
কে সাজালো তোরে ব্রজের রাখাল?
হায়রে গোপাল, তোরে হেরে মোর সকল ধ্যান!
অণুতে রাখিল কেবা হিমাচল?
বিন্দুতে ধরিল মহাসিন্ধু জল?
একি লীলা তব, অহে লীলাময়!
ভক্তি পাহে জয়, প্রেমের দুয়ারে লুটায় জ্ঞান!

শ্রীসাহাজি

নিরালম্বোপনিষদ

এই নিরালম্বোপনিষদখানি পাঠ করিলে ধর্ম্মদর্শনের অনেকগুলি বিষয় মোটামুটি ভাবে জানিতে পারা যায়। দার্শনিক যুক্তি, বাক্‌বিতণ্ডা ও কোলাহলের মধ্যে পড়িতে হয় না। এই উপনিষদে যুক্তিতর্ক ও মতামতের কোনও বালাই নাই। আছে শুধু প্রশ্ন ও তাহার উত্তর। প্রশ্নগুলিও খুব সহজবোধ্য, উত্তর গুলিও জটিলতা দোষে দুষ্ট নহে। ধর্ম্মদর্শনের কতিপয় অত্যাবশ্যকীয় শব্দ ও ভাবের তাৎপর্য্য ইহাতে বড়ই সুন্দর সহজ ভাবে প্রকটিত করা হইয়াছে।

সর্ব্বপ্রথমে আমরা ইহাতে দেখি প্রশ্নকর্ত্তা গভীর বিশ্বাসের সহিত উত্তর গুলি যুক্তিতর্ক দ্বারা সমর্থিত হইবার পূর্ব্বেই স্বীকার করিয়া লইয়া পুনরায় প্রশ্ন করিতেছেন। ইহা হইতে আমার মনে হয়, এই উপনিষদখানির সময় বিষয়গুলী যে মতটী পোষণ করিতেন সেই মতটীর দিক হইতেই এই উপনিষদে সমস্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। নূতন মত ও ব্যাখ্যা বোধহয় ইহাতে দেওয়া হয় নাই।

এই উপনিষদের নামের তাৎপর্য্যটাও প্রণিধান যোগ্য। ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি কোনও প্রকার যুক্তিতর্কের উপর অবলম্বিত বা প্রতিষ্ঠিত নহে। সেই জন্য যদি ইহাকে নিরালম্বোপনিষদ বলা হইয়া থাকে, তাহা হইলে বোধহয় কাহারও আপত্তি করিবার কোনও কারণ হইবে না। যাহা হউক, এখন নিরালম্বোপনিষদে কি আছে তাহাই বলা যাউক। ইহাতে ব্রহ্মের কথা আছে, জীবের কথা আছে; আবার সুখ, দুঃখ, বন্ধন ও মুক্তি, স্বর্গ ও নরকের কথাও আছে। সন্ন্যাসী কে, ব্রাহ্মণ কোন ব্যক্তি, কাহাকে উপাসনা করিতে হয়, কোন বস্তু গ্রাহ্য আর কি কি অগ্রাহ্য, কে বিদ্বান, কে মূর্খ এসকল কথাও আছে।

এখন ব্রহ্মের কথা বলা যাউক। এই প্রসঙ্গে সকল ব্রহ্ম, ঈশ্বর, পরমাত্মা, ব্রহ্মাদি এবং জীব এই কয়টী শব্দের ব্যাখ্যাও করা ভাল।

নিরালম্বোপনিষদকারের মতে ব্রহ্মের কোনও অবয়ব নাই, আদি অন্ত অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুও নাই। ব্রহ্ম নির্গুণ, উপাধিশূন্য, শান্ত অর্থাৎ অপরিবর্ত্তনীয়, পবিত্র অর্থাৎ শুদ্ধ। ব্রহ্মকে চিন্তা করা যায় না অর্থাৎ তিনি অচিন্ত্য, (unconceivable)। কিন্তু আমরা এইটুকু জানি যে, তিনি নিত্যানন্দ এবং অদ্বিতীয়, অর্থাৎ তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে, কিম্বা তাহাকে আঘাত করিতে বা তাহার রাজ্যের গণ্ডি টানিয়া দিতে কোন কিছুই নাই। অর্থাৎ ব্রহ্মের বাহিরে আর কিছুই নাই। মানুষের দেহটাকে যেমন হস্তপদ ইত্যাদিতে বিভাগ করা যায় জলকে যেমন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে বিশ্লেষ করা হয়, ব্রহ্মকে তেমন ভাবে বিভাগ করা যায় না। সেই জন্য এই উপনিষদে ব্রহ্মকে "অখণ্ডৈকরস" বলা হইয়াছে।

এইখানে অনেক জটিল প্রশ্ন উঠিতে পারিত। যেমন নাকি ব্রহ্মকেই অচিন্ত্যই বলিলাম তবে কেমন করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে এত কথা বলা হইল? যদি তিনি উপাধিশূন্য নির্গুণ হইবেন তখন কেমন করিয়াই বা তাহা হইতে উপাধি বিশিষ্ট নানা গুণ সম্পন্ন জীব জন্তু গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি জন্মিল? এই সকল কথার উত্তরে সংক্ষেপতঃ বলা যাইতে পারে যে, নির্গুণ দ্বারা আমরা গুণশূন্য বুঝি না। নির্গুণ দ্বারা আমরা এই বুঝি যে, কোন গুণই ব্রহ্মের মহিমা বা স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারে না, কিন্তু সমস্ত জ্ঞাত অজ্ঞাত গুণই তাঁহার মধ্যে বর্ত্তমান। তাহা হইতেই সমস্ত গুণ উদ্ভূত। পার্থিব বস্তুনিচয়ের গুণ জানিলে তাহাদের একটা দিক নিঃশেষ করিয়া জানা যায়। 'বলটি কাল' বলিলে তাহার রংএর দিকটা আমরা ভাল করিয়াই বুঝিতে পাই। তেমন ভাবে কোন গুণ দ্বারাই ভগবানের কিছু বোঝা যায় না। সেই জন্যই বলা হয়, ব্রহ্ম নির্গুণ। এই জন্যই ব্রহ্মকে আবার অচিন্ত্য বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। মনে মনে ব্রহ্মের ছবি আঁকা বা মূর্ত্তি গঠন করা একবারেই অসম্ভব, কারণ তিনি আকৃতি রহিত, অনন্ত এবং অবয়ব শূন্য চৈতন্য। তবে একবারেই যে তিনি আমাদের চিন্তারাজ্যের বাহিরে অবস্থিত, চিন্তা শক্তির ব্রহ্মের বিষয় ধারণা করিতে যে সম্পূর্ণ অসমর্থ তা নয়। তবে ইহা সত্য যে, আমরা ভগবানকে সম্পূর্ণরূপে জানিতেও পারি না আর তাহার স্বরূপও সম্পূর্ণ ভাবিতে পারি না। তাহার সম্বন্ধে আমরা সামান্য যৎ কিঞ্চিৎই

জানি। জাগতিক বস্তু সমূহ যেমন ওলট্ পালট করিয়া আমরা মানস রাজ্যে বিচার করিতে পারি, মানসপটে যেমন তাহাদের ছবি আঁকিয়া দেই, তেমন করিয়া ভগবানকে ভাবা যায় না। তাই সচরাচর তাঁহাকে অচিন্ত্য অর্থাৎ **unthinkable** বলা হয়। ইহার অর্থ এই যে তাহাকে চিন্তা করিয়া শেষ করা যায় না। নতুবা কিছু কিছু যে ব্রহ্ম সম্বন্ধে চিন্তা করা যায় আর মানুষ মাত্রেই যে তাহা করিয়া থাকে তাহা আমরা সকলেই অবগত আছি।

এইখানে আরও দেখা যাইতেছে যে, ব্রহ্মকে অদ্বিতীয় বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। সুতরাং ইহা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, এই উপনিষদ খানি একেশ্বরবাদী, অর্থাৎ অদ্বৈতবাদের উপরই ইহা প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় তিনি জড় বা আকাশ, স্থান কাল ইত্যাদি অন্য কোনও বস্তু বা ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ করেন না। বস্তুতঃ অন্য বলিয়া কিছু তাহার নিকট নাই। সকলই তাহার অন্তরতম, নিজস্ব।

তারপর ঈশ্বর ও জীবের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া উপনিষদকার বলিয়াছেন, "ব্রহ্মৈব" অর্থাৎ ব্রহ্মই ঈশ্বর ব্রহ্মই জীব। এক দিক হইতে ব্রহ্ম শক্তিকে দেখিতে গেলে তিনি ঈশ্বর হইয়া দাঁড়ান, আবার অন্য দিক হইতে তাঁহাকে দেখিতে গেলে তিনি জীব হইয়া যান। জীবের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া এখানে সৃষ্টি প্রক্রিয়ার কথাই বলা হইয়াছে। আমাদের ইচ্ছা বা মনন, ভগবানের ইচ্ছা বা মনন হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের। আমি যদি লক্ষ টাকার কথা ইচ্ছা করি তখনই লক্ষ টাকা প্রস্তুত হইয়া পড়ে না। আমাদিগকে শক্তি ও বস্তুর সহায্য লইয়া লক্ষ টাকার মুখ দেখার জন্য অসম্ভব রকমে চেষ্টা করিতে হয়। অধিকাংশ সময়েই উহা হইয়া উঠে না। তবে হইয়া উঠিত, যদি আমাদিগকে প্রতি মুহূর্ত্তে বস্তু ও শক্তির সাহায্য গ্রহণ না করিতে হইত। ব্রহ্মকে কোন বস্তু বা শক্তির সাহায্য লইতে হয় না। সুতরাং তাহার পক্ষে যে ইচ্ছামাত্রেই অভিলষিত বস্তুটি বাস্তবে পরিণত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে। সুতরাং হেগেল যে বলিয়াছেন, চিন্তা আর সত্তা একই পদার্থ তাহা মানুষের সম্পর্কে সত্য না হইলেও, ব্রহ্ম সম্বন্ধে তাহা খেঁাটি সত্য কথা, তাহা সকলেই মানেন। এই উপনিষদে আরও বলা হইয়াছে ব্রহ্ম যখন ভিন্ন ভিন্ন দেহসম্পন্ন স্থূল জীবের কল্পনা করেন তখনই ব্রহ্ম ঐ সকল বিভিন্ন প্রকারের অসংখ্য স্থূল জীবে প্রকাশিত হইয়া পড়েন। কিন্তু ইহাতে ব্রহ্মের একত্ব নষ্ট হয় না। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম অখণ্ডৈকরস। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ব্রহ্ম ইচ্ছা শক্তি বলে আপনা হইতে স্থূল জীব সকল সৃষ্টি করেন। স্থূল জীব সমূহ ব্রহ্মেরই নানা মূর্ত্তি। একব্রহ্মই এইরূপে নানা ভাবে প্রকাশ হইয়া পড়েন আর ব্রহ্মেই এই সকল স্থূল জীবের জীবন মৃত্যু, চলন বর্দ্ধন, ব্রহ্মতেই ইহারা অবস্থিত। এই জন্যই বলা হইয়াছে ব্রহ্মই জীব। তবে কথা উঠিতে পারে জীবাতিরিক্ত ব্রহ্ম কি নাই? অর্থাৎ জীবই কি ব্রহ্ম? এক কথায় এই উপনিষদ **Pantheistic** কি না? ইহার মীমাংসা ঈশ্বর ব্যাখ্যা কালীন করা হইয়াছে। উপনিষদকার বলিয়াছেন ব্রহ্মই ঈশ্বর। যখন ব্রহ্ম তাঁহার অনন্ত অফুরন্ত শক্তির লেশ মাত্র গ্রহণ করিয়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডস্থিত সকলের ভিতরে অবস্থান করতঃ বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে পরিচালনা করিতে থাকেন তখন তাহাকে ঈশ্বর বলা হয়। সুতরাং ব্রহ্মের পরিচারক রূপটার নামই ঈশ্বর। এখন দেখা যাইতেছে যে, ব্রহ্ম তাঁহার সমগ্র শক্তি দ্বারা জগৎ সৃষ্টিও করেন না বা সৃষ্টি রক্ষা কিম্বা সৃষ্ট পদার্থ, জীব ও ব্যক্তিকে পরিচালনাও করেন না তাঁহার লেশ মাত্র শক্তি এই সকল কার্য্যে নিয়োজিত এবং সমস্ত পদার্থ, প্রাণী ও ব্যক্তিতে অভিব্যক্ত। সুতরাং জীবই যে ব্রহ্ম অর্থাৎ জীবের কিম্বা জগতের বাহিরে যে ব্রহ্ম নাই তাহা এই উপনিষদের মত নহে। আরও দেখা যাইতেছে যে, নিক্ষিপ্ত কার্টিজের মত ব্রহ্ম সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পর নিস্তেজ হইয়া পড়েন না। তখনও তাহার অফুরন্ত তেজ বা শক্তি রহিয়া যায়। সৃষ্টির পর যে ব্রহ্ম সৃষ্ট জগৎ হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতে থাকেন তাহাও নহে। তিনি জগতের মধ্যেই থাকিয়া যান। শুধু থাকেন না, সমস্ত ভিতর বাহিরের বস্তু সমূহ অহঃরহ পরিচালনা করিয়া থাকেন। জগতের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলেন না। তবে এখন কথা উঠিতে পারে, যদি সমস্ত কার্য্যে এবং সমস্ত মননে ব্রহ্মই পরিচালক রহিলেন তবে মানুষের স্বাধীনতা রহিল কোথায়, পাপ পুণ্য, সদাসদ ও সুখ দুঃখই বা কেমন করিয়া আসিল? কারণ মানুষের যদি স্বাধীন বৃত্তি ও কার্য্য করিবার স্বাধীন

ক্ষমতা না থাকে, অর্থাৎ মানুষ যদি সম্পূর্ণ ব্রহ্মাধীন যন্ত্রপুত্তলি হইয়া পড়ে তবে তাহার কার্য্যাকার্য্যের জন্য মানুষ দায়ী হইতে পারে না, ব্রহ্মই দায়ী হয়। সুতরাং মানুষের পক্ষে সদাসদ্, পাপপুণ্য এই মতানুসারে থাকিতে পারে না। তবে মানুষ সম্পূর্ণরূপে অধীন, অর্থাৎ ব্রহ্ম দ্বারা পরিচালিত কি শুধু আংশিক ভাবে অধীন একথার মীমাংসা এই উপনিষদে নাই তবে পাপপুণ্য, সদসদ্, স্বর্গ নরক, ভ্রম, সুখ দুঃখ ইত্যাদি যখন স্বীকার করা হইয়াছে তখন এই উপনিষদে ব্যক্তিকে ব্রহ্মের যন্ত্রপুত্তলি বানাইলে চলিবে না। তাহাকে কিয়দ্ পরিমাণ স্বাধীনতা দিতেই হইবে।

পাপ পুণ্য ইত্যাদির কথা বারান্তরে বলা যাইবে, এখন সবল ব্রহ্মের কথা বলা যাউক।

সবল ব্রহ্ম এই কথাটি বর্ত্তমানে কেহও তত ব্যবহার করেন না। সমস্ত জগৎ বা ব্রহ্মাণ্ডই সবল ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মাণ্ড সকল প্রকার শক্তিসম্পন্ন সুতরাং ইহা সবল। প্রকৃতি, জীবাত্মা, অহঙ্কার, মানসিক বৃত্তি, পৃথিবী, জল, বায়ু ইত্যাদি এই ব্রহ্মের অপরিমিত শক্তির বিভিন্ন দিক। এই ব্রহ্মাণ্ডের কতকগুলি বিষয় নির্ম্মাণসমর্থ আর কতকগুলি জড়পদার্থ, অর্থাৎ কতকগুলি বিষয়ের সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা আছে, আর কতকগুলির সে শক্তি নাই। জীবজন্তু সকলেই কিছু না কিছু করিতে পারে। অগ্নি, বায়ু, বিদ্যুৎ প্রভৃতিরও কার্য্য ও সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা যথেষ্ট। জগতের এই সকল নানাবিধ বিচিত্র নির্ম্মাণসমর্থ বুদ্ধিরূপা ব্রহ্মশক্তিই প্রকৃতি। এখন "বুদ্ধিরূপা" এই কথাটার তাৎপর্য্য ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। প্রকৃতিকে বুদ্ধিরূপা বলায়, বুঝিতে হইবে হঠাতের উপর অর্থাৎ by chance, এই জগতের কোন কিছুই সংঘটিত হইতেছে না। অণু-পরমাণুর ঘাত প্রতিঘাতেও জাগতিক কার্য্য বা বস্তু সমূহ সম্ভাবিত হইতেছে না। সকল কার্য্য ও বস্তুতেই বুদ্ধি অর্থাৎ reason অথবা intelligence এর নিদর্শন রহিয়াছে। আমরা যেমন পূর্ব্বাহ্নে উদ্দেশ্য সুস্থির করিয়া তাহা সুসম্পন্ন বা বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য নানাবিধ উপায়ের সাহায্য গ্রহণান্তর সুনিয়ন্ত্রিত কার্য্যের মধ্য দিয়া চলিয়া অভিপ্রেত বিষয়টিতে গিয়া পড়ি, অনেকটা সেই প্রকারেই এই ব্রহ্মাণ্ডে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। মোট কথা জাগতিক কার্য্যপ্রণালী অবলোকন করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়, এই সকল কার্য্যপ্রণালীর পশ্চাতে বুদ্ধি সম্পন্ন শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে এবং উহা সুনিয়ন্ত্রিত কার্য্যপ্রণালীর মধ্য দিয়া অভিপ্রেত স্থানে পৌঁছিতেছে। শুধু জড়পদার্থ দ্বারা এই সকল কার্য্য সুচারুরূপে ব্যাখ্যা করা যায় না। অন্ধশক্তি-দ্বারাও ঐ সমূহ সম্ভাবিত হইতে পারে না। সুতরাং জ্ঞান অথবা বুদ্ধিসম্পন্ন শক্তি মানিয়া লইতেই হয়। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, এই বুদ্ধিসম্পন্ন শক্তির আধার কে? মানুষের শক্তি বা বুদ্ধির দৌড় অতদূরে পৌঁছিতে পারে না। ব্রহ্ম ব্যতীত আর কেহও ঐ শক্তির আধার হইতে পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, উপনিষদকার এখানে Teeological view গ্রহণ করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে উপনিষদকার "ব্রহ্মাদয়" এই শব্দটি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই কথাটিও এখন সচারাচর ব্যবহৃত হয় না। হয়তঃ এই উপনিষদকে কেহ কেহ বহু-ঈশ্বরবাদ সমর্থক বলিয়া ভাবিতে পারেন, সেইজন্যই উপনিষদকার এই শব্দটির ব্যাখ্যা আবশ্যক মনে করিয়াছেন। বাস্তবিক এখনও যাহারা বাহির হইতে হিন্দুদের ছত্রিশ কোটী দেব-দেবীর কথা শুনেন, তাহাদিগের মনে বহু ঈশ্বরবাদ ও পৌত্তলিকতার ভাবটিই জাগিয়া উঠে। একেশ্বরবাদের দিক হইতে উহাদের অর্থ তাহারা বুঝিতে সমর্থ হন না। সেই জন্যই বোধহয় উপনিষদকার বলিয়াছেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, রুদ্র, পরমাত্মা, চন্দ্র ও সূর্য্য, দেব ও পিশাচ, জীব, মন ও লক্ষ্মী, পশুপক্ষী ইত্যাদি যা কিছু সকলই ব্রহ্ম-অর্থাৎ ব্রহ্মাদয়ঃ। অর্থাৎ কিনা চূড়ান্ত Pantheism উপনিষদকার মানিয়া লইতেছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রহ্মশক্তির লেশ মাত্র জগৎ সৃষ্টি ও পরিচালনা কার্য্যে ব্যয়িত হয় এবং অপরিমেয় অনন্ত শক্তি ব্রহ্মে রহিয়া যায়। আরও দেখাইয়াছি, উপনিষদকার সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য মানিয়া জীবের স্বাধীনতা প্রকারান্তরে মানিয়া লইয়াছেন এবং জাগতিক অনেক বস্তুকে তিনি নির্ম্মাণসমর্থ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই কয়টি কথা না থাকিলে এই উপনিষদখানিকে যে নির্ব্বিবাদে Pantheism বলা যাইত, সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই।

অন্যান্য উপনিষদও ভারতীয় দর্শনের ন্যায় এই উপনিষদখানির উদ্দেশ্য হইতেছে মোক্ষলাভ। তবে এই মোক্ষ লইয়া যে অনেক তর্কবিতর্ক চলিয়া থাকে তাহা সকলেই

অবলম্ব আছেন। সুতরাং মোক্ষ বলিলে আমরা সচরাচর কি বুঝি তাহা পূর্ব্বেই স্থির করা আবশ্যক। এই উপনিষদে কোনও অতীন্দ্রিয় সুখময় স্থান লাভকে মোক্ষ বলা হয় নাই। এই জগতে কি নিত্য, অর্থাৎ real এবং কি অনিত্য অর্থাৎ unreal যিনি স্থির করিতে পারেন তাঁহার অহংজ্ঞান লোপ পায়। অর্থাৎ তিনি যে নিজ শক্তিতে স্বাধীন ভাবে, অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তির সহায়তা ব্যতীত বাঁচিয়া আছেন এবং কার্য্য করিতে পারিতেছেন এই জ্ঞানটি লোপ পায় এবং তজ্জন্য এই অনিত্য সংসারে তাঁহার সমুদয় সঙ্কল্প ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। এই অনিত্য সঙ্কল্পহীন অবস্থার নামই মোক্ষ। কথাটা বড়ই জটিল বোধ হইতেছে। জীবন্ত মনুষ্যের সঙ্কল্প শূন্য অবস্থার কথা আমরা ভাবিতে পারি না। তবে সঙ্কল্প দুই রকমের হইতে পারে। মনে করিতে পার তুমি স্বাধীনভাবে জগতে বিরাজ করিতেছ এবং তুমি যাহা ইচ্ছা কর তাহা কেবল তোমার সুখের জন্যই, সমগ্র জগতের জন্য নয়। এইরূপ সঙ্কল্পকে অনিত্য বলা যাইতে পারে, কারণ ব্যক্তির ধ্বংস অহরহই ঘটিতেছে। কিন্তু যদি মনে কর, তুমি সমষ্টির, অর্থাৎ সমস্ত জগতের, অর্থাৎ ব্রহ্মের একটি অংশ, এবং তুমি যাহাই করনা কেন তাহাই এই সমগ্র জগতের জন্য এবং তুমি এই সমগ্রের অংশ, সুতরাং তোমার জন্যও। এইরূপ সঙ্কল্পকে নিত্য বলা যাইতে পারে। কারণ, সমষ্টি অর্থাৎ ব্রহ্মের ধ্বংস নাই। সুতরাং মানুষ যখন আপনার সমস্ত কার্য্য ও চিন্তায়, মনে ও প্রাণে আপনাকে বিশ্বের একটি অংশ বলিয়া বিশ্বাস করে তখন তাহার যে অবস্থা সেই অবস্থার নামই মোক্ষ, ইংরাজীতে ইহাকে organic consciousness of the entire world system and the self বলা যাইতে পারে।

এই সম্পর্কে পরম পদের কথাও বলিব। সাধারণতঃ মোক্ষ বলিলে লোকে যাহা বোঝে তাহাকেই এই উপনিষদে পরমপদ বলা হইয়াছে। উপনিষদকার বলিয়াছেন, প্রাণেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাদির অতীত যে সচ্চিদানন্দ, অদ্বিতীয়, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বস্থানে গমন সক্ষম, নিত্য মুক্ত যে ব্রহ্ম তাহার স্বরূপই পরমপদ। অর্থাৎ ব্রহ্মই পরমপদ। কারণ ব্রহ্ম ব্যতীত কাহারও প্রতি সচ্চিদানন্দং অদ্বিতীয়ং সর্ব্বসাক্ষীণং ইত্যাদি আরোপ করা যায় না। এই স্থানে সচ্চিদানন্দ এই কথাটার একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন মনে করি। এই শব্দটি বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই, ইহার মধ্যে সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিনটি শব্দ আছে। সৎ দ্বারা আমরা existence বা অস্তিত্ব বুঝি; যাহা আছে তাহাই সৎ, যাহা নাই, তাহাই অসৎ। ব্রহ্মের একটি গুণ সৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম সদা সর্ব্বদাই বর্ত্তমান আছেন, তাঁহার ধ্বংসও নাই, জন্মও নাই, আরম্ভও নাই, শেষও নাই। সেই জন্য ব্রহ্ম সৎ। চিৎ দ্বারা আমরা চেতনা বুঝি। প্রাণ বিহীন ভস্ম, পাথর কিম্বা মরা কাঠের মত ব্রহ্ম নন। ব্রহ্মের একটি গুণ সেই জন্য চিৎ। তবে এই চেতনা দ্বারা আমরা যে শুধু জীবনী শক্তি বুঝিব তাহা নয়। জীবনী শক্তির অতিরিক্ত মানসিক শক্তিও ঐ সঙ্গে বুঝিতে হইবে। সুতরাং এই চিৎকে আমরা ইংরাজীতে তরজমা করিয়া life বলি; তবে এই life দ্বারা শুধু biological life বুঝিতে হইবে না, mental ও spiritual lifeও ঐ সঙ্গে বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মকে আনন্দও বলা হইয়াছে। তিনি সর্ব্বদা আনন্দময়, দুঃখ তাঁহাতে নাই। যাহারা সসীম, যাহাদিগকে পদে পদে ব্যর্থকাম হইতে হয় তাহাদের পক্ষেই দুঃখ সম্ভবপর; কিন্তু অসীম ব্রহ্মের কোনই দুঃখ হইতে পারে না। এমন জগৎ কর্ত্তা যদি আনন্দময় বলিয়া বর্ণিত হইলেন, তখন এই উপনিষদবর্ণিত দর্শন দুঃখ-বাদ বা pessimism যে হইতে পারে না সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। এইখানে আমরা খ্রীষ্টীয় ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রেমময় ভগবানের (god of love) সহিত আনন্দময় ব্রহ্মের তুলনা করিতে পারি। দুইটিই অনেকটা একই প্রকারের বলিয়া বোধ হয়।

এখন সুখদুঃখের কথা বলা যাউক। এই সম্পর্কে স্বর্গ নরকের কথাও বলা হইবে। আমি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের একটা অংশ বা রূপ এই জ্ঞান বিশ্বাস যখন কাহারও হয় তখন এই জ্ঞানজনিত প্রাণে মনে যে আনন্দ সঞ্চারিত হয় তাহার নামই সুখ। এই জ্ঞান স্থায়ী এবং একবার ইহার সাক্ষাৎ পাইলে মরণাবধি ইহা রহিয়া যায়। সুতরাং এই সুখের সাক্ষাৎ যিনি একবার লাভ করেন তিনি আর কখনও এই সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে পারেন না। এই উপনিষদে দুঃখকে অনাত্ম-বস্তু-সঙ্কল্প বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, অর্থাৎ অপরের বস্তু পাইবার জন্য যে ইচ্ছা তাহার নাম দুঃখ। সুতরাং যে পর্য্যন্ত আমি তুমি ইত্যাদি ব্রহ্মাতিরিক্ত জ্ঞান থাকিবে সেই পর্য্যন্ত এই প্রকার সংকল্প লোপ পাওয়া এক রকম অস্বাভাবিক। যখন আমি তুমি হইতে আরম্ভ করিয়া

সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মের বিকাশ বা অংশ (factor) বলিয়া মনে হইবে, তখন সকল বস্তুই ব্রহ্ম বস্তু হইয়া পড়িবে। পরকীয় কি নিজস্ব কিছুই থাকিবে না এবং সমস্ত সঙ্কল্পই ব্রহ্ম সঙ্কল্প হইয়া পড়িবে। সুতরাং দুঃখ সম্পূর্ণ ভাবে দূর হইবে।

স্বর্গ বলিলে সাধারণ লোকে যে অতীন্দ্রিয় জগতের কথা ভাবিয়া থাকে, সে সম্বন্ধে এই উপনিষদকারের মত বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। কারণ ইহাতে সৎসঙ্গকেই স্বর্গ বলা হইয়াছে, আর এই মায়াময় সংসার বিষয়ে যাহারা ঘোরতর ভাবে জড়িত, তাহাদের সংসর্গকেই নরক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, পার্থিব জীবনেই নরনারী যত কিছু স্বর্গ নরক ভোগ করিয়া থাকে।

সর্ব্বশেষে আমি নিরালম্বোপনিষদ-কারের ব্রাহ্মণ শব্দের ব্যাখ্যা জনসাধারণ সমক্ষে উপস্থিত করিব। তিনি বলিয়াছেন, "যঃ ব্রহ্মবিৎ স এব ব্রাহ্মণঃ" অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী তিনিই ব্রাহ্মণ। তাহা হইলে বোঝা যাইতেছে, ব্রহ্মজ্ঞানই ব্রাহ্মণের সর্ব্বপ্রধান গুণ। এই জ্ঞান ব্যতীত এই উপনিষদের সময়ে ব্রাহ্মণ হওয়া সম্ভবপর ছিল না। যাঁহারা এই শ্রুতির অর্থ সাব্যস্ত করিতে গিয়া বলেন, ব্রাহ্মণ জন্মিবা মাত্র শূদ্রবৎ, তৎপরে যজ্ঞোপবীতাদি হইলেই দ্বিজ, সেই দ্বিজ বেদাধ্যয়ন করিলেই বিপ্র ও বিপ্র ব্রহ্মজ্ঞ হইলেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ হয়েন, ইতিহাসের দিক দিয়া দেখিতে গেলে তাহারা ভুল করেন; কারণ উপনিষদ সৃষ্টির সময়ে আর্য্য সমাজে ব্রাহ্মণেতর জাতি বিভাগ ছিল না।

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই, এই নিরালম্বোপনিষদ খানিতে যে সমস্ত ব্যাখ্যা ও কথা আছে তাহা বর্ত্তমান যুগের দর্শনাচার্য্যগণের ব্যাখ্যা সমূহ অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে। এই উপনিষদে যে মানবসমাজের চিন্তাশীলতার সুফলগুলি পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে সে সমাজ যে বিশেষ ভাবে সমুন্নত ছিল তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না।

শ্রীপ্রিয়গোবিন্দ দত্ত এম-এ, বি-এল।

হরিহর

শুভ্র সিকতা উড়ি কালানল বর্ষে,
শ্যামল তরুবুকে ডাকে পিক হর্ষে।
ঝঞ্ঝার শিঙা বাজে সারা ধরাধ্বংসী
ছায়াময় বনগেহে বাজে মধুবংশী।
তপ্ত পাবন-অহি রহি রহি গর্জ্জে,
ঢল ঢল কালো আঁখি ভীল সরোবর যে।
একদিকে ভস্মেতে বিভূষিত অঙ্গ,
আনদিকে ঘনশ্যাম বনানীর সঙ্গ।

একদিকে মেঘে লোটে কটা বাটা গুচ্ছ
আনদিকে রামধনু শোভে শিখীপুচ্ছ।
ভীতিময় মহাকাল শিব উদ্‌ভ্রান্ত
আনদিকে ঘনশ্যাম কমনীয় কান্ত।
পরিণাম রমণীয় খরতর গ্রীষ্ম,
একাধারে হরিহর মনোহর দৃশ্য।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ।

জয়-মাল্য

নাম তাহার বিশ্বসেন,—তরুণ যুবক, সে রাজকবি—রাজগায়ক।

এই তরুণ যুবকের কণ্ঠস্বরে এমন একটা আকর্ষণশক্তি ছিল, তাহার সঙ্গীতে এমনি মাধুর্য্য ছিল, বীণাটিতে তাহার এমন প্রাণপাগল মূর্চ্ছনা খেলা করিত, যাহাতে রাজ্যের প্রত্যেক প্রাণী কবির সঙ্গীতে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিত না। তরুণ কবির ভক্ত ছিল অসংখ্য, কিন্তু এই ভক্তগুলির মধ্যে সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল,—রাজকুমারী ঊর্ম্মিলা। এই তরুণ কবিটিকে যে সে কি চক্ষে দেখিয়াছিল তাহা বলা যায় না। মুগ্ধ ভক্তের হৃদয়ে যেমন সর্ব্বদা তাহার আরাধ্যদেবের মধুর আলেখ্যখানি ভাসিতে থাকে, কুমারী ঊর্ম্মিলার হৃদয়েও তেমনি কবির মনোহর মূর্ত্তিখানি সর্ব্বদা ফুটিয়া উঠিত। রাজপ্রাসাদসংলগ্ন এক বৃহৎ উদ্যানে কবি বাস করিত। নির্জ্জন উদ্যানের এক প্রান্তে বসিয়া কবি

যখন বীণার তারে মূর্চ্ছনা জাগাইয়া তুলিত, উর্ম্মিলা তখন বক্ষবিস্ময়ে তাহার পাশে বসিয়া বীণা-সঙ্গতের মধুর-সঙ্গীত শুনিত, কবি যখন গান বন্ধ করিত, তখন সে সঙ্গীত সম্বন্ধে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া তাহাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিত; নৈরাশ্য মাখা মৃদু হাসি ছাড়া,—এই হাস্যচঞ্চল কিশোরীর অসংখ্য প্রশ্নের কোন উত্তরই কবি দিত না! যখন লতা-বিতানের শান্ত শীতল ছায়ায় বসিয়া কবি তাহার কিন্নর কণ্ঠে ঝঙ্কার তুলিত, কুমারী উর্ম্মিলা তখন কক্ষে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে কবির কল-কণ্ঠের মধুর কাকলী শুনিতে শুনিতে নিজেকে সঙ্গীত-বন্যায় ভাসাইয়া দিত। কবি যখন উদ্যানের প্রশস্ত পথে পদচারণা করিতে করিতে গুন্ গুন্ স্বরে গান গাহিত, অদূরস্থিত অলিন্দে থাকিয়া মুগ্ধা কুমারী তাহার ডাগর চোখের হাস্যময়ী দৃষ্টিটুকু কবির সুগঠিত বরবপুর উপর তুলিয়া ধরিত! কবি যখন তাহার সাধের বীণাটি লইয়া রাজসভা অভিমুখে যাইত, হর্ষোজ্জ্বলমুখে কুমারী তখন অলিন্দ ছাড়িয়া রাজসভাস্থ নারিগণের আসনে গিয়া,—সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধামত জায়গাটিতে বসিত,—যেখান হইতে কবিকে খুব স্পষ্ট এবং খুব নিকটে দেখিতে পাওয়া যায়। কবির মধুর কণ্ঠস্বর যখন সভাগৃহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ধ্বনিয়া উঠিত,—মর্ম্মর জালতির বড় বড় ছিদ্রের ভিতর দিয়া রাজকুমারীর অপলক নেত্রের স্থির দৃষ্টিটুকু আবদ্ধ থাকিত,—কবির কমনীয় মুখের উপর!

কবি কুমারী উর্ম্মিলার অন্তর বাহির এমনি পূর্ণ করিয়া দিয়াছিল যে, কুমারী তাহার তরুণ জীবনকুঞ্জের চতুর্দ্দিকে একই মূর্ত্তি দেখিত,—সে মূর্ত্তি কবি বিশ্বসেনের! একটি তরুণ নারী হৃদয় এমনি ভাবে ধীরে ধীরে কবির মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলিতেছিল; কবি কিন্তু রাজকুমারীর প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। সময় মত সে রাজসভায় গান গাহিত, তারপর উদ্যান বাটিকায় আসিয়া নিজের ভাবে নিজেই বিভোর হইয়া থাকিত। তাহাকেই আশ্রয় করিয়া একটি নারীহৃদয় যে সন্তর্পণে মুকুলিত হইয়া উঠিতেছে, কবি জেনে তাহা জানিয়াও জানিত না।

সন্ধ্যাবধূর প্রশস্ত ললাটে স্তিমিত সূর্য্যের শেষ রক্তিম-রশ্মি-রেখাটি নববধূর কপালের উজ্জ্বল সিন্দূর-বিন্দুর মতই শোভা পাইতেছিল, বাগানের গাছগুলি ফুলে-ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছিল। সারাটি উদ্যান জুড়িয়া ফুলের মেলা,—গন্ধের ছড়াছড়ি,—আজ যেন সন্ধ্যাবধূর ফুলশয্যা! কুঞ্জবীথির ভিতর বসিয়া কবি তাহার কণ্ঠ-সঙ্গীতের মধুর ঝঙ্কারে আকাশ বাতাস প্লাবিত করিতেছিল, অলিন্দে বসিয়া কুমারী উর্ম্মিলা সেই সঙ্গীত-তরঙ্গে প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিল। সঙ্গীত-মগ্ন তন্ময় কবির কণ্ঠঝঙ্কার ক্রমে স্তব্ধতায় ডুবিয়া গেল, জাগিয়া রহিল কেবল, নীপের শাখায় শাখায়, ফুলের তীব্র-মধুর-গন্ধ-বাহী-সমীরণের স্তরে স্তরে, পুষ্পবীথির ফাঁকে ফাঁকে,—উদ্দাম সঙ্গীতের অস্পষ্ট-স্বর-লহরী,—প্রাণ আকুলকরা মূর্চ্ছনা! কবির কণ্ঠস্বর যখন আর শোনা গেল না, তখন উত্তেজিতা রাজবালা সহসা অলিন্দ ছাড়িয়া চঞ্চলপদে প্রাসাদের পশ্চাৎ-তস্থ দ্বার দিয়া উদ্যানে প্রবেশ করিল। সঙ্গীত বন্ধ করিয়া কবি কখন যে তাহার কোলের বীণাটি পার্শ্বে নামাইয়া রাখিয়াছে, তাহা সে নিজেই জানিত না। তন্ময় কবি তখন বাস্তব জগৎ ছাড়িয়া কল্পনারাজ্যে বিচরণ করিতেছিল; বিশ্বরাজ্যের চিন্তা ছাড়িয়া তখন সে ভাবরাজ্যের চিন্তায় বিভোর! এমন সময় অনুসন্ধান করিতে করিতে রাজ-কুমারী লতাকুঞ্জের ভিতর ভাবমগ্ন কবির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। পদশব্দে চমকিত কবি মুখ তুলিয়া স্বপ্নজড়িত চক্ষু দুটি রাজকন্যার মুখের উপর তুলিয়া ধরিল, অভিভূতের মত অপলক দৃষ্টিতে সে শুধু চাহিয়া রহিল, একটি কথাও কহিল না। রাজকুমারীর শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ ছুটিয়া গেল; এরূপ সময় কোন দিন সে একাকিনী কবির সম্মুখীন হয় নাই, আজ এই মৌন-সন্ধ্যায় কবির সম্মুখে আসিয়া কি জানি কেন সে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল! ক্ষণিকের উত্তেজনায় কাজটা যে অন্যায় হইয়াছে তাহা সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিল। উর্ম্মিলা ভাবিল—ফিরিয়া যাই। আবার ভাবিল, "যখন এসেছি, কথা কহিতেই বা দোষ কি?" রাজকন্যা কবির সহিত গল্প করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না; কম্পিত-মধুর-কণ্ঠে রাজকুমারী ডাকিল,—"কবি!—"

কল্পনারাজ্যের কবি মানসীকে অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতে-ছিল, সেই বুঝি মূর্ত্তিমতী হইয়া তাহার সম্মুখে আসিয়াছে, সাধনা আজ তাহার সার্থক হইয়াছে! বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে কুমারীর দিকে চাহিয়া বিহ্বলকণ্ঠে কবি বলিল,—"এসেছ দেবী! তোমারই অনুসন্ধান আমি করছিলাম!"

"আমারই অনুসন্ধান!"—বিস্মিত রাজকন্যা কম্পিত কণ্ঠে কহিল—আমাকে আপনার প্রয়োজন!"

"প্রয়োজন! —হায় পাষাণী"—ব্যথিত কণ্ঠে কবি কহিল —"আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা কি আজও তোমার হৃদয়দ্বারে আঘাত করে নাই? তোমার মিলনমন্দলে এ শূন্য হৃদয় কি পূর্ণ হবে না? তবে কি ছলনা করতে এসেছ দেবী!"

উর্ম্মিলা বুঝিল, ইহা তন্ময় কবির প্রলাপ। বিস্মিত হাস্যে সে কহিল, "কি বল্‌ছেন আপনি? কোন ছলনাই ত আপনার সঙ্গে করিনি!"

"করেন নি"—ভ্রুকুটিভরে কবি কহিল, "মিথ্যা কথা। —কে আপনি?"

"আমি রাজকুমারী উর্ম্মিলা।"

কবি যেন সহসা জাগিয়া উঠিল, শান্ত দৃষ্টিতে উর্ম্মিলার দিকে চাহিয়া ধীরকণ্ঠে কহিল,—"রাজকন্যা আপনি? —কিন্তু দরিদ্রের কুটীরে কেন দেবী?"

"কেন, আস্‌তে নেই কি? আপনি কি মনে করেছিলেন আমায়?" জিজ্ঞাসুনেত্রে কুমারী কবির দিকে চাহিল।

নত মস্তকে কবি কহিল,—"আমি মনে করেছিলাম, —সুরে—সঙ্গীতে—ঝঙ্কারে যার কাছে প্রাণের ব্যথা ব্যক্ত করে থাকি, কল্পনারাজ্যে যাকে খুঁজে বেড়াই, হৃদয়-আসনে যাকে বরণ করে নেবার জন্য আকুল আগ্রহে বসে আছি, —মনে করেছিলাম, সেই জীবনের সাথীটি এসে আমার সামনে দাঁড়িয়েছে।"

নম্রবিনয়ে কুমারী উর্ম্মিলা বলিল,—"এ ভুল হবার কোন কারণ জানতে পারি কি?"

"কারণ"—অশান্ত কণ্ঠে কবি কহিল,—"আমার কল্পিত মানসীর আদর্শ আপনাতে পেয়েছিলাম।"

"পেয়েছিলেন আমাতে"—সকৌতুকে রাজকুমারী কহিল, —"যদি আপত্তি না থাকে তা হলে আমাকেই আপনার —" সরমরাঙা মুখে কুমারী উর্ম্মিলা মাথা নত করিল।

"তা নয় দেবী!"—বাধা দিয়া কবি বলিল,—"ঘৃণায়-বিলাস রাজ-অনুগ্রহে পুষ্ট দরিদ্র কবি রাজকুমারীকে হৃদয়-দেবী রূপে পাবার আশা করিতে পারে না। আমারই ভুল— যাক্ সে কথা। ক্ষমা করুন দেবী! আমি আপনার কিম্বা আপনিই আমার অযোগ্য!" ভূপতিত বীণাটি তুলিয়া লইয়া কবি দ্রুতপদে লতাকুঞ্জ হইতে বাহির হইয়া গেল।

রাজকন্যা কিছুক্ষণ নতমস্তকে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল,—তারপর ধীরপদক্ষেপে প্রাসাদে ফিরিয়া গেল।

একটির পর একটি সন্ধ্যাতারা তখন আকাশের গায়ে ফুটিয়া উঠিতেছিল। কবি উদ্যানপ্রান্তস্থ নদীতীরে বীণাটি ফেলিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া আকুল উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া ফেলিল। এতদিন সে তার জীবন সাথীটিকে খুঁজিয়া পায় নাই, সে তঃ একটা সান্ত্বনা ছিল, আজ সে পাইয়া হারাইয়াছে তাহার অন্তর বাহির আজ বিরাট শূন্যতায় হা হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

"ওগো দেবী! যদি এলে ত এমন নির্ম্মম মূর্ত্তিতে কেন?—আমি যে তোমায় বড় মধুর মূর্ত্তিতে চেয়েছিলাম।" কবি ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। রাজোদ্যানের কৃত্রিম ঝরণা হইতে শতধারে জল ঝরিতেছিল—ঝর্—ঝর —ঝর।

* * * *

কবির যে বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে রাজসভাস্থ সকলেই তাহার ভাবে তাহা কতকটা অনুমান করিয়া লইল। কবির অবস্থা পরিবর্ত্তনে, ভাববিপর্য্যয়ে সভাস্থ কেহই ততটা উৎকণ্ঠিত হইল না, কিন্তু তাহার বিষণ্ণ বদন, শীর্ণ শরীর, কম্পিত-করুণ-ক্ষীণ-কণ্ঠস্বর রাজকুমারী উর্ম্মিলাকে বিশেষ বিচলিত করিয়া তুলিল, চুম্বনে যদি কবির সব বেদনা মুছিয়া ফেলা যাইত! রাজকুমারী তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলিয়া আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কবি সভাগৃহ হইতে উদ্যান অভিমুখে প্রস্থান করিল। কুটীরে না গিয়া সে নদীতীরে গিয়া বসিল। তটিনীর নৃত্যচঞ্চল-তরঙ্গগুলি হাস্যমুখরা বালিকার মত নাচিয়া নাচিয়া ছুটিতেছিল; কবি অপলক দৃষ্টিতে তরঙ্গিণীর তরঙ্গলীলা দেখিতে লাগিল।

কবির জাগ্রত স্বপ্নে বাধা দিয়া সহসা কে ডাকিল,— "কবি!—"

নিদ্রোত্থিতের মত চকিতে মুখ তুলিয়া কবি দেখিলেন— রাজদূত। ধীর কণ্ঠে সে বলিল,—"কি প্রয়োজন?"

সসম্ভ্রমে মস্তক নত করিয়া দূত কহিল,—"মহারাজ আপনাকে স্মরণ করেছেন!"

* * * *

নগরময় হৈ হৈ পড়িয়া গিয়াছে। কোথা হইতে এক বিদেশী গায়ক আসিয়াছে, সে নাকি রাজকবি বিশ্বমোহনের

সহিত সঙ্গীত-যুদ্ধ করিবে। এই দ্বন্দ্ব যুদ্ধে যে জয়ী হইবে, মহারাজ স্বহস্তে তাহাকে জয়মাল্যে ভূষিত করিবেন।"সকলের প্রাণে একটা উৎকণ্ঠা জাগিয়া উঠিয়াছে,—এই তরুণ কবি কি সঙ্গীতজ্ঞ প্রৌঢ় বিদেশীকে জয় করিতে পারিবে? আহা যদি পারিত! রাজ-অন্তঃপুরে কুমারী উর্ম্মিলা চঞ্চল হইয়া উঠিল, মনে মনে সে বিদেশী গায়ককে অজস্র অভিশাপ দিল! রাজসভা লোকে লোকারণ্য,—মহারাজ কি আদেশ দেন তাহা শুনিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত, সভা নীরব! কবি বিশ্বসেন এখনও আসে নাই। বীণা হাতে কবি সভা-গৃহের দুয়ারে আসিয়া দেখা দিল, এক সঙ্গে অসংখ্য চক্ষু তাহার উপর স্থাপিত হইল। জনতাবেষ্টিত অল্পপরিসর পথ বাহিয়া কবি সভার মধ্যস্থলে আসিয়া দাড়াইল। বিদেশীর সম্মুখে কবির সম্মান বৃদ্ধি করিবার জন্য মহারাজ নিজের দক্ষিণে তাহার আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, কবি সভায় আসিয়া দাঁড়াইতেই মহারাজ তাহার হাত ধরিয়া নিজের পাশে বসাইলেন। মর্ম্মরজাফ্রি-আবৃত নারিগণের আসনে কুমারী উর্ম্মিলা বসিয়াছিল, আনন্দে, গৌরবে, প্রশংসায় তাহার মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল;—"পিতা আজ কবির যোগ্য সম্মানই করিয়াছেন!"

সভা নীরব। মহারাজ গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিলেন, "বিশ্বসেন!—"

নত মস্তকে, নম্রকণ্ঠে কবি কহিল,—"আজ্ঞা করুন, মহারাজ!—"

"এক বিদেশী সঙ্গীতজ্ঞ এসেছেন"—এক নবাগত প্রৌঢ়ের প্রতি রাজা দৃষ্টিপাত করিলেন,—উৎসুক জনতা তাহাদের সমস্ত মনোযোগ কর্ণে কেন্দ্রীভূত করিল, "তিনি তোমার সঙ্গে সঙ্গীত-যুদ্ধ করিতে চান,—তুমি এই দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রস্তুত আছ?" নীরব সভায় একটা অস্ফুট গুঞ্জন উঠিল, কবির উত্তরের প্রতীক্ষায় রাজকন্যা উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন। বিনয়ভরা কণ্ঠে মহারাজের দিকে চাহিয়া কবি কহিল,—"দ্বন্দ্বযুদ্ধ করবার মত স্পর্দ্ধা বা শিক্ষা আমার নেই, তবে শিক্ষার্থীরূপে যে কোন লোকের কাছে পরীক্ষা দিতে আমি প্রস্তুত। আমার বিশ্বাস—এ পরীক্ষায় আমি প্রশংসার সহিতই উত্তীর্ণ হব!" কবির উত্তরে আনন্দের অস্ফুট কোলাহলে সভাগৃহ মুখর হইয়া উঠিল। গম্ভীর কণ্ঠে মহারাজ কহিলেন,—"এতদিন যে সঙ্গীত আলোচনা করেছ, কাল তার পরীক্ষা হবে!—আশা করি, তুমি আমার মুখ উজ্জ্বল করবে।"

"সে দেবী বীণাপাণীর কৃপা"—ভক্তিগদ্‌গদকণ্ঠে কবি বলিল,—"আর মহারাজের অসীম অনুগ্রহ!"

স্থির হইল পরদিন অপরাহ্নে কবিদ্বয়ের সঙ্গীত-যুদ্ধ হইবে, তারপর সভাভঙ্গ হইল। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে করিতে কবির দিকে চাহিয়া রাজা বলিলেন,—"জয়ের মালা আমি নিজের হাতে তোমার গলায় পরিয়ে দেব বিশ্বসেন, বোধ হয় এ আশা আমার সফল হবে।" মহারাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেই রাজকুমারী তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—"আমিও কবির গলায় মালা দেব বাবা!" বিস্মিতদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ কন্যার দিকে চাহিয়া থাকিয়া সহাস্যে রাজা বলিলেন,—"বেশ, তাই দিস!"

* * * *

রাজসভা জনপূর্ণ। স্তব্ধ জনসঙ্ঘ নিশ্চল পাষাণ মূর্ত্তির মত আপনাপন আসনে বসিয়া আছে। রাজার পাশে বসিয়াছিল কবি বিশ্বসেন; মুখ তাহার উজ্জ্বল দীপ্তিতে উদ্ভাসিত, হৃদয় তাহার উদ্বেগ-আকুল! নবাগত কবি অদূরে বসিয়া বীণাটিকে মনোমত সুরে বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, সভাসদবেষ্টিত মহারাজ গম্ভীরভাবে সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। দারুণ উৎকণ্ঠা বুকে করিয়া মর্ম্মর বাতায়নতলে বসিয়াছিল রাজকুমারী উর্ম্মিলা; তাহার আকুল চক্ষের অপলক দৃষ্টিটুকু স্থাপিত ছিল,—কবির সৌম্যসুন্দর মুখের উপর। সকলেই উৎকণ্ঠিত,—সকলের হৃদয়ে একই প্রশ্ন উঠিতেছে,—"কি জানি জয়মাল্য কাহার ভাগ্যে আছে!" বিরাট নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে মহারাজ ডাকিলেন, —"বিশ্বসেন!"—সসম্ভ্রমে কবি উত্তর করিল,—"আজ্ঞা করুন মহারাজ।" "কল্যকার রাজাজ্ঞা স্মরণ আছে তোমার", —পূর্ব্ববৎ কণ্ঠে মহারাজ কহিলেন,—"আশাকরি, এ দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয়ী হবে তুমি।" "চেষ্টা করে দেখব"—গর্ব্বিত বিনয়ে কবি কহিল, "জয়ী হওয়া বা না হওয়া ভবিষ্যতের উপর নির্ভর কচ্ছে!" "উত্তম, প্রস্তুত হও"—মহারাজ কহিলেন;—"আমরা তোমার সর্ব্বাঙ্গীন জয় প্রার্থনা করি!" "সে দেবীর অসীম অনুগ্রহ।" কবি সন্তর্পণে পার্শ্বস্থিত বীণাটি তুলিয়া লইল।

সভা নীরব। রাজকবি বিশ্বসেন উঠিয়া কিরীটাবনত মস্তকে

সভাস্থ সকলকে সম্মান প্রদর্শন করিল। সকলের বক্ষ দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল। পঞ্চমে সুর বাঁধিয়া ধীর কম্পিতকণ্ঠে বিশ্বসেন গাহিতে লাগিল, তন্ময় কবির উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বরে রাজপুরী সভাগৃহ ধ্বনিয়া উঠিল; রাজকুমারী উর্ম্মিলার কিশোর-হৃদয় কবির করুণ সঙ্গীত ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। তরুণ কবি সব ভুলিয়া সঙ্গীতে মগ্ন হইয়া গেল, হৃদয়বেদনা সুরে, সঙ্গীতে, ভাষায় ব্যক্ত করিতে লাগিল। বীণার সুরে সুর মিলাইয়া কবি করুণ রাগিণীতে কাঁদিতেছিল, অসংখ্য জনতার চক্ষু ফাটিয়া অশ্রুর উৎস ছুটিল, রাজকন্যার ডাগর চোখ দুটি অশ্রুমালায় ভরিয়া উঠিল; সগৌরবে কবির দিকে চাহিয়া মহারাজ দুইফোঁটা অশ্রু ঝাড়িয়া ফেলিলেন। অশ্রু-রুদ্ধকণ্ঠে কবি সঙ্গীত শেষ করিল; লক্ষ জনমণ্ডলি গর্ব্বিত প্রশংসায় কবির জয় ঘোষণা করিল। রাজার প্রতি চাহিয়া বিদেশী কবি তাঁহার বীণাটি তুলিয়া লইলেন,—বিদেশীর দীপ্তকণ্ঠ সভাস্থ সকলকে বিচলিত করিয়া তুলিল। সমস্ত সভা নীরব,—রাজপুরী কম্পিত করিয়া বিদেশী গাহিতে লাগিলেন;—বিস্মিত চকিত দৃষ্টিতে বিশাল জনতা নবাগত কবির প্রতি চাহিয়া রহিল; গানের ছন্দে ছন্দে কবির সঙ্গীত বিদ্যা প্রকাশ পাইতেছিল। তরুণ কবি বিশ্বসেন ধীরে ধীরে উঠিয়া নবাগত কবির চরণে প্রণাম করিল, সঙ্গীতযুদ্ধ স্থগিত হইল। বিপুল জনতা ফলাফল জানিবার জন্য ব্যগ্র প্রতীক্ষায় চাহিয়া রহিল। "জয়ের মালা বিদেশী কবিরই প্রাপ্য" - জয়মাল্য হস্তে মহারাজ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, —লক্ষলোকের কর্ণে কর্ণে প্রতিধ্বনি বাজিয়া উঠিল। নীরব মৌনতার মাঝে মহারাজ ধীরে ধীরে জয়মাল্যটি বিদেশী কবির গলায় পরাইয়া দিলেন।

বিষাদকাতর জনতা ধীরপদে সভা ত্যাগ করিতে লাগিল। বড় সাধ করিয়া অসংখ্য গন্ধামোদিত পুষ্পে রাজকন্যা আজ একছড়া মালা গাঁথিয়াছিল,—কবির জন্য। ব্যথিত হৃদয়ে গন্ধপাগল মালাটি বুকে চাপিয়া ধরিয়া, আসন ছাড়িয়া চঞ্চলপদে উর্ম্মিলা প্রস্থান করিল।

পরাজিত কবি বিষাদ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে উদ্যানবাটী-অভিমুখে চলিল; সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ হইল। বেদনা-ভরা দৃষ্টিতে একবার কবির দিকে চাহিয়া মহারাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

* * * * * *

অস্তগামী সূর্য্যের রক্তাভরশ্মি তটিনীর তরঙ্গভঙ্গে,—ফুলের পাপড়িতে পাপড়িতে,—লতাবিতানের পাতায় পাতায়,—শ্যাম তৃণের শিরে শিরে স্বর্ণের মত চিক্ চিক্ করিতেছিল। উদাস কবি ব্যথিত হৃদয়ে উদ্যানে প্রবেশ করিল। আজ যেন সকলে সমস্বরে তাহার পরাজয় কাহিনী ঘোষণা করিতেছে। বিহঙ্গদল যেন মত্ত কাকলিতে তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছে। সমীরণ যেন তাহাকে উপহাস করিয়া হা হা শব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে। ধীরে ধীরে লতাবিতানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্তব্ধ হৃদয়ে বসিয়া পড়িল,—অতীতের সব স্মৃতি, বর্ত্তমানের সব ব্যথা দ্বিগুণ বেগে তাহার হৃদয় দুয়ারে আঘাত করিল। যখন কণ্ঠে তাহার স্বর নাই,—বীণায় তাহার মূর্চ্ছনা নাই,—তখন এ বীণা রাখিয়া ফল কি। কবি একে একে বীণার তারগুলি, ছিঁড়িতে লাগিল, ছিন্ন তার কবির অঙ্গুলি স্পর্শে করুণ সুরে কাঁদিয়া উঠিল। তারগুলি ছিঁড়িয়া, বীণাটি খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া কবি একটা বেদনার নিঃশ্বাস ফেলিল। ভগ্ন বীণাটি কুঞ্জের বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া পশ্চাৎ ফিরিতেই কবি দেখিল,—তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রাজকুমারী উর্ম্মিলা। কবির চোখ ফাটিয়া জল আসিতে চাহিল। সান্ত্বনাভরা আর্দ্রকণ্ঠে কুমারী ডাকিল, —"কবি—"

কবি নির্ব্বাক—গণ্ড তাহার অশ্রুপ্লাবিত। কবির দিকে আগাইয়া গিয়া উর্ম্মিলা কহিল,—"জয়ী তুমি কবি,—আমি তোমায় জয়মাল্যে ভূষিত করিতে এসেছি।—আশা করি দীনা বালিকার এ ভক্তিউপহার তুমি প্রত্যাখ্যান করবে না?"

"কেন দেবী এ উপহাস"—অশান্ত উত্তেজিত কণ্ঠে কবি কহিল,—বিশ্বে কি এতটুকু সান্ত্বনাও আমার জন্য নাই।" বিশ্বসেনের পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া মিনতিভরা সজল কণ্ঠে রাজকুমারী কহিল,—"বিশ্বাস কর প্রভু,—এ উপহাস নয়; —এ মুগ্ধ ভক্তের আত্মনিবেদন। পূজারিণীর এ নৈবেদ্য ঘৃণায় ফিরিয়ে দিও না দেবতা।"—আবেদনমাখা দৃষ্টিতে কুমারী কবির দিকে চাহিল।

ব্যস্ত কবি দুই হাতে পদলুণ্ঠিতা রাজকুমারীকে তুলিতে তুলিতে কহিল,—"অপরাধ ক্ষমা কর বালা। সসম্মানে আজি তোমার মালা গ্রহণ করব; দাও দেবী"—কবি মস্তক নত করিল। আবেগোচ্ছ্বল হৃদয়ে কম্পিত হস্তে উর্ম্মিলা কবির কণ্ঠে মালা পরাইয়া দিল।

অনুরক্ত কবি উল্লাসে রাজকুমারীর হাত দুখানি চাপিয়া ধরিয়া পুলকিত কণ্ঠে কহিল,—"রাজকুমারী! চিরদিন এমনি ভক্তিই কি পাব আমি তোমার কাছে?"

কবির বুকে মাথা রাখিয়া উর্ম্মিলা বলিল,—"জীবনে এ সেবসেবার অধিকার হ'তে যেন বঞ্চিত না হই,—এই আশীর্ব্বাদই চাই আমি তোমার কাছে!" রাজকুমারীর সুরভি নিঃশ্বাস কবির দ্রুতস্পন্দিত বক্ষের উপর ছুটাছুটি করিতেছিল।

"সত্যই আজ আমি জয়ী উর্ম্মিলা"—কবির কণ্ঠ আবেগে ভাঙ্গিয়া পড়িল,—"ভগ্ন বীণায় আবার আমি ঝঙ্কার তুলবো,—ভাষায়,—ছন্দে,—মূর্চ্ছনায় আনন্দের চতুর্দ্দিকে সঙ্গীত-সাম্রাজ্যের সৃষ্টি করব,—সে রাজ্যের সম্রাজ্ঞী হবে তুমি!—আর হৃদয় বিনিময়ে সে সঙ্গীতকে মদির-মোহন করে তুলবো!"

স্বপ্নাবিষ্টের মত বিশ্বসেন ওষ্ঠদ্বয় কুমারী উর্ম্মিলার রক্তাভ গণ্ডে স্থাপন করিল।

শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়।

গৃহশিক্ষক

গোময় ও গোমূত্রের ব্যবহার

('কৃষক' হইতে উদ্ধৃত)

এতদ্দেশে অনেক কাজেই গো-ময় ব্যবহার হইয়া থাকে, কিন্তু গো-মূত্রের ব্যবহার হইতে প্রায়ই দেখা যায় না। সকলেই গো-ময় ও গো-মূত্রের সদ্ব্যবহার প্রায়ই জানেন না। বিনা কাজে প্রচুর পরিমাণে গোময়, স্থানে স্থানে নষ্ট হইয়া থাকে; এ বিষয়ে যদি একটু দৃষ্টি রাখা যায়, তাহা হইলে আমরা উক্ত গো-ময় সংগ্রহ করিয়া জমিতে ব্যবহার করিলে লাভবান হইতে পারি। বঙ্গ দেশে হিন্দু, মুসলমান প্রায় সকলেই গরু পুষিয়া, অল্লাধিক পরিমাণে গো-ময় পাইয়া থাকেন এবং চেষ্টা করিলে ঘাট মাঠ ও গো-চারণ ভূমি প্রভৃতি স্থান হইতে কতক পরিমাণে গো-ময় সংগ্রহ করিয়া উহা জমিতে ব্যবহারের উপযুক্ত করিতে পারেন। অধিকাংশ লোকই এ বিষয়ে উদাসীন; কাজেই প্রচুর পরিমাণে গোময় পাওয়া গেলেও যথাযথ ব্যবহার না হইয়া অধিকাংশই অপব্যবহার হইয়া থাকে। এদেশে গো-চারণের ভূমি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কাজেই গরু চরাইবার জন্য লোকে নানা প্রকার স্থান, যথা—ঘাট, মাঠ ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং যে সময়ে গরু, বাছুর ইত্যাদি ঐ সকল স্থানে থাকিয়া খাদ্য গ্রহণ করে, তখন তাহারা যে মল ত্যাগ করে তাহা প্রায়ই কেহ সংগ্রহ করিয়া কাজে লাগান না। আবার অনেকে জমি হইতে ফসল কাটিয়া লইবার পর ঐ সকল জমিতে চরাইয়া থাকেন, কিন্তু কেহ উক্ত স্থান হইতে গোময় সংগ্রহ করিয়া ব্যবহার করেন না। ঐরূপ স্থান হইতে গোময় সংগ্রহ করা অতি সহজ। কৃষকেরা মনে করিয়া থাকেন উক্ত গো-ময়দ্বারা জমির উন্নতি সাধিত হয়। ইহা একটি ভুল ধারণা মাত্র। কেন না কাঁচা গোময় ক্ষেত্রে ছড়াইয়া রাখিলে, তাহাতে ক্ষেত্রের উপকার না হইয়া বরং অপকারই হওয়ারই সম্ভাবনা। উহা ক্ষেত্রে রৌদ্রে শুকাইয়া, সারাংশ বাহির হইয়া যাস হয়, অথবা বৃষ্টিতে ধুইয়া বা পচিয়া নষ্ট হয়। অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে, কাঁচা গোময় ব্যবহারের জন্য ক্ষেত্রে পোকার উপদ্রব হয়। মনে করুন, আমরা যদি তিল বা সরিষা হইতে তৈল বাহির করিয়া লইয়া উহার ছাবড়া বা খইল তৈলের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করি, তাহাতে যেমন তৈলাক্ত পদার্থ না থাকায় উদ্দেশ্য সাধিত হয় না, সেইরূপ ঘাস বা শুষ্ক গোময় ব্যবহার করিলে, উহাতে সারাংশ না থাকায় উপকার হয় না; অথবা কাঁচা গোময় ব্যবহারে পোকার সৃষ্টি হয়।

সাধারণতঃ গোময় জুরির সারের জন্য ব্যবহৃত হয়। হিন্দুগণ এই গোময় দ্বারা উচ্ছিষ্ট স্থানও পরিষ্কার করি

থাকেন। ইহা ছাড়া অন্যান্য কাজেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এখানে অন্য প্রকার ব্যবহারের বিষয় বলিবার আমার ইচ্ছা নহে; কেবল মাত্র কিরূপে ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধির জন্য গোময় সংরক্ষণ ও ব্যবহার করিতে হয় ইহাই বলা আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু গোমূত্র যে একটি প্রধান সারবান্ পদার্থ একথা হয় ত অনেকেই জানেন না, কাজেই তাঁহারা অবহেলা করিয়া ইহার প্রতি দৃক্‌পাতও করেন না। গোময় অপেক্ষা গোমূত্রে সারের অংশ বেশী বিদ্যমান রহিয়াছে। এইজন্য শুধু গোমূত্র প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা বিধেয় নহে। (জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে সার প্রয়োগ করিলে যেমন জমির উর্ব্বরতা-শক্তি বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ আবার অত্যধিক পরিমাণে সার ব্যবহার করিলে উর্ব্বরতা-শক্তির বৃদ্ধি না হইয়া বরং অপকারই হয়)।

গোমূত্রে সোরার ভাগ বেশী পরিমাণে বিদ্যমান আছে। সোরা জমির পক্ষে বিশেষ উপকারী, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক ব্যবহৃত হইলে, অপকার করিয়া থাকে। আমাদের দেশে কোন কোন সময়ে দেখা যায় যে, গোশালার নিকট-বর্ত্তী ও মেঝের মাটী দিয়া সোরা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার মূল কারণ এই গোমূত্র ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

সাধারণতঃ আমাদের দেশে লোকে কোন এক খোলা (অনাবৃত) স্থানে গোময় আল্‌গা ভাবে জমা করিয়া রাখিয়া দেয়, তাহার কতক অংশ বৃষ্টিতে ধুইয়া এবং পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। গোময়ের কতক সারবান্ পদার্থ আল্‌গা থাকার দরুণ বায়ু কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। এরূপ সার জমিতে ব্যবহার করিলে, বড় কিছু ফল পাওয়া যায় না। কারণ রৌদ্রে, বৃষ্টিতে ও বায়ুতে, শুকাইয়া ধুইয়া এবং উড়িয়া উহার অধিকাংশ সারই নষ্ট হইয়া যায়। যাহা কিছু সামান্য সারের ভাগ থাকে তাহাতে আংশিক কিছু কাজ করিয়া থাকে। যদি একটু যত্ন করা যায় তাহা হইলে সমপরিমাণ গোময় দ্বারা দ্বিগুণ তিনগুণ, বা তদপেক্ষা বেশী কাজ করিয়া লইয়া লাভবান হইতে পারা যায়। অথচ খরচও বড় কিছু করিতে হয় না।

যাঁহাদের গরু আছে, তাঁহারা সকলেই গোময় সারের জন্য সংরক্ষণ করিতে পারেন। উন্নত প্রণালী অনুসারে গোময় রাখিতে হইলে নিয়লিখিত নিয়মানুসারে কার্য্য করা দরকার।

১। গোশালার নিকটবর্ত্তী বা অন্য কোন স্থানে ৭।৮ ফুট লম্বা, ৪.৫ ফুট প্রস্থ এবং ৩ কিম্বা ৪ ফুট গভীর একটি চৌবাচ্চা (গর্ত্ত) করিতে হইবে। এই গর্ত্ত গোময়ের পরিমাণ অনুসারে ছোট বা বড় করা যাইতে পারে। গর্ত্তের নিম্নদিক (তল) বেশ করিয়া এঁটেল মাটি দিয়া পিটাইয়া শক্ত করিয়া দিতে হইবে। উহার সঙ্গে কিছু পরিমাণে গোময় দিলে ভাল হয়। এরূপ করার উদ্দেশ্য এই যে, রক্ষিত সার হইতে জলীয় পদার্থ মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে না পারে। ঐ গর্ত্তের উপরে চারিদিকে অর্দ্ধ হস্ত বা এক হস্ত পরিমাণ উচু একটি আইল এমন ভাবে তৈয়ার করিতে হইবে যে, বর্ষার সময় উক্ত সারের গর্ত্তে চতুষ্পার্শ্বস্থ জল প্রবেশ করিতে না পারে। জল প্রবেশ করিলে সমস্ত পরিশ্রমই পণ্ড হইবে। উক্ত গর্ত্তের উপরে চারি কোণে ৪ খান বাঁশ বা অন্য কোন গাছের খুটী পুতিতে হইবে এবং উহার উপরে এক খানা খড়ের চালা তুলিয়া দিতে হইবে। যাহাতে ঐ চালা হইতে বৃষ্টির জল সহজে সরিয়া পড়ে সে জন্য এক দিক একটু ঢালু করিতে হইবে। চালার উচ্চতা গর্ত্ত অনুসারে হওয়া দরকার। যদি চালা বেশী উচু হয় তবে রৌদ্র প্রবেশ করিয়া গোময় শুষ্ক হইয়া যাইবে। এইজন্য উহা বেশী উচু হওয়া বিধেয় নহে। বৃষ্টির জল ও রৌদ্র হইতে রক্ষা করিবার জন্য চালা দেওয়া হইয়া থাকে।

২। উক্ত সারের গর্ত্তে গোময় এবং গোমূত্র সঞ্চয় করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়েও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। গো-শালার মেঝে সমতল না করিয়া এক দিকে একটু ঢালু করতঃ ঐ ঢালু দিকের শেষ প্রান্তে ড্রেন (নালা) করিতে হয়। ঐ নালা দিয়া যাহাতে গোমূত্র সহজে পড়িতে পারে সেইরূপ করা উচিত। যে স্থানে গোমূত্র জমা হয়, সেইস্থানে একটি মেটে বা অন্য কোন পাত্র এরূপ ভাবে বসাইয়া রাখিতে হইবে যে, অনায়াসে সমুদয় গোমূত্র ঐ পাত্রে আসিতে পারে। রাত্রে যে গোমূত্র জমা হয়, তাহা পরদিন প্রাতেই সংগ্রহ করা দরকার। এরূপ ভাবে কার্য্য করিলে রাত্রিকালের অধিকাংশ গোমূত্রই রক্ষা করা যাইতে পারে, কিন্তু দিনের বেলার গোমূত্র সংগ্রহ করা একটু কষ্ট-সাধ্য। প্রতিদিন সকাল বেলা গোশালা হইতে এবং অন্য স্থান হইতে (যদি পাওয়া যায়) গোময় সংগ্রহ করিবে। উক্ত গোময় পূর্ব্ব কথিত সারের গর্ত্তে প্রথমতঃ রাখিতে হইবে.

পরে উহার উপর গোয়ালের পতিত খড় ও আবর্জ্জনা ইত্যাদি রাখিয়া তাহার উপর সঞ্চিত গোমূত্র ছিটাইয়া দিবে। উহার সঙ্গে ৩।৪ দিন পর কিছু পরিমাণ গোয়ালের মাটী দিলে ভাল হয়। কারণ গোমূত্রের কিয়দংশ ঐ মাটিতে শুষিয়া লয়। দরকার হইলে, গোয়ালে নূতন মাটি দিয়া পূরণ করিবে। প্রতি দিনই সার সঞ্চিত করিয়া কোদাল বা অন্য কিছু দিয়া চাপিয়া সমতল ও শক্ত করিয়া দিবে। গোময় কখনও আলগা ভাবে রাখিতে নাই। যে পর্য্যন্ত গর্ত্ত পরিপূর্ণ না হয়, সে পর্য্যন্ত এইরূপে সার সঞ্চিত করিবে। গর্ত্তটি পরিপূর্ণ হইলে উহার উপর মাটি দিয়া লেপিয়া রাখিলে ভাল হয়। এইরূপে রক্ষিত সার আস্তে আস্তে গর্ত্তের ভিতরে সমভাবে পচিয়া অতি উত্তম ও মূল্যবান সারে পরিণত হইয়া, এক বৎসরে উহা জমিতে ব্যবহারের উপযুক্ত হয়। একটি গর্ত্ত পূর্ণ হইলে, পূর্ব্ব লিখিত মতে অন্য একটি গর্ত্ত প্রস্তুত করিবে। একজন গৃহস্থের সাধারণতঃ ২টি গর্ত্ত হইলেই চলে। এরূপ প্রস্তুত সার জমিতে ব্যবহার করিলে 'সাধারণ রক্ষিত সার' প্রয়োগ অপেক্ষা বেশী পরিমাণে ফসল পাওয়া যায়। ফসল করিবার অন্ততঃ একমাস পূর্ব্বে, জমির উর্ব্বরতা শক্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, পরিমাণানুযায়ী সার ক্ষেত্রে ছড়াইয়া, চাষ ও মই দিয়া মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দিতে হয়।

গবর্ণমেণ্ট কৃষিপ্রদর্শক, গাইবান্ধা,
শ্রীমহেন্দ্রকুমার দাস, (রংপুর)।

উপদেশ।—[১] খুব কম বিষয়েই স্বীকৃতি দিবে; যাহা স্বীকার করিবে তাহা করিতেই হইবে। [২] সদা সত্য বলিবে। [৩] কাহারও নিন্দা করিও না। [৪] ভাল-লোকের সংসর্গে থাকিবে; তেমন লোক না পাও, একাই থাকিবে। [৫] দয়ালু হওয়ার পূর্ব্বে ন্যায়পর হইও; দেনা না দিয়া দান করা ঠিক নয়! [৬] কোনরূপ জুয়াখেলার সংস্রব করিও না। [৭] কোনরূপ মাদকদ্রব্য ব্যবহার করিও না। [৮] সচ্চরিত্র থাকিবে; তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। [৯] পারগ পক্ষে কোন মতেই ধার করিও না। [১০] নির্দ্দোষ থাকিলে তবে সুখী হইতে পারে। [১১] তাড়াতাড়ি ধনী হইতে চেষ্টা করিও না—যদি ঐহিক উন্নতি চাও। [১২] লোকের সহিত কথা কহিবার সময় তাহার চক্ষুর দিকে চাহিও। [১৩] স্ত্রীকে প্রতিপালন করিবার শক্তি হওয়ার পূর্ব্বে বিবাহ করিতে নাই। [১৪] নিজের আয়ের ভিতরেই সকল খরচ করিবে। [১৫] কম বয়সে টাকা জমাইয়া বৃদ্ধাবস্থায় খরচ করিও। [১৬] যদি শোধ দিবার সুস্পষ্ট উপায় না দেখিতে পাও, তবে কখন ধার করিও না। সর্ব্বদাই সাবধানে থাকিবে। [১৭] লোভে পড়িবার অবস্থায় যাইও না; যদি লোভ সম্বরণ করিতে না পারি—সর্ব্বদাই এই ভয় করিবে। [১৮] সৎসঙ্গ এবং সৎকথা ধর্ম্ম রক্ষার জন্য প্রধান সরঞ্জাম। [১৯] অল্প আয়ে এবং নিশ্চিন্ত মনেই সুখ। [২০] নিজে নষ্ট না করিলে সচ্চরিত্রের মন প্রকৃত পক্ষে নষ্ট হয় না। [২১] জীবন যাত্রা এরূপ করা উচিত যে লোকে তোমার নিন্দা করিলে তাহা কেহ বিশ্বাস করিবে না। [২২] রাত্রে শয়ন কালে, সমস্ত দিন যাহা যাহা করিয়াছ তাহার সমালোচনা করিও। [ব্রাহ্মণের ত্রিসন্ধ্যায় ইহা করার বিধি—সকল দোষ তাহাতে ধরা পড়িবে এবং ঈশ্বর সহায়তায় তাহার ত্যাগ চেষ্টা হইবে।] [২৩] অলস হইও না। যদি হাতে কাজ না থাকে, মনের উৎকর্ষ সাধন (ভাল বই পড়িয়া) করিতে থাক।—(ইংরাজের সৎচিন্তা)।

HAND TO KEEP SOFT.

ইহা মহিলাগণের আবশ্যকীয়। ইহা দ্বারা হস্ত কোমল ও মসৃণ হইয়া থাকে।

মাল মসলা

গ্লিসিরিণ	১ আঃ
বে-রম	৩ আঃ
অয়েল কাজু-পটী	অর্দ্ধড্রাম
অয়েল বারগামট	" "

মিশ্রিত করিয়া রাত্রিকালে শয়নের পূর্ব্বে হাতে মাখিয়া শয়ন করিবে।

টাকের লোশন

ইহা দ্বারা টাক পড়া-মাথায় চুল হয়।

অডিকলন	৩ আউন্স
টিং ক্যানথারাইড	২ ড্রাম
অয়েল ল্যাভেণ্ডার	১০ ফোঁটা

ইহা দিবসে একবার বা অবস্থা বিশেষে দুইবার দেওয়া

খাইতে পারে। কিন্তু মাথায় ক্ষত থকিলে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

হোমিও-চিকিৎসা

অধিক মিষ্ট খাইয়া পেটের অসুখ হইলে আর্জ্জেণ্টাইন নাইট্রেট উপকারী।

মাথা ধরা যদি জোরে বাঁধিয়া রাখিলে উপশম পড়ে, তাহা হইলে ১।২ মাত্রা আর্জ্জেণ্টাইন নাইট্রেট সেবনে উপকার হইবে।

শিশু যদি স্পর্শ মাত্রেই রাগিয়া উঠে, গায়ে হাত দিতে না দেয়, সেখানে এণ্টিমক্রুড উপকারী হইবে। যদি নীচু করিলে ভয় পায়, বোরাক্স ৬ দিলে উপকার হইবে।

(কাজের লোক।

মিশরের স্বাধীনতা সংগ্রামের
ইতিহাস

খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৫১ সালে মিশর রোম কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। মিশর শস্যের ভাণ্ডার ছিল, কিন্তু রোম তাহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য শোষণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। দরিদ্র বুভুক্ষিত লোক আর সে যাতনা সহিতে পারিল না। আর যে রাজা হয় হউক, রোমের অধঃপতন হউক, সকলের মনে এই আকাঙ্খা জাগিয়াছিল। ৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে পারস্য যখন মিশর আক্রমণ করে, তখন ঐ দেশের অধিবাসীরা তাহাকে মনপ্রাণের সহিত সাহায্য করিয়াছিল। সেই সাল হইতে পারস্য মিশরের প্রভু হইল। পারস্য পরদেশ শাসন করিতে জানে না। মিশরীদিগকে তাহারা সন্তুষ্ট করিতে পারিল না। ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে আরব মিশর আক্রমণ করিতে আসিল, মিশরীরা মনে করিল, আরবের শাসনে তাহাদের বুঝি সুখ হইবে। তাই তাহারা আরবের সাহায্য করিল, পারস্যের অধিকার বিলুপ্ত হইল।

বাগদাদের খলিফারা ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৮৬৮ অব্দ পর্য্যন্ত মিশরের রাজা ছিলেন। তাঁহাদের শাসনে মিশরে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল, মিশর ধনৈশ্বর্য্যে পূর্ণ হইয়াছিল।

৮৪৮ অব্দে বোখারা-নিবাসী আমোদর ইবন তুলুন নামক একজন তুর্কি দাস মিশরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। তিনি বাগদাদের খলিফাকে অগ্রাহ্য করিয়া মিশরে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। তখন মিশরের রাজস্বের পরিমাণ ৭॥০ ক্রোড় টাকা ছিল।

৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে টিউনিসের ফতেমা খলিফা মিশর দখল করেন। ১১৬৯ অব্দ পর্য্যন্ত মিশর তাঁহাদের দখলে ছিল। তাঁহারা মিশরেই বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, সুতরাং ধনধান্য আর বিদেশে যাইত না।

ক্রুসেড যুদ্ধের সময় মিশরে আবার গোলযোগ হয়। ১১৭১ অব্দে সালাদিন মিশরের কর্ত্তা হইলেন। তাঁহার ২২ বৎসরের রাজত্বে মিশরের অশেষ কল্যাণ হইয়াছিল।

ইহার পর আয়ুবিদ বংশ মিশরের রাজা হইয়া তাহার অনেক শ্রীবৃদ্ধি করেন। কিন্তু ১২৫০ অব্দে মামেলুক দাসেরা মিশর দখল করিয়া ১৫১৭ অব্দ পর্য্যন্ত ঘোর অত্যাচার করে; মিশর অতি দৈন্য দশায় উপনীত হয়।

মিশরীদের সহানুভূতি লাভ করিয়া তুর্কিরা মামেলুক-দিগকে পরাভূত করে। কিন্তু তুর্কি-শাসনে মিশর আরও দরিদ্র হইয়া পড়ে।

১৭৯৮ অব্দে নেপোলিয়ন মিশর দখল করেন, কিন্তু ইংরেজেরা ১৮০১ সালে ফরাসীদিগকে তাড়াইয়া দেন এবং ১৮০৫ সালে মহম্মদ আলি মিশরের রাজা হন। তিনি ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিবার লালসায় ইউরোপীয় বণিকদিগকে মিশরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন। মহম্মদের বংশধর ইস্মাইল ১৮৬৩ হইতে ১৮৭৯ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন, কিন্তু তিনি এমন অপব্যয়ী ছিলেন যে, ইউরোপীয় বণিকদের নিকট ১৪৫॥ ক্রোড় টাকা ধার করিতে বাধ্য হন।

তখন ইংলণ্ড ও ফ্রান্স স্বদেশী উত্তমর্ণদের সাহায্যের জন্য মিশরের রাজস্বের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। একজন ইংরেজ ও একজন ফরাসী রাজস্ব কণ্ট্রোলার নিযুক্ত হন। এইরূপে মিশরে দুই রাজা হন। এক রাজা ইস্মাইল, আর এক রাজা ইংলণ্ড ও ফ্রান্স।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ইস্মাইল রাজপদ ত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র টিউফিক রাজা হন। তিনি কোন কাজের লোক ছিলেন না, ইউরোপীয় হাবভাবের অনুকরণ করিতেন। সুতরাং মিশরীরা আরাবী পাশাকে নেতৃপদে বরণ করিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ১৮৮১ সালে টেলিল কেবিরের যুদ্ধে আরাবী বন্দী হন, মিশরী সৈন্যদের অস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হয়।

১৮৮২ সাল হইতে তুরস্কের সুলতান মিশরের অধিরাজ, টিউফিক ও তাঁহার পুত্র আব্বাস মিশরের রাজা নামে আখ্যাত হইতেন; কিন্তু ইংরেজ প্রতিনিধিই প্রকৃত রাজা ছিলেন।

১৯০৪ সালের ৮ই এপ্রিল ইংরেজ ও ফরাসীর মধ্যে এই সন্ধি হয় যে, মিশরে তখন যেরূপ শাসন ছিল তাহাই থাকিবে, ইংলণ্ড যাহা করেন, তাহাতে ফরাসী কোন আপত্তি করিবেন না। ইংলণ্ড যতকাল ইচ্ছা মিশরের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারিবেন।

উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারীদের অর্দ্ধেক মিশরী, অর্দ্ধেক ইউরোপীয়। ইউরোপীয়দের মধ্যে ইংরেজ অর্দ্ধেক, ফরাসী এক চতুর্থাংশ ও ইটালীয়ান এক চতুর্থাংশ।

বিচার আদালতের উচ্চপদে অর্দ্ধেক মিশরী ও অর্দ্ধেক ইংরেজ নিযুক্ত আছেন।

পূর্ত্তবিভাগের উচ্চপদস্থ প্রায় সমস্ত কর্ম্মচারীই ইংরেজ।

সৈন্যাধ্যক্ষগণ সকলেই ইংরেজ। মিশরী সৈন্য সংখ্যা ১৫৯১৬ ও কামান সংখ্যা ২৫০। ৩৭২২ জন ইংরেজ সৈন্য মিশরে অবস্থিতি করে।

মিশরের বাণিজ্য ব্যবসায়ের অর্দ্ধেক ইংলণ্ডের সহিত হইয়া থাকে।

যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মিশরের ঐরূপ দশা ছিল। ("সঞ্জীবনী")

মিশরের স্বাধীনতা

গত বকর-ইদের দিন সংবাদ আসিয়াছে, মিশর স্বাধীন হইয়াছে। বর্ত্তমান মিশরের ইতিহাস য়ুরোপের পক্ষে গৌরবের ইতিহাস নহে—পরন্তু দুর্ব্বলের উপর সবলের স্বকৃত অধিকারের উদাহরণ। মিশর তুর্ক-সাম্রাজ্যের অধীন ছিল এবং খদিব বা শাসনকর্ত্তা তুর্কীর হইয়া সে দেশ শাসন করিতেন। তবে সর্ব্বত্র যেমন, মিশরেও তেমনই খদিব নামমাত্রই অধীন ছিলেন—তিনি নির্দ্ধারিত রাজস্ব দিয়া মিশরের শাসন কাজ চালাইতেন—তুর্কীর সুলতান তাহাতে প্রায়ই হস্তক্ষেপ করিতেন না। তুর্কীর পক্ষে সুদূর মিশরে উপযুক্তরূপে শাসনদণ্ড পরিচালন সম্ভব না থাকায়, তুর্কী খদিবের নামমাত্র অধীনতা-স্বীকার ও রাজস্ব লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন; খদিব মিশরের শাসনব্যাপারে নিরঙ্কুশই ছিলেন।

খদিব ইসমাইল অমিতব্যয়ী হইয়া বহু টাকা ধার করেন। ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের ঋণদাতারা মিশরের খদিবকে টাকা ধার দেন। শেষে যাঁহারা খদিবের পক্ষে কাজ করিতেন তাঁহাদের মধ্যে একজন ক্ষুণ্ণ হইয়া ঋণদাতৃগণকে ভয় দেখাইলে বিলাতী সরকার ও ফরাসী সরকার মিশরের শাসন-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। কোন্ অধিকারে যে তাঁহারা এই কাজ করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় তাঁহারাও বলিতে পারেন না। তদবধি মিশরে বিদেশীর প্রাধান্যই বাড়িতে থাকে এবং একবার আরবী বের নেতৃত্বে মিশরীরা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও করে। মিঃ গ্লাডষ্টোন তখন বিলাতের প্রধান মন্ত্রী; তখন তিনি মিশরে বিদ্রোহ দমনের জন্য সেনাদল প্রেরণ করেন—তাহারা তথায় রহিয়াই যায়। তখন ফরাসীতে ইংরাজে যে বিশেষ সদ্ভাব ছিল এমনও নহে। অথচ সুয়েজ খাল বেহাত হইলে ইংরাজের ক্ষতি অনিবার্য্য। এইরূপে নানা কারণে ক্রমে মিশরে বিদেশীর প্রাধান্য বর্দ্ধিত হয়। দুর্ব্বল ফ্রান্স ইংলণ্ডের ক্রমবর্দ্ধনশীল প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিতেও পারে নাই। একবার ফরাসীর পক্ষে মেজর মার্চাণ্ড ইংরাজের অতিরিক্ত ক্ষমতার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইহার পর জার্ম্মাণ যুদ্ধে মিশরের খদিব তাঁহার প্রভু সুলতানের পক্ষ লইলে ইংরাজে ফরাসীতে রফা বন্দোবস্ত মতে নূতন একজন শাসককে সুলতান করিয়া মিশরে বসান হয় এবং তথায় ইংরাজের প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত হয়।

যুদ্ধের পর মিশরে প্রজা সাধারণের মধ্যে বিক্ষো

বিক্ষোভ লক্ষিত হয়। শেষে এই সংবাদ আসিয়াছে যে, নূতন সন্ধিসর্ত্ত স্থির করা হইল। তাহাতে ইংলণ্ড মিশরের স্বাধীনতা স্বীকার করিলেন। কিন্তু আর যে সব সর্ত্ত দেখিতেছি, তাহাতে এই স্বাধীনতার স্বরূপ দেখিয়া তাহাকে স্বাধীনতা বলা যায় না। সর্ত্ত এইরূপ—

(১) ইংলণ্ড মিশরের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিতেছেন এবং বিদেশীর আক্রমণ হইতে মিশরের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইতেছেন।

(২) মিশরও সে দেশে ইংরাজের Privileged position বা বিশেষ অধিকার স্বীকার করিতেছেন এবং যুদ্ধকালে মিশরে ইংরাজের যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দিতে সম্মত হইতেছেন।

(৩) ইংরাজ সুয়েজখালের নিকটে (সম্ভবতঃ ইস্মাইলিয়া ও পোর্ট সইদের মধ্যস্থলে কাণ্টারায়) একদল সৈনিক রাখিবেন।

(৪) মিশর অন্যান্য দেশের সঙ্গে তাহার রাজনৈতিক সম্বন্ধ বিষয়ে যথেচ্ছা ব্যবস্থা করিতে পারিবেন এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশে আপনার দূত রাখিতে পারিবেন। কিন্তু বৃটিশনীতির বিরোধী কোন সন্ধিসর্ত্তে বদ্ধ হইতে পারিবেন না।

(৫) হাই কমিশনার (বৃটিশ), বিদেশীদিগের সম্পর্কীয় আইন বিধিবদ্ধ হইতে না দিতেও পারিবেন—সে অধিকার তাঁহার থাকিবে। এখন যে সব বিভাগে মন্ত্রীদিগকে পরামর্শ দিবার জন্য বিদেশী পরামর্শদাতা আছেন, তাহা আর রাখা হইবে না, তবে বর্ত্তমান ঋণ কমিশনের কাজ চালাইবার জন্য একজন বৃটিশ কর্ম্মচারী থাকিবেন। আর এক জন বিদেশী-দিগের সম্বন্ধীয় আইন প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন এবং মিশর সরকার ইচ্ছা করিলে এই সব কর্ম্মচারীর পরামর্শ লাভ করিতে পারেন।

(৬) বৃটিশ কর্ম্মচারীদিগকে নিরাপদ রাখিবার দায়িত্ব মিশর সরকার গ্রহণ করিবেন; যাঁহাদিগকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইবে বা যাঁহারা কর্ম্মত্যাগ করিবেন, তাঁহাদিগকে উদার-ভাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে। ভবিষ্যতে যে সব বৃটিশ-কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করা হইবে, তাঁহারা মিশরী কর্ম্মচারী-দিগের কাছে জবাবদিহি করিতে বাধ্য থাকিবেন।

না—বৃটিশের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এই সন্ধি হইতেছে। বৃটিশ যদি মিত্রভাবে মিশরে থাকিতেন, সে স্বতন্ত্র কথা হইত। কিন্তু এই যে সব সর্ত্ত, ইহাতে প্রভুত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। মিশরে ইংরাজের যে Privileged position রহিল, তাহার মাত্রা কতদূর? এই কথায় ত এমনও বুঝাইতে পারে যে, বৃটিশের যাহাতে আপত্তি থাকিবে, মিশরী সরকার তাহা করিতে পারিবেন না। শুনা যাইতেছে, মিশরের দূতরা বিলাত হইতে ফিরিবার পূর্ব্বে মিশরের জাতীয়দল এই সন্ধি সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছে।

কাণ্টারায় বৃটিশ সেনাদল থাকিবে। অবশ্য সুয়েজ খালে ইংরাজের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখা প্রয়োজন—নহিলে ভারতের পথ বন্ধ হইবে। এই ভয়ে ফরাসীর সঙ্গে একবার ইংরাজের মনোমালিন্য ঘটে। ফ্রান্স যখন সুয়েজ খালে খদিব ইস-মাইলের অংশগুলি কিনিবার আয়োজন করেন, বৃটিশদূত তখন তাহা জানিতে পারেন নাই। কিন্তু কোন সংবাদপত্র সম্পাদক তাহা জানিতে পারিয়া প্রধান মন্ত্রীর গোচর করেন এবং রাতারাতি বন্দোবস্ত করিয়া ইংলণ্ড সে অংশ কিনিয়া লয়েন। তদবধি সুয়েজ খালে ইংরাজেরই প্রাধান্য। আরবী বে যখন মিশরে জাতীয় দলের নেতা হইয়া বিপ্লব ঘটান, তখন কেহ কেহ তাঁহাকে জাহাজ ডুবাইয়া সুয়েজ খাল বন্ধ করিয়া দিতে বলেন তিনি তাহা করেন নাই, কিন্তু করিলে ফল কিরূপ হইত বলা বাহুল্য। বাস্তবিক সুয়েজ খালের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে সামান্য চেষ্টাতেই সে খাল বন্ধ করা সম্ভব। সুতরাং সুয়েজ খাল রক্ষা করিবার জন্য কাণ্টারায় ইংরাজবাহিনী রাখার কারণ সহজবোধ্য। কাজেই কাণ্টারায় ইংরাজ বাহিনী থাকিতে পারে। প্যালেষ্টাইনের যুদ্ধের সময় এই কাণ্টারাতেই ইংরাজের স্কন্ধাবার ছিল।

কিন্তু কেবল সুয়েজ খাল রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়াই ইংরেজ ক্ষান্ত হয়েন নাই। মিশর সরকার বিদেশীদিগের সম্বন্ধে যে সব আইন প্রণয়ন করিবেন, হাই কমিশনার নামঞ্জুর করিলে সে সকল বাতিল হইয়া যাইবে। এ ব্যবস্থার সহিত সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সামঞ্জস্য সাধন সম্ভব হয় না। মিশরের নবগঠিত প্রতিনিধি সভার প্রতি ইহাতে বিশ্বাস ব্যক্ত

এই স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বলা যায় না। কেন হয় না? ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী, মার্কিণ আর কোন দেশে

কি এমন কোন ব্যবস্থা আছে ? মিশরীরাই যখন স্বদেশের শাসনের জন্য দায়ী, তখন তাহারা আপনাদের স্বার্থ ও সুবিধা বুঝিয়াই আইন করিবে। সে বিষয়ে তাহাদের ক্ষমতা যদি কোন বিদেশী কর্ম্মচারী অধীনে পরিচালনা করিতে হয়, তবে স্বাধীনতার স্বরূপ নষ্ট হয় এবং দেশে দেশের প্রতিনিধি-সভার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। মিশরীরা যে অন্যান্য জাতির সঙ্গে ব্যবহারে আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতির মূল সূত্র বিস্মৃত হইতেও পারে---এমন সন্দেহ করিবার কারণ কি ?

বর্ত্তমানে সব বিভাগেই বৃটিশ পরামর্শদাতাদিগের প্রাধান্য। ভবিষ্যতে তাহা হইবে না। কিন্তু একজন বৃটিশ কর্ম্মচারী ঋণ কমিশনের কাজের ভার পাইবেন। এ বিষয়ে আমাদের একটু জানিবার বিষয় আছে। এই যে ঋণ ইহা কাহার ? খদিব ইস্মাইলের আমলের যে ঋণ, যে ঋণের জন্য মিশরের কৃষকপ্রজা (ফেলাহিন) অত্যাচারে জীবন্মৃত হইয়াছিল যে ঋণের সূত্র ধরিয়া মিশরে বিদেশীর আগমন ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা, এ কি সেই ঋণ ? যদি তাহাই হয়---যদি মিশরী সরকার সে ঋণ সরকারী, অর্থাৎ জাতির ঋণ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া থাকেন, তবে ত মিশরের রাজস্ব---ভূমিকর বা শুল্ক প্রভৃতি---তাহার জন্য দায়ী। তবে আবার সেই ঋণের জন্য বিদেশী কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হয় কেন ? যে সভ্য সরকার জাতীয় ঋণের দায়িত্ব গ্রহণে অসম্মত সে সরকার তিষ্ঠিতে পারেন না। জাতীয় ঋণ জাতিকেই শোধ করিতে হইবে। তবে আবার মিশরের রাজস্বের উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য এক জন বিদেশী কর্ম্মচারী বাহাল করা কেন ?

এইরূপ ব্যবস্থায় মিশরীরা সন্তুষ্ট হইবে কি না, সন্দেহ। মিশরে অসন্তোষ অতি প্রবল ভাবেই আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে---বহুবার বিপ্লব হইয়াছে এবং মিশরীর রক্তে মিশরের ভূমি সিক্ত হইয়াছে। মিশরে যে জাতীয় দলের আবির্ভাব হইয়াছে, সে দল দেশের স্বাধীনতাই চাহে। আরবীবের আমল হইতে এই জাতীয় দলের পুষ্টিই সাধিত হইয়াছে, সে দলকে দমন করিবার চেষ্টাও যে সর্ব্বতোভাবে ফলবতী হইয়াছে এমন নহে। ("বসুমতী")

'বেঙ্গলী' পত্রিকা মিশরের স্বাধীনতা লাভের সংবাদ পাইয়া লিখিতেছেন, মিশর যে স্বাধীন রাজ্যনিচয়ের পর্য্যায়ভুক্ত হইল---ভারতবর্ষ এ সংবাদে উল্লসিত হইয়া উঠিবে। দূর অতীতের সেই অস্পষ্ট যুগে যখন ইতিহাসের সৃষ্টি হয় নাই, যখন মানব সমাজের সবেমাত্র শৈশব, সেই সময় মিশর, ভারত এবং চীন সভ্যজাতির শীর্ষস্থানে ছিল। জগতে সভ্যতার আলোক ইহারাই জ্বালাইয়াছিল। ইউরোপ তখন গভীর অজ্ঞানতার অন্ধতমসায় সমাচ্ছন্ন। প্রাচ্যের সভ্যতার রশ্মিই প্রতীচ্যে বিকীরিত হয়। রোমরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার বহুপূর্ব্বে, ক্যালডিয়া, ব্যাবিলন এবং আসিরিয়া অভ্যুত্থিত হইবার অনেক আগে, গ্রীসের নাম জগতে রটিবার বহুপূর্ব্বে ভারত, মিশর এবং চীন জাগ্রত হইয়াছিল। প্রাচীন সভ্যতায় সমৃদ্ধ সেই মিশর যে আজ স্বাধীনতা লাভ করিল, ইহাতেই বুঝা যায় যে, শ্মশানের ভস্মস্তূপ হইতে মরা আবার বাঁচিয়া উঠিতেছে।

'অমৃতবাজার পত্রিকা' বলিয়াছেন---মিশর স্বাধীনতা পাইল, এ খবর শুনিয়া যে আমরা কত সুখী তাহা বলিবার নহে। মিশরের স্বাধীনতা লাভে আমরা নূতন আলোকের আভাস পাইতেছি---জগতে স্বাধীনতা, শান্তি এবং সমৃদ্ধির এক নূতন যুগ আসিতেছে।

কংগ্রেস প্রসঙ্গ

কলিকাতায় বিশেষ অধিবেশন

কলিকাতায় এবার কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। পাঞ্জাব-বৃত্তান্ত ও খিলাফৎ সমস্যা সম্বন্ধে ভারতবাসীর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ এই অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল। গত ৪ঠা, ৬ই, ৮ই, ৯ই সেপ্টেম্বর এই চারি-দিন সভার বৈঠক হয়। প্রথম দিন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ও তৎপর কংগ্রেসের নির্ব্বাচিত সভাপতি লালা লাজপৎ রায় মহোদয়ের অভিভাষণ পঠিত হয়। দ্বিতীয় দিনে চারিটি প্রস্তাব

কর্তৃক পরিগৃহীত হয়। তৃতীয় দিনে সরকারের সহিত সহযোগিতা বর্জন নীতি-বিষয়ক প্রস্তাব মহাত্মা গান্ধী উপস্থিত করেন এবং শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় তৎ-সম্বন্ধে একটি সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থিত করেন। উক্ত উভয় প্রস্তাব সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বাদানুবাদ হওয়ার পর ডেলিগেট-গণের ভোট গ্রহণ করা হয়। প্রচলিত রীতি অনুসারে উভয় প্রস্তাবের স্বপক্ষে ভোটদাতাগণের সম্মতি পর পর হাত তুলিয়া জ্ঞাপন করিতে বলা হয়। তাহার ফলে মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবের স্বপক্ষে অধিকাংশের সম্মতি থাকা সভাপতি মহাশয় সাব্যস্ত করেন। কংগ্রেসের নিয়মানুযায়ী উভয় পক্ষের ভোট গণনার জন্য প্রস্তাব করায় ৪র্থ দিন ঐ গণনার জন্য নির্দ্দিষ্ট করা হয়। ৪র্থ দিন প্রাতঃকাল ৮টা হইতে বেলা ১টা পর্য্যন্ত পর পর প্রত্যেক প্রদেশের ডেলিগেটগণ কংগ্রেস মণ্ডপে উপস্থিত হন ও প্রত্যেক প্রদেশের উভয়-পক্ষের ভোট গণনা করা হইতে থাকে। বেলা ২টার সময় ৪র্থ দিনের অধিবেশন আরম্ভ হয় মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাব অধিকাংশ ভোটদ্বারা সমর্থিত হওয়ায় সভার প্রস্তাবরূপে পরিগৃহীত হয়। তৎপর সভাপতি মহাশয় তাঁহার বিদায় সম্ভাষণ জানাইলে অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে কতিপয় সভ্য তাঁহাদিগের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ও সভার কার্য্য শেষ হয়।

প্রথম দিন

যথারীতি শোভাযাত্রা সহকারে সভাপতি মহোদয় মণ্ডপে আনীত হইলে গায়ক গায়িকারা সভাসূচনা করিয়া গাহিলেন —

"বন্দে মাতরং
সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরং।" ইত্যাদি

১। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির বক্তৃতা

মিঃ চক্রবর্ত্তী উপস্থিত প্রতিনিধি ও দর্শক মণ্ডলীকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়া মিঃ তিলকের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন —

[ক] অশান্তির মূল কারণ -

তিনি বলেন, ভারতের সমৃদ্ধি লুণ্ঠনের নিমিত্ত বৃটিশ বণিক বাণিজ্য-ব্যপদেশে ভারতবর্ষে আগমন করে। ইহাই ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের মূল কারণ। বহুকাল যাবৎ এই লুণ্ঠনে ভারতবর্ষ শীর্ণ বিশুষ্ক হইতেছিল, এক্ষণে আমাদের জাতীয় সত্তা বিলোপের মহা আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। সুসভ্য দেশ সমূহে সর্ব্বত্র মৃত্যুর সহিত তুলনায় জন্মহার অধিক, কিন্তু ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে জন্ম হইতে মৃত্যুর হার অধিক হওয়ার জনসংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে। আমরা যদি এই দুর্গতির প্রতিকার করিয়া মৃত্যু-স্রোতের গতি মন্দীভূত করিতে না পারি তাহা হইলে আমাদের অবস্থা আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের ন্যায় হইবে।

ভারতবর্ষ যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার সহিত আপনার সামঞ্জস্য বিধানে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে আমরা যে অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছি উহা অন্যরূপ। যে জাতি আমাদের উপরে রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে এই বিরোধ তাহাদের সহিত। বিরোধ কেবল রাজনৈতিক নহে, ইহা অর্থ-নৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক। বৃটিশের আগমনের পর হইতেই এই দেশ-বাসীদের সহিত তাহাদের অর্থনৈতিক বিরোধ চলিতেছে। বৃটিশেরা যখন ভারতবর্ষে আইসে তখন আমরা কৃষি ও শ্রমশিল্পজীবী জাতি ছিলাম। বৃটিশেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক আমাদের শ্রমশিল্প সমূহের বিনাশ সাধন করিয়াছে।

গত ১৫০ বৎসর বিদেশীরা ভারতের সমৃদ্ধি লুণ্ঠন করিতেছে। এক্ষণে এই দেশে যে সকল নূতন নূতন শ্রম-শিল্পের উদ্ভব হইতেছে উহার দ্বারা বিদেশী মহাজনেরা লাভবান হইতেছে, ভারতের অর্থ বিদেশে যাইতেছে। ভারতবর্ষ কুলীর কার্য্য করিয়া মজুরী পায় এই পর্য্যন্ত। কিন্তু কুলীরা যাহা পায় সেই অর্থেরও অধিকাংশ বিদেশীরা পায়, কারণ মূর্খ শ্রমীরা নূতন আমদানী করা বিদেশীয় বিলাস দ্রব্য ক্রয় করিয়া তাহাদের উপার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশ বিদেশীয় হস্তে অর্পণ করিয়া থাকে। ইংলণ্ড ও আমেরিকার শ্রমীরা যাহা উপার্জ্জন করে উহা তাহাদের স্বদেশেই থাকে, কিন্তু ভারতের শ্রমজীবীদের সামান্য উপার্জ্জনের বেশীর ভাগ অর্থ বিদেশে চলিয়া যায়। আমরা যখনই এই সকল বিষয় আলোচনা করি তখনই ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের মূল কারণ সুস্পষ্ট দেখিতে পাই।

বৃটিশেরা এই দেশে ব্যবসায়ে টাকা খাটাইয়া যদি

হইতেছে। ইংরাজ বন্ধুরা বলেন, বৃটিশেরা ভারতে নানা শ্রমশিল্পের বিকাশ সাধন করিয়াছেন। কিন্তু উহাতে কে লাভবান্ হইতেছে? বৃটিশেরা আপনাদের ধনাগমের সুবিধার জন্যই উহা করিতেছেন। উহাতে আমাদের কোন লাভ নাই।

(খ) পঞ্জাব

আমরা যখন অমৃতসরে জাতীয় মহাসমিতিতে মিলিত হইয়াছিলাম তখন হাণ্টার কমিটি এবং আমাদের কংগ্রেস সব্ কমিটির তদন্ত চলিতেছিল। এক্ষণে উভয় কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। আপনারা উহার বিচার করুন।

(১) কংগ্রেস কমিটির রিপোর্ট

কংগ্রেস কমিটির রিপোর্ট আমাদেরই কার্য্য। কিন্তু এই কমিটির সভ্যগণ যে অপূর্ব্ব রিপোর্ট রচনা করিয়াছেন, লোক দেখানো বিনয়ের বশবর্ত্তী হইয়া আমি উহার প্রশংসা-কীর্ত্তনে বিরত থাকিতে পারিব না। সংক্ষেপতঃ বলিতেছি. আমি ঐ রিপোর্টের প্রত্যেক বাক্যের, প্রত্যেক অনুমোদনের সমর্থন করিতেছি। আমার একমাত্র বিবাদের বিষয় এই যে. কমিটি যে অনুমোদনগুলি করিয়াছেন সেইগুলি বড়ই মৃদু, বড়ই নরম। কংগ্রেস সব-কমিটি সুস্পষ্টই দেখাইয়া দিয়াছেন :—

১। পঞ্জাবে কোন বিপ্লব বা বিদ্রোহ ঘটে নাই, স্থানে স্থানে যে হাঙ্গামা হইয়াছিল শাসন কর্ত্তৃপক্ষের অনাবশ্যক হস্তক্ষেপেই সেই সকল ঘটিয়াছে, সুকৌশলে কার্য্য করিলে সিবিল কর্ম্মচারীরাই সেই হাঙ্গামা নিবারণ করিতে পারিতেন।

২। সত্যাগ্রহ হাঙ্গামার কারণ নহে। সার মাইকেল ওডায়ারের অনুদার কঠোর শাসন স্থানীয় ঘটনা সমবায়ে হাঙ্গামা উৎপাদন করিয়াছে। তাঁহার সৈন্য সংগ্রহের কঠোর পদ্ধতি, আয়কর আদায়ের পীড়ন এবং লোকের আর্থিক দুর্গতি হাঙ্গামার মূল কারণ।

৩। সামরিক আইন পরিবর্ত্তনের হেতু দর্শাইবার জন্য সার মাইকেল ওডায়ার অর্ব্বাচীনের মত হাঙ্গামাকে বিপ্লব করিয়া তুলিয়াছিলেন। পঞ্জাববাসীর রাজনৈতিক জীবন সর্ব্বথা চূর্ণ করিবার নিমিত্তই সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল।

৪। পঞ্জাবে যে যৎকিঞ্চিৎ হাঙ্গামা ঘটিয়াছিল, তাহা সামরিক শাসন পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে অথবা অব্যবহিত পরেই নিবারিত হইয়াছিল। তথাপি জুনের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত সামরিক শাসন চালাইবার পক্ষে কোন যুক্তিসঙ্গত হেতু দৃষ্ট হয় না।

৫। অমৃতসর, লাহোর এবং গুজরানওয়ালার সামরিক শাসন যে বর্ব্বর ও নিলর্জ্জ উৎপীড়ন করিয়াছে উহা মানব সভ্যতার দুরপণেয় কলঙ্ক হইয়া থাকিবে।

৬। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড একান্ত নির্ম্মম আতঙ্কের ব্যাপার। বিনা উত্তেজনায় এই কার্য্য আরব্ধ হয়, নির্ম্মমভাবে এই হত্যা করা হইয়াছিল, মৃত ও আহতদের প্রতি পশুবৎ অবহেলা প্রদর্শন করা হইয়াছিল।

অখণ্ডনীয় সাক্ষ্যদ্বারা উল্লিখিত বিষয়গুলি প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

(২) হাণ্টার কমিটির রিপোর্ট

হাণ্টার কমিটির সভ্যগণ জাতিগত ভাবে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। দুই দলের নিকটে একই সাক্ষ্য উপস্থাপিত হইয়াছিল। সার মাইকেল ওডায়ার, মিঃ চিফ সেক্রেটারী টমসন, তিওয়ানের সর্দ্দার এই তিনজন ব্যতীত অপর সকলের সাক্ষ্য আমরা পাঠ করিয়াছি। ঐ সাক্ষ্য হইতে ভারতীয় কমিশনারগণ যে রিপোর্ট দিয়াছেন, তদ্ব্যতীত অপর সিদ্ধান্তে কিরূপে উপস্থিত হওয়া যায় আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। তবে ইউরোপীয় কমিশনারগণ পূর্ব্ব হইতেই পঞ্জাবের ব্যাপারটার উপর চুণকাম করিয়া উহা ঢাকিয়া ফেলিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। জেনারেল ডায়ারের দোষ ঢাকিবার জন্য বিধিমত চেষ্টা হইয়াছে, তবু সেই চেষ্টা সফল হয় নাই।

ভারত গবর্ণমেণ্টের মন্তব্যে হাণ্টার কমিটির ভারতীয় ও ইউরোপীয় সভ্যদের মতবিরোধ খর্ব্ব করিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু উভয় দলের অনৈক্য মৌলিক, তীব্র ও প্রশস্ত। ইউরোপীয় কমিশনারগণের রিপোর্টে সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব, সাক্ষ্যের অসম্পূর্ণ বিচার এই দুই কলঙ্ক রহিয়াছে। ভারতগবর্ণমেণ্টের মন্তব্যে স্বীকৃত হইয়াছে :—

(১) জেনারেল ডায়ার সভা বন্ধের যে হুকুম দিয়াছিলেন সেই হুকুম আরও উত্তমরূপে প্রচার করা উচিত ছিল।

(২) জালিয়ানওয়ালাবাগ এবং বিশাখী মেলার বিজ্ঞাপন প্রচার করা সঙ্গত ছিল না।

(৩) জালিয়ানওয়ালাবাগে গুলি চালনার পূর্ব্বে জেনারেল ডায়ারের লোককে সতর্ক করিয়া দেওয়া উচিত ছিল।

(৪) জেনারেল ডায়ারের ক্রমাগত গুলি চালনা কার্য্য কোনক্রমে সমর্থিত হইতে পাবে না।

এই সকল স্বীকার করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের মন্তব্যের উপসংহারে লিখিত হইয়াছে, জেনারেল ডায়ার সরল বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিয়াছেন। তিনি যাহা ভাল মনে করিয়াছিলেন তাহাই করিয়াছিলেন।

জেনারেল ডায়ারের সমর্থনকারীদের মুখে তাঁহার "সরল বিশ্বাস" এবং "ভ্রমপূর্ণ কর্ত্তব্য বোধ" এই কথা শুনিয়া আমরা তিক্তবিরক্ত হইয়া উঠিয়াছি।

মিঃ মণ্টেগু ভারতগবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি করিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন।

(গ) খলিফাৎ প্রসঙ্গ

মিঃ মহম্মদ আলি ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ্জের সহিত সাক্ষাৎকার কালে বলিয়াছেন, মুসলমানদের ধর্ম্মবিশ্বাস দুইটি কেন্দ্র অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। একটি ব্যক্তিগত, অপরটি স্থানগত। ব্যক্তিগত কেন্দ্র বলিতে আমরা তুরস্কের বাদসাহকে বুঝি, তিনি মহাপুরুষ মহম্মদের উত্তরাধিকারী। তুরস্কের বাদসাহ অর্থাৎ খলিফা মুসলমানদের নেতা; নায়কোচিত গৌরব রক্ষার জন্য তাঁহার যথোচিত রাজ্য সম্পদ থাকা আবশ্যক।

আরব মুসলমানদের ধর্ম্ম বিশ্বাস বিজড়িত পুণ্যভূমি। এই ভূমি সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদের শাসনাধীন থাকা চাই।

মুসলমান ধর্ম্মানুশাসনমতে খলিফা মক্কা, মদিনা, জেরুজালেম এই তিন পুণ্য ক্ষেত্রের অভিভাবক হইবেন। নাজফ, কারবেলা, কাজীমান, সমরা ও বাগদাদ এই তীর্থগুলির তিনি প্রভু হইবেন।

মুসলমানদের এই উক্তি অতি সরল, তাহাদের ধর্ম্ম বিশ্বাসের সহিত জড়িত। হিন্দুদেরও এই ক্ষেত্রে কর্ত্তব্য দ্বিধাহীন। হিন্দুকে তাহার মুসলমান ভ্রাতার সহিত হাত ধরাধরি করিয়া মরিতে বা বাঁচিতে হইবে; হিন্দুর নিকটে খলিফাৎ ধর্ম্ম প্রসঙ্গ নয়, কিন্তু ইহার সহিত আন্তর্জ্জাতিক উচ্চ নীতি বিজড়িত আছে।

ইংরেজ, ফরাসী, এবং ইটালীর এরকামা এখন এক শক্তিকে এক একটা রাজ্যের অভিভাবকতা দান করিতেছেন। এই ছেলে-ভুলানো ম্যাণ্ডেট শুনিয়া কে ভুলিবে? তুরস্ক সাম্রাজ্য ভাগবাটোয়ারা হইয়া গিয়াছে। ফ্রান্স সিরিয়া, ইংলণ্ড পালেস্তাইন এবং মার্কিণরা আর্ম্মেনিয়া পাইয়াছেন; মুসলমানেরা কেন এই উৎপাতের প্রতিবাদ করিবেন না? হিন্দুরা কেন এই সময়ে মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইবে না?

(ঘ) গবর্ণমেণ্ট সংশ্রব বর্জ্জন

পঞ্জাব ও খলিফাৎ এই দুই প্রসঙ্গ লইয়া আমাদিগকে সরকারী সংশ্রব বর্জ্জন প্রসঙ্গে উপস্থিত হইতে হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, আমরা বর্জ্জন নীতি গ্রহণ করিব কি না এবং ইহা কার্য্যতঃ কতদূর পালন করা যাইবে। এই উভয় পন্থাই বিপদের কণ্টকে সমাকীর্ণ। সম্ভবতঃ বর্জ্জন-নীতি সম্বন্ধে আমরা সকলে এক মত পোষণ করি। পরন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহার প্রয়োগের বিস্তৃত কর্ম্ম প্রণালী সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে বিস্তর মত বিরোধ রহিয়াছে। আমালাতন্ত্রের স্বেচ্ছাশাসন ব্যর্থ করিবার জন্য যদি আমাদিগকে বর্জ্জন নীতি অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিতে হয় তাহা হইলে ইহার বিস্তারিত আলোচনা আবশ্যক। এই নীতি কি প্রকারে কতদূর কার্য্যে পরিণত করা যায় আমার তৎসম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা নাই।

বর্জ্জন-নীতি আমাদের নিকট একান্ত নূতন নয়। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ আন্দোলনকালে আমরা এক প্রকার এই নীতি গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমরা মহাত্মা গান্ধিকে সেইরূপ কোন কোন প্রণালী অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিতেছি।

ব্রিটিশ জাতি কোন ক্ষেত্রে আমাদের সহকারিতা ন্যায়তঃ দাবী করিতে পারে না। বিধাতার মঙ্গল অভিপ্রায়ে ব্রিটিশ জাতি এই দেশে আসিয়াছেন এই সকল মামুলী উক্তি আমি মানি না। পাঞ্জাবের অত্যাচারে ঐ সকল উক্তির প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও হ্রাস হইয়াছে। ব্রিটিশ বাণিজ্য ব্যপদেশে এই দেশে আগমন করিয়া দেশ অধিকার করিয়া সুবিস্তৃত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ইংরাজ এই দেশের অর্থ জনবল, ধনবল এবং নিসর্গ সম্পদ সমস্ত লুণ্ঠন করিতেছে। এই দেশের অর্থ লুণ্ঠনের জন্য ব্রিটিশ এই দেশে আসিয়াছে এবং

অর্থ লুণ্ঠন করিবার জন্যই এই দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে।

যুদ্ধের পূর্ব্বেই ভারতবর্ষের অবস্থা শোচনীয় ছিল। মহাসমরে পৃথিবীর সর্ব্বত্র, অর্থাভাব উপস্থিত হওয়ায় ভারতবর্ষের অবস্থা অধিকতর সঙ্কটময় হইয়া উঠিয়াছে। স্বাধীন জাতিরা এক্ষণে আপন আপন দেশের আর্থিক অবস্থার সাম্যভাব প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত নানা প্রকার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু আমদের দুয়ারের সম্মুখে বিদেশী এমন ভাবে অবস্থান করিতেছে যে, স্বদেশের আর্থিক দুর্গতি মোচনের কোনরূপ ব্যবস্থা. করিবার অধিকাব আমাদের নাই। যাঁহারা বলেন, শাসনকর্ত্তাদের দৃষ্টি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই সুবাসিত গোলাপজল সেচনকারীদের কানে আমার এই বাক্য অতি কর্কশ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

এইত আমাদের অবস্থা ইহা- সকলেই জ্ঞাত আছেন, অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বিপ্লব করিবার শক্তি আমাদের নাই। আমাদের নিকট কেবল একটি মাত্র পথ খোলা আছে, তাহা সরকারী সংস্রব বর্জ্জন।

পূর্ব্ব-আফ্রিকা ভারতীয় সৈন্য দ্বারা জয় করা হইয়াছিল। এই দেশ হইতে অন্যায়ভাবে ভারতীয়েরা বিতাড়িত হইতেছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট এই বিপুল অন্যায়ের কেবল ক্ষীণ ও হীন প্রতিবাদ করিয়াছেন।

মেসোপোটেমিয়া ভারতীয় সৈন্যের রক্তে রঞ্জিত হইয়াছে। এইদেশে যে আরব বিদ্রোহ হইয়াছে, উহাও ভারতীয় সৈন্য সাহায্যে দমন করা হইতেছে। কিন্তু পরিণামে কি হইবে, যখন এই দেশ শ্বেতাঙ্গদের নিবাসের পক্ষে নিরাপদ হইবে, তখন সেখান হইতে ভারতীয়েরা বিতাড়িত হইবে। কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অপর ব্রিটিশ উপনিবেশ সমূহে ভারতীয়দের যে দুর্গতি এখানেও তাহাই হইবে।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির বক্তৃতান্তে মহিলা গায়িকারা মধুরকণ্ঠে নিম্নলিখিত বৈদিক মন্ত্র গান করেন—

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো
মনাংসি জানতাম্
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী
সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্।
সমানীব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি।

২। সভাপতি নির্ব্বাচন

লালা লাজপত রায় মহাশয়কে সভাপতির আসন পরিগ্রহের প্রস্তাব করিয়া সার আশুতোষ চৌধুরী বলেন,—অদ্য আমার মনে হইতেছে যে, আমি পুনর্ব্বার প্রাণলাভ করিলাম। আমি আপনাদের সহিত কার্য্য করিবার পরই. সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছি, আশা করি আমার জীবনের অবশিষ্ট কতিপয় বৎসর আমি জন্মভূমির সেবা করিয়া কৃতার্থ হইব। আমার দুঃখের বিষয় এই যে, আমি ইতঃপূর্ব্বে এই মহাসভার যাঁহাদের সহিত একযোগে কার্য্য করিয়াছি, এমন কেহ কেহ অনুপস্থিত রহিয়াছেন। এক্ষণে এই দেশের রাজনৈতিক অবস্থা অতীব সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। এমন সময়ে যদি তাঁহারা আমাদিগকে চালনা করিবার জন্য আগমন না করেন, তাহা হইলে আমরা কিরূপে লোকমণ্ডলীর সেবা করিব?

এখন একদল লোক বলেন যে, আমাদের রাজনৈতিক অভ্যুদয়ের সম্ভাবনা আশার অরুণ ছটায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। অপর বহু ব্যক্তি বলেন, যে সকল পরিবর্ত্তন আসিতেছে, উহার মধ্যে আমাদের কোন আশা ভরসার সম্ভাবনা নাই। দেশমধ্যে এই মত ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতেছে যে, কংগ্রেসে চিরন্তন কর্ম্মপদ্ধতি পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। কোথায়ও লুকোচুরি খেলিলে এখন আর চলিবে না। এখন রাজনৈতিক বিপ্লবের দিন আসিয়াছে। আমরা কি এই পৃথিবীতে পশুর মত হামাগুড়ি দিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছি না আমরা মানুষের মত সমুন্নত মস্তকে পদচারণা করিব? আমরা কি এখনও মানব পশুর মত হামাগুড়ি দিয়া কাতরভাবে "ইহা দেও" "উহা দেও" - বলিয়া প্রার্থনা করিব না, মানুষের মত সগর্ব্বে আমাদের জন্মগত অধিকার দাবী করিব?

অতি গুরুতর প্রস্তাব এই মহাসভাকে বিচার করিতে হইবে। যে বিষয়টি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত, আপনারা কি তাহা স্বাধীন ভাবে আলোচনা করিবেন? না উহা ঋষির ব্যাখ্যাত বাণী রূপে বিনা বিচারে গ্রহণ করিবেন। আমি আপনাদিগকে ইহাই বলিতে চাই যে, বর্ত্তমান কাল আর ঋষির যুগ নয়।

এই সঙ্কটকালে আপনারা একজন যথার্থ তেজস্বী পুরুষকে সভাপতি বরণ করিয়া সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। আমার মনে পড়ে, এক সময়ে লালা লাজপত রায় পঞ্জাবের অনভিষিক্ত রাজা বলিয়া পরিগণিত হইতেন। লালাজীর প্রতি আমাদের গভীর বিশ্বাস রহিয়াছে। তিনি আমার বিশেষ বন্ধু। অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য রূপে আমি তাঁহাকে সাদর অভিনন্দন করিতেছি। বঙ্গদেশ লালাজীকে কিরূপ সাগ্রহ আন্তরিক অভ্যর্থনা করিয়াছেন আপনারা তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আমি আপনাদিগকে ইহা সুস্পষ্ট বলিতে পারি যে, এই কংগ্রেসে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবার নিমিত্ত আমরা অপর কোন যোগ্যতর ব্যক্তি পাইতে পারি এমন চিন্তা আমার মনে কদাচ উদিত হয় নাই।

পণ্ডিত মতিলাল নিহরু, শ্রীমতী বেশান্ত মিঃ বিজয়রাঘব চারিয়ার, মিঃ মজহরুল হক এবং পণ্ডিত বিষেণ দত্ত সুকুল প্রভৃতি উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন।

অতঃপর শ্রীমতী বেশান্ত সুললিত সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় সভাপতির নির্ব্বাচন সমর্থন করেন। শ্রীমতী বেশান্তের প্রতি এই দিন যে দুর্ব্যবহার করা হইয়াছে উহা একান্ত অশিষ্ট, অসঙ্গত এবং অন্যায়। এই ওয়েলিংটন স্কোয়ারে তিন বৎসর পূর্ব্বে যাঁহারা শ্রীমতী বেশান্তকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় স্বর্গে তুলিয়াছিলেন আজ তাঁহারাই তাঁহার নিন্দাবাদ প্রচার করিয়া তাঁহাকে নরকস্থ করিতে চাহিতেছেন। এমন নিন্দা-প্রশংসার মূল্য কি তাহাই বিচার্য্য।

৩। সভাপতির অভিভাষণ

জনমণ্ডলীর গগনবিদারী উল্লাসধ্বনির মধ্যে লালা লাজপত রায় দণ্ডায়মান হইয়া আবেগপূর্ণ প্রাণে সুস্পষ্ট ও সুললিত কণ্ঠে দীর্ঘ ৪ ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন।

যথারীতি ধন্যবাদ জ্ঞাপনান্তে তিনি পরলোক গত মিঃ টিলকের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া বলেন,—

(ক) বর্ত্তমান অধিবেশন

অমৃতসহরে যখন জাতীয় মহাসমিতি বার্ষিক অধিবেশন হয় তখন ইহা স্থির হয় যে, হাণ্টার কমিটির রিপোর্ট এবং তদুপরি গবর্ণমেণ্ট যে মন্তব্য করিবেন তাহা আলোচনার জন্য মহাসমিতির এক বিশেষ অধিবেশন হইবে। পরে তুরস্ক-সন্ধির সর্ত্ত প্রকাশিত হইয়াছে, উহাতে আমাদের মুসলমান ভ্রাতারা নিরাশ হইয়াছেন। অতঃপর শাসন সংস্কার সম্বন্ধে কতগুলি নিয়ম প্রকাশিত হইয়াছে; নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি সেই নিয়মগুলিও বিশেষ কংগ্রেসের আলোচনার বিষয় করিয়া দিয়াছেন।

উল্লিখিত ত্রিবিধ জাতীয় সমস্যার আলোচনার নিমিত্ত মহাসমিতির এই বিশেষ অধিবেশন হইয়াছে।

(খ) পঞ্জাব অশান্তি

মহাসমিতির গত অধিবেশনের পরে হাণ্টার কমিটি ও কংগ্রেস সব-কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। হাণ্টার কমিটির রিপোর্টের উপরে ভারত গবর্ণমেণ্ট এবং ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন উহাও আমরা পাঠ করিয়াছি। হাণ্টার কমিটির ভারতীয় ও ইউরোপীয় সভ্যগণ স্বতন্ত্র রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের তদানীন্তন একমাত্র ভারতীয় সদস্য ভারতীয় সভ্যদের সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। নিখিল ভারত সমস্বরে ইউরোপীয় কমিশনারদের রিপোর্ট এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্তের নিন্দা করিয়াছেন।

পাঞ্জাবের অশান্তির জন্য কে দায়ী

পাঞ্জাবের অশান্তির জন্য আমি প্রধানতঃ সার- মাইকেল ও-ডায়ারকে দায়ী মনে করি। ডায়ার, বসওয়ার্থ, স্মিথ, ওব্রায়েন, ডভটন, ফ্রাঙ্ক, জনসন এবং অপর চেলাচামুণ্ডারা সামরিক শাসন প্রবর্ত্তনের ৫ দিন পূর্ব্ব হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত যে অবর্ণনীয় অত্যাচার চালাইয়াছেন উহার মূলে ছিলেন সার মাইকেল ওডায়ার। তিনি যে দিন পঞ্জাব শাসনভার গ্রহণ করেন সেইদিন হইতেই প্রুশিয় শাসন চালাইতেছিলেন। পঞ্জাবের রাজনৈতিক অভ্যুত্থান-চেষ্টা চূর্ণ বিচূর্ণ করাই তাঁহার শাসনের মূল লক্ষ্য ছিল।

সার মাইকেল ওডায়ারের বিরুদ্ধে অভিযোগ—

১। আমি, সার মাইকেল ওডায়ারের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থাপন করিতেছি যে, তিনি ভেদ-নীতি অবলম্বন করিয়া হিন্দুর সহিত মুসলমানের এবং হিন্দু-মুসলমানের সহিত শিখের বিরোধ ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

২। আমি তাঁহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করিতেছি যে, সামরিক ও শিক্ষিত সম্প্রদায়, নগর ও পল্লীবাসীদিগের

মধ্যে অনর্থকর-কৃত্রিম ভেদ সৃষ্টি করিয়া রাজনৈতিক নূতন বিবাদ ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

৩। আমি তাঁহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করিতেছি যে, সৈন্য সংগ্রহ ও যুদ্ধ-ঋণ আদায়ের জন্য তিনি পাশবিক দুষ্কর্ম সমর্থন ও উৎসাহিত করিয়াছেন। তিনি তাঁহার অধীন পুলিশ ও সবর্ডিনেট ম্যাজিষ্ট্রেটদের উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি নিবারণ করিতে পারেন নাই।

৪। আমি তাহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থিত করিতেছি যে, যাঁহারা রাজনৈতিক উন্নতির নিমিত্ত বিন্দুমাত্র স্বাধীনভাব প্রকাশ করিয়াছেন তিনি আইন ও আইনের প্রয়োগ প্রণালী বিকৃত করিয়া তাহাদিগকে দলনের চেষ্টা করিয়াছেন।

৫। আমি তাঁহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করিতেছি যে, সামরিক শাসন প্রবর্ত্তনের দরকার আছে ইচ্ছাপূর্ব্বক এই কথা বলিয়া তিনি ভারত গবর্ণমেণ্টকে প্রবঞ্চিত করিয়াছেন।

৬। আমি তাঁহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করিতেছি, যেখানে বিপ্লব বা বিপ্লবের কোন সম্ভাবনা ছিল না বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি সেইস্থলে সামরিক শাসন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

৭। আমি তাঁহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থিত করিতেছি যে পাঞ্জাবের লোকদিগকে যে বর্ব্বর দণ্ডদান এবং নানা প্রকারে অপমানিত করা হইয়াছে তাঁহার প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য বাক্য বা কার্য্যে ঐ সকল ঘটিয়াছে।

৮। আমি এই অভিযোগ করিতেছি যে, জালিয়ান-ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড এবং সামরিক শাসনের যাবতীয় অত্যাচারের জন্য তিনি দায়ী।

৯। আমি তাঁহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করিতেছি যে, পাঞ্জাবের লোকমণ্ডলীর নিকট হইতে যে সকল পিউনিটিভ জরিমানা আদায় করা হইয়াছে তিনি যেন উহা দেখিয়াও দেখেন নাই।

১০। আমি তাঁহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থিত করিতেছি যে, বিদায়ের পূর্ব্বে তিনি লোককে অন্যায়রূপে ভয় দেখাইয়া অভিনন্দন আদায় করিয়াছেন।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যা সম্বন্ধে নূতন মিথ্যা উক্তি

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে জেনারেল ডায়ার সৈন্য-কাউন্সিলে যে বর্ণনা দাখিল করিয়াছেন, আমি তাহা পাঠ করিয়াছি। এই প্রসঙ্গে পার্লামেণ্টের যে সকল বক্তৃতা হইয়াছে তাহাও জ্ঞাত আছি। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য জেনারেল ডায়ার যে লিখিত বর্ণনা দিয়াছেন উহাতে বলা হইয়াছে :—

(ক) ১০ই তারিখ সহস্র লোক এক বিরাট জনতা সিবিল উপনিবেশ আক্রমণ করিবে এই আতঙ্ক হইয়াছিল। ইহারা দুষ্কার্য্য করিয়াও শাস্তি পায় নাই বলিয়া ইহাদের স্পর্দ্ধা ক্রমে বাড়িতেছিল। গ্রামের লোকও এই দলে যোগ-দান করিয়াছিল, ইহাদিগকে বাধা না দিলে রাত্রিকালে ৩০ হাজার শিখ কর্ত্তৃক নগর লুণ্ঠনের সম্ভাবনা ছিল।

(খ) আমি যে সভায় গিয়াছিলাম ঐ সভায় ১৫।২০ হাজার লোক মিলিত হইয়াছিল, তখন এক বক্তা উত্তেজনা-পূর্ণ বক্তৃতা করিতেছিল।

(গ) ঐ সভায় স্ত্রীলোক কিংবা শিশু ছিল না।

(ঘ) আমি পশ্চাদ্ভাগ হইতে আক্রান্ত হইতে পারি এইরূপ সম্ভাবনা ছিল। বিদ্রোহীদিগকে সর্ব্বতোভাবে দমন না করিলে আমি আমার সৈন্যদল লইয়া নগরের বাহিরে যাইতে পারিতাম না।

(ঙ) কিয়ৎকাল গুলি চালনার পরে দুই স্থলে দুই দল লোক জড় হইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিবার উপক্রম করিতেছিল, ব্রিগেড মেজর তৎপ্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে আমি ঐ দুই স্থলেই বিশেষভাবে গুলি চালনা করিতে হুকুম প্রদান করি, উহার ফলে ঐ দুই দল ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, হাণ্টার কমিটির সাক্ষ্যে জেনারেল ডায়ার এই সকল কথা বলেন নাই। তাঁহার উক্তিটি সম্পূর্ণ নূতন। জেনারেল ডায়ার যে ভাবিয়া চিন্তিয়া এই কর্নাটি প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। হাণ্টার কমিটিতে তিনি যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, উহা পাঠ করিলে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, তাহার এই বর্ণনাটি তৈয়ার করা জিনিষ।

(গ) খালিফাৎ প্রসঙ্গ

ভারতে ৭ কোটি মুসলমান খলিফা আন্দোলনে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। এই প্রশ্ন কেবল রাজনীতির সহিত নহে, ধর্ম্মমতের সহিতও বিজড়িত।

আমাদের স্বদেশী মুসলমান ভ্রাতারা বলিতেছেন যে, তুরস্ক-সন্ধির সর্ত্ত তাহাদের ধর্ম্মানুশাসনের উপর হস্তক্ষেপ করিতেছে, তাহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যাঘাত ঘটাইবে, সুতরাং তাহারা কেমন করিয়া সেই জাতির সহিত বন্ধুত্ব রক্ষা করিবেন যে জাতি এই সন্ধি-সর্ত্ত প্রণয়ন করিলেন ?

১৯১৮ সালের জানুয়ারী মাসে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী দ্বিধাশূন্য সুস্পষ্ট বাক্যে কহিয়াছিলেন —

"আমরা তুরস্ককে উহার রাজধানী এবং তুর্কীপ্রধান সমৃদ্ধ ও সুবিখ্যাত এসিয়ামাইনর হইতে বঞ্চিত করিতে ইচ্ছা করি না।" এইরূপ বহু প্রতিশ্রুতি মন্ত্রি সমাজের মুখে ইতঃপূর্ব্বে মহাসমরের সময়ে শুনা গিয়াছে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, মুসলমানেরা যে আশ্বাস পাইয়া মহাসমরে যোগদান করিয়াছিল সেই প্রতিশ্রুতি কি রক্ষা করা হইয়াছে ? মুসলমানেরা যাহা বলিতেছেন নিখিল ভারত উহার সত্যতা স্বীকার করিতেছেন।

(ঘ) বর্জ্জন নীতি

নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির যে অধিবেশনে এই বিশেষ কংগ্রেসের প্রস্তাব হয় সেই কমিটিতে মিঃ গান্ধি প্রস্তাব করেন যে তুরস্ক-সন্ধির সর্ত্ত এবং পঞ্জাব অশান্তি সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিবার জন্য সরকারী-সংশ্রব-বর্জ্জন পদ্ধতি অবলম্বন করা হউক। মিঃ গান্ধির ব্যাখ্যাত বর্জ্জন-নীতি অনুসারে নূতন ব্যবস্থাপক সভা বয়কট করিতে হয়। অমৃতসর কংগ্রেসে শাসন সংস্কার সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে এই বর্জ্জন নীতি উহার বিরোধী বলিয়া কংগ্রেস কমিটি উহা গ্রহণ করা উচিত মনে করেন নাই। সেই জন্যই এই বিষয়টি বিশেষ-কংগ্রেসের অন্যতম আলোচনার বিষয় হইয়াছে।

অতঃপর এই বর্জ্জননীতি নানা সভায় ও সংবাদ পত্রে বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইতেছে। মিঃ গান্ধির নায়কতায় সেণ্ট্রাল খলিফাৎ কমিটি বর্জ্জননীতি কার্য্যতঃ অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কতিপয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি বর্জ্জননীতি ভাবতঃ গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু মহাসমিতি অধিবেশনের পূর্ব্বে কার্য্যতঃ কাহাকেও কিছু করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গ লইয়া দেশে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। আন্দোলনকারীরা দুইদলে বিভক্ত হইয়াছেন। দুই দলেই লোকমান্য প্রসিদ্ধ জননায়কগণ রহিয়াছেন। এই দুই দলের আলোচনার মধ্যে উগ্রভাব ব্যক্ত হইতেছে সুতরাং এক্ষণে আমি এই সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করিব না।

কিন্তু বর্জ্জননীতি সম্বন্ধে সাধারণ মন্তব্য প্রকাশে কোন বাধা আমার নাই। বর্জ্জননীতি আলোচনার পূর্ব্বে সহযোগিতা অর্থাৎ কো-অপারেসন আলোচনা করা যাউক। আমরা যখন গবর্ণমেণ্টের সহিত একযোগে কার্য্য করিতে যাইব তখন ইহা ধরিয়া লইতে হইবে যে, গবর্ণমেণ্টের সহিত লোকসাধারণের প্রতিনিধি অথবা গবর্ণমেণ্ট লোকসাধারণের স্বার্থ রক্ষা করিতে প্রস্তুত। ভারতবর্ষে দুর্ভাগ্যক্রমে ইহার একটি বিষয়ও সত্য নয়।

গবর্ণমেণ্ট সহকারিতা দ্বিবিধ। প্রথমতঃ বাধ্যতামূলক। যথা গবর্ণমেণ্টকে রাজস্ব দেওয়া, আইনবলে সৈন্য দলভুক্ত করা। দ্বিতীয়তঃ স্বেচ্ছায় গবর্ণমেণ্টের সহকারিতা করা, যেমন—সরকারী চাকুরী গ্রহণ, ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হওয়া ইত্যাদি। আমরা যদি প্রথম প্রকার সহকারিতায় বিরত হই অর্থাৎ সরকারী ট্যাক্স না দেই তাহা হইলে আমাদিগকে আইনতঃ দণ্ডনীয় হইতে হইবে। কিন্তু সম্মান বা পদগৌরব লাভের জন্য আমরা গবর্ণমেণ্টের যে সহকারিতা করিয়া থাকি আমাদের মন দৃঢ় হইলে উহা হইতে আমরা বিরত থাকিতে পারি।

বিচার্য্য বিষয়

আমরা সরকারের সহকারিতা করিব কিংবা সংশ্রব বর্জ্জন করিব ইহা নির্দ্ধারণের পূর্ব্বে আমাদিগকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

(ক) সরকারের সহকারিতা কোন্ কোন্ স্থলে বাধ্যতাঃমূলক, আর কোন্ কোন্ স্থলে আমরা উহা স্বেচ্ছায় করিতেছি।

(খ) সরকারিতা বর্জ্জন করিলে অর্থ নৈতিক কি কি সঙ্কট উপস্থিত হইবে।

(গ) সহকারিতা বর্জ্জন মূলতঃ নীতিবিরোধী কিনা।

(ঘ) আক্রমণ ও আত্মরক্ষার অস্ত্ররূপে ইহার উপযোগিতা কিরূপ।

জনমণ্ডলীর স্বার্থ

আমি আপনাদের সতর্কতার জন্য ইহা জানাইতেছি যে, আমরা অতি সঙ্কটময় অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছি। কেবল ভারতবর্ষে নব পৃথিবীর সর্ব্বত্র এখন লোকচিত্ত সংক্ষুব্ধ হইয়া রহিয়াছে। এতকাল যে আদর্শ, ভাব, নীতি-বিশ্বাস লইয়া কার্য্য করিতেছিল, সকলই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এতকালের যে পুরাতন গণতন্ত্র মহাসমরে বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার স্থলে এখনও নব গণতন্ত্র কোথাও গড়িয়া উঠেনাই। আমরাও এক নব গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি পাইয়াছি, সেই গণতন্ত্রে জাতিতে জাতিতে, বর্ণে বর্ণে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কোন পার্থক্য থাকিবে না। এতদ্বারা মানুষের মনুষ্যত্ব উদ্বোধিত হইবে। এমত অবস্থায় সদ্য জাগরিত নরনারীর স্বার্থের কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। এই নরনারী কি এখন ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য নির্ব্বাচনে ভোট দিবে অথবা রাজনৈতিক অধিকার লাভে অন্যরূপে চেষ্টা করিবে? ভগবানকে ধন্যবাদ করি যে, আমাদের এই দেশের জনমণ্ডলী বিচার-বুদ্ধিহীন জন্তু নয়। এই জনমণ্ডলীর ভাবনার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আর্থিক ক্লেশ, রৌলাট আইন, সামরিক শাসনের পীড়নে তাহারা রাজনৈতিক ভাবনা ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে।

(ঙ) লর্ড সিংহ, ডাঃ সাপ্রু, মিঃ শর্ম্মার নিয়োগ

লর্ড সিংহ, ডাঃ সাপ্রু ও মিঃ শর্ম্মার নিয়োগ ব্যক্তিগত ভাবে অতি উত্তম। আমি ইহাদের শুভাদৃষ্ট এবং গবর্ণমেণ্টের সুবুদ্ধিতে আনন্দ প্রকাশও করিতে পারি। কিন্তু এইরূপ নিয়োগে বর্ত্তমান অশান্তি নিবারিত হইবে না। কয় বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয়েরা এইরূপ উচ্চপদে নিযুক্ত হইলে লোকের আনন্দের সীমা থাকিত না। কিন্তু পঞ্জাবের শোচনীয় কাণ্ডের পরে এই নিয়োগে লোকচিত্ত শান্ত করিতে পারিতেছে না। এখন লোকে কোন রাজপদ চায় না কিন্তু রাজপদে নিয়োগ করিবার ক্ষমতা চায়।

এখন চাই লোকসাধারণের জাগরণ। সুহৃৎকারীতার দ্বারা হউক বা অপর যে কোন উপায়ে হউক লোকসাধারণকে শিক্ষায়, সামাজিক ও আর্থিক অবস্থায় উন্নত করিতে হইবে।

(চ) লোক-চালনা

এক্ষণে আর এক প্রশ্ন এই যে, আমরা কিরূপভাবে লোক চালনা করিব কিংবা তাহাদের দ্বারা কতদূর চালিত হইব। আমাদিগকে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে লোক-চালক হইতে হইলে জনমণ্ডলীকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইলে কিম্বা তাহাদের পশ্চাতে পড়িয়া থাকিলে চলিবে না।

লোক সাধারণ এখন এই দাবী করে যে, আমরা কেবল পরিগ্রহ করিয়া নিবৃত্ত হইব না, ততোধিক কিছু করিব।

দ্বিতীয় দিন

নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হয়

(১)

এই কংগ্রেস লোকমান্য বাল-গঙ্গাধর তিলকের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন। সকৃতজ্ঞ দেশবাসীর স্মৃতিতে তাঁহার নিষ্কলঙ্ক জীবন, তাঁহার স্বরাজ্য লাভের প্রচেষ্টা, তাঁহার অকৃত্রিম জনসেবা চিরদিনের নিমিত্ত মুদ্রিত হইয়া থাকিবে। তাঁহার এই স্মৃতি বংশ-পরম্পরায় আমাদের স্বদেশীয়দিগের বল ও আশা জাগাইয়া তুলিবে। জাতীয় ইতিবৃত্তের এই সঙ্কটকালে কংগ্রেস তাঁহার তুল্য সাহসী ব্যক্তির নায়কতা, স্বদেশ সেবা এবং এই বিপৎকালে কল্যাণকর সদুপদেশে বঞ্চিত হইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন।

(২)

ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ ওহেদেদার যথার্থ স্বদেশ-হিতৈষী, প্রসিদ্ধ দেশ-সেবক ও তেজস্বী জন-পরিচালক ছিলেন তাঁহার মৃত্যুতে দেশের ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া এই কংগ্রেস দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।

(৩)

পঞ্জাবের অত্যাচার

(ক) এই কংগ্রেস কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত পঞ্জাব তদন্ত-সব-কমিটির কমিশনারদিগকে তাঁহাদের শ্রমসাধ্য সতর্ক সাক্ষ্য সংগ্রহ ও রিপোর্ট রচনার জন্য ধন্যবাদ করিতেছেন। কংগ্রেস তাঁহাদের তদন্ত লব্ধ রিপোর্ট সর্ব্বথা সমর্থন করিতেছেন।

(খ) হাণ্টার কমিটির মেজরিটি রিপোর্টের মন্তব্য, বচনবিন্যাস ও ভঙ্গীর প্রতি এই কংগ্রেস বিরক্তিপূর্ণ নিরাশা প্রকাশ করিতেছেন।

(১) ঐ রিপোর্ট পক্ষপাতিত্ব ও জাতিগত বিদ্বেষে কলঙ্কিত, যথোচিত সাক্ষ্য গ্রহণ না করিয়া উহা লিখিত হইয়াছে, সরকারী কর্ম্মচারীদের অসঙ্গত ব্যবহার উপেক্ষিত হইয়াছে, পঞ্জাব ও ভারত গবর্ণমেণ্টের ব্যবহার চূণকাম করিয়া ঢাকিয়া দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

(২) উক্ত রিপোর্ট অবিশ্বাস্য, গ্রহণের অযোগ্য কারণ স্বার্থ প্রণোদিতদের দ্বারা অসম্পূর্ণ ও একপক্ষীয় সাক্ষ্য অবলম্বনে রচিত হইয়াছে।

(৩) মেজরিটি রিপোর্টের লিখিত মন্তব্য উক্ত রিপোর্টে লিপিবদ্ধ সাক্ষ্য দ্বারাও সমর্থিত হইতে পারে না। তাহাদের যাহা অনুমোদন করা আইনতঃ উচিত ছিল তাহা করেন নাই।

(গ) হাণ্টার কমিটির দুই রিপোর্ট সম্বন্ধে ভারত গবর্ণ-মেণ্ট যে সকল অনুমোদন করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে কংগ্রেস এই সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করিতেছেন :—

(১) ভারত গবর্ণমেণ্ট বিনা বিচারে ইউরোপীয় কমি-শনারদের প্রদত্ত রিপোর্ট সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

(২) ভারত গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় কমিশনারদের রিপোর্টের যথোচিত বিচার করেন নাই।

(৩) ভারত গবর্ণমেণ্ট সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কোনরূপ চেষ্টা না করিয়া সরকারী আমলাদের দুষ্কার্য্য ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

(৪) অপরাধী সরকারী আমলাদের সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্ট যাহা ব্যবস্থা করিয়াছেন উহাতে লোকের মন হইতে ব্রিটিশ ন্যায়পরায়ণতার মোহ দূর হইয়াছে।

স্যর আশুতোষ চৌধুরী উল্লিখিত প্রস্তাবের প্রথমাংশ পাঠ করিয়া বলেন,—

কংগ্রেস সব-কমিটির সভ্যগণ পঞ্জাব অশান্তির তদন্ত করিবার সময়ে ৮৭.শত সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা এই তদন্ত কার্য্যে অসামান্য পরিশ্রম ও যোগ্যতা প্রকাশ করিয়াছেন তজ্জন্য কংগ্রেসের পক্ষ হইতে আমি তাঁহাদিগকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ অর্পণ করিতেছি।

বোম্বাইর মিঃ যোষেফ বাপ্তিস্তা, সিন্ধুর মিঃ চইথ্রাম, দিল্লীর হাকিম আজমল খাঁ, যুক্ত দেশের মৌলবী আজাদ সুবানি, মাদ্রাজের মিঃ রাম স্বামী আয়েঙ্গার, মধ্যপ্রদেশের [illegible] বিরণ দত্ত শুকুল, অন্ধ্র দেশের অধ্যাপক গোপাল-কৃষ্ণ এবং যুক্তপ্রদেশের শ্রীমতী মঙ্গলাদেবী উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হয়।

(৪)

ব্রিটিশ-মন্ত্রিসভার নিন্দা

ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা পঞ্জাবের অত্যাচার সম্বন্ধে ভারত গবর্ণ-মেণ্ট প্রদত্ত মন্তব্যের সহিত একমত প্রকাশ করায় এই সভা গভীর নিরাশা প্রকাশ করিতেছে। ঐ সভা পঞ্জাবের সরকারী আমলাদের দুষ্কার্য্য সমর্থন করিয়াছেন।

ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার মন্তব্যে উচ্চ ও মহৎ ভাব প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও তাঁহারা এই বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা করিতে অসমর্থ হওয়ায় ভারতীয় জনমণ্ডলী তাঁহাদের উপর বিশ্বাস হারাইলেন।

তৃতীয়দিনের অধিবেশন

মঙ্গলবারে বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতির কাজের জন্য কংগ্রে-সের অধিবেশন হয় নাই। বলা বাহুল্য সহযোগিতা-বর্জ্জনই বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতির আলোচ্য বিষয় ছিল। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, মহম্মদ আলি, জিন্না প্রভৃতি সহ-যোগিতা-বর্জ্জন নীতির পক্ষপাতী হইলেও মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাব সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিতে সম্মত ছিলেন না। মিসেস বেসান্ত, যমুনাদাস দ্বারকা দাস প্রভৃতি সহযোগিতা-বর্জ্জনেরই বিরোধী। এ দিকে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র এক সংশোধক প্রস্তাব উপস্থিত করেন। জোসেফ বাপটিষ্টা, জয়কার, জিন্না কস্তুরারঙ্গ আয়াঙ্গার, বিজয় রাঘবাচারিয়া, সত্যমূর্ত্তি, কেলকার, খপর্দ্দে, চিত্তরঞ্জন দাশ, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, বসন্ত কুমার লাহিড়ী, শ্যামলাল নেহরু, রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার ডাঃ মুঞ্জে, আলেকার, করণ্ডিকার, ভি ভি মাধো রাও, মদনজিৎ, অশ্বিনী কুমার দত্ত, বরদলুই, দেশ পাণ্ডে প্রভৃতি এই সংশোধক প্রস্তাবের সমর্থন করেন।

মহাত্মা গান্ধী যে ক্রমে ক্রমে ছেলেদিগকে সরকারী স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইবার ও ব্যারিষ্টারদিগকে ব্যবসা ত্যাগ করিবার প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছিলেন, সে প্রধানতঃ পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর জন্য। পণ্ডিতজীর বিশ্বাস ইহাতেই প্রস্তাবটি দেশের লোকের গ্রহণযোগ্য হইবে।

বিস্ময়ের বিষয়, কলিকাতায় আসিবার অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভ্রিটেশমূলক বলিয়া বয়কটে আপত্তি করিয়া

মহাত্মা শেষে বিদেশী পণ্য বর্জ্জন তাঁহার প্রস্তাবের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছেন। রাজনীতিক প্রস্তাবের সহিত বৃটিশ পণ্য-বর্জ্জনের সামঞ্জস্য সাধন সম্ভব হইলেও বিদেশী পণ্য মাত্রেরই বর্জ্জনের সামঞ্জস্য সাধিত হইতে পারে না এবং আমাদের বর্ত্তমান অর্থনীতিক অবস্থায় তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

বেলা এগারোটার সময় কংগ্রেস আরম্ভ হইবার কথা ছিল। কিন্তু যদি কোনরূপ মীমাংসা করা সম্ভব হয়, সেই জন্য আলোচনায় পূর্ণ এক ঘণ্টা কাল অতিবাহিত হয়। বেলা বারোটার সময় সভাপতি মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। সভাপতি প্রথমেই বলিলেন, সার আশুতোষ চৌধুরী একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবেন। সার আশুতোষ সম্বন্ধে কংগ্রেসের প্রতিনিধিদিগের মধ্যে যখন বিশেষ মতভেদ লক্ষিত হইতেছে, তখন আগামী শীতকাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহার বিবেচনা স্থগিত থাকুক। এই প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল।

ইহার পর সভাপতির আহ্বানে মহাত্মা গান্ধী তাঁহার প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে বক্তৃতামঞ্চে আরোহণ করিলেন। মহাত্মা গান্ধী আরম্ভেই বলিলেন, কেহ কেহ তাঁহাকে সাধুত্বের, কেহ আদেশদাতার অপবাদ দিয়াছেন। তিনি তদুভয়ের কোনটিই পাইতে পারেন না। তিনি শ্রোতৃবৃন্দকে করতালি বা ধিক্কার দিতে নিষেধ করিলেন। কেন না, উত্তেজনার ও বিক্ষোভের আবহাওয়ায় সহযোগিতা-বর্জ্জন-কার্য্য করা হইতে পারে না। বিক্ষোভকে সংযত করিয়া উদ্যমে পরিণত করিতে হইবে পঞ্জাবের ব্যাপারে ভারতবর্ষের অপমানের একশেষ হইয়াছে। এ অবস্থায় সহযোগিতা বর্জ্জন ব্যতীত আর এক মাত্র উপায় থাকিতে পারে, সে সশস্ত্র বিদ্রোহ। ভারতবাসীর যদি অস্ত্র থাকিত, তবে তাহারা এই সহযোগিতা-বর্জ্জনের কথায় কর্ণপাতও করিত না। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথায় তিনি বলেন, যদি কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি ভারতবর্ষ হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য বর্জ্জন করিয়া বৃটিশের সহিত স্থায়ী সম্বন্ধ চাহেন, তবে তিনি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারেন যে, বৃটিশের সহিত সম্বন্ধ পরিহার করিয়া হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যই বরণ করিয়া লইবেন। এখন মূল কথা দাঁড়াইতেছে, ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য হওয়া সঙ্গত, কিসে সভা ত্যাগ করা বিধেয়। যখন ব্যবস্থাপক সভারদ্বারা স্বরাজ লাভ হইবে না। তখন ব্যবস্থাপক সভা ত্যাগ করাই উচিত। বৃটিশ সরকারের এবং যে সরকারের বর্ত্তমান কর্ম্মচারীদের প্রতি তাঁহার আর বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নাই। এ অবস্থায় তিনি সমস্ত ভারতবাসীকে সহযোগিতা-বর্জ্জন অবলম্বন করিতেই বলিতেছেন।

তাঁহার পর ডাঃ কিচলু হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের কথা বিশেষ ভাবে বলিয়া প্রস্তাবের সমর্থন করেন।

পরে বিপিন বাবু তাঁহার সংশোধক প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। তিনি বলিলেন, বক্তাদিগের দাবী ন্যায় ও ধর্ম্ম সঙ্গত হইলেও যেমন শ্রীকৃষ্ণ শেষবার কৌরবদিগকে পাণ্ডবদিগের ন্যায়-সঙ্গত অধিকার-অদানের কথা না বলিয়া ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, তেমনি শেষবার বৃটিশ মন্ত্রী-সমাজকে আমাদের সঙ্কল্প না জানাইয়া সম্পূর্ণ ভাবে সহযোগিতা-বর্জ্জনের অনুষ্ঠান সঙ্গত নহে।

ব্যাপটিষ্টা বিপিন বাবুর প্রস্তাবের সমর্থনও ইয়াকুব হাসান মূল প্রস্তাবের পক্ষে বক্তৃতা করেন।

এইবার মিসেস বেসাণ্ট মূল প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতে উঠেন। পূর্ব্ব দিনের ব্যাপারের পর এ দিন আর কেহই তাঁহাকে কোনরূপ বাধা প্রদান করেন নাই।

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু মূল প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলিলেন, মূল প্রস্তাব গৃহীত হইলে অবিলম্বে এক কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। তাহার পর সত্যমূর্ত্তি বিপিন বাবুর প্রস্তাবের ও ডাঃ আনসারি মূল প্রস্তাবের সমর্থন করেন।

জয়াকর ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাব আপাততঃ অসাধ্য বলিয়া স্থগিত রাখিতে বলিলে মৌলবী আবু কালাম আজাদ মূল প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় বিপিনবাবুর সংশোধক প্রস্তাবের সমর্থন করিতে যাইয়া অবিলম্বে ছেলেদিগকে স্কুল ছাড়াইবার ও ব্যবস্থাপক সভা-বর্জ্জনের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

(৩) মহাত্মা-গান্ধির প্রস্তাব

(১) উপাধিধারিগণ উপাধি ও অবৈতনিক চাকুরী ও মিউনিসিপাল ও জেলাবোর্ড ও লোকাল বোর্ডের মনোনীত সভ্যপদ ত্যাগ করুন।

(২) গবর্ণমেন্টের লেভি, দরবার রাজপুরুষদের আহুত আমোদ উৎসব সভা প্রভৃতিতে গমন করিতে অস্বীকার করুন।

(৩) গবর্ণমেন্টের নিজস্ব, গবর্ণমেন্টের সাহায্যকৃত ও গবর্ণমেন্টের শাসনাধীন স্কুল ও কলেজ হইতে সন্তানদিগকে ক্রমে ক্রমে লইয়া যাও এবং প্রত্যেক প্রদেশে জাতীয় স্কুল ও কলেজ স্থাপন কর।

(৪) আইন ব্যবসায়ীরা ক্রমে ক্রমে আদালত ত্যাগ করুন এবং তাঁহাদের সহায়তায় সালিসী আদালত স্থাপন করিয়া আপন আপন বিবাদ মিটাইয়া ফেলুন।

(৫) সৈন্য, কেরাণী বা কুলি হইয়া কেহ মেসোপোটেমিয়া যাইও না।

(৬) কেহ ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইও না; যদি কেহ কংগ্রেসের মত অবহেলা করিয়া সভ্যপদ প্রার্থী হয়, তবে ভোটারগণ তাহাকে ভোট দিও না।

(৭) বৃটিশ বাণিজ্য দ্রব্য বর্জ্জন করা।

সংস্রব বর্জ্জন, আত্মশাসন ও স্বার্থত্যাগের নামান্তর, যাহা ব্যতীত জাতীয় উন্নতি হয় না। প্রত্যেক পুরুষ, স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাদিগকে সংস্রব বর্জ্জনের প্রথম ধাপে আত্মশাসন ও স্বার্থত্যাগের সুযোগ দেওয়া উচিত সুতরাং কংগ্রেস এই অনুরোধ করিতেছেন যে, সকলেই বস্ত্র ব্যবহার বিষয়ে স্বদেশী ব্রত গ্রহণ করুন কিন্তু ভারতীয় অর্থে ও ভারতবাসীর তত্ত্বাবধানে যে সকল কাপড়ের কল আছে, তাহাতে ভারতবাসীর প্রয়োজনীয় বস্ত্র উৎপাদন হয় না এবং বহুদিন হওয়ারও সম্ভাবনা নাই, এই কংগ্রেস এই অনুরোধ করিতেছেন যে, বিস্তারিত ভাবে চরকায় সুতা কাটা হউক এবং লক্ষ লক্ষ তাঁতী যাহারা উৎসাহের অভাবে তাহাদের প্রাচীন ও সম্মানজনক ব্যবসায় ত্যাগ করিয়াছে, তাহারা হাতের তাঁতে বস্ত্র বয়ন করিতে আরম্ভ করুন।

বিপিন বাবুর সংশোধক প্রস্তাব

(১) নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটীর দ্বারা নির্ব্বাচিত কয়েকজন ভারতীয় প্রতিনিধির দৌত্য স্বীকার করিবার জন্য প্রধান মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করা হউক; এই প্রতিনিধিরা ভারতের অভাব-অভিযোগের কথা তাঁহাকে জ্ঞাপন করুন এবং অচিরাৎ পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনাধিকারের জন্য দাবী করুন।

(২) যদি তিনি এই দৌত্য গ্রহণ না করেন অথবা ১৯১৯ সালের সংস্কার আইনের পরিবর্ত্তে অচিরাৎ পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনাধিকার প্রদান না করেন, তাহা হইলে এমন-ভাবে সহযোগিতা-বর্জ্জন নীতি অবলম্বন করা হইবে, যাহাতে বৃটিশ জাতি নিঃসন্দেহ হইবেন যে, ভারতবাসী অতঃপর পরাধীনের মত শাসিত হইতে চাহেন না।

(৩) ইতোমধ্যে কংগ্রেস দেশকে মহাত্মা গান্ধির সহযোগিতা-বর্জ্জনের প্রোগ্রামটী ধীর ভাবে এবং সুনয়নে দেখিয়া শেষে গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন; অবশ্য সমগ্র ভারতবর্ষের পক্ষে অথবা কোনও বিশেষ প্রদেশের পক্ষে যাহা সংশোধন, পরিবর্জ্জন বা পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক, তাহা একটা জয়েণ্ট কমিটী নির্দ্ধারণ করিবেন;

এই জয়েণ্ট কমিটীতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ থাকিবেন—

(ক) নেশানাল কংগ্রেসের ১৫জন প্রতিনিধি,

(খ) মসলেম লিগের ৫ জন,

(গ) সেন্ট্রাল খেলাফৎ কমিটীর ৫জন,

(ঘ) প্রত্যেক হোমরুল লিগের ৫ জন,

(ঙ) শিখ লিগের ২ জন,

(৪) ইতোমধ্যে কংগ্রেস গোড়াপত্তন করিবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত কার্য্যের পথ অনুসরণ করিতে দেশের লোককে অনুরোধ করিতেছেন।

(ক) সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন এবং সহযোগিতাবর্জ্জন নীতি সম্বন্ধে নির্ব্বাচনাধিকারীদিগকে শিক্ষিত করা,

(খ) জাতীয় স্কুল প্রতিষ্ঠা করা,

(গ) সালীশ-আদালত প্রতিষ্ঠা করা,

(ঘ) সরকারী খেতাব ও অবৈতনিক চাকুরী ছাড়িয়া দেওয়া।

(ঙ) সরকারি লেভি, দরবার প্রভৃতি বর্জ্জন করা।

(চ) শ্রমিকগণকে ট্রেড ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করা।

(ছ) ক্রমশঃ য়ুরোপীয় ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায় হইতে ভারতীয় মূলধন ও শ্রমজীবী সরাইয়া লওয়া।

(জ) সৈন্য, কেরাণী ও শ্রমিকগণকে ভারতের বাহিরে সরকারী কর্ম্ম গ্রহণ করিতে নিষেধ করা।

(ঝ) স্বদেশী ব্রত গ্রহণ এবং হাত-চরকা ও তাঁতের পুনঃ প্রচলন।

চতুর্থ দিবসের অধিবেশন

৮ই সেপ্টেম্বর মহাসমিতির তৃতীয় দিনের অধিবেশনে গবর্ণমেণ্ট-সংস্রব-বর্জ্জন প্রস্তাব আলোচিত হয়। সেই আলোচনায় সভাসদগণ শ্রীযুক্ত গান্ধির প্রস্তাবিত গবর্ণমেণ্ট-সংস্রব-বর্জ্জন প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কিন্তু সংশোধন প্রস্তাবকারী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল প্রত্যেক প্রদেশের প্রতিনিধিগণকে পক্ষে ও বিপক্ষে এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ভোট গ্রহণের প্রস্তাব করেন, তদনুসারে বৃহস্পতিবার ভোট গ্রহণ করা হয়। আমরা সেই ভোট গ্রহণের ফল নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি।

	মোট প্রতিনিধি	মিঃ গান্ধির পক্ষে	মিঃ পালের পক্ষে
বঙ্গদেশ	২১০০	৫৫১	৩৯৫
বোম্বাই	৫৮২	২৪৩	১৩
পঞ্জাব	১০৭১	২৫৪	৯২
মান্দ্রাজ	৫০১	১৬১	১৪৫
সিন্ধু	৮৬	৩৬	১৬
মধ্যপ্রদেশ	১৬৩	৩০	৩৩
যুক্তপ্রদেশ	৫৫৮	২৫৯	২৮
দিল্লী	১৭০	৫৯	৯
অন্ধ্র	১৩০	৫৯	১২
ব্রহ্ম প্রদেশ	৩৭	১৪	৪
বিহার	৩৬৯	১৮৪	২৮
বেরার	৪৬	৫	২৮
মোট	৫৮৭৩	১৮৫৫	৮৮৩

৫৮৭৩ জন প্রতিনিধির মধ্যে ২৭৩৭ জন প্রতিনিধি ভোট দিয়াছেন, অর্দ্ধেকের অধিক সংখ্যক প্রতিনিধিই ভোট প্রদানে বিরত ছিলেন। যাঁহারা ভোট দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ৬৩ জন মিঃ গান্ধির প্রস্তাব এবং বিপিন বাবুর সংশোধন উভয়ের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন। ১৮৫৫ জন মহাত্মা গান্ধি এবং ৮৮৩ জন বাবু বিপিনচন্দ্র পালের পক্ষে ভোট দেওয়ায় মিঃ গান্ধির প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

সভাপতি লালা লাজপত রায়ের উপসংহার-বক্তৃতা

বিশেষ কংগ্রেসের সমস্ত কার্য্যের সমালোচনা করিয়া সভার অন্তে লালা লাজপত রায় নিম্নলিখিত চিন্তাপূর্ণ পক্ষপাতশূন্য বক্তৃতা করিয়াছেন :—

বাঙ্গলা দেশের প্রশংসা

সভার শেষে এক্ষণে আমি যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিব তজ্জন্য আপনাদের নিকট পূর্ব্বেই ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। এই মহাসমিতির প্রারম্ভ হইতে সমাপ্তি পর্য্যন্ত আমি আপনাদের আনুকূল্য প্রাপ্ত হইয়াছি বলিয়া আপনাদিগকে হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে ধন্যবাদ করিতেছি। এই ছয় দিন আমি আপনাদের নিকট হইতে যে সৌজন্য ও মধুর ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা আমার হৃদয় অভিভূত করিয়াছে। সামান্য কয়টি দুঃখকর ঘটনা ঘটিলেও আমি দেশে বা বিদেশে কোন মহাসমিতিতে এমন ভাবের বিদ্যুৎ স্পন্দন প্রত্যক্ষ করি নাই। আমি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, সম্পাদকগণ, কাপ্তেন, সহকারী কাপ্তেন এবং ভলাণ্টিয়ারদিগকে ধন্যবাদ করিতেছি। আমরা অতি অসামান্য আতিথ্য সম্ভোগ করিয়াছি। বঙ্গদেশ হইতে এতদপেক্ষা ন্যূন আশা করি নাই। আবশ্যক কর্ত্তব্য-সম্পাদনে বঙ্গদেশ কদাচ পরাঙ্মুখ হন নাই। অতি অল্পকাল মধ্যে বঙ্গদেশ অসাধারণ আতিথ্যের অতি চমৎকার আয়োজন করিয়া স্বদেশ প্রীতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বাঙ্গালী ভ্রাতাদিগকে আমি ইহা স্পষ্ট জানাইতেছি যে, আমি কদাচ চাটুতাষণে অভ্যস্ত নহি। আমি চিরকালই ইহা মনে করি যে, বাঙ্গালীরা জ্ঞানক্ষেত্রে ভারতবর্ষের অগ্রণী ও চালক। এক্ষণে বঙ্গদেশ কিয়ৎ পরিমাণে সেই চালকতা লইতে নিরস্ত হইয়াছেন। বঙ্গদেশ জাতীয়তার অতি পবিত্র আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন। মাতৃভূমির জন্য কিরূপভাবে ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় বঙ্গদেশ নিখিল ভারতকে উহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। ভারতবর্ষের অপর কোন প্রদেশ ভারতবাসীকে ত্যাগের মহৎ আদর্শে এমন ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে পারেন নাই। বঙ্গদেশে ক্লেশ ত্যাগের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে অপর প্রদেশ সমূহেও সেইরূপ দৃষ্টান্ত হউক ইহাই আমার কামনা। বঙ্গদেশবাসীর স্বদেশ প্রীতির গভীরতার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। বাঙ্গালীদিগকে

রাজনীতি ক্ষেত্রে নায়কতা রক্ষার জন্য সাগ্রহ অনুরোধ করিতেছি। আমি যদি কখনও উঁহার সহিত কোন কথা বলিয়া থাকি তথাপি বাঙ্গালীর প্রতি আমার শ্রদ্ধা অনুমাত্র হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। এক্ষণে মহাসমিতির কার্য্য সম্বন্ধে কয়টি কথা বলিতেছি :—

মিঃ মণ্টেগু

দুই একটি অপ্রিয় ঘটনার জন্য আমাকে এই মহা সভার সভাপতিরূপে ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে হইবে। এক বাঙ্গালী বক্তা অসতর্ক ভাবে অনিচ্ছায় মিঃ মণ্টেগুর জাতির কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন। উহার বিরুদ্ধে আমি এক টেলিগ্রাম পাইয়াছি। আমি সকলকে ইহা জানাইতেছি যে, ইহুদি জাতির প্রতি আমার অত্যুচ্চ শ্রদ্ধা আছে। আমেরিকা এবং অপর সকল দেশে গমন করিবার পূর্ব্বে ইহুদিদের সম্বন্ধে আমার এইরূপ ধারণা ছিল না। পৃথিবীর কতিপয় শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল, সুগায়ক, কর্ম্মী এবং সুলেখক ইহুদি জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং এই সম্প্রদায়ের প্রতি নিন্দাবাক্য প্রয়োগ করা সঙ্গত হইবে না। এসিয়াবাসী বলিয়া ইহুদিরা যে আমাদেরই নিকটতর এক জাতি ইহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। বৃটিশ রাজমন্ত্রী অথবা বৃটিশ জননায়করূপে আমরা মিঃ মণ্টেগুকে সমালোচনা করিতে পারি, কিন্তু তাঁহার জাতি তুলিয়া তাঁহাকে গালি দিতে পারি না। সুতরাং আপনাদের পক্ষ হইতে এই অসতর্ক ও অনিচ্ছাকৃত ঘটনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও দুঃখ প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীমতী বেশান্ত ও মিঃ যমুনা দাস দ্বারকা দাস

শ্রীমতী বেশান্তের প্রতি আপনারা প্রথম দিন ও দ্বিতীয় দিন যে ব্যবহার করিয়াছেন উভয়ের মধ্যে প্রভেদ বিস্তর। দ্বিতীয়দিনে তাঁহার প্রতি আপনাদের ব্যবহার অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু মিঃ যমুনাদাস দ্বারকাদাসের প্রতি আপনাদের ব্যবহার একান্ত অসঙ্গত হইয়াছে।

ধীরপন্থীরা কংগ্রেসে না আসিয়া ভাল করিয়াছেন

আমার ইহা মনে হইয়াছে যে, ধীরপন্থী নায়কগণ মহাসমিতিতে উপস্থিত না হইয়াই উত্তম কার্য্য করিয়াছেন। [illegible] অবস্থায় যে সকল ধীরপন্থী নায়ক কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছেন আমি তাঁহাদের দেশপ্রীতির প্রশংসা না করিয়া পারি না। কংগ্রেস যদি ধীরপন্থী নায়কদিগকে বক্তৃতা প্রদান করিতে না দেন, তাঁহারা যদি মিঃ যমুনাদাস দ্বারকাদাসের মত দুর্ব্যবহার প্রাপ্ত হন তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে কংগ্রেসে যোগদান না করাই কর্ত্তব্য।

ন্যাসন্যালিষ্টদের ভবিষ্যৎ

মহাসমিতির সভ্যদের মনের ভাব যদি এই রূপই চলিতে থাকে তাহা হইলে মহাত্মা গান্ধির সহিত যাঁহারা একমত নহেন সেই সকল ন্যাসন্যালিষ্ট নায়কদিগকে অচিরে উক্তরূপ দুর্ব্যবহার সহ্য করিতে হইবে। মহাসমিতির কার্য্য যদি এইরূপ ভাবে চলিতে থাকে তাহা হইলে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান অচিরে সাম্প্রদায়িক সভায় পরিণত হইবে। ভারতবর্ষের কতিপয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন, আমার সুনির্ব্বন্ধ নিবেদন এই যে, আপনারা এই প্রতিষ্ঠানটিকে ইহার জাতীয় প্রকৃতি হইতে বঞ্চিত করিবেন না। যে দলে এখন লোক সংখ্যা অল্প সেই ধীরপন্থীদিগকে যদি আপনারা এমনভাবে লাঞ্ছিত করেন তাহা হইলে কংগ্রেসের জাতীয় প্রকৃতি কি প্রকারে রক্ষিত হইতে পারে? যে দিন কংগ্রেস এই জাতীয় প্রকৃতি হইতে বিচ্যুত হইবে সে দিন ভারত ইতিবৃত্তের অতি শোচনীয় দিন বলিয়া পরিগণিত হইবে। আমি আপনাদিগকে মনের এই ভাব পরিবর্ত্তিত করিতে অনুরোধ করি। মিঃ গান্ধি আপনাদিগকে যে সংযম প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন আপনারা সেই সংযম প্রকাশ করিয়া কংগ্রেসের জাতীয় প্রকৃতি রক্ষা করুন।

বর্জ্জন নীতি

৭ কি ৮ হাজার ভোট দাতার মধ্যে কেবল ৬৩ জনে বর্জ্জন নীতির বিরুদ্ধে মত দিয়াছেন কিম্বা উদাসীন রহিয়াছেন। সুতরাং ইহা অসঙ্কোচে বলিতে হইবে যে, অধিকাংশ লোকই বর্জ্জন নীতি অনুমোদন করিতেছেন। বর্জ্জন নীতি কার্য্যে পরিণত করিবার যে সূচী অনুমোদিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আমার যে মত তাহা আপনাদের ভাল লাগিবে কি না সন্দেহ। কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমি আমার মত ব্যক্ত না করিয়া পারিব না। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বর্জ্জন নীতি সমর্থন করি। কিন্তু যে কর্ম্মসূচী অনুমোদিত হইয়াছে উহা

যে যুক্তি পূর্ণ ও কার্য্যকারী হইবে তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।

(১) ছাত্রদের বিদ্যালয় ত্যাগ করা উচিত নয়

বিদ্যার্থীরা স্কুল কলেজ ত্যাগ করিবে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতেছি। ন্যাসন্যাল স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠায় আমার ঐকান্তিক আগ্রহ আছে। যখন ১৮ বৎসর বয়স্ক বালক, তখন আমি সংসারে প্রবেশ করি, তদবধি আমি যাহা উপার্জ্জন করিয়াছি তাহার অধিকাংশ জাতীয় বিদ্যালয়ের জন্য ব্যয় করিয়াছি। বহু চিন্তার ফলে আমি এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছি যে, যাবৎ স্বদেশীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত না হইবে তাবৎ জাতীয় বিদ্যালয় চলিতে পারিবে না। প্রথমতঃ আমাদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত চেষ্টিত হইতে হইবে। সেই চেষ্টায় সাফল্য লাভ করিবার পূর্ব্বে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা বিফল হইবে।

জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদেব মনে যে ধারণা আছে তাহাও অত্যন্ত ভ্রমপূর্ণ। জাতীয় শিক্ষা কিরূপ এবং কি প্রকারে তাহা প্রচলিত করা যাইতে পারে? শিক্ষা পদ্ধতি কি হিন্দু মুসলমানদের প্রয়োজনানুসারে হইবে? এই প্রশ্ন সমাধানের পথ একান্ত বিপৎসঙ্কুল। ইহার সমাধান হইতে পারে না এমন নয়। প্রত্যেক দেশেই প্রজা সাধারণের নিকট হইতে যাঁহারা কর আদায় করেন সেই গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এখন এই দেশে শিক্ষার্থী ছাত্রদিগকে বিদ্যালয় সমূহ হইতে তুলিয়া আনিলে উহা আত্মহত্যা তুল্য হইবে।

আপনারা এখন সর্ব্বত্র প্রাইভেট স্কুল স্থাপন করিতে থাকুন, সেগুলিকে আমি জাতীয় বিদ্যালয় বলি না। বঙ্গদেশে জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু উহা টিকিতে পারিল না। আপনারা ব্যক্তিগতভাবে স্কুল পাঠশালা, গুরু স্কুল প্রভৃতি নানা বিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারেন। কিন্তু তদ্দ্বারা জাতীয় শিক্ষা সমস্যার মীমাংসা হইবে না। গবর্ণমেণ্ট যতদিন জাতীয় না হইবে ততদিন জাতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। মহাত্মা গান্ধি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, আমরা যে শিক্ষা পাই তাহা ভ্রান্ত শিক্ষামাত্র। তাঁহার বক্তব্য মধ্যে যুক্তি আছে। কিন্তু আমরা সেকালের ভারতীয় হইতে চাহি না, আমরা চাই বর্ত্তমান যুগের উন্নতিশীল ভারতীয় হইতে। আমাদিগকে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিলে চলিবে না, ক্রমাগতঃ অগ্রসর হইতে হইবে।

(২) ওকালতী ব্যারিষ্টারী ত্যাগ করা আরম্ভ হইবে না

উকীল ও ব্যারিষ্টারদের কর্ম্মত্যাগের যে প্রস্তাবনা হইয়াছে উহা আমি সম্ভবপর বলিয়া মনে করি না। উকীলের বা আদালতের প্রতি আমার অনুরাগ আছে বলিয়া মনে হয় না। ওকালতী করিয়া আমি যাহা উপার্জ্জন করিয়াছি তাহা সমস্তই দান করিয়াছি। জাতীয় উন্নতীর জন্য উকীল সমাজের আবশ্যকতা আছে আমি তাহা স্বীকার করি না। উকীলেরা পরভুজ। তাহাদের জীবন ভারতীয় রাজনৈতিক জীবনের এক সমস্যা। রাজনীতি ক্ষেত্রের প্রধান জন-নায়কগণই উকীল, কিন্তু সঙ্কট কালে ইহারাই উন্নতির বিরোধী হইবেন। পঞ্জাবের লালা হর কিসেন লাল, দুলিচাঁদ এবং অপর অনেক উকীলের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে; কিন্তু আমি জানি, পঞ্জাবের অনেক উকীল আমাদিগকে বিপদকালে সাহায্য করিতে অসম্মত হইয়া প্রবঞ্চিত করিয়াছেন। একটু একটু করিয়া উকীলেরা আদালত ত্যাগ করিতে পারিবেন আমি তাহা স্বীকার করি না।

শালিসি আদালত স্থাপনের আমি বিশেষ পক্ষপাতী। ঐ আদালতে আপনারা মামলা মিটাইতে পারিবেন, কিন্তু যতদিন বৃটিশগবর্ণমেণ্ট থাকিবে ততদিন আদালত ত্যাগ করা আমি সম্ভব বলিয়া মনে করি না। আমাদের মধ্যে যাঁহারা বৃটিশ আদালতের নিন্দা ঘোষণায় বিশেষ উৎসাহী রাজনীতিক মামলায় পতিত হইলে তাঁহারাই সর্ব্বাগ্রে উকীল ও আদালতের সহায়তা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

(৩) বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন

অর্থ-নৈতিক দাসত্বই আমাদের অপর সকল দাসত্বের মূল। রাজনৈতিক দাসত্ব মোচন করিতে হইলে আমাদিগকে এই অর্থনৈতিক দুর্গতির মূলে কুঠারাঘাত করিতে হইবে।

বিদেশীদ্রব্যবর্জ্জন আপনাদের কর্ম্ম সূচীর অন্তর্ভুক্ত। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাই কামনা করি যে, এই আন্দোলনে আপনারা সাফল্য লাভ করুন।

ব্যবস্থাপকসভা বর্জ্জন লইয়া কংগ্রেসে বিশেষরূপ উত্তে-

জন্য পূর্ণ আলোচনা হইয়াছে। আমি সুস্পষ্ট জানাইতেছি যে, এই প্রসঙ্গে আমি মহাত্মা গান্ধির সহিত এক মত। কিন্তু আমার হৃদয় যাহাই ভাল মনে করুক, বুদ্ধি সময়ে সময়ে অন্যপক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকে। কাউন্সিল বর্জ্জন সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধি যে সকল যুক্তি দেখাইয়াছেন সেই গুলি আমার সঙ্গত বলিয়াই মনে হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন যে, এই দেশের উৎকৃষ্ট লোক সমূহ ব্যবস্থাপক সভায় গমন করিয়া বিকৃত বুদ্ধি হইয়া থাকেন। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতেও আমি বলিতে পারি যে,আমার যে সকল বন্ধুর দেশ-প্রীতি অতি নির্ম্মল ছিল ব্যবস্থাপক সভায় গমন করিয়া তাঁহাদের সেই দেশ-প্রীতি বিষাক্ত হইয়া পড়িয়াছে। যাহারা আমাদের দেশের হিতৈষী নহেন আমি কদাচ তাঁহাদের নিকট অনুগ্রহপ্রার্থী হই নাই। যে দেশের লোক সংখ্যা ৩১॥ কোটি, একবৎসর মধ্যে আপনারা সেই দেশের লোকের মন হইতে সহকারিতাব দূর করিয়া তাহাদিগকে বর্জ্জন নীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত করিতে পারিবেন না। তাহাতে আপনারা ভ্রমে পতিত না হন তজ্জন্য দেশের হিন্দু মুসলমান প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত এক যৌথ কমিটিতে বর্জ্জন-নীতির বিস্তারিত কর্ম্মসূচী আলোচনা করিয়া তৎপরে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন ইহাই আমার অনুরোধ।

ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ

অনুগ্রহ প্রার্থনার জন্য ইংলণ্ডে যে প্রতিনিধিদল প্রেরিত হয় উহা আমার কাছে উত্তম বলিয়া বিবেচিত হয় না। আমার অভিজ্ঞতা হইতে আমি ইহা বলিতে পারি যে, বৃটিশ জনমণ্ডলীর নিকট আমরা কিছু পাইব এমন প্রত্যাশা করি না। ভিক্ষার্থী হইয়া প্রতিনিধিরা ইংলণ্ডে গমন করিবেন ইহা আমি একান্ত নিষ্ফল বলিয়া মনে করি। কিন্তু ভারতের দুর্দ্দশা ইংলণ্ড আমেরিকা, জাপান, এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়ার আবশ্যকতা আমি স্বীকার করি।

কথা রক্ষা করিতে হইবে

মহাত্মা গান্ধির বাখ্যাত বর্জ্জন প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। একণে ঐ প্রস্তাব অনুসারে আপনাদিগক কার্য্য করিতে হইবে। ৩ মাস পরে নাগপুরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হইবে। তৎপূর্ব্বেই আপনাদিগকে ইহা কার্য্যতঃ বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, বর্জ্জননীতি গ্রহণের অর্থ কি। আপনারা যদি কার্য্যতঃ কিছু না করেন আপনাদিগকে বাক্‌সর্ব্বস্ব মিথ্যাবাদী ও প্রগল্‌ভ বলিয়া লোকে গালি দিবে।

আপনারা প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া বর্জ্জননীতি বরণ করিয়া লইয়াছেন, একণে উহা হইতে সরিয়া পড়িবেন না, কার্য্যতঃ উহা করুন। আমি ইহার সফলতার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিব। যদি কার্য্যক্ষেত্রে ইহাই আপনারা অনুভব করেন যে, আপনাদের কর্ম্মসূচীর সংশোধন আবশ্যক তাহাহইলে, কোন প্রকার সঙ্কুচিত না হইয়া উহা করিবেন। একণে আমাদিগকে আশা ও উৎসাহের সহিত ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইবে।

মুসলমান ভ্রাতাদের প্রতি

মুসলমান ভ্রাতাদের প্রতি আমার এই নিবেদন যে তাঁহারা মনে রাখিবেন যে, মুসলমান ধর্ম্ম ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্মান রক্ষার মহৎ কর্ত্তব্যভার তাঁহাদের উপর পতিত হইয়াছে। এই কর্ত্তব্য পালনে অসমর্থ হইলে মুসল-মানেরা নিখিলমানব এবং পরমেশ্বরের নিকটে দায়ী হইবেন। একণে এই সভার বর্জ্জন প্রস্তাব যিনি গ্রহণ করিলেন তাঁহাকে ধন প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াও উহা রক্ষা করিতে হইবে। যিনি ইহা মানিবেন না তাঁহাকে এই দল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে হইবে।

ধীরপন্থীদের ত্যাগ করিলে চলিবে না

টাইমস অব ইণ্ডিয়ায় কংগ্রেস সম্বন্ধে একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক আমাকে এই অনুরোধ করিয়াছেন যে, আমি যেন মহাসমিতির কবর খনন করিয়া ইহার সমাধি কার্য্য শেষ না করি।

আমার আশা এই যে, মত বিরোধ সত্ত্বেও আপনারা মহাসমিতিকে দুই দল হইতে দিবেন না। আমি আপনাদের নিকটে এই অনুরোধ করিতেছি যে, আপনারা ধীরপন্থী দিগকে আহ্বান করিয়া পুনর্ব্বার মহাসভায় আনয়ন করুন তাঁহাদিগকে না হইলে আমাদিগের চলিবে না। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিলে চলিবে না। এই মহাসমিতির এই বক্তৃতামঞ্চ প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট পবিত্র বিবেচিত হউক। আপনারা ধৈর্য্য সহকারে আমার বক্তব্য শুনিয়াছেন বলিয়া আপনাদিগকে পুনর্ব্বার ধন্যবাদ করিতেছি। ("সঞ্জীবনী")

খেলাফৎ কন্‌ফারেন্স

গত ৫ই সেপ্টেম্বর প্রাতে কংগ্রেস মণ্ডপে খেলাফৎ কন্‌ফারেন্স হইয়া গিয়াছে। জনতায় কংগ্রেস-মণ্ডপ পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। অনেক হিন্দুও ঐ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে মৌলানা আবুল কাশিম আজাদ, সৌকত আলি, মহম্মদ আক্রাম খাঁ, মহাত্মা গান্ধী, নাজামুদ্দীন আমেদ, ওয়াহেদ হোসেন, লতিফররহমান, বদরুদ্দীন আনওয়ারি, পণ্ডিত মদনমোহন মালবী, মৌলবী আবদুল মজীদ সরনা, মহম্মদ ফজলুঃ-ওয়ায়েদ, আবদুল গফুর, ইয়াকুব হোসেন, সেঠ মহম্মদ আল আল্লা, হাজি আবদুল রহিম, নুরুল হোসেন, হাফিজ রহমতুল্লা, মৌলানা সাজ্জাদ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। সর্ব্বপ্রথমে কলিকাতার নাখোদা মসজিদের প্রধান পুরোহিত কোরাণ হইতে একটি অংশ আবৃত্তি করেন। তাহার পর সৈয়দ মহম্মদ ইসা উরদু ভাষায় একটি জাতীয় সঙ্গীত গান করিলেন। যখন এই গানটি গীত হয়, তখন অধিকাংশ মুসলমানই অশ্রুবর্ষণ করিয়াছিলেন।

দেওবন্দের মৌলানা মহম্মদ হাসান সাহেব সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ইনি সমগ্র ভারতীয় মুসলমানগণের প্রধান ধার্ম্মিক। কিন্তু তিনি পীড়িত হওয়ায় আসিতে পারেন নাই।

বদাওনের মৌলানা আবদুল মাজেদকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হয়। তিনি বলেন, খেলাফতের জন্য তিনি সমস্ত ত্যাগ করিতে সম্মত আছেন। যাহারা খেলাফতের কাজে আত্মনিয়োগ না করিবে, তাহারা মুসলমান নহে, কাফের। কতকগুলা লোক বলিতেছেন যে, তুর্কী সুলতান খলিফা নহেন। কিন্তু তিনি কোরাণ আদি ধর্ম্মপুস্তক হইতে প্রমাণ করিয়া দিলেন যে, সুলতানই খলিফা। ইসলামের অনিষ্ট হইতেছে, এ সময় সমস্ত মুসলমানের সজাগ হওয়া কর্ত্তব্য, আইন মানাও কর্ত্তব্য। কিন্তু যে আইন অত্যাচারের পথ প্রশস্ত করে, অথবা যাহা ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রতিকূল তাহা হইতে প্রকৃত ন্যায়সঙ্গত আইন স্বতন্ত্র। মুসলমান এ সময়ে ইসলামের আদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিবে।

ইহার পর বৈঠক মুলতবী থাকে এবং সন্ধ্যা ৭টার সময়ে বৈঠকের পুনরধিবেশন হয়। ঐ সময়ে সমস্ত মণ্ডপ লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। প্রেসিডেণ্ট অসুস্থ হওয়ায় কানপুরের মৌলানা আজাদ শোভানি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় ১১টি মন্তব্য গৃহীত হয়। (১) খেলাফতের বিপক্ষে মিত্রশক্তিপুঞ্জ যেরূপ শত্রুতাচরণ করিয়াছেন, এবং তুর্কির সন্ধি যেরূপ অন্যায় ও নিষ্ঠুর ভাবে হইয়াছে, তাহাতে এই সন্ধির বিপক্ষে ঘোর আন্দোলন চালাইতে হইবে, (২) খেলাফৎ আন্দোলন সম্পর্কে ধর্ম্মাদেশ অনুযায়ী সহযোগিতা বর্জ্জন করিতে হইবে, (৩) হিজরতে যাহারা যোগ দিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি সভার আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করা হইতেছে, (৪) কোনও কোনও মুসলমান দেশে, বিশেষতঃ তুরস্ক ও মেসোপটেমিয়ায় বৃটিশ সরকার যে ব্যবহার করিয়াছেন এবং পরিষদের বিরুদ্ধে ঐ সমস্ত দেশে ভারতীয় মুসলমান সেনা রাখিতেছেন ও প্রেরণ করিতেছেন, ইহা অতীব অন্যায়। ইহার জন্য যে অসন্তোষ-সঞ্জাত হইতেছে, ইহার জন্য সরকার দায়ী।

পরবর্ত্তী মন্তব্যগুলির মধ্যে মহামান্য তুর্কীর সুলতানের প্রতি ভারতীয় মুসলমানের কর্ত্তব্যের কথা, মহামান্য কাবুলের আমীরের প্রতি ভারতীয় মুসলমানের শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের কথা, হিন্দু-মুসলমানের সদ্ভাবের কথা খেলাফতের জন্য অন্ততঃ ৩০ লক্ষ টাকা চাঁদা তোলার কথা, উহার জন্য স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করার কথা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও সিন্ধু প্রদেশের মহাজরীণদের নিগ্রহের কথা প্রভৃতি অনেক কথা ছিল। "বসুমতী"

সংগ্রহ বৈচিত্র্য

পরমাণুর আভ্যন্তরীণ শক্তি

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক এইচ, জি, হাওয়েলস্, লর্ড কেলভিন এবং সার অলিভার লজ প্রভৃতি মনীষীগণের গবেষণা ও আলোচনা এখন এক নূতন দিকে সুরু হইয়াছে। হাওয়েলস্ সাহেব বলেন যে, এই গবেষণার দ্বারা বৈজ্ঞানিক জগৎ এক নূতন শক্তি-কেন্দ্রের অনুসন্ধান পাইয়াছে। তিনি বলেন যে, পৃথিবীতে যদি কয়লা, বাষ্প, বিদ্যুৎ, তৈল বা পেট্রোলের একেবারে অভাব হইয়া পড়ে তাহা হইলেও প্রত্যেক পদার্থের প্রতি পরমাণুর ভিতরে যে শক্তি সঞ্চিত আছে তাহার ব্যবহারের উপায় বাহির করিতে পারিলে সমস্ত কার্য্য আমরা অবলীলাক্রমে সম্পাদন করিতে পারিব।

সম্প্রতি রেডিয়াম নামে যে ধাতু আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে প্রতিক্ষণে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিঃকণিকা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। ইহা এত সূক্ষ্ম যে, একটি পরমাণু অপেক্ষাও এই জ্যোতিকণার ওজন দশ হাজার ভাগের এক ভাগ হইতেও অল্প। এই কণিকা গুলির মধ্যে যে গুলি সর্ব্বাপেক্ষা ধীরে গমন করে, সেই গুলি প্রায় প্রতি সেকেণ্ডে নয় মাইল ভ্রমণ করে। প্রত্যেক কণিকাগুলি যাবতীয় পদার্থই দাহ করিয়া দিতে পারে। এই রেডিয়াম আবিষ্কারের সঙ্গেই উপরি উক্ত বৈজ্ঞানিকেরা এই নূতন দিকে গবেষণার পথ পাইয়াছেন।

তাঁহারা বলেন, বাষ্পের দ্বারা আমরা যে কার্য্য করাইয়া লই তাহাও এই পরমাণু বা অ্যাটমের অভ্যন্তরীণ শক্তির কাজ। জল গরম করিলে জলের উপাদানগুলি ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম করে এবং জলের অণুগুলি অধিক স্থান অধিকার করিয়া বিস্তার লাভ করে। এই অণুগুলি এত জোরে ছড়াইয়া পড়িতে চায় যে, উপরকার ঢাকনাটাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়। ইহাতেই বুঝা যায় যে, এক একটি পরমাণুর কতখানি শক্তি সঞ্চিত থাকে।

তাঁহাদের বিশ্বাস যে, একটি আঙ্গুলের পরমাণুগুলি যত শক্তি ধরে তাহার দ্বারা ব্রিটিশ দ্বীপের সমস্ত রেলগাড়ীগুলি এক মিনিট ধরিয়া চালান যায়। যে কোন ধাতুদ্রব্যের পরমাণুগুলিতে যে শক্তি নিহিত আছে তাহার কয়েক সের [illegible] পাওয়া যায়। এক আউন্স ক্লোরিণ নামক সূক্ষ্ম পদার্থের মধ্যেকার শক্তির সাহায্যে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় জাহাজখানিকে এক সপ্তাহ ধরিয়া পূর্ণবেগে চালান যায়। এক বা দুই আউন্স যে কোন ধাতুদ্রব্যের মধ্যে নিহিত শক্তি এক হাজার টন কয়লা পোড়াইয়া যত শক্তি পাওয়া যায় তাহা অপেক্ষাও অধিক।

লর্ড কেলভিন্ এবং সার অলিভার লজ অঙ্ক কসিয়া দেখিয়াছেন যে এক টুক্‌রা কাচ বা এক গেলাস জলের অন্তর্নিহিত শক্তির দ্বারা ইংরাজ জাতির সমস্ত নৌবহরকে উঠাইয়া পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ স্থানে নিক্ষেপ করা যায়।

সার অলিভার লজ বলেন যে, উপযুক্ত মস্তিষ্কের দ্বারা এই শক্তির উপযুক্ত ব্যবহার এবং এই শক্তির উপর অধিকার রাখার কৌশল বাহির না করিয়া কেবল পরমাণুর শক্তিকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিলে একটা ঘোরতর বিপদের আশঙ্কা আছে। ইহা এত ভয়ঙ্কর এবং এত প্রবল যে, কিরূপে এই শক্তিকে অধীনে রাখা যাইতে পারে তাহা না জানিয়া কেহ যেন ইহাকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা না করেন। ফলে হয় ত এই শক্তির বিক্রমে আমাদের গ্রহটি ধ্বংশ প্রাপ্ত না হইয়া যায়। আমরা বর্ত্তমানে এ শক্তিকে কাজে লাগাইবার উপযুক্ত হই নাই, লাগামের উপর অধিকার না থাকিলে দুর্দান্ত অশ্বে আরোহণ করা নিরাপদ নহে।

(সম্মিলনী)

পোষ্টাপিসের নূতন নিয়ম।—১লা সেপ্টেম্বর হইতে নিয়ম হইয়াছে যে, রেজেষ্টারী না করিয়া ভেলুপেবলে কোন পুস্তক বা অপর কোন দ্রব্য ডাকযোগে পাঠান চলিবে না। বর্ত্তমানে সংবাদ পত্র এবং পুস্তকাদি ভেলুপেবলে অত্যধিক পরিমাণে প্রেরিত হইয়া থাকে। এই নূতন নিয়মে গ্রাহক ও প্রেরক উভয় পক্ষের কার্য্যেরই বিশেষ অসুবিধা হইবে সন্দেহ নাই।

নোবেল প্রাইজ।—১৮ বৎসরের ১৮ জন সাহিত্যের পুরস্কার-প্রাপ্তগণের মধ্যে ৯ জন নাটক লেখক অথবা নিজের পুস্তক হইতে নাটক প্রস্তুত করিতে দিয়া জনসমাজে বিশিষ্ট ভাবে পরিচিত হইয়াছেন। এবারের পুরস্কার স্পেনীয় নাট্যকার জ্যাসিন্টো বেনাভেন্টিকে দেওয়া হইবে। তাঁহার